মাসিকসন্দর্ভ ও সমালোচন।

৫ম খণ্ড।] ১২৮৭। [১ম সংখ্যা।

প্রাণ।

"কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ"

"স উ প্রাণস্য প্রাণঃ" *

"প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎপ্রতিষ্ঠিতং" †

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং" ‡

"Oft in my way have I
"Stood still, though but a casual passenger,
"So much I felt the awfulness of Life."—*Wordsworth*.

কাব্য এবং বিজ্ঞান যেন একই ভাবে বিভোর, যেন একই চিন্তায় অভিভূত হইয়া বলিয়াছে,—এই 'ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড'! এই বিশ্বসৃষ্টি কি বৈচিত্র্যময়ী! বস্তুতঃও মনুষ্যের হৃদয় এবং মনুষ্যের বুদ্ধি, পাশব-প্রবৃত্তির প্ররোচক উত্তেজনা, বিষয়-বাসনার সংকোচনী, এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষার মোহ-মায়া হইতে ক্ষণকালের জন্য উন্মুক্ত হইয়া, চিন্তার সেই নিভৃত নিবাসে প্রবিষ্ট হইলে, আপনা হইতেই সমস্বরে বলিয়া উঠিবে, এই 'ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড'! এই বিশ্বসৃষ্টি কি বৈচিত্র্যময়ী!

ঐ দেখ তুষার-ধবল প্রকাণ্ড পর্ব্বত,

* তলবাকারোপনিষৎ। প্রশ্ন,—প্রাণ কাহার দ্বারা প্রথম নিযুক্ত হইয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করে?—উত্তর,—তিনি প্রাণের প্রাণ।

† প্রশ্নোপনিষৎ।—ত্রিজগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে সমুদয়ই প্রাণের বশে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

‡ এজগতে যাহা কিছু আছে, সমুদয়ই সেই প্রাণময়ের অধিষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

মেঘ-মালার উপর মস্তক তুলিয়া এবং তপস্বীর মত নীরব ও সাধকের মত নিস্তব্ধ-গৌরবে অটল থাকিয়া, কিরূপ স্তিমিতনেত্রে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ডতা দর্শন করিতেছে! আবার ঐ দেখ রজত-রেখার মত সূক্ষ্ম, অতি শুভ্র জল-রেখা, যজ্ঞসূত্রের ন্যায় পর্ব্বত-দেহে বিলম্বিত হইয়া, অথবা তপোরত পর্ব্বতের প্রেমাশ্রুবৎ পর্ব্বত-বক্ষে ধীরে বহিয়া কি অপূর্ব্ব মাধুরীতে শোভা পাইতেছে! ঐ দেখ, সুগভীর সমুদ্র, সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে জড়িত হইয়া, প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ের ন্যায় উথলিয়া উথলিয়া, এই ভীষণ-গর্জ্জনে, এই দীর্ঘশ্বাসের শোক-নিঃস্বনে সৃষ্টির অসীমতা ও বিচিত্র-রমণীয়তা বিষয়ে কতই কি কহিতেছে! আবার ঐ দেখ নির্ম্মাল্যপুষ্প, সমুদ্রের ফেণার উপরে ভাসিয়া ভাসিয়া, সমুদ্র-তরঙ্গে নৃত্য করিয়া, ক্ষুদ্র ও বৃহতের পরস্পর তুলনায় কি বিচিত্র দৃষ্ট হইতেছে! পর্ব্বতের ঐ উচ্চতা এবং সমুদ্রের এই বিস্তার ও গভীরতা চিন্তা করিলে, কে না বলিবে,—ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড, এই বিশ্বসৃষ্টি কি বৈচিত্র্যময়ী! কিন্তু বিজ্ঞান ও কল্পনা কি পর্ব্বত ও সমুদ্র দর্শনেই পরিতৃপ্ত হয়?

পৃথিবীর সমস্ত পর্ব্বত যদি একত্র পুঞ্জীকৃত হয়, বিজ্ঞানের চক্ষে তাহাও বিশ্বসৃষ্টিতে একটি বালুকণা হইতে ক্ষুদ্রতর পদার্থ; এবং পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র যদি উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত হয়, কল্পনার চক্ষে তাহাও উষার নয়নাম্বুসদৃশ কমল-দল-বিলম্বি বারিবিন্দু হইতে লঘুতর পদার্থ। পৃথিবী, পর্ব্বত ও সমুদ্রকে স্তনন্ধয় শিশুর ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া অবিরাম পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু সৌর-জগতের তুলনায় পৃথিবী ... পিণ্ড মাত্র;—এবং আমাদিগের এই ... জগৎ, পৃথিবীর ন্যায় বহু গ্রহ উপগ্রহের আবাসস্থান ও অবলম্ব হইয়াও, অনন্ত সৃষ্টি-জগতের মধ্যে ততোধিক নগণ্য, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, একটি কণিকা মাত্র। অহো! বিশ্ব কি প্রকাণ্ড! এই চন্দ্রতারাময়ী সৃষ্টি কি মনোহারিণী! বুদ্ধি ও কল্পনা কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিত হইয়া, কখনও আশার উল্লাসে, কখনও আশঙ্কার অবসাদে, এই অনন্ত বিস্তার ও সৌন্দর্য্যের পারাবার মধ্যে অহোরাত্র সন্তরণ করিতেছে; হায়! কোথাও ইহার অন্ত নাই! তারকার পর তারকা, সূর্য্যের পর সূর্য্য এবং জগতের পর নূতন জগৎ ধূ ধূ বিভাসিত হইতেছে; কোথাও ইহার শেষ সীমা নাই!

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অনন্তের ও অন্ত আছে, মনুষ্যের অন্তরাত্মা এই অসীমেরও শেষ সীমা জ্ঞানতঃ সন্দর্শন করিয়াছে। যেমন অন্ধকারের শেষ সীমা আলোক, অভাবের শেষ সীমা উৎপত্তি এবং অজ্ঞানের শেষ সীমা জ্ঞান; সেইরূপ এই অচেতন, অনন্ত জড় জগতের শেষ সীমা এবং ইহা হইতে বৃহত্তর, উচ্চতর এবং অনির্ব্বচনীয় গৌরবে গৌরবান্বিত শ্রেষ্ঠতর পদার্থ,—প্রাণ,—বিস্ময়কর ও মধুর, বুদ্ধির অগম্য অথচ নিত্যপ্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূল। প্রাণের সহিত প্রাণশূন্য জড় জগতের তুলনা নাই। যখন ঝটিকা কি ঝঞ্ঝাবাতের প্রবল-প্রতিঘাতে অবনী থর থর কম্পমান হয়, শত বর্ষের প্রাচীন পাদপ আমূল-উৎপাটিত হইয়া তৃণের ন্যায় উড়িয়া যায়, দামিনী

-ববহ্নির মত নভস্তল ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়ে, বজ্র কড় কড় নাদে মুহুর্মুহু নিপতিত হইতে থাকে, নদ ও নদী ক্ষিপ্তের মত প্রমত্ত হইয়া উঠে, এবং প্রকৃতি কেমন এক ভয়াবহ অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করে, আমরা তখন অবোধ শিশুর ন্যায় ভয়ে আকুল হইয়া জড়-প্রকৃতিকেই সৃষ্টির প্রধানা শক্তি বলিয়া সম্মান করি। কিন্তু স্বতন্ত্রজীবিনী, স্বেচ্ছানুসারিণী,প্রাণ-শক্তির নিকট পর-প্রণোদিতা প্রাণহীনা জড়প্রকৃতি যে কিছুই নহে, তাহা আমরা সহজে অনুভব করি না। সে অনুভব চিন্তাসাপেক্ষ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিন্তার ক্লেশবহনে অনিচ্ছুক।

জড়-রাজ্যে সূর্য্যই সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। সূর্য্য ভূ-লোক হইতে কত কোটি যোজন দূরে অবস্থান করিতেছে, তথাপি সূর্য্যের তেজ অসহনীয়। যদি এক খানি অর্ণবতরী ভূ-লোকহইতে সূর্য্যলোকে গমন করিতে সমর্থ হইত, এবং মুহূর্ত্তেরও বিশ্রাম না করিয়া প্রতি ঘটিকায় পঞ্চযোজন পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলেও সহস্রবর্ষে সূর্য্যালোকপ্রাপ্তি সম্ভব হইত কি না, সন্দেহ। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহা পরিগণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য আয়তনে চতুর্দ্দশ লক্ষ পিণ্ডীভূত পৃথিবীর সমান। এই গ্রহাধিরাজ, রাজাধিরাজের ন্যায় আপনার নভঃস্থ সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়া, আলোক দান করিতেছে, অধিকারস্থ গ্রহমণ্ডলকে আপনার শক্তিতে আকর্ষণ করিয়া যথা স্থানে বিধৃত রাখিতেছে, সরসীর কুসুমনেত্র উন্মীলিত করিয়া দিতেছে, প্রকৃতির প্রীতিমুগ্ধ-স্তাবক বিহঙ্গবর্গকে অতিকোমল কর-স্পর্শে প্রবোধিত করাইতেছে। কিন্তু সূর্য্য কি? আমার এই নখধৃত রেণুটিও প্রাণশূন্য, চেতনাবিহীন, পরার্থবস্তু, নব-নবতি-গ্রহের অধিপতি দ্যুতিমান্ প্রভাকরও প্রাণশূন্য, চেতনাবিহীন, পরার্থ বস্তু। এই যে পতঙ্গটি সূর্য্যালোকে উড়িয়া বেড়াইতেছে, সূর্য্যালোক সম্ভোগ করিতেছে, সূর্য্যালোকে পুলকিত হইয়া আপনার সুখে আপনি নাচিতেছে, জড় পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র হইলেও, প্রাণ আছে বলিয়াই উহা সূর্য্য হইতে বৃহত্তর। যেমন গৃহীর সহিত গৃহের প্রভেদ,—এক জন ভোগী, আর একটি ভোগ্যবস্তু, ইহার সহিতও সূর্য্যমণ্ডলের সেই প্রভেদ। এই পতঙ্গটির প্রাণ উহার নিজের জন্য, সূর্য্যের জন্য নহে; কিন্তু সূর্য্য ভোগ্যবস্তুর মত উহার জন্য নভোমণ্ডলে বিলম্বিত রহিয়াছে। উহার সুখ, দুঃখ, চেতনা আছে; সূর্য্যের সুখ, দুঃখ, চেতনা কিছুই নাই।

এইরূপ আবার সূর্য্য-প্রতিবিম্ব চন্দ্রমা। চন্দ্র কখনও মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়া, কখনও ফুল্লজ্যোতিতে প্রস্ফুটিত হইয়া, কবির হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিতেছে, প্রেমিকের হৃদয়ে অমৃত ঢালিতেছে, আর পরমার্থপরায়ণ প্রশান্তচিত্ত ভাবুকের হৃদয়ে শান্তির প্রসন্নমূর্ত্তি প্রতিফলিত করিতেছে। কিন্তু চন্দ্র আপনি কি? দর্পণেও যেমন পরকীয় জ্যোতি প্রতিভাত হয়, চন্দ্রেতেও সেইরূপ পরকীয় জ্যোতিমাত্র প্রতিভাত হইতেছে। সুতরাং চন্দ্রের যে চন্দ্রত্ব, তাহা পরের নিকট। দর্পণের মত উহাও পরার্থ বস্তু, উহার সুখ, দুঃখ,চেতনা কিছুই নাই। ঐ যে

চকোর চকোরী মনের সুখে মত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে, তৃষ্ণা পূরিয়া চন্দ্রকিরণ পান করিতেছে, চন্দ্র-কিরণে অঙ্গ ঢালিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, ভূতগৌরবে অকিঞ্চিৎকর হইলেও প্রাণ আছে বলিয়াই উহারা চন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর গৌরবান্বিত। চন্দ্র উহাদিগের বিলাসের জন্য, উহারা চন্দ্রের জন্য নহে;—সজীব ও নির্জ্জীব, সানন্দ ও সংজ্ঞাশূন্য,—বড়ই প্রভেদ।

ফলতঃ আমাদিগের দেহপ্রাণে যে সম্বন্ধ, এই বহিঃস্থ ব্রহ্মাণ্ড অথবা জড়জগৎ এবং ইহার অন্তঃস্থ প্রাণজগতের সহিতও পরস্পর সেই সম্বন্ধ। দেহ প্রাণের উদ্দেশ্যে,প্রাণ দেহের উদ্দেশ্যে নহে। দেহের যত কিছু সুখসম্পর্ক, শোভা সম্পদ, সমস্তই প্রাণ-স্পর্শে, প্রাণ-সম্মিলনে। প্রাণ বিনা দেহের প্রয়োজন কি? প্রাণের সহিত বিয়োগ হইলে উহার নাম শব।

জড়জগৎও প্রাণজগতের উদ্দেশ্যে, প্রাণ জগৎ জড়জগতের উদ্দেশ্যে নহে। পিঞ্জর যত কেন সৌষ্ঠবশালী হউক না, উহার সার্থকতা পিঞ্জরের পাখী। সরোবরের জল যত কেন স্বচ্ছ ও সুখসেব্য হউক না, উহার সার্থকতা শফরীর ক্রীড়াসুখ। পাখী উড়িয়া গেলে এবং শফরীর সলিল-সঞ্চালনা রহিত হইলে পিঞ্জর ও সরোবর উভয়ই শূন্যগৃহের ন্যায় নিষ্প্রভ, নিরর্থক এবং নয়নমনের পীড়াদায়ক।

তুমি সুন্দর, তুমি শক্তিমান্। তোমার নেত্রযুগল হইতে কখনও প্রীতির সুধাময়ী স্নিগ্ধধারা, কখনও পৌরুষের প্রদীপ্তবহ্নি উদ্গীর্ণ হয়;—তোমার বাক্য তাড়িত-শক্তির ন্যায় মনুষ্যকে উদ্বোধিত করে, অথবা মনুষ্যের আবিল ও উদ্বেল হৃদয়ে শান্তির পবিত্র বারি ঢালিয়া দেয়। শ্রুতি তোমার এক রাজ্য। উহাতে কতই কি ভোগ্য রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? প্রণয়ীর মধুর কণ্ঠ, সংগীতের স্বর্গীয় সুখ, কবিতার কল-নিক্কণ, উদ্দীপনার জলদ-গম্ভীর মধুরধ্বনি এই সকল দেবজনস্পৃহনীয় সামগ্রী লইয়া শ্রুতি তোমার পরিতৃপ্তির জন্য পার্শ্বে অবস্থিত। স্পর্শ তোমার আর এক রাজ্য, এবং দৃষ্টি তোমার এক অতুল সাম্রাজ্য। যাহা শ্রুতির অধিকারে নাই, স্পর্শ তোমায় তাহা উপহার দিতেছে,—যাহা শ্রুতি ও স্পর্শ উভয়েরই অলভনীয়, দৃষ্টি নিখিল জগতের সেই নিরুপম সম্পদ তোমার নয়নসান্নিধ্যে আঁকিয়া রাখিতেছে। তুমি অসহায় হইলেও অবনীতলে সম্রাটের আসনে আসীন রহিয়াছ;—মস্তক উচ্ছ্রিত, দৃষ্টি অভিমানে আকুঞ্চিত, মূর্ত্তি চিত্রার্পিত প্রতিকৃতির ন্যায় স্থির। কিন্তু তোমার এই শক্তি, এই সাম্রাজ্য, এই শারীরসম্পদ ভোগ করে কে?—না, তোমার প্রাণ। প্রাণ যখন বাহির হইয়া যায়, তখন দৃষ্টি অন্ধ, শ্রুতি বধির, লাবণ্য পাদ-দলিত লীলাকুসুম, এবং ভোগের সমস্ত সামগ্রীই শূন্যপিঞ্জর ও শূন্যসরোবর।

জড়জগৎও এইরূপ সুন্দর, শক্তিসম্পন্ন ও অগণ্য সম্পদের আশ্রয় স্থল। অগ্নি, জল ও বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয় উহার শক্তি বহন করিতেছে; ফুল, ফল, লতা, পাতা, আকাশের নীলিমা, প্রভাত ও সন্ধ্যার মধুরিমা, শ্যাম, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ; জ্যোৎস্নার বিবিধ কান্তি এবং আলোক ও অন্ধকা-

রের বিবিধ মিশ্রণ ইহার রূপের লহরী দেখাইতেছে। এমন সৌষ্ঠব ও সম্পদ, এমন মহিমা ও বৈভব আর কোথায় আছে? কখনও ভূকম্পে জগৎ কাঁপিতেছে, কখনও মৃদু-মন্দ-সমীর-হিল্লোলে জগৎ দুলিতেছে, এবং কখনও বা জলে স্থলে কুসুম-বিকাশে এবং চন্দ্র তারার সুস্নিগ্ধ প্রকাশে জগৎ হাসিতেছে। কিন্তু উহার এই সৌষ্ঠব ও বৈভব, এই মহিমা ও মাধুরী, ভোগ করে কে?—না, উহার অভ্যন্তরীণ প্রাণজগৎ। প্রাণ জগতের প্রয়োজনে না আসিলে, এই জড়জগতের প্রয়োজন কি? প্রাণশূন্য ব্রহ্মাণ্ডের নাম ব্রহ্মাণ্ডময় শ্মশান। যদি চক্ষু না দেখিল ও চকোর না চাখিল, তবে চন্দ্রিকা বিলুপ্ত হউক। যদি অনন্তসংখ্য প্রাণীর প্রাণ আলোক দর্শনে পুলকিত না হইল, তাহা হইলে সূর্য্য নভস্তল হইতে খসিয়া পড়ুক। যদি প্রাণজগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে এই উপভোগ্য জড়জগৎও একবারে প্রলয়ে বিলীন হইয়া যাউক।

মনুষ্য সাধারণতঃ জড়জগতের কথা লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, এবং কবি ও বৈজ্ঞানিকের নিকট শুনিয়া শুনিয়া সর্ব্বদা জড়জগতেরই চিন্তা করে। বায়ু বহিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, মেঘ বর্ষিতেছে, মৃত্তিকা স্পৃষ্ট হইতেছে, উল্কা দীপ্তি পাইতেছে, জ্বালা অনুভবে আসিতেছে, জলে তৃষ্ণা পূরিতেছে, জগদ্‌যন্ত্র আবর্ত্তিত হইয়া শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতু এবং দিন-যামিনীর পরিবর্ত্ত ঘটাইতেছে, ইত্যাদি সমস্ত কথাই জড়তত্ত্বের কথা। ঊর্দ্ধে, অধে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সর্ব্বত্রই ঐ জড়শক্তির দুর্ভেদ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। চক্ষু আর কিছু দেখে না, কর্ণ আর কিছু শুনিতে পায় না, শরীর অন্য কোনরূপ সত্বা স্পর্শে পরিজ্ঞান করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং কারারুদ্ধ মনুষ্য শৈশবের প্রথম বিকাশ হইতে একমাত্র জড়বস্তুকেই বস্তুজ্ঞান করিতে শিক্ষা করে; এবং অভ্যাসে তাহার এইরূপ সংস্কার ক্রমশঃ এমনই বদ্ধমূল হয় যে,যাহা জড় নহে,—যাহা জড়প্রকৃতির বহির্ভূত, জড়শরীরের অবিষয়ীভূত, তৎতাবৎ সমস্তই তাহার নিকট অবস্ত, অসত্য ও অলীক। কিন্তু যিনি কাব্যের প্রথম ভাতি এবং বিজ্ঞানের শেষ জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া প্রাণজগতের অভ্যন্তরে অনুভূতির দৃষ্টিলাভ করেন,তাঁহার নিকট জড়জগৎ যেমন বাস্তব পদার্থ, প্রাণজগৎ এবং উহার বৈভবসম্পদও তেমনই কি ততোধিক বাস্তব পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এবং তিনি পবিত্রসলিলা গঙ্গা কি নর্ম্মদার প্রবাহকে যেমন প্রকৃত প্রবাহ বলিয়া জানিয়া আসিতেছেন, আশার স্রোত, আকাঙ্ক্ষার স্রোত এবং জীবের জীবনস্রোতকেও তেমনি কি ততোধিক প্রকৃত বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করিয়া সহর্ষভীতির নূতন স্ফুরণে চমকিত হন। তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার বিবেক, তাঁহার চিত্তবৃত্তি, তাঁহার অন্তরাত্মা তখন এই ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণজগতে বিচরণ করে;—এবং কি কীটদেহে, কি করি-কলেবরে, কি সাগরগর্ভে, কি শৈলশৃঙ্গে, সর্ব্বত্রই প্রাণের সত্বা ও ক্রিয়া এবং প্রাণীর প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, যিনি প্রাণের প্রাণ, প্রাণজগতের অনাদি, অনন্ত,অক্ষয় প্রস্রবণ, তাঁহাতে একেবারে ডুবিয়া যায়।

তখন কোকিলের প্রমত্ত কূজন, ভ্রমরের বিনোদ-গুঞ্জন, বন-বিটপীর প্রভাতি বন্দনা, তাঁহার কর্ণে মধু বর্ষণ করে, এবং তাঁহাকে কর্ণে কর্ণে উপদেশ দেয়,—এ সংসার প্রাণশূন্য মরুভূমি নহে, প্রাণস্পর্শে শীতল হও। তখন অসংখ্য জীবের জীবন-চেষ্টা, উল্লাস, উদ্যম, হর্ষ, বিষাদ, সুখ ও দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে প্রগাঢ় অনুভূত হয় এবং ইহার প্রত্যেক ভাবই সজীব ভাষায় তাঁহাকে বলিতে থাকে—এ সংসার ভস্মময় দগ্ধশ্মশান নহে, প্রাণস্পর্শে শীতল হও। তখন প্রাণজগতের অনন্তনেত্র, তাঁহার নেত্রবিম্বে নিপতিত এবং অনন্তপ্রাণ তাঁহার প্রাণে আসিয়া মিশ্রিত হয়, এবং সেই সমবেত দৃষ্টি ও সম্মিলিত প্রাণ তাঁহাকে আনন্দ ও উৎসাহভরে কহিতে থাকে,—এ সংসারে তুমি একা নহ, প্রাণস্পর্শে শীতল হও। আর, সূর্য্য হইতে যেমন অজস্রপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, এজগতের সংখ্যাতীত, চিন্তাতীত এবং কল্পনারও গতির অতীত, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সুন্দর ও বিকট, বীভৎস ও ভয়ানক, অনন্ত প্রাণ-প্রবাহ যে, সে একই প্রস্রবণ হইতে অবিরাম প্রবাহিত হইয়া, অনন্তদিকে অনন্ত মূর্ত্তিতে বহিয়া যাইতেছে, ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া লীলার নূতন বৈচিত্র্য এবং শক্তির নূতন বিকাশ ও নূতন বিভ্রমবিলাস প্রদর্শন করিতেছে, তখন এই জ্ঞান তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেয় যে,—তোমার এই তৃষাতুর ক্ষুদ্র প্রাণ নিরাশ্রয়, নিরালম্ব নহে; তুমি সেই প্রাণারামের শরণ লও। প্রকৃতি তাঁহার প্রতিকৃতি, তিনিই প্রকৃতির প্রাণ। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত ;—

" স উ প্রাণস্য প্রাণঃ "

কীর্ত্তিনাশা।

(সন্ধ্যা—রাজনগর)

সকলি কি স্বপ্ন! বল ছিল কি এখানে
অভ্রভেদী সেই " এক বিংশতি রতন " ?
যেই সৌধ চূড়া হ'তে বিশাল পদ্মায়
বোধ হ'ত যজ্ঞ-উপবীতের মতন ?
সে বিশাল রাজপুরী ছিল কি এখানে,
পড়িয়াছে ছায়া যার বঙ্গ ইতিহাসে ?
যাহার বিশাল ছায়া, লম্বিয়া পদ্মায়,
পড়েছিল বঙ্গেশের হৃদয়-আকাশে ?

সে রাজনগর এ কি ? সকলি স্বপন !
স্বপনের মত সব গেছে লুকাইয়া !
বঙ্গ সিংহাসন ছিল আকাঙ্ক্ষা যাহার,
একটী তৃণও তার নাহি নিদর্শন !
অতল সলিল গর্ভে পড়িল ভাঙ্গিয়া
কর্ত্তা, কীর্ত্তি;—কি সাদৃশ্য ! পশিল অতল,
চক্র, চক্রী ; হায় তার, অচিন্ত্যে এফল,
অমর কলঙ্ক মাত্র, রহিল কেবল !

৩

কীর্ত্তিনাশা! মানবের ভীষণ শিক্ষক!
ইষ্টক উপরে করি ইষ্টক স্থাপন
লভিবারে অমরতা বাসনা যাহার;
লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে
কাল গর্ব্ভে অমরতা; আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীর্ত্তির শ্মশানে,
দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত নয়নে
তাহার অদৃষ্ট লিপি; ভাবি সমাজের
তব মৃদু কল কলে শুনুক শ্রবণে।

৪

মরি কিবা অভিমানে যাইছ বহিয়া
সন্ধ্যালোকে কীর্ত্তিনাশা! গরবে যেমতি
বিজয়ী বীরেন্দ্র যার মৃদু মন্দগতি,
উপেক্ষি বিজিত শত্রু; চলেছ তেমতি
উপেক্ষিয়া ভগ্নতীর। কি শান্ত হৃদয়!
গণা যায় একে একে তারকা সকল,
প্রতিবিম্বে নীলজলে; কি স্রোত মধুর,
ঝরিবে না গোলাপের, কামিনীর দল।

৫

এত অভিমান যদি; ধর তবে নদী,
ধর একবার সেই ভীষণ মূরতি,
রাজবল্লভের পুরী গ্রাসিল যে রূপে;
ভীষণ ঘূর্ণিত স্রোতে ছাড়িয়া বৃংহতি
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে; তরঙ্গ ফুৎকারে
প্রকম্পিত দিঙ্মণ্ডল করি বিধূমিত;
যে মূর্ত্তিতে বালকের ক্রীড়া যষ্টি মত
ডুবালে সে কীর্ত্তিরাশি;—কল্পনা অতীত!—

৬

ধর সেই মূর্ত্তি। আমি দেখাব তোমায়
বঙ্গ ইতিহাসের সে পৃষ্ঠা ভয়ঙ্কর!
দেখাব বিপ্লব চিত্র, ঘূর্ণ চক্রে যার
ডুবিলেন এই রাজনগর-ঈশ্বর!
তুচ্ছ এই ক্ষুদ্র পুরী;—সেই ঝটিকায়
একটি বিশাল রাজ্য পড়েছে ভাঙ্গিয়া!
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র শাস্তি;—দেখহ চাহিয়া
কি শাস্তি পশ্চাতে তার গিয়াছে রাখিয়া!
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র সৃষ্টি;—এই বালু চর,
একই নিশ্বাসে যাহা পার মিশাইতে;
সে বিপ্লবে, যেই রাজ্য গিয়াছে সৃজিয়া
না ধরে শকতি কাল কণা খসাইতে।

৭

দূর হৌক ইতিহাস! দেখ একবার
মানব হৃদয় রাজ্য; দেখ নিরন্তর
বহিতেছে কি ঝটিকা! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
কতই গগণস্পর্শী হর্ম্ম্য মনোহর
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কত রূপান্তর তার! উঠিছে জাগিয়া
কতই নূতন সৃষ্টি! কত পুরাতন,
নয়ন না পালটিতে যাইছে ভাসিয়া!

৮

কীর্ত্তিনাশা!—কিবা নাম! কিবা পরিণাম!
পার তুমি মানবের কি কীর্ত্তি নাশিতে?
বঙ্গ ইতিহাসের সে কাল পৃষ্ঠা হ'তে
একটি অক্ষর তুমি পার কি মুছিতে?
মুছিলে যেমন এই ধরাপৃষ্ঠ হ'তে
রাজবল্লভের কীর্ত্তি, পার কি মুছিতে
সে পৃষ্ঠা হইতে সেই কলুষিত নাম?
সেই পৃষ্ঠা অন্যরূপে পার কি লিখিতে?

৯

কীর্ত্তিনাশা!—বৃথা নাম! বৃথা অভিমান!
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার!
নাশিতে করের সৃষ্টি, সর্ব্ব শক্তিমান,
মানস সৃষ্টিতে তব নাহি অধিকার!

ভারতের পদ্মাক্রান্ত নৃপতি নিচয়,
হয়েছে অদৃশ্য সহ রাজ্য সিংহাসন;
ত্রিকালের সীমা ওই দেখ নিরূপিয়া,
দাঁড়ায়ে রয়েছে তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ!
নশ্বর জোনাকি রাশি গিয়াছে নিবিয়া,
অমর তারকাবলী রয়েছে চাহিয়া!

১০

তুচ্ছ তুমি কীর্ত্তিনাশা! মহাকালস্রোত,
ওই দেখ দূর হ'তে যাইছে নমিয়া
তাহাদের কীর্ত্তিরাশি; কর-পরশনে
চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ রয়েছে বাঁচিয়া
একটি চরণ-রেণু যেই পুণ্যবান্
পাইয়াছে, তার কীর্ত্তি করিতে বিনাশ
নাহিক শকতি তব, পারিবে না তুমি,
কীর্ত্তিনাশা, কিম্বা কাল সর্ব্ব-কীর্ত্তি-গ্রাস!

১১

আমি কীর্ত্তিহীন নর; না ডরি তোমায়
তব সংহারক মূর্ত্তি ধর কীর্ত্তিনাশা!
হায়! ভগ্নতীরে ওই মূলশূন্য তরু,
আমার অধিক রাখে জীবনের আশা!
তাহার ফলিবে ফল, ফুটিবে কুসুম;
নিষ্ফল জীবন মম! পড়েছে ঝরিয়া
আছিল যে ক'টি ফুল। থাক সেই তরু,
কীর্ত্তিনাশা কীর্ত্তিহীনে নেও ভাসাইয়া!

শ্রীনঃ—

কীর্ত্তিনাশা।

২

সকল প্রকারের উন্নতিই আপেক্ষিক এবং তুলনায় তাহার পরীক্ষা। তিল তিল করিয়া শরীর বাড়িতেছে অথবা কমিতেছে, আমরা স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যিনি দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখিয়াছেন, তিনি আজি দেখিলে আমাদিগের হ্রাস বৃদ্ধির তুলনা করিতে পারেন। সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতির পরীক্ষাও এই রূপে। শরীরের ন্যায় সাহিত্যেরও হ্রাস বৃদ্ধি আছে, উহা ঠিক এক অবস্থায় থাকে না। কিন্তু উহার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অবস্থা তুলনা করিয়া না দেখিলে উহার হ্রাস বৃদ্ধি পরীক্ষিত হয় না।

আমরা আজি বাঙ্গালা সাহিত্যের এই রূপ তুলনার একটি আকস্মিক সুযোগ পাইয়াছি। পাঠকবর্গের কৌতূহল-বিনোদনের জন্য আমরা আজি সেই সুযোগের ব্যবহার করিব। বান্ধবের এই সংখ্যায় কীর্ত্তিনাশা-শীর্ষক একটি নূতন কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, আমরা তুলনার জন্য কীর্ত্তিনাশা-শীর্ষক একটি পুরাতন কবিতাও এস্থলে উদ্ধৃত করিব। প্রথমটি বর্ত্তমান ১২৮৭ বঙ্গাব্দের

বৈশাখে লিখিত,—লেখক বঙ্গীয় সাহিত্যানুরাগী ইদানীন্তন ব্যক্তি মাত্রেরই প্রীতিভাজন; দ্বিতীয়টি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষের লিখিত,—লেখক তদানীন্তন কবিনায়ক (!) স্বনাম-প্রসিদ্ধ প্রভাকর-সম্পাদক। মধ্যে পঞ্চবিংশতি-বৎসর-পরিমিত কাল। এই পঁচিশ বৎসরে বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তি ও সম্পদ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, না ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা করা অনেকেরই আমোদজনক ও আনন্দপ্রদ হইতে পারে।

আমরা উল্লিখিত দুই সময়ের এই দ্বিবিধ রচনার মধ্যে কোন্‌টির গুণ-পক্ষপাতী, তাহা বলিতে চাহি না, অথবা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই তক বলিলে, বোধ হয় কোন দোষ নাই যে, যাঁহারা বাঙ্গালির মানসিক দুরবস্থা দেখিয়া বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে নিরাশ রহিয়াছেন, এই তুলনা তাঁহাদিগের আশা বর্দ্ধন করিবে; —এবং যাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষার অযুক্ত অভিমানে বাঙ্গালা সাহিত্যকে ঘৃণায় স্পর্শ করেন না, এই তুলনা তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিবে।

প্রস্তাবিত কবিতাদ্বয়সম্পর্কে পাঠকবর্গকে আমাদিগের আর একটি মাত্র কথা বলা অবশিষ্ট রহিয়াছে। আমরা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছি যে, এই উভয় কবিতাই তরঙ্গ-ভঙ্গি-ভয়াবহা কীর্ত্তিনাশার তটে বসিয়া বিরচিত হয়। প্রভাকর-সম্পাদক একবার পূর্ব্ববঙ্গ-পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কবিতা সেই সময়ের লিখিত; এবং প্রথমোদ্ধৃত কবিতাও ঐরূপ পরিভ্রমণ-সময়ের লেখা। আজিকার এই ব্যক্তি-সম্পর্কশূন্য সময়-গত তুলনা উভয় লেখকেরই স্বপ্নের অগোচর।

প্রভাকর-সম্পাদক তাঁহার কবিতানিচয়কে অনেক সময়ে গদ্য উপক্রমণিকা দ্বারা অবতারণ করিতেন। আমরা এই হেতু তাঁহার গদ্যাংশও আদর-সহকারে গ্রহণ করিলাম। তাঁহার গদ্যটুকু পদ্য অপেক্ষা আমাদিগের অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছে। কবিতা ছন্দের শৃঙ্খল বিনা স্ফূর্ত্তি পায় না, এমন আমাদিগের বিশ্বাস নহে।

রাজনগর

"যেখানে বৈদ্যকুলোদ্ভব মৃত মহারাজ রাজবল্লভ রাজ-ভবন নির্ম্মাণপূর্ব্বক ১০১ একশত এক রত্ন প্রভৃতি বহুবিধ দেবালয়, ইষ্টকসোপানমণ্ডিত বৃহৎ২ সুচারু সরোবর সকল, গড়, তোপাগার, হস্তিশালা, অশ্বশালা, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা, বিদ্যাশালা, নৃত্যাগার, নহবৎখানা, পণ্যবীথিকা, বিচারশালা, এবং মনোহর উদ্যান ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্ট অদ্বিতীয় কীর্ত্তিসকল স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইস্থল দর্শন করিয়া নয়ন নির্গত বিলাপ-বিন্দুর প্রাবল্য দ্বারা কেবল শোকসিন্ধুর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সর্ব্বনাশিনী কীর্ত্তিনাশা প্রায় সে সমুদয় কীর্ত্তি নাশ করিয়াছে, যিনি কীর্ত্তিনাশা, তিনিই পদ্মা, এই পদ্মা এই কীর্ত্তিনাশ করাতেই কীর্ত্তিনাশা নাম পাইয়াছে, তাহাই দেখিয়া আ-

শ্চর্য্যে অভিভূত হইতে হয়। নয়নের নিমিষ ফেলিতে ইচ্ছা হয় না, আহা! কি পরিতাপ! এই ক্ষণে বিক্রমপুরের সে বিক্রম নাই, সেই কীর্ত্তি-কুশল পৃথ্বীপতি বিরাজমান নাই সেই রাজবংশের সেই রাজ মর্য্যাদা আর কিছুই নাই, রাজনগরের সে শোভাই নাই, কিছুই নাই, কিছুই নাই, মধুহীন মধুচক্রের ন্যায় শুষ্ক স্থানমাত্র রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে অতি নিষ্ঠুর পাষণ্ড ব্যক্তিরও পাষাণময় হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতে থাকে! যে রাজপরিবার পূর্ব্বে পারিন্দ্রবৎ প্রচুর পরাক্রম প্রচার পূর্ব্বক মহানল পরাক্রান্ত কুঞ্জরের উচ্চ গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেন, অধুনা গ্রহবৈগুণ্য জন্য তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সামর্থ্যশূন্য হইয়া কুরঙ্গ অপেক্ষাও হীনবল হইয়াছেন। ফণির মণি নাই, ফণা নাই, ব্যঙ্গ ব্যঙ্গকরিয়া তাহার মুখের অগ্রে নৃত্য করিতেছে। ধরাধর ধরাতলে পতিত হইয়াছে, তাহার উপর গোষ্পদের জল প্রবল হইয়া তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিতেছে, মহাসমুদ্র শুষ্ক হইয়াছে,তাহার বক্ষে বিশাল-বিজন বিরল-বিপিন বিরচিত হইবায় ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তুব্যূহ বিচরণ করিতেছে। কালের ধর্ম্মই এইরূপ, কালের কর্ম্মই এইরূপ, কালে কিছুই থাকেনা, কাল সকলি করিতেছেন, কাল সকলি হরিতেছেন,অতএব বিলাপ করা বৃথা হইতেছে, কারণ এই কাল কালস্বরূপ হইয়া কালে ঐ কীর্ত্তিনাশাকে কীর্ত্তিনাশ করত সমস্ত রাজকীর্ত্তি নাশ করিয়াছে।

কীর্ত্তিনাশা।

হাঁরে ও করাল-কাল, নিদয় কালের কাল,
চিরকাল, স্থিরকাল নও ?।
হোয়ে বহুরূপা প্রায়, ধর বহু রূপ-কায়,
কালে কালে কত রূপ হও ? ॥
সীমাহীন রত্নাকর, হর তার রত্নাকর,
কর তায় দ্বীপের সঞ্চার।
গোষ্পদের বিন্দু জলে, সিন্ধুকর নিজ বলে,
পূর্ণিমারে কর অন্ধকার ॥
রেণুকে পর্ব্বত কর, হোয়ে সেই ধরাধর,
শোভা করে গগণ মণ্ডলে।
সগণ সহিত হায়, গগণ ছাড়ায়ে তায়,
মগন করহ রসাতলে ॥
নগর কানন কর, সমুদয় শোভা হর,
কালে কালে কালমূর্ত্তি ধর।
তোমার অসাধ্য কিবা, রজনীরে কর দিবা,
দিবারে রজনী তুমি কর ॥
তুমি কাল সর্ব্বকাল, ইহকাল পরকাল,
সকলি তোমার করাধীন।
বালকেরে বৃদ্ধ কর, যুবার যৌবন হর,
বলিরে করহ বলহীন ॥
হাঁরে, ওরে, সর্ব্বনাশি, এদেশের সর্ব্বনাশি,
উদরে দিয়েছ স্বর্ণভূমি।
গর্ব্বনাশা সর্ব্বনাশা, পৃথ্বীপতি কীর্ত্তিনাশা,
বৃত্তিনাশা কীর্ত্তিনাশা তুমি ॥
দেখিয়া হোতেছে ক্রোধ,এখনি করিব শোধ,
দেখিব কেমন তুমি নদী।
খেয়ে বারি প্রাণে মারি,একেবারে দফা সারি,
জাহ্নু মুনি হোতে পারি যদি ॥
রাজা রাজবল্লভের, হৃদিরূপপল্লবের,
সমুদয় দুর্ল্লভের ধন।

সাধনেতে যেই ধন, সঞ্চারিল নৃপধন,
সেই ধন করিলি নিধন ? ॥
বিক্রমে বিক্রমপুর, ছিল, যে, বিক্রমপুর,
সে বিক্রম কিছু নাই আর।
বঙ্গদেশ ভঙ্গ করি, রঙ্গরস পরিহরি,
অঙ্গ শোভা হরিয়াছ তার ? ॥
শ্রীরাজ নগর গ্রাম, শ্রীমতীর প্রিয়-ধাম,
কেবল হোয়েছে নাম সার।
শোভাময়ী রাজপুরী, সে শোভা করেছ চুরি,
সকলি করেছ ছারখার ॥
রাজবংশ অবতংস, মানসের রাজহংস,
সুখ-অংশ ধ্বংস করিয়াছ।
নীরানন্দ নাহি আর, নিরানন্দ সবাকার,
মানসের নীর হরিয়াছ ? ॥
মনোহর, সরোবর, উপবন, দেব ঘর,
একেবারে সমুদয় নিলি।
সুখের বাঙ্গাল দেশ, কাঙ্গাল করিয়া শেষ,
যশের জাঙ্গাল ভেঙ্গে দিলি ॥
প্রাচীনের চিহ্ন নাই, ছিন্ন ভিন্ন সব ঠাঁই,
কতদিন রবে আর রব ?।

"বেগের" সে বেগ হত, মলিন কুলীন যত,
গাঙ্গুলি নাঙ্গুলি হোলো সব ॥

* * * * *

শ্রীরাজবল্লভ রায়, শেষ রাজা বাঙ্গলায়,
তুষ্ট যাঁরে সকল ব্রাহ্মণ।
করি এক যজ্ঞ-সূত্র, স্বজাতির যজ্ঞ-সূত্র,
পুনরায় করিল স্থাপন ॥
অকাতরে বহুধন, যে করিল বিতরণ,
কীর্ত্তি যাঁর পৃথ্বী-পারে ধায়।
তাঁহার বংশজ যত, ফণী যেন মণি হত,
দিবসান্তে আহার না পায় ॥
যেন শিশিরের দিন, দিন দিন অতি দীন,
ক্ষীন হীন মলিন বদন।
রাগ নাই পূর্ব্বরাগে, গতি হয় অধোভাগে,
ভাঙ্গিয়াছে স্বর্গের সদন ॥
কিছিল, কি হোলো আহা ! আরনাকি হবে তাহা,
যা হবার হইয়াছে শেষ।
বিস্তারিয়া কালগ্রাস, কালেতে কোরেছে গ্রাস,
সমুদয় বাঙ্গালের দেশ ॥

জয়পুর।

৪র্থ খণ্ডের ১২শ সংখ্যার ৫৩৯ পৃষ্ঠার পর।

ভগবান্‌-দাসের আর তিন সহোদর ছিল; সুরতসিংহ, মধুসিংহ এবং জগৎসিংহ। ভগবান অপুত্রক থাকায় জগৎসিংহের পুত্র মানসিংহকে আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ভগবানের মৃত্যুর পর মানসিংহ অম্বরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ইনিই আকবর-সভার প্রধান রত্ন ছিলেন। নিজ প্রতিভা-প্রভাবে তৎকালে মানসিংহ এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দ্বারা যবনরাজের বিবিধ মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। একমাত্র তাঁহারই বাহুবলে উৎকলরাজ্য অধীনতা স্বীকার করে, আসাম প্রদেশ করদরূপে পরিণত হয়, এবং কাবুল রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয়। তিনি সময়ে সময়ে বাঙ্গালা, বেহার, কাবুল এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অখণ্ডপ্রতাপে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আকবরের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিবার উপক্রম করিলে বিক্রমসিংহ মানসিংহের হস্তেই লুপ্তপ্রভাব হইয়া লৌহপিঞ্জরে জীবন বিসর্জ্জন করেন। কবিকুলচূড়ামণিভারতচন্দ্ররায়-কৃত প্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে তদ্বিবরণ অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে, বঙ্গীয় পাঠকবর্গের জন্য আর তাহার দ্বিরুক্তির প্রয়োজন নাই। ক্রমে ক্রমে মানসিংহ এরূপ পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন যে, আকবরও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, বিংশতিসহস্র রাজপুত-বীরের অধিনায়ক মানসিংহের পরাক্রমে আকবর নিতান্ত জ্বালাতন হইয়াছিলেন; এমন কি উন্নতমনা আকবর মানসিংহের জীবন হরণ অভিপ্রায়ে বিষপ্রয়োগ দ্বারা নিতান্ত লঘুচিত্ত কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যবনরাজ আহার সামগ্রীর সহিত বিষমিশ্রিত করিয়া মানসিংহকে আহার করিতে অনুরোধ করেন; পরিচারকবর্গের ভ্রমনিবন্ধন ভোজনপাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া বিপরীত ফলের আবির্ভাব হইল। মানসিংহ নির্দ্দোষ সামগ্রী আহার করিলেন, আকবর অসন্দিগ্ধচিত্তে বিষমিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ পূর্ব্বক নিজকৃত চাতুর্য্যজালে পতিত হইলেন। আমরা ইতিহাস মধ্যে এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া যার পর নাই বিষাদিত হইলাম। ভারতবর্ষের সিংহাসনে আকবরের ন্যায় সম্রাট কখন বসিয়াছেন কি না সন্দেহ! আমরা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগের কথা বলিতেছি না—বর্ত্তমান যুগ আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরাক্রমের আয়ত্ত। অনেক নিরপেক্ষ ইউরো-

ক্ষীয়েরাও একথা স্পষ্টাভিধানে স্বীকার করেন যে, আকবরের ন্যায় বিচক্ষণ ও মনিষীসম্পন্ন নরপতি জগতে অতি দুর্লভ। মানসিংহের জীবন হরণাভিপ্রায়ে বিষপ্রয়োগ করা আকবরের ন্যায় ব্যক্তির কখনই উচিত হয় নাই।

আকবর মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে রাজা মানসিংহ স্বীয় ভাগিনেয় খসরুকে ভারতবর্ষের সিংহাসন-প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অশেষ-বুদ্ধিসম্পন্ন আকবর ইহা জানিতে পারিয়া বিবিধ উপায় দ্বারা প্রিয় পুত্র সেলিমের (জেহাঙ্গীর) শিরে রাজমুকুট প্রদান করেন। চক্রান্ত কিছুদিনের জন্য নিবৃত্ত হইল; মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করিলেন। কিয়ৎকালানন্তর খসরু-পক্ষীয়েরা প্রবল হইয়া পুনরায় বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। ইহাতে এই ফল হইল যে, দুর্ভাগা খসরু চিরকারারুদ্ধ হইল, এবং তদীয় সহচরবর্গের প্রাণদণ্ড হইল। ইতিহাসবেত্তারা এমনও কহেন যে, এবিষয়ে লিপ্ত থাকার জন্য মানসিংহের অনেক অর্থদণ্ড হইয়াছিল। মুসলমান ইতিহাসবেত্তারা কহেন বঙ্গদেশে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে মানসিংহের মৃত্যু হয়; কিন্তু রাজপুত ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে যে, ১৬১৭ খৃঃ অব্দে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে খিলজীদিগের সহিত যুদ্ধে মানসিংহের নিপাত হয়।

মানসিংহের জীবনবৃত্ত লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হয়। সুতরাং আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিতে হইল। মানসিংহ সম্বন্ধে একটি বিষয় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, এই জন্য এই স্থলে তাহার অবতারণা করিতেছি।

মিবারের রাণা প্রতাপসিংহ অমিত পরাক্রম ছিলেন। তিনি কখনই যবনদিগের নিকট নতশির হয়েন নাই। মানসিংহ সোলাপুর হইতে দিল্লীগমন সময়ে মহারাণা প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে মীবারে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি মানসিংহের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া আহারের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু রাণা প্রতাপসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন না। প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ বলিলেন, তাঁহার পিতার শিরোবেদনা হইয়াছে, সেই জন্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রতাপের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইতে সুচতুর মানসিংহের অধিক সময় লাগিল না। মানসিংহ বুঝিলেন, দিল্লীশ্বরের সহিত তাঁহার কুটুম্বত্ব হওয়ায় জাতিভ্রংশ হইয়াছে বলিয়া প্রতাপসিংহ তাঁহার সহিত একত্র বসিয়া আহার করিলেন না। মানসিংহ অমরকে কহিলেন, মহারাণার শিরোবেদনার কারণ বুঝিয়াছি, যাহা হইয়াছে, তাহা খণ্ডাইবার নহে, সে জন্য যদি মহারাণা আমার সহিত একত্রে বসিয়া আহার না করেন তবে অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার হয়। প্রতাপ সিংহ এই কথা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, যে রাজপুত তুর্কীকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত যাহার আহার হয়, রাণা তাহার সহিত খাইতে

পারেন না, ক্রোধে মানসিংহের সমস্ত শরীর কম্পিত হইল। অন্নস্পর্শ না করিয়াই উঠিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন প্রতাপের গর্ব্ব চূর্ণ করিবেন। মানসিংহের এই প্রতিজ্ঞা-নিবন্ধন রাজস্থানের যে ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা নিতান্ত অসম্ভব। এই জ্ঞাতি বিরোধে রাজস্থান এক কালে ছারখার হইয়া গিয়াছে।

মানসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রাও ভাগ্নসিংহ অম্বরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনিও দিল্লীশ্বরকর্তৃক পঞ্চহাজারী মনসবদার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি কোন অংশেই মানসিংহের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন না। একে স্বভাবতঃই অল্প বুদ্ধি তাহাতে আবার সতত মাদক সেবনে বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন। রাজ-লক্ষ্মী এরূপ অপদার্থ ব্যক্তিকে অঙ্কে স্থান প্রদান করেন না। পাঁচ বৎসর কাল মাত্র রাজ্য করিয়া ১৬২০ খৃঃ অব্দে ভাওসিংহ সংসার-লীলা সংবরণ করিলেন। তদীয় পুত্র মহাসিংহ পিতৃদোষে বশীভূত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই কালের করালগ্রাসে পতিত হন।

মানসিংহ মোগল সম্রাটদিগের নিকট যে বিপুল মানসম্ভ্রম লাভ করিরাছিলেন, তাঁহার অযোগ্য পুত্র ও পৌত্র তদধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই অবসরে যোধপুর ও বিকানীরের অধিশ্বরেরা সেই মানসম্ভ্রম একতন্ত্রা করিয়া লইয়াছিলেন। বিশেষতঃ জাহাঙ্গীরের সহিত বিকানীরের রাজদুহিতা বিখ্যাত নামা যোধা বাইএর পরিণয় হওয়ায় এক্ষণে অম্বরেশ্বরদিগের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। মহাসিংহের মৃত্যুর পর যোধা বাইয়ের মন্ত্রণায় জাহাঙ্গীর অম্বরের সিংহাসন মহার পুত্রকে প্রদান না করিয়া জগৎসিংহের পৌত্র জয়সিংহকে সমর্পণ করেন। এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজপুতমহিলার সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া অন্তঃপুর অলিন্দ হইতে জয়সিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অম্বররাজ! যোধা বাইয়ের অনুগ্রহে অদ্য তুমি অম্বররাজ্য লাভ করিলে, অতএব তাঁহাকে অভিবাদন কর।" রাজপুতব্যবহারানুসারে স্বজাতীয় স্ত্রীলোককে নমস্কার করিবার প্রথা প্রচলিত না থাকায়, জয়সিংহ কহিলেন "জাঁহাপনা! আপনার অন্তঃপুরশোভিনী অন্য রমণীকে অভিবাদন করিতে অনুমতি করুন, আমি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যোধা বাইকে প্রণাম করিতে অক্ষম।" সরলা যোধা বাই হাস্যমুখে কহিলেন, "ভাল, তোমার অভিবাদন করিতে হইবে না, আমি কিন্তু তোমায় অম্বর রাজ্য প্রদান করিলাম।"

মোগলসম্রাটদিগের সভায় জয়সিংহকে সকলে "মির্জা রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার বুদ্ধি ও বাহুবলে অম্বরসিংহাসনের বিলুপ্ত মানসম্ভ্রমের পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। জয়সিংহের কার্য্যকলাপে পরিতুষ্ট হইয়া সম্রাট অরঙ্গজীব তাঁহাকে ছয়হাজারীর মনসব উপাধি প্রদান করেন। জগদ্বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর বিশাল পরাক্রমে অরঙ্গজীব ব্যতিব্যস্ত হইয়া জয়সিংহকে তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কৌশলনিপুণ জয়সিংহ শিবজীকে ধৃত করিলেন এবং ধৃতকরণ-সময়ে

প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবেন। শিবজীর প্রাণরক্ষার জন্য সম্রাট-সমীপে বিবিধ অনুরোধ করিয়াও যখন দেখিলেন অরঙ্গজীব কথা শুনিবার লোক নহেন, তখন শিবজীর পলায়নে সহায়তা করিলেন। সকল বিষয়ে তাঁহার এমন বাক্যনিষ্ঠতা ও সত্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধন রাজকুমার দারার প্রাণবিনষ্ট হইয়াছিল।

জয়সিংহের অধীনে দ্বাবিংশতি সহস্র মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত অশ্বারোহী সেনা এবং দ্বাবিংশতি জন রণকুশল সেনানায়ক সতত আজ্ঞাবহ ছিল। সুতরাং তিনি সম্রাট-সভায় অন্যান্য রাজবর্গ অপেক্ষা প্রবল ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে অরঙ্গজীবের কঠোরহৃদয়ে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না, তিনিও জয়সিংহকে ভয় করিতেন। জয়সিংহ আপনার অমিতপরাক্রমে যার পর নাই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাটকে ক্রীড়াপুত্তলী মনে করিতেন। তিনি দুই হস্তে দুই কাচপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপনার সভামণ্ডপে সহচরমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বসিতেন, এবং সাহঙ্কারবাক্যে কহিতেন—"আমার হস্তে দিল্লী ও সেতারারাজ্য।" বামহস্তস্থিত কাচপাত্র দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিতেন—"এই সেতারারাজ্য চূর্ণ হইল; দিল্লীর ভাগ্য আমার দক্ষিণ হস্তে রহিয়াছে, তাহাও অক্লেশে চূর্ণ করিতে পারি।" এতাদৃশ গর্ব্বিতব্যবহারবার্ত্তা ত্বরায় দুর্বৃত্ত অরঙ্গজীবের শ্রুতিগোচর হইল। সম্রাট গোপনে জয়সিংহের বধসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। জয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র পাপিষ্ঠ কীর্ত্তিসিংহ রাজ্যপ্রাপ্তি লোভে সম্রাটকর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া পিতার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। দুরাত্মা কীর্ত্তিসিংহ যবনের চাতুরীতে মুগ্ধ হইল। পিতার সেবনীয় অহিফেনে গরল মিশ্রণপূর্ব্বক মহাপাপে কলুষিত হইয়াও স্বকীয় কামনা সিদ্ধ করিতে পারিল না। দিল্লীশ্বর এই পিতৃহন্তা দুর্বৃত্তকে কেবলমাত্র কামাপ্রদেশ প্রদান করিয়া অম্বররাজ্য তদীয় জ্যেষ্ঠ রামসিংহকে সমর্পণ করিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে রামসিংহ চারিহাজারী মনসব উপাধি পাইলেন। তিনি আসামযুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সেনানায়ক হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বিষণসিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি তিনহাজারী মনসব উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু তাহাও অধিক কাল ভোগ করিতে পারেন নাই।

বিষণের পুত্র জয়সিংহ অতি ভাগ্যবান নরপতি ছিলেন। প্রথম জয়সিংহ, যিনি মির্জা রাজা নামে অভিহিত ছিলেন, তাঁহা অপেক্ষা দ্বিতীয় জয়সিংহ অধিকতর গুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে সওয়াই জয়সিংহ নামে সম্বোধন করিত। অরঙ্গজীব সম্রাটের রাজত্বের চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষে এবং তাঁহার মৃত্যুর ছয়বৎসর পূর্ব্বে ১৬৯৯ খৃঃঅব্দে জয়সিংহ অম্বরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি চতুশ্চত্বারিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়া আপনার গুণকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। তিনি শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি অরঙ্গজীব কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়া সুকৌশল-সম্পন্ন রাজকার্য্যদ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর সিং-

হাসন লাভের জন্য বাহাদুরসাহ এবং বেদরবখত, উভয়ে পরস্পর ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। জয়সিংহ শেষোক্ত রাজকুমারের পক্ষ সমর্থন করেন। চোলপুরের যুদ্ধে বেদরবখতের পতন হইলে রাজলক্ষ্মী বাহাদুরসাহকে আলিঙ্গন করিলেন। বিজয়ী কুমার "সাহ আলম বাহাদুরসাহ" নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করতঃ শত্রুপক্ষীয় জয়সিংহের দণ্ড বিধানে একান্ত যত্নবান হইলেন। জয়সিংহের হস্ত হইতে অম্বর অপহরণের জন্য মোগলসৈন্য প্রেরিত হইল। তাহারা দেশ লুণ্ঠন করিয়া অম্বর অধিকার করিল। অম্বর রাজ্য শাসনের জন্য একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া গেলেন। পরিশেষে প্রভূত পরাক্রম জয়সিংহের অস্ত্রচালনা সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে পলায়ন করিয়া আসিল। পরস্পর অনুকূলতা করিবার জন্য জয়সিংহ মাড়োয়ারের অজিতসিংহের সহিত সম্প্রীতি করিলেন। ইহার পর তিনি মিবার ও বুঁদীর অধিপতিদিগের সহিত বহুকাল ধরিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

জয়সিংহ অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন; মোগলসিংহাসন পতনোন্মুখ ইহা তিনি বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার হৃৎপ্রত্যয় হইয়াছিল যে, এক্ষণে মোগল রাজসভা চক্রান্তকারীতে পরিপূর্ণ। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বলবিক্রম তাঁহার অগোচর ছিল না। তাহারা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, অনতিকাল মধ্যে দিল্লীশ্বরও তাহাদিগের করতলস্থ হইবে, ইহাও তিনি সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার প্রতিকার চেষ্টা করেন নাই। তিনি আপনার বলবিক্রম বুঝিতেন; কোথাকার জল কোথায় মিশিবে, কার্য্যকারণ ভাব দেখিয়া তাহা স্থির নিশ্চয় করিতে পারিতেন। তাঁহার এমন বলবিক্রম ছিল না, যে দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয় সেনা তরঙ্গের প্রতিরোধ করেন। যাহাতে নিজরাজ্য নির্ব্বিঘ্ন থাকে, তিনি তাহারই উপায় করিতেছিলেন। তথাপি এক দিনের জন্যও দিল্লীশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের ব্যবহার করেন নাই। অনেকে বলিতে পারেন, ফিরকসিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যে চক্রান্ত হয়, এবং যে চক্রান্তে তাঁহার রাজ্য ও জীবন উভয় লয়প্রাপ্ত হয়, ফিরকের সে বিপদে জয়সিংহ শেষকাল পর্য্যন্ত রাজপক্ষাবলম্বন করেন নাই। আমরা সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু ইহাও সাহঙ্কারে প্রকাশ করি যে জয়সিংহ যত দিন পর্য্যন্ত রাজপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তত দিন কেহই করেন নাই। ফিরকসিয়ারের যদি তৈমুর বংশীয় কোন সম্রাটের ন্যায় কিছু মাত্র বলবুদ্ধি থাকিত, তবে জয়সিংহ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিতেন না। দেখিলেন ফিরোক জড় বুদ্ধি,—পদোপযুক্ত পাত্র নহে—সিংহাসনের উপযুক্ত নহে; এরূপ অপদার্থের জন্য পথপরিষ্কার করিলেও যে কণ্টক বিস্তার করিবে; সুতরাং তিনি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া নিজ নিকেতন নিরুদ্বেগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইতিহাস ও জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ নির্ব্বিঘ্ন অবসর আর কখন প্রাপ্ত

হন নাই। তিন বৎসরকাল তিনি কোন যুদ্ধ বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৭২১ খৃঃ অব্দে মহম্মদ সাহ, সায়দ বিনাশ দ্বারা নিজ পথ পরিষ্কার করিলেন *। দিল্লীর সিংহাসন এখন শান্ত সম্রাট্ মহম্মদ সাহের করতলগত হইল। জয়সিংহের জীবন মধ্যে এই পাঁচ সাত বৎসর অবসরকাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় তিনি কেবল জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। ১৭২১ খৃঃ অব্দে তিনি মহম্মদ সাহ-কর্ত্তৃক আগরা ও তৎপরে মালব দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অতিজঘন্য জেজিয়া কর উঠাইয়া দেন, এবং তাঁহারই যত্নে জাঠদিগের উদয়োন্মুখ ক্ষমতা প্রশমিত হয়। ১৭৩২ খৃঃ অব্দে তিনি পুনরায় মালব দেশ শাসন করিতে গিয়া দেখিলেন মহারাষ্ট্রীয়দিগের দমন করিবার চেষ্টা মূর্খতা মাত্র; সুতরাং তাহাদের অধিনায়ক বাজিরাওয়ের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। তাঁহারই যত্নে বাজিরাও মালব দেশের সুবাদার হইয়াছিলেন। জয়সিংহের এই কার্য্যে অনেকেই দোষারোপ করিয়া কহে যে, তিনি দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের হস্তে ভারতবর্ষের চাবি প্রদান করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত জয়সিংহের সম্প্রীতির জন্য দিল্লীশ্বরের অনেক উপকার হইয়াছিল; কারণ এই কৌশলে তাঁহাদিগের দিল্লী আক্রমণে বিলম্ব পড়িয়া গেল। রাজপুতেরা দিল্লীর সিংহাসন-প্রতি ভক্তিমান ছিলেন, কিন্তু শাসনপ্রণালী ক্রমে ক্রমে এরূপ জঘন্য হইয়া উঠিতে লাগিল যে, এই সকল বলবিক্রম-সম্পন্ন পরিপোষকগণ ক্রমে ক্রমে সম্পর্কশূন্য হইয়া দাঁড়াইলেন। নাদের সাহের দিল্লী আক্রমণ-সময়ে রাজপুত রাজগণ আপন আপন রাজ্য রক্ষায় যত্নবান্ হইলেন। এই সময়ে জয়সিংহ এক মহা-ক্লিপদে পতিত হন, নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইল।

* এক সময়ে সায়দেরা সম্রাট সভায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে তাহার সমুদায় বিবরণ জানিতে পারা যায়।

বিষ্ণুসিংহের দুই পুত্র; জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ। জ্যেষ্ঠ জয়সিংহের সিংহাসনারোহণ সময়ে কনিষ্ঠ বিজয় নিতান্ত শিশু ছিলেন। বিজয়ের জননী জয়সিংহের হস্ত হইতে পুত্রকে নির্ব্বিঘ্ন রাখিবার জন্য কিচিবারা দেশে আপন পিত্রালয়ে লইয়া যান। বিজয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তদীয় জননী প্রচুর মণিমুক্তাদি সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে দিল্লীনগরে প্রেরণ করেন। সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী কমরুদ্দীন প্রচুর ধন রত্নের উৎকোচে মুগ্ধ হইয়া অম্বর রাজ্যের প্রধান অংশ বস্বা প্রদেশ বিজয়কে দিবার জন্য জয়সিংহকে অনুরোধ করেন। জয়সিংহ গৃহবিবাদ সর্ব্বনাশের মূল জানিয়া অকপটহৃদয়ে বৈমাত্রেয়কে ঐ প্রদেশ প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু বিজয় জননী এ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া যাহাতে সমগ্র অম্বর রাজ্য বিজয়ের হস্তগত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বার্থের জন্য লোকে কিনা করিতে পারে? দিল্লী দরবারে বিপুল অর্থ উৎকোচ দিয়া বিজয়-জ

ননী জয়সিংহের স্বত্ব অপহরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং তদর্থে দিল্লীশ্বরকে পাঁচ কোটি মুদ্রা এবং করস্বরূপ পাঁচ সহস্র সেনা প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। অকর্ম্মণ্য মোগল সম্রাট্ যে এই উৎকোচে মুগ্ধ হইবেন, তাহা কোন মতে অসম্ভব নহে। উজীর কমরুদ্দীন সম্রাট সমীপে প্রস্তাব করিবামাত্র কার্য্য সিদ্ধি হইল, এবং বিজয়ের নামে সনন্দ পত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। এ সকল কার্য্য এত গোপনে হইতে লাগিল যে, অপর কোন সভাসদ কিছু মাত্র জানিতে পারিলেন না। জয়সিংহের অতি বিশ্বাসী মিত্র খাণ্ডরান খাঁ কোন প্রকারে এই গোপনীয় সংবাদ জানিতে পারিয়া সম্রাট্ সভাস্থ অম্বর দূত কৃপারামকে সমুদায় ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করেন। এই বিষম ব্যাপার শ্রুতি গোচর হইবামাত্র কৃপারাম জয়সিংহকে সমস্ত সমাচার লেখেন। জয়সিংহ পত্র পাঠ মাত্র এক কালে অবাক্ হইলেন। পরম-বিশ্বাস-পাত্র নাজির সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, জয়সিংহ পত্র খানি তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "এক্ষণে ইহার উপায় কি?" সুচতুর নাজির ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া উত্তর করিলেন; "মহারাজ! বাহুবল ও ধনবলে ইহার কোন প্রতীকার হইবে না; কৌশলে ইহার প্রতীকার সাধন করিতে হইবে, চক্রান্তকারী দ্বারাই এ চক্রান্তের বিপর্য্যয় সাধন অতি সহজেই সম্পাদিত হইবে।" নাজিরের পরামর্শানুসারে জয়সিংহ কচ্বহ বংশের দ্বাদশ শাখার প্রধান প্রধান অধিনায়কদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তদীয় আমন্ত্রণানুসারে নাথাবত-নায়ক মোহনসিংহ, ডাঁকো-নায়ক দীপসিংহ, সুবর্ণ-পোতাধ্যক্ষ জোরওয়ারসিংহ, নারুক-পতি হিম্মতসিংহ, ঝলাই-প্রধান কুশলসিংহ, মোজাবাদেশ্বর ভোজরাজ, মাউলিপতি ফতেসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ জয়সিংহের সভায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অম্বরেশ্বর অতি বিনীত ভাবে সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনারাই আমাকে অম্বরের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছেন, কনিষ্ঠ বিজয়সিংহ বসবা প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী নবাব কমরুদ্দীন তাঁহাকে সমগ্র অম্বর রাজ্য প্রদান করিতেছেন।" তাঁহারা সকলেই এককাব্যে কহিলেন "আপনি যদি অকপট হৃদয়ে বিজয়সিংহকে বসবা প্রদেশ প্রদান করেন, তবে আমরা এ বিষয় সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়া দিতে পারি।" জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ বিজয়সিংহের নামে বসবা প্রদেশের দান পত্র লিখিয়া অধ্যক্ষদিগের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন; "আপনাদিগের উপর এই ব্যাপার মীমাংসার সমস্ত ভার প্রদান করিলাম, আপনারা আমাকে যাহা অনুমতি করিবেন আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।" সদস্যেরা বিজয়সিংহ সমীপে দূত-মুখে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন। বিজয়সিংহ কহিলেন, "ভ্রাতার প্রতিজ্ঞায় আমার কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই।" অধ্যক্ষেরা কহিয়া পাঠাইলেন, "আমরা এ বিষয়ে প্রতিভূ রহিলাম। যদি জয়সিংহ আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, তবে আমরা সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার

আশ্রয় গ্রহণ করিব এবং অম্বর রাজ্য তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিব।

বিজয়সিংহ এই সমাচার স্বীয় জননী ও প্রধান আশ্রয় কমরুদ্দীনকে জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে সম্মত হইলেন না; তথাপি কমরুদ্দীন খাণ্ডরান ও কৃপারামকে আদেশ করিলেন, "তোমরা বিজয়ের সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে এই ব্যাপার সুসিদ্ধ হয়, তাহা করিবে।" যাহাতে সুশৃঙ্খলরূপে সকল বিষয় সামঞ্জস্য হয়, তদ্বিষয়ে মধ্যস্থ মহাশয়েরা ব্যগ্র হইলেন, জয় ও বিজয় উভয় ভ্রাতার পরস্পর যাহাতে সাক্ষাৎ হয়, তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ চমু নগর সাক্ষাতের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু পরিশেষে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজধানীর ক্রোশত্রয় ব্যবধানে সঙ্গনেয়ার নগরে ভ্রাতৃমিলন স্থিরীকৃত হইল। বিজয়সিংহ তথায় আগমন পুরঃসর শিবির সংস্থাপন করিলেন। জয়সিংহ ভ্রাতৃশিবিরে যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে নাজির আসিয়া কহিলেন, বিজয় জননীর অভিপ্রায়, উভয় ভ্রাতার সম্মিলন ও স্নেহালিঙ্গন দর্শন করেন। জয়সিংহ সম্ভ্রান্ত প্রধান সভাসদ্‌বর্গকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা কহিলেন, "ক্ষতি কি! ইহাতে আমাদের কোন বাধা নাই!"

নাজির রাজরমণীর গমনোপযোগী মহাদোল প্রস্তুত করিলেন, এবং তদীয় আদেশ অনুসারে রাজরমণীর সহচরীগণের জন্য আর তিনশত যান প্রস্তুত হইল। মহাদোলে রাজমাতার পরিবর্ত্তে ভট্টীজাতীয় বীরকেশরী উগ্রসেন সশস্ত্রে আরোহণ করিলেন; এবং তিনশত যানে প্রত্যেকে দুই দুই জন ভট্টীসেনা সমরোপকরণ সমভিব্যাহারে উত্থিত হইল। পথিমধ্যে রাজমাতার নামে অর্থ বিতরণ হইতে লাগিল। মহাদোল সাংযাত্রিক যানসমূহ সহকারে ক্রমে ক্রমে সঙ্গনেয়ার নগরে উপনীত হইল। এদিকে জয়সিংহ প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে সঙ্গনেয়ার নগরে সমুপস্থিত হইয়া বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করণানন্তর কহিলেন—"ভাই! গৃহবিচ্ছেদে কোন প্রয়োজন নাই;—যদি অম্বররাজ্য তোমার নিতান্ত অভিলষণীয় হয়, এই দণ্ডেই গ্রহণ কর; আমি তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নাই—বস্‌বা প্রদেশই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।" বিজয় এই স্নেহবাক্যে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন "বস্‌বা লইয়াই আমি সন্তুষ্ট হইলাম।"

এমন সময়ে নাজির আসিয়া কহিলেন, "রাজমাতা আদেশ করিতেছেন, সদস্যবর্গ স্থানান্তরিত হইলে তিনি আসিয়া যুবরাজদ্বয়কে দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করেন, অথবা অন্তঃপুরে আপনারা উভয়ে গমন করিলে ভাল হয়।" এতদ্বাক্যে জয়সিংহ তদস্যবর্গের প্রতি কহিলেন, "আপনারা যেরূপ আদেশ করিবেন আমি সেইরূপ করিব।" তাঁহারা কহিলেন "ক্ষতি কি, আপনারা অন্তঃপুরে যাইয়া জননীর সহিত সাক্ষাৎ করুন।" এতদ্বাক্যে জয়সিংহ বিজয়ের হাত ধরিয়া অন্তঃপুর প্রবেশ করিলেন, এবং পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভৃত্যহস্তে অস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "এস্থলে অস্ত্রের

কোন প্রয়োজন নাই।" বিজয় এই কথা শুনিয়া নিজ কটিবন্ধ হইতে অস্ত্র খুলিয়া ভৃত্যের হস্তে দিলেন। উভয়েই নিরস্ত্রে পুরপ্রবেশ করিলেন। গৃহপ্রবেশমাত্র বিজয় উগ্রসেনের করকবলিত হইলেন। উগ্রসেন তৎক্ষণাৎ বিজয়ের হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া মহাদোলে আরোহণ করাইয়া জয়পুরে লইয়া গেল এবং তথাকার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিল। জয়সিংহ সভায় আগমন করিলে সদস্তবীরমণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয় সিংহ কোথায়?" জয়সিংহ তারস্বরে কহিলেন "হামারা পেটমে।" পুনরায় কহিলেন "আমরা উভয়েই বিষ্ণুসিংহের পুত্র—আমি জ্যেষ্ঠ; যদি আপনারা কনিষ্ঠ বিজয়কে রাজ্য দিতে নিতান্ত অভিলাষ করিয়া থাকেন, অগ্রে আমার প্রাণবধ করিয়া পরে তাহাকে সিংহাসন প্রদান করুন। আপনাদিগের জন্যই আমি এ বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; কারণ বিজয় রাজ্য পাইলে যবনদিগকে আনিয়া আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ করিত।" সদস্তবীরমণ্ডলী এই কথায় নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া নিরুপায় বোধে নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। উজীর কমরুদ্দীন বিজয়সিংহের সহিত ষট্ সহস্র অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে জয়সিংহ কহিলেন, "বিজয় আমার ভ্রাতা, তাহার অনুসন্ধানে তোমাদের প্রয়োজন কি? তোমরা নিঃশব্দে চলিয়া যাও, নতুবা অশ্বচ্যুত করিয়া তোমাদিগকে বিদায় করিয়া দিব।" তাহারাও নিরুপায় দেখিয়া পলায়ন করিল।

"একশও ন গুণ জয়সিংকা" নামে একখানি গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহাতে জয়সিংহের নবোত্তর শতগুণ বর্ণিত হইয়াছে। উপরি উক্ত ব্যাপারটি গুণাবলী মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু আমরা উহাকে সদ্‌গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। তথাপি একথা নিঃসংশয়ে কহিতে পারি যে, এই ছলনা-সাধনে জয়সিংহ সম্যক্ চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং এরূপ চাতুর্য্য অবলম্বন না করিলে কখনই তিনি রাজ্যরক্ষা করিতে পারিতেন না।

অম্বরেশ্বরগণ মানসম্ভ্রমে অগ্রগণ্য ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্য সমধিক বিস্তীর্ণ ছিল না। বিষ্ণুসিংহ অম্বর, দেওসা ও বস্‌বা এই প্রদেশত্রয়ের রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্র জয়সিংহ দেওতি প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক নিজরাজ্যে সংযোজিত করেন। দেওতি প্রদেশ অধিকারের অতি বিস্ময়জনক ব্যাপার পাঠকবর্গের গোচর করিবার জন্য নিম্নে বিবরণ করা গেল।

দেওতি সূর্য্যকুলতিলক রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের বংশীয়দিগের অধিকৃত ছিল। ঐ বংশের নাম ব্রগুজর বংশ। ব্রগুজরেরা সর্ব্বদা জাত্যভিমানে মত্ত থাকিতেন, সুতরাং কচ্‌বহ বংশের ন্যায় যবনরাজগণকে দুহিতাদান করিয়া ঐহিক বিভব পরিবর্দ্ধিত করিতে পারেন নাই। জয়সিংহের সমকালে ব্রগুজর বংশীয় ভূপতি নিজ রাজধানী রাজোর নগরে স্বীয় তরুণ বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাখিয়া দিল্লীশ্বরের পক্ষে অনুপসহরে সেনানায়ক পদে নিযুক্ত ছিলেন। একদা ঐ তরুণ যুবক মৃগয়াগমনোপলক্ষে ভ্রাতৃ-বধূর নিকট আহারের জন্য যার-পর

নাই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহাতে ঐ রাজমহিলা দেবরকে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমাকে যেরূপ ব্যগ্র দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় যেন তুমি জয়সিংহের বক্ষে অস্ত্র সঞ্চালন করিবে!" বীর্য্যবান্ যুবরাজের পক্ষে এই উপহাস অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইল। কারণ পূর্ব্বে জয়সিংহের আদি পুরুষ চোলরায় ব্রগুজর রাজার নিকট হইতে দেওসা প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঐ বংশকে দরিদ্র করিয়াছিলেন। ব্রগুজর যুবক ক্রোধে কহিলেন "জগদীশ্বর সাক্ষী, আমি তাহা না করিয়া তোমার হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিব না।" এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ দশজন অশ্বারোহী বীর-পুরুষ সমভিব্যাহারে অম্বরে উপনীত হইয়া জয়সিংহের প্রত্যাশায় নগর প্রাচীরের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দিন পক্ষ মাস গত হইতে লাগিল, তথাপি ব্রগুজরের মনস্কামনা সিদ্ধির কোন অবসর হইল না। অন্নাভাবে সহচরবর্গ পলায়ন করিল; দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবক নিজ অশ্ব ও খড়্গ বিক্রয় দ্বারা উদর পূরণ করিতে লাগিলেন, তথাপি জয়সিংহের সাক্ষাৎ পাইলেন না। শিরস্ত্রাণের অর্দ্ধভাগ বিক্রয় দ্বারা এক দিন চলিল। আর বিক্রয় করিবার কিছুই নাই, এখন প্রস্থান অথবা অনাহার অবলম্বন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। স্থির প্রতিজ্ঞ ব্রগুজর যুবক অনাহার অবলম্বন পূর্ব্বক চারি দিবস বল্লম হস্তে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, জয়সিংহ সুখাসনে আরোহণ পুরঃসর সেই পথে আগমন করিতেছেন। দৃষ্টিমাত্র তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যুবক বল্লম পরিত্যাগ করিলেন। অনাহারে যুবক নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন, তাঁহার বল্লম জয়সিংহকে বিদ্ধ করিতে পারিল না, সুখাসনের পার্শ্ব ভেদ করিয়া রহিল। রাজহন্তার বধের জন্য তৎক্ষণাৎ শত শত খড়্গ নিষ্কোষিত হইল, কিন্তু জয়সিংহ তাহা নিবারণ পূর্ব্বক ব্রগুজর যুবককে অম্বরে আনাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার নির্ভয়চিত্তে কহিলেন, "আমি ব্রগুজর বংশীয়, দেওতির অধীশ্বরের ভ্রাতা। ভ্রাতৃবধূর সহিত কথান্তর হওয়ায় তোমার উপর বল্লম চালনা করিয়াছি; এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই করিতে পার।" আরও তিনি নিজবৃত্তান্ত বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া কহিলেন, "যদি আমি চারি দিবস অনাহারে না থাকিতাম, তাহা হইলে আমার বল্লম কখনই স্বকার্য্যসাধনে নিষ্ফল হইত না।" জয়সিংহ যুবকের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রাজবস্ত্র ও অর্থ প্রদান করিলেন এবং পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সঙ্গে দিয়া রাজ্যের নগরে পাঠাইয়া দিলেন। গৃহে আসিয়া ব্রগুজর যুবক ভ্রাতৃবধূর নিকট সমুদায় বর্ণন করিলেন; রাজমহিলা শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে কহিলেন, "তুমি কালসর্পকে আঘাত করিয়া রাজ্যের নগরে জলাঞ্জলি দিয়াছ।" রাজরমণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি ধ্রুব নিশ্চয় করিলেন, জয়সিংহ ছিদ্র অনুসন্ধানে আছেন, এত দিন কোন অবসর প্রাপ্ত হন নাই, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অবসর জয়সিংহ অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেন। রাজপুরের স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণ অনু-

পসহরে রাজার * নিকট প্রেরিত হইল; দেওতি ও রাজোর দুর্গ জয়সিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর তৃতীয় দিবসে জয়সিংহ সদস্যবর্গসমীপে দেওতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার প্রস্তাব করিলেন। চমুপ্রদেশের অধ্যক্ষ মোহনসিংহ নিবারণ করিয়া কহিলেন "মহারাজ এমন কর্ম্ম করিবেন না; দেওতির অধীশ্বর এখন সম্রাটের প্রিয়পাত্র, বিশেষতঃ এখন তিনি আবার দিল্লীশ্বরের কার্য্যেই আছেন।" এই কথায় আর কোন অধ্যক্ষ যুদ্ধঘোষণার সম্মতি দান করিলেন না; জয়সিংহও কিছুদিন এ প্রস্তাবে নিরস্ত রহিলেন। একমাস পরে জয়সিংহ পুনর্ব্বার সভামধ্যে এই প্রস্তাব করিলেন; বনবীরপোতার অধ্যক্ষ ফতেসিংহ সম্মতি দান করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ব্রগুজরযুবক রাজধানী রাজোর নগর হইতে বহুদূরে গণগৌরীদেবীর পূজা করিতে গিয়াছিলেন, ইত্যবসরে অম্বরসৈন্যেরা দেওতি অধিকার করিল, যুবক প্রত্যাবৃত্ত হইবামাত্র বিপক্ষহস্তে পতিত হইয়া জীবনত্যাগ করিলেন। রাজোরের রাণী মোহনসিংহের ভগ্নী; তিনি অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন; রণজয়ী ফতেসিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভাই! আমার গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা কর!" কিন্তু যখন তাঁহার স্মরণ হইল যে, কেবল তাঁহারই বাক্যে এই ঘোরতর সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং তাঁহার ভাবিপুত্র পৈতৃকস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তখন তিনি নিজ জীবনে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক বক্ষে অস্ত্রাঘাত করতঃ প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। বিজয়ী সেনাবর্গ ব্রগুজরদিগের মস্তক আনিয়া জয়সিংহকে উপহার দিল। জয়সিংহ কহিলেন "যে উদ্ধত যুবক আমার প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার মস্তক আমার নিকট আনয়ন কর।" সেই মস্তক সভায় আনীত হইলে মোহনসিংহ নিজ কুটুম্বের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্রন্দন করিলেন, জয়সিংহ তাহাতে নিতান্ত কুপিত হইয়া কহিলেন,—"যখন আমার জীবন যথার্থ বরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তখনত একবিন্দুও অশ্রু বর্ষিত হয় নাই!" জয়সিংহ সে স্থানের অশ্রুবর্ষণ অপরাধ সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার চমুপ্রদেশ রাজ্যভুক্ত করিয়া তাঁহাকে চুণ্ডার রাজ্যহইতে একবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এইরূপে দেওতি দেশ জয়সিংহের করতলস্থ হইল।

রাজা জয়সিংহ অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি নানাবিধ বিষয় ব্যাপারে থাকিয়াও বিদ্যানুশীলনে অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন। বিদ্যোৎসাহিতা গুণে তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী নরপতি আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। জয়সিংহ নূতন নগর সংস্থাপিত করিয়া তাহার জয়পুর বা জয়নগর নাম রাখিলেন। জয়পুরের ন্যায় সুদৃশ্য মনোহর নগর ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে নির্ম্মিত। ইহার রাজবর্ত্মসকল পরস্পর সমকোণে বিভক্ত। দেখিলে বুঝিতে পারা

* অদ্যাপি অনুপসহরে ব্রগুজর বংশীয়েরা বাস করেন; ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সেই প্রদেশে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন; এখন তাহাই ভোগ করিতেছেন।

যায়, নগরনির্ম্মাতার শিল্পবিজ্ঞানে সাতিশয় নৈপুণ্য ছিল। শাস্ত্রে রাজধানী পত্তনের যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, এই নগরে তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। বিদ্যাধর নামক জনৈক বঙ্গদেশীয় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এ নগর সংস্থাপন সম্বন্ধে জয়সিংহের সাতিশয় সহায়তা করেন। বিদ্যাধর রাজনীতি ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, এবং তত্তৎবিষয়ে তিনি জয়সিংহের সতত সাহায্য করিতেন। সুতরাং তিনি বিদ্যা বিষয়ে জয়সিংহের সুখ্যাতির অংশ পাইতে পারেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে রাজপুত নরপতিবর্গেরই সাতিশয় শ্রদ্ধা ছিল ; কিন্তু জয়সিংহ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার এতদূর খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, সম্রাট্ মহম্মদ সাহ মুসলমানপঞ্জিকা সংশোধনের ভার জয়সিংহের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনার জন্য তিনি দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, বারাণসী ও মথুরায় প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাদিগের মানমন্দির * নাম রাখিয়াছিলেন। নিজ আবিষ্কৃত জ্যোতিষি যন্ত্রসকল মানমন্দিরে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই যন্ত্রগুলির অধিকাংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহা দেখিলে বোধ হয়, তাদৃশ বৃহৎ ও যথাবিহিত শাস্ত্রসিদ্ধ জ্যোতিষিযন্ত্র আর কুত্রাপি প্রস্তুত হয় নাই। তিনি প্রথমে সামরখণ্ডের রাজসভাসদ্ জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক উলুগবেগের যন্ত্রের ন্যায় যন্ত্রসকল ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভিলাষ সুসিদ্ধ হইত না। ক্রমাগত সাতবৎসর গবেষণা করিয়া তিনি একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। উলুগবেগের যন্ত্রের দোষ দেখিয়া তিনি স্বয়ং সমুদায় যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই সময় তিনি পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজক পাদ্রী মানুয়েল সাহেবের মুখে শ্রবণ করিলেন যে, পর্ত্তুগাল দেশে তখন জ্যোতিষশাস্ত্রের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। জয়সিংহ এই সংবাদে পুলকিত হইয়া কতিপয় কৃতবিদ্য যুবককে পর্ত্তুগালদেশে প্রেরণ করিলেন। পর্ত্তুগালের রাজা জেবিয়ার ডি সিল্বা নামক একজন জ্যোতিষ্ক পণ্ডিতকে জয়সিংহের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ সাহেব রাজাকে ডি লা হায়ার প্রণীত বিখ্যাত জ্যোতিষতালিকা প্রদান করেন। জয়সিংহ বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন,

* মানমন্দির সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার ভ্রম আছে। সুরধুনী কাব্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন,"সেয়া জয়সিংহ রায় রেয়া অধিপতি" মানমন্দিরের সৃষ্টি করেন। উহা রেয়া অধিপতি না হইয়া জয়পুর বা অম্বর অধিপতি হওয়া উচিত ছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহের ২য় পর্ব্বের ১৫শ খণ্ডে কাশীবিষয়ক প্রস্তাবে লেখক লিখিয়াছেন, "আকবর সাহের রাজ্যকালে রাজা মানসিংহ স্বকীর্ত্তিকে চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে স্বনামে এক মন্দির প্রস্তুত করান। তাহাতে চন্দ্রসূর্য্যচ্ছায়ানুসারে সময় জ্ঞাপকাদি বহুবিধ প্রস্তরময় যন্ত্রসকল জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে নির্ম্মিত করাইয়া প্রাচীরে গ্রথিত করেন। তাহা অদ্যাপি মানমন্দির বলিয়া লোকবিখ্যাত আছে।" বোধ হয় মানসিংহের নামই এই ভ্রমের মূল হইবে।

পর্ত্তুগালের তালিকা অনুসারে গণনা করিলে ছয় মিনিট সময় অগ্রপশ্চাৎ হইয়া পড়ে। স্বকীয় যন্ত্রের দ্বারা গণনা করিয়া সে ভ্রম নিরাকৃত হইল। তুর্কী জ্যোতির্বেত্তারা যে পিত্তরনির্ম্মিত যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, তাহার যেমন ভ্রম দেখিতে পাইলেন, গবেষণা পরম্পরা দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, হিপারকস ও টলেমী সেইরূপ যন্ত্রেই গণনা করিতেন। সেইরূপ গণনার দ্বারাই ডি লা হায়ারের যন্ত্র ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহার জ্যোতিষি গণনায় এমন কি ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায় জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগকেও চমৎকৃত হইতে হইয়াছিল। ডাক্তার হণ্টার সাহেব জয়সিংহের গণনা দেখিয়া তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

জয়সিংহ বিবিধ গবেষণা দ্বারা একটি জ্যোতিষিতালিকা প্রস্তুত করেন, তাহার নাম "জিজ্ মহম্মদসাহী।" ঐ তালিকানুসারে অদ্যাপি তথাকার সমস্ত গণনা ও পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনি রেখাগণিত, ত্রিকোণমিতি এবং লগারিথেমের তালিকা সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কল্পদ্রুম নামে তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাতে তিনি নিজ দৈনিক বিবরণ সকল সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

বিদ্যা সম্বন্ধে জয়সিংহের যেরূপ অসাধারণ উৎসাহ দেখা যায়, সৎকীর্ত্তি সম্পাদন সম্বন্ধে তদপেক্ষা তাঁহার অল্প অনুরাগ ছিল না, ইহার বিবিধ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সংস্থাপিত সুদীর্ঘ জলাশয়, সুচারু পান্থনিবাস এবং সুপ্রশস্ত রাজপথ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বর্ত্তমান আছে।

জয়সিংহ অত্যন্ত সুরাপানাসক্ত ছিলেন; তদ্বিষয়ে অনেক রহস্যজনক বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। অহঙ্কার দোষও তাঁহার নিতান্ত অল্প ছিল না। মোগল সম্রাটদিগের অধীন হইয়াও তিনি এক রৌপ্যনির্ম্মিত প্রশস্ত যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। সমুদয় রাজগণের উপর একাধিপত্য না থাকিলে এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। যজ্ঞীয় অশ্ব যতদূর নির্ব্বিরোধে ভ্রমণ করিয়া আসিবে, ততদূর পর্য্যন্ত যজ্ঞকর্ত্তার অধিকারস্থ হইবে। বোধ হয় জয়সিংহের যজ্ঞীয় অশ্ব তাঁহার সেই ক্ষুদ্র যজ্ঞশালার চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়াছিল, কারণ তৎকালে দূরে ভ্রমণ করিলে তাহার কোন মতে নিষ্কৃতি হইত না।

জয়সিংহ ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ রাজ্য করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তিন মহিষী ও কয়েক উপপত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন। বোধ হয় ভারতবর্ষের বিজ্ঞানশাস্ত্রও সেই চিতায় আরোহণ করিয়াছে।

ক্রমশঃ—

মানিনী ও অভিমানিনী

" প্রভাত-বাতাহতি-কম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণু-পিশঙ্গ-বিগ্রহম্ ।
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীশং সহতেন্যসঙ্গমম্" ॥

মানিনী ও অভিমানিনী এই দুইয়ে অনেক প্রভেদ আছে। মানিনী কবিকল্পনার পদ্মিনী;—শরীর প্রভাত-বাতে থর থর কাঁপিতেছে, ক্রোধের কমনীয় রক্তিমা সমস্ত কলেবরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, প্রভাতের শিশির-বিন্দু বাষ্প-বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে; আজি কুমুদ-রেণু-রঞ্জিত কৃপাভাজন ভ্রমরের আর কল্যাণ নাই। মানিনী অযোধ্যার কৈকেয়ী,—অবদ্ধকুন্তলা, অঙ্গরাগপরিহীণা, ত্যক্তাভরণা, ধূলিলুণ্ঠিতা। আজি লোকাভিরাম রামচন্দ্রকে সন্ন্যাসীর বেশে বনবাসে প্রেরণ কর, লোকললাম-ভূতা জনকদুহিতাকে সন্ন্যাসিনী করিয়া বাহির করিয়া দেও, এবং মানিনীর ক্রোড়ের ধন ভরতকে সহস্র যোজনের ব্যবধান হইতে এখনই আনিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাও; নহিলে, হে জরদগব দশরথ! তোমারও নিস্তার নাই, তোমার সোণার অযোধ্যারও ভরসা নাই। আর মানিনীর উপর মানিনী, ব্রজবিলাসিনী বৃকভানুনন্দিনী,—

" মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ "।

কাব্যে এমন মানিনী আর নাই। আকাশের মেঘ মুছিয়া ফেল, উহাতে কালো রূপের আভা আছে; যমুনার জল শুষিয়া ফেল, উহাতে কালো রূপের ছায়া আছে; এবং কালো অলি, কালো পিক, কালীয় তমাল বন, ময়ূরের কালো পুচ্ছ, মস্তকের কালো কেশ ও নয়নের কালো তারা, বিধাতার সৃষ্টি হইতে বিলুপ্ত করিয়া ফেল। নহিলে মানিনীর মৃদুমান, মধ্যমান অথবা গুরুমানের গৌরব থাকে না, এবং মানমুগ্ধ জয়দেবের 'গলিত-কুসুম-দর-বিলুলিত-কেশা' অর্দ্ধবিবশা কবিতাও আর, 'রুণু রুণু নাদে, বিরহ-বিষাদে' তালে তালে নাচিতে পারে না।

অভিমানিনী আর এক জাতীয় কামিনী;—প্রেমিকা, অথচ প্রেমের বিকারশূন্যা, প্রফুল্লচিত্তা, অথচ প্রগল্‌ভচাপল্যবর্জ্জিতা, স্রোতস্বিনীর ন্যায় তরঙ্গময়ী, অথচ গভীর-সলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় স্থির-গম্ভীরহৃদয়া।

অভিমানিনী শেক্ষপীরের পোর্শিয়া,—কেটোর যোগ্য কন্যা, বুটসের যোগ্য ভার্য্যা

এবং কল্পনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রতুলিকার যোগ্য নায়িকা। যেমনই হৃদয়, তেমনই বুদ্ধি, যেমনই স্নেহের সানন্দ অধীনতা, তেমনই অভিমানের গগণস্পর্শিনী উচ্চতা। যখন ব্রুটস্, সিজরের শক্তিরোধ অথবা সর্ব্বনাশ এবং রোমের স্বাধীনতা সংসাধনের জন্য শোণিত-তৃষাতুরা, সঙ্কট-চরা রাজনীতির শরণ লইয়া পোর্শিয়ার নিকটও মনের কথা গোপন করিতে লাগিলেন, তখন অভিমানিনীর আর তাহা সহিল না। তিনি যাঁহাকে প্রাণাধিক বলিয়া জানিতেন, তাঁহার গর্ব্বিত প্রাণ তাদৃশ জনের এই পর-পর-ভাব, এই অবলা বলিয়া ঘৃণা ও অদীক্ষিত বলিয়া অবিশ্বাস সহিয়া লইতে সম্মত হইল না। তখন তিনি দাম্পত্য প্রণয়ের উচ্চাভিমানে আরূঢ় হইয়া, ব্রুটসকে বিনয়ের ভঙ্গিতেই কিরূপ ভয়ানক শাসন করিয়াছিলেন,—প্রীতিকে রাজনীতির সম্মুখীন করাইয়া, উহার নৈশ-মন্ত্রণা, অলক্ষিত গতি ও অন্ধকার-প্রিয়তাকে কিরূপ মধুর বাক্যে ধিক্কার দিয়াছিলেন, এবং পুরুষের কঠোর-চিত্তে আঘাত না করিয়াও কিরূপে আধিপত্য বিস্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিতে চিত্ত পুলকিত হয়। তাঁহার স্নেহোদ্ধত আনুগত্য ব্রুটসের আত্মায় গিয়া স্পৃষ্ট হইল, তাঁহার প্রণয়-নম্র অভিমান ব্রুটসকে মোহিত করিয়া ফেলিল। ব্রুটস প্রীতি, লজ্জা ও অভিমানের অঙ্কুশ-তাড়নে আপনা হইতে প্রণত হইলেন। তিনি তখন বুঝিলেন যে, অভিমানিনীর সাহচর্য্য স্বর্গসুখ, এবং তিনি তখন স্বর্গাভিমুখে নেত্রপাত করিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার হৃদয় যেন ঈদৃশী উন্নতমনঃশালিনী মহীয়সী অবলার প্রণয়ের যোগ্য হইয়া কৃতার্থ হয়। বস্তুতঃ, এইরূপ অভিমানিনীর আলেখ্য দর্শনেও পুণ্য আছে।

অভিমানিনী কালিদাসের শকুন্তলা। যখন প্রেমাস্পদ দুষ্মন্ত শাপবশে কিংবা স্মৃতিভ্রংশে, অথবা অন্তঃপুরের অত্যাচার ভয়ে, সভাস্থলে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন,—তপোবনের সেই পবিত্র প্রণয়-বন্ধন, সেই মৃগশিশু লইয়া ক্রীড়াকৌতুক, পুষ্পস্তবক লইয়া প্রমোদ-বিলাস এবং সেই নবোদ্গত প্রীতির অনন্ত হর্ষ, অনন্ত বিষাদ সমস্তই একবারে বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার প্রতি অপরিচিতের মত ব্যবহার দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার সেই গভীর দুঃখ শফরীর ন্যায় নৃত্য করিল না। উহা গভীর অভিমানে পরিণতি পাইল, এবং তিনি দুঃখের সগর্ব্ব-পাদ-বিক্ষেপে দুষ্মন্তের সান্নিধ্য হইতে তিরোহিত হইলেন। আবার সেই দুষ্মন্ত যখন কশ্যপের পুণ্যাশ্রমে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন,—স্মৃতির পুনরুদ্রেকে শোকানলে দগ্ধ হইয়া, শকুন্তলার নিকট সলজ্জ ভয়ে ক্ষমা চাহিলেন, অভিমানিনী তখনও মানভঞ্জনের লীলা প্রদর্শন না করিয়া, তাঁহাকে প্রমুক্তচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার তদানীন্তন নির্ম্মলমূর্ত্তি, সেই পরিস্ফুট দয়া ও অপরিস্ফুট অভিমান, এবং অভিমান ও দয়ার সেই অপূর্ব্ব মিশ্রণ হৃদয়ে একবার যদি অঙ্কিত হয়, আর তাহা প্রক্ষালিত হইবে না।

অভিমানিনী ইতিহাসের ক্যাথেরিণ। যখন দয়ালেশ-শূন্য, জঘন্যমতি অষ্টম হেন্‌রী

আনাবোলিনের অভিনব-বিকশিত-মাধুরী-দর্শনে মোহিত হইয়া, ধর্ম্মপরিণীতা ক্যাথেরিণকে সর্ব্বতোভাবে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, এবং ক্যাথেরিণের সহিত বিবাহের বন্ধন উচ্ছিন্ন না হইলে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না বলিয়া তাঁহাকে বিচার-চ্ছলে ধর্ম্মাধিকরণে লইয়া আসিল, তখন ইংলণ্ডের সেই মর্ম্ম-নিহতা রাজ-বনিতা মানের মণ্ডুল-খেলা না খেলাইয়াও কিরূপে আত্মাভিমান রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অবলাজাতির চিরস্মরণীয়। ইংলণ্ডের অসংখ্য নেত্র তখন ক্ষোভে ও বিস্ময়ে স্তিমিত হইয়া তাঁহার প্রতি নিপতিত ছিল। কিন্তু সকলে কি দেখিয়াছিল? দেখিয়াছিল যে, তিনি রাজ-নামের কলঙ্ক, কুলাঙ্গার হেন্‌রীর নিকট জানুপাত করিয়া, প্রীতি, ধর্ম্মনীতি ও মমতার পবিত্র নামে কৃতাঞ্জলিপুটে অনুনয় করিলেন;—এবং আরও দেখিয়াছিল যে, যখন হেন্‌রীর পাষাণচিত্ত কিছুতেই দ্রব হইল না, তাহার সেই নরকতুল্য হৃদয়ে প্রীতির পবিত্র জ্যোতিঃ কিছুতেই প্রবেশ-পথ পাইল না, তখন তিনি অভিমানের সজীব-প্রতিকৃতির ন্যায় আত্মগৌরবে উচ্ছ্রিত হইয়া,—ইংলণ্ডের রাজা ও রাজসভাকে দেবতার দৃষ্টি-স্ফুরিত নীরব ভাষায় নিভর্ৎসন করিয়া, দেবতা যেমন পূতিগন্ধি কদর্য্যস্থান পরিত্যাগ করে, সেইরূপ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ক্যাথেরিণের সেই সময়ের সেই অভিমান-প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল-প্রতিবিম্ব ইতিহাস অদ্যাপি আদর-সহকারে বক্ষে ধারণ করিতেছে; এবং যদিও হেন্‌রী এবং হেন্‌রীর সমস্ত কীর্ত্তি (!) কাল-কুক্ষিতে নিহিত হইয়াছে, কিন্তু ক্যাথেরিণের সগর্ব্ব কাতরোক্তি মনুষ্যের স্মৃতিপটে জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মানব-সমাজ এ সকল কথা অতি শীঘ্র ভুলিয়া যায় না।

অভিমানিনী উপন্যাসের রেবেকা;—অক্ষয়জীবী ওয়াল্টরস্কটের কল্পলতা, রূপে জ্যোতির্ম্ময়ী, হৃদয়ের দেব-প্রভায় চিরপ্রভাময়ী। এমন কি আর আছে? যখন বাহু-বল-দৃপ্ত, দুর্ব্বৃত্ত বয়গিল্‌বার্ট, তাঁহার রূপের ছটায় ছন্নবুদ্ধি হইয়া, দস্যুর ন্যায় তাঁহার সম্মুখীন হইল, সেই নিরস্ত্র,নিরাশ্রয়া অবলা শুধু অভিমানের দুর্ব্বিষহ সুতীব্র দৃষ্টিতেই তখন তাহাকে দূরে অপসারণ করিলেন। যখন বয়গিল্‌বার্ট রূপের অধিক গুণে তাঁহার পদানত হইয়া,—তাঁহার অভিমানে আহত, তাঁহার অসামান্য মনস্বিতায় বিমোহিত এবং তাঁহার তেজঃপুঞ্জ-প্রকৃতির প্রভাব-দর্শনে একবারে তাঁহাতে বিক্রীত হইয়া, তাঁহার জন্য অতুল পদ-মর্য্যাদা, অতুল প্রভুত্ব এবং আপনার আশা, উন্নতি ও প্রাণ পর্য্যন্তও অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হইল, অভিমানিনী তখনও আত্মবিস্মৃত না হইয়া, তাহাকে ঘৃণায় অভিভূত রাখিলেন। আবার যে আইভানহোকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন,—হৃদয়ের নিভৃতনিবাসে মন্দির গড়িয়া, প্রীতির কমল-দলে আসন রচনা করিয়া, তিনি যে আইভানহোর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—ধ্যানব্রত-তাপসীর ন্যায় দিনে নিশীথে যাঁহাকে তিনি চিন্তা করিতেন, যখন তাঁহার সেই আইভানহো অন্যদীয় প্রেমে অনুরক্ত হইয়া অন্যের হইলেন,

অভিমানিনী পরীক্ষার সেই কঠোর সময়েও নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপ-শিখার ন্যায় আপনাতে আপনি অবিচলিত রহিলেন; এবং যে আভরণে আপনার বরাঙ্গ বিভূষিত দেখিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমের প্রাণ-বল্লভাকে সেই আভরণে স্বহস্তে অলঙ্কৃত করিয়া অবলার অভিমান কাহাকে বলে জগতে তাহার পরিচয় দিলেন। তখন মুহূর্ত্তের জন্য,—নয়ন-পল্লবের নিমেষ-পরিবর্ত্তনে যতটুকু সময় লাগে, তত টুকু সময়ের জন্য, তাঁহার নয়ন-প্রান্ত উদ্গত অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাদৃশ অশ্রুজলকে ভাগীরথীর গিরিনির্ঝর-নিঃসৃত নির্ম্মল জল অপেক্ষাও অধিকতর পবিত্র মনে করি। উহা পার্থিব বস্তু নহে। উহাতে পঙ্কলেশ নাই। উহা ভোগবাসনার স্পর্শশূন্য,—দ্রবীভূত প্রেম। উহার নাম,—প্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গ, অথবা পরার্থ সর্ব্বস্বত্যাগ।

হায়! এইরূপ প্রেমাভিমান পৃথিবীর সর্ব্বত্র কেন দেখিতে পাই না? যাঁহারা প্রেমিকা বলিয়া জগতে পূজিত হইতে চাহেন এবং প্রেমের অভিনয় শিখিবার জন্য, সর্ব্ববিধ শিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া, নাটক-নবন্যাসের নূতন তরঙ্গেই সর্ব্বদা ভাসমানা রহেন, তাঁহারা কেন গৌরবময়ী পোর্শিয়া, গৌরবিত প্রীতির পরিম্লানচ্ছায়ারূপিণী শকুন্তলা, পতিবিড়ম্বিতা ক্যাথেরিণ এবং রূপে অতুল, গুণে অতুল, চারিত্রসম্পদে কল্পনার অতুল-সৃষ্টি, ম্লান-মুখী রেবেকার চরণোপান্তে শিষ্যার ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া, প্রেম আর অভিমান কিরূপে স্বর্ণ ও সুগন্ধের মত মিশ্রিত হয়, কিরূপে আত্মার স্বাভাবিক উর্দ্ধগতি ও পরমুখ-প্রেক্ষিণী প্রীতির স্বাভাবিক নতি, একাধারে বিলসিত রহে, তাহা শিক্ষা করেন না?

পাঠক, তুমি কি অভিমানিনী কুলকামিনীকে অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন কর? যিনি নিগৃহীত হইয়াও পরনিগ্রহে কুণ্ঠিত রহেন, আপনি তুষানলে দগ্ধ হইলেও অন্যকে স্নেহের অমৃতদানে শীতল করেন; এবং পরকীয়চিত্তে আঘাত করা প্রাণান্তকর ক্লেশতুল্য জানিয়া, অভিমানের অনির্ব্বচনীয় উচ্চভাবে, দয়ার সেই এক অলৌকিক অভিমানে আপনাকে আপনি নিপীড়ন করেন, তুমি কি তাদৃশী অবলাকেও অশ্রদ্ধা করিতে সাহসী হও? তাহা হইলে বুঝিলাম, তোমার হৃদয় মহত্ত্ব কাহাকে বলে, তাহা জানে না, মহিমাময়ী অবলা অবনীর কিরূপ আভরণ তাহা বুঝিতে পায় না,—আর অবলার অভিমান বিনা সমাজ-নীতির পরিমার্জ্জন ও পরিশোধনেরও যে উপায় নাই, তোমার বুদ্ধি তাহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না।

কুল-ললনারা অদ্যাপি সংসারে হয় ক্রীড়ার সামগ্রী, না হয় সেবা কি ভোগের দাসী বলিয়াই ব্যবহৃত হইতেছেন। মনুষ্যের চক্ষু তাঁহাদিগের নিকট সসম্ভ্রম-বিনয়ে অবনত হয় না, মনুষ্যের ভাষাও প্রায়শঃ তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে চাহে না। যদি তাঁহাদিগের অভিমান থাকিত, তাঁহারা জ্ঞানে ও প্রেমে, গৌরবে ও গুণে পুরুষের প্রিয়-সঙ্গিনী হইয়া, সমাজে সমান আসন গ্রহণ করিতেন এবং উপদেষ্ট্রীর মত কঠোর

কথা না কহিয়াও সামাজিক আচার-শুদ্ধির অদ্বিতীয় সহায় হইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি রজত-কাঞ্চন কি মণিমুক্তাময় আভরণের জন্য উন্মাদিনী হইয়া, আভরণের বিনিময়ে আত্মার সকল সম্পদ বিলাইয়া দিতে সম্মত হন। যদি তাঁহাদিগের অভিমান থাকিত, তবে তাঁহারা পৃথিবীর পুঞ্জীকৃত রজত-কাঞ্চন ও মণিমুক্তার পর্ব্বত-স্তূপ হইতেও আপনাকে আপনারা উচ্চতর মূল্যের বস্তু বলিয়া সম্মান করিতে শিখিতেন। অনেকে যৌবনের পূর্ণবসন্ত সময়েও পরশ্রীকাতরতার বিষদংশনে জীর্ণকলেবরা বৃদ্ধার ন্যায় জরতী হইয়া পড়েন;—এবং যে কণ্ঠ প্রীতি ও দয়ার ন্যায় মধুবর্ষি হইবে বলিয়া আশা ছিল, সেই কণ্ঠকে কাক-কোলাহলের উপনাস্থল করিয়া তুলেন। যদি তাঁহাদিগের অভিমান থাকিত, তবে তাঁহারা হিংসা ও মৎসরতার পিঙ্গলবর্ণা পিশাচী না হইয়া, মূর্ত্তিমতী প্রীতি কি মূর্ত্তিমতী দয়ার ন্যায় পৃথিবীতে বিরাজ করিতেন। অনেকে প্রশংসার উন্মদ-মদিরায় বিভ্রান্ত হইয়া,—পর-মুখ-বিগলিত প্রশংসা-বাক্যকেই জীবনের সর্ব্বস্ব স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তৃণ যেমন বাতহিল্লোলে উৎক্ষিপ্ত কি নিক্ষিপ্ত হয়, প্রশংসার মৃদুহিল্লোলে সেইরূপ উৎক্ষিপ্ত কি নিক্ষিপ্ত হইতে রহেন। তাঁহাদিগেরও যদি অভিমান থাকিত, তবে তাঁহারা স্তুতির ছলনা ও বিনতির বঞ্চনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়া, এবং স্তুতি ও বিনতির ঊর্দ্ধে উঠিয়া, ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি পাইতে অধিকারিণী হইতেন।

পুরুষের আদর অবলার নিকট এবং অবলার আদর পুরুষের নিকট;—এবং প্রকৃতির এক অলক্ষিত শক্তিতে এই আদর-বিনিময়েই উভয়ের উন্নতি ও অবনতি। পুরুষ, সৃষ্টির প্রথমকাল হইতেই অবলার অনুরাগের ভিখারী, এবং অবলাও সৃষ্টির প্রথমকাল হইতেই পুরুষের অনুরাগের ভিখারিণী;—এবং প্রকৃতির অপরিব্যক্ত উপদেশে, এই অনুরাগ-বিনিময়েই উভয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা। এই জন্যই পুরুষের সমুচিত অভিমানে অবলার প্রকৃত মঙ্গল,—এবং এই জন্যই অবলার সুচারুবিকসিত সমুচিত অভিমান পুরুষের উন্নতির নিদান। পৃথিবীতে অদ্যাপি কাপুরুষের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে না কেন?—না, অবলার উপযুক্ত অভিমান নাই। যাহাদিগের বিদ্যা নাই, ব্রহ্মণ্য নাই, পুরুষোচিত মনস্বিতা নাই,—নয়নে বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি নাই, রসনায় বাণীর স্ফূর্ত্তি নাই,—যাহারা পুরুষের সমবেত-সভায় শৃগাল হইতেও ভয়াতুর, অথবা লজ্জাবতী লতার ন্যায় স্বদেহে সঙ্কুচিত, আর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেই ভীষণ পুরুষ-সিংহ,—অভিধানে যাহাদিগের নাম গেহেনর্দ্দী অথবা পিণ্ডীশূর, তাদৃশ হতমূর্খ অকর্ম্মণ্য জীবেরাও শুধু শরীরের শোভা, বেশ-ভূষার পারিপাট্য এবং কুঞ্চিত-কুন্তলের মোহন-কান্তি প্রদর্শন করিয়াই সমাজের বৈতরণীতে পার পাইয়া যাইতেছে কেন?—না অবলার অভিমান বিষ-দিগ্ধ শল্যের ন্যায় তাহাদিগের হৃদয়ে গিয়া বিদ্ধ হয় না।

তাই বলি, অভিমানিনীকে আদর কর মানিনীকে ভ্রমর, দশরথ আর ব্রজরঞ্জনের

বিড়ম্বিত অবতারদিগের সহিত মান-যুদ্ধের রঙ্গভূমিতে চলিয়া যাইতে উপদেশ দিয়া, যাঁহারা প্রেমাভিমানিনী অথবা অবলাজনোচিত মহত্বের নৈসর্গিক গরিমায় অভিমানিনী, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার আসন প্রদান কর। অবলা অভিমানের দিবাম্বরে পরিহিত হইয়া, দিব্যধাম-নিবাসিনী সুর-সীমন্তিনীর ন্যায় দণ্ডায়মান হইলে, সমাজ আর এক শোভা ধারণ করিবে,—ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও অন্তঃসারশূন্য অপাত্রতা লজ্জাভয়ে লুক্কায়িত রহিবে এবং পুরুষ পৌরুষগুণ উপার্জ্জন করিতে আপনা হইতে বাধ্য হইবে।

বিলাতের পত্র।

ল্যাম্বেথ,—লণ্ডন। ৭ই মে, ১৮৮০।

প্রিয়তম,

বহুদিনের পর, তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া, সুহৃৎসমাগমের নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিলাম। যদি দয়া করিয়া কখনও কখনও এইরূপ পত্র লিখ, তোমার নিকট কৃতজ্ঞতার দুশ্ছেদ্য অথচ সুকোমল শৃঙ্খলে চিরদিনের জন্য বদ্ধ রহিব। প্রিয়জনের হস্তাক্ষরও প্রীতিপ্রদ,—নীরব অথচ কত কথা কহে, নির্জ্জীব অথচ জীবনের প্রবাহকে কিরূপ বিলোড়ন করে। তোমার সহিত সাক্ষাৎ-সন্দর্শন হইলে আমি কিরূপ হর্ষোৎফুল্ল হইতাম, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। কিন্তু তোমার পত্রপাঠে, পত্রদর্শনে, আমি কিরূপ প্রমত্ত ও উৎফুল্ল হই, তাহা তুমি কিরূপে দেখিবে? আমার মনে লয় যেন একটি কপোত,তোমার পিঞ্জর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া,আমার পিঞ্জরে আসিয়া উড়িয়া পড়িয়াছে,—এবং তুমি কেমন আছ, কি করিতেছ, কি ভাবিতেছ, তাহা ভাবভঙ্গিতে আমাকে বুঝাইবার জন্য যত্ন পাইতেছে। ফলতঃ পত্রের মত প্রণয়দূত আর নাই। আমি প্রিয়জনের পত্রকে প্রণয়-কপোত বলিয়া সম্ভাষণ করি এবং স্বর্ণপিঞ্জর হইতেও অধিকতর আদরের পিঞ্জরে সযত্নে পুষিয়া রাখি।

মনে পড়ে কি?—রাজসাহীর পথে, সেই পদ্মার তটে,—পদ্মার তরঙ্গধৌত-সৈকতভূমিতে, প্রকৃতির অকৃত্রিম চন্দ্রাতপ-তলে, দূর্ব্বাদল-শীতল শ্যামল চত্বরে উপবিষ্ট হইয়া দুজনে কতই কি প্রলাপ বলিয়াছিলাম,—কথাপ্রসঙ্গে কবিতা ও দর্শনের কথা তুলিয়া এবং সেই কথায় নিজ নিজ হৃদয়ের মর্ম্ম কথা মিশাইয়া, দুজনে সুসম্বন্ধ ও অসম্বদ্ধ কতই কি কহিয়াছিলাম,তাহা তোমার মনে পড়ে কি? যদিও একযুগের অধিক কাল বহিয়া গিয়াছে, সে সকল পুরাতন কথা তথাপি আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। আমি ক্ষণকালের জন্যও উহা ভুলি নাই, বোধ হয়

কখনও ভুলিতে পারিব না। ভুলিব কেমনে? এ দেশে নদী আছে, পদ্মা নাই; নদীর লহরী আছে, পদ্মার তরঙ্গ নাই; এবং পদ্মার তরঙ্গ জ্যোৎস্নাতলে কিরূপ নৃত্য করে, তাহার উপমার স্থল নাই। তাই আজও সেই কমনীয় দৃশ্য অন্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, স্মৃতি আমার সকল আকাঙ্ক্ষা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে;—আমার সুখের স্মৃতি আছে, সুখের আশা নাই;—দেশে ফিরিয়া গিয়া, সেই সকল দৃশ্য পুনরায় দেখিবার জন্য আর আমার প্রবৃত্তি নাই।

তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য আমায় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছ। আমি তোমাকে তোমার এই অনুরাগের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দি। কিন্তু তোমার মত সুহৃদের কাছে অন্তঃকরণের কথা খুলিয়া বলিতে কি,—যদি আমার এখনকার মতিগতি এমনই থাকিয়া যায়,—যদি কোন রূপ অবস্থা-পরিবর্ত্তের প্রবল আঘাতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে বোধ হয় দেশে আর ফিরিব না।

দেশে যাইব কেন? আমার মত হত ভাগ্যের আবার দেশ বিদেশ কি? এইক্ষণ স্বদেশ আমার বিদেশ হইয়াছে এবং বিদেশই আমার পক্ষে স্বদেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জীবন্ত স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশের দগ্ধশ্মশান এবং শৃগাল ও গৃধিনীর বিসংবাদ-কোলাহলময় পিশাচ-নিবাসে ফিরিয়া গিয়া, মৃতদেহের গলিতমাংস ও অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি লইয়া কাহারও সহিত বিবাদ করিতে আর আমার বাসনা হয় না। দেশে যাইব কেন? যেখানে স্বদেশী বলিয়া স্বদেশীর প্রতি লোকের মমতা নাই, কুক্কুর-বৃত্তির পরপাদ-লেহনে লোকের ঘৃণা নাই,—যেখানে দশজনের মধ্যেও একতা নাই, জ্ঞানে অনুরাগ নাই, সদ্গুণে শ্রদ্ধা নাই, স্বর্ণাভরণশূন্য নিরাবরণ মহত্বে লোকের ভক্তি নাই, সেই আশাশূন্য মরুভূমিতে আর আমার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। দেশে যাইব কেন? যেখানে ধনী ও নির্দ্ধন সকলেই জীবন্মৃতের মত পড়িয়া রহিয়াছে,—এবং প্রকৃত দেশহিতৈষী মহানুভাব ব্যক্তিরা মদান্ধ মূর্খ ও চরণ-লেহী চাটুকারদিগের নিকট বিড়ম্বিত হইতেছে,—যেখানে মান ও যশ, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি রজতমূল্যে বিক্রীত হইতেছে এবং পদ-বৈভববর্জ্জিত কি রজত-বৈভব-বিহীন প্রকৃতমানী বাধ্য হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, সেই অন্ধকার-নিলয়ে আর আমার ফিরিয়া যাইতে চিত্তে লয় না। তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশের কীর্ত্তি-ঢক্কা নিনাদিত করিতে রহ; আমি এই বিদেশে—বৃটেনিয়ার এই পুণ্যভূমিতে আমার দেহপাত করিয়া, হাড় জুড়াইব ও কৃতার্থ হইব।

তোমার শ্রীক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র এবং আধুনিক বঙ্গের বিলাসক্ষেত্র কি? এই বৃটিশক্ষেত্রের এমনই মহিমা যে, ইহার পবিত্র মৃত্তিকায় পদ-ক্ষেপ মাত্র পরাধীন স্বাধীন হয়; দাসত্বের কণ্ঠরজ্জু মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় শিথিল ও শক্তিহীন হইয়া ভূতলে গড়াইয়া পড়ে, এবং ভয়াতুর মনুষ্যও অভয়পদ লাভ করিয়া, প্রকৃত মনুষ্যের মত স্বালম্বনে ও

স্বপদ নির্ভরে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা করে। ইংলণ্ড যোগী ঋষির তবোপন নহে; এখানে বদরিকাশ্রম, ভরদ্বাজাশ্রম এবং শৌনক,শাকটায়ন ও শাক্যসিংহের সিদ্ধাশ্রম না থাকিতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ড যে সর্ব্বাংশে সারস্বতাশ্রম, শক্তির আশ্রম, স্বাধীনতার আশ্রম এবং মনুষ্যোচিত সম্মানের আশ্রম, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই জন্যই সুখে থাকি আর দুঃখে থাকি, ইংলণ্ডে পড়িয়া থাকিব। শক্তি, স্বাধীনতা, সরস্বতীর সাধনা এবং সম্মানের নিকট কি সুখ দুঃখের গণনা হইতে পারে?

তুমি জান বে, আমি সুখ ও সম্মানের তুলনায় চিরদিনই সম্মানের গৌরব করিয়াছি। যদি পৃথিবীতে সম্মান লইয়া থাকিতে চাও, তাহা হইলে জননী ও জন্মভূমির মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সপরিবারে ইংলণ্ডে চলিয়া এসো। * এখানে ভদ্র লোক বলিয়াই মান্য,—সে ডিউক, আরল, মার্কুইস্ ব্যাওরণ প্রভৃতি আভিজাত এবং সেনানায়ক, সামুদ্রনায়ক ও প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি রাজপুরুষদিগের সহিতও সামাজিকতার সমান আসনে উপবেশন করিতে অধিকারী। সে গৃহে কি দিয়া খায়, কিরূপ খট্টায় শয়ন করে, কেহই তাহা জিজ্ঞাসা করিবে না। কারণ কে ভদ্রলোকের সহিত অভদ্রের মত ব্যবহার করিয়া সর্ব্বত্র নিগৃহীত হইতে ইচ্ছা করিবে? এখানে লাঙ্গুলিত হুজুরেরা চতুষ্পদ দার্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইলেই, আর এক মূর্ত্তিধারণ করিয়া মনুষ্যের উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন বুলিবর্ষণ এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে সাহসী হয় না। কারণ, কে তথাবিধ ইতরজনযোগ্য অশিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া সমাজে ঘৃণিত হইতে এবং পঞ্চের চিত্র তুলিকায় আপনাকে চিত্রিত দেখিতে সম্মত হইবে। এখানে রাজকীয় কর্ম্মচারীর নাম Public servant অর্থাৎ সাধারণের ভৃত্য; পদ-মর্য্যাদায় যিনি যত কেন বড় হউন না, এই নীতি তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে;—এখানে শিক্ষিত ও শক্তিমানই সমাজের পরিচালক ও অধিনায়ক; যাঁহারা সাধারণ মিষ্টর মাত্র, যদি তাঁহাদিগের শিক্ষা ও শক্তি থাকে,তাহা হইলে মুকুটিত ডিউক লর্ডেরাও তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ অধীন বলিয়া পরিচিত হইতে আনন্দ অনুভব করিবে। তোমাদিগের অন্ধ ফসেট, দীনের দীন, অন্নের ভিখারী, অবস্থার নিপীড়নে ক্লিষ্ট, এবং লেখনীমাত্রই তাঁহার উপজীব্য; কিন্তু ইংলণ্ডের স্বাধীন রাজ্যে শুধু শিক্ষা ও শক্তির প্রসাদে তিনি যে সম্মান উপার্জ্জন করিয়াছেন, রথচাইল্ডের ন্যায় ধনপতি কুবেরও তাহা আশা করিতে পারে না। যে মানবীয় উন্নতির এই সব অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে,সে কি আর ভারতীয় নিভু নিভু দীপশিখাসমূহের নিকট ভয়ের পতঙ্গবৎ আবার গিয়া নৃত্য করিতে পারে? ভয়ের রাজ্য জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছি। মনুষ্যের নিকট ইহজীবনে আর কখনও ভয়ে ভয়ে

* লেখকের এই উপদেশ স্বদেশবৎসল ব্যক্তিমাত্রেরই উপেক্ষণীয়। ভারতভূমিকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় আত্মার সজীব ভাবকে ভারতে আনয়ন করিতে পারিলেই প্রকৃত দেশহিতৈষিতা ও প্রকৃত পৌরুষ। .... (বান্ধব সম্পাদক)।

কথা কহিব না, ভয়ে ভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনুষ্যত্বের অসম্মান করিব না, এবং দুটি কথা বর্ণবদ্ধ করিতে হইলেই, ভয়ে ভয়ে পাঁচবার বিরত, পাঁচবার বিকম্পিত হইয়া ভাষার স্বাভাবিক গতি ও সত্যের সরলবর্ত্মে কাঁটা দিব না। তাদৃশ জীবনে এইক্ষণ ঘৃণা জন্মিয়াছে,এবং তোমরা উচ্চশ্রেণীর মানসিক শক্তি পাইয়াও কিরূপে জীবনের এই দুর্ব্বহ ভার অক্লিষ্টচিত্তে ও অম্লান-বদনে বহন করিতে পারিতেছ, ইহাতে বিস্ময়জ্ঞান হইতেছে।

ইদেলপুরের পূর্ব্বপ্রান্তবাহী মেঘনাদ নদ বর্ষাকালের পর্ব্বোচ্ছ্বাসে কিরূপ উথলিয়া উঠে,তাহা তুমি দেখিয়াছ; সমুদ্র আপনার আবেগে আপনি কিরূপ উথলে, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছ;—কিন্তু মানব-সমুদ্র শক্তির সঙ্ঘর্ষে কিরূপ উথলে, উথলিয়া কিরূপ ভয়াবহ শোভায় শোভিত হয়, এবং সহর্ষ গর্জ্জন ও সহর্ষ অট্টহাস্তে দিগন্ত কিরূপ নিনাদিত করিয়া তুলে, তাহা তুমি দেখ নাই। আমি এই বিচিত্র দৃশ্য এবার আমার এই দুর্ব্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছি। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ব্যতীত ইদানীং পৃথিবীর আর কোথাও এমন দৃশ্য মনুষ্যের নেত্রগোচর হয় না। ইহা আমার বর্ণন-শক্তির অতীত,—এবারকার সাধারণ–নির্ব্বাচন * সময়ে মানুষী শক্তির যেরূপ লীলা খেলা ও উচ্ছ্বলিত আবর্ত্ত দেখিয়াছি, তাহা ভাষায় পরিস্ফুট করা আমার সাধ্য নহে।

কে বলে যে, ইংলণ্ড আজও প্রভুতন্ত্র রহিয়াছে? ইংলণ্ড যদি প্রভুতন্ত্র, তবে সাধারণতন্ত্র কোন্ দেশ? ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী সর্ব্বাংশে সাধারণতন্ত্রা, এবং সেই সাধারণতন্ত্রতা ফরাসিতন্ত্রের ন্যায় ফেণায়মানা এবং আমেরিক-তন্ত্রের ন্যায় কলকলায়মানা না হইলেও,উহার গাঢ়তা ও গভীরতা, উহার প্রবাহগত বেগবত্তা প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়কে উন্মাদিত অথচ চিন্তার ভারে স্তম্ভিত করে। ইংলণ্ডের প্রকাশ্য রাজা সমাজের মুকুট-মণি,শোভার আভরণ, সম্মানার্হ শিরোভূষণ। সকলেরই তাঁহাতে ভক্তি আছে এবং এই ভক্তি সমাজ-ভিত্তির দৃঢ় বল। ইংরেজেরা রাজ-নামের প্রতিকূলে ফরাসিদিগের মত বৃথা চীৎকার ও বৃথা আস্ফালন করিয়া শেষে যার তার চরণ-তলে লুটাইয়া পড়ে না। তাহারা স্থির, গম্ভীর ও ধীর-প্রকৃতি; অপরিহার্য্য প্রয়োজন বিনা তাহারা পরিবর্ত্তনের অনুমোদন করে না, এবং পরিবর্ত্তনের জন্য অকারণ কখনও লালায়িত হয় না। ইংলণ্ডের অপ্রকাশ্য রাজা বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট এবং সেই পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচন লইয়াই এবারকার এই আরাব-ময় আন্দোলন। এই আন্দোলনের উচ্ছ্বাস-সময়ে অনুভব হইত যে, মনুষ্যের উৎসাহ তাড়িত-স্রোত অপেক্ষাও অধিকতর তেজঃসম্পন্ন অদ্ভুত পদার্থ। উহা যখন তর তর বেগে বহিতে আরম্ভ করে, তখন পর্ব্বতও উহার প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। কূটবুদ্ধি বিকন্সফিল্ড ইংলণ্ডীয় রাজতরীর কর্ণধারের আসনে পর্ব্বতের মতন আসীন ছিলেন। সম্রাজ্ঞী, যুবরাজ, ও সমস্ত রাজপরিবার তাঁহাকে অভিভাবকের মত সম্মান করিতেন; রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের * নেতৃবর্গ করধৃত পুত্তলের

* General Election.

* The Conservative Party.

ন্যায় তাঁহার ক্রীড়াসামগ্রী ছিলেন,—পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য তাঁহার দৃষ্টিপাত-ভূমিতে ভক্তের মত বদ্ধাঞ্জলি থাকিতেন; বিস্‌মার্ক প্রভৃতি ধুরন্ধর ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতি সৌহার্দ্দ দেখাইতেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণী শক্তি এমনই অপ্রমেয় ও অপ্রতিহত যে, বিকন্সফিল্‌ডের ন্যায় পর্ব্বত-পুরুষও উহার তটাভিঘাতি-তরঙ্গপ্রহারে টলিয়া পড়িয়াছেন,এবং যাঁহারা তাঁহার সহায় ও সহচর ছিলেন, তাঁহারা উহার প্রমত্ত স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছেন।

তোমরা মনে করিয়াছ যে, রক্ষণশীল ও উদার-নৈতিকদিগের * মধ্যে প্রতি পাঁচ সাত বৎসরে চিরপ্রচলিত-প্রথানুসারে যেরূপ একটা মল্লযুদ্ধ বাইয়া থাকে, এবারকার এই বিপ্লবনও সেইরূপ এক মল্লযুদ্ধ। যদি এইরূপ তোমাদিগের ধারণা থাকে, তবে তোমরা ইংলণ্ডীয় রাজনীতির গূঢ়ার্থ পাঠ করিতে পার নাই। এবারকার এই আন্দোলনের একদিকে জন-সাধারণী শক্তি, আর এক দিকে প্রভুত্বের অন্ধভক্তি। লর্ড বিকন্সফিল্‌ড ইয়ুরোপের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ক্রীড়াজীব,—নটনৈপুণ্যে ইদানীং অদ্বিতীয়। ক্রীড়াজীব যেমন বিবিধ ক্রীড়নক দেখাইয়া শিশুচিত্ত মোহন করে, তিনিও সেইরূপ ভূমধ্যসাগরে ভারতীয় সেনা, পিঞ্জর-রুদ্ধ সিটাওয়ায়ো, এবং সাইপ্রসের সনন্দপত্র প্রভৃতি খেলার সামগ্রী দেখাইয়া সরলমতি বৃটনদিগকে মোহিত রাখিয়াছিলেন;—এবং নট-নিপুণ চতুর লোকেরা যেমন কোন না কোন একটা ধ্বনি তুলিয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে, তিনিও সেইরূপ 'তেজস্বিনী সামন্তনীতি,'* 'সসম্মান সন্ধিবন্ধন'† ও 'বৈজ্ঞানিক সীমারেখা'‡ এই প্রকার কতকগুলি ধ্বনি তুলিয়া ও শব্দ সৃষ্টি করিয়া সমস্ত ইংলণ্ডকে প্রমাদিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অতি গূঢ় ছিল। তাঁহার আশা ছিল যে, বৃটিশরাজ্য তাঁহার ক্রীড়া-নৈপুণ্য ও নট-নৈপুণ্যে ঐরূপ প্রমাদিত থাকিবে,এবং তিনি সেই অবসরে ধীরে ধীরে পার্লিয়ামেণ্টের শক্তিসঙ্কোচন এবং প্রভুত্বের শক্তি সম্প্রসারণ করিয়া জর্ম্মণীর বিস্‌মার্কের মত বৃটিশ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন। তবে কথা এই, ইংলণ্ডে তাহা হইবে কেন? যে দেশে অদ্যাপি গ্লাড্‌ষ্টোন্, হার্টিংটন্ এবং ব্রাইট্ ও হার্কোর্টের মত স্বজাতির কল্যাণ-প্রার্থী,কর্ম্মঠ পুরুষেরা জীবিত রহিয়াছেন,—এবং যে দেশের সাধারণী শক্তি, বায়রণের কীর্ত্তির মত এক রাত্রিতে প্রস্ফুটিত না হইয়া, প্রাচীন বটবৃক্ষের ন্যায় প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে, সে দেশে এ খেলা খাটিবে কেন? গ্লাড্‌ষ্টোনের এবার এই গৌরব,—এবং ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহা চিরদিনের তরে লিখিত থাকিবে যে,—যদিও তাঁহার সম্প্রদায়স্থ সকল ব্যক্তিই নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যদিও টাইমস্ ও পেল্‌মেল প্রভৃতি ইংলণ্ডের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ পত্রিকা প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রমোহে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অহোরাত্র নির্ভর্ৎসন ও নির্য্যা-

* The Liberals.

* 'Spirited Foreign Policy.'

† 'Peace with honor.'

‡ 'Sceintific Frontier.'

ভন করিয়াছিল, এবং যদিও কুকথা ও কুযশ রটনার কুৎসিত শাসনে ইংলণ্ডের রাজপথে বিচরণও এক সময়ে তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, এই সপ্ততিপর বৃদ্ধ, তথাপি ভীত, কুণ্ঠিত, অবসন্ন কি অণুমাত্র টলিত না হইয়া, এবারকার এই জাতীয় সংগ্রামের সম্মুখ-ভূমিতে, স্বাধীনতার স্বর্গীয় নামে, দৃক্‌পাতশূন্য বীরের ন্যায় একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন;—এবং সত্য যদি সহায় থাকে, তবে একজনেই যে এক কোটির শক্তিসঞ্চালনে সমর্থ, যেন এই নীতিসূত্রের প্রত্যক্ষফল প্রদর্শনের জন্যই এই ধন্য পুরুষ একাকী বৃটেনিয়ার মানব-সমুদ্রবিলোড়ন ও বিকন্সফিল্‌ডের কূটনীতির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ এবার যাহা হইয়াছে তাহার আদি বীজ গ্লাড্‌ষ্টোনী বক্তৃতার অলৌকিক উদ্দীপনা। গ্লাড্‌ষ্টোন চক্ষু উন্মীলন করিয়া না দিলে লোকে এত শীঘ্র দেখিত কি না, গ্লাড্‌ষ্টোন মুখ ফুটাইয়া না দিলে এত শীঘ্র লোকের মুখ ফুটিত কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। আমি এই শ্বেত-কেশ-মণ্ডিত, জীর্ণ-কলেবর, সপ্ততিপর বৃদ্ধকে বাহু তুলিয়া নমস্কার করি। রাজানুগ্রহে বঞ্চিত, প্রজাদ্বারা নিগৃহীত, সংবাদপত্রে নিন্দিত, রুশভিন্ন ইয়ুরোপের সমস্ত রাজপ্রাসাদে বিড়ম্বিত;—তথাপি বৃদ্ধের কি উৎসাহ, কি অধ্যবসায়, কি অক্লান্তশ্রমশীলতা, কি অজেয় দেশানুরাগ! দিবসের মধ্যে পাঁচ বার বক্তৃতা করিতে হইয়াছে, পাঁচবারই বৃদ্ধ দণ্ডায়মান। ইংলণ্ডের এক প্রান্ত হইতে স্কট্‌লণ্ডের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে হইবে, বৃদ্ধ তাহাতেও প্রস্তুত। এমন অপূর্ব্ব বার্দ্ধক্যের কাছে বিলাস-লসিত পুষ্পিত যৌবন দিয়া কি করে? যে যৌবন কার্য্যে নিত্য নূতন স্ফূর্ত্তি দেয় না, পরিশ্রমে উন্মদ উৎসাহ দেয় না, শক্তির আরাধনায় উত্তেজনা দেয় না, মানব-জাতির মঙ্গলসাধন ও সেবারূপ মহাব্রতে মতি দেয় না,—দেয় কেবল আলস্য ও অকর্ম্মণ্য ভোগসুখে অনুরাগ, তাদৃশ ধিক্‌কৃত ও ঘৃণিত যৌবন থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি? বিধাতা গ্লাড্‌ষ্টোনের মত বৃদ্ধদিগকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন। যদি পৃথিবীর কোন উপকার হয়, ইহাঁদিগের দ্বারা হইবে;—যদি মানব সমাজ শক্তি ও উন্নতির এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উন্নীত হয়, তাহাও ইহাঁদিগের যত্নে হইবে। আমাদিগের জীবনও যৌবন জলে জল-বুদ্বুদবৎ। আমরা যদি জগতের অপকার ও মনুষ্যত্বের অবমাননা না করি, তাহা হইলেই আমরা স্বার্থকজন্মা!!

তুমি সর্ রিচার্ড টেম্পলের গুণপণা স্বচক্ষেই অনেক দেখিয়াছ, এবং তাঁহাকে অবশ্যই বিলক্ষণরূপ জান। তাঁহার সম্পর্কেও তোমায় দুটি পংক্তি লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। গ্লাড্‌ষ্টোনের পর টেম্পলের কথা, সম্বৃত পলান্নের পর অম্লরসের মত। কিন্তু বোধহয় এই স্বাদ-পরিবর্ত্তে তোমার অতৃপ্তি জন্মিবে না। রিচার্ড টেম্পল রাজনীতি-বিষয়ে অন্ধ। তিনি ভারতের রাজনীতি,—বিশেষতঃ কাবুল, কান্দাহার, দুই বারের দুর্ভিক্ষ এবং রাজস্ব-বিষয়ক পরিবর্ত্তশীল নীতি, রথ-পতাকার ন্যায় প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকিলেও ইংলণ্ডের রাজনীতি বিষয়ে একবারে মূঢ়! তাঁহার এই আশা ছিল যে, এবার

কার বিপ্লবে বিকন্‌সফিল্‌ডের প্রতাপ ও প্রভুত্ব পূর্ব্ববৎ অব্যাহত থাকিবে ; এবং তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া বিকন্‌সফিল্‌ডের চিত্তরঞ্জনে কোন না কোন রূপে সমর্থ হইলেই, ভারত-সাম্রাজ্যের রাজটীকা তাঁহার ললাটপট্টে শোভা পাইবে। তিনি বেল্‌ভিডিয়ারে বক্তৃতা করিতেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা করিতেন, এবং বম্বের পারসীক সভায় পারসীকদিগের গুণানুবাদ করিয়া ও ভলণ্টিয়র সভায় ভলণ্টিয়রদিগের স্তুতিগীত গাইয়া সর্ব্বদা যশস্বী হইতেন। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা করা এবং বক্তৃতা দ্বারা মনুষ্যের মতের স্রোতে প্রতিকূল লহরী তোলাও ঐরূপ বিনোদ-লীলা। তিনি আশার এই মধুর আশ্বাস এবং বিশ্বাসের এই অন্ধ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, বম্বের রাজপদ ছাড়িয়া, এখানে আসিয়া বিকন্‌সফিল্‌ডের পরিপোষকতায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু হায়! বক্তৃতায় যাহা ঘটিয়াছিল, সে দুঃখের কথা আর বলিব কি? শ্রোতৃবর্গ প্রথমতঃ তাঁহাকে অবজ্ঞার করতালিসহকারে অভিনন্দন করিল, তাহার পর হিহিঃশব্দে হুকুকার দিল, এবং যখন দেখিল যে, বম্বের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজ-প্রতিনিধি তাহাতেও নীরব ও নিবৃত্ত হন না, তখন তাঁহাকে সদলবলে, সবন্ধুবান্ধবে বক্তৃতার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। আশার এইরূপ ছলনায় ছলিত হইলে, মনুষ্যের হৃদয় কি এক বিচিত্র ভাবে আলোড়িত হয়, তাহা বলিতে পার কি ? তথাপি রিচার্ড টেম্প্‌লকে ধন্যবাদ দি। তিনি জাতিতে বৃটন। ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালি এইরূপ বিড়ম্বনায় আত্মহত্যা করিত। তিনি ইহার পরও পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের জন্য অভিনব উপায় দেখিতেছেন, শরীরের ধূলিকর্দ্দম প্রক্ষালন করিয়া সস্মিত-মুখে সভায় যাইতেছেন, এবং সংবাদপত্রে পত্র প্রকটন করিয়া আপনার নাম ধ্বনিত রাখিতেছেন। তোমার বাঙ্গালি কি ভারতবাসী কি এত লাঞ্ছনার পরেও স্বকীয় অভীষ্ট কার্য্যে এইরূপ স্থির ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিতে পারে? তাহারা পারে,—অন্তঃপুরে গিয়া রোদন করিতে, অথবা বধূর অঞ্চল দিয়া অশ্রুজল মুছিতে।

আর না, যথেষ্ট হইয়াছে, আজ তবে এখানেই বিদায় লই ;—লিখিতে লিখিতে অনেক কথা লিখিয়া ফেলিয়াছি, আজ সেই জন্য মনের আর আর কথা মনে রাখিয়া এইস্থানেই বিরত হই। হৃদয়ের হর্ষ দুঃখ, আমোদ প্রমোদ, সমস্তই সুহৃজ্জনের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা করে। তাই উদ্বেলচিত্তে ও চিত্তের অজ্ঞাতসারে এত লিখিয়াছি। ইহাতে বিরক্ত হইও না। তুমি স্বদেশে, আমি বিদেশে;—মধ্যে নদ, নদী ও পর্ব্বত সমুদ্রের ব্যবধান। কিন্তু প্রীতির অমৃতময়ী ছলনায় এইরূপ প্রতীতি হইতেছে যে, আমি যেন তোমায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বচক্ষে দেখিতেছি, এবং আমার হৃদয় যেন তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া শীতল হইতেছে। মনে রে'খো, মনে থে'কো, প্রণয়ীর এই বই আর প্রার্থনা কি?

প্রতাপসিংহ

প্রথমখণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শত্রু না মিত্র।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরকালে মিবারের অন্তর্গত উদয়পুর নগর সন্নিহিত শৈল-শিরে একজন অশ্বারোহী যুবক ভ্রমণ করিতেছেন দেখা গেল। সেস্থান তৎকালে নিতান্ত ভয়ানক হইলেও নিতান্ত অপ্রীতিকর নহে। চতুর্দ্দিকে অর্ব্বলীশৈল-মালা, মেঘের পর মেঘ—তৎপরে আবার মেঘ—এবংবিধ পরম্পরাগত মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী শৈলাঙ্গ বিধৌত করিয়া কুলু কুলু শব্দে প্রধাবিত হইতেছে। কোথায় বা একটি প্রকাণ্ড তিন্তিড়ীবৃক্ষ সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখা সহ দণ্ডায়মান আছে; দূর হইতে তাহাও যেন পর্ব্বত-চূড়া বলিয়া বোধ হইতেছে। স্থানে স্থানে দুর্ভেদ্য অরণ্য। বৃক্ষ-পত্রের শাঁ শাঁ শব্দ, নির্ঝরিণীর কুলু কুলু ধ্বনি, ঝিল্লীর চীৎকার, অশ্বপদাঘাত-জনিত অত্যুচ্চ শব্দ, দলিত শুষ্কপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি ইত্যাদি সমবেত হইয়া তথায় মনোহর ঐকতান সমুৎপাদন করিতেছে।

অন্ধকারে সমস্ত সমাচ্ছন্ন। কৃষ্ণপ্রস্তরময় পর্ব্বত, ঘনারণ্য ও রজনীর অন্ধকার-এই তিন একত্রিত হওয়ায় সেস্থান এতাদৃশ তমসাচ্ছন্ন হইল যে, সম্মুখাগত পদার্থও লক্ষ্য হওয়া অসম্ভব।

অশ্বারোহীর বেশ রাজপুত যোদ্ধার ন্যায়। তাঁহার মূর্ত্তি বীরজনোচিত। দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুর্গম গিরি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নির্ঝরিণী পদে পদে অশ্বারোহীর গতি রোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মিবারের প্রত্যেক স্থানই যেন অশ্বারোহী ও তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্বের সুপরিচিত। তিনি সেই সমস্ত ভয়াবহ স্থান নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সহসা একটি তীর শন্ শন্ শব্দে তাঁহার কর্ণের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। তিনি অশ্ববল্গা সংযত করিলেন; অশ্ব কর্ণ উচ্চ করিল। তৎক্ষণাৎ আর একটি তীর তাঁহার কবচে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। অশ্বারোহী বুঝিলেন শত্রু অতি নিকটে। অচিরে অদূরে অশ্ব-পদ-ধ্বনি কর্ণগোচর হইল—অনতিবিলম্বে অপর এক অশ্বারোহী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে প্রচণ্ড বর্শাঘাতে রাজপুত যোদ্ধার বাম হস্ত বিদ্ধ করিল। তখন রাজপুত বীর কহিলেন,—“যদি তুমি মিবারের মিত্র হও, তবে আমার, বধচেষ্টা ত্যাগ কর,—আমার সহিত তোমার শত্রুতা হইতে পারে না।

আর যদি তুমি মিবারের শত্রু হও তবে আইস,—অমরসিংহের হস্ত হইতে তোমার কদাচ নিস্তার নাই।"

আক্রমণকারী উত্তর না দিয়া অসির দ্বারা রাজপুতকে আঘাত করিল। অমরসিংহ বিদ্যুদ্বেগে কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া বিপক্ষকে সজোরে আঘাত করিলেন; অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির হইল না, উভয়েরই আক্রমণ ব্যর্থ হইতে লাগিল। অবশেষে অমরসিংহের জয় হইল; তিনি স্বীয় বর্শা বিপক্ষের বক্ষোমধ্যে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। সে চীৎকারসহ অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

অমরসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হস্তদ্বারা মৃতের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি যবন। কহিলেন,—"দুরাত্মন্! যত দিন যাবতীয় যবন তোমার দশা না পাইতেছে, ততদিন ভারতের উন্নতির আশা নাই।"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহ এতক্ষণ নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন, সুতরাং বাম হস্তে যে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে আঘাত জনিত যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল; এবং বুঝিতে পারিলেন যে, ক্ষতমুখ হইতে দরদরিত ধারায় রুধির প্রবাহিত হইতেছে। অশ্বে কষাঘাত করিলেন,—বেগগামী অশ্ব দ্রুতগতি চলিতে চলিতে একটি নদীতীরে উপস্থিত হইল। অমরসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং নদীজলে বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান বদ্ধ করিলেন। পরে হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া তীরস্থিত এক খণ্ড সুবিস্তৃত উপলখণ্ড-উপরে উপবেশন করিয়া রাত্রিশেষে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

শোভাময়ী জ্যোৎস্না তখন বিশ্বের স্বতন্ত্রবিধ রমণীয়তা সংবিধান করিয়াছে। রাত্রি তিন প্রহর,—প্রকৃতি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, ঘোর, অলস। সম্মুখে ক্ষুদ্র বুনাস নদী নীরবে স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে অর্ব্বলীমালা উন্নতমস্তকে বসুধা পরিদর্শন করিতেছে। অদূরে নাথদ্বার নগরের সৌধচূড়া, মন্দির-ধ্বজা প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হইতেছে। সকলই নিস্তব্ধ, সকলই শান্ত। আকাশে চন্দ্র তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। চন্দ্রকিরণ নদী-নীরে, গিরি-প্রান্তরে, সৌধশিখরে প্রতিবিম্বিত হইয়া জলন্তরৎ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ সময়ে অমরসিংহ নাথদ্বার নগর সন্নিধানে বুনাস্ নদী-তীরে পাষাণখণ্ডে উপবেশন করিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ ভাবনায় নিবিষ্ট হইলেন।

রাত্রি আরও এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ঊষার স্বভাবশীতল বায়ু নদী-নীর সংস্পর্শহেতু সমধিক শীতল হইয়া অমরসিংহের গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি সেই শিলাখণ্ডের উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রভুভক্ত অশ্ব সন্নিহিত প্রান্তরে স্বীয় আহার্য্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রণরঙ্গিণী।

ঘোর পরিশ্রমজনিত ক্লেশে অমরসিংহ গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে

পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে সূর্য্যদেবের প্রতিবিম্ব প্রকটিত হইল। প্রাতঃকাল সমুপস্থিত প্রায়। এমন সময়ে অমরসিংহ সহসা জাগরিত হইলেন। তিনি নিদ্রাভঙ্গ সহকারে দেখিলেন—চমৎকার!—একটি পরমা সুন্দরী কিশোরী কামিনী কোন লতিকাগ্র স্বীয় সুকোমলহস্তে দলিত করিয়া তাহার রস তাঁহার ক্ষতমুখে ধীরে ধীরে দিতেছে। অমরসিংহ বিস্মিত, অবাক্ এবং মোহিত! আরও বিস্ময়ের কারণ কিশোরীর যোদ্ধৃবেশ! সুন্দরী অমরসিংহের নিদ্রাভঙ্গ দেখিয়া নিতান্ত লজ্জা ও সঙ্কোচসহকারে অবনতমস্তকে দন্তে রসনা কাটিয়া দুইপদ সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে কহিলেন,—

"রাজপুত্র! আপনি আমার ব্যবহারে চমৎকৃত হইতেছেন? বীরের সেবা করা আমার স্বভাব;—আপনি রাজপুত-কুলের ভূষণ, রাজপুতজাতির লুপ্তপ্রায় আশার আধার।"

রাজপুত্র অমরসিংহ আরও চমৎকৃত হইলেন। রমণীর পরমরমণীয় সৌন্দর্য্য, বাক্যকথনকালে তাঁহাব মনোহর ভাব, এবং কামিনীর—বিশেষতঃ চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কমনীয়া কামিনীর—মুখে এবংবিধ কথা শ্রবণ করিয়া তিনি মোহিত হইলেন। তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলেন—'কে বলে রজঃপুত জাতির অধঃপতন হইয়াছে?' সুন্দরী পুনরায় কহিলেন,—

"যুবরাজ! আমি এক্ষণে প্রস্থান করি।"

যুবরাজ অমরসিংহ এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ছিলেন; এতক্ষণে তাঁহার কথনোপযোগী ক্ষমতা হইল। তিনি কহিলেন,—

"বীরাঙ্গনে! আমি আপনার মোহিনী প্রকৃতি সন্দর্শনে বিমোহিত হইতেছি। আমি যদিও আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী নহি, তথাপি আপনার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সাক্ষ্য দিতেছে যে, আপনি রাজবারার কোন মহৎবংশসম্ভূতা। আপনি কিরূপে রাত্রিশেষে এ বিজন প্রদেশে আসিলেন?"

নবীনা লজ্জাসহ কহিলেন,—

"এরূপ বিজনপ্রদেশে আমার আগমন অন্যায় বলিয়া কি যুবরাজ বিরক্ত হইতেছেন?"

অমরসিংহ ব্যস্ততাসহ কহিলেন,—

"না না সুন্দরি, তাহা নহে। মনে করিবেন না যে, আমি ইহার উত্তর না পাইলে অসন্তুষ্ট হইব। উত্তর না দিলেও আপনার ব্যবহারে যে অপার আনন্দ জন্মিয়াছে, তাহার কণিকাও অপচিত হইবে না।"

সুন্দরী কহিলেন,—

"রাজপুত্র! আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন, তাহা ব্যক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনি রাজপুতকুল-প্রদীপ—আপনি কাহারও নিকট অপরিচিত নহেন। কিন্তু আমি আপনার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা। প্রথম সাক্ষাতেই পুরুষের সহিত আলাপ করা কুলকামিনীর পক্ষে ভাল কথা নহে—"রাজপুত্র বাধা দিয়া বলিলেন,—

"সে আশঙ্কা করিও না। যাহার চিত্ত নিয়ত উচ্চচিন্তায় নিবিষ্ট, তাহার পক্ষে কিছুই দোষের কথা হইতে পারে না।"

কিশোরী ক্ষণকাল চিন্তার পর সহসা কহিলেন,—

"আপনার পিশাচ-স্বভাব পিতৃব্য, যুব-

রাজ ! বিরক্ত হইবেন না, আপনার পিশাচস্বভাব পিতৃব্য মুক্তসিংহের ম্লেচ্ছসন্তান মহাবেত খাঁ আকবরের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি অধিকতর অনুগ্রহলাভ বাসনায় দুরাচার সম্রাট সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, পঞ্চবিংশ দক্ষসৈনিক সঙ্গে লইয়া মিবারের অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিবে এবং সুযোগমতে একে একে আপনাদিগকে বিনষ্ট করিবে।"

রাজপুত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁহার চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইল। কহিলেন,—

"এ সকল সংবাদ তোমায় কে জানাইল ?"

শুনুন্ যুবরাজ ! কল্য রাত্রিতে গ্রীষ্মাতিশয্য হেতু অট্টালিকার উপরে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছিলাম। দেখিতে পাইলাম অর্ব্বলী পর্ব্বতোপরি এক স্থানে আলোক জ্বলিতেছে। কৌতূহল সহ দেখিতে দেখিতে বোধ হইল অগ্নিসমীপে কতকগুলি মনুষ্য বিচরণ করিতেছে। ভাবিলাম রাত্রিকাল, অরণ্য স্থল—শত্রু ভিন্ন কে তথায় ভ্রমণ করিবে ? আমি সেই দিকে দৌড়িলাম। রাজপুত্র ! আমারে কুলকামিনী বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না, রমণী-দেহ অনর্থক বলিয়া মনে করিবেন না। আমি এই হস্তে ধনু ধারণ করিয়া শত শত্রু বিমুখ করিতে পারি, বর্শাফলক-সাহায্যে শত যবন বিনষ্ট করিতে পারি, অসির আঘাতে যথেষ্ট ম্লেচ্ছ নিপাত করিতে পারি। আর যুবরাজ ! আর আমি অবিচলিত চিত্তে শত্রুবধনিরতা থাকিয়া রণভূমে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।"

বলিতে বলিতে বালিকার লোচনযুগল যেন বর্দ্ধিত হইল। রাজপুত্র আনন্দে উচ্ছ্‌লিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন—"এ রমণীর দ্বারা নিশ্চয়ই রাজবারা উপকৃত হইবে।" বীরাঙ্গণা দক্ষিণ হস্ত বিস্তৃত করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"নিকটস্থ কোন স্থানই আমার অপরিচিত নহে। জ্ঞানোদয় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সন্নিহিত অরণ্য ও গিরিশিখরে আমি ইচ্ছামতে পরিভ্রমণ করিতে পাইয়াছি। সুতরাং উদ্দেশ্যস্থানে উপস্থিত হইতে আমার বিলম্ব হইল না। অন্তরাল হইতে শত্রুগণের সমস্ত শ্রবণ করিলাম। আমি একাকিনী—শত্রু পঞ্চবিংশ জন। ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় অশ্বপদধ্বনি হওয়াতে মহাবেত একজন সৈনিককে আজ্ঞা দিল,' দেখিয়া আইস অশ্বারোহী কে ?' সৈনিক বহুবিলম্বে আসিয়া কহিল,—' বোধ হয় অশ্বারোহী এক জন যোদ্ধা।' সে অশ্বারোহী আপনি। মহাবেতের আজ্ঞাক্রমে একজন অশ্বারোহী আপনাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা রাজপুত্রের অগোচর নাই।"

রাজপুত্র কহিলেন,—

"তোমাকে কি বলিব, কি বলিয়া তোমার প্রশংসা করিব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি সাহস দেও তাহা হইলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

কিশোরী অবনতমস্তকে ঈষদ্ধাস্যসহ কহিলেন,—

"যুবরাজ ! আমার এতাদৃশ প্রগল্ভতা

অপরাধের তিরস্কারের জন্য কি এমন সম্ভাষণ করিতেছেন? আমি আপনাকে সাহস দিলে আপনি আমাকে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এতদপেক্ষা আমাকে তিরস্কার করিবার অধিকতর সদুপায় আর দেখিতেছি না।"

যুবরাজ ব্যস্ততাসহ কহিলেন,—

"সে কি কথা? তোমাকে তিরস্কার,—আমি ভ্রমেও তাহা ভাবি নাই। আমি জিজ্ঞাসিতেছিলাম, তুমি পুরস্ত্রী—যবনবধে তোমার এত আনন্দ কেন?"

কিশোরী কিয়ৎকাল মস্তক অবনত করিয়া চিন্তা করিলেন; পরে সহসা বলিলেন,—

"যুবরাজ! যবনবধে আমার আনন্দ কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? যবনবধে আমার আনন্দ হইবে না কেন? যাহারা মিবারের, যাহারা রজঃপুতজাতির, যাহারা সমস্ত ভারতের প্রবল শত্রু, তাহারা কি আমার শত্রু নহে? রাজপুত্র! আমি কি মিবারের, রজঃপুতজাতির, ভারতের কেহই নই? আমি পুরস্ত্রী বলিয়া অত্যাচারীর অত্যাচার কি আমার হৃদয়ে আঘাত করে না? আর যুবরাজ! পুরস্ত্রীরা কি মানবসমাজের অংশিনী নহে? তাহাদের দেহ কি রক্তমাংসে গঠিত নহে? তবে তাহাদের শত্রু-নিপাতে প্রবৃত্তি হইবে না কেন? দেখুন যুবরাজ! আমরা মুসলমান জাতির কি অনিষ্ট করিয়াছি? ধনধান্যসুখপূর্ণ ভারত কবে কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছে? জগন্মান্য রজঃপুত জাতি তাহাদের কি ক্ষতি করিয়াছে? তবে কেন দুরাচারেরা অনর্থক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের বিমল সুখ-সলিলে গরল ঢালিয়া দিতেছে? কেন তাহারা আমাদের সৌভাগ্য-শিরে অশনিক্ষেপ করিতেছে? যুবরাজ! কাহাদের দৌরাত্ম্যে এই মিবার জনশূন্য মরুভূমির ন্যায় হইয়াছে? কাহাদের দৌরাত্ম্যে অদ্য চিরসুখী রজঃপুত-শিশু অন্নাভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে? কাহাদের ভয়ে জগদ্বিখ্যাত রাজপুতাঙ্গনাগণ পরম স্পৃহণীয় সতীত্বরত্ন সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে? দুরাচার, ধর্ম্মজ্ঞানহীন, যবন-দস্যুরাই কি সমস্ত অশুভের মূল নহে? রাজপুত্র! সেই মহাশত্রু যবনবিনাশে আমার আনন্দ কেন জিজ্ঞাসিতেছেন?"

অমরসিংহ কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ভাবিলেন হৃদয়ের এতদূর উদারতা আমারও নাই তথাপি এই কুমারী এখনও বালিকা বলিলে হয়, না জানি আর দুই চারি বৎসর পরে, আমার মত বয়সে উপস্থিত হইলে, এই কামিনী কি অসাধারণ ক্ষমতাশালিনী হইবে। এত রূপ, এত গুণ একাধারে থাকিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না প্রকাশ্যে কহিলেন,—

"রজঃপুত-রমণী কুল-কমলিনি! আমি তোমার কথা শুনিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছি। ভরসা করি যবন-যুদ্ধে তোমায় অগ্রণী দেখিব।" রমণী করজোড়ে কহিলেন,—

"রাজপুত্রের আশীর্ব্বাদ।"

"অতঃপর কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব?" সুন্দরী একটু ভাবনার পর বলিলেন,—

"সাক্ষাৎ—সাক্ষাতের কথা সময়ান্তরে বলিব।"

"তোমার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে আপত্তি আছে কি?"

রমণী যেন কিছু ব্যাকুলিতা হইলেন। বলিলেন,—

" সন্নিহিত নাথদ্বার নগরে আমার পিত্রালয়। আর পরিচয় উপযোগী সময় উপস্থিত হইলে বলিব।"

এমন সময়ে অদূরে অশ্ব-পদ-ধ্বনি শুনিয়া উভয়ে সোৎসুকে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমরসিংহ কহিলেন,—

" স্বর্গীয় জয়পাল সিংহের পুত্র প্রিয় সুহৃৎ রতনসিংহ আসিতেছেন।"

তরুণী ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—

" যুবরাজ! আমি প্রস্থান করি। এ উন্মাদিনীর প্রগল্‌ভতা ও অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

এই বলিতে বলিতে নবীনা প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহ সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অসি—না প্রেম?

যখন রতনসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন, তখনও অমরসিংহ যে দিকে বীরনারী গমন করিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। রতনসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অমরের সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন,

" ভ্রাতঃ! যুদ্ধ বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি কি যুবতী সন্দর্শন সুখে পরিলিপ্ত হইলে?"

অমরসিংহ লজ্জিত ভাবে কহিলেন,—

" তাহা কি তোমার বিশ্বাস হয়? তুমি যাহাকে যুবতী মনে করিতেছ, সে একটি বালিকামাত্র আইস, এইস্থানে উপবেশন করিয়া যে কাহিনী বলি তাহা শ্রবণ কর; শুনিলে তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইবে, এবং নির্নিমেষ-লোচনে তাঁহার পরিগৃহীত পন্থা অবলোকন করিবে, বা সমস্ত রাত্রি তাঁহারই আলোচনায় অতিবাহিত করিবে।"

রতনসিংহ সহাস্যে কহিলেন,—

" রহস্য যাউক—ব্যাপার কি বল দেখি।"

অমরসিংহ একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। রতনসিংহ সমস্ত অবগত হইয়া প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। উভয়ে বহুক্ষণ সেই সুন্দরীর বিষয় আলোচনা করিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন রতনসিংহ কহিলেন,—

" এরূপ স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকা বিহিত নহে। মহাবেত অন্তরালে থাকিয়া সর্ব্বদা আমাদের বিনাশ-সাধনে চেষ্টিত রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অসাবধানে থাকা ভাল নয়। চল এখান হইতে প্রস্থান করা যাউক।

অমরসিহ অশ্ব আনয়ন করিলেন এবং রতনসিংহকে কহিলেন,—

" তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ, কোথায় বা যাইবে?"

রতনসিংহ কহিলেন,—

" আমি কমমর হইতে আসিতেছি, সম্প্রতি রাজনগর যাইব। পূজ্যপাদ মহারাণার আজ্ঞা—রাজনগরের সামন্তকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সত্বর যুদ্ধ সম্ভাবনা, —প্রতিক্ষণে বিপদ ৮ সামন্তের সহিত এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার ভার আ-

যার উপর অর্পিত হইয়াছে। তুমি যে কার্য্যে গিয়াছিলে তাহার কি হইল ?”

“সফল।”

“অনেক ভরসা হইল।”

উভয়ে অশ্বারোহণ করিলেন। অমরসিংহ বিদায় হইয়া অশ্বচালনা করিবেন, এমন সময় রতনসিংহ কহিলেন,—

“শুন অমর! পথ শত্রু-সমাচ্ছন্ন। আমি বলি তুমি একাকী যাইওনা। আইস উভয়ে রাজনগর যাই—আবার একসঙ্গে ফিরিব।”

অমরসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

“তোমার বুঝি ভয় লাগিয়াছে ?”

রতনসিংহ উত্তর না দিয়া স্বীয় অসি দেখাইলেন। আর বাক্যব্যয় না করিয়া উভয়ে স্বতন্ত্রদিকে প্রস্থান করিলেন।

এই অবকাশে এই যুবকদ্বয়ের সংক্ষেপ পরিচয় আমরা পাঠকমহাশয়দিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি। অমরসিংহ মিবারের বর্ত্তমান মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র। তাঁহার বয়স অষ্টাদশবর্ষের অধিক নহে। এই অল্প বয়সেই তিনি যোদ্ধৃত্ব, পাণ্ডিত্য, বিনয়, শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণ-হেতু সর্ব্বত্র সমাদৃত।

রতনসিংহ প্রথিতনামা বেড্‌নোর রাজ স্বর্গীয় জয়মলসিংহের পুত্র। জয়মলসিংহের বীরত্ব, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণের সীমা ছিল না। বাদসাহ আকবর স্বয়ং তাঁহার প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। রতনের নিতান্ত বাল্যাবস্থায় জয়মলসিংহের কাল হয়। মৃত্যু সময়ে তিনি পুত্রকে স্বীয় অভিন্নাত্মক মহারাণার হস্তে সমর্পণ করেন, এবং তাহার প্রতি অনুগ্রহ রাখিতে অনুরোধ করিয়া যান। মহারাণা রতনসিংহকে পুত্রবৎ যত্নে লালন পালন ও যথাবিধানে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন।

রতন ও অমর প্রায় সমবয়স্ক। তাঁহারা একত্রে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর অযথা সৌহার্দ্দ ছিল। রতনসিংহকে অনেকেই মহারাণার পুত্র বলিয়া জানিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক কথা।

আমরা এক্ষণে এই আখ্যায়িকা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব ইচ্ছা করিতেছি। কোন কোন পাঠক উপন্যাস অথবা তদ্বৎ কৌতূহল-উদ্দীপক পুস্তকমধ্যে কিয়দংশ নীরস, অসার (?) ঐতিহাসিক বিবরণ ও শ্রেণীবদ্ধ এবং পরম্পরাগত ঘটনানিচয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দুর্ভাগা গ্রন্থকারকেও অনর্থক গ্রন্থকলেবর-পুষ্টিকারক অকর্ম্মণ্য লেখক বলিয়া কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত করেন। এ সকল অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিয়াও আমরা অতঃপর এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি। অনেকেই হয়ত, আমরা এক্ষণে যে দুই একটি কথা বলিব ইচ্ছা করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। তাঁহারা অনায়াসে এ পরিচ্ছেদ ত্যাগ করিতে পারেন। যাঁহারা এ সকল কথা জানেন না, তাঁহাদের সমীপে আমাদের সবিনয়ে অনুরোধ এই যে, যৎপরোনাস্তি নীরস হইলেও, স্বদেশের ইতিহাসের মমতায়, একবার এই

কয় পৃষ্ঠার উপর চক্ষু বুলাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

দুর্দ্দান্ত যবনদিগের প্রতাপের নিকট একে একে ভারতের সমস্ত রাজবর্গ ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া চিরগৌরবশূন্য হইতে লাগিলেন। যখন সুবিচক্ষণ সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, সে সময়ে হিন্দুজাতির ভরসা স্বরূপ রজঃপুত রাজগণের অধিকাংশই ক্রমে ক্রমে মোগলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন। কেহ বা বিবাহ-বন্ধনে, কেহ বা সন্ধি-সূত্রে, কেহ বা অনুগ্রহ পাশে বদ্ধ হইয়া যবনদিগের ঘোর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। যাঁহারা এইরূপে জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হইয়া বলবন্তের আশ্রয়ে ধনপ্রাণ রক্ষা করেন, তন্মধ্যে অম্বরদেশাধিপ মহারাজ মানসিংহ, বিকানীরের কুমার পৃথ্বীরাজ ও মিবারের মুক্তসিংহের সহিত আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সংস্রব আছে। রাজপুতশ্রেষ্ঠ মিবারেশ্বরগণ ভ্রমেও কদাপি যবনের নিকট হীনতা স্বীকার করেন নাই। রাজ্য যায় যাউক, ধনসম্পত্তি যায় যাউক, প্রাণ যায় যাউক, তথাপি কাহারও—বিশেষতঃ ভারতের চিরশত্রু ম্লেচ্ছ যবনের—দাসত্ব স্বীকার করিয়া পবিত্র ইক্ষাকুবংশসম্ভূত রাজপুতকুলে কলঙ্ক অর্পণ করিব না, বাপ্পা রাওয়ের বীর্য্যবন্ত সতেজ বংশধরগণ এই গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন। এই গর্ব্ব হেতু তাঁহাদের অপরিমেয় ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, শোণিত দিয়া সমরক্ষেত্র ভাসাইতে হইয়াছে, তথাপি কদাপি দৃঢ়তা বিচলিত বা চিত্তের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মিবারেশ্বর মহারাণা উদয়সিংহের সময় রাজধানী চিতোর নগর সম্রাট আকবরের হস্তগত হয়। চিতোর রক্ষার্থ যুদ্ধে রাজপুত বীরগণ ও রাজপুত রমণীমণ্ডলী যে অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশ করেন, তাহার তুলনা বোধ হয় অন্য কোন জাতির ইতিহাস মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা পাঠকগণকে ইতিহাস হইতে সেই অসাধারণ ঘটনার বিবরণ অধ্যয়ন করিয়া হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিতে বার বার অনুরোধ করি। * উদয়সিংহ প্রকৃত প্রস্তাবে সুদক্ষ নৃপতি ছিলেন না। আলস্য, শিথিলতা ও ভোগসুখোন্মত্ততা তাঁহার স্বভাবের অনপনেয় কলঙ্ক ছিল। এই জন্যই তাহার সময়ে ধনজন সহায়শূন্য অধঃপতিত মিবারের সম্পূর্ণ অধঃপতন সঙ্ঘটিত হয়।

উদয়সিংহ রাজধানীহীন হইয়া রাজপিপ্পলী নামক স্থানের দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চিতোর-ভ্রষ্ট হইবার পূর্ব্বে তিনি গৈরব নামক পর্ব্বতের উপত্যকা সমীপে "উদয় সাগর" নামক এক হ্রদ খনন করিয়াছিলেন। অধুনা তিনি তৎসমীপে একটি ক্ষুদ্র হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলেন ও গিরিসন্নিহিত সমস্ত ভূভাগ অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ করিলেন। অবিলম্বে ধনবান্ প্রজাবর্গ এই স্থানে সৌধমালা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এইরূপে সুবিখ্যাত উদয়পুর নগর সৃষ্ট হইল।

সংবৎ ১৬২৮ অব্দে উদয়সিংহের জীব-

* Babu Hary Mohan Mookerjee's Edition of Tod's Annals & Antiquity of Rajastan, Vol. I, Ch. X, P. 25 ও দেখ।

লীলা সাঙ্গ হইল। প্রতাপসিংহ সেই রাজ্য-শূন্য, সম্পত্তি-শূন্য, শূন্য-রাজোপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন। কিন্তু প্রতাপসিংহ ধনজন-শূন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন বলিয়া তাঁহার হৃদয় মুহূর্ত্তেকের জন্যও শূন্য হয় নাই। ভারত হিন্দুশাসনাধীনে সংস্থাপিত করিব, চিতোর নগরে পুনরায় সূর্য্যবংশীয়দিগের জয়ধ্বজা প্রোথিত করিব এই আশায় উন্মত্ত হইয়া বীরবর প্রতাপসিংহ জীবনতরণীকে দারুণ বিপদ-সঙ্কুল সাগরে ভাসাইয়া দিলেন।

প্রতাপসিংহের হৃদয়ের অত্যুচ্চ ভাব বিবরিত করা অসাধ্য; তাহা অনুমান করাই কঠিন, প্রকাশ করা সর্ব্বথা অসম্ভব। চিতোরের মায়া প্রতাপের মনে এতই বলবর্ত্তী ছিল যে, তিনি চিতোরের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া, বিরলে বসিয়া, অবিরল অশ্রু-ধারা বিসর্জ্জন করিতেন। বাদশাহ চিতোর অধিকার করিয়া তাহার নিরূপম শোভা সমস্ত বিধ্বংস করিয়াছিলেন। রাজপুত কবিগণ (চরণ) চিতোরের এই অবস্থা নিরাভরণা বিধবা পৌরনারীর দশার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ এই চিন্তায় এতাদৃশ উন্মনা ও কাতর ছিলেন যে, যতদিন চিতোরের এই দারুণ দুর্দ্দশা অপনোদিত না হয়, ততদিন তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গ সমস্ত ভোগ বিলাস হইতে বঞ্চিত রহিবেন, এই নিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসনানুসারে তিনি ও তাঁহার স্বগণ স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত ভোজনপাত্রের পরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্রে (পাতারি) আহার করিতেন, সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে তৃণ শয্যায় শয়ন করিতেন, মৃতাশৌচের ন্যায় নখরকেশাদি রাখিতেন এবং সমৃদ্ধির পুরোভাগে যে নাকারা বাদিত হইত, তাহা সেই নিরানন্দ ঘটনা নিরন্তর স্মৃতির সম্মুখে উপস্থিত রাখিবার নিমিত্ত অতঃপর পশ্চাতে বাদিত হইত। চিতোরের পুনরভ্যুদয় বিধাতার বাসনা নহে,—তাহা হইল না। কিন্তু অদ্যাপি প্রতাপের বংশধরগণ সেই কঠিন আজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা অদ্যাপি ভোজনপাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র পাতিত করেন, শয্যার নিম্নে তৃণ বিস্তৃত করেন, কখনই সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডন করেন না এবং নাকারা অদ্যাপিও পশ্চাতে বাদিত হয়।

প্রতাপ এই ধনজনশূন্য রাজোপাধির উত্তরাধিকারী হইয়া দেখিলেন,—শক্র যেরূপ প্রবল প্রতাপ, এবং তাঁহার সহায় সম্পত্তি যেরূপ হীন, তাহাতে সহসা তাঁহার অভ্যুদয়ের কোনই আশা নাই। এই মিবার ধন ধান্যে যেরূপ পরিপূর্ণ এবং ইহা প্রকৃতির যেরূপ প্রিয় নিকেতন, তাহাতে ইহা চিরদিন রাজ্যলোলুপ মোগলের মনে নিরতিশয় লোভ উদ্দীপ্ত করিবে। অতএব এক্ষণে অন্য চেষ্টা না করিয়া এবংবিধ উপায় অবলম্বন করা বিধেয়, যাহাতে মিবার মরুভূমির বালুকার ন্যায় অসার ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি তদর্থে আজ্ঞা দিলেন যে, প্রজাগণ অতঃপর আর সমতল ভূমিতে—নগরে বা গ্রামে—বাস করিতে পাইবে না, সকলকেই বাস স্থান ত্যাগ করিয়া অরণ্য বা গিরি গহ্বরে বাস করিতে হইবে। প্রতাপের বাসনা ও আজ্ঞা বিচলিত

হইবার নহে। প্রজাগণ স্ত্রীপুত্র কন্যা সমভি-ব্যাহারে ঘনারণ্য ও গিরি-সঙ্কটে উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। সোণার মিবার জনহীন, শস্যহীন, পরিত্যক্ত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উঠিল. মিবারের নগর-সমস্ত শার্দ্দূল, শৃগাল ও সর্পের আবাস হইল। শোভাময় ভবন সমস্ত শ্রীহীন, পতনোন্মুখ, নিরানন্দময় ও "বেচেরাগ" অর্থাৎ দীপহীন হইয়া উঠিল। মিবারের যেরূপ শোচনীয় দশা হইয়া উঠিল, তাহাতে বিরোধী ভূপালের চক্ষে সে রাজ্যে কোনই লোভনীয় সামগ্রী রহিল না। যাঁহারা মিবারের প্রদেশপতি এবং যাঁহাদের আবাস দুর্গমধ্যে সংস্থিত, তাঁহারাই কেবল এই কঠোর নিয়ম হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি লাভ করিলেন। তাঁহারা সমস্ত দিবস দুর্গাভ্যন্তরে বাস করিয়া বিশেষ প্রয়োজন হইলে রাত্রিকালে বাহিরে আসিবার অনুমতি পাইলেন। একতঃ এরূপ প্রদেশপতি ও দুর্গসম্পন্ন প্রজার সংখ্যা নিতান্ত অল্প, অপরতঃ তাঁহাদের পক্ষেও দিবা ভ্রমণ নিষিদ্ধ, সুতরাং মিবারের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও মানব-কণ্ঠ-ধ্বনি শ্রবণ করা যাইত না।

স্বয়ং প্রতাপসিংহও স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে লইয়া ঘনারণ্য মধ্যে বৃক্ষমূলে বাস করিতেন। তাঁহাদের সে অসহনীয় ক্লেশের কথা কি বলিব! সেরূপ অবক্তব্য যাতনাসঙ্কুল রাজপদ অপেক্ষা ছিন্নকন্থাধারী ভিক্ষুকের অবস্থাও শ্রেয়ঃ! যুবরাজ অমরসিংহ সে সময় বালক।

এইরূপে পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু তথাপি রাজ্যের কোনই উন্নতি হইল না। মহারাণা দেখিলেন,—নিরন্তর অরণ্যে বাস করিলেই এবং যবনদিগের আক্রমণ হইতে পরিরক্ষিত থাকিলেই মিবারের সৌভাগ্যের পুনরাবির্ভাব হওয়া অসম্ভব। বলবিক্রমে স্বাধীনতা ও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেই উন্নতির সম্ভাবনা, এ বনে বসিয়া তাহা কিরূপে হইবে? রাজধানীতে থাকিয়া বুক পাতিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তিনি তদর্থে কমলমর নামক দুর্গসম্পন্ন নগর পুনঃসংস্কৃত করিয়া তথায় স্বজনগণ সহ আসিয়া রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।

যে কয়জন প্রধান ব্যক্তি মহারাণাকে অবিচলিত চিত্তে শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার উন্নতি ও অবনতির সহিত আপনাদের উন্নতি ও অবনতি মিশাইয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কুমার অমরসিংহ ও কুমার রতনসিংহ ব্যতীত আরও তিনজন বিশেষ প্রশংসার্হ। সে তিনজন শৈলম্বররাজ, দেবলবররাজ এবং ঝালারাজ। শৈলম্বর-রাজ মহারাণা প্রতাপসিংহের সমবয়স্ক—তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়ে কর্ত্তব্য জ্ঞানের বন্ধন ব্যতীত আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধন ছিল। দেবলবর রাজ বৃদ্ধ। তাঁহার ধবল শ্মশ্রু, ও ধীরকার্য্য জ্ঞানের পরিচায়ক। মিবারের যখন হীনদশা উপস্থিত হইল, তখন তিনি ধন-প্রাণ-রক্ষার্থে যবনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে তেজের অঙ্কুরও আছে, তাহারা সেরূপ হীনভাবে কতদিন থাকিতে পারে? ধন যায় যাউক, প্রাণ যায় যাউক, তথাপি মিবারের হিতার্থে জীবন ব্যয় করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া দেবলবর-রাজ পুনরায়

সবিনয়ে আসিয়া মহারাণার নিকট ত্রুটী স্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ঝালারাজ সর্ব্বদা মহারাণার সমীপে অবস্থান করিতেন না বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে মহারাণার নিমিত্ত জীবন দিতে তিনি কিছুমাত্র কাতর ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন আর এক ব্যক্তি সতত মহারাণার সমস্ত পরামর্শে লীন থাকিতেন। তিন মন্ত্রী—তাঁহার নাম ভবানীসহায়। তাঁহার আকৃতি দেখিলে তাঁহাকে কুৎসিৎ বলিলেও বলা যাইত, কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহাকে যে উদার হৃদয় দিয়াছিলেন, সেরূপ হৃদয় লইয়া মনুষ্যত্ব করা অল্প মানবের সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। মহারাণার প্রতি ভক্তি ও দেশের কল্যাণকর কার্য্যই তাঁহার প্রিয়কার্য্য। মন্ত্রণা তাঁহার সাধন হইলেও অসিধারণে তিনি অপটু ছিলেন না।

প্রতাপসিংহ রাজ্যলাভ করার পাঁচ বৎসর পরের ঘটনা এই আখ্যায়িকায় স্থান পাইবে।

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। 'শশীসন্দর্শন বা সামাজিক দৃশ্য। শ্রীকামিনীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত'।—নাটক লেখাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। গ্রন্থনায়িকা শশী অতি অল্প বয়সের বালিকা। শশীর পিতার ইচ্ছা, কন্যাকে একজন অশীতিপর বৃদ্ধকুলীনের হস্তে দিয়া কুল রক্ষা করেন। শশীর ভ্রাতা শিক্ষানুরাগী এবং সমাজশোধনের পক্ষপাতী। তাঁহার ইচ্ছা ভগিনীকে পিতার অসম্মতিসত্ত্বেও ছলে কি বলে সৎপাত্রে দান করিয়া নীতিরক্ষা করেন। গৃহিণী কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধের দিকে, কিয়ৎপরিমাণে কন্যার দিকে। এই কাহিনী লইয়া 'শশীসন্দর্শন'। যাহা হউক গ্রন্থকার যে সহৃদয় ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখা অপরিপক্ক এবং নানা স্থানে সুরুচিবিরুদ্ধ। নাটক রচনার কৌশলবিষয়েও বোধ হয় তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়া।

২। 'বিজন-বন্ধু কাব্য। শ্রীনিশিচন্দ্র দে প্রণীত।' যদি অনুকরণের জন্য উপযুক্ত শক্তি থাকে, তাহা হইলে অনুকরণ-চেষ্টা কোন অংশেও নিন্দনীয়া নহে। কিন্তু যে খানে শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই ও শিক্ষালভ্য ক্ষমতা নাই, সে খানে ঐরূপ চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। বিজন-বন্ধুর রচয়িতা একজন প্রতিভাশালী কবির আদিরসময়ী কবিতার অনুকরণ করিতে গিয়া এইরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছেন। তাঁহার 'কি দুঃখের বুধবার' এবং 'হতভাগ্য নর' ভদ্রলোকের অপাঠ্য, ভাষার গ্লানিকর, এবং সামাজিক রুচির অসহনীয়। তবে ভরসা এই, এরূপ গ্রন্থ লেখকের সুহৃৎসমাজ অতিক্রম করিয়া প্রায়শঃ অধিক দূরে যাইয়া থাকে না। পণ্যাঙ্গনা এবং পণ্যবিলাসিনী কবিতা,—ইহারা উভয়েই রূপজী-

বিনী। যদি রূপেও ইহারা বীভৎস-দৃশ্যা হয়, তাহা হইলে কে ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে? নিশী বাবু স্বশক্তির পরিমাণ পরিগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কবিতা লিখিলে, নিজেও উপকৃত হইবেন এবং কোন না কোন সময়ে সাহিত্যের উপকার সাধনেও কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া, তিনি অতি জঘন্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকিবে যে, কতকগুলি অশ্লীল শব্দ ও অশ্লীল কথা ছন্দোবদ্ধ হইলেই, তাহা আদিরসের কবিতা বলিয়া আদৃত হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে, এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রমমূলক। যাঁহারা আদিরসের কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শক্তিমান্ লোক। তাঁহারা রসের উদ্দীপনার জন্য কবিওয়ালার কুৎসিত টপ্পা কণ্ঠস্থ করেন নাই,—এবং কল্পনার বিনোদচিত্র সন্দর্শনের জন্যও বটতলা যান নাই। গুণ থাকিলে তাহার সঙ্গে সামান্য সামান্য দোষও তরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিনা গুণে দোষ,—সে বড় ভয়ানক কথা।

৩। 'সুর-সঙ্গিনী। শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত'—এদেশের যে সকল নব-যুবা করকণ্ডূয়নের পরিতৃপ্তি-লালসায় অর্থশূন্য ও রস-লেশ-শূন্য কদর্য্য কবিতা লিখিয়া সর্ব্বত্র নিন্দিত হইতেছেন, সুর-সঙ্গিনীর রচয়িতা তাঁহাদিগের মধ্যেও স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। বস্তুতঃ এরূপ বিকট ও বিকৃত কবিতা সর্ব্বদা লোকের দৃষ্টিপথে পড়ে না। ইহা পড়িবার সময়ে কোন কোন স্থলে হাস্যসংবরণ করাই কঠিন হইয়া উঠে। কবিকীর্ত্তিলিপ্সু গ্রন্থকার 'মলয়পবনের প্রতি' সম্ভাষণে কিরূপ কবিতা সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার দুঃখে দুঃখী, এবং সুহৃদ ও সহায়, যে যে খানে আছেন, সকলেরই তাহার দুচারি পংক্তি পাঠ করা উচিত। গ্রন্থকার লিখিতেছেন,—

"বলপ্রদ ওহে ধনিনী-নন্দন
বড় বাবু তুমি মলয়-পবন!
ঘরেতেই থাক—প্রেয়সী কি রাখ;—
পাঁজি পুথি বুঝি দিবা রাত্রি দেখ?
লেখা পড়া জান?—বোধ হয় যেন
জননীর সেবা কর নিশী দিন!
ভাবি আর কত—জানি তা'ও যত
দাস দাসী তব আছে কত শত?"—

* * * *

"উড়া'তে পার্ব্বে না।—গাড়ি চড়ে যাও,
মসলা দিয়ে পান দিব্বি ক'রে খাও,
টঙ্গে বসে থাক, বামা তবলা শেখ,
অমানিশি শশী গায়ে ফুদে' দেখ?"

ইহাই বোধ হয় গ্রন্থকারের তোটকচ্ছন্দ। তাঁহার অন্যান্যচ্ছন্দের কবিতানিচয় ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর! কিন্তু গ্রন্থকার বাণীস্তোত্রের উপক্রমণিকায় একটি সদর্থ সংস্কৃত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহার এই অর্থ যে, মধুলুব্ধ মধুকরেরা কেতকী ফুলেও উড়িয়া পড়ে।

অশ্রুজল

" Sweet tears, the awful language eloquent
Of infinite affection, far too big
For words. "

তোমার মণিমুক্তার মোহন-মালা দূরে রাখ ; আমি একবার নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই। মণিমুক্তা পৃথিবীর ধুলিসমান ; বালক কি বণিকের নিকট ভিন্ন অন্যত্র উহার মূল্য নাই। অশ্রুমালা দ্রবীভূত মনুষ্যহৃদয়ের সজীব-ধারা ; পৃথিবীর কোন বস্তুর সহিতই উহার তুলনা নাই।

এই সংসার-মরুতে মনুষ্যহৃদয়ের অবলম্ব কি ?—না, মনুষ্যহৃদয়। মানুষী তৃষ্ণার তৃপ্তিস্থল কোথায়?—না, মনুষ্যহৃদয়। হৃদয় যদি হৃদয়কে সম্ভাষণ করিয়া প্রতিসম্ভাষণে প্রীত, আশ্বস্ত ও পুলকিত না হয়, তাহা হইলে কে এই শূন্যসংসারে ইচ্ছাসহকারে জীবন ধারণ করে ? হৃদয় যদি হৃদয়ের উপর ভর করিয়া প্রতিনির্ভরে প্রাণ-বল না পায়, তাহা হইলে কে এই দগ্ধশ্মশানে অস্থি-সংগ্রহের জন্য পড়িয়া থাকিতে সম্মত হয় ? হৃদয় যদি প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে আত্ম-দান করিয়া প্রতিদানে হৃদয় না পায়, তাহা হইলে কে এই তিমিরান্ধভুবনে ভবলীলার নটনৈপুণ্য শিক্ষার জন্য বন্দী রহিতে পারে ? রাজার প্রাসাদ, বুভুক্ষু ভিখারীর পর্ণকুটীর, যোগীর তপোবন, বিয়োগীর নিভৃত-কানন, পুণ্যাত্মার শান্তিনিকেতন, প্রমোদীর বিলাস-ভবন, ইহার সর্ব্বত্রই মনুষ্যের আশ্রয়-স্থান মনুষ্যহৃদয়। কবিতা মনুষ্যহৃদয়ের প্রীণনের জন্য ফুলের মধু, লতার মাধুরী এবং এই অনন্তবিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সারভূত সৌন্দর্য্যসুধা চঞ্চুপুটে সঞ্চয়ন করিয়া নিত্য আনিয়া উপহার যোগাইতেছে। চিন্তা হৃদয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও প্রকৃত পুষ্টির জন্য আকাশে উড্ডীন হইয়া, সাগরে ডুব দিয়া এবং ভূগহ্বরে প্রবেশ করিয়া সুস্বাদ ও সুভক্ষ্য ফল চয়ন করিতেছে। উদ্দীপনা মনুষ্যহৃদয়েরই উদ্বোধনের জন্য, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, উৎসাহের প্রতপ্ত মদিরা এবং প্রতপ্তাড়িত-প্রবাহ উন্মাদিনীর মত ঢালিয়া দিতেছে। বুদ্ধি আলোক দান করিতে পারে ; বিবেক নির্ম্মল-চেতা, নির্ভীক সুহৃজ্জনের ন্যায় নীতির দুর্গমপথ প্রদর্শন করিতে পারে ;—কিন্তু তৃষ্ণায় তৃপ্তিদান করিতে, জ্বালা ও বেদনায় শান্তি দিতে, এবং শান্তি যখন আশাতীত ও অসম্ভব হয়, তখন সহানুভূতির অমৃতস্পর্শে প্রাণ জুড়াইতে, মানবীয় জগতে একমাত্র বস্তু মনুষ্যহৃদয়। অশ্রুধারা সেই মনুষ্যহৃদয়ের জীবনময়ী নির্ঝরিণী। উহা কখনও ধীরে বহে,

কখনও বেগে প্রবাহিত হয়, কখনও বা নিশার শিশিরবিন্দুর ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঝরিতে থাকে। কিন্তু যেই মনুষ্য উহার দিকে দৃষ্টি-পাত করে, অমনি তাহার হৃদয় অন্তরতম স্থলে স্পৃষ্ট হইয়া, এই বিশ্বাস ও এই গভীর আনন্দে উল্লসিত হয় যে, এসংসার কঙ্কর ময় কান্তার অথবা হৃদয়-শূন্য দগ্ধপ্রান্তর নহে।

যাহারা ক্ষণকালও কোন বিষয়ে মনো-নিবেশ করিতে চাহে না, অথবা প্রকৃতির চাপল্যে ক্ষণকালের তরেও কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় না—কার্য্য, কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি, জীবন ও মৃত্যু, এবং মানবজীবনের উন্নতি ও অবনতি, সমস্তই যাহাদিগের নিকট হাস্যের বিষয়, সেই বি-কটবুদ্ধি, কিম্ভূত পুরুষেরা অবশ্যই মনুষ্যের অশ্রু লইয়া উপহাস করিতে পারে। আর, যাহারা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষা, সংসর্গ অথবা কর্ম্মগুণে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস হইতেও নিষ্ঠুর হইয়াছে,—কাব্যে যাহাদি-গের নাম ধূম্রলোচন কি ফ্রুণ্টবিয়ক, ইতিহাসে যাহারা ভিটেলস * কি ভি-স্কণ্টী †, তাহারাও মনুষ্যের অশ্রু দর্শনে খিল খিল করিয়া হাসিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বাংশে অন্তঃসারহীন ও প্রাণবিহীন নহেন, মনুষ্যত্ব একবারে যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই, উহা স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করে, এবং আপনি তরল হইয়াও তাঁহাদিগের তারল্যকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। মনুষ্যের অশ্রুজল বস্তুতঃও সামান্য পদার্থ নহে।

অশ্রুজল দয়ার প্রবাহ। স্বার্থপরতা নিভৃতে বসিয়া ক্ষতিলাভ গণনা করে; লোভ কাহার কি হরণ করিবে, সেই চিন্তায়

* অলাস ভিটেলস রোমের সম্রাট্ ছি-লেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব এমনই জঘন্য ও নিষ্ঠুর ছিল, এবং তিনি বিনা প্রয়োজনেও লোক-পীড়নে এমন অনুরক্ত ছিলেন যে, প্রজারা আর সহিতে না পারিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে, এবং পরিশেষে তাঁহাকে নানাবিধ নিগ্রহ ও অপমান সহ-কারে হত্যা করিয়া, রোমের প্রান্তবাহী টাই-বরের জলে তাঁহার মৃতদেহ ফেলাইয়া দেয়। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' এবং 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর রচয়িতা, মস্তিষ্কতত্ত্ববিৎ বিখ্যাত পণ্ডিত জর্জ কুম্ব, অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার প্রতিকৃতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে, স্বপ্রণীত গ্রন্থে ভিটেলসের একখানি প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে রোমের অনেক সম্রাট্কেই এইরূপ সম্মান করিতে পারিতেন।

† গায়োভেনি মেরায়া ভিস্কণ্টী লম্বা-র্ডীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভিস্কণ্টী বংশের অন্যতম রাজা। কথিত আছে, ইনি মনু-ষ্যের দুঃখ, যন্ত্রণা ও দুর্ব্বিসহ ক্লেশ দর্শনে যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন, আর কিছু-তেই ইহাঁর তেমন আনন্দ হইত না। ইনি সুরূপ পুরুষ ও সুন্দর বালক বালিকাদিগকে মাটিতে অর্দ্ধেক পুতিয়া শিক্ষিত কুক্কুর দ্বারা তাহাদিগের মাংস খাওয়াইতেন, এবং এই-রূপ দৃশ্য মধ্যে মধ্যেই বিশেষ হর্ষের সহিত দর্শন করিতেন। ভিটেলসের ন্যায় ইহাঁরও অপমৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি।

সর্ব্বত্র চৌরবৎ বিচরণ করে; হিংসা পরের সুখ-সম্পদ ও সম্মান দর্শনে আপনি পুড়িয়া মরে এবং বিষাক্ত দৃষ্টি ও বিষাক্ত বাক্যে অন্যকে পুড়িয়া ভস্ম করে; কামাদি কলুষিত-বৃত্তি প্রমত্ত পশুর ন্যায় আরক্তলোচনে সতত ভোগ্য বিষয়েরই অনুসন্ধান করে। কিন্তু পর-দুঃখ-কাতরা দয়া, অশ্রুজলে বিগলিত হইয়া,—আপনাকে আপনি ঢালিয়া দিয়া, পরকীয় হৃদয়ের দুঃখ-দাহ নির্ব্বাণ করে। দয়ার অশ্রু দেবতারও দুর্লভ ধন। যাঁহার চক্ষু দয়ার অশ্রুতে সিক্ত হয়, দেবতার মধ্যে দেবতা বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন কর।

'যে যাহারে ভালবাসে,' সে তাহারে প্রায়শঃই ভালবাসিতে পারে। কিন্তু পরকে ভালবাসে কে? আপনার পুত্রকন্যা ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তির প্রতি সকলেরই স্নেহ-সঞ্চার হয়। কিন্তু পরকে প্রমুক্তচিত্তে স্নেহ বিলাইতে পারে কে? যেখানে রূপ আছে, গুণ আছে, প্রতিভার উজ্জ্বলদীপ্তি কিম্বা কুসুমের সুকুমার সৌরভ আছে, সেখানে সকলেরই অনুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যেখানে রূপ নাই, গুণ নাই, নয়ন-মনোবিনোদনের কিছুই নাই,—আছে দুঃখের কালিমা এবং দুর্ভাগ্যের কশাঘাত-জন্য ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন, তাদৃশ স্থানে হৃদয়ের স্বতঃপ্রবৃত্তস্ফুরণে অনুরক্ত হইতে পারে কে? যেখানে সম্পদের সুখসামগ্রী মাক্ষিকপ্রকৃতি মনুষ্যগণকে মধুগন্ধে মোহিত রাখে, সেখানে সকলেই গিয়া মমতার বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যেখানে বিপদের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবাতে সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে, তাহাও বিনাশ পাইতেছে এবং আশার শেষ আলোকবর্ত্তিকাও নিভিয়া যাইতেছে, আপনা হইতে সেখানে যাইয়া আপনাকে আপনি মমতার রজ্জুতে জড়াইতে পারে কে? যে পবিত্র, পূত-চরিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ, তাহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতে পারে; কিন্তু যে অধম, অপাত্র, অপবিত্র ও অস্পৃশ্য, তাহাকে তুলিয়া লইয়া আবরিতে পারে কে? হৃদয় যেখানে উড়িয়া পড়িতে সুখানুভব করে,—সুখসংস্পর্শে শীতল হয়, সেখানে সকলেই স্বয়মাহূত উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে সকলই দুঃসহ, দুর্নিরীক্ষ্য ও নিদারুণ দুর্ভোগ,—যে স্থানের বীভৎস দৃশ্যে বিরক্তি ও ঘৃণা ব্যতীত আর কোন ভাবেরই উদ্রেক হয় না,—যেখানে বল-প্রয়োগেও চিত্তকে প্রেরণ করা যায় না, সেখানে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে কে?

তুমি প্রভুত্বের উপাসনায় আত্মসমর্পণ কর,—প্রভুত্বলাভে পূর্ণকাম হইবার জন্য অকথ্য ক্লেশ স্বীকার কর,—সে তোমার আপনার জন্য; পরের জন্য নহে। তুমি সারস্বতসমুদ্রে সাঁতার দিয়া একবারে উহাতে ডুবিয়া থাক,—সরস্বতীর পাদপদ্মে একবারে বিলীন হইয়া যাও,—সে তোমার আপনার জন্য; পরের জন্য নহে। যদি প্রভুত্বের উপাসনায় ও সরস্বতীর পদারবিন্দসেবায় কোনরূপ অলৌকিক মাদকতা না থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহাতে দেহ মন সমর্পণ করিতে পারিতে কি না, সন্দেহের কথা। তুমি কীর্ত্তির বিশ্ববিনোদ বংশীধ্বনি শ্রবণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া কীর্ত্তিকর ও যশস্কর যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান কর,—যে সকল কঠোর, কষ্টজনক ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম

সম্পাদন করিয়া সমাজের কীর্ত্তিস্তম্ভনিবহে আপনার নামাক্ষর লিখিয়া রাখিতে যত্নপর হও,তাহাও তোমার আপনার জন্য ; পরের জন্য নহে। পরের জন্য দয়ার অশ্রু। পৃথিবীতে যেখানে উহা নিপতিত হয়, সেই স্থানই পুণ্যস্থান বলিয়া চিরদিন পূজিত রহে।

অশ্রুজল প্রেমের নীরব-গীত। শব্দে যাহা পরিস্ফুট হয় না, সংগীত আপনি যাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, প্রেমিকের নীরব-নিঃসৃত অশ্রুজলে সেই অনির্ব্বচনীয় কাহিনী নীরবে পরিব্যক্ত হয়। যখন হৃদয় প্রেম-ভরে উদ্বেল হয়,—আতট পরিপূর্ণ হয়,—হৃদয়ে যখন আর ধরে না, তখন নয়নে আপনা হইতেই ধারা বহে। উহা তখন লজ্জার উপদেশ ও নিন্দার শাসন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। কাহার সাধ্য প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অবরোধ করে ? এই নিমিত্তই প্রেমিকের মিলনে অশ্রু, বিরহে অশ্রু, সুখে ও দুঃখে সকল সময়েই উচ্ছ্বলিত অশ্রুজল। আমরা প্রীতির কথা কাব্যে শুনি ; হৃদয়ে কখনও অনুভব করি না। প্রীতি আমাদিগের নিকট আকাশ-কুসুম। আমরা কদাচিৎ কখনও উহার ক্ষণিক-স্পর্শে উন্মাদিত হইতে পারি। কিন্তু উহা আমাদিগের পাশব-সুখাসক্ত, দুরিত-দুর্গন্ধময়, নিরয়তুল্য হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়িনী হয় না। যে প্রীতি ইলোয়িসের * অনাঘ্রাত হৃদয়ে সুর-শৈবলিনীর অমল তরঙ্গে খেলা করিয়া অবলার আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে ;—যে প্রীতি জুলিয়তের নবকুসুমিত নবীন হৃদয়কে প্রবীণার প্রগাঢ়তম ভাবের ভারে স্পন্দহীন করিয়াছে ;—যে প্রীতি বিদর্ভরাজ-দুহিতাকে ভিখারিণীর বেশে বনে লইয়া গিয়াছে, এবং লোক-ললাম-ভূতা, সুখ-বর্দ্ধিতা দেস্‌দিমোনাকে প্রাণান্ত-দক্ষিণায়ও প্রীত রাখিতে পারিয়াছে,—হায় ! যে প্রীতির কণিকামাত্র লাভ করিয়া অবনী সময়ে সময়ে অমরাবতীর অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিয়াছে, যদি সেই আশাময়ী, আবেশময়ী ও অমৃতময়ী প্রীতিই আমাদিগের হৃদয়কে ভরিয়া রাখিত, আমাদিগের চক্ষু তাহা হইলে কখনও এইরূপ শিলাসম কঠিন রহিতে পারিত না।

ভবভূতির উত্তরচরিত অঙ্কে অঙ্কে ও অক্ষরে অক্ষরে অশ্রুজলে লিখিত। পাঠ সময়ে পাষাণেরও অশ্রুপাত না হইয়া পারে না। ইহা কেন ?—না, উহার সর্ব্বত্রই প্রেমের অপার্থিব তত্ত্বসুধা। প্রেমের চিত্র ও প্রেমের কবিতা অশ্রুজল ভিন্ন আর কিছুতেই লিখিত হয় না। যাহাকে লোকে আদিরসের আবিলতা বলে, তাহা অন্য বর্ণেই লিখিত হয় বটে ; কিন্তু প্রেমের আলেখ্য আর কোন বর্ণে ফলায় না। কালিদাস অতি তরলমতি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার সতৃষ্ণবিলোল-নয়না, লীলাময়ী কল্পনাও, 'পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা', বসন্ত-বিলাসিনী ব্রততীর ন্যায়, সকল সময়েই

* বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' মদন-পারিজাত ' ইলোইসের আখ্যায়িকা অবলম্বনে বিরচিত। যে সকল বঙ্গীয় পাঠক মদন-পারিজাত নামক খণ্ডকবিতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইলোইসের অসামান্য ত্যাগশীলতা এবং প্রেম-নিষ্ঠ মহিমার আংশিক পরিচয় পাইয়াছেন।

স্মিতমুখী। কিন্তু তথাপি, যখনই তিনি বীণার গভীর ঝঙ্কার দিয়া প্রেমের গভীর রাগের আলাপ করিতে যত্ন পাইয়াছেন, তাঁহার কল্পনার নেত্রযুগলও তখনই অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়াছে। যেমন সূর্য্যালোক-মণ্ডিত মেঘমালার হাস্যচ্ছটায় এবং তরুরাজির তদানীন্তন সহাস্য শ্যামল শোভায় বৃষ্টিধারা, তেমনই প্রেমিকের হর্ষোৎফুল্ল নয়নে আনন্দের অশ্রুধারা। যেন নয়নের একপ্রান্ত, আর রাখিতে না পারিয়া, অশ্রুবর্ষণ করিতেছে; এবং নয়নের আর এক প্রান্ত, আধ লুক্কায়িত রহিয়া সেই অশ্রুদর্শনে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। যেমন প্রভাত-কুমুদের মলিন মুখে বিষাদের বাষ্পবিন্দু, তেমনই প্রেমিকের বিরহ-তপ্ত নয়নপল্লবে হৃদ্গত দুঃখের বারিবিন্দু। উভয়ই দর্শনীয়,—উভয়ই ভাবুকজনের চিরস্পৃহনীয়।

অশ্রুজলে শোকের তর্পণ। সাবধান! শোকাকুলের পবিত্র হৃদয়কে কেহই সাংসারিক সুখের বৃথা প্ররোচনা দিয়া বঞ্চনা করিতে যত্ন পাইও না। তাহাকে নিভৃত নির্জ্জনে, নিঃশব্দ রোদনে, অবিরামবর্ষি অশ্রুজলে প্রিয়জনের তর্পণ করিতে দেও। সে তাহার হৃদয়-বাহিনী ফল্গুগঙ্গার অমল বারিতে অঞ্জলি পূরিয়া হৃদয়ারাধ্য প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে অর্পণ করুক; এবং মনুষ্য যে যেখানে আছে,—যে বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া, কুটচিন্তার আবর্ত্ত-জলে হাবু ডুবু খাইয়া এবং সংসারের তমসাচ্ছন্ন তরঙ্গরাজিতে আহত ও প্রত্যাহত, উৎক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎকে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিতেছে, সে প্রকৃতিপ্রণোদিত, প্রকৃতির অকর্ণশ্রুত—অভ্রান্ত মন্ত্রে দীক্ষিত মানব-হৃদয়ের এই অন্তর্গূঢ় ও আশাপ্রদ, প্রাকৃত আরাধনা দেখিয়া আশায় উল্লসিত হউক।

আর এক কথা এই, মনুষ্য-সমাজ বহু কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে। মনুষ্যের স্নেহে আর বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধায় আর প্রত্যয় নাই, মনুষ্যের কিছুতেই শুদ্ধি, সারবত্তা ও নির্ম্মল স্বর্ণের কান্তি নাই, এই শ্রুতিকঠোর-বিলাপধ্বনি মনুষ্য জগতের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মনুষ্য সর্প, মনুষ্য সর্প হইতেও খল,—মনুষ্যের সংসর্গ পরিহার কর, মনুষ্য হইতে দূরে রহ, মনুষ্য-নিবাস পরিত্যাগ করিয়া বন্য জীবের বিজন-বাসে চলিয়া যাও, বৈরাগ্যের এইরূপ নিষ্ঠুর কথা গৃহে গৃহে নিনাদিত হইতেছে। যে জগতে মনুষ্যের এত নিন্দা, এত কলঙ্ক, সেই জগতে মনুষ্যের মর্ম্ম-নিহিত-মমতার শোকাশ্রু দেখিয়া দুঃখিত হইও না। সগরবংশের স্তূপীকৃত ভস্ম-রাশি গঙ্গা-জল-স্পর্শে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল; মনুষ্য-হৃদয়ের ভস্মীভূত আশা ও আকাঙ্ক্ষাও শোকাশ্রুর স্বর্গীয় সলিলস্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। অতএব শোকাশ্রুর সম্মান কর।

অনুতাপীর মুক্তিপ্রবাহও অশ্রুজলে। দগ্ধ মেদিনী অবিরল-পতিত বৃষ্টি-ধারায় অভিষিক্ত না হইলে শস্যশোভা এবং ফল-পুষ্পে সুশোভিত হয় না;—দুষ্কৃতির মুর্ম্মুর-দাহনে ততোধিক দগ্ধ মনুষ্যহৃদয়ও অশ্রুজলে না ভিজিলে, মনুষ্যোচিত মহত্ত্ব, মনুষ্যোচিত দয়াদাক্ষিণ্য এবং স্নেহমমতাদি কমনীয় কুসুমে শোভান্বিত হইতে পারে

না। মনুষ্য যখন আত্ম-গ্লানির অগ্নিকুণ্ডে অঙ্গারতুল্য হইয়া আত্মার পুনঃশুদ্ধির জন্য অশ্রুজলে স্নান করে,—হৃদয়ের অঙ্গার-কালিমা প্রক্ষালনের জন্য ধারায় অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করে;—যে হস্ত মনুষ্যের শান্তির পথে কাঁটা দেওয়া এবং মনুষ্যের অন্তরতম সুখে আঘাত করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে অগ্রসর হইত না, যখন সেই হস্ত পুনরায় মনুষ্যের উপকার-ব্রতে ব্রতী হয়;—যে জিহ্বা পূর্ব্বে কদর্য্যপঙ্ক অথবা কালকূট গরল বই আর কিছুই বর্ষণ করিতে জানিত না, যখন সেই জিহ্বা পুনরায় পীযূষবর্ষিণী হয়;—যে দৃষ্টি পূর্ব্বে সূচির ন্যায় তীক্ষ্ণধারে মনুষ্যচিত্তে বিদ্ধ হইত, যখন সেই দৃষ্টি পুনরায় শারদগগণের চন্দ্রকিরণবৎ মনুষ্যচিত্তে সুস্নিগ্ধ অনুভূত হয়;—যে মনুষ্য পৃথিবীতে পূর্ব্বে পিশাচ কি অসুরের অবতার বলিয়া সকলের ঘৃণা কিংবা শঙ্কার কারণ হইত, যখন সেই মনুষ্য অশ্রুময়ী মন্দাকিনীর পুণ্যোদকে অবগাহন করিয়া মূর্ত্তিমান্ মঙ্গল-স্বরূপ পুনরুত্থিত হয়,তখন স্বর্গে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে থাকে, প্রীতি হর্ষভরে পুষ্পবৃষ্টি করে, এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির সম্মিলিত হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করে।

এই জন্যই বলিয়াছি যে, তোমার মণি-মুক্তার মোহন-মালা দূরে রাখ; আমি একবার নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই। অশ্রু-জলের অসূত্র-গ্রথিত অপূর্ব্ব মালা কণ্ঠে পরিতে পারিলে, কারুকরের কৃত্রিম আভরণে আর প্রয়োজন কি? দয়া যদি নয়নে বহে, প্রীতি যদি মুখচ্ছবিতে বিলসিত রহে, এবং হৃদয় যদি প্রক্ষালিত ও পরিশোধিত হইয়া প্রসন্নজ্যোতিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে আভরণের আর অভাব কি?

যাঁহারা বীর-ধর্ম্মে অনুরক্ত, বীরাচার-পরায়ণ এবং পৌরুষ-মহিমার উপাসনাই যাঁহাদিগের এক মাত্র উপাসনা, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও অশ্রুবর্ষণে লজ্জা ও অশ্রু দর্শনে ঘৃণা হয়; এবং যাঁহাকে তাঁহারা অশ্রুজলে আপ্লুত দেখেন, তাঁহাকে অকৃতী, অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বলমনা বলিয়া তাঁহারা অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন। অহো! মনুষ্যের কি ভ্রম! যখন অনন্য-সাধারণশক্তি-সম্পন্ন, বীর হৃদয় রিয়েন্জী, ইটালীর পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া, এবং প্রাণগত যত্ন-সত্ত্বেও পরিশেষে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া, ইটালীর দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, তাঁহার পৌরুষী প্রতিভা তখন উজ্জ্বলতর আলোকে আলোকিত হইয়াছিল—না,লজ্জায় হীনপ্রভ হইয়াছিল? যখন অক্ষয়কীর্ত্তি ইপ্সিলান্তি কারাবাসের আশঙ্কিত অন্ধকারে, নৈরাশ্যের অরুন্তুদ বেদনায়, পর-প্রহার-নিগৃহীত স্বজাতির জন্য অশ্রু-মোচন করিয়াছিলেন, তখন কে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্টি-পাত করিয়াছিল? যখন জুলিয়স ফাবর, ফ্রান্সের ক্ষতদেহে ঔষধ লেপনের উদ্দেশ্যে অশেষ বিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, ক্ষতবিক্ষত ফ্রান্সের অবস্থা স্মরণে শত্রুর নিকট অশ্রুত্যাগ করিলেন, তাঁহার চারিত্র-গৌরব ও মানসিক সামর্থ্য তখন অধিকতর শোভা পাইয়াছিল,—না, লজ্জাবশে নুইয়া পড়িয়াছিল? যেমন প্রকৃত গৌরবান্বিত,

উন্নত পুরুষেরা বিনয়ে অবনত হইতে লজ্জা অনুভব করেন না ; সেইরূপ যাঁহারা প্রকৃত বীরপ্রাণ, প্রধান পুরুষ, তাঁহারাও হৃদয়ের উদ্বেলতায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লজ্জিত হন না। বীর-ধর্ম্ম অশ্রু জলের বিরোধী নহে। অশ্রুজলে উহার পুষ্টি,— অশ্রুজলেই অনেক স্থলে উহার বিকাশ। যে দেশের মৃত্তিকা বীরের নয়ন-নীরে আর্দ্র হয় না, সেখানে আর যে কোন ফল ফলুক, স্বাধীনতার স্বর্গীয়শোভাময়ী কল্পলতা কখনও তথায় অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে পারে না। ইতিহাস এই কথার সাক্ষি-স্থলে দণ্ডায়মান। জগতের যে কোন দেশকে এইক্ষণ স্বাধীনতার সম্পদনিচয়ে বিভূষিত দেখিতেছ, সেই দেশেরই এই কাহিনী। মনুষ্য দেখে নাই, কিন্তু সর্ব্বসাক্ষী ইতিহাস দেখিয়াছেন যে, তথাকার অগ্রগণ্য পুরুষেরা, যামিনীর অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া, জননী জন্মভূমির প্রীত্যর্থে অশ্রুজলে তর্পণ করিয়াছেন ; এবং সেই তর্পণেই মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হইয়াছে,—মৃতদেহের শত খণ্ডে বিভক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পুনরায় যোড়া লাগিয়াছে, এবং বরাভয়-করা, বীরারাধ্যা আদ্যাশক্তি প্রফুল্ল ও প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎকারপ্রদানে তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

অশ্রু ঝরে কার ?—না, যার হৃদয় আছে। মনুষ্য কে ?—না, যে হৃদয়বান্। যে সাধনা অথবা যে তপস্যায় হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সাধনা অথবা সেই তপস্যায় আবার সিদ্ধি ও ইষ্ট ফল কি ? শব্দে শ্রুতি-বিনোদন হয়। কিন্তু হৃদয় ভিন্ন হৃদয়কে জাগাইতে পারে কিসে ? মনুষ্যসমাজ যেসকল ভুবন-বিশ্রুত, ভয়াবহ বিপ্লবে আমূল বিলোড়িত হইয়াছে,— যে সকল অভাবনীয় বিপ্লব সৃষ্টি ও অসৃষ্টি এবং অন্ধকার ও আলোককে এক করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, নূতন গড়িয়া, মনুষ্য-সমাজকে নূতন মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছে,—যাহার অপ্রতিহত প্রভাবে জাতির উৎপত্তি কি জাতির বিলয়, ধর্ম্মের পুনঃসংস্করণ, নীতিশাস্ত্রের পুনঃশোধন, রাজনীতির নূতনগ্রন্থন, এবং স্বাধীনতার চিরবিদ্বেষিণী দানবী ক্ষমতার বিনাশ-সাধনরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় ফল ফলিয়াছে, একীভূত জাতীয় হৃদয়ের অন্তস্তল-বিলোড়নই তাহার একমাত্র কারণ ;—এবং যাঁহারা ঝটিকার পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া জাতিবিশেষের হৃদয়-বিলোড়নে অগ্রসর হইয়াছেন, বজ্র বিদ্যুৎ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছেন, বিঘ্নে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন, বিপত্তিকে আদর করিয়া মাথায় লইয়াছেন, অথবা আপনার হৃৎপিণ্ডকে হৃদয়-গ্রন্থি হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া শক্তির নিকট বলি স্বরূপ উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হৃদয়বান্। তাঁহাদিগের চক্ষু হইতে দয়ার অশ্রু, প্রেমের অশ্রু অথবা জাতীয় অনুরাগের উষ্ণ অশ্রু ধারায় বহিয়াছে, এবং সেই অশ্রু-ধারাই জাতীয় হৃদয়ে প্রমত্ত বেগে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীর পাপ, তাপ ধুইয়া নিয়াছে। ধন্য সেই পবিত্র অশ্রু! ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা স্বদেশ, স্বজাতি, কিংবা দেশনির্ব্বিশেষ ও জাতিনির্ব্বিশেষ মনুষ্যের জন্য ঐরূপে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন।

জয়পুর।

পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম খণ্ডের ২৪ পৃষ্ঠার পর।

জয়সিংহের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরী সিংহ জয়পুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি সুবিস্তীর্ণ রাজ্য, পরিপূর্ণ ধনাগার, সদ্‌গুণশালী মন্ত্রীবর্গ এবং সুশিক্ষিত সৈন্য সামন্ত প্রাপ্ত হইয়াও নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠাধিকার-ব্যবস্থানুসারে ঈশ্বরী সিংহ সিংহাসনের সম্পূর্ণ অধিকারী। মধু সিংহ নামক তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁহাকে সুখ সন্তোষ লাভ করিতে দেন নাই। মধু সিংহ মিবারের মহারাণার ভগিনীর গর্ভজাত, সুতরাং তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ না হইয়াও আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠবল ও অত্যন্ত প্রবল। তিনি মিবারের মহারাণার ভাগিনেয়। ঈশ্বরী সিংহ তেজস্বিনী বুদ্ধি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, তিনি কখন বীরত্বের পরিচয় দান করিতে পারেন নাই। বরং আরদালী আক্রমণ সময়ে লোকে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল। অধিক কি বলিব, যখন প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বীর্য্যবতী সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণাপ্রকাশ পূর্ব্বক ভৎর্সনা বাক্যে অভ্যর্থনা করেন। ফলতঃ সাধারণে তাঁহাকে জয় সিংহের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিত না। জয় সিংহ জীবিত সময়ে মধু সিংহকে টঙ্ক, রামপুর, ফাগী ও মালপুর এই চারিটী প্রদেশ দান করিয়া গিয়াছিলেন। মিবারের মধ্যে রাণাও তাঁহাকে কয়টি প্রদেশ প্রদান করেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন ও সিংহাসন প্রাপ্তির সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় দলপতি হোলকার মধু সিংহের ঐ কয়টি পরগণা ও চতুরশীতি লক্ষ মুদ্রা আত্মসাৎ করেন। বলা বাহুল্য যে এইরূপ বিবিধ কৌশল পরম্পরার সহায়তায় মধু সিংহ সিংহাসন লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

মধুসিংহ অম্বর রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বিদ্যা বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে গৃহছিদ্র দেখাইয়া ভাল করেন নাই। রাঠোরদিগের সহিত মিলিত হইয়া তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের দর্প চূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং তিনি যেপ্রকার বলবীর্য্য সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে বোধহয় চেষ্টা করিলে মনোরথ সিদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে চেষ্টা করিবার সময় পান নাই। প্রতিবাসী জাঠেরা এই সময় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে; তাহাদিগকে দমন করিতে তাঁহার পূর্ব্ব মনোরথ প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে জাঠদিগের অভ্যুদয় বিবরণ সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইল।

জাঠেরা এক সময়ে ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে গণনীয় ছিল। কালক্রমে তাহাদিগের সে মানসম্ভ্রম বিলোপ প্রাপ্ত হইলে তাহারা কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। এই সময়ে ভূস্বামীবর্গের উৎপীড়ন নিবারণের জন্য তাহারা প্রথমে দলবদ্ধ হয়। যে সাহস-সম্পন্ন ব্যক্তি হল-যন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনচিত্ত স্বজাতীয়দিগকে উৎপীড়কদিগের প্রতি অস্ত্র সঞ্চালন করিবার শিক্ষা প্রদান করে, যাহার উৎসাহে জাঠদিগের হৃদয়-চুন্নিস্থিত অস্ফুট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধক্ ধক্ করিয়া শিখা বিস্তার পূর্ব্বক পৃথিবীতে তাহাদের জাতিগৌরব সংস্থাপন করিয়া গিয়াছে, সেই সাহসিক বীর পুরুষের নাম চূড়ামন্। যৎকালে সম্রাট আরঙ্গজীবের পুত্র পৌত্রগণ সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য গৃহবিগ্রহে ব্যস্ত, সেই সময়ে জাঠেরা থুল ও সিন্‌সিনি গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহারা প্রথমে ভূস্বামিদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে আপনারা এরূপ দৌরাত্ম্যকারী হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনধিক কাল মধ্যে তাহারা "কজ্জাক্" অর্থাৎ তস্কর এই উপাধি প্রতিবেশবাসীদিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের উৎপাতে রাজপথে লোক যাতায়াতের ঘোরতর বিঘ্ন হইয়া উঠিল। এই সময়ে সায়দেরা সম্রাট সভার অধিনায়ক ছিলেন। অবিলম্বে থুল ও সিন্‌সিনি দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্ব্বৃত্ত জাঠদিগকে দমন করিবার জন্য সায়দেরা অম্বরেশ্বর জয়সিংহের প্রতি আদেশ প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহ এক কালে উভয় দুর্গই আক্রমণ করিলেন। ভাবি কালে ভরতপুরের মৃন্ময় দুর্গ ইংরেজদিগের কর-কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাঠেরা যে অমিত পরাক্রম ও অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অসাধারণ বলিয়া পরিচিত আছে। যে পরাক্রমের প্রভাব-সম্মুখে বজ্রবিদ্যুত্পাণি ইউরোপীয় সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল, অধিক কি কহিব, যাহাদিগের পরাক্রমে বলবুদ্ধিসম্পন্ন বীর্য্যবান দিগ্বিজয়ী সেনাপতি লেক হিম্‌সিম্ খাইয়া গিয়াছেন, সেই জাঠপরাক্রমের শৈশব সময়েও এই দুই ক্ষুদ্র মৃন্ময় দুর্গ রক্ষার জন্য জাঠেরা অদ্ভুত পরাক্রম ও রণকৌশল দেখাইয়া ভাবি উন্নতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। জ্যোতিষরাজ জয়সিংহ ক্রমাগত এক বৎসরকাল ঐ দুর্গদ্বয় আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বীর চূড়ামণি চূড়ামনের কৌশলে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। অকৃতকার্য্যতায় লজ্জিত হইয়া অম্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। চূড়ামনের কনিষ্ঠ সহোদর বদনসিংহ, কোন প্রকার অন্যায় কর্ম্ম করায় জ্যেষ্ঠকর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হয়। কতিপয় জাঠভৌমিকের অনুরোধে চূড়ামন তাহাকে কারামুক্ত করেন। বদন মুক্তিলাভ করিয়াই অম্বরে গমনপূর্ব্বক জয়সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্ব্ব হইতেই জয়সিংহের মনে বিলক্ষণ ক্ষোভ ছিল, সময় পাইয়া বদনের সহায়তা করিতে কাল বিলম্ব করিলেন না। অবিলম্বে সৈন্য সামন্ত লইয়া থুল দুর্গ আক্রমণ করিলেন, এবং

ক্রমাগত ছয়মাসকাল পরিশ্রমের পর দুর্গজয়ে কৃতকার্য্য হইলেন। থুলদুর্গ ভূমিসাৎ করা হইল; চূড়ামন ও তদীয় পুত্র মোখনসিংহ পলায়ন করিলেন। বদনসিংহ রাজোপাধি ধারণ করিয়া জয়সিংহ কর্ত্তৃক দিগনগরে রাজটীকা প্রাপ্ত হইলেন। বদনসিংহের অনেকগুলি সন্তান সন্ততি হয়, তন্মধ্যে সূর্য্যমল, শোভারাম, প্রতাপ ও বীরনারায়ণ এই চারি জন সমধিক খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বদন অনেকগুলি প্রদেশ করতলস্থ করিয়াছিলেন। মৃত্যুসময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যমলকে স্বীয় পদের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ওয়ার প্রদেশে একটি দুর্গ সংস্থাপন করিয়া তাহা প্রতাপকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

সূর্য্যমল পিতার ন্যায় সাহস ও বলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। ভরতপুরের দুর্গে কায়মা নামক একজন স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি বাস করিতেন। সূর্য্যমল প্রথমেই তাঁহাকে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। ভবিষ্যতে এই ভরতপুর জাঠদিগের সুবিখ্যাত রাজধানী ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটি গণনীয় নগর হইয়াছিল। তাঁহার সাহসের কথা কি বলিব, তিনি ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে দিল্লী নগর আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তিনি মৃগয়ায় ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে কতিপয় বেলুচীজাতীয় অশ্বারোহী সেনার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। তাঁহার পাঁচ পুত্র— জোয়াহির সিংহ, রতনসিংহ, নঁওল সিংহ, নাহরসিংহ এবং রণজিৎ সিংহ। এতদ্ব্যতীত হরদেওবক্স নামে তাঁহার এক পালক পুত্র ছিল। বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। ঐ পঞ্চপুত্র মধ্যে প্রথম দুইজন কুর্ম্মীজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত, তৃতীয় পুত্র এক মালিনীর গর্ভজ, শেষ পুত্রদ্বয় স্বজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

জোয়াহির যে সময়ে জাঠদিগের অধীশ্বর হন, সে সময়ে জয়পুরের সিংহাসনে মধুসিংহ আসীন ছিলেন। এই সময়ে প্রতিবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তারের ইচ্ছা জাঠদিগের মনে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। সময়ক্রমে তাহার দুই একটি কারণও উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য মধুসিংহ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। জাঠরাজ যাহাতে তাঁহার ঐ সঙ্কল্প সিদ্ধ না হয়, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। বোধ হয় এ বিষয়ে তাঁহার নিজেরই সঙ্কল্প ছিল। এদিকে মাচেরী প্রদেশের অধ্যক্ষ নারুকবংশীয় প্রতাপসিংহ অম্বরেশ্বরকর্ত্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়া স্বগণসমভিব্যাহারে জাঠরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জোয়াহির সিংহ এই ব্যাপারকেও একটি ছিদ্র মনে করিয়া লইলেন। কাহারও সহিত বিবাদ বাধাইবার একান্ত ইচ্ছা হইলে সূত্র পাইতে বিলম্ব হয় না। জোয়াহির সিংহ ব্যাপারটি আরও ক্রমে পাকাপাকী করিয়া তুলিলেন। কামোনা প্রদেশ আপনার অধিকারভুক্ত করিবার জন্য জোয়াহির সিংহ মধুসিংহের নিকট বার বার প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। মধুসিংহ জাঠদিগের ভয়ে কাঁপিবার লোক ছিলেন না। জাঠেশ্বরের

প্রার্থনা তুচ্ছ করিলেন। জোয়াহির জয়পুর রাজের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া পবিত্র পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন। কোন রাজা অন্য রাজার অধিকার মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া উচিত,নতুবা অবজ্ঞা প্রকাশ হয়। জোয়াহির এই অযথা ব্যবহার দ্বারা মধুসিংহের যার পর নাই অবমাননা করিলেন। সে সময়ে মাড়োয়ারের রাজা বিজয়সিংহ পুষ্করতীর্থে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জাঠরাজকে পদ, মর্য্যাদা ও আভিজাত্যে আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট জানিয়াও তাঁহার সহিত উষ্ণীষ পরিবর্ত্ত করিয়া সৌভ্রাত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন *। জাঠরাজ অহঙ্কারে একবারে ফাটিয়া পড়িলেন। জয়পুরাধিপতি মধুসিংহ এসময়ে শারীরিক অসুস্থ ছিলেন, হরসহায় ও গুরুসহায় নামক সহোদরদ্বয় রাজার অতি বিশ্বাসপাত্র ছিলেন, সকল বিষয়েই তাঁহারা রাজার আজ্ঞা লইয়া কায করিতেন। তাঁহারা উদ্ধত জাঠের অযথা ব্যবহার রাজসমীপে নিবেদন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে মধুসিংহ কহিলেন, জোয়াহিরকে পত্র লিখিয়া পাঠাও, যেন তিনি আর আমাদের অধিকারের মধ্য দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন না করেন। দ্বিতীয়বার এরূপ ব্যবহার হইলে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা যাইবে। জোয়াহির সে পত্র গ্রাহ্য করিবার লোক নহেন। একে জয়পুরের সুশিক্ষিত সেনা ও সেনানায়কদিগের সমক্ষে আপনার অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দিবার জন্য উৎসুক,তাহাতে আবার মাড়োয়ারের রাজা বিজয়সিংহের স্নেহব্যবহারে গর্ব্বগিরির শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছেন, মধুসিংহের পত্র কেন গ্রাহ্য করিবেন? হলায়ুধ জাঠ এখন অস্ত্র ধরিতে শিখিয়াছে, সফরী ফর্‌ফরাইতে শিখিয়াছে,—মধুসিংহের পত্র সে গ্রাহ্য করিবে কেন? জাঠেশ্বর সগর্ব্বে জয়পুররাজ্যের মধ্য দিয়া আপন অধিকারে প্রত্যাগমন করিল। মধুসিংহ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধঘোষণা করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাতরঙ্গে দেশ প্লাবিত হইল, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল; অসভ্য হলযন্ত্রধারী জাঠের নিকট মধুসিংহের পরাজয় মানিতে আর অধিকক্ষণ বিলম্ব নাই,এমন সময়ে,—জগদীশ্বরের ইচ্ছায় (তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে এমন হইবে কেন?) এরূপ একটি কারণ ঘটিল *।

* রাজপুতদিগের আত্যান্তিকী আত্মীয়তা দেখাইতে হইলে পরস্পর উষ্ণীষ পরিবর্ত্তনের প্রথা আছে। যাহার সহিত এরূপ ব্যবহার হয় তাহাকে "পাগ্‌ড়ী বদল ভাই" বলে। সুতরাং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত এরূপ ব্যবহার হইলে শ্লাঘার বিষয় বলিতে হইবে।

* মাচেরী প্রদেশ জয়পুরের অন্তর্গত। তথাকার অধ্যক্ষ প্রতাপসিংহ কৌশল্যারাম ও নন্দরাম নামে দুইজন বিশ্বাসী প্রিয়পাত্র সমভিব্যাহারে জাঠদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাঠেরা বিনা অনুমতিতে জয়পুর রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজপুতজাতির যে অবমাননা করে, তাহাতে মাচেরীর অধ্যক্ষ মনে মনে জাঠদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন। যুদ্ধ সময়ে তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মধুসিংহের

যে, বিজয়লক্ষ্মী জয়পুরের অঙ্কশায়িনী হইলেন, জাঠেশ্বর চিরকালের জন্য পলায়ন করিলেন। মধুসিংহের জয়লাভ হইল।

জোয়াহিরের সহোদর রতনসিংহ জাঠরাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। বৃন্দাবন হইতে এক ভণ্ডসন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়। রাজার নিকট সে এরূপ ভাণ করে যে, তাহাকে লৌহ আদি যে কোন ধাতু দেও, সে তাহা কোন প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সুবর্ণে পরিণত করিতে পারে। রতনসিংহ তাহাতেই ভুলিয়া গেলেন। যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য নিত্য নিত্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। যে দিন শেষকার্য্য সমাধা হইবে, সেই দিন রাজা একাকী সন্ন্যাসীর প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। সন্ন্যাসী দেখিল বিষম বিভ্রাট, অদ্য তাহার সমুদায় কৌশল প্রকাশ হইয়া পড়িবে; তাহা হইলেই রাজদণ্ডে নিগৃহীত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া সে রাজার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করতঃ পলায়ন করিল। রতনসিংহের পুত্র কেশরীসিংহ ও পৌত্র রণজিতসিংহ ক্রমান্বয়ে সিংহাসনারোহণ করেন। ভরতপুরদুর্গরক্ষার সময়ে সেনাপতি লেকের বিপক্ষে মহাবীর রণজিত অস্ত্রধারণ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র—রণধীর, বলদেব, হরদেব, লক্ষ্মণ। রণধীর রাজা হইলেন, রণধীরের মৃত্যুর পর তদীয় শিশু সন্তান সিংহাসনে

দলে যোগ দেন। যুদ্ধসমাপ্তির পর মধুসিংহ প্রতাপের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনরায় মাচেরীর অধ্যক্ষতাপদে স্থাপিত করেন।

আরোহণ করেন। তদীয় পিতৃব্য রাজ্য মধ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া পড়েন। তাঁহাকেই পদচ্যুত করিবার জন্য ইংরেজসৈন্য ভরতপুর উৎসন্ন করে।

মধুসিংহ অনেক দিন হইতে উদরাময় রোগ ভোগ করিতেছিলেন। জাঠদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবার চারি দিবস পরে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হন। তিনি সপ্তদশ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পর হইতেই কচ্ছবহ বংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। তিনি অনেক গুলি নগর সংস্থাপন করিয়া যান, তন্মধ্যে সুবিখ্যাত রিন্থম্বোর দুর্গের নিকটবর্ত্তী মধুপুর নগর স্থাপনা দ্বারা রাজপুতানা রাজ্যের বাণিজ্যের সাতিশয় উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। পিতার ন্যায় তিনিও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন, দীর্ঘজীবী হইলে তাহার অনেক পরিচয় দিয়া যাইতে পারিতেন।

মধুসিংহের পুত্র অপ্রাপ্তব্যবহার পৃথ্বিসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বিমাতা অভিভাবিকা হইলেন। বিমাতার প্রতাপ নামে একটী অতিশিশু পুত্র ছিল। কর্ত্রী ঠাকুরাণী রাজ্যশাসনোপযোগিনী অনেক শক্তি ধারণ করিতেন, কিন্তু তিনি নীচগামিনী হইয়া রাজ্যের অনেক প্রকার অপকার করিয়া গিয়াছেন। ফিরোজ নামা এক জন হস্তিপকের সহিত তাঁহার অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছিল; তাহাকে তিনি মন্ত্রীসভার সভ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে জয়পুর-অধিকারভুক্ত সর্দ্দার ও জায়গিরদারেরা যার পর নাই বিরক্ত হইয়া রাজসভা

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,দুশ্চরিত্রা তাহাতে কিছু মাত্র উন্মনা হয় নাই ; বরং অম্বাজীর অধীনে কতকগুলি সেনা প্রদান করিয়া অতি কৌতূহল সহকারে কর আদায় করিতে লাগিল। এই সময়ে আরুতরাম মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ও কৌশল্যারাম মন্ত্রী-সভার একজন সভ্য ছিলেন। ইহাঁরা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিজ্ঞ হইলেও হস্তিপকের অনুমতি ভিন্ন কোন রাজ কার্য্যই সম্পাদিত হইত না। নয়বৎসরকাল এইরূপ গোলযোগে চলিত লাগিল, এমন সময়ে হঠাৎ এক দিন পৃথ্বিসিংহ অশ্ব হইতে পতিত হইয়া বিগতজীবিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে সকলে এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, যে রাণী স্বীয় গর্ভজাত প্রতাপসিংহের জন্য সিংহাসন লাভ প্রত্যাশায় বিষপ্রয়োগ দ্বারা সপত্নী-পুত্রের জীবন বিনাশ করিয়াছেন। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের কিছুই অসাধ্য নহে। সুতরাং এরূপ জনরব নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়াও বোধ হয় না। যশোরাশি জয়সিংহের পুত্রবধূ এবং তদীয় উপযুক্ত পুত্র মধুসিংহের স্ত্রীর এবম্বিধ কলঙ্কিত চরিত্র বর্ণন করিতে মনে বার বার ঘৃণার উদ্রেক হয়, কিন্তু ইতিহাসের সহিত ইহার এরূপ দৃঢ়বদ্ধ সম্বন্ধ রহিয়াছে, যে না লিখিলেও চলে না। পৃথ্বিসিংহের অতি অল্প বয়সেই দুইটি বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমটি বিকানীরে ও দ্বিতীয়টি কৃষ্ণগড়ের রাজসংসারে। দ্বিতীয়া রমণীর গর্ভে মানসিংহ নামে এক পুত্র জন্মে—এই পুত্রটি কলঙ্কিনীর চক্ষুশূল হইয়াছিল। এই শিশুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তদীয় মাতুলালয়ে তাহাকে রাখিয়া আসে। কিন্তু তাহাও নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া শিশুকে গোয়ালিয়ারের অধিপতি সিন্ধিয়ার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। *

অবিলম্বেই ব্যভিচারিণী কর্তৃক প্রতাপসিংহ সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। হস্তিপক সর্ব্বে সর্ব্বাই রহিল। কৌশল্যারাম রাজোপাধি ধারণ করিয়া প্রধান মন্ত্রীত্ব পদে অধিরোহণ করিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া রারা কৌশল্যারাম ফিরোজকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবলম্বিত কৌশল পরম্পরা দ্বারা মনোরথ সিদ্ধ হইল, অপিচ তাঁহার পূর্ব্বস্বামী মাচেরীর অধ্যক্ষ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে নজিফ খাঁ সম্রাটের প্রধানসেনাপতি ছিলেন। ইনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তা বলে আগরা নগর হইতে জাঠদিগকে দূর করিয়া দিলেন,

* দুইবার এরূপ অবসর হইয়াছিল যে, বিশেষ রূপে চেষ্টা করিলে এই বালক মানসিংহ জয়পুরের সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে যখন জয়পুরীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ দুর্ব্বৃত্ত জগৎসিংহের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাকে সিংহাসন চ্যুত করিতে চাহেন ; ১৮২০অব্দে ঐ দুর্ব্বৃত্তের মৃত্যুর পর, এই দুইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। শেষবারে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু বালকের যথার্থ সত্ব কেন বিচারিত হইল না জানিতে পারা যায় না। টড সাহেব বলেন—সে সময়ে কেহ ইংরাজদের নিকট বালকের যথার্থ সত্ব বুঝাইয়া দেয় নাই।

এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিজয়ী হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সম্রাটের সেনাদল কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে কৌশল্যারামের পরামর্শ ক্রমে মাচেরীর অধ্যক্ষ সসৈন্যে তাহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। এইরূপ অচিন্তনীয় সাময়িক বলযোজনায় সম্রাটের পক্ষে জয় লাভ হইল। নজিফ খাঁ প্রীত হইয়া সম্রাট সমীপে মাচেরী স্বামীর গুণবর্ণনা করিলে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে জয়পুরের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিয়া দিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে তিনি রাও রাজা উপাধি এবং রাজসনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। কৌশল্যারাম অম্বরের যাবতীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া সম্রাট সেনার পৃষ্ঠবল হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দুশ্চারিণী তাহাতে কোন প্রকার প্রতিবাদ করিল না, কিন্তু সেই সুসজ্জিত সেনা সমূহের অধিনায়ত্ব পদে রাজা কৌশল্যারামকে স্থাপিত না করিয়া আপনার প্রণয় ভাজন হস্তিপককে বরণ করিল। কৌশল্যারাম ইহাতে নিতান্ত অপমানিত হইলেন। কিন্তু এই উন্নতি ফিরোজের পতনের কারণ হইয়াছিল। ফিরোজ, অম্বরসেনার অধিনায়কত্ব পদে আপনাকে স্থাপিত দেখিয়া গর্ব্বে ফাটিয়া পড়িল। সম্রাটশিবিরে মাচেরীর অধ্যক্ষ রাওরাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে যেন উভয়েই সমকক্ষ এইরূপ ভাবে সগর্ব্বে আলাপ করিল। রাও রাজা ইহাতে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ফিরোজের বধ সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য সেই নরাধমের সহিত আত্মীয়তা বৃদ্ধি করিতে করিতে রাওরাজার প্রতি ফিরোজের যার পর নাই বিশ্বাস সংস্থাপিত হইল। এই সময়ে এক দিন বিষপ্রয়োগ দ্বারা ফিরোজকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিলেন। এ শোক হস্তিপমহিষী সহ্য করিতে পারিল না, অল্পদিন পরেই কলঙ্কিনী বিগতজীবিতা হইয়া পৃথিবীর ভার লাঘব ও নরকের প্রজা বৃদ্ধি করিল। কৌশল্যারাম ও রাওরাজা উভয়ে মিলিত হইয়া অম্বরের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রতাপ সিংহ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, মন্ত্রীদ্বয় ক্রমে ক্রমে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল, উভয়ের মধ্যে দিন দিন বিবাদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হামাদান খাঁ ক্রমে সম্রাটের সেনানায়ক হইলেন। কৌশল্যারাম তাঁহার সহিত যোগ দিলেন; রাওরাজা মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিলিত হইলেন। অদ্য এক চক্রান্ত হয়, কল্য তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। প্রতাপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপে চলিল। প্রতাপ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া যথেচ্ছাচার মন্ত্রীদিগের অধীনতাবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। প্রতাপের তেজস্বিনী বুদ্ধি, রাজদণ্ডধারণের উপযোগিনী শক্তি, ও রণদক্ষতা ছিল। তিনি টোঙ্গা নামক স্থানে এক ঘোরতর যুদ্ধে সম্রাটসেনা ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজয় করিয়া কিছু দিনের জন্য চক্রান্তভেদ ও শত্রুশূন্য করিয়াছিলেন। তিনি পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন; প্রতাপ অতি বীর্য্যবান ও রাজনীতিজ্ঞ

ছিলেন। তাহার রাজ্যের উপরে অনেক বিদেশীয় শত্রুর চক্ষু পড়িয়াছিল; এবং রাজ্যের অভ্যন্তরেও সর্দার ও জায়গীরদারগণের মধ্যে একতাবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। মাচেরী করবহিষ্কৃত হওয়ায় জয়পুর রাজ্য সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতাপের রাজত্ব সময়ে জয়পুর-ধনাগারের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। দুইবারে মহারাষ্ট্রীয়দিগকেই অশীতি লক্ষ মুদ্রা দিতে হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে মধুসিংহ সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য রাজকোষ হইতে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া যান, তথাপি অপর ধনাগারে এত অর্থ ছিল যে প্রতাপ টোঙ্গা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শুদ্ধ ধর্ম্মোদ্দেশে চতুর্বিংশতি লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

১৭৯১ খৃঃঅব্দে পাটনের যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয়, রাঠোরদিগের সহিত বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তকাজী হোলকার জয়পুর আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ লইয়া যান, অধিকন্তু বর্ষে বর্ষে কর স্বরূপে কতক অর্থ পাইবার নিয়ম করেন। ইহার পর প্রতাপের মৃত্যু পর্য্যন্ত সিন্ধিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার আক্রমণ করিয়া জয়পুরকে শ্রীভ্রষ্ট করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে প্রতাপের মৃত্যু হয়।

জগৎসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহাঁর ন্যায় দুষ্ক্রিয়াশালী অযোগ্য নরপতি আর কখনও জয়পুর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ইনি সপ্তদশবর্ষ রাজত্ব করেন। এই রাজত্বসময়ে কেবল বিদেশীয়ের আক্রমণ, নগর লুণ্ঠন, চক্রান্ত, যুদ্ধ এই সকল ঘোর অত্যাচার সম্বলিত দুষ্কার্য্যের নিতান্ত প্রবলতা হইয়াছিল। কখন কখন দৈনিক আক্‌বরে অর্থাৎ সংবাদপত্রে রাজঅন্তঃপুরের ঘৃণাজনক সংবাদ, রসকর্পূর নাম্নী রাজউপপত্নীর সহিত লম্পটশিরোমণি জগতসিংহের রসাভাব প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাপারেই পূর্ণ হইয়া যাইত। জয়মন্দিরে ন্যস্ত অর্থ সকল জঘন্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইতে লাগিল। জয়সিংহ নির্ম্মিত জগদ্বিখ্যাত বিচিত্রপুরীর অত্যুচ্চ প্রাচীর সকল লুণ্ঠনকারী দস্যুদিগের আশ্রয়স্থান হইল। বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল, কৃষিকার্য্য দিন দিন ন্যূনতাভাবে পরিণত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যের শৃঙ্খলাসকল দূরে পলায়ন করিল, উপযুক্ত মন্ত্রীগণ অপদস্থ হইয়া পলায়ন করিলেন। অদ্য রোরজী থাওয়াস নামক একজন সূচিক (দর্‌জি) মন্ত্রীসভার সভাপতি, কল্য তাহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া একজন বণিককে সেই সভাপতির আসন প্রদত্ত হইল, পরদিবস হয়ত আর একজনের প্রতি রাজদৃষ্টি পতিত হইল। এইরূপে রাজকার্য্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। জগৎসিংহ স্বয়ং কিছুই দেখিত না, দেখিবার ক্ষমতাও ছিল না। পরিণীতা স্ত্রীগণের সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইত না, কেবল যবনী রসকর্পূর সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিত। দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী করিয়া তাহার মস্তকে মুকুট অর্পণ করিয়াছিল। রসকর্পূরের নামে মুদ্রা খোদিত হইয়াছিল। একদিন দুরাচার এই ব্যভিচারিণী সমভিব্যাহারে জয়সিংহের জগদ্বিখ্যাত পুস্তকাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই অমূল্য গ্রন্থনিচয়

পাপিনীর বন্ধুবর্গকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিল। কখন কখন যবনপ্রণয়িনী লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সর্দ্দারবর্গকে আদেশ করিত যে, রাণীদিগের প্রতি তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ইহার প্রতি সেই প্রকার করিতে হইবে। সর্দ্দারদিগের পক্ষে এ সকল নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। দুর্নীর অধ্যক্ষ তেজস্বী চাঁদ সিংহ রাজা ও যবনীর প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা প্রকাশ করায় দুইলক্ষ মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে অম্বরের প্রধান প্রধান প্রজালোকে দুর্ব্বৃত্ত জগৎসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য দলবদ্ধ হইলেন। গুপ্তচরবর্গের মুখে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া দুরাচারের মনে ভয় হইল। অধিকন্তু রসকর্পূরের সম্বন্ধে সন্দেহসূচক কোন গূঢ় সমাচার জগতের কর্ণগোচর হওয়ায় দুরাচারিণীর সমস্ত ধনসম্পত্তি রাজভুক্ত করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল। সে তথায় অন্ধ হইয়া জীবনের শেষ কাল অতিকষ্টে অতিবাহন করে। জগৎসিংহ রসকর্পূরকে পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুর্ব্বৃত্ততার একশেষ করিয়া গিয়াছে।

জগৎসিংহ রাজকুলসম্ভূতা চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। নিঃসন্তান অবস্থায় লোকলীলা সম্বরণ করায় উত্তরাধিকার লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। ক্ষণকালের জন্যও সিংহাসন শূন্য থাকা রাজস্থানের নিয়মানুগত নহে। ঔরস বা দত্তকপুত্রের দ্বারা চিতা প্রজ্জালিত করিতেই হইবে। নরবরের রাজবংশ হইতে মোহনসিংহ নামে একটি বালক আনাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপিত হইল, সুতরাং সেই বালক উত্তরাধিকারী হইয়া অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করিল। তাহা লইয়া এক ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট গিয়া মধ্যস্থ হইলেন। এই সময়ে প্রকাশ পাইল, জগতের এক স্ত্রী অন্তর্ব্বত্নী আছেন। তাঁহার প্রসবকাল অপেক্ষায় গৃহবিচ্ছেদ শান্তভাব ধারণ করিল। জগতের মৃত্যুর চারি মাস চারি দিবস পরে রাণী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন।

এই বিবাদের সূত্র অবলম্বন করিয়া ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট জয়পুরে প্রবেশ করিলেন। তদবধি জয়পুরেশ্বর ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন পূর্ব্বক মিত্রভাবে রাজকার্য্য করিতেছেন।

সমাপ্ত।

কুক্কুর ও বিড়াল।

অথবা

স্বাধীনতা, স্বার্থপরতা এবং প্রেমের কথা।

ধীরপ্রকৃতি এবং অভিমানী পুরুষেরা উপহাস করুন, আজি আমি ক্ষণকালের জন্য আত্মার গাম্ভীর্য্য ও গর্ব্ব পরিহার করিয়া শীর্ষাঙ্কিত ঐ ক্ষুদ্র দুইটি জন্তুর সহিত একটুকু ক্রীড়া ও কৌতুক করিব। আমরা মনুষ্যজাতি যত বড় হই না কেন, প্রকৃতি চিরদিনই আমাদের শিক্ষক। বৃক্ষের ফল, নদীর জল, পতঙ্গ ও কীটের মৃত্যুপ্রাণ, পশু পক্ষীর প্রকৃতি ও সংস্কার ইহারা মনুষ্যকে প্রতি মুহূর্ত্তে, এবং নিস্তব্ধভাবে কতই কি শিক্ষা দিতেছে, এবং মনুষ্যের জীবনস্রোতকে কিরূপ বিলোড়িত, সংশোধিত ও আমূল পরিবর্ত্তিত করিতেছে, চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অবসন্ন হইতে হয়। সুতরাং ক্ষুদ্র বলিয়া ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিও না। তুমি আপনি মহৎ হইলে, ইহাদিগের মধ্যেও মহত্ত্ব দেখিতে পাইবে, এবং স্রষ্টার প্রিয় শিষ্যের ন্যায় প্রকৃতি হইতে আত্মশিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে ইহাদিগের নিকট যথেষ্ঠ শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। আজি উল্লিখিত জন্তুদুটির ক্ষুদ্রতা ও নীচাশয়তার বাহ্যিক আবরণ উন্মোচন করিয়া উহাদের প্রকৃতিগত গুণসমষ্টির অবধারণা করিতে চেষ্টা করিব, এবং যদি ইহাতে শিক্ষণীয় কিছু পাওয়া যায়, তবে যত্নের সহিত তাহা গ্রহণ করিব।

লোকালয়ে যত প্রকার জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, অবয়বে ক্ষুদ্র হইলেও প্রকৃতিগত গুণবাহুল্যে কুক্কুর ও বিড়াল ইহারাই সর্ব্বাগ্রণ্য। কাহাকে কোন গ্রাম্যজন্তুর নাম করিতে হইলে সে সর্ব্বাগ্রে ইহাদেরই নামোল্লেখ করে, এবং যখন দুই প্রতিবেশিনীর মধ্যে গার্হ্যস্থের আলাপ হইতে থাকে, তখনও ভূয়োভূয়ঃ ইহাদের নামোচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহারা মনুষ্যের পোষ্য মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। —মনুষ্য আপনার পাতের অন্নে ইহাদিগকে প্রতিপালিত করে, আপনি ভাল খাইলে ইহাদিগকে ভাল খাওয়ায়, এবং আপনার শিশু সন্ততির ন্যায় ইহাদিগকে সর্ব্বদা দয়া ও স্নেহের চক্ষে দেখে। কয়েক দিবস হইল বিলাতে "রয়েল সোসাইটিতে" সুপ্রসিদ্ধ Huxley সাহেব "কুক্কুর ও মনুষ্যের সাদৃশ্য" এই বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উহাতে মনুষ্যের সহিত কুক্কুরের যে আকৃতি এবং প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য আছে, তাহা তিনি প্রমাণ করিতে বিলক্ষণ চেষ্টা পাইয়াছেন। ডারউইন বহুদূরে

যাইয়া মনুষ্য যে নিকৃষ্ট জাতি হইতে সমুদ্ভূত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুক্কুরের সহিত আমাদিগের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, সুতরাং আমরা কুক্কুর-বংশোদ্ভব, একথা বলিতে আমাদিগের সাহস অথবা প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু তথাপি কুক্কুর এবং বিড়াল এই দুই জাতি যে মনুষ্যের কতকগুলি সাধারণ গুণে বিভূষিত,ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা ইহারই কয়েকটি গুণ লইয়া, এই দুইজাতির পরস্পরের মধ্যে, এবং ইহাদের সহিত অন্যান্য জাতির, কিরূপ পার্থক্য আছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কুক্কুর ও বিড়াল অন্যান্য গ্রাম্য জন্তু হইতে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন; এবং ইহারাই যে প্রকৃত মনুষ্যের পোষ্য মধ্যে গণনীয় হইবার যোগ্য, তাহারও অনেক কারণ আছে; মনুষ্য অন্যান্য জন্তুকে অত্যাচার প্রয়োগ দ্বারা সংযমিত করে; কিন্তু ইহাদিগকে মিষ্ট কথা এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনে বশীভূত রাখে। গাভী, ছাগ, মহিষ, গর্দ্দভ, অশ্ব প্রভৃতিকে বিনা প্রয়োজনে কেহ কখনও প্রতিপালন করে না। কিন্তু ইহাদিগকে অনেকেই শুধু চক্ষুতৃপ্তি অথবা চিত্তবিনোদনমানসে পালিয়া থাকে। অন্যান্য জন্তুকে ভয়প্রদর্শন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত করান যায় না; কিন্তু ইহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রতিপালকের যথাসাধ্য উপকার করে। অন্যান্য পশু গৃহের সামান্য ভৃত্য; ইহারা যুদ্ধসৈনিক। ইহাদিগের ব্যবসায় যেমন মহৎ, মনুষ্যের সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধও তেমনই উচ্চ।

ইহারা পরের অন্নে জীবন ধারণ করিয়াও কার্য্যতঃ স্বাধীন। তুমি একটি কুক্কুরকে মুষ্টিমিত অন্ন প্রদান করিলে, সে কৃতজ্ঞতায় তোমার পদানত হইয়া পড়িবে; কিন্তু তাই বলিয়া উহার অনভিমতে উহা দ্বারা কোন কার্য্য করাইতে পারিবে না। তাহাকে যে প্রতিপালন করে, সে তাহার চিরানুগত্য স্বীকার করে; কিন্তু তাহার এই সাধুপ্রবৃত্তি ভয়দ্বারা সংগঠিত হয় নাই, ইহা প্রীতি ও অনুরাগপ্রণোদিত। সে আপনি ইচ্ছা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক, নিশাচরগণ হইতে প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করে; কিন্তু তাহার এই অভ্যাস মানবীয়শিক্ষাসম্ভূত নহে; ইহা তাহার স্বভাবজাত। মনুষ্যের অভাব আছে বলিয়া সে পরিশ্রম করে না; কিন্তু তাহার পরিশ্রমে ভাগ্যক্রমে মনুষ্যের উপকার হয়। সে প্রয়োজনের জন্য নহে, কিন্তু প্রয়োজন তাহার জন্য।

পৃথিবীতে স্বাধীন কে? সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাজপথের ভিখারী হইতে রাজমুকুটধারী সম্রাট পর্য্যন্ত, সকলেই কাহারও না কাহারও অধীন; এবং সমাজের বাহিরে আসিলেও, ছদ্মবেশধারী পরিব্রাজক হইতে, স্তিমিতনেত্র যোগরত তপস্বী পর্য্যন্ত সকলেই কিছু না কিছু পরানুগত। কিন্তু তথাপি স্বাধীনতা কথা শুদ্ধ কল্পিত নহে, অথবা বিলাতী বাদ্যকরদিগের পরিচ্ছদের ন্যায় শুদ্ধ শোভাসম্পাদনার্থই ভাষায় গৃহীত হয় নাই। যদি পরের সহিত কোন রূপ সম্পর্ক রাখিলেই স্বাধীন নামের অনুপযুক্ত হইতে হইত, তাহা হইলে সামাজিক অভিধানে এই শব্দ কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া

যাইত না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, এ উভয়েরই নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। পরের উপর নির্ভর করিতে হইলে, অথবা পরের আনুগত্য স্বীকার করিলেই যে স্বাধীন হওয়া যায় না, তাহা নহে। যে ব্যক্তি ন্যায্যপথে থাকিয়া, যতদূর আপনার সৎপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে স্বাধীন। আর যে ব্যক্তি প্রয়োজনবশে পরের উপর নির্ভর করিয়াও আপনার আত্মার অতৃপ্তিজনক কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে, তাহাকেও কোনরূপ পরাধীন বলা যাইতে পারে না। স্বাধীনতা কাহারও গাত্রে অঙ্কিত থাকে না। অন্তরের সহিতই উহার একমাত্র সম্বন্ধ। যদি সেই অন্তর কোনরূপ আনুগত্যভার বহন না করে, যদি সেই অন্তর আপনার তৃপ্তিতে আপনি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমি হস্তে যে কোন পদ মর্দ্দন করি না কেন, মস্তকে যে কোন পাদুকা বহন করি না কেন, অথবা মুখে যে কাহারও অন্ন তুলিয়া দেই না কেন, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই কারণবশতঃ, পুত্র পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিতে, পিতা পুত্রের আবদার সহ্য করিতে, ভর্ত্তা ভার্য্যার বাসনা পূর্ণ করিতে, এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কোনরূপ কষ্ট অনুভব করে না বলিয়া, ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধীন হইয়াও, সম্পূর্ণ স্বাধীন। এবং এই কারণেই বলি যে, কুক্কুর ও বিড়াল মনুষ্যের অধীন থাকিয়াও স্বাধীন, লোকালয়ে থাকিয়াও অরণ্যবিহারীর ন্যায় স্বেচ্ছাচারী এবং পরপিণ্ডপ্রত্যাশী হইয়াও স্বমতাভিসারী।

ইহাদের এই স্বাধীনতা আছে বলিয়াই আমরা ইহাদিগকে ভালবাসি ও যত্ন করি। আর অন্যান্য জন্তুর এই স্বাধীনতা নাই বলিয়া, তাহারা শত প্রয়োজনে আসিলেও আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করি। যাহারা মনে করে, একমাত্র মনস্তুষ্টিই প্রীতির সোপান, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদি সেই তুষ্টির উপাদানের সহিত তোষ্টার তৃপ্তি ও অনুরাগ মিশ্রিত না থাকে, তাহা হইলে প্রীতিলাভের আশা করা বৃথা। তুমি আমার অধীন হইয়া আমার অত্যাচারে নিপীড়িত হইলে, আমার উপর তোমার অনুরাগ থাকিতে পারে না, সুতরাং তোমার উপরও আমার অনুরাগ থাকা অসম্ভব; এবং এই অনুরাগ না থাকিলে, তুমি যতই কেন আমার মনস্তুষ্টি করিতে যত্ন কর না কেন, তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইতে পারি, কিন্তু বন্ধুর ন্যায় হৃদয়ের প্রীতি তোমাকে সমর্পণ করিতে পারি না। যদি কাহারও বন্ধুত্ব অথবা প্রণয় পাইতে চাও, তবে প্রথমে তাহা হইতে স্বাধীন হও, অথবা তাহার অত্যাচারের ভয় হইতে মুক্তিলাভ কর। প্রণয় অথবা ভালবাসার যে অত্যাচার, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। কিন্তু যে অত্যাচারের ভয়ে প্রণয় পরিত্রাহিরবে দূরে পালাইয়া যায়, তাহারই হস্ত হইতে তোমাকে সাবধান থাকিতে বলিয়াছি। যে স্বাধীন, লোকে হয় তাহাকে ভয় করে, না হয় ভক্তি করে। কিন্তু যে পরাধীন, সে চিরদিন অবজ্ঞা ও দয়ার চক্ষে অবলোকিত হয়।

কুক্কুর ও বিড়াল এবং অন্যান্য লোকানুগত জন্তুর মধ্যে যে বিভিন্নতার উল্লেখ হইল,

তাহার এক মূলীভূত কারণ আছে। সেই কারণ এই ;—এই শেষোক্ত সমস্ত জন্তুই কেবল শাকভুক্, কিন্তু ইহারা উভয়েই মাংসাশী। মাংসাশী জন্তু কোন দিন পরবশে আনীত হয় নাই। যদিও এরূপ অসংখ্য শাকভোজী জন্তু আছে, যাহারা কখনও লোকানুগত্য স্বীকার করে নাই, অথবা লোকালয়ের বহির্দ্বারেও পা দেয় নাই, তথাপি এরূপ একটিও মাংসাশী দেখিতে পাওয়া যায় না, যে মনুষ্যের বশীভূত হইয়া আপনার স্বাধীনতা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছে। আমরা যে বাহ্যাবস্থার সহিত আভ্যন্তরিক অবস্থার সংমিলন ও একের উপর অন্যের নির্ভরতা শুদ্ধ মনুষ্যের মধ্যেই দেখিতে পাই, তাহা নহে ; প্রকৃতির প্রত্যেক স্থলেই এই সংমিলন ও নির্ভরতা দৃষ্ট হয়। আমরা প্রকৃতি হইতে যে সমস্ত স্বাভাবিক অস্ত্রবল প্রদত্ত হইয়াছি, সেই সমস্ত পরিচালন করিবার জন্য তদুপযোগিনী ক্ষমতা ও প্রবৃত্তিও আমরা সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিয়াছি। এবং আমাদের বাহ্যিক অবস্থাতে যেরূপ জীবন আমাদের পক্ষে সুখকর, সেরূপ জীবন অতিবাহিত করিতে প্রকৃতিই আমাদের চেষ্টা জন্মাইয়া দিতেছে। আজি যদি শুক্রগ্রহ হইতে কোন লোক পৃথিবীতে আসিয়া অবতীর্ণ হয়, তবে সে মনুষ্যের শারীরিক গঠনপ্রণালী দেখিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, মনুষ্য প্রকৃতির উপর রাজত্ব করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ মাংসভোজী জন্তু দেখিলেই আমরা ইহা অনুমান করিতে পারি যে, উহার ঐ সুতীক্ষ্ণ দন্তদ্বয় শুদ্ধ শোভার্থ প্রদত্ত হয় নাই ; উহা জীবিকা উপার্জ্জন এবং শত্রুসংহরণ মানসেই ঐ স্থানে নিবেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহারা যে স্বাধীন জীব দৃষ্টিমাত্রই তাহা উপলব্ধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,যখন এই মাংসাশী জন্তু অরণ্যের স্বাধীন বিহার ছাড়িয়া লোকালয়ের কারাগারে উপস্থিত হইল, তখনও সে তাহার সেই স্বাধীন প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। বোধ হয় যেন, ইহারা লোকালয়ের সুখসচ্ছন্দ অবলোকনে আকৃষ্ট হইয়াই উহার অংশ ভোগ করিবার মানসে মনুষ্যের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল। এবং যখনই মনুষ্য ভ্রমক্রমে উহার স্বাধীনতার উপর আপনার হস্তপ্রসারণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে, তখনই যেন উহার অভ্যন্তর হইতে কেহ এই কথা বলিয়া দিয়াছে যে, তুমি স্বাধীন, তুমি প্রতারিত হইতেছ। যদি তুমি এই প্রতারণার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে না পার, তবে বৃথা তোমার প্রকৃতিপ্রদত্ত অস্ত্রবল, বৃথা তোমার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জ।

আমরা এপর্য্যন্ত কুক্কুর ও বিড়ালের সহিত অন্যান্য জন্তুর পার্থক্য দেখাইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বভাবগত কি পার্থক্য আছে, তাহার আলোচনা করিব। এই পশুদ্বয়ের সাধারণ ব্যবহারের প্রতি একটুকু দৃষ্টি করিলেই ইহা উপলব্ধ হয় যে, ইহাদের মধ্যে বিড়াল স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, এবং কুক্কুর সঙ্গপরায়ণ,—বিড়াল একাকী থাকিতে ভালবাসে, কুক্কুর সংসর্গে থাকিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এবং ইহাদের কার্য্যপ্রণালীর উপর একটুকু বিশেষ মনোযোগ

প্রদান করিলে, এই দেখা যায় যে, বিড়াল ভয়ানক স্বার্থপর, কুক্কুর সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। ইহাদের সমুদায় কার্য্য ও ব্যবহার এই স্বাভাবিক গুণ হইতে সমুৎপন্ন, এবং ইহারই ছায়াপ্রাপ্ত। স্বাধীনতার সহিত স্বার্থপরতা মিশ্রিত থাকিলে স্বভাবে যে কেমন একটুকু বন্যতা আবিষ্ট হয়, বিড়ালে ঠিক সেই টুকু দৃষ্ট হয়; এবং স্বাধীন হইয়া স্বার্থশূন্য হইলে, প্রকৃতিতে যে একটুকু মধুরভাবের আবির্ভাব হয়, কুক্কুরেও ঠিক সেই টুকু দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্বাধীন, পরের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক রাখা না রাখা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছায়ত্ত। আমি যদি তোমার কোন ধার না ধারি, তবে আমার ইচ্ছা হইলে তোমার সহিত কথা বলিব, আর ইচ্ছা না হইলে বলিব না। যদি তোমার সহিত বাক্যালাপ করি, তবে সে হয়ত তোমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশে, অথবা আমার স্বার্থসাধনমানসে। সমাজের প্রতি একটুকু দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যায় যে, যাহারা স্বাধীন বলিয়া পরিচিত, তাহাদের পোনেষোলগণ্ডাই এই শেষোক্ত অভিপ্রায়ে লোকের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি সে যত কেন স্বাধীন হউক না, সামাজিকতার অনুরোধে, তাহার সেই স্বার্থাভিসন্ধিতেও সে লোকানুরাগের এমন বিশিষ্ট রং ফলাইতে পারে যে, তাহাকে আর সাজ বলিয়া চেনা যায় না। যদি অকপট স্বার্থপরতা দেখিতে চাও, তবে মার্জ্জারসমাজে গমন কর।

বিড়াল এই স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়াই মনুষ্যের সহিত মিশিয়াও মিশিতে চায় না। সে মনুষ্যের সমাজের কোন ধার ধারে না, সামাজিক সম্বন্ধের কোন অপেক্ষা করে না। সুতরাং স্বার্থসিদ্ধি বই মনুষ্যসংসর্গে তাহাকে দেখিতে পাইবে না। যদি তুমি আদরব্যঞ্জক স্বরে তাহাকে সম্বোধন কর, তবে সে চক্ষু মেলিয়া অগ্রে দেখিয়া লইবে তোমার হস্তে দুগ্ধের সর আছে কি না। যদি তুমি তাহাকে মূষিক সংহার করিতে বল, তবে সে প্রথম বিবেচনা করিয়া দেখিবে, তাহার ক্ষুধা আছে কি না। যদি তোমার হস্ত শূন্য, অথবা তাহার উদর পূর্ণ থাকে, তবে তোমার শত সম্ভাষণেও সে কর্ণপাত করিবে না। যদি তাহাদ্বারা কোন কার্য্য করাইতে চাও, তবে তাহার দুর্ব্বলস্থানে আঘাত কর,—তাহার স্বার্থপরতাকে উত্তেজিত কর। তাহাকে আহার না দিলে সে ক্ষুধা পাইবে, এবং ক্ষুন্নিবারণ করিতে যাইয়া মূষিকারি-রূপধারণ পূর্ব্বক তোমার শত্রুকুল সংহার করিবে।

বিড়াল মনুষ্যের গৃহখানিকে অরণ্যের ন্যায় ব্যবহার করে। তাহার নিকট সুবর্ণনির্ম্মিত দিব্যাসন, অথবা মকমলসজ্জিত সুরম্য শয্যা কিছুই পবিত্র নহে। তাহার মতে গৃহে যত কিছু আহার্য্য সামগ্রী আছে, সকলই তাহার জন্য প্রস্তুত; এবং সে যাহা কিছু দেখে, সকলই তাহার ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত। গৃহের কেহ বাচুক কি মরুক, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। চারিটা দুধভাত ও নির্ব্বিঘ্নে ঝিমাইবার একটুকু স্থান, ইহাই তাহার একমাত্র প্রার্থনীয়। কিন্তু যে দুধভাতে তাহার এত পরিতৃপ্তি, তার জন্য সে কাহারও প্রতি মুখ তুলিয়া

চাহিবে না, অথবা তুমি তাহাকে উহা দিয়াছ বলিয়া তোমাকে চিনিতেও যত্ন করিবে না; কারণ স্বার্থসিদ্ধির সহিতই স্বার্থের বিলয়. ইহা তাহার ধ্রুববিশ্বাস। এই সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া, এমন দুইটি স্বার্থপর জন্তু পাওয়া যায় কি না, সন্দেহের বিষয়।

কুক্কুর বিড়াল হইতে এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নপ্রকৃতিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুক্কুর স্বাধীন, অথচ স্বার্থশূন্য। যাহাদিগের অন্তরে স্বার্থের লেশমাত্র নাই, তাহাদিগের অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ। প্রেমের উপর স্বার্থ, পূর্ণচন্দ্রের গায়ে জলদপাতের ন্যায়;—যেমন মেঘরাশি পূর্ণচন্দ্রকে ধীরে ধীরে আবৃত করিয়া উহার রজতরশ্মিকলাপ বিলুপ্ত করিয়া ফেলে, কিন্তু যেটুকু অনাবৃত থাকে, সেই টুকুই দীপ্তি প্রদান করে, তেমন স্বার্থ প্রেমের উপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া উহার মধুরলহরী ভাঙ্গিয়া দেয়, কিন্তু যতটুকু অংশ স্বার্থ হইতে বিমুক্ত রহে, ততটুকুই হৃদয়ের শোভাসম্পাদন করিতে থাকে। প্রেমশূন্য প্রাণী নাই। প্রেম বিশুদ্ধ, আত্মাও স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ; কিন্তু স্বার্থের পঙ্কিল তড়াগে পতিত হইয়া, আত্মা অচিরেই কলুষিত হয়। যাহারা চিরকালের তরে এই স্বার্থকে দূরে রাখিতে সমর্থ হয়, তাহারাই প্রকৃত প্রেমিক, এবং তাহাদিগেরই আত্মা প্রকৃত পবিত্র। আবার, যাহারা একবার প্রেমিক হইতে পারিয়াছে, স্বার্থ তাহাদের ত্রিসীমায়ও অবস্থান করিতে পায় না। প্রেমিকের আত্মা তাহাতে থাকে না;—উহার অবস্থিতি অন্যত্র। সুতরাং সে কাহার জন্য স্বার্থচিন্তা করিবে? প্রেমিক মুহূর্ত্তও আপন সত্বা অনুভব করে না, সুতরাং সেই সত্বার জন্য তাহার কি চেষ্টা থাকিবে?

কুক্কুরের হৃদয় স্বার্থবিরহে আতট প্রেমে পরিপূর্ণ। অনেকে প্রভুভক্তিনামে, ইহার এক স্বতন্ত্র গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক এইটি একটি পৃথক গুণ নহে। ইহা প্রেমের অপরিহার্য্য সহচর। প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা এই দুই স্রোত দিয়া হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে প্রেরিত হয়। প্রেম অন্তরে অবস্থিতি করে, ভক্তি ও ভালবাসা তাহার সত্বা জগতে প্রচার করিয়া দেয়। প্রেম প্রদীপ্ত ভাস্করস্বরূপ; ভক্তি ও ভালবাসা তন্নিঃসৃত কিরণমালা সদৃশ। প্রেম মূলাধার, ভক্তি ও ভালবাসা তদ্বহির্গত স্রোতযুগল। বস্তুতঃ যদি প্রভুভক্তি নামে ইহার স্বতন্ত্র একটি গুণ থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহার এতদূর কার্য্য দেখিতে পাইতাম না। যেমন মূলপ্রস্রবণে জল না থাকিলে স্রোত সত্বরই শুষ্ক হইয়া যায়, তেমন প্রেমরূপ পরিপোষক কিছু না বিদ্যমান না থাকিলে, প্রভুভক্তির তেজ অচিরেই হ্রস্ব হইয়া যাইত।

এই প্রেমের পরিপূর্ণতায় কুক্কুর স্বাধীন হইয়াও দৃষ্টব্যে অধীন। কিন্তু এ অধীনতা দুঃখের সামগ্রী নহে,—ইহা সুখের ভাণ্ডার। এই অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা; কারণ ইহাতেই তাহার সমস্ত সুখ, ইহাই তাহার জীবন। সে মুহূর্ত্ত এই অধীনতা ভোগ করিতে না পারিলেই, অধীর হইয়া উঠে, জগৎ শূন্যময় নিরীক্ষণ করে, এবং জীবন যাপন বৃথা মনে করিতে থাকে। সে এই অধীনতাভোগ করিবার জন্য, বেত্রাঘাত

সহ্য করিতে ক্লেশানুভব করে না ; সমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিতে শঙ্কা বোধ করে না ; ব্যাদিতবদন শত্রুর সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হয় না, এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে জীবন আহুতি দিয়াও আত্মার উপযুক্ত তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় না। যদি তুমি একবার তাহার প্রেমের অধিকারী হইতে পার, তবে আমরণ সে তোমার ছায়া অনুসরণ করিয়া চলিবে, দিনান্তে আহার না পাইলেও সে তাহাতে কাতরতা চিহ্ন প্রকাশ করিবে না ; তুমি তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিলেও সে তাহাতে ব্যথিত হইবে না ; এবং যদি সমস্ত দিন অনাহারের পর, তুমি তাহাকে কোন পূতিগন্ধি স্থান দেখাইয়া দেও, তাহা হইলেও সে একই তৃপ্তিতে উহা হইতেই আপনার উদর পূর্ণ করিয়া, আবার তোমার পশ্চাদ্ধাবমান হইবে। যে এই মহৎ হইতেও মহত্তর জন্তুকে উপেক্ষা করে, অথবা ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহার চক্ষু বহিরিন্দ্রিয় বলিয়াই অভিহিত হইতে পারে, চিন্তা ও দয়া কখনও উহার সঙ্গিনী হয় না।

মেঘনা।

(প্রথম বসন্ত—জ্যোৎস্না নিশি)

এই কবিতাটি কএক মাস হইল সাধারণী নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু, যাঁহারা নিশার গভীর নিস্তব্ধতায় মেঘনাদের হৃদয়-বিলোড়ি তরঙ্গগর্জ্জনকে কালস্রোতের সুগভীর গর্জ্জন বলিয়া অনুমান করেন,—যাঁহারা মেঘনাদের অনন্তপ্রসারিত তরলবক্ষে প্রভাতসূর্য্য কিংবা পূর্ণচন্দ্রের সহস্রধাবিভক্ত স্বর্ণকান্তির তরলপ্রতিবিম্ব দেখিয়া আনন্দের অনির্ব্বচনীয় স্ফুরণে ভয় ও দুঃখের কথা ভুলিয়া যান,—মেঘনাদের তরঙ্গলীলার সহিত যাঁহাদিগের জীব-লীলার নিত্য মিশ্রণ, —উহারই প্রবাহে যাঁহাদিগের আশার প্রবাহ ও আশঙ্কার প্রবাহ, আমাদিগের সেই সমস্ত পাঠকবর্গের অনেকেই সাধারণীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন না। আমরা এই হেতু তাঁহাদিগের বিশেষ অনুরোধে এই কবিতাটি বান্ধবে পুনঃপ্রকটন করিলাম। সাধারণীর সহিত বান্ধবের অক্ষয় সৌহার্দ্দ। যদি আমাদিগের এই অপহৃতি কোন অংশেও দূষণীয়া হইয়া থাকে, সহৃদয়া সাধারণী তাহা ক্ষমা করিবেন।

আর এক কথা এই। আমরা মেঘনাকে সকল স্থলেই মেঘনাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি ; কবিতায় ইহা মেঘনা বলিয়া উল্লিখিত। পাঠকবর্গ ইহাতে বিস্মিত হইবেন না। পুরাতন তন্ত্রাদিতে মেঘনাদ বলিয়াই ইহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং প্রচলিত প্রবাদের সহিতও এই নামের বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। আমরা তান্ত্রিক বলিয়া তন্ত্রোক্ত

নামেরই সম্মান করিলাম। অথবা,—নামে কি করে। এই সজীব জলরাশিকে যে নামেই সম্ভাষণ কর, উহা সকল সময়েই ভয়াবহ, সকল সময়েই কবিহৃদয়ের ভাবাবহ।

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে
মানব জীবন!
অমনি চাঁদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে,
অমনি মধুর স্রোতে, সঙ্গীত মতন,
বহিয়া না যায় কেন মানবজীবন!

২

অহো! কি স্বর্গীয় শোভা বসন্ত মধুর—
স্বপন সৃজন!
কিবা শান্তি মনোহর! ভাঙ্গে পাড়ে, চন্দ্র কর
আদরে আদরে বক্ষ পরশিয়া যায়,
অহো! কি শান্তির ছবি ভাসে মেঘনায়!

৩

বাসন্তী চন্দ্রিমা মাখা চারু নীলাম্বর,
মধুর কেমন!
মিশিয়াছে অন্তনীরে! মিশিয়াছে নীল নীরে
বঙ্কিম রেখায়! কেন মিশে না তেমন
অনন্তের সহ, এই মানব জীবন!

৪

মানব জীবন—
এত আশা, ভাল বাসা, এতই নিরাশা,
এত দুঃখ কেন?
প্রেমের প্রবাহ হায়! কেন না বহিয়া যায়,
এমন মধুরে? কেন আকাঙ্ক্ষা লহরী
বহিয়া না যায় হেন শান্ত ভাব ধরি?

৫

মাতার পবিত্র স্নেহ, পিতার আদর
পত্নীর প্রণয়,—
কেন মেঘনার মত, নাহি বহে অবিরত?
কেন নাহি বহে হায়! বন্ধুতা এমন—
শান্ত, সুগভীর, স্থির,—মেঘনা যেমন?

৬

সৃষ্টি কর্ত্তা! এই শান্তি, স্নাত চন্দ্র করে,
দেও নাথ! জড়ে;
অজড়ের প্রতি নাথ! কেন এ অভিসম্পাত,
তাহার অদৃষ্টে হায়! ঝটিকা কেবল—
তরঙ্গ তরঙ্গ পৃষ্ঠে তরঙ্গ প্রবল?

৭

লিখিতে এ শান্তি যদি, সর্ব্ব শক্তিমান!
মানব কপালে!
আজি এই ভূমণ্ডল, হইত না মরুস্থল,
পরিপূর্ণ হাহাকার। মানব জীবন
বহিত নীরবানন্দে মেঘনা যেমন!

৮

মানবের এত দুঃখ, দয়াময় তুমি,
কিসে সহ বল?
তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ মানবের ক্রীড়া স্থান
এত কণ্টকিত কেন? মানব জীবন
কণ্টক কণ্টক পৃষ্ঠে, কণ্টক এমন?

৯

কমলে কণ্টক কেন, প্রণয়ে বিষাদ,
স্নেহে কেন শোক?
কামনায় তৃপ্তি নাই, যাহা চাই নাহি পাই,
বন্ধুতায় স্বার্থ বিষ, ধর্ম্মে প্রবঞ্চনা,
কীর্ত্তিতে কলঙ্ক, নারী-হৃদয়ে ছলনা?

১০

সর্ব্বশক্তিমান তুমি! পার না কি তবে
মানব জীবন,—

হাসাইয়া, নাচাইয়া, চন্দ্রালোকে মাখাইয়া,
আলোক কুসুম রাশি, বহাতে এমন
পার নাকি বল, নাথ! মানব জীবন?

১১

পার যদি হায়! নাথ, তবে কেন বল
দুঃখের প্রবাহ,
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি, আশা,সুখ,স্নেহরাশি
নেয় ভাসাইয়া তার? সুখের স্বপন
মিশাইয়া যায় ওই হিল্লোল মতন?

১২

সর্ব্বশক্তিমান তুমি!
তবে একবার যাহা দেও তাহা কেন
নেও হে কাড়িয়া?
নেও যদি—পুনরায়, কেন নাহি দেও তায়,
জীবন নিবিয়া কেন উঠে না জ্বলিয়া?
বহি মেঘনার মত, আসে না ফিরিয়া?

১৩

সৃজন, পালন, যদি নিয়ম তোমার
তবে বল নাথ!
আশার কুসুম যার, ছিঁড়িয়া জীবন-হার,
একে, একে, একে নাথ পড়িছে খসিয়া,
রাখ কেন শূন্য সূত্র নাহি বিনাশিয়া?

১৪

রাখ কেন শূন্য-সূত্র আমার মতন,
বল দয়াময়?
ঝটিকায় ঝটিকায়, মৃণালের সূত্র প্রায়
উঠিতেছে, পড়িতেছে, জীবন যাহার,
নাহি বিনাশিয়া তারে, কেন রাখ আর?

১৫

ঝটিকায় ঝটিকায় অর্দ্ধেক জীবন
গিয়াছে আমার।
জানু পাতি মেঘনাতীরে,ভাসি আজি অশ্রুনীরে,
এক দয়া কর নাথ! জুড়াও জীবন;
দেও দিনেকের শান্তি মেঘনার মতন।

১৬

অথবা এ অস্তমুখ জীবনের তারা
ডুবাও এখন!
মিশাও মেঘনার জলে, বাসন্তী চন্দ্রিকাতলে,
হাসাইয়া, ওই ক্ষুদ্র হিল্লোল মতন,
মিশাও তরঙ্গপূর্ণ—বিষাদ জীবন!

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী।

আমরা ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ প্রদেশে কোন গদ্যগ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাই না; কিন্তু অনেক কবির সুনাম আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়,—অনেক কবি আমাদের নয়নপথের পথিক হন; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, আমরা কোন কবিরই জীবনবৃত্তান্ত আমূল সংগ্রহ করিতে সমর্থ নহি,—কেহই তাঁহাদের জীবনী লিখিয়া যান নাই; সুতরাং এত উত্তরকালবর্ত্তী হইয়া আমাদের সেই সকল জীবনী-সংগ্রহ কখনই সম্পূর্ণরূপে ভ্রমশূন্য হইতে পারে না। আমরা বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের জীবনচরিত

পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহা ভ্রমশূন্য কি না বলিতে পারি না; আবার সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে যে, অনেক কবি এক্ষণেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, ঘনাবৃত সূর্য্যের ন্যায়, সাগরগর্ভস্থ মহামূল্য রত্নের ন্যায়, মরুভূমিস্থিত সুগন্ধবিশিষ্ট পুষ্পের ন্যায়, এখনও কীটদষ্ট হইয়া হস্তলিখিত পুঁথির আকারে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রশংসা করিবার কেহই নাই; বিদ্যারসবিহীন ইতর লোকের গৃহের মঞ্চের উপর নির্জ্জনে তাঁহাদের বাস,—দুরন্ত কীট তাঁহাদের সহচর, এবং অবিরত তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতেছে। এইরূপ হস্তলিখিত পুঁথির আকারে কত যে মহামূল্য রত্নরাশি বিক্ষিপ্ত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা অদ্য শীর্ষদেশে যাঁহার নাম স্থাপন করিয়াছি, বোধ হয় এই ঘনরামের নাম অনেকের নিকট অশ্রুত; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইনি একজন সরস্বতীর বরপুত্র; ইঁহার রচনা যেমন সরল, তেমনই তীব্র অথচ সুমিষ্ট ও উপদেশপূর্ণ; ইনি কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বা কৃত্তিবাস ও কাশীদাস কাহারই নিম্নস্থানীয় নহেন, অথচ ইঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রায় সকলেরই অপরিচিত। এইরূপে আমরা আরও দুইচারিজন সাধারণ্যে অপরিচিত অথচ সুকবির নামোল্লেখ করিতে পারি, যথা—রূপরাম, কৃষ্ণরাম, রঘুনন্দন। বোধ হয় কেহই ইহাদের নাম শ্রবণ করেন নাই; আমাদের একান্ত বাসনা, আমরা ক্রমশঃ এই সকল কবির জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর করি; এইরূপ করিলে যে ক্রমশঃ তাঁহারা সকলেরই পরিচিত হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা যে সকল কবির নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থ এক্ষণেও মুদ্রিত হয় নাই। আমরা অনেক কষ্টে দুই তিন খানি পুঁথি হস্তগত করিয়াছি, সুবিধামতে সে গুলি জনসমাজে প্রচার করিব এইরূপ বাসনা।

বঙ্গীয় পূর্ব্বকবিসম্প্রদায়কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—প্রথম গীতিলেখক (Lyric poets), দ্বিতীয় মহাকাব্যপ্রণেতা (Epic poets); বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাথমিক কবিগণ প্রথমশ্রেণীর অন্তর্ভূত; মুকুন্দরাম, ঘনরাম, কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতি দ্বিতীয় দলের চূড়া। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ বৃহৎ কাব্যের মুখ পর্য্যন্ত অবলোকন করেন নাই। এই ষোড়শ শতাব্দীতেই বঙ্গদেশ নানা প্রকার উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে;—একদিকে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাবিপ্লব ঘটাইয়াছেন, অন্যদিকে টোডরমল্ল প্রভৃতি রাজনৈতিকগণের দ্বারা রাজনীতি সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন; আবার এই সময়েই বঙ্গীয় সাহিত্য নবীন অনুরাগে, নবীনভাবে, নূতন তানে সমুদিত হয়; এই ষোড়শ শতাব্দীতেই মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য, এবং কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণ প্রণয়ন করেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের মধুময়, অমৃতনিস্যন্দিনী বীণাঝঙ্কার নীরব হইলেই ঘনরামের মোহনভেরী নিনাদিত হইতে লাগিল। আবার ইহার ভেরীধ্বনি নিস্তব্ধ হইলে ভারতচন্দ্রের মুরলীবিমিশ্রিত স্ত্রীকণ্ঠগীতি লোকের চিত্তাকর্ষণ

করিল। এইরূপে পূর্ব্বকালে বর্দ্ধমান অনেক সুশ্রাব্য মোহনসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছে। তখন বঙ্গদেশের এই অংশই ইহার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল; মুকুন্দরাম, ঘনরাম, রূপরাম, ভারতচন্দ্র, কাশীরাম প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণ এই অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইহাঁরাই নানাবিধ আভরণে দীনা বঙ্গীয় সাহিত্যকে বিভাষিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, সেই বর্দ্ধমানই এক্ষণে বঙ্গদেশের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা বিদ্যাচর্চ্চায় হীনপ্রভ;—ইহা অবশ্যই অতীব দুঃখের বিষয়।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মুকুন্দরাম বর্দ্ধমান অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম আমাদের রায়ণা হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ। ইহার বংশধরগণ এক্ষণও রায়ণা থানার অন্তর্গত বড়বৈনান গ্রামে বসবাস করিতেছেন। ইহাদের নিকট কবির হস্তলিখিত একখানি চণ্ডীকাব্য আছে; সে খানিকে ইহারা অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৫৯০ শকাব্দায় বা ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই গ্রাম আমাদের রায়ণা হইতে চারিক্রোশ পশ্চিম; ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি উক্ত গ্রামেই বাস করিতেছেন; ইহাদের নিকটও কবির স্বহস্ত লিখিত এক খানি শ্রী-ধর্ম্মমঙ্গল আছে, তাঁহারা ইহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বলরামের পিতার নাম গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মাতার নাম সীতাদেবী যথা—

মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিবন্ত দান্ত শান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥
প্রভু যাঁর কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
তাঁর সুত ঘনরাম মধুরস গান॥

শ্রী-ধর্ম্মমঙ্গল প্রথমপালা।

কথিত আছে ইনি বাল্যকালে অতিশয় তেজস্বী ছিলেন;—তাঁহার সমবয়স্ক কেহই বলে ইহাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। অথচ সকলের সঙ্গেই বিবাদ করিতেন। অধ্যয়নে ইহার প্রগাঢ় যত্ন ছিল, এমন কি চতুষ্পাঠীর মধ্যে কেহই ইহার সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু গৌরীকান্ত তাঁহাকে বিবাদপরায়ণ দেখিয়া তাঁহাকে রামবাটী গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। এই রামবাটী পূর্ব্বকালে বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এখানে অনেক পণ্ডিতের বাস এবং অনেক প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী ছিল। এই গ্রাম রায়ণার অতি সন্নিকট, ঘনরাম এই স্থানে অবিবাদে যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, এবং কিছু দিনের মধ্যেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কাব্যে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; এই জন্য নিজ পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা তিনি সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন; কখন কখন ঐ সকল পুস্তক হইতে কোন বিষয় লইয়া কবিতা রচনা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। তাঁহার কবিতা রচনা তখনই এত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল যে, তাঁহার গুরু তাঁহার ভাবী উন্নতির লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে "কবিরত্ন" এই উপাধি প্রদান করেন।

ভাবি গুরু-পদ দ্বন্দ্ব, দুই এক ভাষা ছন্দ,

কবিতা করিতাম পূর্ব্বকালে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত, বলিতে বলিলা গীত,
গুরুব্রহ্ম বদনকমলে॥
নিজ গুণে হয়ে যত্ন, নাম দিলা "কবিরত্ন,"
কৃপাময় করুণা আধান।
শুনি অসম্ভব ভাস, লোকে পাছে উপহাস,
তায় তুমি আপনি প্রমাণ॥
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রথম পালা।

ঘনরাম যে সময় রামবাটীতে অধ্যয়ন করেন, তখন রূপরাম নামে তাঁহার এক সমপাঠী ছিলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই ঘনরামের লেখার ঈর্ষা করিতেন; অথচ কাব্যের প্রতি রূপরামের তত অনুরাগ ছিল না। এদিকে ঘনরাম কাব্যপ্রিয়, সুতরাং তিনিও কাব্যের আদর করিতেন, এবং তাঁহার ন্যায় সময়ে সময়ে দুই একটি কবিতা লিখিতেন। এইরূপ অবস্থায় ঘনরামের যৌবন সীমা অতিক্রান্ত হইলে ঘনরাম রামবাটীর পাঠ সমাপ্ত করিয়া নিজগৃহ কৃষ্ণপুর চলিয়া গেলেন। তথায় একখানি মহাকাব্য রচনা করেন, সেই গ্রন্থখানির নাম "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল"। এই কাব্যখানি তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আনুকুল্যে রচনা করেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের স্থানে স্থানে ইহার নাম সংযোজিত আছে যথা;—

অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তা তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রথম পালা।

এই গ্রন্থখানি গীত হইবার জন্যই তিনি রচনা করেন,—তাঁহার সময় হইতেই ইহা চারিদিকে গীত হইতেছে। ঘনরামের নাম এ অঞ্চলে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলে রূপরাম আর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও একখানি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থখানিও গীত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার লেখা ঘনরামের লেখার ন্যায় প্রাঞ্জল ও সরস নহে। ইহার লিখন পরিশ্রমপ্রসূত বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু তা বলিয়া অত্যন্ত কর্কশ নহে—স্থানে স্থানে বিশেষ কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে। ঘনরাম ইহার কবিতা ও গান সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

(লোকে) শব্দ শুনে স্তব্ধ হবে গান শুনবে কি?

রূপরামের মঙ্গল খোল করতাল সংযোগে গীত হইয়া থাকে।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল চতুর্ব্বিংশতি পালায় (Canto) বিভক্ত; প্রত্যেক পালায় এক হাজার করিয়া শ্লোক আছে;—তাহা হইলে সমগ্র কাব্যখানিতে প্রায় চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক আছে। এই চতুর্ব্বিংশতি পালার নাম যথাক্রমে—১ম সৃষ্টিপত্তন; ২য় অজয়টেঁকুর; ৩য় রঞ্জাবতীর বিবাহ; ৪র্থ হরিশ্চন্দ্র; ৫ম রঞ্জাবতীর শালেভর; ৬ষ্ঠ লাউসেনের জন্ম; ৭ম আখড়াগৃহ; ৮ম ফলক নির্ম্মাণ; ৯ম গৌড়যাত্রা; ১০ম কামদলবধ; ১১শ জামতি নগর; ১২শ গোলাহাট; ১৩শ হস্তীবধ; ১৪শ কামরূপ যাত্রা; ১৫শ কামরূপ যুদ্ধ; ১৬শ সিমুলা; ১৭শ মায়ামুণ্ড; ১৮শ ইছাই বধ; ১৯শ বাদল; ২০তি পশ্চিমোদয় আরম্ভ; ২১তি মহামদের ময়না আক্রমণ; ২২তি জাগরণ; ২৩তি পশ্চিমোদয়; ২৪তি স্বর্গারোহণ।

ঘনরাম এই গ্রন্থখানি কখন লিখিতে আরম্ভ করেন তাহার স্থিরতা নাই;—গ্রন্থের কোন স্থলেই তাহার উল্লেখ নাই। তত্রাপি তিনি যখন যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময়েই লিখিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়। তাহা হইলেই আনুমানিক ১৬২৬ শকে অর্থাৎ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং ১৬৩১ শকে বা ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ইহার লেখা সমাপ্ত করেন যথা—

সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন ॥
শকে লিখ রাম গুণ রস সুধাকর।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল চতুর্ব্বিংশতি পালা।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে ঘনরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী; ভারতচন্দ্র ১৬৪৪ শকে বা ১৭২২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ঘনরামের গ্রন্থপ্রণয়নের প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল রচনা শেষ করেন; তাহা হইলেই ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের প্রায় ৪৩ বৎসর পরে তিনি অন্নদামঙ্গল প্রণয়ন করেন। ঘনরাম, ভারতচন্দ্রের সমকালীন লোক নহেন; ঘনরামের বয়স যখন ৫৩ বৎসর তখন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং যে সময়ে ভারতচন্দ্রের প্রতিপত্তি হয়, সে সময়ে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিম্বা কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। জীবিত থাকিলে তাঁহার বয়স তখন প্রায় ৯০ বৎসর হইবার সম্ভাবনা; কারণ ভারতচন্দ্রের প্রতিপত্তি হইতে অন্ততঃ ৪।৫ বৎসর লাগিয়াছিল।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বীররস প্রধান মহাকাব্য; লাউসেন, কর্পূরসেন ইহার নায়ক; তন্মধ্যে লাউসেনই প্রধান, এবং ইহাকেই ইহার নায়ক বলিতে হইবে। অমলা, বিমলা, কালঙ্গা, কানড়া, লাউসেনের এই চারি স্ত্রীর চরিত্রগত বিবরণ; লক্ষ্মীডোমনীর চরিত্র, ধুনসীর চরিত্র প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্র পাঠ করিয়া অনেক স্ত্রীলোক সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন; সুরিক্ষা, গুরিক্ষা প্রভৃতি দুষ্টাস্ত্রীর চরিত্র ও শাস্তি দেখিয়া অনেক নীতিশিক্ষা হইতে পারে। আমরা বলি ঘনরামের এই শ্রীধর্ম্মমঙ্গল অধুনা স্ত্রীগণের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাল হয়। ইহাতে তাঁহারা কামিনী, ভামিনী, দামিনী, তারিণী প্রভৃতি নবেল, নাটক অপেক্ষা অনেক শিক্ষয়িতব্য বিষয় শিক্ষা করিতে পারেন; বিশেষ দেশীয় কোন মহাকাব্য পাঠ না করিলে কখনই সে দেশীয় লোকের ভাষায় ভালরূপ অধিকার জন্মে না। আমরা সেই জন্যই বলি, যেমন আজি কালি রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতি স্ত্রীলোকগণের ভক্তি হ্রাস হইয়াছে, তেমনিই এই নূতন মহাকাব্যের উপর তাঁহাদের ভক্তির উদয় হউক; তাহা হইলে রামায়ণ ও মহাভারত উপেক্ষা করিয়া যে অনিষ্ট হইতেছে, সে অনিষ্ট আর ততদূর হইতে পারিবে না। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়, ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করা হইয়াছে।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গীত হইয়া থাকে; এই জন্য পালার ও পরিচ্ছেদের উপরে একটি করিয়া ধুয়া আছে, সে গুলি ঘনরামের রচিত নহে। গীত গাহিবার সুবিধার নিমিত্ত তাঁহার

কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ সে গুলি সংযোজনা করিয়া দেন। মঙ্গল ব্যতীত ঘনরাম আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার নাম "সত্যনারায়ণের কথা"। এখানিও চমৎকার ভাষায় লিখিত। যেমন ভারতচন্দ্রের লেখা হইতে দুই একটি শ্লোক উপদেশবাক্যের (Proverbs) মত হইয়া গিয়াছে। যথা—

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।
ইত্যাদি

সেইরূপ ঘনরামের লেখা হইতেও অনেক কথা উপদেশ বাক্যের ন্যায় হইয়া আসিতেছে যথা;—

সুখ দুঃখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষভেদে যেমন চন্দ্রিমা বাড়া টুটা॥

আরও

লাভ আশে আসি কেহ মূল নেশে যায়।

পুনশ্চ

কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ দুঃখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাচের ভিক্ষুক॥

আমরা ঘনরামের যে স্থান পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই পরম প্রীত হইয়াছি। ইহার লেখার কেমন চমৎকারিত্ব আছে। আমরা ইতস্তত: একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতেই পাঠক দেখিবেন ইহার রচনায় কি মনোহারিত্ব আছে;—

নহুশ্চন্দ্রের বলিদান।

বাছার বচনে বড় বাঁধাইলা বুক।
পুত্র বলি দিয়া ধর্ম্মে পূজিছে ভূভুক॥
কৌতুক দেখেন প্রভু দেবপূজা তার।
পরিপাটী মহা পূজা ষোল উপচার॥
সকল পূজার সার মহা বলিদান।
নহুশ্চন্দ্রে মহারাজা করাইল স্নান॥
জননী জন্মের মত যত অলঙ্কার।
পরাল মনের মত দেখা নবে আর॥
রাজার নিকটে দিল ছল ছল আঁখি।
আঁচলে লোচনযুগ মোচে চাঁদমুখী॥
উৎসর্গ করেন রাজা নানা বেদ তন্ত্র।
আপনি গোঁসাই তাঁর কাণে দিলা মন্ত্র॥
পূজা করে ঘাড়েতে ছোঁয়াল খড়্গখান।
সন্ন্যাসী সম্মুখে নিল দিতে বলিদান॥
হাসি হাসি সন্ন্যাসী কহেন মহীনাথে।
বলিদান দিবে রাজা আপনার হাতে॥
মদনা ধরুন পোয়ে তুমি ধর খাঁড়া।
রাণী কন বচন ঘুচাও বড় বাড়া॥
দশ মাস অভাগী ধরিনু যারে আঁতে।
সে কেমনে পুত্র ধ'রে কাটাবে সাক্ষাতে॥
কোন্ হাতে বলি দিবে অভাগীয়া বাপ।
তুলনা তুলনা প্রভু তিন গুণ তাপ॥
ইত্যাদি। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম যেমন দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকে ফুল্লরার নিকট ভগবতীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ঘনরামও সেইরূপ দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকে লাউসেনের নিকট ভগবতীর পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যথা—

নিবাস নিয়ম নাই যথা তথা থাকি।
কোন জাতি জগতে মজাতে নাই বাকী॥
ইত্যাদি। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

পরিশেষে ভারতচন্দ্রও এইরূপ একবার ভগবতীর পরিচয় করাইয়াছেন। ঘনরামের "সত্যনারায়ণের কথার" লিখনও বেশ মনোহর; এবং শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের পদ্যের রচনা বলিয়া কিঞ্চিৎ গাঢ়।

ঘনরাম একজন প্রকৃত কবি; কিন্তু তা

বলিয়া যে ইহার কোন দোষ নাই একথা বলা যাইতে পারে না; তাঁহার অন্যান্য দোষের মধ্যে একটিই প্রধান,—এইটিই তাঁহার অনুপ্রাস। ঘনরামের ন্যায় অনুপ্রাসপ্রিয় কবি আর দেখিতে পাই না। যে দোষের জন্য কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর মলিন হইয়া গিয়াছে, ঘনরামে সেই দোষ অতি বলবতী। কিন্তু রামপ্রসাদের অনুপ্রাস যেমন দন্তে লাগে ঘনরামের তত নয়; অনুপ্রাস আছে সত্য, কিন্তু সেই অনুপ্রাসের ভিতরে যেন কিঞ্চিৎ মধুরতা আছে।

ঘনরামের চারি পুত্র; প্রথম, রামপ্রিয়; দ্বিতীয়, রামগোপাল; তৃতীয়, রামগোবিন্দ ও চতুর্থ, রামকৃষ্ণ। ঘনরাম ইহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহার "সত্যনারায়ণ" সমাপ্ত করিয়াছেন যথা;—

মোকর্দ্দমা কর্ম্মচারী গ্রামান্য সকলে।
সত্যনারায়ণ সবে রাখুন কুশলে॥
প্রিয় রামপূর্ব্ব রাম গোপাল গোবিন্দ।
রামকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রভু রাখিবে সানন্দ॥
শ্রীরাম পদারবিন্দে দেহ মোর মতি।
ভনে দ্বিজ ঘনরাম করিয়া প্রণতি॥

সত্যনারায়ণের কথা।

ঘনরামের বংশধরগণ এক্ষণেও কৃষ্ণপুরে বসবাস করিতেছেন; তাঁহাদের কাহারও কাহারও এই মঙ্গলগীত ব্যবসায় আছে। আমাদের রায়ণায় ঘনরামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গীত গাহিতে আসিতেন। এক্ষণে তাঁহার কাল হইয়াছে; তাঁহার একটি শিশুসন্তান আছেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

মহাশ্বেতা।

একটি মধুর ছবি, অতীত কালের পটে
রয়েছে অঙ্কিত আজো উজ্জ্বল রেখায়।
তপস্বিনী মহাশ্বেতা, নিবিড় কানন কোলে
জ্যোৎস্নার ছায়া যথা বনরাজি গায়॥
নিবিড় তনুয়া কিবা, বরাঙ্গের স্ফুট বিভা
নয়নে বদনে ঘন মাখান মাধুরি।
কল্পনায় সে প্রতিমা, ধেয়ান করিলে তবু
উঠে ভাবুকের চিতে কি সুখ লহরি॥
কিবা তপস্বিনী বেশ, কিবা বিষাদের লেশ
কি গম্ভীর হাবভাব, কি অমিয়া তায়!
পলকে পলকে তার, কি গভীর দৃষ্টি ঝরে
কি পূত ধারণা তার, অঙ্গের সীমায়॥
বিষাদ ভাবনা ভরে, সদত বিষণ্ণ আঁখি
সুন্দর উরসে কিবা ভাবনা মধুর।
গণ্ডে নীরবে ঝরে, মধুর নয়ন জল
মধুর শোকেতে বালা কিবা সে আতুর॥
বাঁশরি তুলিয়া মুখে, কি গীত গাহিল ওই
ছুটিল পরাণ তার ভাসিয়া সে সুরে।
গভীর প্রবাহে সেই মধুর নিনাদ করি
পড়িল ছড়ায়ে প্রাণ সে কানন পুরে॥
বিকচ যৌবন ভরে, ঢল ঢল তনু খানি
গভীর বিপিনে একা বসি তপস্বিনী।
পারশে পড়িয়া তার, নাথের অচেত তনু
নয়ন রাখিয়া তায় গায় বিষাদিনী॥

" প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ—মম,
যায়—যায়—যায়—যেরে"
অধরে ফুটিছে শ্বাস বাঁশরির গায়।
দ্রবিয়া হৃদয়লৌহ, আনত নয়ন যুগে
নীরবে পড়িছে ঝরি সেই যাতনায়॥
বলরে জগত! তোর বিপুল সংসারে কোথা
আছে সুখ ওই মত রোদনে যা মিলে।
কিবা সে গভীর ব্যথা মধুরে পরাণে বাজে
কিবা সে অবশ তনু শোক পরশিলে॥
কিবা সে স্মৃতির জ্বালা, পরাণ আকুল করে
কি আবেশে ঝরে জল মুদিত নয়নে।
স্তবধ পরাণে যেন উথলে তরঙ্গরাশি
ঘাত প্রতিঘাতে কত সুখ ওঠে মনে॥
বিধিরে! জনমান্তরে দিও দুঃখ হৃদিপুরে
কাঁদিব পরাণ ভরে বসি এক মনে।
সংসার বন্ধনগুলি দিও জন্মান্তরে খুলি
দিও কিন্তু আশা তৃষ্ণা ঢালিয়া জীবনে॥
আধ লাজ আধ ক্ষুধা, দিওনারে হেন দ্বিধা
পরাণ ভরিয়া যেন পারি কাঁদিবারে।
অমনি বাঁশরি গলে, পরাণ ঢালিয়া দিব,
ছড়ায়ে পড়িবে প্রাণ অমনি সংসারে॥
পাতায় লতায় মূলে, ও গীত যেমনি বাজে
যেমনি কাননপুরে ওঠে প্রতিধ্বনি।
আমারো সে গীত যেন, বাজে নরনারী প্রাণে
সংসার পুরিয়া যেন, উঠে সে নিক্কণি॥
ওই পুন তপস্বিনী রাখিয়া বাঁশরি খানি
সজল নয়নে চাহি নাথের বদনে।
না পরশি তনু তার, সুধুই নয়নে হেরে
কি তৃষ্ণা পূর্ণিত দৃষ্টি ঝরে ও নয়নে॥
নাথের যুগল আঁখি, পল্লবে রয়েছে ঢাকা
গভীর নিদ্রায় যেন রয়েছে মুদিত।
বিকসিত ওষ্ঠাধরে বিরাজে রক্তিম রাগ
বদন মণ্ডল যেন ভাষায় জড়িত॥
মৃণাল সে ভুজদ্বয়, অলসে অবশ যেন
সেই পদ্মরাগ শোভে বিশাল উরসে!
প্রশান্ত ললাট খানি শান্ত স্বেদ ক্লেদ হীন
প্রসারিত যেন ঘোর নিদ্রার পরশে॥
জীবিত এখনো যেন, নিদ্রিত সুধু কি তবে
সে কিরে বিষাদ কেন এতই নিষ্ঠুর।
তপস্বিনী প্রিয়তমা, এ দীর্ঘ বৎসর ধরি
কাঁদিছে পারশে তবু নিদ্রা নহে দূর॥
জাগ, জাগ পুণ্ডরিক দেখহে নয়ন মেলি
কি রত্ন পড়িয়া আজ পারশে তোমার।
স্বরগের পারিজাত, মরতের কহিনুর
এ রতন তুলনায় সকলি সে ছার॥
কে বলে তাপস তোমা, কেবলে ভিখারি তুমি,
কি দেবেন্দ্র-কি নরেন্দ্র—কাহার ভাণ্ডারে।
আছে ও অমূল্য মণি, আছে ও প্রেমের খণি
ও অশ্রু ঝরেছে বিশ্বে বল কার তরে॥
কোন্ ব্রতে ছিলে ব্রতী কি তপ করিলে বল
অতীত জীবনে বল কি পুণ্য লভিলে।
কি শিক্ষা শিখিয়াছিলে, কি মন্ত্র আয়ত্ত করি
এমন দুর্ল্লভ রত্নে সঞ্চয় করিলে॥
অভাগা কবির ভাগ্যে সাধ্য কিসে দৃঢ়ব্রত
কি কঠিন পণ তার কিবা সে আচার।
সাধি যদি যুগে যুগে, ধরি সে কঠোর ব্রত
ফলিবে কি ও তপস্যা অদৃষ্টে আমার॥
পুণ্যবান পুণ্ডরিক পুণ্যবতী মহাশ্বেতা
জগতের রম্য ছবি তোমরা দুজন।
কালের বিশাল বক্ষে এমনি মধুর ভাবে
বিরাজিবে চিরদিন যাবত ভুবন॥

শ্রীঈঃ—

কাব্য—কবি—বাঙ্গালা কবি।

১২৮৬

শুনিয়াছি নাকি মলয় পর্ব্বতে ভেরেণ্ডা বৃক্ষ জন্মিলেও, স্থানমাহাত্ম্যে তাহা চন্দন-বৃক্ষে পরিণত হইয়া থাকে। বোধ করি, বিধাতার সেই নিয়ম অনুসারেই, বঙ্গভূমির সাহিত্যক্ষেত্রে যে কোন ছন্দোবদ্ধ বাক্য ছাড়িয়া দিলেই, তাহা কাব্যে গণিত হইয়া যায়। না হইবে কেন ?—এখানকার স্থান মাহাত্ম্য অনেক! যেখানে মহকুমার ডিপুটি, থানার দারোগা, বড়লোক পদবাচ্য হয়; উমেদারকে চাকুরিদানে মহানুভব; ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দুই পয়সাদানে ধার্ম্মিক; সংবাদপত্র সম্পাদককে ঘুস দিলে বিদ্বান্; এবং একমেব দ্বিতীয়ং বলিলে ব্রাহ্ম হইতে পারা যায়; সেখানে তোমার আমার তাহার, খণ্ড, গণ্ড বা ভণ্ডকাব্য, কাব্যপদবাচ্য; এবং তুমি, আমি, তিনি মহাকবি বলিয়া গণিত না হইব কেন ? বঙ্গভূমিতে কাব্যের এখন কি শস্তা বাজার! পথে ঘাটে মাঠে, যেখানে যাও, সেখানেই কাব্য পাইবে; পাঠশালার বালকেরা পর্য্যন্ত, কাঁধে করিয়া পথে পথে ফেরি করিয়া ফিরিতেছে। এই না কাব্যের আশ্রয় লইয়া কয়েকটি ভিক্ষুক, ভিক্ষুক হইলেও, রাজ্যেশ্বরকে অতিক্রম করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে ? সেই দৈবশক্তিময় কাব্য কি এই ? তবে এই অপক্ককদলিদর্শন সেই দৈবশক্তিময় কাব্য, না জানি কি অদ্ভুত বস্তু! আইস বাঞ্ছারাম, একবার আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; দেখি, সুবিধা পাইলে, তুমি আমিও কেন এই সুযোগে কাব্য লিখিয়া, কবি বলিয়া গণ্য হইয়া না যাই ?

সবাই বলে কাব্য,—কাব্য; কিন্তু কাব্য যে কি তাহা কাহারও মুখে শুনিতে পাই না। সম্ভবও নহে! গাছ হইতে আতা পড়িতেছে, তুমি দেখিতেছ, আমি দেখিতেছি, সবাই দেখিতেছে, নিউটন দেখিতেছে, নিউটনের কুকুরও দেখিতেছে, কিন্তু বুঝিতেছে কে ? তবে আক্ষেপের বিষয় এই, বঙ্গভূমে যতগুলি লোক, সবাই জ্যেষ্ঠ; কনিষ্ঠ কেহ নাই।

কাব্য কাহাকে বলে ? অনুপ্রাস ছটা, সুমধুর শব্দবিন্যাস, কৌশলময় ভাবপূর্ণ শ্লোকখণ্ড, অথবা বোমের আওয়াজের ন্যায় পদবিশেষ, ইহা কি কাব্য ? আমাদিগের অভিধান খুলিয়া দেখিলাম, উহাকে কাব্য বলে না, অথবা কাব্যের কাব্যত্বপক্ষে তিলমাত্রও সহায়তা করে না। কামানল, হোমানল, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল উলট পালট, ত্রিভুবনে খবর চালাচালি, দেবাসুর সংগ্রাম, নরকদর্শন, বজ্রপাত, ঘোরযুদ্ধ, ইত্যাদি

ইত্যাদি, এ সকলও একে একে খুলিয়া দেখিলাম, কিন্তু বৃথা, ইহাদিগকেও কাব্য-পদে অভিহিত করে নাই। মালোপমা, ঝাঁপতাল, আরও যে কিছু তাল আছে, ইহাদিগকেও কাব্য বলেনা। এ সকল বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিক এবং তাহার দাসানুদাসদিগের সম্পত্তি। সে সকল আলঙ্কারিকদিগের পক্ষে অনর্থক কালক্ষেপে আত্মধ্বংসাপেক্ষা; কাল এরূপে, যতই সামান্যভাবে হউক, সদুদ্দেশ্যে যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাই সৌভাগ্য। তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যালঙ্কারমালা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি করিতে থাকুন। শিশির, বসন্ত, এ বিশ্বের পরমাণুটি পর্য্যন্ত যখন সকলকেই ভোগ করিতে হয়, তখন কাব্য সম্বন্ধেও যে তাহা খাটিবে না, এমন কখনও হইতে পারে না। যাহারা সেই শীতকে কঠোরতর করিয়া তুলিতেছে, তাহাদিগের পথ মন্দ হইলেও, তাহাদিগের হইতে শুভপক্ষে কিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা থাকায়, কেন তাহাদিগকে ধন্যবাদ না দিই? কঠোরতর শীতের পরে বসন্ত অতি মনোহর; দারুণ অমাবস্যার পরে পূর্ণিমার চন্দ্র বিশেষ আনন্দদায়ক; অধিক অন্ধকারের পরে আলোক উজ্জ্বলতায় অধিকতর; অনেক মিথ্যার পরে সত্য অধিক প্রীতিকর হইয়া থাকে। একে কাব্য অতুলনীয়, মানবের পক্ষে দেবদত্ত ধন, আদরের জিনিস, কণ্ঠের হার, জীবনের পরিচালক, জীবনবৃত্তির শিক্ষক; তাহাতে সেই পদার্থের যে বৈপরীত্ব সমাবেশে আবার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সে ধন্যবাদের পাত্র নয় ত কি? অথবা আলঙ্কারিক বা তাহার দাসবর্গের কথাই বা বলি কেন? ঈশ্বর, যার পর নাই শয়তানের দ্বারাও সুকার্য্য প্রসব করাইয়া থাকেন।

কাব্য কি, চিরকালই ঠিক আছে, অথচ এ পর্য্যন্ত তাহা ঠিক হইল না। সময়ে সময়ে বহুতর জগৎপূজ্যগণ বহুতর কথা বলিয়া গিয়াছেন, বহুতর ব্যাখ্যা করিয়া লোক বুঝাইয়াছেন; অথচ তাঁহাদিগের সময় অতীত হইলেই, লোকে আর সে কথায় বুঝে না, আর সে কথায় ভুলে না, আবার নূতন কথা শুনিতে চায়। কেন? বাঞ্ছারাম, আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহারা শুনিতে চাহিবে না কেন, ইহাতে কি আশ্চর্য্য বোধ হয়? যদি হয়, তাহা দুর্ভাগ্য,—নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া জানিও। যদি একই কথায়, একই ব্যাখ্যায় চিরকাল ভুলিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা বস্তুতঃ দাঁড়াইতাম কি?—সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সুমহান্ পাকযন্ত্র মাত্র। এই পাকযন্ত্রগুদাম পৃথিবীতে, বর্ম্মিংহাম পেটেণ্ট শ্রেষ্ঠ যন্ত্র দাঁড়াইতেন তাঁহারা, যাঁহারা এখন হেয়, অধম মধ্যে পরিগণিত, —সেই গজস্কন্ধ, অযত্ন-আহার-কুশলী মহাপুরুষগণ! কিন্তু নিয়ন্তার ইচ্ছা স্বতন্ত্র!

নিয়ন্তা-সম্ভব আমাদের এই জীবনসমষ্টি, নিতান্ত পাকযন্ত্রস্থ বাষ্পবেগ নহে। উহা বিচিত্রশক্তিময়ী, দিব্য, দৈব, বিশ্ববিচারিণী, বিধাতৃবিদ্যুৎকণা বলিয়া জানিও। উহার গতি অনন্ত গর্ভ দিয়া। নিয়ন্তা অনন্ত, জগত অনন্ত, কাল অনন্ত, আমাদের জীবনগতি অনন্ত, এবং আমাদের জাতীয় জীবনগতিও অনন্ত। কিন্তু এ গতি কো-

থায়? কোন উদ্দেশ্য স্থানে? বলিতে পারি না, কিন্তু গন্তব্যস্থান যেখানেই থাকুক, আমরা অনন্তগতিতে সেই একই স্থানে যাইতেছি। বাঙ্গারাম, ইতিহাস পড়িয়াছ? প্রাচীন বৃত্তান্ত শুনিয়াছ? শুনিয়া থাক যদি, ভাবিয়া দেখ দেখি জাগতিক জাতিসমূহ, বিভিন্ন পথে হউক, কিন্তু একই গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাইতেছে কি না? আমরা যাইতেছি, আমরা সকলেই যাইতেছি, আমাদের পশ্চাতে যাহারা আসিতেছে, তাহারাও যাইবে; অনন্ত গর্ভ দিয়া যাইবে; আসিয়াছি অনন্ত হইতে, যাইব অনন্তে।

এই দারুণ অনন্তপথ যে অনন্ত অবস্থাসঙ্কুল হইবে, ইহাতে কি আশ্চর্য্য বোধ হয়? ফলতঃ পথ যেখানে অনন্ত, সেখানে অবস্থারও অন্ত নাই। যদি তাহাতে সন্দেহ হয়, তবে দূরবীক্ষণ বা অদূরবীক্ষণ, যাহার সাহায্যে হউক, একবার গগন-সমুদ্রে দৃষ্টিপাত করিও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে। ভাল! আমরা যে এই নিঃসহায় মানবশিশু সকল সেই অপার অবস্থাসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিতে চলিয়াছি, আমরা কি একা? আমাদের পথদর্শক বা উৎসাহবর্দ্ধক কি কেহ নাই। হিব্রুজাতি মিসর হইতে আসিবার সময় পথদর্শকরূপে কখনও অগ্নিস্তম্ভ, কখন মূসাকে পাইয়াছিল। আমরাও কি কাহাকে পাইতেছি না? আমরাও কি সেই ঈশ্বরের সন্তান নহি? আমরাও পাইয়া থাকি। আমাদের পথও যেমন পর্ব্বে পর্ব্বে অপার অবস্থাসঙ্কুল, তেমনি আমরা পথদর্শকও সময়ানুরূপ বহুতর পাইয়া থাকি। যখন যাহাকে পাইতেছি, তখন পূর্ব্ব দর্শক অপেক্ষা তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা এবং গণনা করিতেছি; তাহাকেই আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহার বর্ণনাতে মোহিত হইতেছি; এবং সহচরদিগকে মোহিত করিতেছি। আবার সে অবস্থা উলটাইয়া গেল, আবার নূতন দর্শক পাইয়া নূতন কথা বলিলাম। অতএব বাঙ্গারাম, কাব্যের যে নিত্য নূতন ব্যাখ্যা শুনিবে; অথবা কেবল কাব্য কেন, যে কোন বিষয়েরই যে নিত্য নূতন ব্যাখ্যা শুনিবে; এবং আজি শুনিবে, কালি পরিত্যাগ করিবে; তাহাতে বিচিত্র কি? যাহারা এরূপ ব্যাখ্যা করে ও শুনায়, তাহারা ভাল; দোষের মধ্যে এই যে, তাহারা আপন ব্যাখ্যাকেই সম্পূর্ণ বলিয়া গণনা করিয়া থাকে; বোধ করি তাহার কারণ, আর অধিক তাহাদের দৃষ্টি চলে না। কিন্তু আর যাহারা তোমাকে সূত্র নিয়মাদি রচনায় একেবারেই গমনে বাধা দিতে প্রস্তুত, তাহারা ঘৃণার বস্তু, স্বীয় ঔদার্য্যগুণে তাহাদের দোষ ক্ষমা করিয়া যাও; বিশেষ, যেহেতু তাহারা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় জলের ছিটা স্বরূপ।—অগ্নির তেজ বাড়ায় ভিন্ন কমায় না।

তুমি কি দেখ নাই, মানবজীবন বা জাতীয় জীবনের অবস্থা অনুসারে, সময় অনুসারে, গতি অনুসারে, কাব্যেরও স্বভাব এবং প্রয়োগ কিরূপ বৈচিত্রবহুল হইয়া থাকে? যদি দেখিয়া না থাক, একবার বিভিন্ন সময়বিভেদে এই ভারত ক্ষেত্রস্থ কাব্য সমূহের আলোচনা করিয়া দেখ। বেদ, রামায়ণ এবং মহাভারত, এতৎ ত্রয়ে স্বভাব ভেদ কোথায় এবং কিজন্য, তাহা

আলোচনা কর। অথবা তুমি বা নিধুর টপ্পায় মোহিত হও কেন, আর একজন বা তাহা ফেলিয়া শান্তি শতক লইয়া উন্মত্ত কি জন্য ?

অতঃপর জিজ্ঞাস্য, কাব্য কাহাকে বলে ? যদি বাক্যকে ছন্দোবন্ধ করিলে কাব্য হয় ; এবং শুনিয়াছি কবিরা নাকি পাগল, অতএব যদি খেয়াল লিপিবদ্ধ করিলে কাব্য হয় ; তবে বঙ্গভূমির পয়ার রচকদের এরূপ দুর্দ্দশা কেন ?—ছন্দোবন্ধেরও কমি নাই, খেয়াল ও অপার! যদি শব্দ বিন্যাস এবং ভাববিন্যাস কৌশলে কাব্য হয়, তবে উদ্ভট কবিরা উৎসন্ন হইয়া বাল্মীকি কালিদাস থাকেন কেন ? যদি উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা হয়, তবে সৃষ্টির দিন হইতে একাল ধরিয়া কত লোক নীতি শিখাইল, তথাপি লোকে শিখে না কেন ? যদি উদ্দেশ্য খোষ আমোদ হয়, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে কি খোষ আমোদের কিছু কমি আছে ? সহজেই ত লোকে খোষ আমোদে আত্মহত্যা করিতে চলিয়াছে, তবে আবার তথায় আগুণে আহুতি দেওয়ার ফল ? কাব্যের উদ্দেশ্য যদি শ্রুতিবিনোদন হয়, তাহা হইলে সুরমা কর্ণাটরাজপ্রিয়া কালিদাসের কণ্ঠে বাম চরণ দিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছিলেন ; কারণ মধুর কামিনী কণ্ঠের নিকট তোমার কালিদাস কোথায় থাকেন। তোমার কালিদাস খোল, আর পশ্চাৎ হইতে তোমার প্রণয়িনী আসিয়া তোমায় প্রিয় সম্ভাষণ করুন, দেখ জয় পরাজয় কাহার হয়। তবে কি কাব্যের উদ্দেশ্য স্বভাব চিত্রন ?—স্বভাব চিত্রনের এত দাম ? তাহা হইলে ফটোগ্রাফের মূল্য চারি পয়সা কেন ; যদি দেব চরিত, বীর চরিত, ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ণনে কাব্য হয়, তবে বর্ণনীয় রাজা রাজড়া ফেলিয়া বর্ণনাকারী ভাটের আদর এত কেন ? কবেকার হোমার, কবেকার বাল্মীকি কোথাকার কালিদাস, কতকাল ধরিয়া জীবিত রহিল, এবং রহিবে। ভিক্ষোপজীবী অরণ্যবাসী, সমাজপরিত্যক্ত ; তাহাদিগকে আমরা কি জন্য পূজা করি ; আর যাহারা তাহাদিগের রাজ্যেশ্বর ছিল, তাহাদিগকে স্মরণ করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে বিস্মৃতির অন্ধতম গুহায় ফেলিয়া দিয়াছি কেন ? তাহারাত তাহারা ; তাহাদের সময়কে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। হোমার এখন আমাদের হোমার, বাল্মীকি এখন আমাদের বাল্মীকি। আজি যেমন আমরা "আমাদের"—বলিতেছি, এইরূপ যুগ যাইবে, আমরা যাইব, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে "আমাদের" এই শব্দ যাইবেনা। উহা কালের সঙ্গে গতির মুখে সমান বেগে সমান পদে ছুটিবে। স্তুতিগায়ক, মহিমাগায়ক ভাটের এত আদর ? হয় মনুষ্য জাতি খেপিয়াছে, নতুবা কবিরা ভাট নহে ; কাব্যও স্তুতি বা মহিমা গান নহে।

বাঞ্ছারাম, যাহা যাহা বলিলাম, কাব্য তাহার কিছুই নহে ; অথচ এ সকলেরই নামাবেশে কাব্যের গঠন। কাব্যের বিষয়ীভূত বস্তু যাহা, তাহা দিব্য, অপৌরুষেয় এবং অনন্তদিশ্ময়। অন্তবন্ধ মানবচক্ষের ধারণা-উপযোগী পার্শ্বিক মাত্র, এক এক সময়ে ক্ষণানুসারে, প্রকটিত হইয়া থাকে।

যখন সেই গঠনে এই দিব্য বস্তুর সঞ্চার হয়, তখনই তাহা জীবন্ত কাব্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতকে পবিত্র করিতে থাকে।

আবার জিজ্ঞাসা করি কাব্য কাহাকে বলে? বলিতে পার কি গুণে দেলিস্লি মার্সিলীয় সঙ্গীতে আজি পর্য্যন্ত ফরাসি জাতিকে স্বদেশহিতৈষিতামোহে উন্মাদিত করিয়া থাকে? কি গুণে দেল্ফির দৈবনির্দ্দিষ্ট ত্রিচক্ষু সেনাপতি, রণকার্য্যে পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্বেও, কেবল এক সঙ্গীতামোদে মাতাইয়া গ্রীকসৈন্যবর্গকে রণজয়ে সমর্থ করাইয়াছিলেন? কি গুণে আর্য্যসংসারে আর্য্যঋষির গীতিসমূহ বেদবচনরূপে পরিণত হইয়া মানবমণ্ডলীর ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে? কি গুণে হোমারীয় স্তোত্রসমূহ দেবমন্ত্ররূপে পরিণত হইয়া গ্রীকজাতিবর্গকে সুপথে এবং ধর্ম্মপথে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে? সে গুণ কি তাহা বলিতে পার না পার, এবং তাহার নাম যাহাই হউক, তাহাকেই কাব্যের মূল, এবং তাহাই কাব্য বলিয়া জানিও।

তুমি জ্ঞাত আছ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তা যাহাই হউক, জানিও আমরা জগতরূপি কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই কর্ম্মরত। সামান্য পরমাণু হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্কপিণ্ড পর্য্যন্ত, কি জড় কি অজড়, আমরা সকলেই অবিশ্রান্ত কর্ম্মরত। শান্তি নাই, বিরাম নাই, অনবরত অনন্ত কর্ম্মপথে প্রধাবিত হইতেছি। আমাদের এই কর্ম্মপথ কামনাহেতুক, এবং কালচক্র বাহিয়া উহার স্থিতি। কালচক্রেরও, চক্রধর্ম্মানুরূপ আহ্নিক এবং বার্ষিক গতি আছে। এই দ্বিবিধ গতিবশে, জীবনযাত্রায় নিত্য অবস্থাবৈচিত্র এবং নৈমিত্তিক অবস্থাবৈচিত্র ঘটিয়া থাকে। কি ব্যক্তিগত জীবন, কি জাতিগত জীবন, উভয়েতেই উহা সমান প্রযুক্ত। আমরা আমাদিগের কর্ম্মপথে প্রতিনিয়ত নিত্য বা নৈমিত্তিক অবস্থা বিপর্য্যয়ে, বা অবস্থান্তর ঘটনে, পথবিতথের ন্যায় আকুলিত এবং রোরুদ্যমান হইয়া থাকি; অথচ কিছুই নিরাকরণ, কিছুই নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না।—কি যেন বলিব বলিব করিতেছি, অথচ বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কি যেন ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, অথচ কি জন্য তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কি যেন খুজিয়া খুজিয়া শ্রমবিদ্ধস্ত হইতেছি, অথচ তাহা কি জন্য, অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য বস্তু কিরূপ, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। এইরূপ মূঢ়ের ন্যায় আঁধারে পড়িয়া দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি; অথচ কালচক্র আমাদিগের পশ্চাৎ হইতে, পাছে পশ্চাৎ হইয়া পড়ি বলিয়া, অনবরত তাড়না করিতেছে। যেন বস্ত্রবন্ধনয়ন মানব, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আবদ্ধ হইয়া, যেদিকে যাইতেছে সেই দিকেই প্রাচীর কপালে ঠুকিয়া পড়িতেছে; অথচ যাও যাও করিয়া পিছন হইতে বেত্রাঘাতেরও ত্রুটি হইতেছে না। এরূপ অবস্থা, কি ব্যক্তিগত জীবন কি জাতিগত জীবন, উভয়েতেই সমান আসিতেছে, যাইতেছে; তবে কে কতদূর এই দুর্বিপাক নিরসনে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে, কেহ কেহ বা নিষ্কৃতি পাইবার পূর্ব্বেই পৃষ্ঠ ভাঙ্গান দেয়, তাহা তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্মস্থলের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

যাঁহারা এরূপ দুর্ব্বিপাক নিরাকরণ করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য এবং যথার্থ ধন্যবাদের পাত্র। প্রাচীরআবদ্ধ বদ্ধচক্ষু বেত্রাঘাতপীড়িত মানবকে যে যে সহসা চক্ষু মোচন করিয়া নিরাপদ গন্তব্য মুক্তি স্থানের সুখাভাস দিয়া থাকে; এবং যে যে সেই গন্তব্য স্থানের পথ সাবধান করিয়া পৌছনের উপায় করিয়া দেয়; সেই সেই ব্যক্তি সেই বন্ধন মুক্ত ব্যক্তির নিকট, কতই কৃতজ্ঞতা, কতই ভক্তির পাত্র হইবার সম্ভব। মানব জীবন, জাতীয় জীবন, ইহাদের তদ্রূপ উদ্ধারকর্ত্তার পক্ষেও অবিকল সেইরূপ। ঘোর কর্ম্ম বিপাকে যাহারা উক্ত প্রকার সুখাভাস দানে চক্ষু মোচন পূর্ব্বক আশ্বস্ত এবং উৎসাহিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা কবি; এবং যিনি সেই সুখাভাস-আকর্ষিত গতির বিপদ নিরাকরণ করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন; তিনি জ্ঞান তত্ত্ববিদ্। আর আর যাহারা, তাহারা এই যাত্রা-উপযোগী উপকরণ সংগ্রাহক এবং তৎপ্রয়োজক মাত্র। এই সংসারে কবি এবং জ্ঞানতত্ত্ববিদ্, এই সুমহৎ কার্য্য করিয়া থাকেন বলিয়াই, সংসার তাঁহাদিগের নিকট এত কৃতজ্ঞ, তাঁহাদিগের প্রতি এত ভক্তি দেখাইয়া থাকে। সেই জন্যই রাজা, রাজপুরুষ বিজ্ঞানবিৎ, অজ্ঞানবিৎ, সকল ফেলিয়া, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের নাম স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখে। সেই জন্যই হোমার ভিক্ষুক হইলেও, হোমারের রাজ্য ফেলিয়া হোমার চিরস্মরণীয়; সেই জন্যই আর্য্যঋষি চির পরাধীন জঙ্গলবাসী হইলেও, লোক সমাজে দেববৎ পূজ্য।

উপরে যে সুখাভাসের কথা কহিলাম, উহাকে আদর্শ, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে Ideal বলে। এই আদর্শই আমাদের কর্ম্ম নির্দ্দেশক ও কর্ম্মনিয়োজক এবং কর্ম্ম প্রাণ, অথবা কর্ম্মই উহার বিস্তার ও সম্প্রসারণ বলিলে হয়। কর্ম্ম পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলেই আদর্শের সিদ্ধতা। আমরা কর্ম্মরত জীব, কর্ম্মই এ জীবনের পরিমাণ, সুতরাং কর্ম্মেই সুখ, আদর্শে সেই সুখের পূর্ণতা। সেই সুখ ভিন্ন পৃথিবীতে আর শ্রেষ্ঠ সুখ নাই। আমি বুঝিতেছি বাঞ্ছারাম, তুমি এ কথায় বিশেষ চটিতেছে, বিশেষ তুমি যখন সুখভিত্তি জ্ঞানে বাহ্য সম্পদ সংগ্রহার্থে এ বয়স ধরিয়া মাথার চাঁদি ফাটাইয়া আসিতেছ! তুমি ভাবিতেছ, সুখ যাহা তাহা বাহ্যসম্পদে। বাঞ্ছারাম, সম্পদে যদি সুখ থাকিত, তবে রাজা কাঁদে, মেথর হাসে কেন? প্রকৃতি এমনই সুচতুরা যে, পরিমাণ অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন কাহাকেই কিছু কিছু দেয় না। সুখ ত সুখ, যে কোন বস্তু দেখিয়া প্রার্থনাবান হইবে, অগ্রে তাহার পরিমাণ অনুরূপ বস্তুবিশেষত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত কর, তবে তাহা পাইবে। তাস দাবা খোষপোষাক বা অর্থসাধ্য বিলাস বস্তুতে সুখ নাই। উহা দুর্দ্দমনীয় কালকে বালকোচিত বিস্মৃত ও ফাঁকি দিবার পন্থা মাত্র। বাহ্য সম্পদ বা এসকলে সুখ নাহি। সুখ, চিত্তের তৃপ্তি; এবং উহা রাজা প্রজা সকলেরই নিকট সমান সুসাধ্য। এই জন্যই উচ্চ নীচ নানা পর্য্যায়, নানাবৃত্তি রত হইলেও, সকলেই যথাশক্তি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বাঁচিতেছে; নতুবা বাঁচিত না, ফাটিয়া মরিত।

এই তৃপ্তির চরমোৎকর্ষ আদর্শের পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত হয় না। তোমার বাহ্যসম্পদ, বা তাস দাবার জন্য কয়জন লোক আত্মবলিদান দিয়াছে? আর দেখ আদর্শের খাতিরে কত অসংখ্য অসংখ্য! নাম শুনিতে চাও, সক্রেটিস দেখ, বিশুখৃষ্ট দেখ, মধ্যযুগের খৃষ্টশিষ্যদিগকে দেখ, নেপোলিওন দেখ; এ সকল বড় বড় নাম, ইহাদের আদর্শভিত্তিও, সহসা মনে ধারণা করা সুকঠিন। ছোট ছোট নাম দেখিতে চাও, ইতিহাস খোল, বা চক্ষু থাকে তবে তোমার পার্শ্বস্থ কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আরও ছোট ছোট দেখিতে চাও, আলোকাকৃষ্ট পতঙ্গদিগের প্রতি নিরীক্ষণ কর; দেখ, কেমন অকাতরে আত্মপ্রাণ বলিদান করিতেছে। বাঞ্ছারাম, এই আদর্শকেই কাব্য কহে। এই জন্যই কাব্যের আদর সকল হইতে এত অধিক; এই জন্যই কাব্য লইয়া সংসার পাগল।

কাব্য অপার, অনন্ত এবং ইহার ভাণ্ডারও ক্ষয়রহিত। আঢ়কধারী স্বয়ং অনন্ত দেব। এমন সংসারে গ্রাহক এবং বাহক যে অনন্ত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রাহকেরা গ্রহণ করিতে পারিলেই, বাহক প্রস্তুত। কিন্তু তথাপি অনেক মূর্খ আছে যে, যাহারা বলিয়া থাকে যে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যেরও উৎপত্তিহ্রাসতা হইয়া থাকে। সুতরাং বলিতে হয় যখন একেবারে অধিক উন্নতি হইবে, তখন কাব্যও একেবারে হ্রাসপ্রায় হইবে। অতি সুবোধের কথা, যেন এই খানেই আমাদের সকল শেষ হইল! উন্নতি, উন্নতি! এ উন্নতি আমার নব্য বঙ্গীয়ের "ঊনবিংশ শতাব্দি" বিশেষ; কাহার ঘাস জলে কাহার জাঁক! উন্নতি কাহাকে বলে, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের নাম উন্নতি। কাল যখন যে ভাবে ক্রমান্বয়ে আগত হইতেছে, তখন তাহারই মত প্রস্তুত হওয়াকে উন্নতি বলে। ঘোড়ার গাড়ি ছাড়িয়া রেলের গাড়ি পাইয়া ভাবিতেছ, আজি তুমি অত্যন্ত উন্নতি করিয়াছ; তুমি জানিও মানবমণ্ডলী যে দিন গরুর গাড়ি ছাড়িয়া ঘোড়ার গাড়ি পাইয়াছিল, তাহারাও সে দিন অবিকল সেইরূপ ভাবিয়াছিল। আবার যে দিন রেলের গাড়ি ছাড়িয়া লোকে হাওয়ায় চলিতে শিখিবে, সে দিনও তাহারা সেইরূপ ভাবিবে। অতএব ভাবনারও অন্ত নাই, কালেরও অন্ত নাই, সুতরাং উন্নতিরও অন্ত নাই। ইহারা তিনই সৃষ্টির দিনে এক সঙ্গে বাহির হইয়াছিল, তিনই এক সঙ্গে একরূপে সমানপদে চলিয়া আসিয়াছে; এবং তিনই এক সঙ্গে একরূপে সমানপদে চলিয়া যাইবে। দুর্দ্দমনীয় কালই সকলের মূল; আপনিও নিরন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে, আমাদিগকেও ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে। যদি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিলাম তবেই ভাল, তবেই উন্নতি, নতুবা অধঃপতন। অতএব উন্নতির সঙ্গে কাব্যহ্রাসতার সম্বন্ধ কি? বলিতে পার, অথবা বলিয়া থাক যে, চিত্ত তখন বহুবিষয়ে ব্যাপৃত হওয়ায়, এবং মনীষাশক্তির প্রাখর্য্য বশতঃ যুক্তিতত্ত্বের সমধিক প্ররোচণায়, কল্পনা ক্ষীণবল হইবায়; মানবচিত্ত বস্তুমূর্ত্তিগ্রহণ ও চিত্রণকে কাব্য বলিয়া থাকে? কাব্য কেন তাহাদিগের সাপেক্ষাধীন হইবে? প্রত্যুতঃ

সেই সেই বহু বিষয় কাব্যেরই বহুবিস্তার ও কাব্যজনিত ফল নহে কি? আগে কাব্য, পরে উন্নতি; অথবা কালোচিত ক্রিয়াদর্শ কাব্যকেই যথাবিহিত অনুসরণ করার নাম উন্নতি। অতএব উন্নতির সঙ্গে কাব্য ফুরাইবে কেন? তবে আমাদের কর্ম্ম ফুরাইলে, কর্ম্মাদর্শ কাব্য ফুরাইতে পারে বটে; কিন্তু কর্ম্মও ফুরাইবার নহে, সুতরাং কাব্যও ফুরাইবার নহে। উভয়ই অনন্ত। অদূরদর্শী, বাহ্যিরচটক, জ্ঞানমূঢ় মেকলে যখন ইংলণ্ডে বসিয়া, উন্নতির সঙ্গে কাব্য ফুরাইল বলিয়া চিৎকার করিতেছে; ঐ দেখ তখন জার্ম্মান ভূমির দিকে তাকাইয়া দেখ, কি অদ্ভুত দৃশ্য! বিরাটমূর্ত্তি, জগতকবি গেটে, প্রভাতরবির ন্যায় জার্ম্মানগগনে সমুদিত হইয়া, জ্যোতিবিস্তারে মধ্যাহ্নগগন অভিমুখে সমাগত হইতেছেন। জ্ঞানমূঢ় তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না. পাইবার কথাও নহে। গেটেকে যাহারা দেখিবে, তাহার অন্ততঃ মেকলের দুই শত বৎসর পরে জন্মিবে।

এই মনুষ্যসংসারে প্রকটিত যাবতীয় শাস্ত্রের মধ্যে, প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, কেবল কাব্য ও মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রই আধ্যাত্মিক; তদ্ভিন্ন আর সমস্তকে ভূতসাপেক্ষ, আধিভৌতিক বলা যাইতে পারে। আমাদের এই জীবন ভূত এবং আত্মা উভয় সমাবেশে নির্ম্মিত; সুতরাং আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক উভয়বিধ প্রয়োজনজালেই বেষ্টিত। তন্মধ্যে আধিভৌতিক, উপকরণ; এবং আধ্যাত্মিক, ফলাভাস।' এই ফলাভাসেই সুখাভাসের সম্বন্ধ।

কাব্য এবং জ্ঞানতত্ত্ব আমাদিগের সেই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের বিকাশক ও পূরক। কাব্য আমাদিগের এই জীবনগতির কর্ম্মভাব, জ্ঞানতত্ত্ব তাহার বিজ্ঞতা। অথবা অন্য কথায়, কাব্য আমাদিগের আধ্যাত্মিক দেহের, দৃষ্টমূর্ত্তি সৌন্দর্য্য; জ্ঞানতত্ত্ব তাহার দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসংস্থান। আর সমস্ত শাস্ত্র আধিভৌতিক প্রয়োজনপূরক। আমি যে কখন মাটী কাটিতেছি, কখন আকাশ মাপিতেছি, কখন বা জাহাজ চালাইতেছি, সে কেবল আমার আধ্যাত্মিক আদর্শ কলে সাধন করিবার জন্য। যতক্ষণ আমার সেরূপ সাধন উদ্দেশ্য না হইবে, ততক্ষণ আমি কথনই সেই সেই কার্য্যে সুখ পাইব না বা রত হইব না। একথা শুনিয়া যেন এমন বুঝিও না যে, আধ্যাত্মিকভাব হইতে আধিভৌতিকভাব হেয়। হেয় কেহই নহে। আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক উভয়ে পৃথক বস্তু নহে, একই বস্তুর দুই বিভিন্ন দিকমাত্র। ভৌতিক, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আত্মিক যাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রত্যক্ষ হয় নাই, কেবল চিত্তের দ্বারা প্রত্যক্ষ বলিয়া মানা যায়। এই ভৌতিক পৃথিবীতে স্থূলশরীরী হইবায়, আমাদের সমক্ষে, আত্মিক এবং ভৌতিক উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষাধীন। সুতরাং উহাদের সামঞ্জস্যতেই আমাদের জীবনগতির সৌন্দর্য্য ও তাহার পূর্ণতা। ইহার যে কোন দিকে ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিপদ।

মূর্খ! খালি অভিপ্সিত গন্তব্য স্থান দেখিয়া নাচিলে কি হইবে; পায়ের সাহায্য না থাকিলে যাইবার উপায়? তবে যদি ঘ্রাণ আহারে কখন তোমার উদর পূর্ণ হইতে

দেখিয়া থাক, তাহা হইলে একান্তেতর ধরিলে ক্ষতি নাই। ফলতঃ অনেকে, বিশেষ নাগা-সন্ন্যাসীরা এবং অধুনাতন দুই একজন প্রচারকও, কেবল আধ্যাত্মিক ভাব ধরিয়া এইরূপে ঘ্রাণাহারে উদরপূর্ত্তি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। একটি ছাড়িয়া কেবল একটি ধরিলে, সামঞ্জস্য রহিল কোথায়? যেখানে সামঞ্জস্যের অভাব, সেখানে ফলেরও অভাব। স্ত্রীগুণ ও পুরুষগুণের একত্র সমাবেশ ভিন্ন ফলের উৎপত্তি নাই। আমাদের এই জীবনে আধিভৌতিক প্রয়োজন পুরুষ-গুণ। নাস্তিকে তাহা বুঝে না। এই জন্য ভৌতিক শাস্ত্রের যে অযথা গোড়া, সে প্রকৃতভাবে কাব্যাদির সৌন্দর্য্য, কাব্যাদির মহত্ব বুঝিতে পারে না; তাহার হৃদয় শুষ্ক। তেমনি কাব্যাদিরও যে অযথা গোঁড়া, সে অন্যশাস্ত্রের মর্ম্মাবধারণে ও তাহাদের প্রয়োজন নিরাকরণে অক্ষম; তাহার হৃদয় রসশূন্য নহে; কিন্তু তথায় রসের আধিক্য হেতু সে বাহ্যদৃষ্টিতে বঞ্চিত। অতএব উভয়েরই উভয় দিকে অন্ধের মৃগয়া মাত্র।

কাব্যের অন্তঃ-ভাব (Subjective nature) ভৌতিক না হইয়া সর্ব্বদাই আত্মিক হওয়ায়, তদ্বিষয়ীভূত যে আদর্শবস্তু, তাহা সর্ব্বদাই মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতিকে উত্তেজিত, উৎসাহিত ও গতিশীল করিয়া থাকে; এবং সেই অন্তঃপ্রকৃতিরূপ দ্বার দিয়া শেষে আধিভৌতিক উপকরণ সহযোগে কার্য্যরূপে ভৌতিক মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। কাব্যের বিষয়ীভূত সেই আদর্শই যথার্থ আদর্শ, যাহা ভাবি-বিকাশক, ভাবি-কার্য্যসাধক, যাহা আমার অগোচর বিষয় ছিল, তাহা গোচর করিয়া দেয়। যে কাব্য এরূপ আদর্শ-প্রাণ, তাহাই যথার্থ কাব্য; তাহাই বহুকাল এ জগতে জীবিত থাকিয়া, মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে। যাহা এরূপ নহে, তাহা কাব্যও নহে; এবং তাহাদের জীবনকালের সংখ্যাও অতি সামান্য। কথা এই, যাহার যত দিন এ সংসারে প্রয়োজন, সে ততদিন বাঁচিবে; আর সেই বস্তুরই প্রয়োজন, যাহার অভাব। কিন্তু যাহা আমি জানি, তাহা যদি জানাইতে আইস; যাহা শুনিয়াছি, তাহা যদি শুনাইতে আইস; যাহা আমি করিতেছি, তাহাই যদি করাইতে আইস; তাহা হইলে কেন আমি তোমাকে গ্রাহ্য করিব। এমনও কখন কখন হইতে পারে বটে যে, তুমি সেই সেই বিষয় নানা অলঙ্কারযুক্ত ও কৌশল-আবৃত করিয়া, আমার সমক্ষে নূতন বলিয়া পরিচয় দিয়া, ক্ষণেকের তরে আমাকে ভুলাইতে পার; কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য?—চেনা জিনিস চিনিতে কতক্ষণ লাগিয়া থাকে? একবার মাত্র চোখ্ চাহিয়া ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলেই তোমার গুমর ফাঁক! বাঞ্ছারাম, এই জন্যই ঈশ্বরগুপ্ত "ব্যাপ্ত চরাচর, যাহার প্রভাবে প্রভা করে প্রভাকর" হইয়াও, এখন দেখ, একেবারে লুপ্তনাম। কলিকাতা এবং দেশশুদ্ধ বাবু সাহেবদের বাহবা লইয়া, সৌভাগ্যের গাদায় বসিয়াও, ঈশ্বরগুপ্ত লুপ্তনাম; আর দেখ তোমার দিবাত্রয়-অনাহারী, দশ আড়িধান ও শালুকের নৈবেদ্য-সম্বল কবিকঙ্কণের দিকে চাহিয়া দেখ, কেমন জীবিত! যেন আজিকেরই কবিকঙ্কণ, ভিক্ষুক চণ্ডীবগলে এই দ্বারে উপস্থিত! .

অতএব যথার্থ কাব্য যাহা, সে সর্ব্বদাই স্বীয় উৎপত্তি-সময় হইতে পূর্ব্বগামী। তাহার বিষয়ীভূত বস্তু এরূপ যে তাহার অঙ্কুর সেই কাব্যোৎপত্তি-সময়ে হইয়াছে; কিন্তু তাহার পূর্ণতা তদপেক্ষা দূরতর সময়ে নিহিত। বস্তু যত গুরুতর, তাহা সেই পরিমাণে দুরারাধ্য, এবং তাহার পূর্ণতাও তত দূরে। এই নিমিত্তই যথার্থ কাব্য যাহা, তাহা প্রায়ই, কোন কোনটি গুরুত্ব অনুসারে একেবারেই, স্বীয় উৎপত্তি-সময়ে সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয় না।---কাব্যের বিষয়ীভূত বস্তুর অঙ্কুর-মাত্র-সম্বল লোকে, কিরূপে তাহার সমগ্র মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইবে? এবং মর্ম্ম যতক্ষণ না বুঝিবে, কেই বা আদর করিয়া থাকে। বাঞ্ছারাম, জানত পূর্ব্বদেশের লোকে, আগে "ব্যাতন" কত তাহা জানিয়া, পরে বসিতে কিরূপ আসন দিবে, তাহা নিরূপণ করিয়া থাকে। এখন বুঝিতে পারিলে কি জন্য তোমার বড় বড় কবিরা সময়ে সমুচিত আদর পাইয়াছিলেন না। যে কবি আপন সময়েই সম্যক আদর পায়, তাহাপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান্ কবি আর এ জগতে নাই।

বাঞ্ছারাম, তুমি এবং তোমার ন্যায় পণ্ডিতেরা এতক্ষণে আমার কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতেছ,—"কাব্যের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির ত সম্বন্ধ এই দেখিতেছি, কাব্য আদর্শ, আমরা তাহার অনুগামী। কাব্যালোক-আকৃষ্ট হইবার, তদনুগমনেচ্ছাজনিত যত্ন-ধর্ম্মে আমাদের সুপ্তবৃত্তি প্রবৃত্তিসকল জাগরিত করিয়া, তদ্যোগে উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন হইয়া, সেই আত্মশক্তি সহায়ে, কাব্যালোকপ্রদিষ্ট বিষয় আকাঙ্ক্ষায়, তদভিমুখে ধাবমান হইব ও তাহা সাধন করিব। ভাল তাহাই হউক। কিন্তু কাব্যেতে সৎ অসৎ উভয় বিষয়ই বর্ণিত হইয়া থাকে, তবে অসৎ বিষয়কেও কি সেই রূপে অনুগমন করিতে হইবে? তাহা হইলে শিক্ষা এবং জীবনগতির উন্নতি ত দেখিতে চূড়ান্ত!" পণ্ডিত! আর আর যতগুলি বলিয়া আসিলে সকলই সত্য, গোল কেবল যেখানে ভাবিয়াছ যে অসৎকেও, সতের ন্যায় সমভাবে অনুগমন করিতে হইবে। শিক্ষা আমাদিগের দুই প্রকারে, এক কি করিব, আর এক কি করিব না। কাব্যে সৎ অসৎ উভয়েরই আদর্শ দিতেছে; কিন্তু আমাদের সদসদ্ বিবেচক আত্মিক শক্তিযোগে একটিকে লইব, অপরটিকে পরিহার করিব। পরিহার করাইবার অভিপ্রায়েই কবির তাহা যোজনা; নতুবা নিজে, মন্দ-অঙ্কুরের আদ্যের পরিণাম বুঝিতে না পারিয়া, হয় ত তাচ্ছিল্যে তদনুগমনে তাহাতে অমঙ্গল ঘটাইয়া ফেলিতাম।

যাহা হইলে কাব্য হয়, তাহা যথাযথ উপরে বিবৃত করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কাব্যে গল্প ও বস্তুনির্দ্দেশাদি এবং ছন্দোবন্ধ প্রভৃতিও লাগিয়া থাকে। কিন্তু সে সকল উপলক্ষ্য বা কাব্যরসের আনুষঙ্গিক উপকরণাদি মাত্র। অনেকে, বিভিন্ন কবিদ্বয়ে, গল্পের একতা, ছন্দের একতা, বা পদবিশেষের বা ভাবের একতা দেখিয়া মনে করিয়া থাকে যে, পশ্চাদ্বর্ত্তী কবি নিঃসন্দেহই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাণ্ডার হইতে সেই সেই বিষয় চুরি করিয়া লইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কবি-

যশের কলঙ্ক সমুপস্থিত। যাহারা এরূপ ভাবে, তাহাদিগের ভাবনা, তাহাদিগেরই নিকট থাকুক, তাহাতে আমাদিগের কোন কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। ফল কথা, আদত যাহা কাব্যের বিষয়, তাহা যাহার নিজের, সেই মূল কবি। সেক্ষপিয়ারের সপ্তম রিচার্ড নামক নাটকে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকৃত অন্যূন তিনহাজার পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে!

এখন জিজ্ঞাস্য কবি কাহারা। বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বোক্ত বর্ণনানুরূপ কাব্যে যাহারা কৃতি, তাহারাই কবি। এই কবি তুমি আমি মানবমাত্র সকলেই। তবে প্রভেদ এই, কাহারও নিজ সম্পত্তিতে নিজের কুলায় না; কেহ বা দিয়া অপরের কুলাইয়া দেয়। এ সংসারে যাঁহারা কবি বলিয়া বিখ্যাতনামা, তাঁহারা এই শেষস্থ শ্রেণীর লোক। বলা বাহুল্য যে ইহার মধ্যে যাহার মহাজনী যত অধিক ও মূল্যবান, তিনি সেই পরিমাণে এ সংসারে স্মরণীয় ও পূজ্য। আর প্রথম শ্রেণীস্থ তুমি, আমি, আর সকলে। আইস বাঙ্গারাম, তুমি আমি মনে করিয়াছিলাম, যে কাব্য এক আধখান লিখিয়া কবি হইয়া এ সংসারে নাম জাহির করিব; কিন্তু তাহা দেখিতেছি হইল না। যে সংসারে মরিবার জন্য বিষ প্রার্থনা করিলেও যখন বিনামূল্যে পাওয়া যায় না; তখন তোমার আমার কাব্য যেখানকার আদর কিনিতে পারিবে, এবং তুমি আমি যে আদরণীয় হইব, সে আশা বৃথা। মিছা গণ্ডগোলে কাজ নাই, আইস, দুষ্ট গোয়াল অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল। সবছে চুপ আচ্ছা!

তবে যে কবিদিগকে পাগল দেখিয়া থাক, পাগল ভাবিয়া থাক, এবং তাহাতেই কেবল আশ্বস্ত হও, সে তোমার ভ্রম। যে পরবর্ত্তী বিষয় দেখাইতে আসিয়াছে, তাহার প্রকৃতিও পরবর্ত্তী সাময়িক। সুতরাং তাহার সাময়িক লোকের প্রকৃতিসহ মিল না হওয়ায় লোকে তাহাকে ভিন্নভাবে দেখিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যস্বভাব সামাজিক, কবি স্বীয় সময় হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি হওয়ায়, সেই সামাজিক সহানুভূতিতে বঞ্চিত। সমাজ বিশ্লিষ্ট হইলে মনুষ্যস্বভাব যেরূপ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কবিতেও অংশত তাহা বর্ত্তে। সুতরাং আমরা কবিদিগকে যে যে রূপ ভাবি, সেইরূপে পাগল বলিয়া দেখিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে কাহার যায় আসে? কবি যে সে কবি, তুমি আমি গালি দিলেও সে কবি। অতএব মিছাভ্রমে ভুলিও না, মিছাগালে মুখ নষ্ট করিও না। তাহা কেবল নিজের লোকসান!

অতঃপর আমরা কাব্যের শ্রেণিনির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের এ নির্দ্দেশপ্রণালী পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়ম হইতে কিছু কিছু ভিন্নতর, সুতরাং আলঙ্কারিক মহাশয়েরা ইহাতে কি বলিবেন, বলিতে পারি না। মানবীয় জীবনগতির নিত্য এবং নৈমিত্তিক অবস্থাবৈচিত্রসঙ্কুল হেতু কাব্যও নিত্য এবং নৈমিত্তিক, উভয়বিধ। নিয়ত প্রবর্ত্তিত কর্ম্মবিপাক যদ্দ্বারা নিরাকৃত হয়, তাহা নিত্য; এবং যুগান্ত ও যুগারম্ভ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মবিপাক যদ্দ্বারা নিরাকৃত হয়, তাহা নৈমিত্তিক। প্রথমটির দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরাজ সেক্ষপিয়র,

এবং দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্তস্বরূপ ইতালীর দান্তের নাম মাত্র উল্লেখ করা গেল। অপরাপর কবিদিগকে পাঠকেরা, ইচ্ছা করিলে, আত্মবুদ্ধি অনুরূপ এতদুভয় শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইবেন। যাহা এতদুভয়ের মধ্যে না আসিবে, তাহা শঙ্কর কাব্য। শাঙ্কর্য্যছাড়া এ পৃথিবীতে বস্তু নাই, তবে ন্যূনাতিরেকে, আধিক্যের নামানুসারে নামিত ও খ্যাত হয়। বাঞ্ছারাম, শঙ্করবস্তুও কখন কখন মূল বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু সে উৎকর্ষ, অধম পদার্থের উচ্চাংশ যেমন; আর অশঙ্কর বস্তুর অপকর্ষভাব,—যেমন উচ্চ পদার্থে নিচাংশ। তারতম্য বুঝিলে?

নিত্য, নৈমিত্তিক এবং শঙ্কর, এই ত্রিবিধ শ্রেণীনিবদ্ধ কাব্য আবার বিবিধ পর্য্যায়ে বিভক্ত। বলা বাহুল্য যে, মানবীয় জীবনগতি ও কর্ম্মবৈচিত্র হেতু, উহার পর্য্যায়ও অনন্ত হইবে। সুতরাং তদ্বর্ণন করিতে বাহুল্যে যাওয়া অনাবশ্যক। কেবল মাত্র, আমাদিগের কাব্যনিচয়ের, পর্য্যায়ক্রম কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

প্রথম পর্য্যায় ধর্ম্ম। উহার কাব্য সর্ব্বশাস্ত্র চূড়া বেদবিদ্যা। কবি, বৈদিক ঋষিগণ। এই সময়ে মনুষ্য কেবলমাত্র পাশববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্য পদবীতে পদার্পণ করিতে শিখিয়াছে। আগে যে আত্মবল-সর্ব্বস্ব হইয়া, অজ্ঞ পাশবভাব অবলম্বনে, জীবন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছিল; কালপথে অগ্রসর হইবায় জ্ঞানের প্রথমোদয়ে সে পাশবভাব এখন পরিহরণীয়। আত্মবল, এখন আর এক মহৎ অদৃষ্ট বলের সম্মুখীন হওয়ায়, এবং তাহার প্রখর প্রভাব অনুভব করায়, পদে পদে আত্মন্যূনতা অবলোকন করিয়া ম্রিয়মান হইতেছে। জীবনের পূর্ব্বাবলম্বন যে আত্মবল-সর্ব্বস্বভাব, তাহা এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন; অথচ নূতন অবলম্বন বস্তু এখনও কিছুই আসিয়া উপস্থিত হইতেছে না। বিষম কর্ম্মবিপাক উপস্থিত। দারুণ অন্ধকার! কালের তরঙ্গে মানবজীবন তরঙ্গায়িত, সহায় শূন্য, সাহস শূন্য, অবলম্বন শূন্য, উপায় জ্ঞান শূন্য; নিম্নে শান্তি নাই, উপরে সুখ নাই, অবস্থাসঙ্কুল দিক সমূহ বিকট তাড়নায় ভীতি উৎপাদন করিতেছে। কি ঘোর কর্ম্মবিপাক! এভাব দেখিলে কাহার না হৃদয় শুষ্ক হয়; এভাব দেখিলে কোন ক্ষমতাবানের বা দয়া না হয়। সময় উপস্থিত, —করুণানিধান বৈদিক ঋষি দয়ার্দ্র হৃদয়ে, নরক নিবাসিত তিমিরজাল ভেদ স্বীকার করিয়াও গগণ অলোকিত করত, ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধশিখা, পতিতগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সুস্বর তান লহরী সমন্বিত বেদগান করিতে করিতে জগতক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। বসন্ত আসিল, কুসুম ফুটিল, আকাশে সূর্য্যশশি দিক প্রকাশিয়া প্রসন্নমুখে—গগণসুন্দর প্রসন্নমুখে, প্রসন্ন হাঁসি হাসিলেন। বৈদিক ঋষি সমাগত। বুঝাইয়া দিলেন, দেখাইয়া দিলেন, তোমাদিগের এ কর্ম্মবিপাক তোমাদিগের পশুত্বভাবের;—তোমাদিগের আত্মবল নির্ভরতার মৃতুযন্ত্রণা মাত্র, তোমাদিগের পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে আসিবার ইহা পূর্ব্বসূচনা! এখন আর আত্মবল নির্ভরতায় চলিবেনা; যে অদৃষ্টবলসংলগ্নে

বিপদগ্রস্থ বোধ করিতেছ, আত্মবল পরিত্যাগ করিয়া,সেই অদৃষ্ট বলের উপর আত্ম-নির্ভরতা স্থাপন কর, তাহাতেই আবার সম্পদগ্রস্থ হইবে ; ইন্দ্রদেব তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন, তাঁহার পূজা করিও। মানবজীবন অকুল সাগরে কুল পাইল; আত্মবল নির্ভরতা পরবলে ন্যস্ত করিয়া, মানব পশুত্ব মোচনে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইল। এই জন্যই বেদের এত আদর। তুমি যে তাহাতে গাছ পালার স্তুতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাক, জানিও সেই গাছ পালার স্তুতিই তোমাকে মানুষ করিয়াছে ; তাহারই প্রভাবে আজি আমি বলিতেছি, তুমি শুনিতেছ, নতুবা আজিও তোমার আমার সেই গাছ পালা সার হইত। এই জন্যই বেদবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোভূষণ।

বাঞ্ছারাম, তুমি বলিতে পার যে তাহা হইলেত বেদের শিক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে এখনও এপৃথিবীতে থাকিয়া ভট্টাচার্য্য ঠাকুরদের চাউল কলার পুঁটুলি বাঁধার সাহায্য করেন কেন। কথাটা জিজ্ঞাস্য বটে কিন্তু বেদের শিক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। ধর্ম্ম শিক্ষা প্রায় একরূপ বহুপরিমাণে শেষ হইয়াছে বলিতে হইবে কিন্তু এখনও অনেক শিক্ষা বাঁকি। বুঝিতে না পার, না হয় অন্ততঃ ইউরোপায় পণ্ডিতদিগের নিকট কিছু শুনিয়া লও। বিশেষ এ জগতে কোন বস্তুরই ধ্বংস নাই। যতদিন যাহার প্রয়োজন, সে তাহা পূরণ করিয়া ; তদুপরি উদ্ভূত ও তদুত্তর-আগত বস্তুর ভিত্তিস্বরূপ হইয়া, অদৃশ্য মাত্র হইয়া থাকে। বেদেরও যখন তেমন দিন আসিবে, তেমন ঘটিবে। হোমারীয় স্তোত্র সমূহ যেমন ইলিয়দকে সমাগত করিয়া তন্নিম্নে অদৃশ্য হইয়াছে ; বেদেরও যে দশা সেইরূপ একদিন ঘটিবে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। সকল কাব্য সম্বন্ধেই একথা বর্ত্তে। সুচতুর দৈবজ্ঞেরা এই সঙ্কেত ধরিয়া, ইচ্ছা করিলে, যে কোন কবির জীবনকাল-নিরূপক ঠিকুজি কোষ্ঠী তৈয়ার করিতে পারেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায় সামাজিক এবং গার্হস্থ্য ; কাব্য জগতবিমোহক রামায়ণ,কবি বাল্মীকি। তৃতীয় পর্য্যায় ধৈর্য্য এবং রাজনৈতিক; কাব্য মহাভারত, কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। বলা বাহাল্য যে মহাভারত নৈমিত্তিক শ্রেণীস্থ হইলেও শাস্কর্য্যবহুল। চতুর্থ পর্য্যায়ে ঐশ্বর্য্য এবং ভোগসুখ। ভারতীয়গণ জাতীয় জীবনের এক পর্য্যায় পূর্ণতায় আনিয়া, তাহার ফলভোগরূপ শান্তিসুখে প্রবর্ত্ত। কবি ভারতীপুত্র কালিদাস। বিষয় ভেদে ইহাদিগের প্রতি ভারতসন্তানগণের ভক্তিপ্রদর্শনক্রিয়াও অনুরূপ। বেদ অতিবৃদ্ধ পিতামহবৎ, লোকে প্রায় উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অবসর। এমন বৃদ্ধের নিকট, নবানুরাগী নবপন্থানুগামীর প্রবৃত্তি-তৃপ্তিকর কথা শুনিবারও সম্ভব অতি অল্প, অথচ এমন নিষ্পাপ করুণাময় পিতৃপুরুষের উপর হৃদয়ের পূর্ণভক্তির উদ্ভবও অনিবার্য্য। রামায়ণ পিতৃমাতৃস্থানীয়, স্নেহময়, করুণাময়, আদরময়, যখনই নিকটে যাইবে, স্নেহরসে ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইতে থাকিবে ; যখনই নিকটে যাইবে, তখনই স্নেহমাখা মধুর কথা শুনিতে পাইবে, সুতরাং লোকে রামায়ণে আকৃষ্টও সর্ব্বদা, অথচ সর্ব্বদাই

ভক্তিসংযুত। আর মহাভারত আমাদিগের গুরু; অন্য যে সে গুরু নহে, শিক্ষা বা দীক্ষা গুরু। যখন নিকটে যাইবে, তখনই হাঁসি আছে বটে, কিন্তু তিলক ছটার মিশালে; যখন নিকটে যাও তখনই হরিনাম; যখন নিকটে যাও তখনই উপদেশের ছড়াছড়ি; এমন কি এক এক সময়ে শুনিতে শুনিতে প্রাণ ঝালা পালা হইয়া উঠে। লোকে সহজে সে দিকে ঘেঁসিতে চাহেনা, অথচ গুরুর প্রতি ভক্তি অপরিহার্য্য, কেননা তিনি উদ্ধারের সেতু! আর কালিদাস বন্ধু, কালিদাস ইয়ার; মনের কথা বল, মনের কথা শোন; যাহা মনে আসে তাই বল, যাহা মনে আসে তাই শুন, কালিদাসের সহবাসে সরসও বিরস হইয়া থাকে। কালিদাসের সহবাসে এই দুরন্ত দুঃখসঙ্কুল সাংসারও সুখের হইয়া যায়। কালিদাস কবির মধ্যে ঔষধের মকরধ্বজ। যেমন অনুপান দিয়া যে রোগে প্রয়োগ করিবে, সেখানেই সেই রোগের উপশম। সংস্কৃত কবিদিগের বিষয়ে, আরও ক্রমান্বয়ে পর্য্যায় আলোচনার আবশ্যক রাখে না; তাহা অধিকন্তু হইবে। বাঙ্গারাম, বুঝিতে পারিয়াছ, আমাদিগের এই নূতন অলঙ্কার শাস্ত্রমতে, কাব্যের পর্য্যায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পর্য্যায়ের নামকরণটা, সমালোচক ও ভাবুকের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে?

এই নিয়ম অনুসারে এক্ষণে বাঙ্গালি কবি মহাশয়দিগের পর্য্যায় আলোচনা কিঞ্চিৎ করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং বঙ্গসন্তান সুতরাং লোকতঃ ধর্ম্মতঃ, উভয়তঃই তাহা কর্ত্তব্য। আমাদিগের আদি কবি, চণ্ডিদাস, ক্রন্দনের মালিক,—নিরাশার ক্রন্দন। তখন আর বাঙ্গালিজীবনে আছে কি? স্বাধিনতা লোপ, ধর্ম্মলোপ, কর্ম্মলোপ, ম্লেচ্ছদৌরাত্মে গৃহসুখ পর্য্যন্ত লোপ; লোকচরিত্র ভীষণ স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ, সামাজিকতাশূন্য, বন্ধুত্বগুণশূন্য। বঙ্গ তখন আধ্যাত্মিক শ্মশান ভূমি; জীবন আকাশে অবলম্বন-সূর্য্য কালের তিমির গহ্বরে নিপতিত, চতুর্দ্দিকে মোহ অন্ধকার যুগান্ত অন্ধকারবৎ; সামান্য মানব প্রাণ না কাঁদিয়া করে কি! চণ্ডীদাস কীর্ত্তনের জন্মদাতা। এই কীর্ত্তনছলে বঙ্গভূমি এই দীর্ঘকাল কাঁদিয়া আসিতেছে। ক্রন্দনে ফল আছে। সমলরত্ন অগ্নিদ্রব ভিন্ন কবে নির্ম্মল হইয়া থাকে। অনেক ক্রন্দনে শোকের শান্তি হয়। দুঃখের অন্ত ভিন্ন সুখের উদয় হয় না। এই ক্রন্দন সেই দুঃখের সত্বরে পূর্ণতাসাধনকার্য্য;—গন্তব্য স্থানে যাইতে, শীঘ্রতার খাতিরে শ্বাপদ সঙ্কুল বন পথের আশ্রয় গ্রহণ;—বিপরীত উপায়ে শীঘ্র অভিষ্ঠ লাভের আকাঙ্ক্ষা।

চণ্ডীদাসের পরে কবিকঙ্কণ। নিরাশ ক্রন্দনে যেমন চণ্ডীদাস, সআশ ক্রন্দনে তেমনি কবিকঙ্কণ। ইঁহারও আকাশ শোকমেঘে আচ্ছন্ন বটে, কিন্তু কোথাও কোথাও ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া দুই একটি নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস ও কাশিদাসে পূর্ব্বস্মৃতি। কৃত্তিবাসের পূর্ব্বস্মৃতি যেমন প্রলাপের উপর স্মৃতির উদয়; স্মৃতি উদ্ভূত হইয়াছে মাত্র কিন্তু কার্য্য করিতেছে না। কাশিদাসে সেই স্মৃতিতে স্থৈর্য্য এবং আত্মদৃঢ়তা লাভ। এই কবি চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে

সমাজে; এবং সমাজের শ্রেণিভেদ অনুসারে, সমাজস্থগণের নিকটে; কিরূপ আদৃত, ও তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা বঙ্গসন্তান মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন; সুতরাং তদ্বিষয় আমূলতঃ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, তাহা উপলব্ধি হইতে পারিবে। বহুকাল পরে তাপবিনত চিত্তকে ঊর্দ্ধে উত্থানে মধুসূদন। উৎসাহ, যন্ত্রণাপীড়নউদ্ভেদ-সৃষ্ট তেজগর্ব্ব, এবং মানবীয় মনুষ্যোচিত বাঞ্ছিতার্থে ক্ষোভাশ্রু আকর্ষণে নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের পরে যিনি কবি হইবেন, কোষ্ঠিরচনে ও ভবিষ্য দর্শনে তাঁহাকে আমি যতদূর দেখিতে পাইতেছি, যতদূর চিনিতে পাইতেছি, যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে বলিতে পারি যে তিনি যে দিন এই বঙ্গজগতী-তলে অবতরণ করিবেন, তাহা বাঙ্গলার পক্ষে অত্যন্ত শুভদিন বলিয়া জানিও। বাঙ্গারাম, তাই বলিয়া ভাবিওনা যেন সে আজি কালি। তাহার এখনও বিলম্ব আছে, তখন বাঙ্গালিরা প্রায় দশ আনা ছ আনা মানুষ হইয়া আসিবে।

আমাদিগের নিত্য কবির অভাব বড়, কেবল একা মধুসূদন মাত্র প্রকৃত পক্ষে তৎস্থানীয়, কিন্তু তাহাও উচ্চ পর্য্যায়ের নহে। বঙ্গীয় নৈমিত্তিক কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিকঙ্কণ ও নবীনচন্দ্র।

উপরে যে কয়টি বঙ্গ কবিদিগের বিষয় বলিয়া আসিলাম, তাহা অরণ্য মধ্যে কেবল কয়টি মহাবৃক্ষ মাত্র। ক্ষুদ্রবৃক্ষ, কাঁটা গাছ, ঘাস পাতাড়, ইহাদের কথা কিছুই বলি নাই, বলিবার তত আবশ্যকও রাখেনা। ফড়ে অর্থাৎ পাইকেড়ে কবি অনেক;—সকল দেশে সকল কবিরই পাইকেড়ে বা ফড়ে আছে, তাহাদের শুধু মাত্র নাম লিখিতে গেলেও স্থানে কুলায় না। কিন্তু অন্য দেশের পাইকেড়ে আর বঙ্গভূমির পাইকেড়েতে কিছু প্রভেদ আছে। বাঙ্গালার পাইকেড়েরা বড় নচ্ছার, প্রায়ই কলিকাতার বাখরগঞ্জো বাঙ্গাল ফেরিওয়ালা। সত্য বটে পৃথিবীর সকল বস্তুকেই আগে মলমুক্ত হইয়া তবে স্বস্বভাব ও স্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় উঠিতে হয়; সকল দেশের সকল সাহিত্যকেই আনুষঙ্গিক অসারমলমুক্ত হইয়া তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে হয়। বঙ্গ সাহিত্যও যে সেই নিত্য নিয়মের বহির্ভূত হইবে এমন বলিতেছি না। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাগ্যে যে এত কুটমল জন্মিয়াছিল, এবং তাহাকে যে তাহাদের সেই পর্ব্বতরাশি ভেদ করিয়া উঠিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

যাহা হউক এই সারশূন্য নিপাতযোগ্য পাইকেড়ের দল হইতে কতকগুলি আছেন, যে তাঁহারা পাইকেড়ে বৃত্তিরত হইলেও, তাহাদের হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র এবং ইহাদের মধ্যে এমনকি, কেহ কেহ এমনও আছেন, যে তাঁহাদিগকে প্রকৃত ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত শ্রদ্ধাস্পদ ফড়ে কবিদিগের মধ্যে দুইটি নাম প্রধান, ও নামযোগ্য। প্রথমে ভারতচন্দ্র, দ্বিতীয়ে হেমচন্দ্র। কবিকঙ্কণের পাইকেড়ে ভারতচন্দ্র, মধুসূদনের হেমচন্দ্র। কবিকঙ্কণ, মধুসূদন,

আড়তদার; ইহারা তাহাদের মুদি। কিন্তু মুদির মধ্যে আবার প্রভেদ আছে। ভারতচন্দ্র, হুতুমের রিষড়ার ঘাটের শামি বামি দোকানী। দোকানের জিনিস কিছু মন্দ নহে, কিন্তু মুদির চোখের জোরে, খরিদ্দার এক টাকার জিনিসকে গাঁইটের কড়ি দিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক চারিটাকার বলিয়া স্বীকার করিয়া আইসে। আর হেমচন্দ্র ঢাকা সহরস্থ ব্রাহ্ম বাবুদিগের মণিহারির দোকান। জিনিস ভালয় মন্দয়, মন্দ নহে; সব টিকিট মারা দাম খরিদ্দারের কোন ফৈজত নাই; ইচ্ছাহয় নাও, না হয় না নাও।*

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়

বিবিধ।

পামারষ্টনের প্রথম যৌবন।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী বিখ্যাতনামা লর্ড পামারষ্টন অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময়েও রাজকার্য্য এবং স্বজাতির সম্মানজনক অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যে অক্লান্তমনে অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেন। পরিশ্রমেই তাঁহার একমাত্র স্ফূর্ত্তি ও তৃপ্তি ছিল, এবং তিনি আহার,নিদ্রা ও আবশ্যকীয় বিশ্রামের সময় ভিন্ন ক্ষণকালও বিনাপরিশ্রমে থাকিতে পারিতেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহার এক জন পার্শ্বচর প্রিয়সুহৃদ্ এক দিন নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—'পুরুষের প্রথম যৌবন কত কাল থাকে?' পামারষ্টন তন্মুহূর্ত্তেই উত্তর করিলেন,—'উনাশী তক।' ইহার ক্ষণপরেই তিনি ঈষদ্ভ্রূকুঞ্চনসহকারে, যেন একটুকু কি ভাবিয়া,—একটুকু বিষণ্ণ হইয়া, পুনরপি বলিলেন,—'আমার বয়ঃক্রম এইক্ষণ আশী হইয়াছে; বোধ হয় আমি যৌবনের প্রথম সীমা একটুকু অতিক্রম করিয়াছি'। যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে বিস্ময়াবিষ্ট ছিলেন; প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। যাঁহারা কৃতী, কর্ম্মঠ ও সার্থকজন্মা, পৃথিবীর কার্য্য যাহাদিগের জীবনের কার্য্য, যাঁহারা কার্য্যের উৎসাহে সকল সময়েই উৎসাহযুক্ত রহেন এবং হৃদয়-নিহিত পৌরুষীশক্তির নিত্য নূতনবিকাশে আনন্দে পরিপূর্ণ থাকেন, তাঁহাদিগের জীবন ও যৌবন কখনও ফুরায় না।

* এই প্রবন্ধের অনেক কথা চিন্তনীয়, অনেক কথা পুনরালোচ্য, এবং বোধ হয় অনেক কথা বিশেষ প্রতিবাদযোগ্য। কিন্তু আমরা লেখকের স্ফূর্ত্তিমতী চিন্তাশক্তির সম্মান করি।

বান্ধব সম্পাদক।

মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ।

(৪র্থ খণ্ড, ৫২৮ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদ পৃথিবীস্থ সকল জাতীয় লোকদিগকে আপনার প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সর্ব্বদাই যাত্নিক ছিলেন। তিনি জীবিত থাকা সময় তাঁহার ধর্ম্ম তত অধিক বিস্তার হইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ, ছলে হউক, বলে হউক, উপদেশ দ্বারা হউক, অন্য জাতীয় ব্যক্তিগণকে মুসলমান করা মুসলমানের সার ধর্ম্ম ও প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মহম্মদের নিকট সর্ব্বদাই উপদেশ পাইতেন; সুতরাং তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত রহিলেন। আবুবেকার আরবীয় জাতি সকলকে বশীভূত করিয়া ধর্ম্ম বিস্তারে ব্রতী হইলেন। সময় তাঁহার অনুকূল হইল। কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাটগণের সহিত পারস্যাধিপতিদিগের দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সংগ্রাম চলিতেছিল, তাঁহাতে এই দুই পরাক্রান্ত রাজকুল এক কালে হীনবল হইয়া পড়ে। সুতরাং যে কেহ সেই সময়ে সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ সকল আক্রমণ করুক না কেন, তাহার পক্ষে কৃতকার্য্য হওয়া বড় কঠিন ছিল না। রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে আবুবেকার, মহম্মদের জীবনের অপরাহ্ণ সময়ের ঈপ্সিত কার্য্যটি সফল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন;—সীরিয়া জয় করণার্থ আপন সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন।

সীরিয়া অতি বিস্তীর্ণ প্রদেশ ছিল; পালস্তিন, ফিনিসিয়া, মিশোপটেমিয়া, ক্যালডিয়া, আশিরিয়া প্রভৃতি তাহার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রদেশ কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাট হিরাক্লিয়সের অধিকারভুক্ত ছিল। প্রদেশটি বিলক্ষণ শস্যবতী এবং আরবীয়গণের স্থল-বাণিজ্যের সর্ব্ব প্রধান স্থান বলিয়া, তৎকালে আরববাসিগণ তৎপ্রতি সর্ব্বদাই লোভের চক্ষে দৃষ্টিপাত করিত। এক্ষণে আবুবেকারের উৎসাহপূর্ণ ঘোষণায় সমরপ্রিয় আরবীয়গণের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। অতি অল্প দিন মধ্যে অশ্ব, উষ্ট্র, তীর, তরবারি, ঢাল, বল্লম, প্রভৃতিতে চারি দিক পূর্ণ হইল। তেজস্বী অশ্ব যেমন তেজসম্বরণে অসমর্থ হইয়া আরোহীর বল্গাকর্ষণে উল্লম্ফন করে, অগ্রসর হইতে পারেনা; আবুবেকারের আদেশ প্রাপ্তির বিলম্বে, সৈন্য গণের তাদৃশ অবস্থা হইল। তাহারা শস্যপূর্ণা সীরিয়া সম্মুখে দেখিয়া, মরুপ্রদেশে কিরূপে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিবে? পরিশেষে খলিফা, আবুসোফিয়াসকে সেনাপতি করিয়া সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তিনি এক পর্ব্বতশৃঙ্গে দণ্ডা-

য়মান হইয়া সৈন্যস্রোত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। উৎসাহে, আনন্দে এবং আশায় হৃদয় স্ফীত ও উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। শ্রেণীবদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রের চাকচিক্যে, অশ্বারোহিগণের সগর্ব্ব অশ্বচালনে, উষ্ট্র সকলের শ্রেণীক্রমে গমনে, খলিফার মনে মহম্মদের অল্প সংখ্যক সৈন্যের কথা উদয় হইল। মহম্মদের মক্কা হইতে তাড়িত হইয়া পলায়ন করার পর দশ বৎসরও গত হয় নাই, কিন্তু এই অল্প কাল মধ্যে কত উন্নতি? তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার আদেশে অগণ্য সৈন্য দলবদ্ধ; তাহাদের পরাক্রমে দূরবর্ত্তী সম্রাটগণের সিংহাসনও থরথরে কম্পিত? আবুবেকার এই সকল বিষয় চিন্তা করিলেন এবং ঈশ্বরোপাসনা সমাপনান্তে সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তাহারা, দুর্ব্বার জল-প্রপাতের ন্যায়, ভীষণবেগে পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্য দিয়া ধাবিত হইল।

আবুবেকার প্রথম দিবস পদব্রজে সৈন্যগণের অনুগমন করিলেন। সৈনিকগণ আপন আপন অশ্ব তাঁহাকে দিতে চাহিল, কিন্তু তিনি বলিলেন, " না, অগ্রসর হও। তোমরা আল্লার কার্য্য করিতেছ, আমার প্রত্যেক পাদবিক্ষেপ জন্য তিনিই পুরস্কার প্রদান করিবেন। "

খলিফা সেনাপতিকে নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান পূর্ব্বক মদিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

"তোমার সৈন্যদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও। তাহাদের প্রতি সর্ব্বদাই ন্যায়াচরণে এবং তাহাদের সুখ দুঃখ ও মতামতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বিস্মৃত হইও না। বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিও, কদাচ শত্রুকে পৃষ্ঠ দর্শন করাইও না। জয়লাভ হইলে বালক, বৃদ্ধ এবং ললনাগণকে রক্ষা করিও। তালবৃক্ষ অথবা অন্য কোন ফল বৃক্ষ ছেদন করিও না; শস্য ক্ষেত্র নষ্ট হইতে দিও না, অনর্থক ছাগ মেষাদি নাশ করিও না। সত্য ও প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রাখিও। যে সকল ধার্ম্মিক লোক সন্ন্যাসাশ্রমে জীবন যাপন করে, তাহাদিগকে মান্য করিও, তাহাদের আশ্রম নষ্ট হইতে দিও না। কিন্তু যদি তুমি তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার নাস্তিক দেখিতে পাও, যাহারা মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক সয়তানের শিষ্যবৎ বিচরণ করে, তবে তাহারা সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে অথবা করদানে অসম্মত হইলে, নিশ্চয়ই তাহাদের শিরশ্ছেদ করিবে।"

খলিফার প্রার্থনা সফল হইল। অতি অল্প কাল মধ্যে অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র প্রভৃতি লুণ্ঠন দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া, স্রোতের ন্যায় মদিনার তোরণে প্রবেশ করিল। সম্রাট হিরাক্লিয়স্ সেনাপতির গতি পর্য্যবেক্ষণার্থ একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। আবুসোফিয়াস্ তাহাদিগকে পরাস্ত এবং তাহাদের সেনাপতিসহ বার শত সৈন্য হত করেন। তিনি অন্যান্য যুদ্ধেও সেইরূপ কৃতকার্য্য হন। এই যুদ্ধলব্ধ সমস্ত লুণ্ঠন দ্রব্য, শস্যক্ষেত্র-সীরিয়ার প্রথমোপার্জ্জিত-শস্য স্বরূপ খলিফাকে উপহার দিলেন।

প্রথমোদ্যমে কৃতকার্য্য হওয়াতে চতুর্দ্দিক হইতে মুসলমান সৈন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। একেত ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ, তাহাতে আবার উর্ব্বরা দেশসকল লু-

ঠনের সুযোগ প্রাপ্ত হইলে মরুদেশবাসীগণের দারিদ্র দূর হইতে পারে, সুতরাং আরবীয়গণের আর উৎসাহের সীমা রহিল না। খালেদকে সেনাপতি করিয়া খলিফা আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ওমার তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন দেখিয়া, আয়েশা তাঁহার পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, খালেদকে ফিরাইয়া আনা হয়,এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে আমরু ইবন্ আলআস্ সেনাপত্য গ্রহণ করে। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে হাস্তরসপূর্ণ কবিতা লিখিয়া মহম্মদ এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিদ্রূপ করিত, কিন্তু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণান্তর বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করে। এই সময়ে সংগ্রাম-বাসনা সকলের হৃদয়ে এতদূর বলবতী হইয়াছিল যে, খালেদ যে সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন, তাহাদের সমশ্রেণীস্থ হইয়া নূতন সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করিতে চলিলেন।

সদুপদেষ্টা আবুবেকার নূতন সেনাপতি আমরুকে অনেক উপদেশ দিলেন। সীরিয়ায় অনেক সৈন্য এবং অনেক কার্য্যদক্ষ সেনাপতি যাইতেছে দেখিয়া, খলিফা তাহাদের কাহার কি কার্য্য করিতে হইবে, নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আমরু পালস্তিনাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, আবু ওবিদা ইমিসা, আবু সোফিয়াস্ ডামাস্কস্ এবং ইবিন্-হাসন্ জর্দ্দানের সমীপবর্ত্তী প্রদেশ আক্রমণ করিবেন। সকলে যথাসম্ভব ঐক্য হইয়া কার্য্য করিবেন, এবং একের প্রয়োজন হইলে অন্যে সাহায্য করিবেন, এইরূপ অবধারিত হইল। সমস্ত সৈন্য মিলিত হইলে সকলে আবু ওবিদার অধীন হইবেন, কারণ তিনি সীরিয়ায় সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণকে আবুবেকার অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদের সকলেই বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন; কেহ কেহ খলিফা-পদপ্রাপ্তির উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেন। আবু ওবিদা তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার বয়স এই সময়ে পঞ্চাশৎবর্ষ। তিনি যেমন তেজস্বী ও স্বধর্ম্মানুরক্ত, তেমনই নম্র, সদয় ও সাবধান ছিলেন। সুতরাং আবুবেকার বিবেচনা করিয়াছিলেন, ধর্ম্মোন্মত্ত অনলপ্রতাপ ইস্লাম্ সৈন্যের তেজ যথাযোগ্য স্থলে প্রয়োগ করাইতে আবু ওবিদাই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সেনানী হইবেন।

একদিকে এই অগণ্য সৈন্যস্রোত রোমরাজ্যে প্রবেশ করিল, অন্যদিকে আর একদল সৈন্য ইরাক প্রদেশ আক্রমণ করিয়া বসিল। মিসরাধিপ টলেমি বংশের অধীনে, এই দেশ প্রাচীন ক্যালডিয়া ও বাবিলোনিয়ার অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বদিকে সুসিয়ানা বা খর্জ্জেস্থান এবং আসিরিয়া ও মিডিয়ার পর্ব্বত শ্রেণী, উত্তরে মেশোপটেমিয়া এবং পশ্চিমে ও দক্ষিণে সীরিয়া ও আরব দেশীয় মরুভূমি এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী প্রদেশকে ইরাক্ বলিত। প্রদেশটি পারস্যাধিপের করদ ছিল। খালেদ অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া কএকটি বিদ্রোহী প্রদেশ শাসনাধীনে আনিতেছিলেন, খলিফা তাঁহার বিক্রমের বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারই হস্তে সেনাপত্য প্রদান করিবেন, স্থির করিয়া নিম্নলিখিত রূপ পত্র পাঠাইলেন।

"আরবীয় ইরাকাভিমুখে অগ্রসর হও। হিরা এবং কিয়ুফা বিজয় তোমার হস্তে ন্যস্ত হইল। জয়-সাধন করিয়া, এইলা প্রদেশে গমন পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রসাদাৎ শাসনাধীন কর।"

হিরা পশ্চিম বাবিলোনিয়ার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, সীরিয়ার মরুভূমি প্রান্তে স্থিত ছিল। অধিবাসীগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অনুশীলন করিত। রাজধানীর নামও হিরা ছিল। এই নগরীতে অতি সুদৃশ্য দুইটি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত ছিল। কথিত আছে, যে স্থপতি-কার্য্য-বিশারদ ব্যক্তি ঐ প্রাসাদদ্বয় নির্ম্মাণ করে, সে অন্যত্র তদপেক্ষা সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে ভয়ে, রাজা তাহাকে দুর্গের উপরিভাগ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া হত করেন।

খালেদ তাঁহার স্বাভাবিক শৌর্য্যের সহিত এই রাজ্য আক্রমণ করিলেন। দশ সহস্র লোক লইয়া রাজধানী অবরোধ করিলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। রাজা হত হইলেন, রাজপ্রাসাদ ভূমিসাৎ হইল, রাজ্যটি অধীনতা স্বীকার করিল। বাৎসরিক সপ্ততি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা করনির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, প্রথম বৎসরের কর ও মৃতরাজার পুত্রকে মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর খালেদ এলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পারস্যাধীপ নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা হর্ম্মজকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার মুকুট এবং লুণ্ঠন দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ খলিফার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই মুকুট অতিশয় মূল্যবান্ ছিল। পারস্যের সাত জন রাজাধিরাজ উপাধিধারী রাজপ্রতিনিধি যে সাতটি মুকুট ধারণ করিতেন, ঐ মুকুট তাহারই একটি ছিল। অন্যান্য উপহার দ্রব্য সহ একটি হস্তীও মদীনায় প্রেরিত হইয়াছিল। আরও তিনজন পারস্যের সেনাপতি ও গবর্ণর খালেদের গতিরোধে প্রয়াস পান, কিন্তু তাঁহারা সকলেই পরাস্ত হইয়াছিলেন। নগরীর পর নগরী তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল, বোধ হইল, কিছুতেই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। ইয়ুফ্রেটিস্ নদীতীরে বিজয় পতাকা স্থাপন পূর্ব্বক পারস্যাধিপতিকে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ অথবা করদান করিতে পত্র লিখিলেন। এবং লিখিলেন, "যদি আপনি উভয় প্রস্তাবেই অসম্মত হন, তবে আমি অগণ্য সৈন্যসহ আপনাকে আক্রমণ করিব, আপনি আপনার জীবন যেরূপ ভালবাসেন, আমার সৈন্যগণও মৃত্যুকে সেইরূপ ভালবাসে।"

খালেদ পুনঃপুনঃ জয়লাভ করিয়া যে সমস্ত লুণ্ঠন দ্রব্য মদীনায় প্রেরণ করেন, সে সমস্ত দেখিয়া, বন্দী রাজপুত্রগণ, প্রেরিত রাজমুকুট সকল অবলোকন করিয়া এবং ভিন্নদেশ প্রথমতঃ করদ করা হইল দৃষ্টে, সাধারণের উল্লাস ও আশা অসাধারণ বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার প্রতি বিজয়লক্ষ্মী ঈদৃশী প্রসন্না দেখিয়া, আবুবেকার আরও অধিক হৃষ্ট হইলেন। কারণ, ওমার, খালেদকে বধকরণার্থ বারবার অনুরোধ করাতেও তিনি তাহা করেন নাই, আপনার গুণগ্রাহিতার আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিলেন। বিজয়ের পর বিজয় ঘোষিত হইতে লাগিল; দলে দলে উষ্ট্রাদি লুণ্ঠনদ্রব্য বহন পূর্ব্বক মদীনার তোরণ সমীপে উপস্থিত হইল,

দেখিয়া, খলিফা ভাবিতে লাগিলেন, এই দুর্দ্দান্ত সৈনিক পুরুষের পরাক্রম তিনি যে পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়াছেন, কার্য্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক দেখাইল। তিনি উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "হে আল্লা? স্ত্রীলোকগণ নিতান্তই দুর্ব্বল, তাহারা দ্বিতীয় খালেদকে গর্ভে ধারণ করিতে পারে না?"

একদিকে ইরাকের জয়লাভে খলিফা উল্লাসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্যদিকের সংবাদে তাঁহাকে ম্লান হইতে হইল। আবু ওবিদা সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি হইয়া সীরিয়ায় প্রবেশ করেন। কিন্তু প্রথমোদ্যমে আক্রমণকারী সেনাপতির যাদৃশ সাহসের আবশ্যক, তাঁহার তত ছিল না। তাঁহার একদল সৈন্যের আংশিক পরাজয় এবং সম্রাট হিরক্লিয়সের বহুসংখ্যক সৈন্যসংগ্রহের সংবাদ শ্রবণে তাঁহার উৎসাহ হ্রাস হইয়া পড়ে। তিনি খলিফার নিকট যে পত্র লিখেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ আংশিক প্রকাশ পায়। আবুবেকারের অন্তঃকরণ নিতান্ত স্থির প্রকৃতির হইলেও খালেদের বিজয়-রশ্মিতে আলোকিত হইয়াছিল, সীরিয়ার সেনাপতি কেবল আত্মরক্ষায় ব্রতী আছেন দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। তিনি খালেদকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, তিনি অবিলম্বে ইরাকের যুদ্ধ কার্য্য তাঁহার অধীনস্থ সৈনিক গণের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া সীরিয়ায় গমন পূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চ সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। খালেদ মোসেনা ইবিস্ হারিস্ নামক ব্যক্তির হস্তে ইরাকের সেনাপতিত্ব রাখিয়া পনের শত অশ্বারোহী সহ সীরিয়ায় প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে অবগত হইলেন, মুসলমান সৈন্য বসরা নগরী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

এই নগরী সীরিয়ার সীমান্তর্ব্বর্ত্তী সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য স্থান। সার্থবাহগণ প্রতি বৎসর এই স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানে মহম্মদ সার্জ্জিয়স্ নামক উদাসীন হইতে খৃষ্টীয়ধর্ম্মে উপদেশ প্রাপ্ত হন। নগরী বাণিজ্য দ্রব্যে পূর্ণ থাকাতে লুণ্ঠন পক্ষে আদরণীয় ছিল। কিন্তু চতুর্দ্দিকে দৃঢ় প্রাচীর ছিল, অধিবাসীগণ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী থাকাতে, যখন ইচ্ছা দ্বাদশসহস্র অশ্বারোহীসহ সমরে অবতীর্ণ হইতে পারিত। সীরিয়া দেশীয় ভাষায় বসরা অর্থ "নিরাপদ আশ্রয়-দুর্গ"। আবুওবিদা এই নগরীর বিরুদ্ধে সার্জ্জাবিল ইবিস্ হাসানের অধীনে দশসহস্র অশ্ব প্রেরণ করেন। রোমানস্, বসরার গবর্ণর, করদানে সম্মত হইতেন, কারণ ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান সৈন্যের গতি তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ বিলক্ষণ সাহসী ছিল, তাহারা যুদ্ধ করণার্থ জেদ করিতে লাগিল।

মহম্মদের প্রিয় পাত্র সার্জ্জাবিল বিজয় লাভার্থ ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তখন কোন ফল দেখা গেল না। নগরীর অভ্যন্তর হইতে দলে দলে অশ্বারোহী বাহির হইয়া আক্রমণপূর্ব্বক মুসলমানসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল। মুসলমানগণ শ্রেণীভঙ্গ হইল দেখিয়া, সার্জ্জাবিল পলায়নে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখা গেল, ধূলিতে অন্ধকার করিয়া আর একদল সৈন্য অগ্রসর হইতেছে।

উভয়পক্ষ ক্ষণকালের জন্য বিরত হইল।

কিন্তু ধূলিরাশির মধ্য দিয়া খালেদের পতাকা অবলোকনমাত্রে "আল্লা আকবর" নাদে মুসলমানগণ রণস্থল কম্পিত করিল। যোদ্ধৃবর বেগে অশ্বচালনা করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সঙ্গীয় অশ্বারোহীগণ বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। খালেদ প্রাচীর সমীপে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিলেন।

যুদ্ধান্তে সার্জ্জাবিল তাঁহার পরিত্রাতা খালেদকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাদের অনেক দিন হইতে সখ্যভাব ছিল। খালেদ মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া সেনা-পরিপূর্ণ প্রস্তর-গ্রথিত, প্রাচীর-পরিবেষ্টিত এই সুদৃঢ় নগরী আক্রমণ করিতে কিরূপে বাতুলতা উপস্থিত হইয়াছিল?"

সার্জ্জাবিল বলিলেন, "আমি নিজের বুদ্ধিতে কার্য্য করি নাই, আবুওবিদার আদেশে করিয়াছি।"

খালেদ বলিলেন," আবুওবিদা অতি বিজ্ঞ ব্যক্তি, কিন্তু তিনি যুদ্ধবিদ্যায় তাদৃশ পারদর্শী নহেন।"

সেনাপতির পরিবর্ত্তনে যে ফললাভ হইল, সৈন্যগণ তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারিল। খালেদের সৈন্যগণ কঠিন পরিশ্রম এবং কঠিনতর সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া শীঘ্র আহার গ্রহণপূর্ব্বক নিদ্রিত হইল। কিন্তু নগরী হইতে কোন উপদ্রবের আশঙ্কা করিয়া, খালেদ স্বয়ং একটি নূতন ঘোটকারোহণপূর্ব্বক সমস্ত রজনী শিবিরের চারি পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে সকলে ঈশ্বরোপাসনা করিল। বসরার সৈন্যগণ প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল দেখিয়া, খালেদের নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। তিনি বলিলেন, "এই নাস্তিকগণ আমাদিগকে পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত মনে করিতেছে, কিন্তু শীঘ্রই সমুচিত শিক্ষা পাইবে।

সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে রোমানস্ তাঁহার সৈন্যের পুরোভাগে আসিয়া মুসলমান সেনাপতিকে দ্বন্দযুদ্ধে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। খালেদ তৎক্ষণাৎ সম্মুখীন হইলেন। রোমানস্ তাঁহার অস্ত্রচালনার পরিবর্ত্তে মৃদুস্বরে বলিলেন, তিনি হৃদয়ে মুসলমান, নাগরিকগণকে করদানে সম্মত করিতে চেষ্টা করাতে তাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিতেছে। তিনি জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষায় অভয় প্রাপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে এবং নগরী মুসলমানদিগের হস্তে সমর্পণ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে সম্মত আছেন।

খালেদ সম্মত হইলেন। কিন্তু বলিলেন, নাগরিকগণ কোন প্রকারে সন্দেহ করিতে না পারে, এজন্য কিয়ৎকাল ক্রীড়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। রোমানস্ অগত্যা সম্মত হইলেন। তিনি অস্ত্র ঝন্ ঝন্ করিয়াই বিরত হইতেন, কিন্তু খালেদ তরবারির পৃষ্ঠদেশ দিয়া এমনই গুরু আঘাত করিলেন যে, ধারাল অংশে আঘাত করিলে রোমানসের শরীর দ্বিখণ্ড হইত।

ধীরে ধীরে রোমানস্ বলিলেন, "এই কি আপনার কৃত্রিম যুদ্ধ? না, আপনি আমাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করেন?"

খালেদ বলিলেন " তাহা নহে। তবে আমরা কোন চক্রান্ত করি নাই দেখাইতে কিঞ্চিৎ গুরু আঘাত করাই উচিত।"

রোমানস্ ক্ষতবিক্ষত শরীরে আপন সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি এক্ষণে খালেদের পরাক্রমের বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন, এবং নগরবাসীগণকে নগরসমর্পণে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার ভীরুতায় অসন্তুষ্ট হইয়া ভৎসনা করিতে লাগিল, তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া আপন গৃহে বন্দী করিয়া রাখিল; এবং সম্রাট হিরাক্লিয়স্ নূতন সৈন্য সহ যে সেনাপতিকে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষতা সমর্পণ করিল।

নূতন সেনাপতি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া খালেদকে দ্বন্দযুদ্ধে স্পর্দ্ধা করিল। আবদুল্ রহমান্ নামক খলিফাতনয় অগ্রসর হইতে অনুমতি চাহিলে খালেদ তাহাতে সম্মতি দিলেন। কিয়ৎ কাল যুদ্ধ হইল। বসরার গবর্ণর, সেই বালক মুসলমান-বীরের ভীষণ আকৃতি, কঠোর কণ্ঠস্বর, অশ্ব ও অস্ত্রচালন-পদ্ধতি অবলোকনে ভীত হইল। সে প্রথম আহত হইয়াই পলায়ন করিতে প্রয়াস পাইল, তাহার তুরঙ্গম দ্রুতগতিতে তাহাকে আপন সৈন্য মধ্যে লইয়া গেল। বীরশিশু, দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিল। তরবারের কঠিন আঘাতে দুই পার্শ্বের বিপক্ষ সৈন্য ভূশায়ী হইয়া, তাহার পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল।

খালেদ শিশুর পরাক্রম দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাহার বিপন্ন অবস্থায় ভীত হইয়া সৈন্য সাধারণের প্রতি আক্রমণের আদেশ দিলেন। যুদ্ধ, যুদ্ধ, স্বর্গ, স্বর্গ এইরূপ উচ্চৈঃশব্দে দশদিক পরিপূর্ণ করিল। অশ্ব অশ্বের প্রতি, পদাতি পদাতির প্রতি লক্ষ্য করিল। এই ভীষণ সংগ্রাম নাগরিকগণ প্রাচীর হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সকলে ভয়ে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। ঘণ্টার ঘোর রোল, স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি, বালকের চীৎকার, উদাসীনজাতির মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি রঙ্গভূমি আলোড়িত করিয়া তুলিল।

মুসলমানগণ উচ্চৈঃস্বরে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে বসরার সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। যে সকল সৈন্য প্রভাতে গৌরবের সহিত অগ্রসর হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা নিতান্ত নিস্তেজ ও হীনপ্রভ হইয়া নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বাররোধ করিল। দুর্গমধ্যে ভীতিবিহ্বল-চিত্তে সৈন্যগণ বসিয়া রহিল, সম্রাটের নিকট নূতন সৈন্য-প্রার্থনায় দূত প্রেরিত হইল।

রজনীর নীলবসনে রঙ্গভূমি আবরিত হইল। যে বসরা আমোদের আবাস ভূমি ছিল, আজি তাহা রণাহতগণের আর্ত্তনাদে, স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনিতে এবং উদাসীন গণের কণ্ঠস্বরে শোচনীয় করিয়া তুলিল। আরবীয়গণ শিবির রক্ষায় অবহিত থাকিল।

আবদুল রহমান একদিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাচীরের পার্শ্বস্থ অন্ধকার ভাগে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি চুপে চুপে আসিতেছে, দেখিতে

পাইলেন। তাহার পরিচ্ছদের কারুকার্য্য সন্দর্শনে তাহাকে কোন উচ্চপদস্থ পুরুষ বলিয়া অনুমান হইল। আবদুল রহমান তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বল্লম উঠাইলেন। তখন সে রোমানস্ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক খালেদের সমীপে গমন প্রার্থনা করিল, সেনাপতির পট্টগৃহে নীত হইয়া প্রতিহিংসা লইতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। সে তাহার আপন গৃহে রুদ্ধ ছিল। ঐ গৃহ নগরপ্রাচীরের সহিত গ্রথিত। তাহার পুত্র ও ভৃত্যগণ প্রাচীর ভগ্ন পূর্ব্বক একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়াতে, রোমানস্ সেই পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। সে এক্ষণে সেই পথে একদল মুসলমান সৈন্য প্রবেশ করাইয়া নগরীর তোরণ উদ্ঘাটন করিয়া দিতে সম্মত হইল।

এই প্রস্তাবে খালেদ সম্মত হইলেন। তখন সেই ভয়ানক কার্য্যে আবদুল রহমান নিয়োজিত হইলেন। তিনি একশত মনোনীত সৈন্য সঙ্গে লইলেন। বিশ্বাসঘাতক রোমানসের গৃহে প্রবেশ করিয়া আহার করিলেন। অনন্তর আপন সৈন্যগণকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন দল তিন দিকে পাঠাইলেন। এবং "আল্লা আকবর" নাদ শ্রবণ মাত্র অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার প্রার্থনায় রোমানস্ গবর্ণরের গৃহ দেখাইয়া দিল। সকলেই ছদ্মবেশী। প্রহরীগণ চিনিতে পারিল না, নাগরিক বলিয়া মনে করিল। রোমানস্ অগ্রে গেল, গবর্ণরকে একজন বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে বলিল। গবর্ণর বলিলেন, "কোন্ বন্ধু এই নিশিথ সময়ে আমার অনুসন্ধান করে?" রোমানস্ বলিল "তোমার বন্ধু আবদুল রহমান তোমাকে নরকে পাঠাইয়া দিতে আসিয়াছে।"

হতভাগ্য গবর্ণর পলায়ন করিত, কিন্তু আবদুল রহেমান বলিলেন, "তুমি পুনরায় পলায়ন করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া একাঘাতে তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিলেন।

অনন্তর তিনি ও তাঁহার পঞ্চবিংশ অনুচর "আল্লা আকবর" বলিয়া চিৎকার করাতে দ্বার সমীপস্থ অন্যান্য সৈন্যগণ প্রতিধ্বনি করিল। তোরণ উদ্ঘাটিত হইল। খালেদ ও সার্জ্জাবিলের সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করিল। "আল্লা আকবর" নাদে, নগরবাসীগণ জাগরিত হইয়া কারণানুসন্ধানে অগ্রসর হইল, অমনি আপন আপন দ্বারসমীপে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড চলিবার পর নাগরিকগণ আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন খালেদ মহম্মদের একটি উপদেশ স্মরণ পূর্ব্বক হত্যাকাণ্ড স্থগিত করিয়া জীবিতদিগকে শাসনাধীন করিলেন।

গোলযোগ প্রশমিত হইলে নাগরিকগণ জিজ্ঞাসা করিল. "কি উপায়ে মুসলমানেরা নগরী প্রবেশ করিয়াছে?" তখন খালেদ ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, রোমানস্ বলিল, "আমাকর্ত্তৃক এসমস্ত সংঘটিত হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে, তোমাদের ধর্ম্ম ও খৃষ্টকে ঘৃণা করি। আমি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। কাবা আমার দেবমন্দির, মুসলমানগণ ভ্রাতা, মহম্মদ ধর্ম্মোপদেষ্টা। একমাত্র ঈশ্বর, তাঁহার গৌরব ও শক্তির অন্য অংশী নাই।"

এই বলিয়া পূর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোমানস্ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এবং বসরা হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। খালেদ তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিলেও যাহাতে তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠিত না হইতে পারে, তজ্জন্য প্রহরী নিযুক্ত রাখিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্র—

প্রতাপসিংহ।

(৫ম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠার পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চারণ।

বৈকালে মহারাণা প্রতাপসিংহ, শৈলম্বররাজ ও মন্ত্রী ভবানীসহায় কমলমর দুর্গের উপরে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার এখনও বিলম্ব আছে। দূরে উদয়পুর নগরের সৌধ-শিরে ও মন্দির-ধ্বজায় স্বর্ণ-বর্ণ সৌর-কররাশি প্রতিভাত হইতেছে। ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় অর্ব্বলী পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া জগতের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে—মিবারের ভূত ঘটনাবলীর সাক্ষী দিতেছে।—কারণ তদপেক্ষা রাজবারার চঞ্চলা অদৃষ্টলিপির উৎকৃষ্টতর সাক্ষি আর কে আছে? অর্ব্বলীহৃদয়ে রাজবারার কতই উন্মাদকাহিনী অঙ্কিত আছে? রাজবারার উৎকৃষ্ট শোণিত বিন্দু সমস্ত অর্ব্বলীর স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে, অর্ব্বলী চিরকাল বক্ষ পাতিয়া রাজবারার প্রধানগণের পদচিহ্ন ধারণ করিয়াছে; অর্ব্বলীর গুহায় গুহায়, কন্দরে কন্দরে রাজবারার বীরকীর্ত্তির নিদর্শন আছে; অর্ব্বলী রাজবারার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের, সুখ ও দুঃখের জীবন্ত সাক্ষী।

মহারাণা প্রতাপসিংহ ও তাঁহার বন্ধুগণ বসিয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন। কি মনে হইল সহসা উঠিয়া মহারাণা পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি অতি দূরস্থ ছায়াবৎ চিতোর নগরের ভগ্নচূড় দেবমন্দির, শ্রীভ্রষ্ট প্রাসাদ প্রভৃতি অবশেষসমস্তে নিবদ্ধ হইল। তিনি এমনি উন্মনা হইয়া উঠিলেন যে, যেন দেখিতে লাগিলেন বিগলিত-কুন্তলা, শ্রীহীনা ভবানী কল্যাণী দেবী ভগ্ন মন্দিরোপরে দাঁড়াইয়া বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতেছেন। বহুক্ষণ এইরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইলেন। সেই সময় একজন পরিচারক নিবেদিল,—

"অন্তাল নগরের চারণ দেবী-সিংহ নিম্নে অপেক্ষা করিতেছেন।"

মহারাণা সকলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

"তাঁহাকে এই খানে লইয়া আইস।"

অচিরে দেবীসিংহ উপস্থিত হইলেন। মহারাণা ও অপর সকলে তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দেবীসিংহ একে একে মহারাণা ও তদনুচরগণকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

দেবীসিংহের বয়স ষষ্ঠী অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার মস্তক বহ্বায়ত শ্বেত উষ্ণীষে সমাবৃত—উষ্ণীশের পার্শ্ব দিয়া কয়েক গুচ্ছ ধবল কেশ প্রকাশিত। তাঁহার বদন শ্মশ্রু-বিহীন—গুম্ফ নির্ম্মল শ্বেত ও উভয় পার্শ্বে বহু বিস্তৃত। ভ্রূ ও চক্ষুর লোম সমস্ত ধবল বেশ ধারণ করিয়াছে। দেবিসিংহের দেহ শ্বেত স্থূল পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন। পৃষ্ঠে এক খানি প্রকাণ্ড ঢাল, স্থূল শুভ্র কোমরবন্ধে এক খানি তরবার ও এক খানি কিরীচ বিলম্বিত। দেবীসিংহের দেহ উন্নত—বদন চিন্তাযুক্ত—মূর্ত্তি গম্ভীর। বয়স যতই কেন হউক না, স্বাভাবিক শ্লথতা তাঁহাকে অধীন করিতে পারে নাই। দেবীসিংহ মহারাণাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"এক্ষণে কি স্থির করিতেছেন ?"

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

"যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ করিব।"

দেবী। উত্তম।

ভবানী সহায় বলিলেন,—

"কিন্তু কি ভরসা—আমাদের কি আছে ?" বৃদ্ধ দেবীসিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; তিনি কহিলেন,—

"কাহার কি থাকে? আমাদের আমরা আছি। যদি না পারি তবে এরূপ কলঙ্কিত জীবন বহিয়া থাকা অপেক্ষা মরণে ক্ষতি কি ?"

মহারাণা বলিলেন,—

"ঐ কথা। ভবানী জানেন কেন এতদিন এ কলঙ্ক বহিলাম—ধিক্!"

দেবী। যত্নে কি না হয়? তেজ, উদ্যম, ভরসা।

মহারাণা কহিলেন,—

"দেব! আমার হৃদয় তেজ, উদ্যম বা ভরসা শূন্য নহে। আমি এখনও দেখিতেছি ঐ চিতোরের ভগ্নচূড় মন্দির-মস্তক হইতে যেন শ্রীহীনা আলুলায়িত-কুন্তলা কল্যাণী দেবী আমায় অভয় দিয়া বলিতেছেন, 'বৎস! মিবারের পুনরুদ্ধার তোমার দ্বারাই ঘটিবে।' মরি বা বাচি দেখিব মিবার থাকে কি না।"

দেবলবর রাজ বলিলেন,—

"যদি আপনার দ্বারা না হয়, তবে আর আশা নাই।"

দেবীসিংহের নয়ন আবার প্রদীপ্ত হইল। কহিলেন,—

"মানব যাহা করিয়াছে, মানব তাহা কেন পারিবে না ? মিবারের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলেও ইহার আশা আছে। এইরূপ ঘোরান্ধকারে মিবার বার বার সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—আবার সুখ-সূর্য্যের উদয়ে আলোকিত হইয়াছে। এবারও কেন তাহা না হইবে ? যদি তাহা না হয় তবে আমাদের হৃদয়ই নিন্দনীয়। হায়! পূর্ব্বে যে হৃদয় লইয়া রজঃপুতগণ জগৎ পূজিত ছিলেন, এক্ষণে আমাদের সে হৃদয় নাই—সে উদ্যম নাই, সে অদম্য স্পৃহা নাই, সে উচ্চ আশা নাই, সুতরাং এক্ষণে আমাদের এই হীনতা, এই দুর্দ্দশা, এই অপমান।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উন্মত্তভাবে গাহিতে লাগিলেন,

"কোথায় সেদিন মনের গরবে *
হাসিত ভারত যেদিন সুখে?
কোথায় এখন স্বাধীনতা ধন?
পর নিপীড়ন, ভারত-বুকে।

"হায়! হায়! হায়! একি হেরি আজি
কাঙ্গালিনী বেশে রাজার মাতা
মলিন বসন, নাহিক ভূষণ।
শীর্ণকায় হায়! জীবন-মৃতা!

"কি গাহিব আজি? গাহিতে কিআছে?
সকলি লুটেছে যবনদল।
ভারত এখন শ্মশান সমান
শুষ্ক মরুভূমি যাতনা স্থল।

"ঐ যে চিতোর আলু থালু বেশ,
কবরী বিহীনা নারীর মত,
ভূষণ বিহীনা শ্রীহীনা নবীনা,
বিধবা কামিনী রোদনে রত—

"উহার এদিন ভাবিলে সতত
কাঁদিয়া উঠেছে আকুল প্রাণ;—
সলিলে প্রবেশি, হলাহল খাই,
আছাড়িয়ে মাথা করি শত খান্।"

মহারাণা উৎপৎস্যমান শোক-প্রবাহ প্রশান্ত করিবার নিমিত্ত বক্ষে হস্তদ্বয় চাপিয়া বার বার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। চারণ দেবীসিংহ সংক্ষুব্ধ স্বরে হস্তান্দোলন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

"ভাবিয়ে দেখহে সেদিনের কথা
যেদিন চিতোর স্বাধীন ছিল,
সেই শুভদিন মনে কর সবে
যেদিন বাপ্পা জনম নিল।

"ত্রিকূটের পদে নগেন্দ্র নগরে
খেলিছে বালক বাপ্পা রায়
বালক যখন তখন হইতে
যশের সৌরভ দিগন্তে ধায়।

"সোলাঙ্কির বালা ঝুলুনি খেলিতে
ছয়শত সখি সঙ্গেতে লয়ে,
আম্র উপবনে মনের আনন্দে
গিয়েছে হরষে যতেক মেয়ে।

"ঝুলুনি খেলিবে নাহি তার দড়ি
ভাবিয়ে আকুল, মরমে মরে।
গোপাল লইয়া দরিদ্র বাপ্পা
ছিল সেই মাঠে জীবিকা তরে।

"হাসিতে হাসিতে নরেশনন্দিনী
বলিল তাহার দড়ির কথা।
বাপ্পা কহে 'তাহে কি ভয় তোমার?
'দিইতেছি দড়ি আনিয়া হেথা।

" 'আগে হ'ক তবে বিবাহের খেলা
'ঝুল্ ঝুল্ খেলা খেলিও শেষে।'
ভাবিয়া চিন্তিয়া বালিকার দল
ধরিল তাহার হাত হরষে!

* এই গীত ঠুংরি তাল লগনি রাগিণীতে গেয়।

"কুমারীর বাস গোপালের বাসে
বাঁধিয়া দিলেক সকলে মিলে ;
পাক দিল সবে শাস্ত্রের বিধানে
আনন্দেতে আম্র গাছের মূলে।

"হইল বিবাহ খেলার ছলে,
শুনিল নরেশ দুদিন পরে ;
রাখাল বালক করেছে বিবাহ
রাজার দুহিতা গোপন করে।

"আজ্ঞা দিল রাজা বাঁধিতে বাপ্পায়,
শুনিয়া বালক ব্যাকুল ভয়ে ;
গিরির গুহায় পলাইয়া যায়
দুইজন ভীল সঙ্গেতে লয়ে।

"চিতোরের যত মোরী রাজা ছিল
তাহারা আদূল বাপ্পায় অতি ;
সামন্তের পদে অভিষেক তায়
করিল আদরে যত সুমতি।

"সমরে অটল প্রবল প্রতাপ
শাসিল বাপ্পা যবন গণে ;
গজনি নগরে বিজয় কেতনে
উড়াইল বীর তেজের সনে।

"চিতোরের ছত্র ক্রমেতে শোভিল
বাপ্পার শিরে ছটার মত।
রাজ, উপরাজ, সামন্ত প্রধান
ভীতভাবে সব হইল নত।

" 'হিন্দু সূর্য্য' আর 'রাজগুরু' দের
হইল সেহতে বাপ্পার নাম।
ভবেশের দাস, দেবের চিহ্নিত,
অজর, অমর, বিজয় কাম।

"সেই কাল হতে চিতোরের দ্বার
দেবাদেশে মুক্ত হইয়ে গেল ;—
নাচিল অপ্সরা, গাইল কিন্নর,
প্রসূন বর্ষিল দেবের দল।"

দেবলবর রাজ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"হায় ! কি দিনই গিয়াছে !'

দেবী সিংহ বলিলেন,—

"আবার শুনুন্—

"কাগার সময়ে দুরাত্মা যবন
নাশিল ভারত বীরের দল।
হলো অন্ধকার, গেল গেল সব
ধরম করম অতল তল।

"চিতোরের রাণা ধীর বীরবর
'যোগীন্দ্র' উপাধি সমর রায় (সিংহ)
ত্যজিল জীবন কাগার সংগ্রামে,
করি বীরপনা—কহা না যায়।

" পৃথা রাণী তাঁর, নবীনা কুসুম,
চিতায় আরোহী জলিয়া গেলো।
দেশ ছারখার, শোণিতের ধার
প্রবল বেগেতে বাহিত হলো।

" এই চিতোরের কি দশা তখন
স্মরণ করহে ধীমানগণ !
শিশু কর্ণ হাতে রাজ কার্য্যভার,
রাণী কর্ম্মদেবী ব্যাকুল মন।

" আসিল কুতব কিতবের দাস
হরিতে চিতোর স্বাধীনতায়।
স্মরিয়া মহেশে, দেবী কর্ম্মদেবী
দিলা গিয়া তেজে আটক তায়।

" হইল সমর অম্বরের দেশে
কল্যাণীর মত যুঝিলা বামা ;
পরাজিত করি নিজ বাহুবলে
তাড়াইয়া তায় দিইলা রমা।

" সেকথা স্মরিলে এখনও উল্লাসে
নাচিয়া উঠে এ অবশ প্রাণ—
হর্ষ, ঘৃণা, রাগ এ মৃত হৃদয়ে
করে পুনরায় জীবন দান।

" সমস্ত ভারত ক্রমে ক্রমে হায়
যবন চরণে বিনত হলো ;
কেবল চিতোর কর্ম্মদেবী তেজে
অটল ভাবেতে স্বাধীন রলো।

" রমণীর মনে যে তেজ আছিল
এখন কোথায় সে তেজ আর ?
গত যত বল রোদন এখন
চিতোর অদৃষ্টে হয়েছে সার।"

মহারাণা দন্তে দন্তে নিপীড়ন করিয়া বলিলেন ;

"কেন মরি নাই ?"

দেবীসিংহ কহিলেন,—

" আর এক দিনের কথা—

" আর এক দিন চিতোর অদৃষ্টে
ঘটিল ঘটনা কাহিনী শুন !
চোহান তনয়া পদ্মিনী সুন্দরী
যেমনি স্বরূপ তেমনি গুণ।

" শোভার ভাণ্ডার পদ্মিনী কথা,
জগত জুড়িয়া হইল খ্যাত।
বাদশাহ আলা শুনিয়া সে কথা
হইয়া উঠিল পাগল মত।

"লম্পট দুরন্ত ত্যজি লাজ ভয়
ভীমসিংহে কয় মনের কথা ;—
' দেখিবারে চাই দর্পণেতে ছায়া
' বারেক তোমার পদ্মিনী যথা।'

" যে কাল সমর উঠিল তাহাতে
স্মরিলে এখনও উপজে ভয়।
বালক বাদল, রাণা ভীমসিঙ্
আর যোধ যত গণা নাহি যায়,

" যুঝিল অনেক ; রহিল না বীর ;
বহিল শোণিত প্রবাহি নালা।
অদৃষ্টের গতি কে খণ্ডাতে পারে ?
জয় পরাজয় বিধির খেলা।

" হলো পরাজয় ; চক্রের গতিতে
চিতোর পড়িল যবন করে।
প্রাসাদ উপরে আছিলা পদ্মিনী
ব্যাকুলা সংবাদ পাবার তরে।

" দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদল
শোণিতাক্ত দেহে আসিল তথা ;
কহিলেক ' মাতঃ ! কি দেখিছ আর ?
আমাদের আশা বিলুপ্ত হেথা।'

"কহিলা পদ্মিনী ' বল্‌রে বাছনি
'কিরূপ আছেন পিতৃব্য তব ?'
'কি বলিব দেবি ! শোণিত শয্যায়
' পাতিয়া গৌরবে নিহত শব,

" 'অসভ্য যবন করি উপাধান,
'নাশি শত্রুরাশি, লভিয়ে মান,
'ত্যজি এই দেহ ভীমসিংহ রায়,
'অমর লোকেতে লভিলা স্থান।'

" কহিলা সুন্দরী 'বল্‌রে বাদল !
'বুঝিলা কেমন প্রাণেশ মম ? '
কহিলা বাদল, জুড়ি দুই কর
'দেখি নাই কভু তাঁহার সম।

" 'এই মাত্র জানি, যশ অপযশ
'বিপক্ষ জনেরা ঘোষণা করে;
'ছিল না সমরে একটিও অরি
'তাঁর যশাযশ প্রচার তরে।'

"হাসি সুবদনী আশীষি বাদলে
বিদায় করিলা বিধবা রাণী।
পুরের ভিতর রাণীর আদেশে
জ্বালিলেক চিতা অনল আনি।

"জ্বলিল অনল, ধিকি ধিকি ধিকি,
উজলিল তায় তাবত দেশ;
একে একে একে আসিল তথায়
চিতোরের নারী পরিয়ে বেশ।

" নূতন বসন পরিয়ে সকলে
দুলাইয়ে গলে জবার মালা
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ঘৃতের আহুতি
পূজিলা অনলে বীরের বালা।

"সাঙ্গ হলে পূজা, সঙ্গীত প্রবাহে
বসুধা আকাশ প্লাবিত করে,
অনলে বেষ্টিয়া, মহিলার দল
গাইতে লাগিল সমান স্বরে।

"নন্দন কাননে দেবতার দল
শুনিলা সে গীত স্তব্ধভাবে।
ক্ষিরোদবাসিনী লক্ষ্মী সনাতনী
ব্যাকুল হৃদয়ে পুছিলা তবে।

" 'কহ নারায়ণ ! কাঁপিছে অবনী,
'পাতাল, স্বরগ কিসের তরে ?
'পশু পক্ষী যত নীরব নিচল,
'কে যেন জীবন লয়েছে হরে !

" 'বহিছে না বায়ু—চিরক্রীড়াশীল—
'নড়িছে না পাতা অচল সব।
'মন্দাকিনী বেগ শিথিল হয়েছে
'নাহি কুলু কুলু গতির রব !

" 'হ্যাদে দেখ হোথা স্থাণুর ললাটে
'ধক্ ধক্ ধক্ আগুণ জ্বলে !
'ছাড়িয়ে স্বরগ, বসুধা ভেদিয়া
'পশিতেছে যেন পাতাল তুলে !

" 'পুনঃ দেখ দেখ নাচিছে মহেশ,
'সঙ্গেতে জুটেছে ভৈরব কত !
'নাগদল দেখ এল্যায়ে পড়িছে
'জীবন বিহীন মরার মত।

"'হেথা একি নাথ! দেবেশ-হৃদয়ে,
'পড়েছে ঢুলিয়া দেবের রাণী!
'কবরী বন্ধন খুলিয়ে গিয়েছে,
'বাঙ্ময়ী শচী কহে না বাণী!

"'আরও চমৎকার দেখহ প্রাণেশ
'বসিয়ে আছেন শচীর পতি,
'শচীর কারণে নহেন ব্যাকুল
'আর কি আনন্দে বিভোর মতি!'

"কহিলা তখন জগতের পতি
'শুন মন দিয়া হৃদয়েশ্বরি!
'রাখিতে সতীত্ব—জাতীয় গৌরব,
'অনলে পশিছে ভারতনারী।

"'জগতে অতুল সতীত্ব-রতন
'মহিমা তাহার তাহারা জানে,
'রাখিতে সে ধন অটুট অক্ষয়,
'পরাণ তাহারা সামান্য গণে।

"'বসুধা ভিতরে আর্য্যনারী সম
'রমণীরতন নাহিক আর,
'কীর্ত্তি তাহাদের দেবের বাঞ্ছিত,
'মিলে না কোথাও তুলনা তার!

"'হাজার হাজার রমণীরতন
'পশিছে চিতায় আনন্দ মনে—
'উপেক্ষি যৌবনে, রূপের তরঙ্গে,
'ভোগের আশায় বিষয় ধনে।

"'গাইছে তাহারা সমস্বরে গীত,
'সে গীতের ধ্বনি পশিছে যথা,
'পুণ্য, পবিত্রতা, ধর্ম্ম, স্বর্গসুখ,
'অতুল আনন্দ সিঞ্চিছে তথা।

"'স্থাবর জঙ্গম দেবতা মানব
'সে গীতের ধ্বনি যাহার কাণে,—
'লভিছে প্রবেশ—হতেছে সেজন,
'আনন্দ উন্মত্ত, বিভোর প্রাণে।

"'সে গীতের হেতু নাচিছে মহেশ,
'এলায়ে পড়েছে শচীর দেহ,
'স্তব্ধ মন্দাকিনী, নিচল পাদপ,
'আপনে আপনি নাহিক কেহ।

"'তুমি সুবদনী শুন মন দিয়া
'তোমারও আসিবে ঘুমের ঘোর,
'আনন্দ উন্মাদ ছাইবে অন্তর,
'প্রেমেতে হইবে হৃদয় ভোর।'

"হৃষীকেশ বুকে রাখিয়া মস্তক
শুনিলা বিস্ময়ে কেশব প্রাণ—
রাজপুতবালা অনলে বেষ্টিয়া
করতালি দিয়া গাইছে গান;—

"'যাই যাই প্রাণনাথ! ত্যজি এ জীবন,*
'অনলে কি তরি দেব! লভিতে চরণ?

'জ্বলিছে অনল যাহা,
'প্রিয় বলে মানি তাহা,
'লয়ে যাবে আমাদের সৌর-নিকেতন,
'সে সুখের বিনিময়ে কি ছার জীবন।

* এই গীত তাল যৎ ও কামদ রাগিণীতে গেয়।

' এমন সুদিন তবে
' বল আর কবে হবে ?
'হাস আজি প্রাণ ভরে সহচরিগণ,—
'সুখে থাক বিভাবসু—শোক-বিনোদন।

' বিলম্বে কি প্রয়োজন,
' কর ত্বরা আয়োজন।
'চল সবে করি গিয়া অনলে শয়ন—
'কুসুমিত সুকোমল শয্যার মতন।

' ঐ শুন যবন রব,
' আসিছে ছুটিয়ে সব,
'আসিতে আসিতে হই অনলে মগন,
'জীবন যৌবন দেহ করুক গমন।

' দেখে সেই ভস্ম স্তূপ,
' বুঝিবে যবন ভূপ,
'জীবন ধর্ম্মের ভাব উথলে যখন,
'মানব অক্ষম হায়! রোধিতে তখন।

' সে পবিত্র ভস্মরাশি,
' উড়িবেক দিশি দিশি,
'করিবে মানব তেজে ধিক্কার প্রদান—
' যবনের বাসনার বিদ্রূপ বিধান।

' ঢাল ঢাল হবি আর,
' চন্দন কাষ্ঠের ভার '
'পাবকে প্রবল কর মনের মতন,—
'ঐ দেখ ডাকিছেন হৃদয়ের ধন।

' ক্ষম অপরাধ নাথ,
' এখনি তোমার সাথ,
'মিলিয়া লভিব দেব! অক্ষয় জীবন,
'সেবিব মনের সুখে কাঙ্ক্ষিত চরণ।

' ঢাল ঢাল হবি আর
' চন্দন কাষ্ঠের ভার
'পাবকে প্রবল কর মনের মতন
'নাচুক অনল শিখা ভেদিয়া গগন।

' বম্ বম্! হর হর!
' উমানাথ! দিগম্বর!
'ভূতনাথ! ভোলানাথ! বিপদভঞ্জন!
'রক্ষ রক্ষ অবলায় শ্রীমধুসূদন!'

"এত বলি সব মহিলা মণ্ডলী *
ঝাঁপ দিলা ক্রমে অগিণী মাঝে—
ভুবন মোহিনী নবীনা কামিনী
আবরিয়া কায় মোহিনী সাজে।'

"সুকুমার ফুল রূপের লতিকা
অকালেতে হায় খসিয়ে গেলো
পশিয়া অনলে, অনল বরণা—
অনলে অনল মিশায়ে গেলো।'

"শত শত শত স্বরগ দুয়ার
তখনি আপনি খুলিয়া গেল;
নন্দন হইতে সুরভির ভার
বহিয়া আনিল মলয়ানিল।

"মধুর বাতাসে পূরিল বসুধা
প্রেমের আনন্দে যাইল ভরে;

* এই স্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুনরায় তাল যৎ ও লগ্নি রাগিনীতে গেয়।

চেতনাচেতন জীব অগণন
ভাসিল অবশে সুখের সরে।

"শত শত শত অপ্সরী কিন্নরী
নামিল ভূতলে ধরিয়ে তান—
পরম যতনে মহিলার দলে
লইয়া চলিল স্বরগ স্থান।'

"ভাতিল স্বরগ দ্বিগুণ বিভায়
যেমন তাঁহারা পশিলা তথা ;
শত দিবাকর, শতেক নন্দন,
শত কল্পতরু দেখাল সেথা।

" স্বয়ং পিণাকী হয়ে অগ্রসর
আশীষিলা সুখে বামার দলে ;—
' ভূতলে অতুল তোমাদের যশ,
' অমর তোমরা কীর্ত্তির বলে ;

" যতদিন ভবে চন্দ্র সূর্য্য রবে
' রবে ততদিন এই সুনাম ;
' সুখে রহ সবে নিজ পতি পাশে ;
' যাও সুলোচনে দিনেশ ধাম।

" ' গাইবে স্বরগ, গাইবে বসুধা,
' জয় জয় জয় ভারত নারী
' ভূতলে অতুল তোমাদের পেয়ে
' ধন্য হলো আজি জগৎ পুরী।'

" সুরভি কুসুম বিস্তারিলা পথে,
দাঁড়া(ই)লা দুপাশে-অমরগণ,
মাঝ খান দিয়া হাসিতে হাসিতে
আনন্দে চলিলা রমণীগণ।

"যেথা দিয়া তাঁরা চলিতে লাগিলা
গাইতে লাগিলা অসুর অরি ;—
' ভূতলে অতুল তোমরা লো সবে,
' জয় জয় জয় ভারত নারী।' "

মহারাণা প্রতাপ সিংহের নয়নে আনন্দাশ্রু আবির্ভূত হইল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈলশ্বর রাজ বলিলেন,—

" হায়! সেই মিবার! "

দেবীসিংহ আবার গাহিতে লাগিলেন,—

" চলিলেক আল্লা লইতে চিতোর,
দেখিলেক তাহা শ্মশান স্থল—
শোণিতে শবেতে পূরিতা নগরী,
নিহত সমরে বীরের দল।

" যেদিকে নয়ন ফিরাইল আলা
পরিহাস তায় বারমবার
করিতে লাগিল, জনহীন পুর,
প্রাণহীন দেহ, শোণিত ধার।

" পশিলা বাদশা প্রাসাদ ভিতরে,
দেখিলা তখনও জ্বলিছে চিতা,—
পুড়িয়াছে যত মহিলামণ্ডলী
যবন-দৌরাত্ম্যে হইয়া ভীতা।

" হু হু হু হু করি জ্বলিছে অনল
অনিলে ছুটিছে তাহার শিখা ;
কাঁপিয়া উঠিল যবন রাজন—
এমন কখন হয়নি দেখা!

" ছুটিতেছে শিখা এদিক ওদিক
কভুবা আসিছে বাদশা পাশে ;
' ভাবিল ভূপতি ধাইছে অনল

আমাকেই বুঝি গ্রহণ আশে।

সভয়ে তখন যবন রাজন
দুই চারি পদ পিছায়ে গেলো ;—
স্থানের মাহাত্ম্যে পাষাণের হিয়া
আজিকে ভয়েতে আকুল হলো!

"দেখিলেক যেন চিতার মাঝারে
পড়িয়া রয়েছে অযুত দেহ ;—
সুকুমার কায়, দহেনি অনলে!
গাইছে কেহবা, হাসিছে কেহ!

"তখনি দেখিলা নাহি সেইরূপ!
পুরিয়াছে চিতা বিকৃত জীবে!
জ্বাল য় যন্ত্রণায় অধীর হইয়া
ছুটাছুটী হায়! করিছে সবে!

"পলাই পলাই ভাবিয়া ভূপতি
ফিরিয়া দেখিলা প্রাসাদ পানে ;
খল্ খল্ খল্ ভয়ানক হাসি
চারিদিক হতে পশিল কাণে!

"শূন্য নিকেতন, মুক্ত গৃহদ্বার,
সে সব ভেদিয়া হাসির ধ্বনি,
কাঁপাইয়া দিল যবনের হিয়া—
চাপিলা দুকাণ, প্রমাদ গণি!

"বিকট ধ্বনিতে কহিলা তখন,
'কি দেখিছ ভূপতি?' অদৃষ্টচর ;
চমকি উঠিল বিধর্ম্মী যবন
চাহিলা সভায় দিগ্দিগন্তর!

" 'কি দেখিছ ভূপ? ভাবিয়াছ মনে
'ক্ষমতা তোমার অটুট ধন ;
'বুঝিয়াছ মনে উৎপীরণ স্রোতে
'ভাসিয়া যাইবে ক্ষত্রিয়গণ!

" 'ত্যজিবে সম্মান, জাতীয় গৌরব,
'আশ্রিত হইবে চরণে তব ;
'হিন্দু সিমন্তিনী সেবিকা করিয়া
'সুখের সাগরে সাঁতার দিব।

" 'না শুনে যদ্যপি হিন্দুরা একথা—
'অসি আছে হাতে কিসের তরে?
'সমরে নাশিয়া, অধীন করিয়া,
'বাসনা মিটাব হৃদয় ভরে।

" 'ভ্রান্ত ম্লেচ্ছরাজ! তোমার সিদ্ধান্ত
'নিতান্ত অসার, এখন দেখ।
'জ্ঞান উপার্জ্জন হয়না সহসা,
'এখন নরেশ ঠেকিয়া শেখ।

" 'কোথায় পদ্মিনী,নবীনা কামিনী,
'যার কথা শুনে ক্ষেপিয়াছিলে?
'যাহার কারণে শোণিতের স্রোতে
'বসুধা প্লাবিত করিয়া দিলে?

"কোথায় এখন, হে ইন্দ্রিয় দাস!
'পদ্মিনী সুন্দরী কোথায় গেল?
'জলের আশায় ছুটাছুটী করে
'আগুণে আসিয়া পড়িতে হলো!

" 'দেখিছ যে চিতা, উহার অনলে
'পুড়িয়া পদ্মিনী হয়েছে ছাই ;

'করেছ যে সাধ, লম্পট বর্ব্বর !
'মিটিবার আর উপায় নাই।

"'ভেবেছিলে তুমি হে অদূরদর্শী !
'হইবে যবন চিতোররাজ ;—
'প্রভাহীন দেশে, জনহীনস্থলে
'কর এবে ভূপ রাজার কাজ।

"'পড়িয়া রয়েছে সম্মুখে তোমার
'সোণার চিতোর—শ্মশান ভূমি !
'কি ভাবিয়া এলে, কি ফল ফলিল—
'কাঞ্চনে অঙ্গার লভিলে তুমি !

"'ভেবেছিলে মনে, সমরে পুরুষ
'মরে যদি সব তাহে কি হানি ?
'সুন্দরী সকল জীবিতা রহিলে,
'অতুল সম্পদ বলিয়া মানি।

"'যবন ভূপাল ! যবনের মত
'বিচার বিধান করিয়াছিলে ;
'জানিতে না তুমি, কুলের কামিনী
'ত্যজে না সতীত্ব সংসার দিলে।

"'পুরুষের দেখ চিহ্ন পড়ে আছে,
'হেথায় সেথায়, দেখিলে পাবে,—
'রমণীর দল কোথায় গিয়েছে
'চিহ্ন তার আর নাহিক ভবে।

"'এমন যে দেশ, বিধর্ম্মী ভূপাল !
'করিতে এসেছে তাহাকে জয় !
'অসির ভয়েতে নহে তাহা ভীত
'জয় করা তাহা সুসাধ্য নয়।

"'ক্ষমতা তোমার নিতান্ত অসার
'রাজপুতগণ অন্তরে গণে।
'রাখিতে সম্মান অতি অকাতরে,
'ত্যাগ করে তারা জীবন ধনে।

"'এ দেশে তোমার নাহি কোন আশা
'অসি তব পুনঃ পিধানে লও
'যে দেশে মানব কৃপাণ দেখিলে
'ভয়ে হয় জড়, তথায় যাও।

"তাহারা এখনি কাতরে পড়িবে
'আসিয়ে তোমার চরণ তলে ;
'নারী দিবে তারা বাছিয়া বাছিয়া,
'মানিবে তোমায় দেবতা বলে।'

"আবার আবার হইল তখন
অতি ভয়ানক হাসির রোল।
আলা বাদশাহ, হইয়া উঠিল
মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় শুনিয়া গোল।

"চাহিয়া দেখিল এদিক ওদিক
নাহি কোন খানে একটি জন—
ভয়ে ভয়ে ভয়ে, পায়ে পায়ে পায়ে
বাহিরে আসিল ব্যাকুল মন।

"এইরূপে হায় ! চিতোর নগর
যবন পীড়নে বিনষ্ট হলো।
বহুকাল পরে হামীর সুধীর
আবার তাহায় জীবন দিলো।

"শোভিল চিতোর স্বাধীন হইয়া
ভাসিল মানব সুখের নীরে ;

হিন্দুর নিশান উড়িল আবার
চিতোর নগরে প্রাসাদ-শিরে।

" কত কত কত হইল রাজন,
ভুবনে অতুল তাঁদের যশ।
সাধি হিত কাজ, নাশি শত্রু কুল
মানবমণ্ডলী করিলা বশ।

" বলিতে হইলে সে সব কাহিনী
সপ্ত দিবানিশি বহিয়া যায় ;
স্মরিলে তাঁদের নিরূপম কথা
অশ্রুবারি বক্ষ ভাসায়ে ধায়।

" তাঁদের প্রভায় সমস্ত মিবার
হইয়া উঠিল উজলতর ;
হাসিল ভারত মনের আনন্দে,
পাইয়া সে সব কুমার বর।

কিন্তু হায়———
" কোথায় সে দিন মনের আনন্দে
হাসিত ভারত যেদিন সুখে ?
কোথায় এখন স্বাধীনতা ধন ?
পর নিপীড়ন, ভারত বুকে।

" ঐ যে চিতোর আলু থালু বেশ,
কবরীবিহীনা নারীর মত,
ভূষণবিহীনা, শ্রীহীনা নবীনা,
বিধবা কামিনী, রোদনে রত।

" উহার এ দিন ভাবিলে সতত
কাঁদিয়ে উঠে এ আকুল প্রাণ,
সলিলে প্রবেশি, হলাহল খাই,
আছাড়িয়ে মাথা করি শত খান্।

" ধিক্ উদিসিংহে তাঁহারই সময়ে
এঘোর——"

মহারাণা প্রতাপসিংহ চারণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

" না—ও কথায় আর কাজ নাই। "

বহুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া মহারাণা অনুচ্চস্বরে কহিলেন,—

" উদয়সিংহ—পাপ—পাপ উদয়সিংহ না জন্মিলে আজ্ কাহার সাধ্য মিবারের এ দুর্দ্দশা করে ? "

শৈলম্বর রাজ কহিলেন,—

" সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সায়ংকালীন উপাসনা করা হইল না। "

দেবীসিংহ ও দেবলবর রাজ বলিলেন,—
" বটেইত—চলুন। "

একে একে সকলে দুর্গের ছাত হইতে অবতরণ করিলেন।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

" সেই তুমি ? "

সময়ে সময়ে দুই একটি ঘটনা চিত্তকে এমনি আক্রমণ করে যে, কিছুতেই তাহা হইতে মন অন্তরিত করা যায় না। তাহা হৃদয়ের সহিত এমনি মিশিয়া যায় যে, কিছুতেই তাহার ছায়া বিলুপ্ত হয় না ; শয়নে, স্বপ্নে প্রতিকার্য্যে সেই ব্যাপার বিভিন্ন ভঙ্গীতে আসিয়া চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। নাথদ্বার নগর সমীপে বুনাস্ নদী-তীরে সেই বীর-মদোন্মত্তা কিশোরীর নিরু

পম মাধুরী ও ত্বদীয় হৃদয়ের অসামান্য প্রশস্ততা অমরসিংহের চিত্তকে এরূপ উদ্বেলিত করিয়াছিল যে, এই কয়দিন মধ্যে তিনি সেই ব্যাপার একবারও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পিতৃ-পার্শ্বে, মাতৃ-সকাশে, শত্রু-নিপাত-পরামর্শে সকল সময়েই সেই ভুবনমোহিনীর আশ্চর্য্য সাহস, অপরিসীম স্বদেশানুরাগ ও অসামান্য সৌন্দর্য্য সজীব চিত্রের ন্যায় মানস-চক্ষে সন্দর্শন করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি অমরসিংহ দেশের অবস্থা চিন্তনে উদাসীন ছিলেন? যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী—তজ্জন্য সতর্কতা বিধেয়—একথা শিশোদিয়া বংশাবতংস মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র সম্পূর্ণই জানিতেন। কি দিবা কি রাত্রি সততই তাঁহারা সমরায়োজনে রত।

রাত্রি এক প্রহর। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী বিশ্বভূমে অবতীর্ণা। বহুদূরে কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত গোগুণ্ডা দুর্গ আকাশ পর্য্যন্ত মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে; চন্দ্রালোকে দুর্গ যেন অর্ব্বলী পর্ব্বতের শাখা বিশেষ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই সময়ে যুবরাজ অমরসিংহ অশ্ব-পৃষ্ঠে গোগুণ্ডা দুর্গে গমন করিতেছেন। এখনও দুই ক্রোশ যাইতে হইবে। বেগগামী অশ্ব দ্রুতগতি চলিতেছে। হঠাৎ পার্শ্বস্থ বন মধ্য হইতে বিকট চীৎকার ধ্বনি উঠিল। অশ্ব উৎকর্ণ হইয়া পুচ্ছ আন্দোলন ও শব্দ করিল। অমরসিংহ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ব্যাপারটা কি না জানিয়া অগ্রসর হইতেও ইচ্ছা হইল না। তখন পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল,—

"আজি আর নিস্তার নাই। যদি জীবনের সাধ থাকে তবে বাদশাহের দাসত্ব স্বীকার কর।"

অমরসিংহ অশ্ব ফিরাইলেন। দেখিলেন, চারি জন মুসলমান তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিতেছে। এক লম্ফে তাঁহার অশ্ব তাহাদের সম্মুখীন হইল। তাহাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। তখন অমরসিংহ অসিদ্বারা পার্শ্বস্থ যবনকে আঘাত করিলেন। সে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল। তিন জন মুসলমান অসি হস্তে অমরসিংহকে আক্রমণ করিল; তিনি কাহাকেও আক্রমণ করিতে অবসর পাইলেন না, কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। যবনেরা মনে মনে তাঁহার শিক্ষার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। এরূপে কার্য্যসিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া তাহারা এককালে অনেকদূর পিছাইয়া গেল। অমরসিংহ সেই অবসরে ধনুক হইতে তীর ত্যাগ করিলেন; সে তীর এক জনের হস্তবিদ্ধ করিল, সুতরাং সে অগ্রসর হইতে পারিল না। অপর দুইজন সবেগে আসিয়া এককালে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিক হইতে আক্রমণ করিল। বিচিত্র শিক্ষার প্রভাবে তিনি তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। অমরসিংহ নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন, কিঞ্চিদ্দূরে না যাইলে জয়ের আশা নাই। ইঙ্গিতমাত্র অশ্ব বিংশ হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। অমর তখন ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগিলেন। এক তীরের আঘাতে পূর্ব্বে যাহার হস্ত বিদ্ধ হইয়াছিল, এবার

তাহার মুণ্ড বিদ্ধ হইয়া গেল। সে তখনই পঞ্চত্ব পাইল। তখন দুই জন মাত্র শত্রু অবশিষ্ট রহিল। একজন বেগে অগ্রসর হইয়া অমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আর এক জন দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই ব্যক্তি স্বয়ং মহাবেত খাঁ। নিরত অসি চালনায় অমরসিংহ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি বিশ্বময়ী ভবানীর চরণ স্মরণ করিয়া উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবেত অলক্ষিত ভাবে, অমরের পশ্চাতে আসিল। অমর আগতপ্রায় বিপদের কিছুই জানিতে পারিলেন না। তখন জগৎহিতপরায়ণা দেবমাতার দৈববাণীর ন্যায়, মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায়, অকূল সিন্ধু-নীর-নিমগ্ন ব্যক্তির আশ্রয়ের ন্যায় অতি দূর হইতে শব্দ হইল।—

"রাজপুত্র! ফিরিয়া দাঁড়াও! সাবধান!"

নিমেষমধ্যে রাজপুত্র ফিরিয়া দেখিলেন —জীবন গতপ্রায়—বিপক্ষের অসি উত্তোলিত। দুই জনেই তখন অমরকে আক্রমণ করিল। সেই সময় সহসা একজন মুসলমান দারুণ যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া অশ্বভ্রষ্ট হইয়া পড়িল ও গতাসু হইল। অমর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন,—' ইহাকে কে মারিল?' কেবল মহাবেত জীবিত রহিলেন। আর যুদ্ধ করা সৎপরামর্শ নহে বিবেচনায় তিনি বিপরীত দিকে অশ্ব ফিরাইলেন। অমর ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগিলেন ও তাহার পশ্চাতে অশ্ব চালাইলেন। মহাবেত পলাইতে পলাইতে কহিলেন,—

' ফিরিয়া যাও। তুমি আজি যে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ, তাহা বড় বড় বীরের পক্ষেও শ্লাঘার বিষয়! তুমি তো বালক। এই কয় মুসলমানের বীরত্বের কথা বাদসাহাও অবগত আছেন। কিন্তু ভাবিও না, অমর! এ সৌভাগ্য প্রতিদিন ঘটিবে। যবনের দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি। আজি না হয় কালি ফলিবে।'

অমর বলিলেন,—

'একবার আকবরকে আসিতে বলিও—বিধিলিপির অর্থ বুঝাইয়া দিব।'

অমরের অশ্বের ন্যায় মহাবেতের অশ্ব অধিক শ্রান্ত হয় নাই। অতএব সে বেগে ছুটিতে লাগিল, অমরের অশ্ব তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না। তখন অমরসিংহ হতাশ হইয়া অশ্ব ফিরাইলেন। কারণ মহাবেত তখন বনান্তরালে অদৃশ্য। শ্রান্তি পরিহারার্থ ক্ষণেক বসিবেন স্থির করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সন্নিহিত বৃক্ষপার্শ্বে দেখিলেন—বর্শাহস্তে শ্বেতাম্বর বিশোভিতা ভুবনমোহিনীপ্রতিমা! চন্দ্রালোকে রমণীর বদন দেখিতে পাইলেন; সবিস্ময়ে কহিলেন,—

' সেই তুমি?'

কিশোরী সম্মান সহকারে অমরসিংহকে প্রণাম করিলেন। অমর আবার কহিলেন,—

' এতক্ষণে বুঝিলাম অদ্য তোমারই উপদেশে প্রাণ পাইয়াছি, তোমারই বর্শায় একজন যবন নিহত হইয়াছে। তোমার ঋণ ইহজন্মে শোধিতে পারিব না।'

সুন্দরী কহিলেন,—

' সে কি কথা—আমি কি করিয়াছি?'

যুবরাজ কহিলেন,—

'তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের আশায় নিতান্ত ব্যাকুল ছিলাম। তোমার গুণগ্রাম—তোমার—যে কখন ভুলিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না।'

কিশোরী লজ্জায় বদন বিনত করিলেন। অমরসিংহ আবার কহিলেন,—

'তুমি আজি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?'

সুন্দরী হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

'আমি কোথায় না থাকি? আপনি এখন কোথায় যাইবেন?'

অমরসিংহ বলিলেন,—

'আমি গোগুণ্ডা দুর্গে যাইব।'

কিশোরী বলিলেন,—

'আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন, একটু বিশ্রাম করুন—পরে দুর্গে যাইবেন। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি।'

'তুমি এখনই যাইবে? আমি তোমাকে কত কথা জিজ্ঞাসিব মনে করিতেছি। যাহার নিকট জীবন এত উপকারে বদ্ধ, তাহার সহিত নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় এত অল্প সাক্ষাতে মন তৃপ্ত হয় না।'

যখন অমরসিংহ কথা কহিতেছিলেন, সুন্দরী তখন অতৃপ্তনয়নে তাঁহাকেই দেখিতেছিলেন। কথা সাঙ্গ করিয়া অমরসিংহ তাঁহার বদনের প্রতি চাহিলেন; উভয়ের দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। তখন সুন্দরী ব্রীড়াসহকারে মস্তক বিনত করিলেন। অমরসিংহ আবার বলিলেন,—

'তোমার সহিত হয় ত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে না।'

সুন্দরী বর্ষাগ্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে কহিলেন,—

'এ অধীনার প্রতি কুমারের অসামান্য অনুগ্রহ। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু—হয় ত'—যাহা বলিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া আবার বলিলেন,—

'রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল; আমি এক্ষণে বিদায় হই।'

যুবরাজ কহিলেন,—

'কে জানে আবার তোমার সহিত কবে সাক্ষাৎ হইবে?'

সুন্দরী বলিলেন,—

'সাক্ষাৎ সততই প্রার্থনীয়; কিন্তু যুবরাজ আমি কুলকামিনী—'

রাজপুত্র বলিলেন,—

'পথ শত্রুসমাচ্ছন্ন। অতএব চল আমি তোমার সঙ্গে যাই।'

'আমি বিপরীত দিকে যাইব।'

'দুর্গে না গিয়া আমি তোমার সঙ্গে বিপরীত দিকেই যাইতেছি।'

কিশোরী অবনত মস্তকে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

'আপনার আশীর্ব্বাদে, কুমারী ঊর্ম্মীলা কখন ভয়ে ভীতা হয় নাই।'

ধীরে ধীরে কুমারী ঊর্ম্মীলা অমরসিংহের নিকট হইতে চলিতে লাগিলেন। অবিলম্বে কিশোরী নেত্রপথের অতীতা হইলেন। অমরসিংহ বহুক্ষণ মুগ্ধের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে দীর্ঘনিশ্বাসসহ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—

'কুমারী ঊর্ম্মীলা—কুমারী ঊর্ম্মীলা কখনই মানবী নহে!'

অমরসিংহ অশ্ব আনয়ন করিয়া আরোহণ করিলেন। সেই গভীর রজনীতে, সেই জনশূন্য অরণ্যপথে বীরবর অমরসিংহ একাকী চলিলেন। বাহ্যপ্রকৃতি তখন তাঁহার অন্তরে আর স্থান পাইতেছে না। সংসার, যুদ্ধ, যবন, ধর্ম্ম, স্বদেশ সে সকল তখন তিনি ভুলিয়াছেন। একই বিষয় চিন্তনে তখন তাঁহার অন্তর বিনিবিষ্ট। কুমারী উর্ম্মীলা সেই চিন্তার বিষয়। সেই দিন হইতে অমরসিংহের হৃদয়ে কি এক অননুভূতপূর্ব্ব বিদ্যুদ্বেগ সঞ্চালিত হইল; সেই দিন হইতে অমরসিংহ নিজ চিত্তের উপর প্রভুতা হারাইলেন।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য বর্ত্ম।

প্লিনি ও অপরাপর বৈদেশিক গ্রন্থকারেরা ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যের বিষয় অনেক বিবরণ প্রকটন করিয়াছেন, তত্তাবতের আলোচনা বর্ত্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্য নহে। কোন্ কোন্ প্রধান বর্ত্ম দ্বারা পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত ভারতের বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পাঠককে উপহার প্রদান করাই আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য।

দ্বিবিধ বর্ত্ম দ্বারা ভারতীয় বাণিজ্য সম্পাদিত হইত। তন্মধ্যে অগ্রে স্থল-পথের বর্ণনা করা যাইতেছে। স্থল-পথে বাণিজ্য স্বার্থবাহী-বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইত। এই বণিকেরা ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থিত শৈলময় সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বেক্‌ট্রিয়া অভিমুখে গমন করিত। যাইবার সময় বাল্ক নগরে ইহাদিগকে কিছুদিন অবস্থিতি করিতে হইত। সুতরাং বাল্ক নগর কালে এক প্রধান বাণিজ্য স্থল হইয়া উঠে। বেক্ট্রিয়া হইতে গমন করিতে করিতে বেবিলনের মধ্য দিয়া যাইতে হইত, সুতরাং বেবিলনও একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে। এই বর্ত্ম অনুসরণ করিয়া বণিকেরা প্রায় কাস্পিয়ন হ্রদের সন্নিকর্ষে গমন করিত; এই স্থান হইতে অর্ণব-যানে পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে একটি সুবিধাজনক স্থানে তৎসমুদয় পৌছাইত, এবং উক্ত স্থান হইতে স্থল-পথে বহন করিয়া কৃষ্ণসাগরে পুনর্ব্বার বাণিজ্য পোতে উহা বোঝাই করিত। এতদ্দ্বারা উক্ত সাগরের উপকূলস্থ বন্দর সমূহ এবং ভূমধ্য সাগরের তীরস্থিত-নগর সকল ভারতের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে বিবিধ পণ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইত। বক্ষ্যমাণ বাণিজ্য-বর্ত্ম বেবিলন হইতে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া সৈকত-মরুভূমিস্থ পেলমিরা নগরে প্রবেশ করে, তথা হইতে বিস্তৃত হইয়া ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বাংশ লিবেণ্ট সাগরে যাইয়া পর্য্যবসিত হয়। পেলমিরা পূর্ব্বে একটি নগণ্য স্থান ছিল, তথায় প্রকৃতিজাত কোন দ্রব্যই দৃষ্টিগোচর হইত না। কিন্তু প্রাগ্বর্ণিত বর্ত্ম দ্বারা নানা পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি হওয়াতে উহা কালে একটি অতি

প্রসিদ্ধ নগর, হইয়া উঠে, এবং প্রবল পরাক্রান্ত একটি রাজ্যের রাজধানী রূপে উহা পরিণত হয়। রণ-রঙ্গিনী বোয়াডেসিয়া এই রাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন, এবং তাঁহার বীর্য্যপ্রভাবে এই নগর ইতিহাসপাঠকদিগের অন্তঃকরণে অদ্যাপি অঙ্কিত হইয়া আছে। পেলমিরা হইতে অনায়াসেই পণ্যবস্তু লিবেণ্ট উপকূলে নীত হইত, এবং লিবেণ্ট সাগরের তীরস্থ বন্দর সকলে ভারতবর্ষের এলা লবঙ্গ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সমুদায় ইয়োরোপ ও আফ্রিকাজাত পণ্যের সহিত বিনিময় হইত। এই প্রধান স্থল-পথ হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়া দূরবর্ত্তী স্থান নিচয়ে ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্য সকল নীত হইত। সুতরাং এসিয়া, ইয়োরোপ, ও আফ্রিকা এই খণ্ডত্রয় এই স্থলপথ কর্ত্তৃক উপকৃত হইত।

উপরিউক্ত স্থল-পথ উপকারী হইলেও তত সুবিধাজনক ছিল না। প্রথমতঃ উষ্ট্র ব্যতীত পণ্যবহনের উপায়ান্তর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ পণ্যবহনে প্রভূত অর্থব্যয়, অসাধারণ কষ্ট, এবং যথেষ্ট কালক্ষয় হইত। এই এই কারণ বশতঃ দিগ্দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার হইবার বহু পূর্ব্বে ভারত-মহাসাগরে প্রবাহিত মৌসমি বায়ুর প্রকৃতি অবগত হইবামাত্র নাবিকেরা অর্ণবপথে পোতযোগে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসমি বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলেই বণিকগণ বিদেশে যাত্রা করিত, এবং হেমন্তের শেষ ভাগে পূর্ব্বোত্তর মৌসমি বায়ু বহিলেই স্বদেশাভিমুখে প্রতিগমন করিত। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সাধারণ পাঠক বর্গের অবগতির জন্য মৌসমি বায়ু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন হইবে না।

দেশ বিশেষে বৎসরের মধ্যে চারি পাঁচ মাস স্থির ভাবে অনবরত একদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়; অপর চারি পাঁচ মাস বিপরীত দিক হইতে আবার ঐরূপ স্থির বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর নামই মৌসমি বায়ু। বঙ্গদেশে বর্ষা আরম্ভের পূর্ব্বেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু বহিতে আরম্ভ করে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে মধ্য ভারতবর্ষ, উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ এবং পঞ্চনদ প্রদেশে যখন গ্রীষ্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হয়, তখন বিষুব রেখার অপর পার্শ্ব হইতে ভারতের উত্তরাভিমুখে প্রবলবাত্যা বহিতে থাকে, তৎসঙ্গে সমুদ্রজাত বারিসিক্ত বাষ্পকণাসমূহও নীত হয়। ইহাকেই আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম-মৌসমি বায়ু নামে অভিহিত করিয়াছি। পক্ষান্তরে পৌষ মাঘ মাসে যখন এদেশে সূর্য্যের উত্তাপ মন্দীভূত হয়, এবং পৃথিবী শীতল হয়, তখন অষ্ট্রেলিয়া ও বিষুব-রেখার দক্ষিণস্থ স্থান সকল ভয়ানক উষ্ণ হইতে থাকে, এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর দিক হইতে শীতল বাতাস বহিয়া উক্ত উষ্ণ স্থানসমূহে গমন করে, ইহাকেই আমরা পূর্ব্বোত্তর-মৌসমি আখ্যা প্রদান করিয়াছি। সংপ্রতি আমরা প্রস্তাবিত বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মৌসমি-বায়ুর প্রকৃতি পরিজ্ঞান নিবন্ধন, নৌ-বাণিজ্য ও পোত-চালনের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার

বহুপূর্ব্বেই ফিনিসীয় সাংযাত্রিগণ নৌ-পথে ভারতবর্ষের সহিত পরোক্ষভাবে বাণিজ্য করিতেছিল। টায়র নগরের ব্যবসায়ীগণ এই বণিগ্‌বৃত্তি প্রভাবে কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে। তাহারা একদা এমন প্রবল হইয়াছিল যে সেকন্দরসাহ বল, কৌশল ও প্রভূত আয়াসের পর তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ফিনিসীয় বণিকেরা প্রথমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিত না। মিসরীয় লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে পণ্য সংগ্রহ করিয়া ফিনিসীয়দিগের সহিত বিনিময় করিত। কিন্তু কস্মিনকালে উভয় জাতির মনান্তর উপস্থিত হইলে ফিনিসীয়েরা ভারত-বাণিজ্যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা মিসরীয়দের প্রতি কেবল নির্ভর না করিয়া লোহিত সাগরের প্রবেশমুখে আরবদেশের উপকূলস্থ কতিপয় বন্দর হস্তগত করে। ভারতবর্ষ হইতে পোতযোগে পণ্য দ্রব্য এই সমস্ত বন্দরে আনয়ন করিত, পরে স্থলপথে তৎসমুদয় টায়রনগরে প্রেরণ করিত। এইরূপে বাণিজ্যকার্য্য করা অতি কষ্টকর হইয়া উঠিল। কিন্তু উদ্যম ও অধ্যবসায়ের নিকট কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাই তিষ্ঠিতে পারে না। প্রাগুক্ত অসুবিধা নিরাকরণ জন্য উদ্যমশীল ফিনিসীয় বণিক সম্প্রদায় ভূমধ্যসাগরের তটবর্ত্তী হ্রণকলার নামা বন্দর অধিকার করে। এই বন্দর হইতে অনায়াসেই লোহিত সাগরের অপর পার্শ্বে বাণিজ্য পোত যাইতে পারিত। ইহাতে একটি অসুবিধা উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে জলযানযোগে পণ্য দ্রব্য লোহিত সাগরে আনিত হইবার পর উহা তটে নামাইতে হইত; স্বার্থবাহী বণিগ্‌বৃন্দ উক্ত পণ্য বহন করিয়া সুয়েজ যোজকের অপর পার্শ্বে উপস্থিত করিত, তথা হইতে পুনরায় উহা পোতে বোঝাই করিয়া ভূমধ্য সাগর বাহিয়া টায়র নগরে নীত হইত। দুইবার পণ্য বোঝাই করা ও দুইবার নামাইতে যথেষ্ট কষ্ট হইত বটে, কিন্তু স্থলপথে বাণিজ্যের দূরতা ও বহুব্যয়সাধ্যতার সহিত তুলনা করিলে এতদ্দ্বারা অনেক সুবিধাই হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই শেষোক্তপথে অপর্য্যাপ্তরূপে ও সুলভমূল্যে ভারতীয় পণ্য আমদানি হওয়াতে ফিনিসীয় বণিকেরা বিপুল অর্থশালী হয়, এবং ভারতীয় বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করে।

সেকন্দরসাহ কর্ত্তৃক টায়র নগর ধ্বংশ হইলেও ভারতবাণিজ্যের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। সেকন্দর স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার মানসে নীলনদীর মুখে আলেকজেন্দ্রিয়া নগর স্থাপন করেন। টায়র নগরের পরিবর্ত্তে এই নগর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। স্থাপয়িতা স্বীয় নগরের শোভা সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধিশালিতা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ এই নগর স্থাপনের অব্যবহিত কাল পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। যাহউক, মৃত্যুর পূর্ব্বে এই নগর স্থাপনের উদ্দেশ্যগুলি এরূপ বিশদরূপে তদীয় কর্ম্মসচিব তোলেমি লেগসকে বলিয়া যান যে, তিনি মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে স্বীয়

রাজধানী স্থাপন করেন। এবং নগরের প্রবেশস্থানে অর্ণবকূলে পোতচালনের সুবিধার জন্য এরূপ একটি আলোক-গৃহ স্থাপন করেন যে, তাহার শোভা ও শিল্পনৈপুণ্য বশতঃ পৃথিবীর অদ্ভুত সপ্তকীর্ত্তির * অন্যতম কীর্ত্তিরূপে উহা গণ্য হয়। তোলেমি লেগসের পুত্র তোলেমি ফিলাদেলফস্ পৈতৃক দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া ভারতীয় বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে তৎপর হন। তিনি প্রথমে সুয়েজ যোজক কর্ত্তন পূর্ব্বক একটি খাল খনন করিতে বারবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তখন বিজ্ঞানের তাদৃক উন্নতি হয় নাই বলিয়া তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। পরিশেষে অপরবিধ সুবিধার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া লোহিত সাগরের পশ্চিম কূলে বেরিনিস্ নামে একটি নগর সংস্থাপন করেন। বেরিনিস্ হইতে হইতে কপ্টস্ নগর পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করান, এই বর্ত্ম দ্বারা স্থলপথে পণ্যদ্রব্য প্রবাহিত হইত। ইহাতে যে সকল অসুবিধা ছিল, তাহা পরিহার করিবার জন্য তোলেমি ফিলাদেল্ফস্ বিস্তর যত্ন ও অর্থব্যয় করেন। কপ্টস্ হইতে নীল নদ পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র খাল খনিত হয়, ঐ খাল ও নদী দ্বারা পোতযোগে আলেক্জেন্দ্রিয়াতে অল্প সময়ে পণ্য দ্রব্য নীত হইত।

ইয়োরোপ ও আফ্রিকাজাত বিবিধ বাণিজ্যবস্তু লইয়া বেরিনিস্ নগর হইতে পোত গমন করিত, এবং আরব ও পারস্য উপকূলের নিকট দিয়া গমনপূর্ব্বক পোত একেবারে সিন্ধুনদমুখে উপস্থিত হইত। তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে বাণিজ্যতরী গমন করিত কি না তাহার কোন বিবরণ আমরা অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু দক্ষিণ দিকে যখন অনেক বহুমূল্য বাণিজ্যবস্তু জন্মাইত, এবং সিন্ধুনদের মুখ হইতে সেদিকে অর্ণবপোত পরিচালনের যখন কোন অন্তরায় দেখা যায় না, তখন ভারতের সমগ্র উপকূলবর্ত্তী নগরেই যে বৈদেশিক বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই লাভজনক বাণিজ্য করিবার জন্য মিসরীয় ভূপতিগণ সর্ব্বদা বাণিজ্যতরীসমূহ সুসজ্জিত রাখিতেন; এবং এই বাণিজ্যবর্ত্ম সুগম করিতে তাঁহারা বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেলুকস নিকেতর একটি খাল খনন দ্বারা কাস্পীয়ন ও কৃষ্ণসাগর সংযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০ অব্দে রোমকর্ত্তৃক মিসর জয় হইলে পর, রোমবাসীরা ভারতীয় বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি করিয়াছিলেন। ইতঃপ্রে বৈদেশিক বাণিজ্যতরী কূলের নিকট বাহিয়া লোহিত সাগর হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইত, ইহাতে অনর্থক অনেক

* এই সপ্তকীর্ত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে, আমরা তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ মতের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাদের নাম করিতেছি যথা—বেবিলনের প্রাসাদ, রোডস্ দ্বীপের প্রকাণ্ড মুরদ, চৈনিক মহাপ্রাচীর, আলেকজেন্দ্রিয়ার আলোকগৃহ, মিসরে পিরামিড্, বেবিলনের দোলায়মান উদ্যান এবং আগ্রার তাজমহল।

সময় নষ্ট হইয়া যাইত। পূর্ব্বে যে মৌসমি-বায়ুর বিষয় বিবৃত হইয়াছে, নিবিষ্টচিত্তে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হিপাল্‌স নামে একজন নাবিক প্রথমে অনুমান করেন যে, সমুদ্রের মধ্যভাগ দিয়া মৌসমিবায়ুর সাহায্যে গমন করিলে অতি অল্পসময়ে লোহিত সাগর হইতে ভারতের উপকূলে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এবং তিনিই প্রথমে ঐ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হন। কিন্তু এই বিষয়টি এত সহজে অনুমেয় যে, হিপালাসের পূর্ব্বে কেহ ইহার আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বলিয়া সহজে বিশ্বাস করা যায় নাই। প্লিনিকৃত ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যবর্ত্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটন করিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। কিন্তু উক্ত গ্রন্থকার স্বরচিত প্রাকৃতিক ইতিহাসে লিখিয়াছেন ভারতবর্ষে যে সকল বৈদেশিক পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হইত, তাহা নীলনদে বাণিজ্যপোতে বোঝাই হইয়া কপ্টস্ নগরে নীত হইত। আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে এই নগরের দূরত্ব ১৫১ ক্রোশ, এবং তথায় পৌছিতে দ্বাদস দিবস লাগিত। কপ্টস্ হইতে স্থলপথে নীত হইয়া দ্বাদস দিবসে বেরিনিস নগরে পণ্য পৌছিত। এই দুই নগরের ব্যবধান ১২৯ ক্রোশ ছিল। বেরিনিস হইতে জাহাজে পণ্য বোঝাই হইয়া ৩০ দিনে লোহিতসাগর অতিক্রম করিত, এবং ৪০ দিনে ভারতমহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের উপকূলে পৌছিত। সর্ব্বসমেত তিন মাস অথবা চতুর্ণবতি দিবসে এই নৌযাত্রা সম্পাদিত হইত। লোহিতসাগরে যে সময় ব্যয়িত হইত, তাহা আপাততঃ শুনিতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দুইটি কারণে অসম্ভব না হইলেও পারে। প্রথমতঃ, প্রতিকূল বায়ু ও প্রতিকূলতরঙ্গের জন্য উক্ত সাগর চিরপ্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, পণ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থ বোধ হয় স্থানে স্থানে পোত সংলগ্ন করিতে হইত। পৌষ মাঘ মাসে এই সকল বণিকেরা স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিত।

শ্রীজ—

চিত্তমুকুর। *

কাব্য মাত্রই চিত্তমুকুর। কারণ, মনুষ্যচিত্তে যাহা কিছু সুন্দর, মনুষ্যচিত্তে যাহা কিছু কুৎসিত, মনুষ্যের আনন্দ, অন্তর্বেদনা এবং ভক্তি, প্রীতি, ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি ভাবের আলেখ্য প্রদর্শন কাব্যের এক প্রধান উদ্দেশ্য। যে সকল বর্ণনায় উল্লিখিত প্রকারের আলেখ্য সকল প্রদর্শিত হয় না, তাহা অন্যাংশে যার পর নাই প্রশংসনীয় বস্তু হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাব্য নহে।

এই স্থলে এই এক প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, কাব্যের এইরূপ লক্ষণ নাটকাদি কাব্যেই প্রযুজ্য হইতে পারে;—গীতিকাব্যে অথবা গীতিকাব্যের অনুরূপ বর্ণন-কাব্যে ইহা প্রযুজ্য হইবে কেন? অভিজ্ঞানশকুন্তল পুরু-

* চিত্তমুকুর, পদ্যগ্রন্থ। কলিকাতা রায়যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ষের পিপাসাকুল প্রেম, অবলার আধ মুকুলিত অমল অনুরাগ, মুগ্ধস্বভাবা তাপসতনয়ার কারুকার্য্যশূন্য সরলচিত্তের সরলবিশ্বাস, ততোধিক মুগ্ধ নির্ব্বিকার তপস্বীর নির্ব্বিকার স্নেহবাৎসল্য, ইত্যাদি মনোহর চিত্রে অলঙ্কৃত থাকিতে পারে;—কিন্তু ঋতুসংহারে মানবচিত্তের কোন্ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে? মেঘগর্জ্জনে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে;—সেই নয়নবিনোদন নৃত্যের কথায় মনুষ্যের কথা কোথায় থাকে? হিমাচলের বর্ণনায় মনুষ্যচিত্তের সম্পর্ক কি? জ্যোৎস্নাধৌত যামিনীর বর্ণ-চিত্রে মনুষ্যচিত্তের কোন্ আলেখ্য নেত্রগোচর হয়?—এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর সম্ভবে। কিন্তু আমরা তাহা না করিয়া প্রত্যুত্তরে আর একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করিব।

ইহা সত্য বটে যে নাটকাদি কাব্যে মানব-চিত্তের উচ্ছ্বাস, আবর্ত্ত, আলোড়ন ও অনন্ত পরিবর্ত্ত, মনুষ্যস্বভাবের অনন্ত স্ফূর্ত্তি, অনন্ত বৈচিত্র যেরূপ প্রদর্শিত হয়, বর্ণনকাব্যে তাহা কখনও হইতে পারে না। কিন্তু বর্ণনকাব্য কি? উহা কি বিজ্ঞান, না দর্শন,—না কোন একটি দৃশ্য দর্শনে কি ঘটনা চিন্তনে মনুষ্যবিশেষের চিত্তবৃত্তিতে যে অপূর্ব্ব একটি ভাবের আবির্ভাব অথবা অননুভূতপূর্ব্ব একটি রসের আকস্মিক সঞ্চার হয়, তাহারই একখানি শব্দময় আলেখ্য? তুমিও যে ফুলটি দেখিয়া প্রীত হইতেছ, আমিও সেই ফুলটি দেখিয়া প্রীত হইতেছি। কিন্তু উহা তোমার চিত্তে এক ভাব জন্মাইতেছে, আমার চিত্তে ঠিক তাহার বিপরীত আর একটি ভাবের উদ্দীপন করিতেছে। সকলেই ত মেঘাবৃত জ্যোৎস্না, অথবা জ্যোৎস্নাবৃত অটবীর অপরূপ কান্তি দর্শন করে। কিন্তু সেই শোভা ও সেই কান্তি সকলের চিত্তে ঠিক একই ভাব উৎপাদন করে না। ইংলণ্ডের কবি বাত্যাবিতাড়িত বৃষ্টিধারা, এবং তুষারসম্পাত ও তুষারসমাচ্ছাদিত শস্যক্ষেত্রাদি দর্শনে কোন্ ভাবে কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও দেখ; এবং সেই বৃষ্টি, সেই ঝটিকা ও সেইরূপ তুষার-রাশি দর্শনে ভারতীয় কবি কোন্ রসে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তাহাও চিন্তা কর *। ভারবি ও কালিদাস উভয়েই হিমাচলের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কুমারসম্ভবে আমরা হিমাচলের যে সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হই, কিরাতার্জ্জুনীয়ে সেই সৌন্দর্য্য, সেই মোহনচ্ছবি দেখিতে পাই না; এবং কিরাতার্জ্জুনীয় হিমাচলের মহিমাময়ী মূর্ত্তি আমাদিগের চিত্তে যে ভাব ও যে রসের পরিস্ফুরণ করে, কালিদাসের হিমাদ্রি তাহা করে না †। ইহার কারণ কি?—না, এই আলেখ্যনিচয়ের একটিতে একজনের চিত্ত, আর একটিতে আর একজনের চিত্ত। উভয়ের চিত্তগত গঠন ও গতিতে যে প্রভেদ, উল্লিখিত বর্ণনাচয়েও সেই প্রভেদ। সুতরাং বনের ফুল, বৃষ্টিধারা অথবা হিমাদ্রি-

* টমসনের শীতবর্ণনার সহিত ঋতুসংহারের শীতবর্ণনা মিলাইয়া পড়িলেই একবার অর্থগ্রহ হইবে।

† পাঠকবর্গ আমাদিগের অনুরোধে,—

"তপনমণ্ডলদীপিতমেকতঃ"

ইত্যাদিক কবিতা নীচয়ের সহিত কুমারের হিমাদ্রিবর্ণনার তুলনা করিবেন।

বর্ণনায় তাপসতনয়ার চিত্তের আলেখ্য প্রদর্শিত না হউক, উহা যে কবিচিত্তের তদানীন্তন ভাবের অকৃত্রিম আলেখ্য, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। এক ওথেলোতে মানবচিত্তের যত প্রকার মূর্ত্তি, যত প্রকার পরিবর্ত্তের ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে, বায়রণের সমগ্র জীবনের সমগ্র কবিতাতেও তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু কি বোনাপার্টির বিনিপাতসাক্ষী ওয়াটলুর রণক্ষেত্র, কি গ্রীসের পুরাতন পর্ব্বতমালা, বায়রণের যে কোন বিষয়ের যে কোন বর্ণনা পাঠ কর, তাহাতেই তাঁহার তৎকালীন চিত্তের চিত্র দেখিবে; এবং তাহাতে অনন্ত চিত্তের অনন্ত বৈচিত্র দেখিতে না পাও, অন্ততঃ একটি চিত্তের প্রকৃত প্রতিকৃতি দর্শনে অবশ্যই অন্তরে স্পৃষ্ট হইবে। এই হেতুই আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, কাব্য মাত্রই চিত্ত-মুকুর;—এবং বোধ হয় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্ণনকাব্যও এক অর্থে চিত্তমুকুর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

কিন্তু ইহাও আমরা বলিয়াছি যে, বর্ণনকাব্য চিত্তমুকুর বলিয়া আখ্যাত হইবার যোগ্য হইলেও বর্ণনা মাত্রই চিত্তমুকুর নহে। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য একটি উদ্ভট শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

"গোরপত্যং বলীবর্দ্দো ঘাসমত্তি মুখেন সঃ।
লাঙ্গুলং বিদ্যতে চাস্য শৃঙ্গঞ্চাপিচ বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ এই যে বলীবর্দ্দ দণ্ডায়মান, ইনি গোরুর অপত্য; ইনি মুখে ঘাস খাইতেছেন; ইহাঁর লাঙ্গুল আছে, ইহাঁর শৃঙ্গও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই শ্লোকনিবদ্ধ শব্দমালাকে অবশ্যই বর্ণনা বলিতে পারি। কেন না, গোরুর অপত্য বলীবর্দ্দ ইহাতে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে লাঙ্গুলের কথা আছে, শৃঙ্গের কথা আছে এবং তিনি যে মুখের দ্বারা ঘাস খাইতেছেন, তাহারও বর্ণনা আছে। তথাপি ইহা বর্ণনকাব্য নহে। কিন্তু কুমারের সপ্তমসর্গে মহাদেবের বৃষভের যে বর্ণনা আছে, তাহাকে বর্ণনকাব্য বলি *। পূর্ব্বোদ্ধৃত বলীবর্দ্দ-বর্ণনা যাঁহার লেখনীপ্রসূত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, শেষোক্ত বৃষভবর্ণনাও তাঁহারই লেখনী হইতে নিঃসৃত। তথাপি, প্রথমোক্ত শব্দ কয়টি শুধু শব্দ বলিয়াই গৃহীত হয়, এবং কুমারের বৃষভবর্ণনাকে লোকে কাব্য বলিয়া আদর করে।

আমাদিগের আজিকার সমালোচ্য 'চিত্তমুকুর' কাব্য বলীবর্দ্দবর্ণনার মত বর্ণনামাত্রে পূরিত নহে। কাব্যগণনায় যে স্থানেই উহার স্থান হউক, উহা সর্ব্বথা বর্ণনকাব্য বলিয়া আদৃত হইবার উপযুক্ত। ইহাতে কবিচিত্তের কএকটি ভাব উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে;—কবি স্বজাতির দুঃখে কিরূপ দুঃখী, স্বদেশের অধঃপাত দর্শনে কিরূপ ব্যথিত, সদ্‌গুণান্বিত সুপুরুষের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধান্বিত এবং কুৎসিতস্বভাব কাপুরুষের প্রতি কিরূপ ঘৃণাযুক্ত, তাহা ইহাতে কবিতার অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। অতএব ইহা কাব্য মধ্যে গণিত হইবে। ইহাতে ভাবের সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য ও পরি-

* "খে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ
ইত্যাদি

স্ফুটতা” বিষয়ে যে কোন অভাব, অপূর্ণতা ও অপক্কতা পরিলক্ষিত হউক, যে ইহা পড়িবে, ইহার বর্ণনানিচয়কে সেই সদর্থ কবিতা বলিয়া সম্মান করিবে। আমরা প্রথমতঃ ইহা হইতে একটি শোকাবহ বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। যদিও ভারত-কথা এবং ভারত-গীতি, দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ, কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য অর্ব্বাচীনের করকণ্ডূয়ন ও কৌতুকস্পৃহার ক্রীড়াসামগ্রী হইয়া, অনেকের নিকটই পুরাণ কথা ও পুরাণ গীতের মত অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা তথাপি সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিবে;—এবং যিনি ভারতমাতাকে অন্তরের অন্তরে আপনার জননী বলিয়া জানেন, বোধ হয় ইহার কোন কোন স্থান তাঁহার হৃদয়ে দগ্ধশলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইবে।

গাঢ় অমাবস্যা-নিশি ঘোর অন্ধকার,
আচ্ছন্ন কালিমা মেঘে শূন্য চারিধার,
বদন বিস্তার ক'রে, গ্রাসিবারে বসুধারে,
মন্দ পদক্ষেপে যেন আসে দণ্ডধর।
ত্রাসে যেন সঙ্কুচিত বিশ্ব-চরাচর।

২

এহেন নিশীথে বসি প্রকোষ্ঠে আপন,
সর্ব্ব-সংহারিণী মূর্ত্তি করি দরশন,
চপলা বিকট হাসে, ভুবন চমকে ত্রাসে,
গম্ভীরে জলদ করে ভীম গরজন।
স্তব্ধ বিশ্ব সেই রবে স্তম্ভিত পবন।

৩

হেরি দুনয়নে সুধু অনন্ত আঁধার,
গাঢ়তর কালিমায় ঢাকা চারিধার,
সহসা জলদরাশি, ভেদিয়া সম্মুখে আসি,
দাঁড়াইল নারী এক অপূর্ব্ব রূপসী।
ফুলের কবরী শিরে, দেহে ফুলরাশি।

৪

প্রফুল্ল কমল দুটি মৃণাল সহিত,
চারু করতলে তার হয়েছে শোভিত,
গলে পুষ্পকণ্ঠমালা, বক্ষঃস্থলে পুষ্প ঢালা,
জীবন্ত যৌবন যেন কুসুমের বেশে।
দাঁড়াইল কাছে মোর, মুখে মৃদু হেসে।

৫

সরমে শিহরি শেষে চিনিনু তাহার,
বিজন-সঙ্গিনী সম প্রিয় কল্পনায়,
বদন গম্ভীর করে, কহিল বিষাদ-স্বরে,
আইনু দেখিয়া এক দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
দেখিতে বাসনা যদি হও অগ্রসর।

৬

চলিনু কল্পনা-সাথে ঘোর ত্রিযামায়,
দেখিতে ভীষণ দৃশ্য, বিরাজে কোথায়,
নদ নদী গিরি বন, করি কত উল্লঙ্ঘন,
উপনীত দুইজনে বিস্তীর্ণ শ্মশানে—
তরু-শূন্য—প্রাণিশূন্য- গৃহ-শূন্য স্থানে।

৭

শ্মশানের বক্ষঃস্থলে নেত্রপাত করি
নিরখি ভীষণ দৃশ্য উঠিনু শিহরি,
উন্মাদিনী চিতাহাসে, দাঁড়ায়ে তাহার পাশে
সুন্দর আয়ত-তনু যুবা একজন,
রুক্ষ-কেশ—রক্ত-নেত্র—ভীমদরশন।

৮

একপদ পুরোভাগে, অপর পশ্চাতে
অনতি বৃহৎ এক দণ্ড ধরি হাতে,
জ্বলন্ত চিতার ক্রোড়ে, প্রবীণা রমণী পোড়ে,
নিবিড় চিকুর-জাল, বিস্তীর্ণ শিয়রে,
দুইখানি ক্ষীণ বাহু পড়ি দুই ধারে।

বদন অঙ্গারে ঢাকা চেনা নাহি যায়,
ক্ষীণ অঙ্গে অগ্নি-শিখা খেলিয়া বেড়ায়,
দেহ ভস্ম নাহি হয়, পরিধানও দগ্ধ নয়,
সহসা দেখিলে হেন জ্ঞান হয় মনে,—
জীবিতা প্রাচীনা সুপ্ত অনল-বিতানে।

১০

সভয়ে যুবার পার্শ্বে করিয়া গমন,
জিজ্ঞাসিনু কার চিতা,—সে বা কোনজন;
তুলিয়া জ্বলন্ত আঁখি, আমার বদনে রাখি,
তীব্রভাবে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল,
ভয়ঙ্কর দৃষ্টি তার—হৃদয় কাঁপিল।

১১

রাখি ভূমে কাষ্ঠদণ্ড জলদ গম্ভীরে,
কহিল ভীষণস্বরে মোর পানে ফিরে,
'বুঝি বঙ্গবাসী হবে, নহিলে কেনবা কবে,
কার চিতা, দেখ নর জননী তোমার'
হস্ত সরাইয়া দিল জ্বলন্ত অঙ্গার।

১২

'সাত শতবর্ষ আজ দিবারাত্র ধ'রে
এই শ্মশানের বক্ষে এই চিতা পোড়ে,
শব দগ্ধ নাহি হয়, দেহও এমতি রয়,
ঢালিয়াছি কুম্ভ পূরে সিন্ধুসম জল,
নিবে না এ চিতানল জ্বলিছে কেবল।'

১৩

শিহরিনু নিরখিয়া রমণীর মুখ
যাতনায় ক্লিষ্ট যেন মূর্ত্তিমতী দুখ
নয়নের ঊর্দ্ধকোণে, নেত্র-তারা রহে টলে
জীবন চঞ্চলা মরি নিষ্প্রভ নয়নে,
অস্ত যায় আঁধারিয়া রমণী বদনে।

১৪

লহরে লহরে শিখা শবের উপরে
বিকট ভৈরব রঙ্গে হেসে নৃত্য করে,
কভু শিরে কভু পায়, বহ্নি-শিখা ছুটে ধায়,
আবার দাঁড়ায়ে বক্ষে ভীমরঙ্গে হাসে,
নিরখি সে চিতানল কাঁপিলাম ত্রাসে।

তুষার-তর্জ্জনী মম বক্ষের উপরে
রাখিয়া কহিল যুবা সুগম্ভীর স্বরে,
'চিনিলে কি চিতা কার,—চিতা ভারতমাতার
এই ধর জননীর রাজ নিদর্শন,'
মুকুট রতনদণ্ড করিল অর্পণ।

এই কবিতাটির আরম্ভস্থলে কবিচিত্ত-বিনোদিনী কল্পনাদেবীর যে রূপ-বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সুরুচির পরিচায়ক হয় নাই। চিতাশয্যা রূপবর্ণনার স্থল নহে। কোথায়,—

'বদন অঙ্গারে ঢাকা চেনা নাহি যায়,'
'জীবিতা প্রাচীনা সুপ্ত অনলবিতানে।'

আর কোথায়,—

'দাঁড়াইল নারী এক অপূর্ব্ব রূপসী
ফুলের কবরী শিরে, দেহে ফুলরাশি।'

সকলেই জানে যে, কবিসম্প্রদায় চির-কালই কল্পনাকে বড় সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু জননী জন্মভূমির অর্দ্ধদগ্ধ, অর্দ্ধজীবিত, অস্থিমাত্রাবশিষ্ট জীর্ণ-দেহ এবং তাঁহারই দগ্ধশ্মশান দেখিতে যা-ইবার সময়ে, 'বক্ষঃস্থলে পুষ্পঢালা' 'বি-জন-সঙ্গিনী' কল্পনাবালার সহিত 'সরমে শিহরিয়া' 'মুখে মৃদু হাসি' হাসিয়া সরস প্রেমালাপে কি কখনও কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে? এবং কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি এইরূপ লাজে মাথা ললিত আলাপে সম্মত কি তৃপ্ত হইবে? এই কবিতাটিতে এই অংশটুকু

বস্তুতঃই দূষণীয় হইয়াছে। এটুকু পরিত্যাগ করিলে ইহার আর সকল স্থলই প্রশংসার্হ। কবি লিখিয়াছেন,—'শিহরিনু নিরখিয়া রমণীর মুখ;' তাঁহার ঐ স্থান পড়িবার সময়ে ভারতবাসী ব্যক্তিমাত্রই শোকাভিভূত হৃদয়ে,হৃদয়ের অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিবে,—

'শিহরিনু নিরখিয়া জননীর মুখ।'

চিত্তমুকুরে ঠিক এইরূপ হৃদয়স্পর্শিনী বর্ণনা আর একটি না থাকিলেও, ইহার অন্যান্য কবিতা সকলও সুন্দর ও মধুর। আমরা দুই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক কবিতা হইতে দুচারি পংক্তি করিয়া যথেচ্ছ উদ্ধৃত করিব। পাঠক, তাহা পড়িলেই কবির বর্ণনানৈপুণ্যের পরিচয় পাইবেন।

"কে গাহিল—কি মধুর—ওই যে আবার—
ছুটিল সঙ্গীত-স্রোত ভাসায়ে গগন!
একি!—এ যে ভেসে যায় হৃদয় আমার
নিশীথে কে করে হেন সুধা বরিষণ!
আবার—আবার—গায়,
পুন চিত্ত ভেসে যায়,
নারী-কণ্ঠ!—বটে তাই,
ছুটিয়া গবাক্ষে যাই
দেখিলাম—কি দেখিনু—কি বলিব হায়!
স্থির সৌদামিনী-লতা পড়িয়া ধরায়।" *

"সুন্দর হইয়ে কেন হইল চপল।
বিদ্যুত মেঘের কোলে, আভাময়ী তনু ঢেলে
রহিতে পারিত যদি হয়ে অচঞ্চল;
সলিলের ধারা সনে ঝরিয়া পড়িত আলো
কি সুন্দর বেশে তায় সাজিত ভূতলে!"

* * *

"নিবিড় তরুর তলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে
পড়িয়া শীতল ছায়া শান্তি-স্বরূপিনী,
বৃন্তে বৃন্তে ফুলগুলি, আনন্দে পড়েছে ঢলি,
অদূরে উঠিছে ধীরে মানবের ধ্বনি,
বোধ হ'ল যেন আজ নবীন ধরণী।"

* * *

"দেখিনু শিশির বিন্দু গোলাপের দলে
কিরণে উজ্জ্বল হয়ে ঢল ঢল করে,
গোলাপ পড়িল হেলে, শিশির পড়িল ঝুলে,
দেখিতে দেখিতে বিন্দু খসিয়া পড়িল,
সূক্ষ্ম বৃন্তে চারুপুষ্প নাচিয়া উঠিল।"

এসকল বর্ণনা কষ্টকৃত কিংবা আয়াস-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। কল্পনার সহিত মল্লযুদ্ধ না করিলে যাঁহার কবিত্বশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, এবং ভাষার বক্ষঃস্থলে নিদারুণ আঘাত না করিলে যাঁহার শব্দ বাহির হয় না, তিনি শিশির বিন্দুর ন্যায় নির্ম্মল,শিশির-স্নাত কমল-দলের ন্যায় সুকোমল ভাবনিচয়কে শব্দে আঁকিয়া তুলিতে কখনও সমর্থ হইবেন না। কিন্তু চিত্তমুকুর-রচয়িতা বহিঃ-প্রকৃতির এসকল সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য বর্ণনায় যে প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, মানবজাতির অন্তঃপ্রকৃতির আভোগ ও আবেগ বর্ণনায় তাদৃশ ফললাভ করিতে পারেন নাই। শিশির-বিন্দু সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল হইয়া কিরূপ

* এই পংক্তি কয়টির সহিত নবীনচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পংক্তি নিচয়ের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

"দেখিলাম,—দেখিব কি আর? দেখিলাম

* * *

"সজলদ সৌদামিনী আসিছে যেমন,

* * *

"দেখিলাম বিদ্যুদ্দাম গলায় আমার।"

ঢল ঢল করে, গোলাপ সমীরণের মৃদু হিল্লোলে কিরূপ হেলিয়া পড়ে, বৃন্তে বৃন্তে ফুল এবং তরুতলে শ্যাম দূর্ব্বা ইত্যাদি দৃশ্য বর্ণনে তাঁহার একপ্রকার সুন্দর ও প্রশংসনীয় ক্ষমতা আছে। কিন্তু ব্যথিত অভিমান ব্যথিত ভুজঙ্গের ন্যায় কিরূপ অস্ফুট গর্জ্জন করে, মহত্ব মনোহারিতায় মিশ্রিত হইলে কিরূপ সুন্দর দেখায়, মনুষ্যের নীচতা নীচদিকে কত দূর যায়, এবং অবলার প্রেম সেই নীচতার সম্মুখীন হইলে লজ্জায় কিরূপ মলিন হয়, তাহা তিনি সুকবির ন্যায় বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তিনি যেখানে যেখানে মানবচরিত্রের দুই একটি গূঢ়চিত্র আঁকিতে গিয়াছেন, সেখানেই কিঞ্চিৎ অপক্কতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'কলঙ্কী জয়চন্দ্র'ই একথার প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

ভারত-কলঙ্ক জয়চন্দ্র ভারত-হৃদয়কে যবন ছুরিকায় বিদারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আপনা আপনি কহিতেছেন,—

"পাষাণের বক্ষ আর ক্ষত্রিয় হৃদয়,
এক উপাদানে দুই হয়েছে গঠিত।
পাষাণে অস্ত্রের লেখা অনন্ত অক্ষয়,
অপমান ক্ষত্রবক্ষে আজন্ম অঙ্কিত।
সমগ্র ভারত যদি হয় একত্তর,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম করিব সাধন।
শুকাবে সাগর কিংবা লুটাবে ভূধর,
প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল মম হবে না কখন।
ক্ষত্রিয়ের পণ আর লিপি বিধাতার,
ভবিতব্য দুই,—দুই সম-দুর্নিবার।"

যে বীর বল-দর্পে দৃপ্ত এবং ক্ষত্রগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আপনার প্রতিজ্ঞার উপর এইরূপ অভ্রভঙ্গ ও অটলভাবে দণ্ডায়মান হয়, তাহাকে বীর-কুলের ললাট-মণি এবং ভীষ্মের বংশধর বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু জয়চন্দ্র কিরূপ বীর ইতিহাসে তাহার পরিচয় আছে, এবং তাঁহার আর একটি স্বগত উক্তি ও প্রণয়িনীর মিষ্ট ভৎর্সনায় চিত্তমুকুরেও তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। যে জয়চন্দ্র ঐ ভয়াবহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনিই আবার প্রতিজ্ঞার পর আর এক স্থানে বলিতেছেন,—

"তবে কেন ত্রাসে চিত্ত আনন্দবিহীন ?
* * *
কি করিব কোথা যাব, কে আছে আমার
কে দিবে বলিয়া মোরে নিগূঢ় উপায়,
রমণীর বীর্য্যহীন হৃদয় যাহার,
হা বিধাতঃ! প্রতিহিংসা কেন এত তায়!

এইরূপ আবার তাঁহার প্রণয়াস্পদ রাজমহিষী বলিতেছেন,—

"ভাগ্য-দোষে বীরপত্নী নহে অভাগিনী
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কুলে জনম আমার,
বীর কন্যা আমি নাথ, বীর-প্রসবিনী
রক্ষিব যেমনে পারি গর্ব্ব আপনার।"

আমাদিগের বোধ হয় গ্রন্থকার জয়চন্দ্রের মুখে যে প্রতিজ্ঞাটি আবৃত্তি করাইয়াছেন, তাহা তাঁহার ভার্য্যার মুখে ব্যক্ত করাইলেই স্বভাবের অবয়বগত সামঞ্জস্য অধিকতর রক্ষা পাইত। কেহ বাক্যে বলিতেছেন যে,—'হে চন্দ্র সূর্য্য, ও পৃথ্বীবাসী মনুষ্য, তোমরা দেখ আমি কেমন বীর, আমি পর্ব্বতের আঘাতে পর্ব্বত চূর্ণ করিব, —সমুদ্র শুষিয়া ফেলিব এবং প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইব, তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা টলিবে না,'—অথচ সেই

সময়ে ভয়চকিতা হরিণীর মত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া থর থর কাঁপিয়া উঠিতেছেন এবং ভাবিতেছেন, 'হায় কি বলিলাম,'—এইরূপ দৃশ্য অস্বাভাবিক।

জয়চন্দ্র অপেক্ষা জয়চন্দ্রের প্রণয়িনী শৈলবালা অনেক অংশে শ্রদ্ধাস্পদা এবং সুচিত্রিতা। আমাদিগের কবি তাঁহাকে ব্রুটসের পোর্শিয়া বানাইতে বিশেষ যত্ন পাইয়াছেন,—পোর্শিয়া ব্রুটসকে রাজনীতির গুপ্তমন্ত্রণায় অন্ধকারে বিচরণ করিতে দেখিয়া প্রণয়ের অভিমানে যেরূপ শাসন করিয়াছিলেন, শৈলবালাও জয়চন্দ্রকে সেইরূপ ভৎ‍র্সনা করিতেছেন, এবং ব্রুটস তাহাতে প্রত্যুত্তরে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, জয়চন্দ্রও শিক্ষিত শুকপক্ষীর ন্যায় সেই সকল অভ্যস্ত কথা বলিতেছেন। শেক্ষপীরের এই চিত্রানুকরণে ও ভাবানুবাদে চিত্তমুকুর-প্রণেতা কৃতার্থ কি ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন তাহা সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের তুলনা করিয়া দেখা আবশ্যক। দুরাচার জয়চন্দ্র গভীর নিশিতে, নির্জ্জন উদ্যানে, একা ভ্রমণ করিতেছেন—এমন সময়ে

অদূরে তরুর পার্শ্বে দাঁড়া'য়ে গোপনে
স্থির সৌদামিনীরূপা একটি রমণী,
বদন গম্ভীর, দৃষ্টি প্রখর নয়নে,
নীরবে শুনিতেছিল রাজার কাহিনী।
যন্ত্রণায় জয়চন্দ্র মুদিলে নয়ন,
অগ্রসরি দাঁড়াইল সম্মুখে তাহার;
স্থিরদৃষ্টে নিরখিয়া ডাকিল তখন
প্রাণেশ্বর!—
শিহরিয়া জয়চন্দ্র খুলিল নয়ন
হেরিল সম্মুখে তার রমণী রতন

"শৈল তুমি কেন এই অনাবৃত স্থানে?
গভীর নিশায়—এই নিশীথ শিশির
জান না কি অপকারী, * দেখ দেহপানে
এখনও আরোগ্য নহে তোমার শরীর,
চল গৃহে" বলি হস্ত করিল ধারণ;
বিস্ফারি নয়ন, শৈল কহিল গম্ভীরে,
"আমা হ'তে মূল্যবান্ তোমার জীবন,
তোমার উচিত নহে ভ্রমিতে শিশিরে;
আমার—হায় রে যার সমুদ্রে শিবির
কি করিবে নাথ তার নিশির শিশির।

"যে অনল বক্ষঃস্থলে—থাক্ সে সকল,
বল প্রাণেশ্বর তব কি ভাবনা মনে?
গত দিন কত ধরি নিরখি কেবল
নিমগ্ন সতত তুমি গভীর চিন্তনে।
কারণ জিজ্ঞাসি যদি বিস্ফারি নয়ন †
আমার বদনে চাহ, পুনঃ জিজ্ঞাসিতে
ফিরায়ে নয়ন ভূমে প্রহারি চরণ
'কিছু না' বলিয়া উঠ দাঁড়াও ত্বরিতে
তথাপি জিজ্ঞাসি যদি, সঞ্চালিয়া কর
বিরক্তে ইঙ্গিত কর হইতে অন্তর।

"ভাবিতাম পূর্ব্বে ইহা চিত্তের বিকার,
দিন দুই পরে চিত্ত হইবে সুস্থির;
দিনে দিনে বৃদ্ধি এবে হইছে ইহার,
বল নাথ কেন এত হইলে অধীর?"
"বলিয়াছি একবার বলি আর বার

* "Portia what mean you?" &c

† "And, when I asked you what the matter was,
You stared upon me" &c &c

শরীর অসুস্থ মম বড়ই এখন *
এই প্রশ্ন শৈল মোরে করিও না আর
যাও তুমি নিজ গৃহে করগে শয়ন।"
বেষ্টিয়া হৃদয়ে বাহু—কুঞ্চিত নয়নে
ভ্রমিতে লাগিল জয় সুমন্দ চলনে।

"অসুস্থ!—ইহা কি তবে ব্যবস্থা তাহার †
অনাবৃত স্থানে এই নিশীথ ভ্রমণ ?
প্রগল্‌ভতা প্রাণেশ্বর ক্ষম অবলার
অবশ্য ইহার আছে অপর কারণ।
অন্তরের পীড়া ইহা মর্ম্মের যাতনা—"
জানু পাঁতি পতিপদ করিয়া বেষ্টন,
"সত্য করি বল নাথ ত্যজি প্রতারণা
কোন পাপ-ভাবনায় মগ্ন তব মন ?
পত্নী যদি না বুঝিল পতির বেদন
সুধু কি তাহার কার্য্য শোভিতে শয়ন ?"

"উঠ শৈল, কেন পড় চরণে আমার
জিজ্ঞাসিছ কিন্তু কিবা বলিব তোমায়,
রাজ-কার্য্যে চিত্ত মগ্ন সতত রাজার
কেনা জানে-কেন পুনঃ জিজ্ঞাস আমায়?"

ইহার আদর্শচিত্র শেক্ষপীরে জুলিয়স সিজর নামক জগদ্বিখ্যাত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে, ব্রুটস ও পোর্শিয়ার কথোপকথনে দৃষ্ট হইবে। যাহার প্রবৃত্তি হয় তিনি শেক্ষপীরের সেই অংশ পংক্তি পংক্তি করিয়া পুনরায় পড়িয়া লইতে পারেন।

অনুকৃতি কি অনুবাদ দোষের নহে। যিনি শেক্ষপীরের অনুকরণ কিংবা অনুবাদ করিতে যত্নপর হন, তাঁহার সৎসাহসকে বরং ধন্যবাদ দেওয়াই কর্ত্তব্য। তবে কথা এই, সেই অনুকরণ অথবা অনুবাদ কোন্ স্থলে সম্ভব এবং কোন্ স্থলে অসম্ভব, কোন্ স্থলে সঙ্গত এবং কোন্ স্থলে অসঙ্গত তাহা অগ্রেই বিশেষরূপে বিবেচনা করা উচিত। ক্ষত্রসিমন্তিনী শৈলবালা কবির অনুরোধে পোর্শিয়ার ভুবনমোহন পরিচ্ছদের দুই এক খানি ছিন্ন চীর অঙ্গে জড়াইয়া পোর্শিয়ার দুই একটা কথা কহিতে, কিংবা দুই একটি ভাবের অভিনয় করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু যিনি পোর্শিয়া সাজিবেন, তাঁহার ব্রুটস কোথায় ? বঙ্গদেশের অনেক কুল-ললনাকে সীতা সাজাইয়া সমাজের বহিরাঙ্গণে আনা যাইতে পারে। কিন্তু সীতা পাইলে হইবে কি ? সীতানাথ হইবার উপযুক্ত রামচন্দ্র কৈ ? যেমন রামের বামে না হইলে সীতামূর্ত্তি ফলায় না, তেমনই ব্রুটসের পার্শ্বে না দাঁড়াইলে কাহাকেও পোর্শিয়ার মত দেখায় না। আমাদিগের ব্রুটস কি ঐ জয়চন্দ্র ?—ঐ দুর্ব্বৃত্ত কুলাঙ্গার ? ঐ নরাধম কাপুরুষ? যে ব্রুটস স্বজাতির স্বাধীনতার জন্য দিগন্তব্যাপ্ত রোমসাম্রাজ্যকে বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন, এইক্ষণ কি জাতীয় স্বাধীনতার চিরস্মরণীয় শত্রু জয়চন্দ্রের মুখে তাঁহার কথা শুনিতে হইবে ?—যে ব্রুটসকে পৃথিবীর সমস্ত জাতি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা ও পবিত্রমূর্ত্তি দেবতা বলিয়া পূজা করে, একটা পিশাচের দ্বারা তাঁহার অভিনয় করাইলে, সেই অভিনয়ে কি কাহারও তৃপ্তি জন্মিবে ?

* " I am not well in health, and that is all. "

† "Is Brutus sick? and is it physical
To walk unbraced ," &c

যাহা হউক এসকল দোষ লইয়া আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। থাকে এ সকল দোষ থাক্। এই সকল দোষ সত্ত্বেও চিত্তমুকুর একখানি উপাদেয় কাব্য। ইহা কাব্যশোভাকর বহুগুণে অলঙ্কৃত বলিয়াই আমরা যত্নসহকারে ইহার কএকটি দোষ দেখাইলাম। যদি ইহাতে গুণ-বাহুল্য না থাকিত, তাহা হইলে এ পরিশ্রমে আমাদের কখনও প্রবৃত্তি হইত না। গ্রন্থকার নবীন-বয়স্ক। এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। আমরা তাঁহার প্রথম উদ্যমের ফল দেখিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে বলিতে পারি যে, তিনি যদি ব্রতধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে কালে যশস্বী হইতে পারেন। বঙ্গদেশের অনেক লেখক ছাই ভস্ম লিখিয়াও যশস্বী হইতেছেন। আমরা এইক্ষণ সেই ঘৃণার্হ যশের কথা কহিতেছি না। যে যশ পুণ্যের মত পূজনীয় পদার্থ, সরস্বতীর প্রকৃত সাধক সেই যশের ভিখারী। চিত্তমুকুর-রচয়িতা যেরূপ সহৃদয় ও স্বাদগ্রাহী ব্যক্তি, তাহাতে এইরূপ ভরসা করা যায় যে, তিনি সাময়িক যশ ও অপযশে দৃক্‌পাতও না করিয়া সেই অনাবিল যশের উপাসনায় চিত্তসমর্পণ করিবেন। এই বঙ্গবিপণিতে যখন ইচ্ছা তখনই বাজারের যশ ক্রয় করা যাইতে পারে; কিন্তু যাঁহার অন্তরে অভিমানের স্ফুলিঙ্গ মাত্রও প্রজ্বলিত থাকে, তাঁহার তাদৃশ যশে পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত নহে।

চাটুকার

ভ্রমর যদি মধুরভাষী বলিয়া এত আদর পাইতে পারে, কোকিল, দয়েল, শ্যামা, বুলবুল, ইহারাও যদি শুধু মধুরভাষিতার জন্য রসিক ও প্রেমিক, ভাবুক ও বিলাসীর বিনোদ-কুঞ্জে কিংবা আদরের পিঞ্জরে স্থান পাইতে অধিকারী হয়, তবে মধুরভাষীর অগ্রগণ্য চাটুকারের প্রতি লোকের এত অশ্রদ্ধা ও এত অবজ্ঞার কারণ কি?

চাটুকারবর্গ নীতিকারবর্গের নিকট এইরূপ তর্ক করিতে পারে;—'দেখ, আমরা অপরাধী কিসে? তোমাদিগের ভ্রমর যেমন সতত গুণ-গুণ ধ্বনি করিয়া মধুপূর্ণ কুসুমের নিকট উড়িয়া বেড়াইতেছে, আমরাও সেইরূপ, যেখানে মধুর আশা, সেখানে মনের সুখে, সুমধুর নিঃস্বনে গুণ-গুণ ধ্বনি করিয়া ও গুণের কথা কহিয়া ভ্রমরের মত উড়িয়া বেড়াইতেছি। ভ্রমরকে তুমি পুনঃ পুনঃ তাড়াইয়া দেও, কুসুমে যদি মধু থাকে, ভ্রমর পুনরায় আসিয়া উড়িয়া বসিবে। আমাদিগকেও তুমি পুনঃপুনঃ তাড়াইয়া দেও, অথবা পদাঘাতে দূর কর; আমরা যে মধুর জন্য লালায়িত, তোমাতে সেই মধুর কণামাত্রও যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে, লাঞ্ছিত হই, বিড়ম্বিত হই, আমরা ততক্ষণ তোমার নিকট পড়িয়া থাকিব। ভ্রমরও আর কোন গুণের সংবাদ লয় না,

ঐ এক মধুগুণেই চির-মুগ্ধ ;—আমরাও আর কোন গুণের সংবাদ লই না,—আর কোন গুণ আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করি না, ঐ এক মধুগুণেই তোমার নিকট চির-বদ্ধ। মধু ফুরাইলে ভ্রমরের আর দেখা নাই ; মধু ফুরাইলে আমাদিগকেও দেখিবার আর প্রত্যাশা নাই। ভ্রমর তখন নূতন ফুলে, আমরাও তখন কোন এক নূতন স্থলে। ইহাতে আমাদিগের অপরাধ কি ?

'দেখ, বসন্তের কোকিল, কুসুম-বিলসিত বৃক্ষবাটিকায় উপবিষ্ট হইয়া, উহার ঐ কল-কূজনে যুবজনের হৃদয়কে কিরূপ উদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। কে উহার নিন্দা করে ? যাহার হৃদয় পূর্ব্বে পর্ব্বতের ন্যায় ধীর ও নিস্পন্দ ছিল, উহার ঐ উন্মাদিনী কণ্ঠসুধা তাহাকে পতঙ্গের ন্যায় অধীর করিতেছে ;—যে ছলনা কাহাকে বলে তাহা স্বপ্নেও জানিত না, উহা তাহাকে ছলনা শিখাইতেছে ;—লাজুকের লজ্জা ভাঙ্গিতেছে ; মনে যে ভাব কোন সময়েও প্রবেশ-পথ পায় নাই, উহা সেই ভাবকে মনের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছে ;—যেখানে শান্তির সুখ-নিদ্রা, সেখানে অশান্তির উদ্বেগ আনিয়া শয্যাকণ্টক ঘটাইতেছে ;—তৃপ্তিতে অতৃপ্তি সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে আকুলিত রাখিতেছে। কোকিল এত দোষে দোষী, তথাপি কে উহাকে নির্ভর্ৎসন করে ? তুমি প্রতিজ্ঞার উপর অটল হইয়া মনে মনে সংকল্প করিতেছ যে, প্রবৃত্তির আবিল পঙ্কে প্রাণান্ত হইলেও আর কখনও নিমজ্জিত হইবে না ;—কোকিল সেই সময়ে পঞ্চমে উঠিয়া, কু উ কু বলিয়া, তোমায় উপদেশ দিতেছে যে, এমন কুৎসিত সংকল্পকে ক্ষণকালের তরেও মনে পুষিও না। তুমি হৃদয়ের অন্তর্জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া,—হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ তুষানলে অন্তর্দগ্ধ হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিতেছ যে, এ জীবনে আর কখনও কোন কারণে, নীতিবিগর্হিত কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্মে পাদচারণা করিবে না ;—কোকিল পুনরপি সেই সময়ে, উহার সেই চিরপরিচিত মোহন কণ্ঠে কু উ কু বলিয়া তোমায় উপদেশ দিতেছে যে, এমন কুবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া সকল সুখে বঞ্চিত হইও না,—বিবেকের এই নীরস-কঠোর নির্ম্মম নীতিকে মুহূর্ত্তের তরেও চিত্তে স্থান দিও না। যে মত্ততার অনুকূলে নিত্য তোমায় এইরূপ মন্ত্রণা দেয়, তাহাকে তুমি ভালবাস, অথচ আমাদিগকে ঘৃণা করিতে চাহ। ইহা কি অসঙ্গত নহে ? অনিন্দিত কোকিলে এবং নিন্দিত চাটুকারে প্রভেদ কি ? কোকিলও যেমন পরপুষ্ট, আমরাও তেমনই পরপুষ্ট ; উভয়েই উচ্ছিষ্টজীবী, আশ্রয়ত্যাগী, মিষ্টকথার বণিক্, আমোদতন্ত্রের অধ্যাপক এবং প্রমাদ ও মতিভ্রমের অগ্রনায়ক। আমরা চাটুভাষীরা কোকিল হইতে কোন্ দোষে তোমার নিকট অধিকতর দোষী হইব ? কোকিল বসন্তের সখা, আমরাও বিলাসের সখা। যখন বসন্তের পর ঝটিকা বহে, কোকিল তখন চলিয়া যায় ;—যখন বিলাসের পর বিপত্তির ঝঞ্ঝাবায়ু বহিতে আরম্ভ করে, আমরাও তখন চলিয়া যাই। তবে আমাদিগের মধ্যে এই ন্যায়বিরুদ্ধ তারতম্য কেন ?

'আরও দেখ;—এই সংসারের পণ্য-বীথিকায় কত কোটি লোক কাঞ্চন-মূল্যে কাচ বিক্রয় করিয়া কৃতার্থ হইতেছে! কে তাহাদিগের সহিত বিবাদ করে? কোথাও প্রেমের বিনিময়ে সুখ, কোথাও সৌহার্দ্দের বিনিময়ে সখ্;—কোথাও জ্ঞানের বিনিময়ে গর্ব্ব, কোথাও মানের বিনিময়ে মর্কটলীলা। যখন এইরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে, বঞ্চনাই বাণিজ্যশাস্ত্রের মূলসূত্র, তখন আমরা সেই সূত্র অবলম্বনে নিজ নিজ সৌভাগ্যসঞ্চয়নে কি জন্য বঞ্চিত থাকিব? বাণিজ্য যাহাদিগের উপজীব্য, বাজারের গতিই তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি। তাহারা লোকের রুচি বুঝিয়া রোচক যোগায়, প্রবৃত্তি বুঝিয়া প্রলোভন সংগ্রহে যত্নশীল হয়। আমরাও যখন চাটুভাষার বিপণি খুলিয়া এই নীতিতেই ব্যবসায় চালাইতেছি, তখন কি হেতু আমরা নীতিকারের নিকট বিশেষ রূপে নিন্দনীয় হইব?'

চাটুকারেরা ঠিক্ এই সকল কথা না বলুক, তাহারা স্ব স্ব চিত্তকে প্রায় এইরূপ কথা বলিয়াই প্রবোধ দিয়া থাকে; আর মনে করে যে, যে স্বভাবতঃ বিকল-চিত্ত, তাহাকে বংশীধ্বনি শুনাইয়া কিংবা কন্দুক-কৌতুক দেখাইয়া বশীভূত রাখিলে,—যে যেরূপ মদিরার জন্য লালায়িত, ভাল হউক আর বিকৃত হউক, তাহাকে সেইরূপ মদিরা দিয়া তৃপ্ত করিতে পারিলে, অথবা মনুষ্যের মনোমোহনের জন্য ঐরূপ আর কোন মোহিনী প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইলে, তাহা কি জন্য দোষ বলিয়া গণ্য হইবে এবং মনুষ্যজাতিই বা তাহাতে অকারণে কেন বিরক্তি দেখাইবে। কিন্তু সূক্ষ্মার্থদর্শিনী নির্ম্মলা বুদ্ধি এ সকল মধুর কথায় ভুলিয়া যান না। যাঁহারা মনুষ্যত্বের অস্বাভাবিক বিকৃতি ও অধোগতি দর্শনে হৃদয়ে গভীর দুঃখ অনুভব করেন, তাঁহারা সেই বিকৃতি ও সেই অধোগতির প্রবর্ত্তক ও প্ররোচক বলিয়া ঘৃণিত চাটুকারদিগকে কখনই অন্তরের সহিত ঘৃণা না করিয়া পারেন না।

ভ্রমরের গুণ-গুঞ্জন এবং কোকিলের কুহুকূজন যাহার হৃদয়ে যে ভাবে কেন অনুভূত না হউক, ভ্রমর ও কোকিল যদি অপরাধী হয়, তাহা হইলে নিবিড়-কৃষ্ণ জলদমালা, 'সজলদ সৌদামিনী,' শারদীয় গগনের পূর্ণচন্দ্র, চন্দ্রালোক-প্রফুল্লা প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণী, এ সকলও মনুষ্যের নিকট নিতান্ত অপরাধী। কারণ, সৃষ্টির এ সকল মনোহর দৃশ্যে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই উদ্বেল হয়। কিন্তু উদ্বেল হইলেই যে উহা আবিল হইবে, এমন কথা কে বলিয়াছে? ভক্তিতেও মনুষ্যের মন উদ্বেল হয়। কিন্তু ভক্তির মত নিরাবিল ভাব আর কি হইতে পারে? চাটুকার মনুষ্যের চিত্তকে উদ্বেল না করিয়া আবিল করে। এই জন্যই চাটুকার মানবীয় উন্নতির এক ভয়ানক কণ্টক। যাঁহারা একথার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝেন না, বুঝাইলেও হয় ত তাঁহারা তাহা বুঝিবেন না। তথাপি বুঝাইবার জন্য একবার যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের অধ্যাত্ম উন্নতি ও চারিত্রবিকাশের প্রথম সোপান কি?—না, আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান বিনা কোন জ্ঞানেরই কিছুমাত্র মূল্য নাই। যে আপনাকে বুঝিতে

না পারে, আপনাকে চিনিতে না পারে,—আপনার অভাব, অপূর্ণতা, দোষ ও গুণ ভাল করিয়া জানিতে না পারে, তাহার ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছুমাত্র ভরসা নাই। সে আপনার হইয়াও আপনার নহে। কেন না, প্রবৃত্তির প্রবল স্রোত তাহাকে যেদিকে লইয়া যায়, সে সেই দিকেই ভাসিয়া যায়; —স্রোতের জলে তৃণ, তরঙ্গের গতিতেই তাহার গতি। ইয়ুরোপীয় তত্ত্ববিদ্যার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সক্রেতিস এই নিমিত্তই বলিয়া গিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল। 'মনুষ্য! আপনাকে আগে জান, তাহা হইলেই সৃষ্টির সকল তত্ত্ব জানিতে পারিবে।' এই নিমিত্তই কবি উপদেশ করিয়াছেন যে, যদি আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হও, তাহা হইলে অযুতকোটি দীপালোকেও জগতের গূঢ়তত্ত্ব দেখিতে পাইবে না। চাটুকার এই আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান পরিপন্থী। মনুষ্যের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপই তাহার এক মাত্র ব্রত, এবং মনুষ্য আপনাকে যেন বুঝিতে না পারে, আপনাকে যেন জানিতে না পারে,—যে আপনি যাহা নহে,সে আপনাকে তাহা জানিয়া যেন মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ইহাই তাহার একমাত্র অভিলষিত। যে একবারে নিরক্ষর মূর্খ, সে তাহাকে মহিমান্বিত পুরুষ বলিয়া সম্মান করে; যে রূপে অলম্বুষের অবতার, সে তাহাকে কন্দর্পের কাণ্ডবিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করে; এবং দুষ্কৃতির দুর্গন্ধ ভিন্ন আর কিছুতেই যাহার মতি যায় না ও তৃষ্ণা পূরে না, সে তাহাকে 'সৌখীন' বলিয়া বর্ণনা করে। তাহার অভিধান ভাষার প্রচলিত অভিধান হইতে সর্ব্বাংশে পৃথক্। উহাতে আলোকের নাম অন্ধকার, অন্ধকারের নাম আলোক; ধর্ম্মের নাম অধর্ম্ম, অধর্ম্মের নাম ধর্ম্ম; বিষের নাম অমৃত, অমৃতের নাম বিষ। সত্যের এইরূপ অবমাননা মনুষ্যের অসহনীয়, মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর।

যেমন তরুলতার পরিবর্দ্ধনের জন্য সূর্য্যের আলোক, তেমনই মনুষ্যহৃদয়ের পরিস্ফূর্ত্তি এবং মনুষ্যশক্তির পরিবর্দ্ধনের জন্য সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ। তরুলতা যেমন সূর্য্যের উত্তাপময় আলোকে বঞ্চিত হইলে, শুষ্ক, শীর্ণ ও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়; মনুষ্য-হৃদয় এবং মানুষী শক্তিও সত্যের সন্তাপনী দীপ্তিতে বঞ্চিত হইলে, ঠিক সেইরূপ রুগ্ন, জীর্ণ ও বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে অবস্তু মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহা প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম। কিছুতেই ইহার অন্যথা নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সত্যের দ্যুতি, আপাতত যারপর নাই দুর্ব্বিষহ হইলেও পরিণামে মনুষ্যের প্রাণপ্রদ বলিয়া স্পৃহনীয়; এবং যাহারা চাটুকারের জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সেই সত্যকে ঢাকিয়া রাখে, অথবা মনুষ্যকে আত্মজ্ঞান সম্পর্কে সেই সত্যে বঞ্চনা করে, তাহারা আপাততঃ যারপর নাই প্রীতিকর হইলেও পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

'ত্যজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা' দুষ্টজন যদি নিতান্ত প্রীতিভাজনও হয়, তাহাকে সর্পক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। মনুষ্য সমস্ত শরীর যদি

বিষাক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে শেষে আর কোন ঔষধেই ধরিবে না।

চাটুকারের আর এক অপরাধ এই, সে মনুষ্যকে মহত্ত্বের উপাসনা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মোপাসনায় প্রবর্ত্তিত করে, এবং যে ঐরূপে তাহার ফাঁদে পড়িল, তাহাকে কৃত্রিম উপাসনার কৃত্রিম ধূপে উন্মাদিত রাখিয়া, কর-ধৃত পুতুলের মত নৃত্য করাইতে রহে। ইহাও সামান্য কথা নহে। মনুষ্য যদি বড় হইতে চাহে, তাহা হইলে আপনা হইতে উচ্চতর আদর্শের উপাসনাই তাহার একমাত্র উপায়। যাঁহারা চাটুকারে পরিবৃত থাকেন, তাঁহারা উপাসনার সেই সম্পদে অনধিকারী। কারণ, তাঁহারা নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট উপাসনায় অঙ্গীভূত হইয়া, আপনার ক্ষুদ্রতাকেই মহত্ত্বের আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করেন, এবং এই অনন্ত জগতে আর যে কিছু উপাস্য আছে, সেই ধারণা তাঁহাদিগের সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে দূরীভূত করিয়া ফেলেন। রোমের কোন কোন সম্রাট্ ও ফ্রান্সের কোন কোন রাজা এইরূপ মোহে অভিভূত হইয়া সংসারে উপহসিত হইয়াছেন; এবং যাঁহারা সম্রাট্ নহেন, রাজা নহেন, অথবা রাজকীয় জগতের ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গ কিংবা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটানুকীট বলিয়াও গণ্য হইবার যোগ্য নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে উল্লিখিত মোহবিকারের আচ্ছন্নতায় বিবিধ হাস্যজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অহরহঃ হাস্যাস্পদ হইতেছেন। যে উপাসনা মনুষ্যকে উপরে উঠাইবার ভান করিয়া দুর্গতি ও অবনতির দিকে এইরূপে টানিয়া আনে,—স্বর্গের অপূর্ব্ব শোভা দেখাইবে বলিয়া অবশেষে শাখামৃগের লাঙ্গুলগুম্ফিত উচ্চ (!) আসনে আনিয়া উপবেশন করায়,—যে উপাসনা পুষ্পচন্দনের নির্ম্মল সৌরভে অরুচি জন্মাইয়া পিশাচ-ভোগ্য পুতিগন্ধি পঙ্কে চিত্তকে আসক্ত করিয়া তুলে,—স্রোতস্বিনীর সজীব প্রবাহে কিংবা সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ করিতে না দিয়া তিমিরাবৃত বদ্ধকূপের পঙ্কিল জলেই চিরদিন ডুবাইয়া রাখে, চাটুপটু চতুর লোকের তাদৃশ ন্যক্কারজনক উপাসনায় আত্মবিস্মৃত হওয়া অল্প দুঃখ, অল্প দুর্ভাগ্য অথবা অল্প ক্ষতি নহে।

চাটুকারের তৃতীয় অপরাধ এইরূপ বিড়ম্বনাকর না হইলেও অন্য এক ভাবে বিশেষ অপচয়কর। প্রিয়জনের প্রিয়সম্ভাষণ এবং প্রীতিমুগ্ধ সুহৃজ্জনের প্রণয়-পূর্ণ কথোপকথন কাহার না প্রার্থনীয়? প্রশংসার পার্থিব সুখ বিবেক-লভ্য চিত্তপ্রসাদরূপ দুর্লভ সুখের নিকট যত কেন নিম্নস্থানীয় হউক না, যে প্রশংসায় কাপট্যের কারুকার্য্য নাই, তাহা কাহার না বাঞ্ছনীয়? লোকের মুখে ভালবাসার ভালকথা শুনিলে কাহার আত্মা না উল্লসিত হয়? শক্তিমান্ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট সদর্থ পরিশ্রমের দক্ষিণা স্বরূপ সাধুবাদ পাইলে কে না আপনাকে ধন্য মনে করে? কিন্তু যাঁহারা চাটুকারের ক্রীড়নক, মনুষ্যসেব্য এ সকল সুখ তাঁহাদিগের নিকট আকাশকুসুম। যেখানে ছলনাময়ী প্রীতি অনন্তকথার অনন্তছলনায় মনুষ্যের কর্ণে মধু ঢালিতে

থাকে, প্রকৃত প্রীতি লজ্জায় সেখানে মুখ দেখাইতে চাহে না, এবং বিপৎকালের আবরণভূতা ছায়ার ন্যায় নিত্য সন্নিহিত থাকিলেও, লজ্জায় সেখানে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে ভালবাসে না। আর, যেখানে অকার্য্যে প্রশংসা হয়, অপকার্য্যে ধন্যবাদ হয়, এবং বিনা কার্য্যেও যশের ঢক্কা নিনাদিত হয়, পুরুষকার-সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তিরা অবজ্ঞায় সেখানে পদক্ষেপ করেন না, এবং সেখানে কদাচিৎ কখনও প্রকৃত কার্য্য দর্শন করিলেও প্রশংসা বিতরণে সাহস পান না।

মানবপ্রকৃতির মর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মনস্বীব্যক্তিরা এই সকল কথা আলোচনা করিয়াই চাটুকারদিগকে ঘৃণা করিয়াছেন, এবং মনুষ্যের ভাষাও এই সকল কারণেই পৃথিবীর সকল দেশে, সকল কালে, চাটুকারদিগকে অতি নিকৃষ্টজীব বিবেচনায় ঘৃণার শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে। চাটুকারেরা চৌর নহে, চাটুকারেরা দস্যু নহে।' কিন্তু ইহাদিগের ভাষাগত উপাধি চৌর-দস্যুর নাম হইতেও অধিকতর ঘৃণাজনক। শৌণ্ডিকেরা পৃথিবীর যে অপকার না করে, স্তুতি ও প্ররোচনার জঘন্য সুরা উপঢৌকন দিয়া ইহারা সেই অপকার সাধন করে, এবং পাদলেহী কুক্কুর নীচতার যে মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয়, ইহারা তাহা অপেক্ষাও নীচতর নীচতা অকুণ্ঠিতমনে ও অম্লানবদনে প্রদর্শন করিয়া, মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের অতি গভীর ঘৃণা উৎপাদন করাইয়া দেয়। ইহারা বাত-কুক্কুট, যে দিকে বায়ু বহে, সেইদিকেই ইহাদিগের পুচ্ছপতাকা। ইহারা দৃষ্টিদাস, যে দিকে দৃষ্টি চালনা, সেই দিকেই ইহাদিগের উল্লম্ফন। অথবা ইহারা আপনারাই আপনাদিগের উপমা স্থল। ইহাদিগের সংকীর্ত্তিত ব্যবসায়ের উপর স্বর্ণবৃষ্টি হউক!
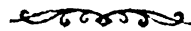
সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। 'পঞ্চানন্দ। রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন। ভবানীপুর সুধাকরযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।'—পঞ্চানন্দ আমাদিগের পুরাতন ও পরীক্ষিত সুহৃৎ। দুই তিন বৎসর হইল পঞ্চানন্দ বাঙ্গালা-সাহিত্য-গগণে প্রথম উদিত হইয়া, দেখা দিতে না দিতেই, ধূমকেতুর মত দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যান। এইবার তাঁহার দ্বিতীয় প্রকাশ। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চানন্দ দ্বিজ-পদবাচ্য।

এইক্ষণ পঞ্চানন্দের নামার্থ লইয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ বিচার করা যাউক। আমাদিগের ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকবর্গ অবশ্যই জানেন যে পঞ্চ্ (Punch) নামে বিলাতে একখানি বিদ্রূপপত্র আছে। বিলাতে সে খানির কিরূপ আদর ও আধিপত্য, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চানন্দ বাঙ্গালার পঞ্চ্ (Punch); অর্থাৎ পঞ্চ্ ইব আনন্দং বিদধাতীতি পঞ্চানন্দঃ। ইহার নামের আরও অনেক প্রকার অর্থ হইতে

পারে। যথা পাঁচজনের যাহাতে আনন্দ, তাহার নাম পঞ্চানন্দ ;—অথবা, পাঁচটি টাকা পাইলেই যাহার আনন্দ, তাহার নাম পঞ্চানন্দ। পঞ্চানন্দের অগ্রিম বার্ষিক দক্ষিণা পাঁচ টাকা। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, যিনি ইহার নামকরণ করিয়াছেন, অর্থবাদ অর্থাৎ বাদার্থশাস্ত্রেও তিনি অব্যুৎপন্ন নহেন। অতএব যে রূপেই অর্থ কর, পঞ্চানন্দ অন্বর্থনামা ; এবং কোন না কোন একটি ক্ষণে যখন ইহার জন্ম হইয়াছে, তখন অবশ্যই ক্ষণজন্মা। পঞ্চানন্দ আত্মপরিচয়ে এইরূপ বলিয়াছেন ;—

" পঞ্চানন্দ চায় কি ? চায়,—পাঁচজনকে দেখিতে শুনিতে, পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে ; চায় পাঁচ রকম বলিতে কহিতে, সুতরাং পাঁচটা কথা সহিতে ; চায় দশে পাঁচে দেখা করিতে, পাঁচটি করিয়া টাকা লইতে।"

আমরাও বলি, তথাস্তু। পঞ্চানন্দ আত্মপরিচয়ে পুনরপি প্রশ্ন করিয়া উত্তর করিতেছেন ;—

"পঞ্চানন্দ খায় কি ?—যৎসামান্য ! পাঁচ জনের মাথা, পাঁচটা গালাগালি ! তবে অমনি অমনি খায় না ; বদান্যতা আছে ; পাঁচজনকে না দিয়া খায় না।"

আমরা এবারও বলি, তথাস্তু। কিন্তু ভরসা করি, পঞ্চানন্দের নিকট এইরূপ উপরোধ করিলে কোন অপরাধ নাই যে, তিনি যেন বান্ধবের মাথা খাইতে অগ্রসর হইয়া অবান্ধবতার পরিচয় দেন না। খাও ত বখিলের মাথা খাও ; আত্মারাম সরকারের মাথা খাও ; অথবা যাহারা দেশের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া দেশীয় ভাষার আদর করে না, পত্রিকা লইয়া মূল্য দেয় না, পরনিন্দার মধু ভিন্ন আর কোন মধুর স্বাদ লয় না, এবং রণরঘুর চক্ষুঃশূলরূপিণী, মুদ্রাদেবীর মহিমাগুণে মনুষ্যকে আর মনুষ্য বলিয়া গণনায় আনে না, তাহাদের মাথা খাও। যদি তাহাতেও উদরপূর্ত্তি না হয়, তাহা হইলে যাঁহারা গৃহিণীর মনোরঞ্জনের জন্য বাঙ্গালা ভাষার মাথা খাইয়া আমাদিগকে জ্বালাতন করিতেছেন, সেই গজপতি বিদ্যা দিগ্‌গজদিগের মাথা খাও। কিন্তু হে দেব পঞ্চানন্দ! তুমি সুহৃৎ স্বজনের মাথা খাইতে মুখ ব্যাদান করিলে 'মহিম্নঃপারন্তে' বলিয়া তোমার স্তুতি পাঠ করিবে কে ?

যখন মহিমা কীর্ত্তনই এই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন পণ্ডিতবর পঞ্চানন্দ কবিতা রচনায় কিরূপ পারদর্শী, তাহাও প্রদর্শন করা আবশ্যক। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের যে সকল রসিক পাঠক ভৃঙ্গজাতীয় জীব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন, কবিতার মধুগন্ধ না পাইলে তাঁহারা পঞ্চানন্দের আদর করিবেন কেন ? পঞ্চানন্দ এই নিমিত্ত আত্মগুণ কীর্ত্তন করিয়া কবিতাচ্ছলে কহিতেছেন ;—

"পাইয়া প্রিয়ার কাছে দগ্ধানন নাম *
কীর্ত্তিকল্পতরু ফল—মর্ত্ত্যে অমরতা †
করি লাভ। সুপ্রসন্ন বিধি যার প্রতি,
ধরিলে ধূলির মুষ্টি, সুবর্ণে তখনি
পরিণত হয় তাহা।—সর্ব্বাংশে তখন

* অর্থাৎ পোড়া মুখ।

† ' মর্ত্ত্যে ইন্দ্রপদ ' এইরূপে লিখিলে কীর্ত্তি ও মর্ত্ত্যের সঙ্গে উৎকৃষ্টতর ওজন থাকিত (বান্ধব)

সার্থক হইলে নাম,—রামদাস কবি,—*
কবিকুল-ধাত্রি মাতঃ কহগো কি ভাবে,
ভাবিতেছিল এ দীন, এক দিন তব
অনিন্দ্য পদারবিন্দ। বোতল-স্যন্দিনী
আনন্দদায়িনী সুধা;—কল্পনার খনি—
কোন্ দৃশ্য দেখাইল,† কহ বীণাপাণি।"

যাঁহাদিগের বুদ্ধি আছে, তাঁহারা ইহাতেই বুঝিয়াছেন যে, পঞ্চানন্দ উপেক্ষিত হইবার ব্যক্তি নহেন। পঞ্চানন্দ লিপিক্ষম, চিন্তাক্ষম, এবং লোকচিত্তবিনোদনেও যাহা হাস্যজনক, তাঁহার সরলসমালোচনে বস্তুতঃই নিতান্ত সক্ষম। তাঁহার সকল লেখা ও সকল কথাতেই বাঁধাগদের অতিরিক্ত এবং আদরের উপযুক্ত বিশেষ কিছু সামগ্রী থাকে। সুতরাং সকলে তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া কৃতার্থ হউন, এই আমাদিগের অনুরোধ। বছরে পাঁচটি করিয়া টাকা দিলেই বারমাসে চব্বিশবার পঞ্চানন্দের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা এক বোতল শ্যাম্পেনের জন্য পাঁচ টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা পাঁচটি মাত্র টাকা ব্যয় করিয়া, বৎসর ভরিয়া, তৃষ্ণা পূরিয়া, পঞ্চানন্দী প্রমোদ-মদিরা পান করিতে কুণ্ঠিত হইলে, লোকে বলিবে যে, বাঙ্গালীর মত রস-পাষণ্ড জাতি জগতে আর নাই।

* ভারত উদ্ধার নামক মহাকাব্য (?) প্রণেতা।

† যে দৃশ্য দেখিয়া মাইকেল আধুনিক সভ্যতার আলেখ্য, কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের নক্সা এবং দীনবন্ধু নিমচাঁদের ছবি আঁকিয়াছিলেন। (বান্ধব)

২। 'প্রকৃতি'। বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী সমালোচনী পত্রিকা। শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।'—পত্রিকা আকারে নিতান্তই ক্ষুদ্র, অথচ ইহাতে বিজ্ঞান, কবিতা ও সমালোচনা এই তিনেরই সমাবেশ। গুণজ্ঞ সম্পাদক এই তিনের কোন একটি মাত্র বিষয় রাখিয়া, আর দুইটি পরিহার করিলে পত্রিকার উন্নতি হইতে পারে। ইহার তৃতীয় সংখ্যার একটি প্রবন্ধে উপন্যাসের প্রতি বড় বিরক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু দেখিলাম, ঐ সংখ্যার অধিকাংশ স্থানই কবিতাতে পূর্ণ, এবং সেই সকল কবিতারও অধিকাংশই কেবল প্রিয়তম আর প্রিয়তমার কথা।

৩। অপূর্ব্ব সংগীত। কলিকাতা সরস্বতীযন্ত্রে প্রকাশিত।—গ্রন্থকারের নাম 'সংসারবিরাগী শ্রীপাগল ভোলা' এবং এই জন্যই গ্রন্থের নাম অপূর্ব্ব সংগীত। এই গ্রন্থখানি পূর্ব্বে কোন দিনও ছিল না; সুতরাং ইহাকে অপূর্ব্ব বলা যাইতে পারে, আর গ্রন্থকার তাঁহার কথা ক'টি ছন্দোবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং ইহাকে সংগীত বলাও দোষের নহে। সংগীতের একটি লহরী এইরূপ;—

" লেখনী ধরিয়া মস্যাধার নিয়া
সুসাজে সাজিয়া বসেন যবে,
হুজুরের সনে নাচিয়া নাচিয়া
হাসিয়া চলিয়া যাইতে হবে।"

ইহার সকল লহরী এইরূপ হাস্যরসের উদ্দীপক নহে। দুই একটিতে বীররস, ব্যঙ্গরস ও কাব্যরসও আছে।

৪। গোচারণের মাঠ। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র

সরকার প্রণীত।—ইহা একখানি পদ্যময় গ্রন্থ। ইহা বালকদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ইহা পড়িয়া সুখী হইবেন। অক্ষয় বাবু একজন প্রসিদ্ধ গদ্যলেখক, গোচারণের মাঠ পদ্য গ্রন্থ হইলেও, ইহা তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ প্রতিষ্ঠার প্রতিরোধিনী হয় নাই। ইহাতে যেমনই ভাষার ক্ষমতা, তেমনই কল্পনার সুকুমার মাধুরী প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং গ্রন্থকার যে নূতনপথে চলিতে জানেন, —ইচ্ছা করিলেই নূতনপথে চলিতে পারেন, ইহার পদে পদে তাহার পরিচয় আছে। গ্রন্থের কলেবর ২৪ পৃষ্ঠা। এই চব্বিশ পৃষ্ঠার পদ্যগ্রন্থে একটিও যুক্তাক্ষর নাই; অথচ প্রীতিপ্রদ কবিত্ব আছে। এই প্রশংসা অনায়াস-লভ্যা নহে। আমরা এস্থলে ঊষার বর্ণনা হইতে কএকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। গ্রন্থখানি কিরূপ হইয়াছে, এই কয়টি পংক্তি পড়িলেই তাহা প্রতীত হইবে।

"লোহিত কপোলে ঊষা ঈষৎ হাসিল।
ঊষাপতি হাসে তাহে ঊষার আদরে,
উজলে অরুণ আঁখি নব রাগ ভরে,
সে হৈম হাসিতে বন ভাসিয়া উঠিল
শামল সবুজে হাসি গড়ায়ে চলিল।
আকাশের হাসি গিয়া মিশিল আকাশে,
সুনীল আকাশে হাসি আপনিই হাসে।"

সংযুক্ত অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া পদ্য রচনা কঠিন না হইতে পারে, কিন্তু অসংযুক্তবর্ণে কবিতা রচনা করিতে হইলে, ভাষার উপর বিশেষ আধিপত্য চাই। বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের পাঠের জন্য এইরূপ আর একখানি সুখ-পাঠ্য কবিতাপুস্তক আছে কি না, জানি না। সুতরাং এদেশের নিম্নশ্রেণীস্থ বিদ্যালয়সমূহে এখানির প্রচলন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ও নিতান্ত উচিত। যাহারা শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ পড়িয়াছে, গোচারণের মাঠ যে তাহাদিগের জন্য একখানি উৎকৃষ্ট শিক্ষাগ্রন্থ হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। তবে বলা যায় না, যাঁহারা শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রাধ্যক্ষ, তাঁহাদিগের মহিমা অসীম। তাঁহারা এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে,—'ইহাতে কেবলই কাটা কাণ ও কাটা সানের কথা নাই। শামল সবুজে হৈমহাসি প্রভৃতি কঠিন ভাবের কথা আছে,দয়েলের গীত ও বিটপীর সমাধির কথা আছে। অতএব ইহা বালকদিগের অপাঠ্য'!

সুযোগ্য গ্রন্থকারকে উপসংহারে আমাদিগের কেবল একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আমরা স্বীকার করি যে, কবিতার অনুরোধে অন্যমনকে 'আনমন' লেখা যায়, শ্যামলকেও শামল লেখা যাইতে পারে। কিন্তু নূতন নূতন না লিখিয়া 'নত্তন নত্তন' কেন?

৫। 'ইতালীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত ম্যাট্‌সিনীর জীবনবৃত্ত; তদীয় আত্মজীবনবৃত্ত অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ এ প্রণীত।'—আমরা অদ্য এই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে প্রস্তুত নহি। গ্রন্থের প্রাপ্তিস্বীকার এবং গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশই অদ্য আমাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু সমালোচনা না করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই গ্রন্থ

যে ভাবে আরব্ধ হইয়াছে, যদি সেই ভাবে পরিসমাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহা বাঙ্গালা ভাষার একখানি সম্পত্তি হইবে। ম্যাট্‌সিনীর স্বরচিত জীবনবৃত্ত ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। যাঁহারা সেই অনুবাদ পাঠ করিয়া ম্যাটসিনীর পবিত্র নামকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা যোগেন্দ্র বাবুকে উন্মুক্তচিত্তে ধন্যবাদ দিবেন। আর, শুধু বাঙ্গালা সাহিত্যই যাঁহাদিগের শিক্ষার অবলম্ব, এই পুস্তকে তাঁহারা অনেক নূতন কথা শিখিবেন। আমরা ভরসা করি, এই জীবনবৃত্ত সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সমালোচিত হইবে, এবং যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্যের সুহৃদ্ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা গ্রন্থকারের সাহায্য করিতে আহ্লাদসহকারে অগ্রসর হইবেন।

৬। ‘বিজন-চিন্তা। হরিনাভি সাহিত্য-উৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত।’—এই বিজন-চিন্তা রাজকৃষ্ণ বাবুর নিশীথ চিন্তার Second dilution অর্থাৎ দ্বিতীয় নিষ্কর্ষণ। লেখা সুখপাঠ্য।

৭। ‘প্রণয়-প্রতিমা। (উল্লাপ্য)। বিজন-চিন্তা প্রণেতা প্রণীত।’—এখানি অভিজ্ঞানশকুন্তলার Hundredth dilution, অর্থাৎ শততম নিষ্কর্ষণ। কিন্তু কম্পাউণ্ডরের অবিবেচনা ও অসাবধানতায় ইহাতে অনেক কদর্য্যবস্তু মিশ্রিত হইয়াছে। ইহার লেখা বিজন-চিন্তার মত সুখদ নহে। অনেক স্থান নিতান্ত বিরক্তিজনক। কালিদাসের সেই ত্রিলোক-দুর্ল্লভ চিত্রপট লইয়া এইরূপ ক্রীড়াকৌতুক কর্ত্তব্য নহে। ইহার শকুন্তলা নাটক-ঘরের নটীর ন্যায় গীত মুখস্থ করিয়া কহিতেছেন ;—

“প্রাণ যে রহে না আর প্রাণসখারে না হেরে,
ধৈরজ ধরিতে নারি প্রাণ মন হুহু করে।”

যদি গোবিন্দ অধিকারীর বৃন্দা দূতী নিকটে থাকিত, সে অমনি নাচিয়া নাচিয়া বাহু নাড়িয়া উপদেশ দিত ;—

“রাধে! ধৈর্য্যং, কুরু ধৈর্য্যং
মম গচ্ছং মথুরায়ে।”

প্রণয়প্রতিমার রচয়িতা উৎসাহশাল ব্যক্তি। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ বিনয়সহকারে এই অনুরোধ করি যে, তিনি যেন তাঁহার উন্মেষোন্মুখ উৎসাহশীলতার এইরূপ অবমাননা না করেন।

৮। “কিন্নর-পারিজাত বা সুরসুন্দরী। গীতি-নাট’—এখানি কিছুই নহে। ইহা সম্পূর্ণরূপে অবস্তু মধ্যে গণ্য ;—সুতরাং নিন্দারও নিম্নস্থানীয়। গ্রন্থের এক অপ্সরা গাইতেছেন,—

“নবীন নাগর, রসের সাগর,
কেন এত ডর ভাব হে।”

গোপাল উ’ড়ের মালিনী গাইয়াছিল,—

“নবীন নাগর, রসের সাগর
ভুল্‌বে কি সে আমায় দে’খে?”

উভয় গীতই আড়খেমটায় গেয়।

৮। ‘The Seventeenth Annual Report of the Uttarpara Hitakary Shabha. 1879—80.’।—আমরা এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া একান্ত প্রীত হইলাম। বঙ্গদেশের সভা সতর বৎসরকাল জীবিত রহিয়াছে, ইহাই প্রথমতঃ সৌভাগ্যের বিষয়, তাহার পর সভার সৎকার্য্যপরম্পরা।

যাঁহারা সভার প্রতিষ্ঠাতা ও পোষ্টা, তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

৯। 'সোপান। প্রথমস্তর। (নীতি বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ) শরচ্চন্দ্র, বিরাজমোহন ও সন্ন্যাসী প্রণেতা কর্তৃক বিরচিত।'—সোপান-প্রণেতা তাঁহার সকলগুলি পুস্তকই দয়া করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। আমরা তাঁহার উপন্যাসনিচয় এখন পর্য্যন্তও পড়িয়া উঠিতে না পারিয়া অপরাধী আছি। সুতরাং আজি আমাদিগকে সোপানের প্রথমস্তরেই থাকিতে হইবে।

সোপান নীতি বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকার সুনীতিপরায়ণ, সুরুচিসম্পন্ন, সৎশিক্ষানুরাগী ও স্বদেশবৎসল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা উন্নত, তাঁহার উদ্দেশ্য মহান্। কি সাময়িক রাজনীতি, কি নিত্যস্থায়িনী সমাজ-নীতি, তিনি ইহার যে কোন বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের কথা; এবং এই নিমিত্তই তাঁহার লেখা সাধারণতঃ হৃদয়গ্রাহিণী। কিন্তু উহা হৃদয়গ্রাহিতা গুণে যেরূপ প্রশংসনীয়, সেরূপ প্রগাঢ়, পরিশুদ্ধ ও পরিপক্ক নহে। যথা গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠায়,—

"জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা ও বিবেচনা শক্তি যখন চিন্তার সহিত ঐকমত্য হইয়া পড়ে, তখনই এই সকল অভাব উপস্থিত হয়।

'চিন্তার সহিত ঐকমত্য হইয়া পড়ে' এইরূপ প্রয়োগ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ; এবং বিচারক্ষম পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, উদ্ধৃত বাক্যটি উহার সকল অবয়বেই অবোধ্য ও ভাষার রীতিবিরুদ্ধ। আমরা শুধু রীতিলঙ্ঘনের আর একটি উদাহরণ দিব। গ্রন্থের ৫ম পৃষ্ঠায় এক স্থলে আছে,—

যদি ভারতে ম্যাজিনীর ন্যায় কোন সত্যপরায়ণ বীরের উত্থান হয়, তাপিত বক্ষ শীতল করি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া।"

এখানে 'আলিঙ্গন করিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি গদ্যে অসহনীয়। সোপানের এইরূপ দোষ অনেক আছে। ভরসা করি ইহার দ্বিতীয় স্তরে এসকল পরিহৃত হইবে। সোপান-রচয়িতা, আধুনিক বহু লেখকের ন্যায়, কোন একটি বিশেষ ভাবের উদ্দীপনা লইয়া যেরূপ আকুল, চিন্তার বন্ধনী এবং ভাষার গাঁথনির প্রতি তেমন মনোযোগী নহেন। কিন্তু বোধ হয়, চিন্তার পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধ দৃঢ়-শৃঙ্খল ও ভাষার পূর্ব্বাপর-সঙ্গত দৃঢ়গাঁথনি বিনা কোন ভাবই সর্ব্বাবয়বে পরিস্ফুট হয় না; এবং যেখানে ভাবের ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ পরিস্ফুটতা নাই, উদ্দীপনাও সেখানে পূর্ণমাত্রায় খেলাইতে পারে না।

সোপানের কোন কোন প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হইল যে, গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন। যদি জাতীয় ভাষার প্রতি তাঁহার তথাবিধ হৃদ্গত ভক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে এসকল কথা বলা আমরা আবশ্যক জ্ঞান করিতাম না। তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার উপকার হইতে পারে;—বঙ্গীয় সামাজিক জীবনের যে আংশিক উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই।

১০। 'ভারতে দুর্ভিক্ষ। শ্রীমনোরঞ্জন

গুহ ঠাকুরতা কর্ত্তৃক বিরচিত।'—আমরা এই গ্রন্থখানির নামে একটুকু প্রতারিত হইয়াছি। বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টের প্রধান সভ্যেরা ভারতের দুর্ভিক্ষ লইয়া ব্যতিব্যস্ত;—যাঁহারা রাজনীতির পরিচালক, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই এই কথার আন্দোলনে গভীর চিন্তাবিষ্ট। কেহ কেহ এবিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কেহ মাসিকপত্রে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কেহ বা এই প্রসঙ্গে অতীব সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া গ্রন্থাকারে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সেই ভ্রমে পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম যে, এখানিও ঐরূপ একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ হইবে, এবং ইহাতে দুর্ভিক্ষের ভূত ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ প্রতিবিধানের কথাই সম্ভবতঃ সমালোচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এইক্ষণ দেখিলাম, ইহা তাহার কিছুই নহে; —ইহা একখানি অভিনব কাব্য। ইহার শব্দবিন্যাস মধুর এবং ইহার অনেক স্থলেই করুণ রসের উদ্রেক আছে।

" শিশু পুত্র কন্যাগুলি ননীর পুতুল
উত্তাপে গলিয়া যায়, সুখের বাতাস গায়,
লাগিলে অমনি হয় অস্থির আকুল।
কি কব রে হায় হায়, দুখে বুক ফেটে যায়,
যত্নে খাওয়াইতে যারা তবু খেতে চায় না
আজি ভাসি নেত্রজলে, মাগো আমি খাব বলে,
ক্ষুধার সময়ে কেঁদে দুটি অন্ন পায় না।
আমার কঠিন প্রাণ এদেখেও যায় না।"

এ রচনা উত্তম। এই পুস্তকে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর রচনা আছে। পাঠসময়ে অনেক কথা মনে পড়ে এবং চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। তবে লেখকের এই এক অসাধারণ কীর্ত্তি যে, তিনি এইরূপ হৃদয়বিদারি করুণ কাহিনীর মধ্যেও স্থানে স্থানে আদিরসের ফুল ফুটাইতে একাগ্রমনে যত্ন করিয়াছেন। তাদৃশ বিষয়বিরোধ ও রুচিবিকার না থাকিলে, এই দুর্ভিক্ষকাব্য কিয়ৎপরিমিত আদরের বস্তু হইত, এবং ইহাকে স্বসুখ-নিরত স্বোদর-পরায়ণ ধনিসন্তান ও প্রজাপীড়ক ভূস্বামিদিগের গৃহে গৃহে উৎসাহসহকারে প্রচার করা যাইত।

১১। 'বালকবোধ। বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তিসংকলিত। নূতন সংস্করণ।' আমরা এই গ্রন্থের অতি অল্পই পড়িয়াছি; কিন্তু যে টুকু পড়িয়াছি, তাহা মন্দ হয় নাই। ইহাতে ঐতিহাসিক ভ্রমপ্রমাদ আছে কি না তাহা দেখিবার সময় পাই নাই। ইহার ভাষা বালকশিক্ষার অনুপযুক্ত নহে। গ্রন্থখানি বড় ছোট হইয়াছে। এত ছোট যে, ইহাতে কোন কথাই ভাল করিয়া লেখা সম্ভবপর নহে। এ দোষ গ্রন্থকারের কি না জানি না; তাঁহার প্রতি বোধ হয় এইরূপ 'ফরমায়েস' হইয়া থাকিবে। যাঁহারা ফরমায়েস দিয়াছেন, তাঁহাদিগের এইরূপ সংস্কার হইতে পারে যে, নামের তালিকা এবং ঘটনাবলীর তারিখওয়ারি ফর্দ্দ পড়াইলেই বালকদিগকে ইতিহাস পড়ান হয়। এদেশের বিদ্যালয়স্থ বালকেরা এখনও ঐরূপ তালিকা ও তারিখের ফর্দ্দ পড়িতেছে।

কণিক-নীতির সাম্য-কারিকা

পাঁচ আর একশত পাঁচ।

অথবা

রাজনৈতিক প্রীতি ও স্বার্থসমন্বয়।

এ জগতে যে সবল, সে স্বভাবতঃই দুর্ব্বলের নিপীড়ক, নিহন্তা অথবা বিবিধ বিঘ্ন-বিপত্তির নিদান। তাহাকে কেহ শিখায় না, কেহ মতি দেয় না, কেহ প্ররোচনা দিয়া প্রবর্ত্তিত করায় না; কিন্তু তথাপি সে সমীপবর্ত্তী ক্ষীণ-প্রাণ বস্তুর আপদ ও অনিষ্ট উৎপাদন করে। তাহার মহত্ত্ব ও দয়া-দাক্ষিণ্য, সাধুতা ও সারল্য থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার বর্দ্ধমানা শক্তি, বর্দ্ধমানা বহ্নি-শিখার ন্যায়, তথাপি সমীপবর্ত্তিনী ক্ষীণতর শক্তিকে ভস্ম করিয়া ফেলে অথবা আত্মসাৎ করিয়া লয়। ইহা নিসর্গসিদ্ধ ও নিত্য-প্রত্যক্ষ।

যে স্থানে একটি বট-বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতা-নিচয় অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লতা লতার বন্ধনে শুকাইয়া যায়, অন্যান্য পাদপ সকলও সবলের ঐ বিষাক্ত ছায়াতেই মৃত্যুমুখে ঢলিয়া পড়ে। বট এখানে উপলক্ষণ মাত্র। বস্তুতঃ,বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষ মাত্রেরই এই ধর্ম্ম। ঐ সকল বৃক্ষ বহুসহস্র প্রাণীকে প্রীতির অযাচিত আশ্রয়-দানে শীতল করে, —বহুসংখ্য বিহঙ্গের বাস-স্থল হইয়া আনন্দের কোলাহলে অহোরাত্র কল-কলিত রহে; কিন্তু জীবের জাতি-হিংসা ধর্ম্মে, আপনা হইতে দুর্ব্বল, অন্যান্য উদ্ভিদ্‌মাত্রেরই প্রাণ-বল শোষণ করে। এইরূপ, কোন অটবীর মধ্যে বৃহৎ কোন জন্তু প্রবিষ্ট হইলে, তত্রত্য ক্ষুদ্র জন্তু-সমূহ প্রথমতঃ ভয়ে আকুলিত হয়, তাহার পর ইতস্ততঃ পলাইতে থাকে, পরিশেষে একটি একটি করিয়া নিহত অথবা সকলেই সদল-বলে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে জলাশয়ে কোন বৃহৎ কলেবর মৎস্যের প্রবেশ হয়, সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যের জীবন অথবা সংখ্যা বৃদ্ধির আর ভরসা থাকে না; যেখানে কুম্ভীরের সঞ্চার হইতে থাকে, সেখানে কোনরূপ জলচরেরই কল্যাণ বিষয়ে আর প্রত্যাশা করা যায় না।

মনুষ্য-সমাজেও সবল ও দুর্ব্বলের পরস্পর সান্নিধ্যে সর্ব্বত্রই এই দশা। এই কাহিনীই রাজা, রাজপুরুষ, রাজ্য ও সাম্রাজ্য-নিচয়ের প্রধান ইতিহাস,—ইহারই নাম শক্তি-সঙ্ঘর্ষ,ইহা লইয়াই রাজনীতি লীলা-চাতুরী অথবা বিঘ্ন-সংকুল ঝটিকাবর্ত্ত, এবং ইহা হইতেই রাজ্যের উত্থান ও বিলয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য কিংবা উপরাজ্য

সৌহার্দ্দ ও অসৌহার্দ্দে একত্র অবস্থিত রহে; —একের দ্বারা অন্যের বিশেষ কোন ইষ্ট অথবা বিশেষ কোন অনিষ্ট না হউক, কেহই কাহাকেও কুক্ষিস্থ করিতে পারেনা বলিয়া পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বের পুষ্টি-সাধন করে;—কিন্তু যেই তাহাদিগের মধ্যে একটি প্রবলতর শক্তির অভ্যুদয় হয়, অমনি তাহারা আপনা হইতে বিশুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া সেই শক্তির ক্ষুধিত-গ্রাসে গড়াইয়া পড়ে।

আমেরিকার আদিম নিবাসীরা আপনাদিগের সুদূরস্থিত বাস্তুভূমিতে আপনা আপনি চিরদিন কি নিরাপদে অবস্থিত ছিল! তাহারা ছিল কি না, পৃথিবীর কেহ তাহা জানিত না; এবং পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, কোথায় কি পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে, তাহারাও সেই সংবাদ রাখিত না। প্রকৃতির বন্য শোভা তাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ তাহাদিগের শিক্ষাগুরু,—পর্ব্বতের উচ্চ-শৃঙ্গ তাহাদিগের প্রীতির স্বর্গ, এবং বাহু-বলে বৈর-নির্য্যাতন ও স্নেহ-বলে পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজন-বর্গের পরিরক্ষণই তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষার শেষ। তাহাদিগের অশিক্ষিত সামাজিকতা, সুখ-দুঃখের সূক্ষ্ম পার্থক্য লইয়া বিচার করিতে না জানিলেও, স্বাভাবিক সুখ-লালসার তৃপ্তি বিধান করিত; তাহারা ধর্ম্মের নামে ধ্বজা তুলিয়া, শান্তি-পাঠের সঙ্গে শস্ত্র-প্রয়োগ ও অশ্রু-জলের সঙ্গে অগ্নি-বর্ষণ করিতে না শিখিয়া থাকিলেও, সেই এক প্রকার অর্দ্ধ-বিকসিত, অপরিমার্জ্জিত, ভয়-ভক্তিমিশ্রিত উগ্র ধর্ম্মের ভজনা করিত; এবং পার্লিয়ামেণ্টের আশ্রয় বিনাও পঞ্চায়তের সাধারণ মতেই রাজ-নিয়োগ,ও রাজনীতির গল-মন্ত্রণা বিনাও পরস্পর-বিরোধের মীমাংসা করিত। যদি তাহারা ঐ ভাবেই থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে কোন না কোনরূপ অভিনব সভ্যতার যে বিকাশ হইত না, তাহা কে বলিতে পারে? আবর্ত্তনেই সামাজিক বিকাশ, * এই আধুনিক সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকার সেই আদিম অসভ্যেরাও সামাজিক জীবনের ক্রমিক আবর্ত্তনেই ক্রমে সুসভ্য হইয়া বিশ্বজনীন মানব-সমাজের অঙ্গীভূত হইত। কিন্তু তাহাদিগের অস্তিত্বের ইতিহাস পঞ্চদশ শতাব্দীর অবসান হইতে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে কেন কিরূপ পরিবর্ত্তিত অথবা পরিসমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহার আলোচনা কর।

প্রসিদ্ধনামা কৃষ্টফর কলম্বস, পঞ্চদশ শতাব্দীর অবসান-সময়ে, অতিথির পবিত্র পরিচ্ছদে, আমেরিকার প্রান্ত-রেখায় প্রথম উপনীত হন; এবং অতিথি-জনোচিত অভ্যর্থনাতেই দেশের বলাবল বুঝিতে সমর্থ হইয়া, সেই নূতন-দৃষ্ট স্থানকে হিস্পানোলিয়া অর্থাৎ নূতন স্পেন নামে স্পেন-রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত করিয়া লন। স্পেনের পর ফরাসি,ফরাসির পর বৃটন এবং বৃটনের পর পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি তদানীন্তন সমৃদ্ধ জাতীয়েরাও তথাবিধ আতিথ্য-লাভের জন্য ক্রমে ক্রমে আমেরিকায় গিয়া উড়িয়া পড়েন;—এবং সকলেই বলে কি কৌশলে

* The Theory of Evolution.

আমেরিকার এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রক্ত-শোষণ ও অস্থিচর্ব্বণ দ্বারা আপনি আপনার আতিথ্য করেন। এই সকল প্রবল জাতির আতিথ্যসৎকারে আমেরিকদিগের শেষ ফল কি ফলিয়াছে, তাহাও কি পুনরায় বলিতে হইবে? যে বৃক্ষবাটিকায় সুন্দর (?) কি গজারি বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেখানে পুরাতন তরুলতার পরিশেষে কি হইয়া থাকে, তাহাও কি আবার দ্রষ্টব্য? আমেরিকার সেই পুরাতন অধিবাসীরা এইক্ষণ আর নাই! যাহারা গৃহের গৃহস্থ ছিল, তাহারা ইদানীং ইতিহাসের কথামাত্র! তাহাদিগের যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে,—তাহারা আপনারাও শক্তির খরস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে!

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, আমেরিকা সম্প্রতি সম্পদে ও গৌরবে অমরাবতী নাম লাভ করিয়াছে, এবং ঠিক অমরাবতীর মতই অবনীর ললাট-স্থলে শোভা পাইতেছে। কিন্তু সেই অমরাবতী কাহার জন্য? আমাকে যদি তুমি আমার জন্মস্থান এবং শৈশব ও যৌবনের ক্রীড়া-স্থান হইতে দূর করিয়া দিয়া সেই শূন্যস্থানে সোণার অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর, তাহাতে তোমার সুখসন্তৃপ্তি হইতে পারে,—যাহারা তোমার আশ্রিত ও মুখ-প্রেক্ষী, স্বার্থে তোমার অনুগত এবং ভোগ-সাম্যে তোমার সহিত জড়িত, তাহাদিগেরও হর্ষোদ্রেক হইতে পারে। আমার তাহাতে কি? তোমার সান্নিধ্যই যদি আমার সর্ব্বনাশের কারণ হয়, তোমার সম্পদ-বৃদ্ধি প্রকৃতির কোন্ নিয়মানুসারে আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিবে? আমেরিকার সর্ব্বত্রই এইক্ষণ স্বর্গের শোভা, স্বর্গের বৈভব। কিন্তু ঐ আমেরিকা যাহাদিগের পুরুষ-পরম্পরাগত জন্মস্থান এবং শৈশব ও যৌবনের ক্রীড়া-স্থান ছিল,—যাহারা উহার বেলা-ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া উপল চয়ন করিত এবং কানন-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া মৃগয়া-সুখে সুখী হইত, এই স্বর্গ-শোভা ও স্বর্গীয় বৈভব তাহাদিগকে এইক্ষণ কোন্ সুখে সুখী করিতেছে? তাহাদিগের ভস্মরাশিতে পরকীয় প্রাসাদের প্রলেপ-কার্য্য হইতেছে, এই কি তাহাদের সুখ? তাহাদিগের পিতৃপুরুষদিগের শ্মশান-ক্ষেত্রে অন্যে আসিয়া আনন্দের উৎসবে নৃত্য করিতেছে, এই কি তাহাদিগের সৌভাগ্য?

আমেরিকায় যে ইতিহাসের রচনা হইয়াছে,—অষ্ট্রেলিয়া, ট্যাস্‌মেনিয়া ও নবজিলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ-রাজ্যসমূহে যে ইতিহাসের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এইক্ষণ এসিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ-নিচয়ের স্থানে স্থানেও তাহারই আংশিক পুনঃসংস্করণ হইতেছে;—এবং স্পেনরাজ্যের অধিবাসীরা মেক্সিকো ও পেরু প্রভৃতি স্থানে যে নাটকের অভিনয় করিয়াছিল,—পর্ত্তুগীজদিগের প্রতাপ-সময়ে ব্রেজিলে যে নাটকের অভিনয় হয়, এইক্ষণও পৃথিবীর নানা স্থানে, নানা ভাবে সেই নাটকের পুনরভিনয় হইতেছে। কোথাও দিগ্‌নিরূপণ অথবা দেশ-লুণ্ঠন, কোথাও বৈজ্ঞানিক সীমানির্দ্দেশ অথবা বহ্নি-তর্পণ,—কোথাও শিক্ষার উন্নতি অথবা শক্তিপ্রতিষ্ঠা, কোথাও সভ্যতার বিস্তার অথবা সর্ব্বস্ব লইয়া আকর্ষণ। কোন স্থলে রাত্রী নিশার নিস্তব্ধ নিদ্রার পর জাগ্রত হ-

ইয়াই সপরিবারে কারারুদ্ধ এবং কারারুদ্ধ ব্যাঘ্র ভল্লুকের মত সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইতেছে, —কোন স্থলের প্রজাবর্গ স্বকীয় বাস্তুগৃহের প্রতি অনুরাগ এবং বাস-ভূমির দুঃখে অশ্রুপাতের অপরাধে সবংশে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এই সকল ঘটনা কি শুদ্ধ সাময়িক বৃত্তান্ত, না ইহার আর কোন গূঢ়ার্থ আছে ?

যাঁহারা ঐতিহাসিক যবনিকার অন্তরালেও দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, এই সকল ঘটনার একটিও অসম্বদ্ধ অথবা উচ্ছৃঙ্খল নহে। ইহার প্রত্যেকটিই সবল ও দুর্ব্বলের সংঘর্ষ-জন্য ইতিহাসের এক একটি গ্রন্থি স্বরূপ। ইহার কিছুই নূতন কথা নহে ; ইহার সমস্তই পুরাতন গীত। ঈদৃশ অভিনয়ের অবসানও গণনা দ্বারাই নিরূপিত হইতে পারে। কেন না, মেক্‌সিকো, পেরু ও ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের পূর্ব্বতন নিবাসীরা যে কারণ সমবায়ে ভূপৃষ্ঠ হইতে বিদূরিত হইয়াছে, এইক্ষণকার উৎপীড়িত জাতিসমূহও অসূত্রগ্রথিত ও অসহায় বলিয়া সেই কারণেই স্থান-ভ্রষ্ট, গৃহভ্রষ্ট, কারারুদ্ধ ও বিনষ্ট হইতেছে,—এবং যদি তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়, তাহারাও ভূপৃষ্ঠ হইতে অচিরেই সেইরূপ বিদূরিত হইবে।

ইহার পর স্বভাবতঃই এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে, এইরূপ আপদ-পাতে মনুষ্য-জাতির আত্মরক্ষার উপায় কি? মনুষ্য তৃণ-লতার মত অচেতন উদ্ভিদ্ নহে যে, অচেতন ভাবে শুকাইয়া যাইবে। মনুষ্য পশু-পক্ষি-মৎস্যাদির মতও একবারে কার্য্যকারণ-বিবেকশূন্য নহে যে, ভবিষ্যৎ চিন্তায় অন্ধ থাকিয়া অন্ধের ন্যায়, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে। মনুষ্যের নাম মনুষ্য। প্রীতি যেমন তাহার হৃদয়ের প্রবাহ, প্রতিবিধিৎসাও তেমনই তাহার প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি। তৃণলতা ও পশুপক্ষী প্রভৃতি বিধাতৃ-শক্তিতে বঞ্চিত। মনুষ্য সেই শক্তিতে একবারে বঞ্চিত নহে। তাহার সামান্য একটুকু জ্ঞানোদয় হইলেই সে বুঝিতে পায় যে, সে কিয়ৎ পরিমাণে আপনার শুভাশুভ ও সুখ দুঃখের বিধাতা। সুতরাং যখন জাতিবিশেষের উপর প্রবলতর শক্তির সন্নিপাতে এইরূপ অভাবনীয় বিঘ্ন আপতিত হয়, তখন তাহার প্রতিবিধানের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নপর হওয়া সেই জাতির অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। বৈরাগ্য-জনিত ঔদাস্য এবং বিলাস-জনিত আলস্য, পারমার্থিক মুক্তি অথবা কবিতাময়ী পরিতৃপ্তির নামে, যাহাই কেন উপদেশ করুক না, আত্মরক্ষার জন্য অভ্যুত্থান এবং পরকীয় অত্যাচারের প্রতিবিধান মনুষ্যমাত্রেরই প্রাকৃত ধর্ম্ম। কিন্তু সেই অভ্যুত্থান ও সেই প্রতিবিধানের আদি সোপান কি ? এই জিজ্ঞাসার এক বই আর দ্বিতীয় উত্তর নাই এবং সেই উত্তর,—প্রাণবল-সঞ্চয় ;—অর্থাৎ বুদ্ধি-বল, বাহু-বল, বিজ্ঞান-বল ও সমাজ-বলের যোগ-বন্ধন। কিন্তু তাদৃশ যোগ-বলের আদি প্রস্রবণ কি ? না, জাতীয় একতা। অন্যান্যরূপ সাধন-যোগে এই চতুরঙ্গ-বলের বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভাবনা থাকিলেও একতাতেই শক্তির প্রথম পত্তন। শক্তি ভিন্ন শক্তির প্রতিরোধ করে কে ? আর জাতীয় একতা বিনা জাতীয় শক্তির সৃষ্টি করাই বা কাহার সাধ্য ?

ধ্যান, ধারণা, আরাধনা ও তপস্যা প্রভৃতি কতিপয় মানস-কার্য্য ভিন্ন মনুষ্য-সাধ্য সমস্ত কার্য্যই একতার উপর নির্ভর করে। এই নিষ্ঠুর জড়-প্রকৃতির নিকট তুমি আত্ম-দুঃখের ইতিবৃত্ত লইয়া একাকী বিলাপ ও পরিতাপ কর, প্রকৃতি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না। তোমার ক্ষুধায় অন্ন মিলিবে না, শীতে বস্ত্র ঘটিবে না, এবং জল অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি ভূতনিচয়ের কেহই তোমার কোনরূপ অনুরোধ ও উপরোধ রাখিবে না। কিন্তু যখন একীভূত মনুষ্য-শক্তি জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া, প্রভুর ন্যায় আজ্ঞা প্রচারে প্রবৃত্ত হয়, প্রকৃতি তখন পাষাণের কঠিন বক্ষ হইতে শস্য-রাশি উপহার যোগায়, জল অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি ভূতনিচয়কে মনুষ্যের সেবা-কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত করিয়া রাখে, বালুভূমে বাণিজ্যের জন্য জল-পথ খুলিয়া দেয়, এবং বিজ্ঞানকে কবি-কল্পনার সৃষ্টি হইতেও অধিকতর অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইয়া অযুত মুখে একতার মহিমা কীর্ত্তন করে।

সমাজ-শোধন, শিক্ষা-বিধান, ধর্ম্ম প্রচার ও সাহিত্যের বিকাশ ইত্যাদি কাযও অংশতঃ একতা সাপেক্ষ। যিনি আপনার চারিত্র-বলে বহুলোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া লইতে অসমর্থ, তিনি অসাধারণ বাগ্মী হইলেও সমাজ-শোধনে অকৃতী। যিনি আপনার হৃদয়-বলে বহু সহস্র হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া লইতে অপারগ, তিনি আপনি অতি পবিত্র-মতি যোগী হইলেও ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে অপটু। এইরূপ শিক্ষা-বিধানে,—এইরূপ সাহিত্যের গঠনে। ইহার কোন কার্য্যই বহুলোকের একযোগ বিনা সম্পাদিত হয় না। কিন্তু রাজনৈতিক জাতি-গঠনে একতা শুধু উপায় নহে। একতাই সেখানে উদ্দেশ্য, অথচ একতাই সেখানে উপায়। একতার রাজনৈতিক মাহাত্ম্য বর্ণনার অতীত। যেমন শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে একতার নাম শারীরিক সজীবতা, সেইরূপ রাজ্যের ভাগে ভাগে ও অঙ্গে অঙ্গে একতার নাম রাজনৈতিক জীবন। উল্লিখিত রূপ জাতীয় একতা অথবা রাজনৈতিক বন্ধন কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে, এই একটি প্রশ্নের আন্দোলনই এই প্রবন্ধের মুখ্য অভিপ্রায়।

মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের ব্যক্তিগত পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধেই একতা যখন দুর্ল্লভ বলিয়া প্রতীত হয়, তখন জাতি-বিচ্ছিন্ন মনুষ্য-সমাজের এক শাখার সহিত আর এক শাখার একতার পথে কতরূপ অন্তরায় থাকিতে পারে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। জাতীয় একতা প্রধানতঃ কিরূপ অন্তরায় দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, অগ্রে তাহারই আলোচনা করা যাউক।

মনুষ্য-সমাজ প্রায় প্রত্যেক জনাকীর্ণ রাজ্য অথবা প্রায় প্রত্যেক সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডেই জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মভেদ ও ভাষাভেদ, নদ নদী ও পর্ব্বতাদির ব্যবধানভূত-মধ্যবর্ত্তিতা, সামাজিক আচার ও ব্যবসায়-বৈভবাদির পার্থক্য এবং আরও বহুবিধ কারণে বহুভাগে বিভক্ত রহিয়াছে;—এবং কেবল বিভক্ত রহিয়াছে, এমন নহে, ইহার প্রত্যেক বিভাগের সহিতই অনুবর্ত্তী অন্য বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ লইয়া ঘোরতর অভ্যন্তরীণ বিরোধ চলিয়া আসিতেছে।

যতক্ষণ সমান স্বার্থ, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় কিংবা দেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেও ততক্ষণই সহৃদয় সৌহার্দ্দ; এবং যে মুহূর্ত্ত হইতে স্বার্থের পার্থক্য, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সৌহার্দ্দের বিলয় ও একতার বিলোপ। ইতিহাসের অতীত ও আধুনিক উভয় পরিচ্ছেদেই এই সিদ্ধান্তের অসংখ্য উদাহরণ,—এবং এই জাতি-স্বার্থ, বর্ণ-স্বার্থ, ধর্ম্ম-স্বার্থ ও ভাষা-ভেদ প্রভৃতি কারণ-মূলক বিবিধ সাম্প্রদায়িক স্বার্থই যে রাজ-নীতির অভীপ্সিত একতার প্রধান বিঘ্ন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার অসংখ্য নিদর্শন।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই আর্য্য-বংশোদ্ভব,—আর্য্য-কীর্ত্তির আশ্রয়-স্তম্ভ। যখন আর্য্য প্রবাহ, পাশ্চাত্য প্রাচীর ভেদ করিয়া, ভারতে আসিয়া প্রবাহিত হয়, এবং ভারতের পুরাতন জাতিসমূহকে স্রোতের প্রবল ঘাতে সমূলে নাশ কি দূরে অপসারণ করিয়া ভারত-ক্ষেত্রের দিগ্‌দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়ে, তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই পরস্পরের প্রণয়-বন্ধ ও স্বার্থের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে পরস্পর-সম্পৃক্ত। কি সৌখ্য! কি সৌহার্দ্দ! কি আশ্চর্য্য একতা! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধি-স্বরূপ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বাহু-বল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ভক্তি-নির্ভরে বিষয়-চিন্তায় নিশ্চিন্ত রহিয়া বেদ-বিদ্যা ও দর্শনাদি শাস্ত্রের আতল বিলোড়ন করিতেছে;—ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উপর সমাজ রক্ষার দুর্ব্বহ ভার সমর্পণ করিয়া সামাজিক সামর্থ্য আহরণে ব্যাপৃত রহিতেছে। কেহ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলে, ক্ষত্রিয় তাহার প্রতিশোধের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও বদ্ধ-পরিকর;—কেহ ক্ষত্রিয়ের অসম্মান করিলে, ব্রাহ্মণ তৎক্ষণেই তাহার প্রতিশোধের জন্য অভিসম্পাতের ভয়াবহ অস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান। ক্ষত্রিয় সিংহাসনে,—ব্রাহ্মণ রাজার উপরে রাজা, শরীরের উপরে পুরোহিত-চক্ষু, অথবা মস্তকের উপরে মুকুট-মণির মত সেই সিংহাসনেরও ঊর্দ্ধদেশে;—ক্ষত্রিয় রণ-ক্ষেত্রের অগ্রভাগে, ব্রাহ্মণ সেই রণ-ক্ষেত্রের মন্ত্রগৃহে;—হরিহরের ন্যায় এক আত্মা, অভেদ-মূর্ত্তি ও সর্ব্বত্র অভিন্নগতি। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এই মৈত্রী কত কাল? না, যত কাল স্বার্থের মেল। যখন ভারতের পূর্ব্বতন অধিবাসীরা,—সেই বেদ-বর্ণিত অসুর ও দস্যু-জাতীয়েরা, আর্য্যজাতির সমবেত প্রভাবে পরাভূত হইয়া, গিরিগুহা, গহন-বন ও শত্রুর অগম্য অন্যান্য স্থানে পলায়ন করিল, তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বন্ধন-রজ্জু ধীরে ধীরে শিথিল হইতে লাগিল; এবং যখন পরকীয় আক্রমণের আশঙ্কা উন্মূলিত, ও পরের সহিত বিরোধ বিগ্রহের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ স্বার্থের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

স্বার্থের এই পার্থক্য সৃষ্টি অবধি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের মত প্রচণ্ড বীরকে পৃষ্ঠবল করিয়া ভারত-মাতাকে ক্ষত্রিয়ের রক্তে কত বার স্নান করাইয়াছে, এবং ক্ষত্রিয়েরা শরীরে পুনরায় শোণিত-সঞ্চারের পর প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণদিগকে কিরূপ নির্য্যাতন করিয়াছে, সংস্কৃত পুরাণাদিতে তাহার বহু

বিস্তৃত বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক-জাতি-সম্ভূত,ও এক-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও শাস্ত্র-কল্পিত ও সমাজ-শাসনে ব্যবস্থাপিত কৃত্রিম জাতি-পার্থক্যে কিরূপ স্বার্থ-পার্থক্য ও ভয়ঙ্কর বিরোধ ঘটে, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের আত্ম-কলহকে তাহার উদাহরণ বলা যাইতে পারে। এইক্ষণ ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় পুনরায় প্রায় এক! কারণ, এইক্ষণ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই,—সে ব্রাহ্মণও নাই, সে ক্ষত্রিয়ও নাই;—জগতে উভয়েরই ছায়ামাত্র বিদ্যমান। ছায়ার সহিত ছায়ার বিরোধ সম্ভবে না, এবং বিরোধের সম্ভাবনা থাকিলেও শক্তিতে তাহা কুলায় না। কিন্তু শক্তির পুনরুদ্রেক হইলেও যে এই নির্জীব একতা এমনই সুরক্ষিত রহিবে, সে আশা অদূরদর্শীর আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

বর্ণগত পার্থক্যের বিরোধ-বিষয়ে আধুনিক আমেরিকার মিলিত-তন্ত্ররাজ্যই প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল বলিয়া পরিগণনীয়। আমেরিকা সর্ব্বাংশে সৌভাগ্যশালী হইয়াও এই এক বিষয়ে নিতান্ত দুর্ভাগাযুক্ত। আমেরিকার এক ভাগ অমল-শ্বেত-কান্তি, আর একভাগ কৃষ্ণবর্ণ। এই বর্ণ-পার্থক্য শ্বেতাঙ্গদিগের চক্ষে সহে না, এবং যাহার সহিত তাঁহাদিগের বর্ণগত বিভিন্নতা আছে,সে যদি জ্ঞানে তাঁহাদিগের শিষ্য, ধর্ম্মে তাঁহাদিগের শরণাগত, ও সেবায় তাঁহাদিগের দাসানুদাস হইয়া রহে, তথাপি তাহার স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটাইতে, তাহার সুখের পথে কাঁটা দিতে, তাহাকে পশুবৎ নিপীড়ন করিতে, তাঁহাদিগের সুশিক্ষিত দয়া ও সুমার্জ্জিত বিবেক অণুমাত্রও ব্যথিত হয় না। অনেক শ্বেত-ললনা, উপন্যাস পাঠের সময় নায়ক-নায়িকার কল্পিত-বিরহ-বেদনায় বাষ্প-মোচন করিয়া যুবজন-সমাজে যার পর নাই যশস্বিনী হন; এবং উপন্যাস-পাঠাবসানে, তাঁহারাই আবার, পিতা কি পতির কৃষিক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, কৃষ্ণ-কায় সেবক-বর্গের নিরাবৃত পৃষ্ঠে স্বহস্তে কশাঘাত করিতে আরম্ভ করেন। ইহা দেখিয়া অবশ্যই এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, পুরুষের স্বার্থানুসারিণী বিষয়-বুদ্ধির ন্যায়, অবলার স্বাভাবিক স্নেহ-শীলতাও বর্ণ-বৈষম্যের অনুসারিণী। নতুবা তাঁহারা এইরূপ নীতি-বিগর্হিত অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিবেন কেন?

কোন রাজ্য অথবা সমাজ এইরূপ বিভিন্নবর্ণ মনুষ্যের বাস-ভূমি হইলে তাহার অঙ্গে অঙ্গে সমবেদনা ও সকল অঙ্গে রাজনৈতিক একতা থাকা সম্ভব কি না,তাহা আমেরিকার শেষ অভ্যন্তর-যুদ্ধেই * সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টীয় সন পর্য্যন্ত আমেরিকায় যে ঝটিকা বহিয়াছে ও মুহুর্মুহুঃ যে ভূকম্প হইয়াছে, উল্লিখিত স্বার্থদ্বয়ের একত্র সমাবেশই তাহার একমাত্র কারণ। ইহারই জন্য ষ্টৌর অনল-রেখাঙ্কিত আখ্যায়িকা,—ইহারই নিমিত্ত চ্যানিঙ্‌, পার্কার ও গ্যারিসন প্রভৃতি প্রধান পুরুষদিগের অশ্রু-ত্যাগ,এবং ইহারই অনুরোধে লোক-বিশ্রুত আব্রাহাম লিন্‌কনের উপাংশু-বধ। কিন্তু এই বর্ণ-পার্থক্যের বি-

* Read the History of the late Internal Civil War of America.

রোধ-কলঙ্ক কি তথাপি একবারে প্রক্ষালিত হইয়াছে? ঘৃণা ও বিদ্বেষ শক্তির দৃঢ়শাসনে ও প্রয়োজনের তাড়নে, একে অন্যের নিকটবর্ত্তী হইতে অথবা একে অন্যকে সহিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এই দুই কি এখনও মিশিয়া যাইতে পারিয়াছে?

ধর্ম্ম-ভেদে কিরূপ স্বার্থ-ভেদ ঘটে, পৃথিবীর যে দিকে চাও সেই দিকেই তাহার উদাহরণ পাইবে; এবং ধর্ম্ম-জন্য বিরোধ যে বর্ণ-পার্থক্যের বিরোধ হইতেও অধিকতর ভয়ঙ্কর, বোধ হয় সকলেই ইহা এক-বাক্যে স্বীকার করিবে। ধর্ম্মকে অমূলক অভ্যাস, অন্ধ-বিশ্বাস অথবা মানব-প্রকৃতির নৈসর্গিক শ্বাস-প্রশ্বাস,ইহার যাহা কিছু বলিয়াই কেন গ্রহণ কর না, ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যের প্রিয়তর বস্তু আর নাই। যে পুত্র আশার অবলম্ব-যষ্টি, আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি-স্থল ও জীবনের প্রধান সম্বল,—যাহাকে ক্ষণকাল না দেখিলেই সংসার শূন্য বোধ হয়, ধর্ম্ম-ভ্রান্ত মনুষ্য সেই পুত্রকে অকাতর-প্রাণে পরিত্যাগ করে; এবং ধর্ম্ম এমন উপদেশ করেন যদি এই বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মে,তাহা হইলে সে সেই পুত্রের মস্তক আনিয়া বলি-স্বরূপ উপহার দেয়। যে জননী শৈশবে স্তন্য-দানে ও বাল্যে অন্ন-দানে লালন ও পরিবর্দ্ধন করেন,—যাঁহা হইতে জীব-স্রোতের প্রথম তরঙ্গ ও জীবনের প্রথম সুখ, সর্ব্বস্ব দিয়াও যাঁহার সেবা করা হৃদয়-সম্মত ও ন্যায়-সঙ্গত, ধর্ম্ম-ভ্রান্ত মনুষ্য সেই জননীকে জীর্ণ-বস্ত্রের মত অবহেলায় ফেলাইয়া দেয়; এবং ধর্ম্ম এমন আজ্ঞা করেন যদি এইরূপ তাহার বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে সে তাঁহার মর্ম্ম-ক্রন্দনেও আহ্লাদ-সহকারে সম্মত হয়। যে ভার্য্যা চক্ষুর আনন্দ, চিত্তবৃত্তির চির-বিনোদ ও প্রাণের প্রিয়তম-সঙ্গিনী,—যাঁহার বিরহে সুখ সুখ বলিয়া গণ্য হয় না, সারস্বত-সম্পদও মনকে আকৃষ্ট রাখিতে পারে না,—প্রাণ-ত্যাগে মতি হইলেও যাঁহাকে পরিত্যাগ করা কঠিন জ্ঞান হয়, ধর্ম্ম-ভ্রান্ত মনুষ্য তাঁহাকেও পথের কাঙ্গালিনী করিয়া দূরে চলিয়া যায়; এবং ধর্ম্ম ইহা চান যদি এই প্রকার তাহার সংস্কার জন্মে, তাহা হইলে, যিনি কণ্ঠের হার ও হৃদয়ের কৌস্তুভ ছিলেন, সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমাকেও সে কালসর্পবৎ পাদ-তলে দলন করিতে প্রস্তুত হয়। অথবা পুত্র-কলত্র ও জনক-জননী আর অধিক কি,—মনুষ্য যখন ধর্ম্মেরজন্য আপনার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলায়, বুদ্ধি ও বিবেককেও বিড়ম্বিত করে এবং প্রকৃতিকেও অপ্রাকৃত করিয়া তুলিতে যত্নশীল হয়, তখন ধর্ম্ম-ভ্রান্তিতে সে না করিতে পারে, এমন কোন কার্য্যের কল্পনা করাও কঠিন।

আমাদিগের এ সকল কথায় ধর্ম্মের নিন্দা হইতেছে না, প্রত্যুত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির মহীয়সী ক্ষমতারই পরিচয় হইতেছে। ইহাই এস্থলে প্রধানতঃ আমাদিগের বক্তব্য যে, ধর্ম্ম-বিষয়ক বিশ্বাস ভ্রান্ত হউক আর অভ্রান্ত হউক, মনুষ্য-হৃদয়ের উপর উহার আধিপত্য অসীম; এবং সুতরাং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের ধর্ম্মে যখন মত-ভেদ হয়, সেই বিভিন্ন-মতাবলম্বীরা, পরস্পর অতি নিকট-সম্পর্কিত হইলেও কার্য্যতঃ সেই হইতেই একে অন্যের পর ও স্বার্থে পৃথক্। এইরূপ বিরোধী

-দিগের মধ্যেও কি একতার প্রত্যাশা করা যায়? খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান-ধর্ম্ম, হিন্দুদিগের ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম, অথবা পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মই কি উল্লিখিত স্বার্থ-ভেদ-রূপ অনর্থকর অধর্ম্মের সজীব সাক্ষী নহে? ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস যে রক্তাক্ষর-লিখিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এই স্বার্থ-বিরোধ ভিন্ন তাহার আর কি কোন কারণ সম্ভবে?

ইহুদী ও খৃষ্টীয়ান উভয়েরই মূল অবলম্ব এক। উভয়েরই ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবল,—আদি গুরু মোজেস্, ও গন্তব্য-পথ পবিত্রতার দিকে। কিন্তু ইহুদীরা অগ্রে খৃষ্টীয়ানদিগের উপর কিরূপ অত্যাচার করিয়াছে তাহাও লিপিবদ্ধ আছে; এবং খৃষ্টীয়ানেরা পশ্চাৎ প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়া ইহুদীদিগকে দেশে দেশে কিরূপ উৎপীড়ন করিয়াছে ও কত অকথ্য যন্ত্রণা দিয়াছে, তাহাও প্রামাণিকতার সহিত লিখিত রহিয়াছে। আবার খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান উভয়ই একেশ্বর-বাদী, উপধর্ম্ম-বিরোধী ও অবতার-ভক্ত,—পৌত্তলিকতার প্রতি উভয়েরই সমান বিদ্বেষ এবং পারলৌকিক জীবনেও উভয়েরই সমান বিশ্বাস। কিন্তু কি বিচিত্র, এত বিষয়ে সাম্যসত্ত্বেও এই উভয়েরই পরস্পর-সম্পর্কে প্রধান ধর্ম্ম পরস্পরের মুণ্ডপাত। খৃষ্টীয়ান, ইয়ুরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক-দেহে উত্থিত হইয়া,মুসলমানের শিরশ্ছেদে ও শক্তিরোধে প্রাণপণ করিয়াছে;—মুসলমান, খৃষ্টীয় রাজ্য-নিচয়ের রমণীয় নগর-মালায় বজ্র-শলাকার ন্যায় প্রবেশ করিয়া, যে স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই স্থানই একবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

খৃষ্টীয়ান ও মুসলমানের এই বিরোধবহ্নি ক্রুজেদের সময়েই অত্যন্ত জলিয়া উঠে,—রিচার্ড ও সালাদীন প্রভৃতি পুরুষ-সিংহেরা এই বহ্নিতে নিজ নিজ পৌরুষী গরিমার পরীক্ষা দেন, এবং উভয় ধর্ম্মেরই উপাধ্যায়বর্গ এই বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া ইতিহাসে উচ্চ আসন লাভ করেন। কিন্তু রাবণের চিতা-বহ্নি-সদৃশ এই ধর্ম্ম-ভেদের বিরোধ-বহ্নি কি এখনও নির্ব্বাণ হইয়াছে? যদি এই অনলই নির্ব্বাণ হইয়া থাকিবে, তবে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মোরীয়-বিপ্লবে পঞ্চদশ লক্ষ খৃষ্টীয়ান ও বহুলক্ষ মুসলমান সশরীরে দগ্ধ হইল কিসে? যদি এই অনলই নির্ব্বাণ হইয়া থাকিবে, তবে এখনও ভল্‌গেরিয়া ও রৌমিলিয়া, মল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালেসিয়া প্রভৃতি উপরাজ্য কিংবা খণ্ডরাজ্যসকল থাকিয়া থাকিয়া জলিয়া উঠে কেন?—এবং যে তুর্ক ইয়ুরোপের পার্শ্বদেশে পর্ব্বতের মত অটল ছিল, যাহার পদাঘাতে অষ্ট্রীয়া কম্পিত থাকিত,রুশ পরের শরণার্থী হইত, ও সমগ্র ইয়ুরোপ ভয়ে নিদ্রাশূন্য রহিত, সেই তুর্ক, সেইরূপ বাহুবল-দৃপ্ত ও বীর-গর্ব্বে গর্ব্বিত রহিয়াও, আজি স্বরাজ্য-কলহে ভগ্নগৃহের মত ভাঙিয়া পড়িতেছে কেন? হাঁ ইহা সত্য বটে যে, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক হিন্দু আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্রভূমিতে পূর্ব্বের মত পরস্পর পরস্পরের প্রতিকূলাচারী হয় না; ইহাও সত্য বটে যে, ভারতীয় হিন্দু ও ভারতীয় যবন, শার্দ্দূল ও মহিষের মত,একে অন্যের বক্ষোবিদারণের অভিলাষে আর সে ভাবে উল্লম্ফন করে না। কিন্তু ইহার এমন অর্থ নয় যে, ইহাদিগের ধর্ম্মগত স্বা-

র্থের বিরোধ বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, বৌদ্ধ ও হিন্দু এবং হিন্দু ও যবন, পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় প্রবলতর শক্তির আচ্ছাদনে পড়িয়া জীবন্মৃত ও নিস্পন্দ রহিয়াছে! নদী যখন মরিয়া যায়,—নদীর প্রবাহ যখন অবরুদ্ধ হয়, তখন বায়ু পূর্ব্বের মত ঝটিকার বেগে প্রবাহিত হইলেও, আর কি সেই তরঙ্গ খেলে?

ভাষাভেদও স্বার্থের পার্থক্য-সৃষ্টির আর এক কারণ, এবং জাতীয় একতার আর এক অন্তরায়। ভাষা মনুষ্যের সুখ-দুঃখ ও হর্ষ-বিষাদের সজীব-প্রবাহ। ভাষায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের উদ্দীপনা;—ভাষায় ব্যথিতের বিলাপ ও বিপন্নের ত্রাহি-ধ্বনি এই নিমিত্তই ভাষায় যাহার সহিত পার্থক্য, সে বিতস্তি-মিত ব্যবধানে রহিলেও, স্বার্থে ও সহানুভূতিতে এবং কার্য্যে ও প্রয়োজনে তাহার সহিত সমুদ্রের ব্যবধান। আমি হাসিলে যে হাসে না, আমি কাঁদিলে যে কাঁদে না, সে আমার দুঃখ বুঝিবে কিসে? আমার চিন্তার স্রোত যাহার মনঃক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতে পারে না, এবং আমি যাহার চিন্তার অংশী হইতে পারি না, আমার সহিত তাহার সুখ ও স্বার্থে পূর্ণসম্মিলন হইবে কেন? ইহা একবারের স্থলে সহস্রবার বলা যাইতে পারে, এবং যাঁহারা বিশিষ্ট যুক্তি ও বিশিষ্ট প্রমাণ বিনা একটি কথাও স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, ইহা তাঁহাদিগের নিকটও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া উপস্থাপিত হইতে পারে যে, একটি সুদৃঢ় সাম্রাজ্য গঠনের জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন, আমাদিগের এই ভারতভূমি তাহার কোন উপকরণেই দরিদ্র নহে। সাম্রাজ্যের এক উপকরণ ধন;—ভারতভূমি ধনে কুবেরের ভাণ্ডার বলিয়া ইতিহাসে প্রথিত। ইহার অভ্যন্তর হইতে কতই বা মণিমুক্তা, কতই বা হীরকাদি রত্নরাজি কত দেশে ও কত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে? আর কত জাতি যে ভারত-মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া সমৃদ্ধ ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে? ভারত এইক্ষণ দরিদ্র বটে,—যেখানে পূর্ব্বে মহোৎসবের হল-হলায় কর্ণ বধির হইত, সেখানে এইক্ষণ দুর্ভিক্ষের হাহাকার! মোগল ও পাঠান প্রভৃতি বহুজাতির লুণ্ঠনের পর লুণ্ঠনে এবং বহুসহস্র বৎসরের পরকীয় শোষণে ভারতের পুরাতন বৈভবের কিছুই এইক্ষণ আর নাই বলিলেও অতিবাদ হয় না। কিন্তু ভারতে তথাপি যাহা আছে, তাহা ইংলণ্ডাদি কতিপয় বিশেষ দেশ ভিন্ন অনেক দেশেরই কল্পনাতীত সম্পদ্। ভারত-ললনার কর্ণের দুল, কণ্ঠের মালা ও কেশের কৃত্রিম কুসুমে যে পরিমাণ মণিকাঞ্চন ব্যবহৃত হয়, তাহা গ্রীক প্রভৃতি নব্য রাজ্য সমূহের নিকট অদ্যাপি রাজার বৈভব।

সাম্রাজ্যের আর এক উপকরণ ভূমির শস্যশালিতা। ভারত-ভূমি আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্তমানে শস্যশালিনী কি না,—ভারতীয় শস্য বিংশতি কোটির উপর আরও বিংশতি কোটির অন্নসংস্থানে উপযুক্ত কি না, পৃথিবীর সমগ্র বণিগ্‌জাতি তাহার সাক্ষ্য দান করুক। সাম্রাজ্যের তৃতীয় উপকরণ বাহুবল, চতুর্থ উপকরণ বুদ্ধির বিকাশ, পঞ্চম উপকরণ সামাজিক উন্নতি,

ষষ্ঠ উপকরণ সাহিত্য এবং সপ্তম ও শেষ উপকরণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি। ভারতে কি এ সকল উপকরণেরও অভাব আছে? যে ভারত যোগীর চক্ষে পুণ্য-ক্ষেত্র, বীরের চক্ষে রণ-ক্ষেত্র এবং শাস্ত্রার্থদর্শী পণ্ডিতের চক্ষে সরস্বতীর বিলাস-ক্ষেত্র বলিয়া চিরকাল পূজিত হইয়া আসিতেছে;—যে ভারত মৃত হইয়াও অন্যান্য জীবিত জাতিকে জ্ঞান দান করিতেছে, এবং নিরস্ত্র হইয়াও প্রয়োগ-সময়ে অস্ত্র-নৈপুণ্যের প্রশংসাবাদ পাইতেছে, সেই ভারতের আজি এই দশা কেন?

ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই দুর্ব্বিষহ শোচনীয় অবস্থা কখনই এক কারণে ঘটে নাই। কিন্তু ইহাও অবধারিত সত্য যে, ভক্তির বিকার, বিজ্ঞানের অভাব, ধর্ম্মের বিচ্ছেদ, উপধর্ম্মের শাসন, শক্তির উপসনায় বিমুখতা, আদিরসের প্রাবল্য, অনুচিত বিলাস-প্রিয়তা এবং জাতীয় একতার পরিপন্থি-স্বরূপ অনন্ত সূত্রে জড়িত বিচিত্র এক জাতি-বন্ধন প্রভৃতি যে সমস্ত কারণ একত্র মিলিত হইয়া এই অচিন্তনীয় অধঃপাত ঘটাইয়াছে, ভারত-বাসীর ভাষাগত পার্থক্যও তাহার মধ্যে একটি প্রধান কারণ বলিয়া গণনীয়। যে অবধি সংস্কৃত-সম্ভবা প্রাকৃত-ভাষা গৌড়ী, লাটী, শৌরসেনী, পালি ও মাগধী প্রভৃতি বহুপ্রবাহে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই অবধিই ভারতে ভাষা-পার্থক্য ঘটিয়াছে;—আর, যে অবধি ভাষায় এইরূপ পার্থক্য, সেই অবধিই স্বার্থের এক নূতন পার্থক্য সমুদ্ভূত হইয়া একই ভারত ভূমিকে বহুদেশে ও বহুরাজ্যে বিভাগ করিয়াছে, এবং পরস্পর সহানুভূতির অন্তর্মূলে আঘাত করিয়া জাতীয় সামর্থ্যের ভিত্তি ভাঙিয়াছে। মান্দ্রাজী ও মহারাষ্ট্রী উভয়েই এক-বৃক্ষ-সম্ভূত; কিন্তু ভাষার পার্থক্যে একে অন্যের নিকট অপরিচিত, অথবা উভয়ে উভয়ের চির-শত্রু। অযোধ্যাবাসী ভাষার পার্থক্যে পঞ্জাবীর প্রতিকূলে চালিত হইতেছে, এবং পঞ্জাবী সেনা দাক্ষিণাত্য-নিবাসী হিন্দু-সন্তানের রুধির-ধারায় অস্ত্র ধুইতেছে। যেখানে কেহই কাহারও কথা বুঝে না, সেখানে বিশেষ প্রয়োজন বিনা কে কার বিপত্তির ভার বহন করিতে সম্মত হইবে?

বৈভবের বিভেদ এবং ব্যবসায়াদির পার্থক্যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক স্বার্থবিরোধ জন্মে তাহা ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রাক্‌কালীন ফ্রান্স এবং অধুনাতন আয়র্লণ্ডে দেখা যাইতে পারে। ফ্রান্সে ধনী ও শ্রমজীবী এই দুই শ্রেণির লোক দুই পৃথক্ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ধনীর স্বার্থ যে, শ্রমজীবী দরিদ্রেরা রাজ্যের কর-ভার ও ক্লেশ-ভার বহন করুক,—বৃষ্টির জলে আর্দ্র ও সূর্য্যের উত্তাপে দগ্ধ হইয়া,—তুষারে ও ঝটিকায়, শীতে ও গ্রীষ্মে সমান ভাবে পরিশ্রম করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যে তনুপাত করুক; আর সংসারে সুখের ও ভোগ-বিলাসের যত কিছু সামগ্রী আছে, তাহা বিনাশ্রমে ও বিনা যত্নে তাঁহাদিগের প্রমোদ-গৃহে আসিয়া রাশীকৃত হউক। শ্রমজীবী দরিদ্রের স্বার্থ যে, এই অকর্ম্মণ্য গন্ধকীটের বংশ মনুষ্য-নিবাস হইতে একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাউক, এবং তাহাদিগের শ্রম-ভার, কর-ভার ও দুর্ব্বহ ক্লেশের ভার সেই সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত

লঘু হইয়া পড়ুক। এই স্বার্থ-বিরোধের ভীষণ বিলোড়নেই ফরাসি রাষ্ট্র-বিপ্লব, এবং ইহারই মৃদু-হিল্লোলে আয়র্লণ্ডের বর্ত্তমান বিপদ। পৃথিবীর কোন্ দেশ এইরূপ বিরোধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে? বিরোধিপক্ষদিগের একদেশে নাম লর্ড ও পীপল্, আর একদেশে নাম ভূস্বামী ও প্রজা;—এক স্থলে তাঁহারা স্বেচ্ছাচার রাজ-পুরুষ ও প্রাকৃত সমাজ বলিয়া বিচ্ছিন্ন, আর এক স্থলে তাঁহারা বণিক্ ও কৃষক, অথবা যাজক ও যোদ্ধা বলিয়া পরস্পর-বিভিন্ন। কিন্তু বিরোধের আকৃতিতে এইরূপ প্রভেদ থাকিলেও প্রকৃতি ও গতি সর্ব্বত্রই সমান।

এই প্রকারে দৃষ্ট হইবে যে, মানব-জাতির ভাগে ভাগে বিভিন্ন স্বার্থ এবং সেই স্বার্থভেদই তাহাদিগের একতা-সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, একতা অথবা জাতীয় এক-প্রাণতাই বিপন্ন দুর্ব্বলের প্রাণ-বল লাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু এইরূপ স্বার্থ-বিরোধে,—স্বার্থের আঘাত-প্রতিঘাতে কোন্ মন্ত্রে মনুষ্য মিলিত হইবে? যাহারা একে অন্যের শত্রু বলিয়া স্পষ্ট পরিচিত, কোন্ সূত্রে তাহারা প্রয়োজনের সময়ে প্রাণে প্রাণে গ্রথিত রহিবে? জগতে এমন কি আছে, যাহার প্রভাবে অহি-নকুল এবং শার্দ্দূল ও মহিস, আর্য্য ও অনার্য্য এবং শ্বেত-কৃষ্ণ সমান উদ্দেশ্যে বদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের শক্তি বর্দ্ধন করিবে?

ধর্ম্মের নিকট এই কূট-সমস্যার সদুত্তর নাই। ধর্ম্ম আপনি অভিন্ন হইলেও মনুষ্যের নিকট অভিন্ন রহিতে অসমর্থ। মনুষ্যের ধর্ম্ম সম্প্রদায়-বদ্ধ ও পৃথিবীর ধূলি-মিশ্রিত;—এবং ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সেই জন্যেই ধর্ম্মে ও ধর্ম্মে চির-বিরোধ। যে ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত, সাম্প্রদায়িক পতাকায় পরিশোভিত, এবং সাম্প্রদায়িক ঢক্কায় প্রচারিত, তাহা কি কখনও জাতি-বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে একতার বন্ধনে বাঁধিতে পারে? তবে আশা কোন এক অলৌকিক অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে? তাদৃশ বাঞ্ছাকল্পতরু বিশ্বজনীন ধর্ম্ম এ মনুষ্য-লোকে কোথায় মিলিবে? ইতিহাসে এইরূপ দেখা যায় যে, পৃথিবীর কোন কোন ধর্ম্ম, উহার প্রথম-প্রচার-সময়ে একতার একটি আশ্চর্য্যভাব সৃষ্টি করিয়া ও কতকগুলি মনুষ্যের মনঃ-প্রাণ এক-সূত্রে গাঁথিয়া লইয়া, যাহা অসাধ্য বলিয়া আকাঙ্ক্ষার বাহিরে ছিল, সেই নূতন একতার নূতন বলে তাহা অবলীলায় সংসাধন করিয়াছে, এবং যে সকল প্রতিবন্ধক পর্ব্বতের ন্যায় দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রতীয়মান হইত, পতঙ্গের মত তাহা নখরে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কিংবা তৃণের মত তাহা ভাসাইয়া নিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম-বন্ধনের একজাতীয়তা কোন্ দেশে কতকাল স্থায়ী রহিয়াছে? কোন্ ধর্ম্মের উপাসকেরা আপনাদিগের অভীষ্টবর্ষে দীর্ঘকাল ঐরূপ জাতীয় একতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছে?

যখন মহাত্মা শাক্যসিংহ ভারতের সকল ধর্ম্মকে ভাঙিয়া চুরিয়া একধর্ম্ম করিবার অভিলাষে বৈদিকধর্ম্ম, পৌরাণিকধর্ম্ম ও আরও বহুবিধ উপধর্ম্মের উপর বজ্রের মত আঘাত করিতে লাগিলেন, এবং সেই বজ্রাঘাতের প্রতিধ্বনিতে ভারত-ভূমি কাঁপিয়া উঠিল, তখন সকলেরই মনে আশা হইল যে, এত

দিনে ভারতবাসী এক-প্রাণ হইবে;—ভারতের সহস্র জাতি ও সহস্রাধিক অন্তর্জ্জাতি এক জাতিতে পরিণত হইয়া আত্ম-কলহ ও স্বগৃহ-বিরোধের মূল পর্য্যন্ত উৎসারণ করিবে;—আর, এই ধর্ম্ম-গত একতাই রাজনৈতিক একতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গিরি-নদী-সমুদ্র-রক্ষিত ভারত-বক্ষকে শত্রুর দুরধিগম্য দুর্গ করিয়া তুলিবে। কিন্তু কোথায় সেই বৌদ্ধ-একতা ও একীভূত শক্তির অবতার স্বরূপ বুদ্ধ-শিষ্য অশোক; আর কোথায় শোক-জর্জ্জরিত, শতধাভিন্ন ভারত-সাম্রাজ্য? কোথায় সেই অহিংসার অভেদ-জ্ঞান, আর কোথায় হিংসা-জনিত শত শাখা, শত সম্প্রদায়? বৌদ্ধধর্ম্মের সেই ভাবের কিছুই কি আর আছে? পৃথিবীর সমস্ত বৌদ্ধ অথবা ভারতের সমস্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী কি এইক্ষণ এক-জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়? যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণপ্রদ সহানুভূতিতে এক-রাজ্যবৎ গঠিত হইয়াছিল, তাহারা কি স্বার্থে ও শক্তিতে এখনও এক? তাহাদিগের একটি যখন বিনষ্ট কি বিদলিত হয়, আর একটি কি তখন তাহার উদ্ধারের জন্য হস্তাবলম্ব প্রদান করে? অথবা, তাহারা একে যখন প্রবলতর প্রতাপের শাসনে অন্যের প্রতিকূলে চালিত হয়, ধর্ম্মের বন্ধন কি তাহাতে একটুকুও প্রতিবন্ধকতা দেয়?

যখন সাধক-সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় দীন-সখা খৃষ্ট, ইহুদীয় শৈল-শিখরে স্বর্গাগত দেবতার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, বাহু তুলিয়া উপদেশ দিলেন যে, সাধু অসাধু, ধনী ও নির্দ্ধন, সবল ও দুর্ব্বল, সম্রাট্ ও ভিখারী, সকলেই জগন্নিয়ন্তার সমান সন্তান, তখন জগতে এক যুগান্ত উপস্থিত হইল; এবং পৃথিবীর অসংখ্য জাতি সেই জীবন্ত উপদেশে উন্মাদিত হইয়া, জাতি-মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টের চিরস্মরণীয় নামে আপনাদিগকে এক-জাতি করিয়া তুলিল। যে খৃষ্টধর্ম্ম সর্ব্বত্র উপহসিত ছিল, তাহা সর্ব্বত্র আদৃত ও পূজিত হইতে লাগিল। যাহা দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরেও স্থান পাইত না, তাহা রাজার প্রাসাদ কাড়িয়া লইল,—রাজ-মুকুটের মধ্য-স্থলে ক্রুশ-চিহ্নে শোভা পাইল। কিন্তু খৃষ্ট ও সেই খৃষ্টীয় একতা এইক্ষণ কোথায়? খৃষ্টধর্ম্মের এইক্ষণকার এই অনন্ত অবান্তর-ভেদ এবং সেই ভেদ-জন্য বিভিন্ন স্বার্থ কোথা হইতে আসিল? ধর্ম্ম যদি সত্য সত্যই কতকগুলি জাতিকে স্বার্থে এক, এবং দীর্ঘকালের জন্য এক-জাতি করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে, তাহা হইলে খৃষ্টীয় ইয়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই প্রত্যেক জাতির প্রতিকূলে অহর্নিশ সশস্ত্র রহিতেছে কেন? যে স্থানের উপাসনা-গৃহে শান্তিমূলক একতার উপদেশ, সেই স্থানের আকাশ-মণ্ডল কেন অশান্তির অনলে নিত্য-ধূমিত? যে শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরেই ভ্রাতৃভাব ও প্রেমের অমৃত, সেই শাস্ত্রের প্রত্যেক কার্য্যেই কেন বৈর-বিদ্বেষ ও গরলের উদ্গার?

ধর্ম্মের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মই পার্থিব রাজ-নীতির ধর্ম্ম (?) বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। উহা প্রীতি ও পবিত্রতার অংশে যে পরিমাণে হীন, রাজনীতির একতার অংশে সেই পরিমাণে ওজস্বল। কিন্তু মুসলমানধর্ম্মও আত্ম-পর-ভেদে তথাবিধ একতা সম্পূর্ণরূপে

রক্ষা করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা সিয়া ও সুন্নি এই দুই সম্প্রদায় অথবা দুই পৃথক্ জাতিতে বিভক্ত হইয়া শত্রুর নিকট দুর্ব্বল হইয়াছে, এবং এই দুই প্রধান সম্প্রদায় হইতে আরও বহু অপ্রধান সঙ্কর সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া মুসলমান জাতির ইতিহাস-কীর্ত্তিত আতঙ্কজনক শক্তিকে অধঃপাতের দিকে টানিতেছে। সুতরাং পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাবিত হইয়াছিল, বোধ হয় সেই রূপই প্রমাণিত হইয়াছে যে ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম উন্নতি, সমাজ-শুদ্ধি ও মুক্তিপথের অদ্বিতীয় সহায় হইলেও, এক-জাতীয়তার দৃঢ় ভিত্তি নহে,—এবং ধর্ম্ম-জনিত একতা কিয়ৎকালের জন্য প্রমত্ত বহ্নি-শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত রহিলেও উহা ঝটিতিই আবার নিভিয়া যায় বলিয়া স্বার্থমাত্র-পরায়ণা চির-ক্ষুধাতুরা রাজনীতির উপযোগিনী নহে।

ধর্ম্ম যাহা পারেন নাই, আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান কি তাহা সংসাধন করিতে পারিবে? সরোবরের শীতল জলেও যে তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয় নাই, দার্শনিক মরু-ক্ষেত্রের মৃগতৃষ্ণিকায় কি তাহা পূর্ণ হইবে? ফলতঃ যে সমাজ-বিজ্ঞান যাজক ও পূজক, কৃষক ও বণিক, যোদ্ধা ও পণ্যজীবী, রাজা ও প্রজা এবং অভাব ও প্রভাবকে এক-স্বার্থে সম্মিলিত করিবে, সে সমাজ-বিজ্ঞান এখনও সৃজিত হয় নাই। যে সমাজ-বিজ্ঞান তামিলী ও তৈলঙ্গী, মাগধী ও মহারাষ্ট্রী, নেপালী ও ব্রজবুলী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে এক ভাষায় মিশাইবে,—শাক্ত ও বৈষ্ণব, শৌর ও গাণপত্য, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ এবং হিন্দু ও যবনকে এক উদ্দেশ্যে চালনা করিবে,—যে সমাজ-বিজ্ঞান শক্তির তারতম্য ও স্বার্থের ভেদ উন্মূলন করিয়া সর্ব্ববিধ শক্তি ও সর্ব্বপ্রকার স্বার্থকে এক বন্ধনে বান্ধিয়া লইবে, তাহা এখনও মনুষ্য-বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় নাই।

ধর্ম্ম ও সমাজ-বিজ্ঞানের পর রাজনীতি। স্বার্থের সূক্ষ্মার্থদর্শিনী রাজনীতি এই একতা বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে অন্যরূপে উত্তর করিয়াছেন। রাজনীতি জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম্ম, পর্ব্বতাদির ব্যবধান ও ব্যবসায়াদির পার্থক্য-জনিত স্বার্থের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইয়াছেন; এবং এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থ রূপান্তরে পরিবর্ত্তিত হইলেও যে একবারে বিলুপ্ত হইবে না, ইহা স্বীকার করিয়া, সমান-স্বার্থের সমন্বয়ের জন্য স্বার্থেরই মধ্য হইতে অন্য এক পথ দেখাইয়াছেন। যখন চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধনকে সপরিবারে বন্ধন করিয়া আপনার অধিকারে লইয়া যাইতে উদ্যোগী হয়, তখন কণিকরূপী কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের মন্ত্র-শিষ্য, রাজনীতি-বিশারদ যুধিষ্ঠির তাঁহার অনুজবর্গকে দুর্য্যোধনের পরিত্রাণার্থ এই স্মরণীয় কারিকায় উপদেশ দেন যে,—

"বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চ শতানিচ।
পরেষু প্রতিপন্নেষু পঞ্চোত্তর-শতানিচ॥"

অর্থাৎ আমরা যে পাঁচ, আমরা পাঁচই আছি, এবং দুর্য্যোধনেরা যে একশত, তাহারাও ঐ একশতই থাকিবে; কিন্তু যখন পরের সহিত বিরোধ ঘটে, তখন আর আমরা পাঁচ ও একশত এইরূপ পৃথক্ নহি;—তখন আমরা উভয়ে মিলিয়া একশত পাঁচ।

এই প্রসিদ্ধ কারিকাটি আত্ম-পর, শত্রু-মিত্র ও বিভিন্ন স্বার্থের সাম্য-বিধায়িনী

আমরা এই হেতু ইহাকে সাম্য-কারিকা বলি। আর, ইহাতে দয়ার কথা, ধর্ম্মের কথা, স্বার্থ-ত্যাগ অথবা উদারতার কথার গন্ধমাত্রও নাই বলিয়া আমরা ইহাকে কণিক-নীতি নামে নির্দ্দেশ করি। যাহার প্রত্যেক বাক্য তুষানলের মত হাড়ে হাড়ে জ্বলিতেছে, ইহাতে তাহার প্রতি প্রেম! যাহার নিপাত-কল্পে স্থির-সংকল্প, ইহাতে তাহার সহিত মৈত্রীর বিধি। জগতে বাল্মীকির সময়ে এ নীতি প্রচলিত ছিল না;—বাল্মীকি এবং বাল্মীকির আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্র ইহা স্বপ্নেও ভাবিয়া যান নাই। খলতার প্রতিমূর্ত্তি লঙ্কাধিপতি, খলতাতেও এমনই সরল ছিল যে, এ নীতি তাহার মুখ হইতেও বাহির হয় নাই। ইহা সর্ব্বাংশে কণিকের উপযুক্ত, এবং যে সময়ে কণিক-নীতির ক্রীড়ারম্ভ, সেই সময়েই ইহার প্রথম উদ্ভাবনা। এই উপদেশ-কথা আপাত-শ্রবণে সাধারণ নীতি-কথার ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও ইহার প্রকৃত অর্থ অতি গভীর। যদি ব্যক্তি-গত উদাহরণ-যোগে অর্থ করা যায়, তাহা হইলে ইহার এইরূপ অর্থ হয় যে,—কৌরব ও পাণ্ডব নিজস্ব সম্পর্কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, এবং তাহাদের এই বিচ্ছেদ কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না; অতএব তাহাদের স্বার্থের পার্থক্য ও পার্থক্যের বিরোধ যেমন আছে, তেমনই থাকুক। কিন্তু যখন কুরুপাণ্ডবের উভয় হইতেই পৃথক্ কোন প্রবলতর শক্তি তাহাদিগের একটিকে কবলিত করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান করে,—যখন ঐরূপ কোন প্রবলতর শক্তির আকস্মিক আক্রমণে তাহাদিগের একতর পক্ষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন কৌরব ও পাণ্ডব সাধারণ-স্বার্থে এক।

ব্যক্তিগত উদাহরণ পরিত্যাগ করিয়া সার-নিষ্কর্ষ করিলে উল্লিখিত নীতি-কারিকার এইরূপ মর্ম্মোদ্ধার হয় যে, যাহারা জাতির পার্থক্যে, ধর্ম্মের পার্থক্যে অথবা স্বার্থের অন্যবিধ পার্থক্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া একত্র অবস্থান করে, তাহারা নিজ নিজ পৃথক্ স্বার্থ সম্বন্ধে কখনও এক হয় নাই, এবং একের দ্বারা অন্যে সর্ব্বতোভাবে অভিভূত না হইলে,—সেক্সন ও নরমাণের মত একে অন্যের অঙ্গীভূত হইয়া না গেলে, কখনও এক হইবে না। তাদৃশ পার্থক্যের অবস্থায়, পরস্পর পৃথক্ সম্পর্কে, আত্মবলই তাহাদিগের আত্মাবলম্ব, এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি পূজনীয় সাধন-যোগে সেই বলের দৈনন্দিন বৃদ্ধিতেই তাহাদিগের স্বতন্ত্র পুষ্টি ও প্রাণ। কিন্তু যখন ঐরূপ বিচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থ প্রবলতর স্বার্থের গ্রাসে পড়ে, তখন সেই অংশে সমান বলিয়া ঐ সকল অসমান স্বার্থ এক,—এবং অসমানের এইরূপ সাম্য কিংবা সমন্বয়-সাধনই রাজনৈতিক-প্রীতি ও সমষ্টিগত অস্তিত্ব-রক্ষার পথ। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে সকল অসভ্যজাতির অস্তিত্ব-লোপের উদাহরণ দিয়াছি, যদি সেই সকল জাতিও এই কণিক-নীতির উপদেশে অসভ্য তাতার ও অসভ্য টিয়ুটনদিগের ন্যায় অঙ্গে অঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ রহিত, তাহা হইলে কি তাহারা কখনও সমূলে বিনষ্ট হইত? পৃথুরায় ও জয়চন্দ্র এই নীতি বুঝেন নাই বলিয়াই এদেশে সাহাবুদ্দিনের অধিকার; এবং সুইজরলণ্ডের ক্যাণ্টনসমূহ এই নীতি বুঝিয়াছিল

বলিয়াই, সমুদ্রের মধ্যে শৈলশৃঙ্গের মত, আজি পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত।

পৃথিবীর মধ্যে ইয়ুরোপই ইদানীং সজীব রাজনীতির বিহার-ভূমি। অন্যান্য দেশে গ্রাস আছে, মুক্তি নাই। ইয়ুরোপে গ্রাস ও মুক্তি উভয়ই আছে, এবং উভয়েরই পৃষ্ঠদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সজীব-তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে। ইয়ুরোপে যাহাকে শক্তি-সাম্য* বলে, তাহা এইরূপ স্বার্থ সমন্বয় অথবা রাজনৈতিক প্রীতির নামান্তরমাত্র। প্রথিতনামা রিস্‌লু, স্বয়ং ক্যাথলিক কার্ডিনাল হইয়াও, এই নীতির অনুরোধে জর্ম্মণির প্রটেষ্টাণ্টদিগকে অষ্ট্রিয়ার অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন; ইহারই শাসনে চতুর্দ্দশ লুইর দর্প-নাশ, এবং অদ্যাপিও এই নীতিরই বিবিধ ব্যবস্থা ইয়ুরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যনিচয়ের শক্তি-রক্ষা ও সমগ্র ইয়ুরোপের শান্তি-রক্ষার বীজ। ইয়ুরোপের রাজবর্গ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এই নীতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সেই বিস্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত ষোড়শ লুইর শিরশ্ছেদে। কিন্তু যখন বিপ্লব-নায়ক বোনাপার্টি ইয়ুরোপের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত রাজ্যকেই শোষণ ও উদরসাৎ করিবার অভিলাষে জিহ্বা প্রসারণ করেন, তখন ইয়ুরোপের শত্রু মিত্র, কৌরব পাণ্ডব, বিভিন্ন-ভাষাবাসী, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই আবার এক; এবং সেই একতাবদ্ধ স্বার্থ-সমন্বয়,—সেই রাজনৈতিক প্রীতির প্রভাবে ওয়াটর্লুর অচিন্তিত-পূর্ব্ব ফল। বৃটন ও ফরাসিতে চির-বিদ্বেষ, অথচ শিবাস্তপুলে উভয়ে উভয়ের পরম সুহৃৎ;—এবং জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়া স্যাডোয়ার শক্তি-পরীক্ষার পরক্ষণ হইতেই পরস্পর পরস্পরের প্রাণ-সখা। রুশ ও বৃটন উভয়ই খৃষ্টধর্ম্মের উপাসক, এবং প্রাচীন প্রথানুসারে তুর্ক ও আফগান এই উভয় উভয়ের সমান শত্রু। কিন্তু তথাপি এই নীতির অনুশাসনে খৃষ্টীয় রুশ তুর্কের বিপক্ষ ও আফগানের স্বপক্ষ, এবং খৃষ্টীয় বৃটন তুর্কের স্বপক্ষ ও আফগানের বিপক্ষ।†

পুরাতন গ্রীকরাজ্য যখন জীবিত ছিল, তখন স্পার্টা ও এথেন্স প্রভৃতি খণ্ডরাজ্যনিচয়, স্বগৃহে পরস্পর বিরোধি রহিয়াও, পরকীয় শক্তির প্রতিরোধ-সময়ে রাজনৈতিক প্রীতির বন্ধনে এইরূপ এক হইয়া যাইত; এবং এখনও যে সকল রাজ্য জীবিত আছে,—অথবা নূতন জীবন লাভ করিতেছে, এই প্রকারের একতাই তাহাদিগের জীবনীশক্তির প্রস্রবণ হইয়া রহিয়াছে। রাজনৈতিক একজাতীয়তা লাভের আর কোন উপায় আছে কি না, ইতিহাস তাহা জানে না;—পাঁচ আর একশত পাঁচ এই গণনা ভিন্ন আর কোন গণনায় সন্ধি-বিগ্রহ ও শান্তি-বিপ্লবে সকলের স্বার্থ একস্বার্থে মিলে কি না, বুদ্ধিও তাহা অবধারণ করিতে পারেনা। ইহা বিশুদ্ধ-নীতির বিশুদ্ধ বিচারে যত কেন দূষিত হউক না, সংসারের কুটিল-চক্রে এই কণিক-নীতিই রাজনীতির একমাত্র গতি!

---

* Balance of Power. ইহাতে শত্রু-মিত্র-বিচার নাই; বিচার একমাত্র তৎকালীন স্বার্থের।

† আজিকালি যে বাতাস একটুকু ফিরিয়া আসিতেছে, তাহার অন্য কারণ আছে।

প্রতাপসিংহ।

(৫ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর।)

(৫ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর।)

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

সন্ধ্যাকালে চাঁদেরী নদীতীরস্থ মৈর্ত্ত দুর্গদ্বারে যুবরাজ অমরসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। চাঁদেরী নদী সুপ্রশস্ত, কিন্তু প্রতাপের কঠিন শাসনে তদুপরি একখানি নৌকা নাই। চতুর্দ্দিক জনশূন্য। জনশূন্য নদীতীরে চতুর্দ্দিকস্থ ঘনারণ্য মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত দুর্গ ভয়ানক দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। সেই দুর্গ সংস্করণ ও তাহার যথাবশ্যক ব্যবস্থা করিবার ভার অমরসিংহের উপর অর্পিত হইয়াছে। কুমার দুর্গদ্বারে সমাগত হইবামাত্র দুর্গরক্ষকেরা সসম্মানে আলোক জ্বালিয়া তাঁহাকে দুর্গাভ্যন্তরে লইয়া গেল। দুর্গ মধ্যে প্রবেশিয়া অমরসিংহের বিস্ময় জন্মিল। তিনি দেখিলেন, পার্শ্বে একখানি শিবিকা, কতকগুলি বাহক ও কয়েকজন রক্ষক-বেশ-ধারী পুরুষ রহিয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে দুর্গরক্ষকগণকে জিজ্ঞাসিলেন,—

'এ সকল কি?'

দুর্গরক্ষকেরা বিষম বিপদে পড়িল। তাহারা প্রভুর অজ্ঞাতসারে দুর্গমধ্যে কাহাকেও স্থান দিয়াছে; তচ্ছ্রবণে প্রভুপুত্র বিরক্ত হইতে পারেন বিবেচনায় নিস্তব্ধ রহিল। কুমার পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—

'এ কি ব্যাপার আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছ কেন?' সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ রক্ষক অগ্রসর হইয়া করজোড়ে কহিল,—

'অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন। নাথদ্বার নগরস্থ রাজা রঘুবর রায়ের দুহিতা শৈলম্বর গমন করিতেছেন। এই স্থানে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, অথচ নিকটে আর থাকিবার স্থান নাই। তাঁহাদিগকে এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া আমরা এই দুর্গে তাঁহাদের রাত্রিযাপন করিতে দিয়াছি। তাঁহারা এক প্রান্তে আছেন।' অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

'তাঁহারা কয়জন আছেন?'

'একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ও একজন সঙ্গিনী মাত্র।'

'রাজা রঘুবর রায়' এই শব্দটি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া কুমার অমরসিংহ দুর্গের দক্ষিণ দিকস্থ একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপবেশন করিয়া মনে মনে কহিলেন,—'রাজা রঘুবর—রাজা রঘুবর ইদানীং মিবারের রাজমুকুটের বিশেষ অনুগত ছিলেন না।' ক্ষণেক পরে আবার

ভাবিলেন,—'বিশেষ শত্রুও ছিলেন না; কিন্তু তিনি তো এখন আর এ জগতের লোক নহেন।' তাহার পর কুমার প্রধান দুর্গরক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে দুর্গ সম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ করিলেন এবং পরদিন প্রাতেই যাহাতে আবশ্যকীয় কার্য্য সমস্ত আরব্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে করিতে ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। তাহার পর রক্ষক ভৃত্যাদিকে বিদায় দিয়া কুমার শয়ন করিলেন। কিন্তু গ্রীষ্মাতিশয্য হেতু নিদ্রা আসিল না। অনর্থক নিদ্রার সাধনা করা রাজপুতজাতির স্বভাব নহে। কুমার গাত্রোত্থান করিয়া বায়ুসেবনার্থ ছাতের উপর আসিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার নাই। বিমল জ্যোৎস্না এখন তরল জ্যোতিঃ ঢালিয়া সমস্ত পদার্থ 'মলম্বা অম্বরে' আবরিত করিয়াছে। প্রকৃতি শান্ত। সম্মুখে চাঁদেরী নদী গৈরিক উপকূল বিধৌত করিতে করিতে চন্দ্রমা ও অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া অবিশ্রান্তভাবে ধাইতেছে। অমরসিংহ সেই ছাতের উপর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন নাথদ্বার-নগরনিবাসিনী কুমারী উর্ম্মিলার চিন্তায় তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট; সুতরাং কোন দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নাই। একবার তিনি পার্শ্বদিকে নেত্রপাত করিলেন। সেই নেত্র তখন এক রমণীর মূর্ত্তি বহন করিয়া তাঁহার উদ্বোধন করাইল। দেখিলেন— অদূরে যুবতী স্ত্রীলোক। বুঝিলেন—দুর্গাশ্রিতা রাজা রঘুবরের কন্যা বায়ু সেবনার্থ বেড়াইতেছেন। তখন অমরসিংহের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিল—'কুমারী উর্ম্মিলাও তো নাথদ্বারনিবাসিনী। তবে তিনিই কি রঘুবরের কন্যা?' মীমাংসা হইল—'হইতে পারে।' তাহার পর আশঙ্কা,—'তবে কেন? পিতা রঘুবরের নামে সন্তুষ্ট নহেন।' অমরসিংহের হৃদয় শুষ্ক, অন্তর শূন্য হইয়া গেল। তাহার পর ভাবিলেন—'অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে,—আমি সে দেবীমূর্ত্তি হৃদয় হইতে অন্তরিত করিব না।' কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল,—'ঐ রমণী উর্ম্মিলা।' তাঁহার চরণ যেন অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে সেই দিকে লইয়া চলিল। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া কুমার বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার আশঙ্কা সত্য—সেই কামিনী উর্ম্মিলা! অমরসিংহের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল; পৃথিবী শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে দুইবার কুমারী উর্ম্মিলার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে দুইবারই উর্ম্মিলা যোদ্ধৃবেশে সজ্জিতা ছিলেন। অদ্য তাঁহার বেশ অন্যবিধ। শেল, অসি, চর্ম্ম প্রভৃতির পরিবর্ত্তে হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার সমস্ত অদ্য তাঁহার শরীরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহার বদনে এক্ষণে শান্তি, সরলতা, পবিত্রতা ও অসামান্য বুদ্ধি ক্রীড়া করিতেছে। কোমলতা তাঁহার সকল অঙ্গে মাখা। কে বলিবে, এই ভুবনমোহিনী গভীর রজনীতে, একাকিনী, ঘনারণ্য মধ্যে বর্ষাহস্তে ভ্রমণ করিতে পারেন; অথবা কে বলিবে যে, এই কোমলাঙ্গীর কমনীয় কায়ায় অলস্ত অলঙ্কার অপেক্ষা রণায়ুধ অধিক শোভা পায়?

বহুক্ষণে অমরসিংহ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—

'কুমারি! অদ্য এস্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।'

উর্ম্মিলা ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'আপনি এখানে ছিলেন, তাহা তো কেহই বলে নাই।'

'তোমরা দুর্গে আগমন করার পর আমি আসিয়াছি। তোমার সহিত সাক্ষাতের আশায় আমি কতই কষ্ট করিয়াছি কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য, কিছুতেই কৃতকার্য্য হই-নাই।'

উর্ম্মিলা বলিলেন,—

'আপনি যে কৃপা করিয়া আমাকে মনে রাখিয়াছিলেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।'

অমরসিংহ বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বলিলেন,—

'এতদিনে বুঝিতে পারিলাম, তুমি স্বর্গীয় রঘুবররায়ের দুহিতা। কিন্তু তুমি যাহারই দুহিতা হও, মিবারের তুমি পরম হিতৈষিণী।'

সুন্দরী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন,—

'যুবরাজ! আমি তো আপনাদের চক্ষে পতিতা; কারণ আমি ৺ রঘুবর রায়ের দুহিতা। জনসাধারণের বিশ্বাস, আমার পিতা মিবারের রাজশ্রীর অনুকূল ছিলেন না; সুতরাং মহারাণা তাঁহাকে পতিত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সাধারণে যাহাই বলুক এবং আপনারা যাহাই ভাবুন, আমার বিশ্বাস আমি মুক্তকণ্ঠে জগতকে জানাইব। আমার বিশ্বাস যে, পিতৃদেবের হৃদয়ে রাজভক্তি বা মিবারের কল্যাণকামনার কিছুই ক্রটি ছিল না। সাধারণে যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলে, পিতার তাহা তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক ছিল। তবে তাঁহার এক বিষম ভ্রান্তি ছিল। তিনি জানিতেন, শত চেষ্টাতেও আর মিবারের অভ্যুদয় হইবে না; মিবারের পতন আরম্ভ হইয়াছে, ইহার ক্রমে অবসান হইবে। এ সময়ে ইহার প্রতিকূল চেষ্টা করা, বালির বন্ধন দ্বারা প্রখর স্রোতস্বিনীর গতিরোধ করার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সকল চেষ্টায় উদাসীন ছিলেন। অদৃষ্টের গতিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তিনি তাহারই নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিষম বিশ্বাসই তাঁহার ঔদাসীন্যের হেতু এবং মহারাণার সহিত মনোমালিন্যের কারণ। কিন্তু এ কথা এখন কাহাকে বলিব? কে এখন এই কথা বিশ্বাস করিবে?'

কুমার বলিলেন,—

'কেনই বা না বিশ্বাস করিবে? আমি কখন শুনি নাই, বা কেহ কখন শুনে নাই যে, তিনি আমাদের কখন কোন অনিষ্ট করিয়াছেন।'

কুমারী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—

'লোকে বিশ্বাস করিবে না—মহারাণা একথায় কর্ণপাত করিবেন না। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায়া পিতৃহীনা কুমারী এ বিশ্বাস বিদূ-

রিত করিবেই করিবে। এই মনোমালিন্য যুবরাজ! আমার দ্বারাই অবসিত হইবে। আমি দেশের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ বিক্রীত করিয়াছি, দেশের হিতার্থে আমি সকল ভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি, যবন-বধই আমি জীবনের সারব্রত করিয়াছি, এবং শাণিত লৌহই এদেহের প্রধান ভূষণ বলিয়া স্থির করিয়াছি। যুবরাজ! ইহাতেও কি মহারাণা বুঝিবেন না; ইহাতেও কি তিনি সদয় হইবেন না। যদি ইহাতেও তাঁহার করুণা লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহার চরণে এই ক্ষুদ্রপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অদম্য রাজভক্তির প্রমাণ দিয়া যাইব। রাজপুত্র! তখনও কি লোকে বলিবে না যে, রঘুবর রায়ের দুহিতার দেহে অতি পবিত্র রাজভক্ত শোণিত প্রবাহিত ছিল?'

অমরসিংহ বলিলেন,—

'যখন তোমার এই অনির্ব্বচনীয় গুণগ্রাম মহারাণার গোচরে আসিবে, তখন তোমাকে তিনি আরাধনা করিবেন। এরূপ অকৃত্রিম রাজভক্তি, এরূপ আন্তরিক স্বদেশানুরাগ কে কবে কোথায় দেখিয়াছে? আমি জানি তুমি মানবী নহ, তুমি দেবী। তোমার যে সকল উচ্চ মনোবৃত্তি ঈশ্বরেচ্ছায় আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, রাজপুতের নিকট তাহা অতিআদরের ধন। উর্ম্মিলে! আমি আমার কথা বলিতেছি—আমি তোমাকে আজীবন কাল পরম শ্রদ্ধা করিব এবং তোমার ঐ মূর্ত্তি আমি যাবজ্জীবন হৃদয়ে বহন করিব।'

কুমারী লজ্জাহেতু বদন বিনত করিয়া নীরব রহিলেন। অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

'শুনিলাম তুমি শৈলম্বর যাইতেছ। শৈলম্বররাজ তোমার মাতুল, তাহা আমি জানি। তিনি মহারাণার বিরাগ-ভয়ে তোমাদের সহিত সম্পর্ক এতদিন এক প্রকার উচ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়। এখনও কি তাঁহার সেই ভাব আছে?'

কুমারী বলিলেন,—

'যে কারণে তাঁহার মহারাণার বিরাগের ভয় সে কারণই আর এ জগতে নাই, সুতরাং মাতুলের আর সে ভাবও নাই। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর হইতে মাতুল আমার অভিভাবক। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা নাই। তিনি নিঃসন্তান। আমি মাতুল ও মাতুলানীর বাৎসল্যের একমাত্র স্থল। আমি এক্ষণে তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে সেই স্থানেই গমন করিতেছি।'

অমরসিংহ আহ্লাদসহ কহিলেন,—

'ভালই হইল, তোমাকে যে অতঃপর সময়ে সময়ে দেখিতে পাইব, তাহার ভরসা হইল। মহারাণার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ শৈলম্বররাজ আমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। তাঁহার আবাস আমি পরের আবাস বলিয়া ভাবি না।

উর্ম্মিলা বলিলেন,—

'কুমারের এত অনুগ্রহ থাকিবে কি? কুমার কি কখন মনে করিয়া এ অভাগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?'

কুমার বিস্মিতের ন্যায় কহিলেন,—

'এ কি আশঙ্কা উর্ম্মিলে? আমি কি মানুষ নহি? তোমাকে ভুলিব?'

তখন উর্ম্মিলা ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন,—

'কুমারের কতই কার্য্য; কত বিষয়ে কুমারের কতই অনুরাগ? সেই সকল কার্য্য ও অনুরাগ সাগরে এ ক্ষুদ্র-হৃদয়া মন্দভাগিনী কোথায় ডুবিয়া থাকিবে!'

'শত কার্য্য, শত অনুরাগ একদিকে আর কুমারী উর্ম্মিলা একদিকে।'

উভয়ে নীরব। বাক্যস্রোতকে আর অগ্রসর হইতে দিতে উভয়েরই সাহস নাই।

রাত্রি অবসান প্রায় হইল। পিঙ্গল উষা আসিয়া রজনীকে দূর করিয়া দিতে লাগিল। পক্ষীগণ সেই পরিবর্ত্তনে আনন্দিত হইয়া চারিদিক হইতে শব্দ করিতে লাগিল।

তখন উর্ম্মিলা কহিলেন,—

'যুবরাজ! দেখিতে দেখিতে রাত্রি অবসান হইয়া গেল। আমার যাত্রার সময় উপস্থিত, অতএব আমি এক্ষণে বিদায় হই।'

যুবরাজ বলিলেন,—

'তোমাকে বিদায় দেওয়া সহজ নহে কিন্তু বিলম্বে অসুবিধা হইতে পারে। ভগবান্ ভবানীপতি তোমায় সুখে রাখুন। জানিও, তোমার নাম এই হৃদয়ে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় স্থাপিত রহিল।'

কুমারী উর্ম্মিলা একটি কথা বলিবেন ভাবিয়া মস্তক উন্নত করিলেন, একবার অধরোষ্ঠের স্পন্দন হইল। কিন্তু কোন শব্দ বাহিরিল না। তিনি প্রস্থান করিলেন।

অমরসিংহ সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুর্গরক্ষকগণের 'বম্ বম্, হর হর' শব্দে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'এই দেবীর নিকট চিত্ত বিক্রয় করায় যদি পিতার সমীপে অপরাধী হই, তাহা হইলে পিতার সন্তোষ-সাধন এ কুসন্তানের অদৃষ্টে নাই।' তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

উর্ম্মিলা যুবরাজের নিকট হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কোন দিকে লক্ষ্য নাই, অন্য কিছু মনে নাই। সহসা তাঁহার প্রৌঢ়বয়স্কা সঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—

'কে ও তারা? আমার ভয় লাগিয়াছিল।'

কিন্তু তারার তখন আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গিয়াছে। সে কুমারীকে শয্যায় না দেখিয়া তাঁহার সন্ধানার্থ ছাতের উপর আসিয়াছিল। দেখিল কুমারী উর্ম্মিলা একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত গাঢ় আলাপে মগ্ন! তাহার চক্ষুকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

উর্ম্মিলার কথা শুনিয়া ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—

'যে রাজপুতরমণী গোপনে রাত্রিকালে পরপুরুষের সহিত আলাপ করিয়া পিতা মাতার বংশ কলঙ্কিত করিতে পারে, তাহার আবার ভয়?'

উর্ম্মিলা অতি শৈশবাবস্থায় মাতৃহীনা। তারা সেই কাল হইতে তাঁহাকে মাতৃবৎ যত্নে লালন পালন করিতেছে। সুতরাং তাঁহার দোষ দেখিলে তারার শাসন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তারা-কৃত ঘোর অপমান উর্ম্মিলার পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও চারুহৃদয়ে আঘাত করিল। তারার উপর তাঁহার সহজে

ক্রোধ হইত না। কিন্তু অদ্য ক্রোধ হইল। তিনি য থাসাধ্য হৃদয়কে শান্ত করিয়া বলিলেন,—

'যাহাকে যখন যাহা বলিবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিও। না জানিয়া কথা বলায় সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে।'

তারা বলিল,—

'আমি না জানিয়া কি বলিয়াছি? স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি। তুমি কি ভাবিয়াছ আমায় ধমকাইয়া সারিবে? যে কার্য্য করিয়াছ ইহার ফল শৈলশ্বর গিয়া পাইবে। যাও, তোমার সহিত আমার আর কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। যাহার স্বভাবে এত দোষ, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহি না। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও—যাহার সহিত ইচ্ছা রাতি কাটাইয়া আইস।'

তারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। উর্ম্মিলা কহিলেন,—

'বলি শুন। তাহার পর রাগ করিতে হয় করিও।'

তারা দাঁড়াইল কিন্তু কথা কহিল না। উর্ম্মিলা বুনাস্ নদীতীরে যুবরাজের সহিত প্রথম সাক্ষাতাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত কথা বলিলেন। তারা শুনিতে শুনিতে ক্রমে ফিরিয়া দাঁড়াইল, ক্রমে উর্ম্মিলার মুখের প্রতি তাকাইল। সমস্ত শুনিয়া বলিল,—

'এত হইয়াছে, বল্ল নাই কেন?'

উর্ম্মিলা বলিলেন,—

'আরও বলি শুন। তুমি যাঁহাকে পরপুরুষ বিবেচনা করিতেছ, তিনি আপাততঃ তোমাদের নিকট পরপুরুষ বটেন কিন্তু তিনি এই হৃদয়ের রাজা—তিনি আমার স্বামী। আমি ভবানী গৌরীর নামে শপথ করিয়াছি যে, যুবরাজ অমরসিংহ ভিন্ন আর কাহাকেও এ হৃদয়ে স্থান দিব না। আমি জানি, আমার এ আশা নিতান্ত দুরাশা; আমি জানি, আমার এ বাসনা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তারা! আমি এই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি। ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, আমি সে দোষের জন্য কাতর নহি। আমি না বুঝিয়া নিরাশ-প্রণয়-সাগরে ডুবিয়াছি বলিয়া যদি তোমরা আমাকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা কর, বা মানবসমাজ আমাকে কলঙ্কিত মনে করে, তাহা হইলে—তারা—তোমার ঘৃণা বা মানবসমাজের কলঙ্কে কুমারী উর্ম্মিলা ভ্রূক্ষেপও করে না।'

তারা আর কথাটিও না কহিয়া উর্ম্মিলার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বেলা অপরাহ্ণ। আগরা নগরের অতি মনোহর শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত রাজভবনের স্বর্ণ-চূড়ায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণময় কররাশি পড়িয়া ঝলসিতেছে। প্রাসাদোপরিস্থ পতাকা পবন-হিল্লোলে একবার বক্র ও একবার ঋজু হইতেছে। প্রাসাদ অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু তাহার অগণ্য পুরী ও প্রকোষ্ঠ মধ্যে নেত্রপাত করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই।

বাদশাহ আকবর প্রতিদিন প্রাতে দরবার-গৃহে ওমরাহগণের সহিত উপবেশন করেন এবং প্রকাশ্য রাজকীয় কার্য্যসমস্তের আলোচনা করেন। বৈকালে তিনি মন্ত্রণাগৃহে উপবেশন করিয়া বিশেষ বিশেষ লোকের সহিত নিগূঢ় বিষয়ের পরামর্শ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বাদশাহ বাহাদুর মন্ত্রণাগৃহে বসিয়া আছেন। আমাদের অধুনা সেই গৃহেই প্রয়োজন।

মন্ত্রণাগৃহ একটি বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠ। তাহার মধ্যে তুরুস্ক হইতে সমানীত একখানি অতি চমৎকার গালিচা বিস্তৃত। সেই গালিচার উপরে হীরকখচিত স্বর্ণময় সিংহাসনে সম্রাট-কুলতিলক আকবর উপবিষ্ট। তাঁহার পার্শ্বে অপর এক আসনে একজন অপূর্ব্বকান্তি রাজপুত যুবক উপবিষ্ট। তিনি বিকানীরের কুমার পৃথ্বীরাজ। সুকৌশলী আকবর জানিতেন যে, রাজপুতগণ এই ভারতের মুখস্বরূপ। তাঁহারা সাহসে অতুল, বলে অদ্বিতীয় এবং বুদ্ধিতে অজেয়। অতএব সেই রাজপুতগণকে স্বপক্ষ করিতে না পারিলে ভারতে মুসলমান রাজ্যের ভদ্রস্থতা নাই। বলা বাহুল্য যে, আকবরের এই বিশ্বাসই তাঁহার অত্যুন্নতির মূল। তিনি কৌশলে রাজপুতপ্রধানগণের সহিত মিত্রতা স্থাপনে প্রবৃত্ত হন এবং যোগ্য রাজপুতগণকে অতি মান্য রাজপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্মবৈপরীত্য হেতু, বা প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কদাচ রাজপুতগণকে অপমান, বা অনাদর করিতেন না। এই জন্যই অসাধারণ বুদ্ধিবল ও কৌশলসম্পন্ন রাজপুতগণ ক্রমশঃই আপনা আপনি তাঁহার আশ্রিত হইতে লাগিল এবং জেতা ও বিজিতভাব ক্রমে ক্রমে অন্তরিত হইতে লাগিল। রাজপুতগণ কৃতঘ্ন নহে; তাহারা সম্রাটদত্ত অতুল সম্মান লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আপনাদিগকে তাঁহার কর্ম্মে ব্রতী করিতে লাগিল; সুতরাং মোগলরাজশ্রী অবিলম্বে অত্যুন্নত গৌরব-পদবীতে সমারূঢ়া হইল। কুমার পৃথ্বীরাজ আত্মরাজ্যের স্বাধীনতা সংরক্ষণে অক্ষমতা হেতু বিজয়ী আকবরের শরণাগত হইয়াছিলেন। আকবর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল, তিনি মুখে মুখে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং পত্রাদি যাহা লিখিতেন, সমস্তই শ্লোকে রচনা করিতেন। গুণগ্রাহী আকবর তাঁহার এই অসাধারণ গুণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'রাজকবি' নাম প্রদান করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে সমাদরে সঙ্গে রাখিতেন। পৃথ্বীরাজ যদিও কোনরূপ সম্রাটপ্রসাদেই বঞ্চিত ছিলেন না, তথাপি তিনি আত্মরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া আপনাকে আপনি অতি ঘৃণার্হ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মহারাণা প্রতাপসিংহের বড়ই অনুরাগী ছিলেন; কারণ মহারাণা মিবারের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ যত্ন করিতেছিলেন, অন্য কোন রাজপুতই তাহা করে নাই।

অদ্য বাদশাহ আকবরের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। কারণ সোলাপুর জয়ের সংবাদ অদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। তিনি পৃথ্বীরাজকে বলিতেছেন,—

' কেমন রাজকবি! মানসিংহের ন্যায় রণনিপুণ ও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি বোধ করি আর দ্বিতীয় নাই।'

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—

' এ কথা কে না স্বীকার করে? বাদশাহর ন্যায় অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভিপ্রায়াধীনে যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের কার্য্যমাত্রই সকল হওয়া বিচিত্র কথা নহে। মানসিংহ তো অসাধারণ যোদ্ধা।'

বাদশাহ বলিলেন,—

' মানসিংহ আমার দক্ষিণ হস্ত। মানসিংহ বীর-চূড়ামণি। বোধ করি তুমি মহারাজ মানসিংহের ন্যায় কর্ম্মঠ ও অধ্যবসায়ী দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম করিতে পার না।'

রাজকবি বলিলেন,—

' বাদশাহ বোধ করি এ কথাটি হৃদয়ের সহিত বলেন নাই। মহারাজ মানসিংহ যে অসাধারণ বীর এ কথায় কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু বাদশাহ স্মরণ করিলে জানিতে পারিবেন যে, এখনও রাজপুতকুলে এমন বীর আছেন, যাঁহারা অম্বরেশ্বরকে তৃণজ্ঞান করেন এবং তাঁহাকে এখনও অসি চালনার উপদেশ দিতে পারেন। তাঁহারা বিক্রমে অতুল, প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ়ব্রত এবং রণকৌশলে অনির্ব্বচনীয়। সেরূপ অসামান্য ব্যক্তির অপেক্ষাও যে মানসিংহ শ্রেষ্ঠ একথা এ অধম স্বীকার করিতে পারে না।'

বাদশাহ ক্ষণকাল চিন্তারপর বলিলেন,—

' আমার বোধ হইতেছে যে, মিবারের প্রতাপসিংহকে তুমি লক্ষ্য করিয়া এত কথা বলিতেছ। আমি স্বীকার করি, প্রতাপ অসাধারণ বীর ও অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তুমি কি ভাবিয়াছ যে, প্রতাপের এই তেজ থাকিবে? মানসিংহের দ্বারাই প্রতাপের গর্ব্ব খর্ব্ব করাইব। এইবার তাহার বিক্রমের পরীক্ষা হইবে।'

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—

' বাদশাহ! আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে আমি এই বলিতে পারি যে, প্রতাপসিংহকে অবনত করা সহজ হইবে না—কখন ঘটিবে কি না সন্দেহ। মানসিংহের ন্যায় যোদ্ধা প্রতাপের কি করিবে? সে অদম্য বিক্রম-প্রবাহে মানসিংহ রূপ প্রবল মাতঙ্গও ভাসিয়া যাইবে।'

তাহার পর মনে মনে বলিলেন,— ' প্রতাপ! তোমার সার্থক জন্ম? কিন্তু সমুদ্রে বাণ ডাকিয়াছে, সব ভাসিয়া যাইবে; যে ঝড় উঠিয়াছে, সব উড়িয়া যাইবে! নিস্তার নাই! তথাপি দেখা ভাল। দেখ, যদি কোন উপায় হয়। কেন দেখিবে না।'

বাদশাহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর কহিলেন,—

' প্রতাপের বীরত্ব যে অতুল তাহা আমি জানি এবং সে জন্য আমি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করি। কিন্তু সে সিংহ যদি জালে না পড়ে, তবে আমার কিসের কৌশল? সে দর্প যদি চূর্ণ না হয়, তবে আমার কিসের গৌরব? সে বীর যদি অধীন না হয়, তবে আমার কিসের বল? আমার এই রাজপুত যোদ্ধাগণ পৃথিবীকে ক্ষুদ্র বর্ত্তুলের ন্যায় ঘুরাইয়া ফেলিতে পারে, তাহারা

একজন মনুষ্যকে অবনত করিতে পারিবেনা ?'

পৃথ্বীরাজ অবনত মস্তকে বলিলেন,—

'জাঁহাপনা ! জয় ও পরাজয় সমস্তই বিধি-নিয়োজিত ফল। বল বা প্রতাপদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাদশাহের সহিত তুলনা করিলে প্রতাপসিংহ ত গণনায় আইসে না। আবুলফজেল যাঁহার মন্ত্রী, টোডরমল্ল যাঁহার সচিব, ফৈজি যাঁহার পার্শ্বচর, মানসিংহ যাঁহার অনুগত, এবং মহাবেত খাঁ, রায় বীরবলসিংহ, সাগরজি, শৌভাসিংহ প্রভৃতি বীরেরা যাঁহার আশ্রিত; যাঁহার রাজ্য আসমুদ্র বিস্তৃত, যাঁহার সৈন্যসংখ্যা অগণনীয়, যাঁহার প্রতাপে ভারত অবনত তাঁহার সহিত ক্ষুদ্র মিবারের ধনজনশূন্য ক্ষুদ্র প্রতাপের কোনই তুলনা হয় না। কিন্তু—'

এই সময়ে একজন কর্ম্মচারী তথায় আগমন করিয়া সম্মানসহ নিবেদিল,—

'জাঁহাপনা ! মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর প্রাসাদ-তোরণ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন।'

বাদশাহ অতিশয় সন্তোষের সহিত কর্ম্মচারীকে বিদায় করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

'কিন্তু কি ?'

বাদশাহ ক্ষুদ্র বা মহৎ কাহারও নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে অপমান মনে করিতেন না, বা তাঁহার সংস্কারের বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইলে বিরক্ত হইতেন না। এই জন্যই প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে পৃথ্বীরাজের অভিপ্রায় কি এবং তাঁহাকে জয় করার পক্ষে পৃথ্বীরাজের মনে কি কি আপত্তি আছে তাহা বাদশাহ আগ্রহের সহিত শুনিতেছেন; অথচ এমনি ভাব প্রকাশ করিতেছেন যে যেন তিনি পৃথ্বীরাজের ভ্রমভঞ্জন ও তাঁহার কুসংস্কার দূরীভূত করিবার বাসনাতেই এত কথা কহিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সতত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহাদের প্রিয়ভাষদ্বারা বাদশাহের মনস্তুষ্টি করিতে হইত না। তাহাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইতেন না। সুতরাং তাঁহারা নিঃসংকোচে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। এই জন্যই পৃথ্বীরাজ বলিতে সাহস করিলেন যে,—

'কিন্তু প্রতাপের প্রতাপ আছে। যতদিন প্রতাপ আছে, কাহার সাধ্য তাহাকে জয় করে। এ দীনের এই বিশ্বাস, প্রতাপসিংহ কখনই নত হইবে না। বাদশাহের চেষ্টা সফল হইবে না।'

বাদশাহ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার সেই কর্ম্মচারী আসিয়া তদ্রূপ ভাবে নিবেদিল,—

'মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর এই দিকে আসিতেছেন।'

কর্ম্মচারী বিদায় হইল। তখন নকিব চীৎকার করিতে লাগিল,—

'অম্বররাজ, বিশ হাজারী মন্‌সব্‌দার, অতুল-প্রতাপ বাদশাহ বাহাদুরের অনুগ্রহভাজন, রাজপুত-চূড়ামণি, মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর উপস্থিত।'

বাদশাহ উঠিয়া দ্বারসমীপস্থ হইলেন; তথা হইতে হাসিতে হাসিতে মানসিংহকে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। মানসিংহ ভূমিস্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

'বীরবর! তোমার যশঃসৌরভ তুমি আসিবার অনেক পূর্ব্বে আমার নিকটে আসিয়াছে। আমরা এখনও তোমার কথায় নিযুক্ত ছিলাম।'

মানসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

'এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির বিষয় আলোচনায় বাদশাহ বাহাদুরের একটি মুহূর্ত্তকালও অতিবাহিত হইয়াছে এ সংবাদ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের, প্রশংসার বা অনুগ্রহের কথা মানসিংহ জানে না।'

বাদশাহ তাহার পর আসন গ্রহণ করিলেন এবং মানসিংহকেও আসন গ্রহণে অনুমতি দিলেন। তাহার পর পরস্পর স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা হইল। বাদশাহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

'আমরা কিন্তু তোমার নিন্দা করিতেছিলাম।'

মানসিংহ বলিলেন,—

'এ অধমের এমন কি সৌভাগ্য যে সে বাদশাহ বাহাদুরের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবে। কিন্তু নিন্দাতে হউক বা প্রশংসায় হউক বাদশাহ বাহাদুর যে তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাই এ দীনের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।'

আকবর বলিলেন,—

'যে বীর হিন্দুস্থান পদাবনত করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই; যাহার ক্ষমতা, সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, গজনী নগরকেও হতবল করিয়াছে, সে বীরের অমিত তেজ যদি স্থান বিশেষে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সেই ঘটনা চিরকাল তাহার বীর চরিত্রের কলঙ্করূপে ঘোষিত হইবে।'

মহারাজ মানসিংহ বহুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

'বাদশাহ আজ্ঞা করিলে এ দীন অনলে শয়ন করিতে পারে, সমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারে, একাকী শূন্য হস্তে সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু অধীন জানে না, কোথায় সে বাদশাহের জয়ধ্বজা প্রোথিত করিতে চেষ্টা করে নাই।'

বাদশাহ ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন,—

'মিবার—প্রতাপসিংহ।'

মানসিংহ কাঁপিয়া উঠিলেন। বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন; পরে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার চক্ষু ঘোর রক্ত বর্ণ; যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া বাহিরে আসিতেছে। বলিলেন,—

'প্রতাপসিংহ—দাম্ভিক প্রতাপসিংহ—দরিদ্র, ভিক্ষুক, কুটীরবাসী প্রতাপসিংহ—সে আমার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে—সে আমার অন্তরে তীব্র বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব; আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব; আমি তাহাকে পথের ভিখারী করিব; আমি তাহাকে অন্নহীন করিব; আমি তাহাকে বাদশাহের চরণে বাঁধিয়া আনিয়া দিব; আমি তাহাকে আমার চরণ ধরিয়া রোদন করাইব, তবে আমার ক্রোধ শান্ত হইবে, হৃদয়ের তৃপ্তি হইবে।'

আকবর জিজ্ঞাসিলেন,—

'তাহার উপর অদ্য তোমার এত ক্রোধ দেখিতেছি কেন? সে সম্প্রতি আর কোন নূতন অপরাধে অপরাধী হইয়াছে কি?'

তখন মানসিংহ একে একে সমস্ত ব্যা-

পার বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া বাদশাহ আকবর অনেকক্ষণ তুষ্ণীম্ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহারও অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইল, কিন্তু তিনি ক্রোধ ব্যক্ত করিবার লোক নহেন। তাঁহার পার্ষদ রাজপুতমণ্ডলী যদি তাঁহার অনধীন কোন রাজপুত বীরের উপর বিরক্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে,রাজপুতগণের মনোবাদ ও অনৈক্য ঘটিলে ভারতে যবনপ্রতাপের আর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। কিন্তু রাজপুতগণ সমমতাবলম্বী হইলে শত যবনভূপেরও এমন সাধ্য হইবে না যে, ভারতে একদিনও রাজত্ব করে। তিনি বুঝিলেন যে, প্রতাপসিংহ অতুল বীর ও প্রভাবশালী হইলেও আর তাঁহার নিস্তার নাই। কারণ মানসিংহের ন্যায় তাঁহার স্বজাতীয় বীর এক্ষণে তাঁহার প্রবল শত্রু। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা প্রভুর সন্তোষ সাধন এক কথা, আর নিজ হৃদয়ের বিজাতীয় জ্বালা নিবারণের চেষ্টা আর এক কথা। সহস্র প্রভুভক্ত হইলেও প্রতাপসিংহের ন্যায় স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করিতে কোনও রাজপুতেরই প্রবৃত্তি বা অনুরাগ হইত না। কিন্তু এক্ষণে আর সে অনুরাগের অপ্রতুলতা থাকিতেছে না। সুক্তসিংহ প্রভৃতি বীরেরাও প্রতাপের বিরোধী।* সুতরাং প্রতাপের নিস্তার কোথা? এ সকল কথাই তিনি বুঝিলেন।

এমন সময় নকিব আবার চীৎকার করিয়া জানাইল সাহারজাদা সেলিম উপস্থিত। বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে সেলিম মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কান্তি ভুবনমোহন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি উজ্জ্বল ও অতি সুদৃশ্য। তাঁহার মস্তকে বিবিধ কারুকার্য্যসমন্বিত শিরপেঁচ জ্বলিতেছে। তাঁহার বিশাল-বক্ষে সুগোল মুক্তার মালা শোভা পাইতেছে। তাঁহার আয়ত ইন্দীবর নয়ন হইতে তেজঃ ও বুদ্ধির জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। কিন্তু একজন বিচক্ষণ লোক দেখিলে বুঝিতে পারিত যে, সেলিমের এই অপূর্ব্ব লাবণ্যের উপর অযথা ভোগবিলাসানুরাগিতা এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়মাবহেলন হেতু একটা কালিমা পড়িয়াছে। সাহারজাদা সেলিম প্রবেশ করিয়া বাদশাহের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বাদশাহের চরণে হস্ত স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন। বাদশাহ অত্যন্ত স্নেহের সহিত সেই যুবককে আলিঙ্গন করিলেন। মানসিংহ ও পৃথ্বীরাজ সাহারজাদাকে যথাবিহিত সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর সকলেই আসন গ্রহণ করিলে বাদশাহ বলিলেন,—

* সুক্তসিংহের সহিত কেন মহারাণা প্রতাপসিংহের মনান্তর ছিল, তাহা বোধ করি ইতিহাসানুসন্ধিৎসু পাঠকের অবিদিত না থাকিতে পারে। Tod's Rajasthan, Vol. I, PP. 275 এবং 276 দেখ।

যেরূপে সুক্তসিংহের সহিত প্রতাপসিংহের মনান্তর ও পার্থক্য ঘটে এবং তৎকালে কুল-পুরোহিত তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জনার্থ যেরূপে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন, তাহার বিবরণ এবং অকুতোভয় সুক্তসিংহের বাল্যজীবনের সাহসের কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

'সেলিম ! কোন গুরুতর সামরিককার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করি না বলিয়া সর্ব্বদাই তুমি দুঃখ করিয়া থাক। এবার তোমাকে এমন এক যুদ্ধের ভার দিব স্থির করিয়াছি যে, তাহাতে জয়-পরাজয়ের সহিত তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতিরও দৃঢ়সম্বন্ধ থাকিবে।'

সেলিম বলিলেন,—

'যেমনই কেন বিপক্ষ হউক না, জয়লাভে এ দাসের কোন সংশয় নাই। বাদশাহের আশীর্ব্বাদই দাসের বল। যতদিন সেই আশীর্ব্বাদের প্রতি এ দীনের অবিচলিত ভক্তি থাকিবে, তত দিন কোথায়ও এ দাস অপদস্থ হইবে না। এক্ষণে বাদসাহ কোন্ অভিনবক্ষেত্রে এ দাসকে নিযুক্ত করিয়া অনুগৃহীত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতে পারি কি ?'

আকবর বলিলেন,—

'রাজা মান ! তুমি যখন প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে, তখন সেলিমকে সঙ্গে লইবে। সেলিমের অদম্য সমর-সাধ নিবৃত্তির উহাই উত্তম ক্ষেত্র। এক্ষণে সেলিম তুমি প্রস্তুত হও। রাজা মানের সহিত তোমার এবার মিবারের প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।

সাহারজাদা বলিলেন,—

'এ দাস সর্ব্বদা সম্রাট্ কার্য্যে প্রস্তুত। অনুমতি হইলে এই মুহূর্ত্তেই যাত্রা করিতে পারি।'

মানসিংহ বলিলেন,—

'বাদশাহের আদেশে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমাদের কোন্ সময়ে যাত্রা করা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে বাদশাহের কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নাই।'

বাদশাহ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

'সম্মুখে খোস্‌রোজ পর্ব্ব উপস্থিত। খোস্‌রোজের পর যাত্রা করাই আমার মতে যুক্তিসঙ্গত। তোমাদের কি মত ?'

মানসিংহ বলিলেন,—

'তাহাই স্থির।'

তাহার পর একে একে পৃথ্বীরাজ ও মানসিংহ বিহিতবিধানে বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে পিতা ও পুত্র বিষয়ান্তরের কথায় নিবিষ্ট হইলেন।

আমিত্ববাদে।

১২৮৫। ক ১——৩।

বাপু বাঞ্ছারাম, কি সুসময়! দারুণ তাপদগ্ধ দিবামান গতপ্রায়। সন্ধ্যা-সমীরণ ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু, মন্দহিল্লোলে, তর্ তর্ সর্ সর্ রবে, নাচিয়া নাচিয়া, কুসুমরেণু চয়ন করিয়া ফিরিতেছে। ফলপুষ্পপল্লবময়ী বিটপমালাও নূতন লতায় অঙ্গ জড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে,দুলিতে দুলিতে, আপন রূপের গৌরবে আপনি ঢলিয়া পড়িতেছে। অস্তমান সৌরকর-রঞ্জিত-মেঘময়-উপান্তবিশিষ্ট নভঃস্থল কারুখচিত চন্দ্রাতপরূপে দিগ্বলয়ে মিশিয়া ঝুলিতেছে। সময় গুণে বিপদও সম্পদ হয়, সময় গুণে মেঘও বিপরীত বিধর্ম্মিশোভার পরিপোষক হইয়া হাসিতেছে। পাখীর গাণে, পতঙ্গের রবে, অপূর্ব্ব তানলয় স্বর সংযোগে চতুর্দ্দিকে মধুবর্ষণ হইতেছে। রৌদ্রভাব বিদূরিত, শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। কি সুসময়! অধীরা প্রকৃতি আজি ধীরভাবে ললনা-কোমল কোমলতায় মোহিনীবেশে বিভূষিত, মাধুর্য্যচ্ছটায় বিশ্ব বিমোহন করিয়া হাসিতেছে। কেন? প্রকৃতির আজি এত সুবেশ কেন? এ যে দেখিতেছি শোভার চরম, নয়ন ফিরে না, মোহিত হইলাম;—স্পন্দশূন্য, সংজ্ঞাশূন্য, রূপের সাগরে ডুবিলাম; রহ রহ, ক্ষণেক প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া দেখি; বাঞ্ছারাম, এস এস, ক্ষণেক প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া দেখ!—

কিন্তু এ কি! সহসা এ দুরন্ত কর্ণভেদী শব্দ কোথা হইতে আসিল? কে, কোন্ পাষণ্ড, কোন্ অবিবেচক, এমন অনুকূল সময়ে এ দুরন্ত প্রতিকূল স্বর প্রচার করিল?—দেখত হে সে কোন্ দুরাত্মা!—সে কি! যে মেঘের টুকরাটুকু এই মাত্র আকাশের প্রান্তভাগে নগণ্যভাবে ভাসিতেছিল; চখে দেখিয়াছিলাম কি না দেখিয়াছিলাম,তাহাও যাহার এখন ভাল করিয়া স্মরণ হয় না; যে শোভায় শোভা মিশাইয়া এই কতক্ষণ হাসিতেছিল; তাহার আবার এই মূর্ত্তি কখন হইল!—এই ডাক তাহার! দেখিতে দেখিতে সেই নগণ্য মেঘ গণনায় আসিল, শরীর ফুলিল, ক্রমে সূর্য্য গ্রাসিল, পরে অর্দ্ধাকাশ, পরে তৃতীয়াংশ,—ক্রমে নীলিমচ্ছটায় দিগ্বলয় অন্ধকার হইয়া আসিল। স্বন্ স্বন্ রবে বায়ু ছুটিল, সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকিল, বিদ্যুৎ চমকিল, মেঘ-গর্জ্জনের কি ভীষণ ধ্বনি! প্রবল বাত্যায় পাতা উড়িল, ফল ছিঁড়িল, বৃক্ষ ভাঙ্গিল, আমূল জগৎ কম্পমান। মেঘের কড়কড়ে, জলের তড়্‌তড়ে, উচ্চপুচ্ছ ভয়বিহ্বল পশুর কলরবে, মেদিনী উন্মাদিনী, যেন যুগান্তমুখে

ছুটিয়া হান্‌-ফান্‌ করিয়া ফিরিতেছে। ত্রাহি মধুসূদন! এবার কি, কোথা যাই, প্রাণ যায়! নিবিড় অন্ধকারে, প্রবল বাত্যায়, বজ্রপতনে, দিগ্বলয় বিনষ্ট; কোথা যাই, প্রাণ যায়; ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন!

নির্ব্বোধ! এই না কতক্ষণ তুমি প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মোহিত হইতেছিলে, ভাবিতেছিলে এইই অপ্রতিহত সুন্দর দিন উপস্থিত হইয়াছে, ইহার আর লোপ হইবে না? কিন্তু কই, কোথায় তোমার সে সুন্দর দিন, কোথায় তোমার সে মানস-তৃপ্তি?—আবার কেন এখন বসিয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছ, মধুসূদনকে স্মরণ করিতেছ, কেন কি হইয়াছে; সে শোভা কোথায় গেল, স্বপ্নবৎ কোথায় মিশাইল? —ইহা কি তোমার নিকট নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে? বলিতে পার সে সৌন্দর্য্য ও তাহার অপলোপ, কোথা হইতে সংঘটিত হইল; এবং তোমার বা তোমার জগতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি?

বাঞ্ছারাম, অগ্রে তোমার সহিত বাহ্য-জগতের কি সম্বন্ধ, তাহা একবার মিলাইয়া দেখ দেখি যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, কেবল সেই জন্য, বাহ্যজগৎ তোমার নিকট কিরূপ মূর্ত্তিতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বায়ুভরে কুসুমগন্ধ আসিতেছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি; অতএব উহারা অস্তি। ঐরূপ রস, ঐরূপ শব্দ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ইত্যাদি না থাকিত, তাহা হইলে উহাদের অস্তিত্ব কোথায় রহিত? আমার যদি অন্যেতর বোধশক্তি না থাকিত, তবে তোমার বৃক্ষ, পত্র, পশু, পর্ব্বত, সমুদ্র, শিলা এ সকল কোথায় রহিত?—আমি যাই আছি, তাই উহারা আছে। আমি না থাকিলে,উহারাও থাকিত না। ভাল, উহারা যদি না থাকিত, তবে তুমি যখন নিঃসহায়, নিরুপায়, শক্তিসঞ্চালনমূঢ়, অবিবেক এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলে, তখন তোমার অবলম্বন কি ছিল? এবং যখন যাইবে, তখনই বা তোমার অবলম্বন কি হইবে? বাপু, কেবল দেড়গজি কথায় কাজ হয় না, কাজের দিকেও একবার তাকাইয়া কথা কহিও। অতএব তুমি থাক বা না থাক, উহারা ছিল এবং থাকিবেও। ভাল, তুমিই কেন না ছিলে, বা না থাকিবে? তবে থাকিবে না কি?—রূপবৈচিত্র-আয়ত্তক তোমার প্রদত্ত সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞাদায়ক শক্তিই, তুমি বাহ্যজগতের অংশ হইলেও, তোমাকে তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; উহারই বলে তুমি সকল হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া ভাবিতেছ; উহারই বলে তুমি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মানদণ্ডরূপে আপনাকে কল্পনা করিতেছ; এবং যেন সেই সকল প্রাগল্‌ভ্য কর্ম্মেরই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, সেই সংজ্ঞাদায়ক শক্তিবশেই আবার সুখদুঃখাভিঘাতে মুহ্যমান হইতেছ।

এখন একবার তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া দেখ, বাহ্যজগৎ বস্তুতঃ কিরূপ দাঁড়ায়। যদি সত্য সত্যই তোমাকে খুন না করিয়া, কেবল তোমার প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং সেই সংজ্ঞাপ্রদায়ক বোধানুভবমাত্র

হরণ করিয়া, আর সমস্তই টায় টায় বজায় রাখিয়া, বাহ্যজগতের প্রতি অবলোকন ও ধারণা করিতে চেষ্টা পাই, তবে তাহাতে কিরূপ ফল দাঁড়াইবার সম্ভব? কি বলিব, বলিতে পারিতেছি না। পাগল! তুমি কি করিয়া বলিবে, তোমার দোষ কি? তোমাকে কিরূপ হইয়া দেখিতে বলিতেছি তা জান?—বাহ্যজগৎ + (তুমি—সংজ্ঞা ও সংজ্ঞাদায়ক বোধানুভব।) পাটিগণিত পড়িয়াছ ত, এখন বুঝিতে পারিবে।

ভাল! তুমি বলিতে না পার, আমি দেখিতেছি। বাহ্যজগৎ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। আমি তুমি হইয়া দেখি, বা তুমি আমি হইয়া দেখ, একই কথা; কেবল এই মাত্র মনে রাখিও, কোথায় দাঁড়াইলে,এবং স্বভাবে কোন্ অংশে পরিণতি ও নির্ভর হইলে, দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখ, বাহ্যজগৎ হইতে সংজ্ঞা এবং তৎপ্রদায়ক বোধানুভব উঠাইয়া লইলে রহিল কি? নামশূন্য অপার রূপরাশিমাত্র। এবং যেমন দেখিয়া আসিলে, তুমিও, কেবল তোমার বোধানুভব বাদে, সেই অপার রূপরাশির অপৃথক অংশ মাত্র। বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, সমুদ্র, শিলা, এবং তোমার তুমিত্ব বাদে তুমি, সেই মহান্ রূপরাশির অঙ্গবৈচিত্রবিশেষ মাত্র। রূপরাশি বৈচিত্রময়ী, সচঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল। ঐ যে পর্ব্বতসানু, ঐ যে বনভূমির গর্ভ দেশ, উহাতে কত নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত, কাহারও অঙ্কুর, কাহারও প্রাদুর্ভাব, কাহারও বিলয়, এবং তাহাতে আবার অপরের আবির্ভাবের সূত্রপাত হইতেছে, তাহা তুমি যদিও দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাহা হইতেছে। তিল তিল করিয়া হইতেছে, অদৃশ্য ভাবে হইতেছে; যখন দৃশ্য হইবে, তখন যদি দেখিবার জন্য কোন চক্ষু থাকে, সে দেখিতে পাইবে যে সে কার্য্য কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব্ব, কি অভূতপূর্ব্ব! যদি যুগারম্ভে, এবং যুগের অন্তে, তোমারও দেখিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তুমিও দেখিতে পাইতে যে রূপবৈচিত্রের কি দারুণ তরঙ্গ অনন্ত হইতে অনন্ত মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কাল এবং শক্তি সংমিলনে রূপের প্রচার। সৌরকরসংযোগে মেঘঙ্গদয়ে ইন্দ্রধনুর সঞ্চার দেখিয়াছ, এরূপ রূপরাশির সঞ্চারও অবিকল তদ্রূপ না হউক, সেই রকমের বটে। ফলতঃ রূপ বস্তুবিশেষের বাহ্যপ্রচার মাত্র, স্বয়ং বস্তু নহে। অতএব রূপরাশিকে অতিক্রম করিয়া চল; যে বস্তুর উহা বাহ্য-প্রচার তাহার অনুসন্ধান কর। কই, দেখিতে পাইলে?—কাল এবং শক্তির সংমিলন। সংমিলনও সম্পূর্ণ বস্তু নহে, সাহচর্য্যে উহা বস্তু। অতএব উহাও অতিক্রম করিয়া আইস, দেখ এখন কি আছে,—কাল এবং শক্তি! তাহাই। এখন বুঝিলে, যাহাকে তুমি বাহ্যজগৎ বলিয়া থাক, তাহা রূপ-প্রচার; যাহাকে প্রকৃতি বলিয়া থাক তাহা শক্তি; যাহাকে আধার বলিয়া থাক, তাহা কাল। যাহাকে কর্ম্ম বা রূপ-বৈচিত্র-সংঘটন বলিয়া থাক, তাহা কাল সংমিলনে শক্তির গতিমাত্র। এই কাল ও শক্তি সাংখ্যকারের হস্তে পড়িয়া পুরুষ ও প্রধান; এবং তন্ত্রকারের হাতে পড়িয়া মহাকাল ও মহাকা-

লীরূপে পরিণত হইয়াছে। সাংখ্যকারের নীরস পুরুষ ও প্রধান হইতে, বঙ্গগৃহে কালীমূর্ত্তিটি বড় সুন্দর দেখি, ও দেখিতে বড় ভাল বাসি। আর্য্যঋষি অনেক দেখিয়া, অনেক ভাবিয়া, কোথাও স্থির ভাবে বসিতে স্থান না পাইয়া, বহুশ্রমবিদ্ধস্ত হইয়া, অবশেষে এই কাল ও কালীকে অবলম্বন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অমলরজতশ্বেত সহাস্য-আস্য স্থির নিশ্চল প্রশান্তমূর্ত্তি মহাকাল, পদতলে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে নিপতিত। উপরে উপরতা, নৃত্য-সচঞ্চল, মেঘবরণা; বরাভয়-খর্পর-মুণ্ডহস্ত, এবং "শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চিং হসন্মুখীং, ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং' রূপে মহাশক্তিরূপা শ্যামা বিরাজিত। উর্দ্ধকেশা, উন্মত্তা, উন্মাদিনী, বেগভরে আমূলজগৎ কম্পিত,—স্বর্গে সূর্য্য, পাতালে নাগরাজ! কিন্তু স্থিরবক্ষ সহাস্য-আস্য সেই মহাদেব কেমন স্থিরভাবে নিপতিত রহিয়াছেন। যে দিকে দেখ, সর্ব্বত্রই সেই মহাকালময় জগৎ সংসার; সর্ব্বত্রই বক্ষ সমানভাবে পাতিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং এ অঘোরনৃত্যে নর্ত্তকীর পদচ্যুতিজনিত সৃষ্টিবিশৃঙ্খলের সম্ভাবনা নাই। তোমার সাংখ্যকারের পুরুষ ও প্রধানের ন্যায়, তন্ত্রকারের এই মহাকাল ও মহাকালী আত্মসর্ব্বস্ব নহেন। ইহারা উভয়েই আবার আপন আপন ইষ্টবিশেষকে জপিয়া থাকেন। বলিতে পার, সে ইষ্ট কি?

বিস্তারবৈচিত্র অনন্ত বহুল হইলেও, ক্রমসংকোচে সংমিলিত হইয়া, অন্তে যথায় বিন্দুমাত্রে পরিণত হইয়াছে; সেই বিন্দুই কি তবে ইহাদিগের ইষ্ট দেবতা? সেণ্ট্ আগষ্টিনের উক্তি,—'যে বিন্দু বিশ্বচক্রের সর্ব্বত্রই মধ্য-বিন্দুরূপে বিরাজিত, তাহাই ঈশ্বর।' বাঞ্ছারাম, আমাদের এ বিন্দু কোন্ বিন্দু? বলিতে না পার, ভাবিয়া দেখ; যতক্ষণ বলিতে না পার, কথা কহিও না। এই বিন্দুরূপী মহান্ মূল হইতে যে কামনা প্রবাহ ছুটিয়াছে, কামনার সেই প্রবাহ-গুণই মহাশক্তি। এই মহাশক্তির আভাস-ব্যাপ্তি, মহাকাল। মহাকালের বেষ্টসমষ্টি দেশ (Space)। মহাশক্তি এই আত্মাধারভূত মহাকালের সহ সংমিলনে, তদাবলম্বনে বেগবতী হইয়া চলিয়াছে। তবে কি এই জন্যই তান্ত্রিক ঋষি স্বকাম-ব্রহ্ম-শক্তি-রূপ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের প্রসূতিরূপে এই মহাশক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাকেই আবার সেই মহেশ্বরের পরিণীতারূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন? কি গুঢ় গুহ্য, কি দুষ্কর তত্ত্ব! আর্য্য ঋষি ভিন্ন এ গুঢ় গুহ্য উদ্ভেদ করিয়া, তত্ত্ব-উদ্ঘাটন আর কাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে? আর্য্য ঋষি! পিতৃ-পুরুষ! তোমাকে শত শত নমস্কার!

কাল অনন্ত ব্যাপ্ত এবং নিশ্চল। তদাবলম্বনে মহাশক্তি প্রবাহিত। অনন্ত মূল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, অনন্ত পথে, অনন্ত বেগে, অনন্ত অন্তে ছুটিয়া যাইতেছে। আশ্রয়ভূতাকাল অনন্তব্যাপ্ত, সুতরাং দুর্দ্দম-গতিতেও আধাররূপী কালচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। এই অনন্ত গতিবশে, প্রতিমুহূর্ত্তে, অথচ পূর্ব্ব ও পর মুহূর্ত্তসহ

অবিচ্ছিন্নভাবে,কালসহ শক্তির নিত্য নূতন সংমিলনে, নিরবচ্ছিন্ন নিত্য নূতন রূপ-বৈচিত্রের সঞ্চার। গতির বিরাম নাই, সুতরাং নিত্য নূতন রূপ-বৈচিত্রেরও বিরাম নাই। এ বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতেছ, স্থূলনেত্রে যাহা কিছু নয়ন গোচর হইতেছে, সকলেই সেই শক্তি-স্রোতে নিরবচ্ছিন্ন ভাসিয়া যাইতেছে; ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলেই ভাসিয়া যাইতেছে; অথবা তাহাই বা বলি কি জন্য, শক্তিস্রোতে তাহারা ধারা প্রতিধারা ইত্যাদি মাত্র। ঐ যে বৈঠকের উপরে সুন্দর বাঁধা হুকাটি দেখিতেছ, ঢাকাই শিল্পকৌশলে একটি স্ফীতগণ্ড ব্যাঘ্র হাঁ করিয়া ছাগ বা মনুষ্যশিশুর অভাবে, একটি কুসুমশিশুর মাথা ছিঁড়িতে উদ্যত,ভাবিতেছ যে উহাকে যেমন দিব্য হুকাটি বসাইয়া রাখিয়াছি, উহা তেমনই দিব্য হুকাটি রহিয়াছে। শক্তিস্রোতের ত কোন চিহ্নই দেখি না, রূপেরই বা রূপান্তর কই? কিন্তু নির্ব্বোধ! তুমি যতই বল, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, তুমি যে সকল দেখিতে না পাইয়া উপহাস করিতেছ, তুমি দেখিতে পাও বা না পাও, তথাপি জানিও যাহা হইবার তাহা হইয়া যাইতেছে। তুমি যতক্ষণ ধরিয়া এই কয়টি কথা কহিলে, চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইতে যে, ইহারই মধ্যে ব্যাঘ্রবিক্রম সমেত তোমার বাঁধা হুকাটি শক্তিস্রোতে কতদূর চলিয়া গিয়াছে। তথাপি প্রত্যয় না হয়, আর এক কার্য্য কর, তোমার ঐ বাঁধা হুকাটি যেমন ভাবে আছে, ঠিক তেমনই ভাবে পঞ্চাশ বৎসর ঘরে চাবি দিয়া ফেলিয়া রাখ, একবারও উঁকি দিয়া দেখিও না। পঞ্চাশ বৎসর পরে ঘর খুলিয়া হুকাটি যেমন অবস্থায় দেখিবে বলিও; তখন আবার তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের বাক্যালাপ ও বাক্‌চাতুরি করা যাইবে।

ফলতঃ এই বিশ্বের প্রতি বারেক সযত্ন-অবলোকন করিয়া দেখ। পরমাণুটি হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্কপিণ্ড পর্য্যন্ত বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থই সচল, সকলেই অনন্তগতিবশে অনন্তমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। শান্তি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সেই একই মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। ঐ যে লোক আসিতেছে, লোক যাইতেছে; কাপড় কিনিতেছ, কাপড় ছিঁড়িতেছ; ভাত হইতেছে, ভাত পচিতেছে; এ সকল কি? সেই সেই বস্তুর সেই অবিশ্রান্ত গতিক্রিয়া মাত্র। কালসমুদ্রজলে জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণেক উঠিতেছে, ক্ষণেক ডুবিতেছে। এই জলবুদ্বুদবৎ যখন যাহা ভাসিয়া উঠিতেছে, তখনই তাহা আমরা ভাত, কাপড়, বা যে কোন সংজ্ঞাধারী বস্তুরূপে তাহাদিগকে অবলোকন; আবার যখন ডুবিতেছে তখম তাহাদিগকে ধ্বংসরূপে দর্শন করিয়া থাকি। অপার-ভ্রমণক্ষেত্রবিহারী ভ্রাম্যমাণ ধূমকেতু সদৃশ, এই বিশ্বরঙ্গভূতে বারেক মাত্র তাহারা নয়নসমক্ষে সমুদিত হইয়া, অবিলম্বেই আবার স্বীয় গতিবশে নয়ন-অতীত-পথে বিলীন হইয়া যাইতেছে; আবার কখনও নয়নসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইবে কি না কে বলিতে পারে!

বৈচিত্র হইতে বৈচিত্রান্তর প্রবর্ত্তনে, পূর্ব্ববৈচিত্র যে ভিত্তিভাবে পরবৈচিত্রের মধ্যে অপলোপ হয়;তাহাকেই আমরা ধ্বংস

বলিয়া থাকি। কিন্তু ধ্বংস কি বস্তুতঃ ধ্বংস? বাঞ্ছারাম, কখন কোন বস্তু ধ্বংস হইবার সময় জ্ঞানচক্ষে কি তাহার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে একবার ভাল করিয়া দেখিবে। দেখিতে পাইবে, কোন বস্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, যেখানে যতদূর হইতে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, তাহার অবনতি প্রাপ্তির সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে; ঠিক সেই খানে, ততদূর হইতে তাহার গাত্র-উদ্ভূত ও গাত্র-সংলগ্নভাবে, আর এক বস্তুর সমুদ্ভবের সূত্রপাত হইয়া চলিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত যদিও জগতের যাবতীয় বস্তুমাত্রেই দেদীপ্যমান, তথাপি তজ্জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। তোমার আপনা দিয়াই দেখ, আধিভৌতিক জীবন,—যৌবনের ক্ষীণতা সহ আধ্যাত্মিক জীবনের কেমন অঙ্কুর, ও ক্রমে সেই ক্ষীণতার পরিমাণ অনুরূপ কেমন তাহার পুষ্টতা হইয়া আসিতেছে। সে যাহা হউক, পূর্ব্ব বস্তু ক্রমেই উত্তরোত্তর যেমন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকে; উত্তর বস্তুও তেমনি ক্রমে ক্রমে উত্তরোত্তর পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্ববস্তুর ক্রম-সঙ্কীর্ণতাজনিত পরিত্যক্ত স্থানাধিকার করিয়া স্বীয় মধ্যাহ্ন যৌবন মুখে চলিয়া আইসে। উত্তরবস্তু ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া যতদূরে আসিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, পূর্ব্ববস্তুও ঠিক ততদূরে ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া আসিয়া, উত্তরবস্তুতে সমাবিষ্ট হইয়া লোকনয়নে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। যেখানে পূর্ব্ববস্তুর এই অপলোপ, এবং উত্তরবস্তুর পূর্ণতা দৃষ্টি করিলাম, ঠিক তাহার অব্যবহিত পরেই বা সেইখান হইতেই, সেই পূর্ণতা প্রাপ্ত উত্তরবস্তুর কোল হইতে আবার এক নূতন বস্তুর সঞ্চার;— উত্তরবস্তু, আবার সেখান হইতে পূর্ব্ববস্তুত্ব ভাবপ্রাপ্ত হইতে চলিল। এই বিশ্বসংসারের এই গতি। যে দিকে দেখিবে, ইহাই প্রতিমুহূর্ত্তে অভিনয় হইয়া আসিতেছে। তুমি দেখিতে পাও বা না পাও, তথাপি ইহাই প্রতি মুহূর্ত্তে অভিনয় হইয়া আসিতেছে। অতএব এখন জিজ্ঞাসা করি, ধ্বংস কি বস্তুতঃ ধ্বংস? রূপবৈচিত্র হইতে রূপবৈচিত্রান্তর গ্রহণকে যদি ধ্বংস বল, তবে তাহাই। নতুবা বস্তুতঃ ধ্বংস কোথায়? পদার্থমাত্রের, প্রাণিমাত্রের, ইহাই ক্ষয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

মহাকালপথে গমমান্ মহাশক্তিবশে আবর্ত্তনশীল পদার্থনিকর নিরন্তর স্থানান্তর, কালান্তর, অবস্থান্তরপ্রাপ্তে নিত্য নবগুণবিকার সমুৎপাদনে নিত্য নবরূপবৈচিত্রের সম্ভব সংঘটিত হয়। এই গুণবিকারই লোকনয়নে ধ্বংস বা অসৎ, এবং রূপ-অস্তিত্ব বা সৎ। উপরে রূপবৈচিত্রসঞ্চারের যে আধ্যাত্মিক কারণ বলিয়াছি, এরূপেই তাহার আধিভৌতিক প্রচার। ইহাই এ জগতে বিষয়ভেদে, বস্তুভেদে, শুভাশুভ, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, আয় ব্যয়, আলোক অন্ধকার, দিবা রাত্র, বসন্ত শিশির, উন্নতি অবনতি ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঞ্ছারাম, তুমি যে মনোহারী বাসন্ত-প্রদোষের স্থায় সেই প্রদোষকাল দেখিয়া সুখানুভব করিতে করিতে, আবার পরক্ষণেই তদ্বিপ-

রীতে মেঘ বিদ্যুৎ বজ্রঘটা ঝড়জল দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া কাঁপিতেছিলে, তাহা কি? তোমার সেই সুখময় প্রদোষ, ও তাহার পরক্ষণেই তন্নাশক ঝড়জল, এই সর্ব্বজনীন অসৎ ও সতের কার্য্যমাত্র। বস্তুভেদে বিষয়ভেদে, ভিন্নরূপ দেখাইতেছিল, তাহাতেই চিনিতে পার নাই। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ চিনিতে না পারিয়া থাক; ভাল, এখন একবার দেখ দেখি চিনিতে পার কি না। কিন্তু আর এক তামাসা দেখিয়াছ এবং উপরেও তাহা আভাষিত করিয়াছি যে, যে অসৎকে, যে অশুভ, বা যে অবনতিকে আমরা বস্তুতঃ অসৎ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি; এবং তাহা স্মরণ করিয়া তজ্জন্য অনুতাপ-বশতঃ মুগ্ধ হইয়া থাকি; কখন কখন কতই বিলাপ-ব্যাকুলিত হই,তাহা বস্তুতঃ অসৎ নহে।—এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে এবং যেহেতু মহাশক্তি অগ্রগামী হইয়াই চলিতেছে, পশ্চাৎ হটিতেছে না, সুতরাং পূর্ব্ব অবস্থা হইতে উত্তর অবস্থার মধ্যে 'অন্তরতা' ভাবের অস্তিত্ব হেতু, দূর অর্থাৎ উচ্চ বা অগ্রস্থিত অবস্থায় গতিমাত্র। যে অবস্থার যখন যাহাকে আমরা হ্রাস বলিয়া গণনা করিতেছি, সে অবস্থার তখন তাহা বস্তুতঃ উচ্চপথে গতিক্রিয়া মাত্র। মৃত্যুজন্মের যুগপৎ একত্র সমাবেশ। তুমি এখনই বলিবে যে, এই কতক্ষণ যে ঝড়-জল প্রলয় উৎপাতে ভীত বিরক্ত জড় সড় হইলাম,তাহা কি তোমার অবস্থান্তর হইতে উচ্চ অবস্থায় যাওয়ার গতিক্রিয়া? তাহা হইলে তোমার মাথা মুণ্ড উচ্চ অবস্থাই বা কেমন,এবং তাহার গতিক্রিয়াই বা কোথায় সুসিদ্ধ হইল, তাহাত ভাবিয়া ঠিক পাই না। মূর্খ! তোমার ঠিক পাইবার কথাও নহে। যদি ঠিক পাইবার হইত,তাহা হইলে তোমার দশাই বা এমন হইবে কেন; এবং তাহা হইলে কি তুমি ভয়ে এত জড় সড় হইয়া এমন করিয়া কাঁপিতে? নির্ব্বোধ! ইহাতে অধিকতর শুভের যদি আর কিছুই দেখিতে না পাও,অন্ততঃ ইহাওত দেখিতে পাইবে যে আজিকার দিনে যে গ্রীষ্মদগ্ধ হইতেছিলে, কালিকার দিন তাহা অপেক্ষা অনেক শীতল হইবে! যে কোন বর্ত্তমান ঘটনা, যতই সামান্য এবং নগণ্য হউক, জানিও নিশ্চয়ই তাহা সমগ্র ভবিষ্যতকে উত্তেজিত ও আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

তবে কি এ জগতে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সুখ বা শুভই সর্ব্বস্ব; দুঃখ বা অশুভ যাহা তাহা স্বপ্ন? সুখ হইতে সুখান্তর-উচ্চে নীত হওয়ার গতিক্রিয়ার নাম যদি দুঃখ হয়, তবে দুঃখ শব্দ সম্বন্ধে আমাদিগের যে বোধানুভব আছে, তাহার অস্তিত্ব কোথায়? তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। এই যে দুঃখ দেখিতেছি ইহা এখন প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন দেখিতেছি যে এ দুঃখের অস্তিত্ব না থাকিলে হয়ত দুঃখে মরিয়া যাইতাম। নির্ব্বোধ! সত্য সত্যই তাহাই। মঙ্গলময় মহা-উৎস হইতে যাহার উৎপত্তি, সে মহাশক্তি যেরূপেই গতিশীলা হউক না কেন, তাহা কি অমঙ্গলময় হইতে পারে? মঙ্গলময় মনীষা হইতে অমঙ্গলময় কামনার সম্ভব কোথায়? তুমি ইচ্ছা করিলে, আত্মবুদ্ধিগুণে আপনাপনি কখন কখন মানুষ ঘুচিয়া বানর সাজিতে পার, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়ম অবলম্বন করিলে কখনই তাহা

পারিবে না। সে নিয়ম ধরিয়া চলিলে তোমাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর মনুষ্যত্বে যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মহাশক্তির বিস্তার-ক্রিয়া যাহা, যাহাকে আমরা শুভ বা সৎ বলি, তাহা অনন্ত; ঐরূপ বিপর্য্যয় যাহা, যাহাকে আমরা অশুভ বা হ্রাস বলি, তাহা অন্ত। এই নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন অনন্ত অন্ত সংঘটন, পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড-ক্রিয়া। এই কথিত অসৎকে মূসা, ঈশা, ও মহম্মদ সয়তান বলিয়া, এবং জরথুস্ত্র অহ্রমন্যু বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। আমাদিগের দূরদর্শী আর্য্যঋষি ইহাকে মিথ্যা দৃষ্টি, বলিয়া থাকেন। মিথ্যাদৃষ্টিই বটে, নতুবা শুভের কারণ-অশুভ-হইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইব কেন?

এই গেল আমিত্ব বাদে; কিন্তু আমিত্ব যুক্তে?* শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গে পাশ্চাত্যসভ্যতা।

"ফরাসী সভ্যতা আয়ত্ত করিতে, ফরাসী রীতি নীতি অনুকরণ করিতে রুশযুবকেরা উন্মত্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংসর্গে যে সকল বিপত্তি উদ্ভূত হয়, তৎসমুদয়ই অদ্য রুশরাজ্যে দেদীপ্যমান। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে ইউরোপীয় উচ্চতম জ্ঞানালঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'অর্দ্ধ-শিক্ষা মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, পূর্ণ শিক্ষা মনুষ্যকে পুনরায় ঈশ্বর-সন্নিধানে লইয়া যায়।' অর্দ্ধশিক্ষা যে সকল রুশ যুবককে স্পর্শ করিয়াছে, তাহারা নাশ পাইয়াছে। লোকে কহে 'রুশযুবক শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, জাতীয়কাফ্তান' ত্যাগ করিয়া কোট ধরিলেই জানিবে সে অধঃপাতে গিয়াছে।' কথাটি ঠিক সত্য নহে। তবে, রুশযুবকেরা সহসা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিলে অনেকেরই স্বাভাবিক গুণ সমূহ লোপ পাইয়া থাকে; তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতি, সরলতা ও সাত্বিকতা বিনষ্ট হয় এবং কেবল জীব-সাধারণ প্রবৃত্তি-সমূহই তাহাদের চরিত্রে অবশিষ্ট থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রোড়ে যাহারা আজন্ম লালিত, উহার বিষে তাহাদের তত অপকার করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু সেই বিষ রুশ-যুবকের মনুষ্যত্ব হরণ করে।"

পরিব্রাজক-প্রধান হাক্সৌসেন—যিনি রুশ রাজ্যে গ্রামসংঘের অস্তিত্ব প্রথম নির্দ্ধা-

---

* এই সকল প্রবন্ধ মধ্যে অদ্ভুত-নূতন, অসংলগ্ন, অসম্বদ্ধ, অনেক কথা আছে। কিন্তু আমার প্রিয়শ্রোতা বাঞ্ছারামের সঙ্গে ওরূপ কথা অনেক হইয়া থাকে। অতএব বঙ্গসাহিত্য-পাঠক মহোদয়েরা ওদিকে বড় একটা কাণ দিবেন না। এবং যাহাতে তাঁহারা কাণ না দেন, সেই জন্যই সশঙ্কভাবে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া কোন কথা বলিতে সাহসী হই না।

ষণ করেন—রুশীয় গ্রামাচার ও সামাজিক জীবন দেখিয়া তিনি এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে বিষ-বৃক্ষের অঙ্কুর মাত্র তখন দেখিয়া আসিয়াছিলেন, অদ্য সেই বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া সমুদয় রুশরাজ্য অধিকার করিয়াছে। উহারই ছায়ায় সর্ব্বোচ্ছেদকেরা (Nihilists) পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এখন রুশরাজ্যকে কম্পমান এবং রুশরাজকে প্রাণভয়ে ব্যাকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বীয় স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য প্রাণ-হস্তে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা সমগ্র মানব জাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র; কিন্তু যাহাদিগের রক্ত-পিপাসা, রাজাকে কিঞ্চিৎ ভয় প্রদর্শনের জন্য, শতসহস্র ব্যক্তির প্রাণবধে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা মানব মূর্ত্তিতে পিশাচ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকেরা বক্তৃতা কালে যেরূপ একটি বচন ধরিয়া ধর্ম্মনীতির ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নানা কথার অবতারণা করেন আমরাও উদ্ধৃত হাক্সৌসেনের সার-গর্ভ বাক্য গুলির তদ্রূপ ব্যবহার করিব। উহা ধরিয়া আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বঙ্গে যে যে বিষময় ফল উদ্ভূত হইতেছে তাহার প্রধান প্রধান কএকটির আলোচনা করিব, এবং সেই সভ্যতার কোন্ ভাগ আমাদের গ্রহণীয় তাহাও অনতি-বিস্তারে নির্দ্দেশ করিতে যত্নশীল হইব।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নিন্দা করার হাক্সৌসেনের কিছুমাত্র স্বার্থ ছিল না, বরং তাঁহার সেই সভ্যতার পক্ষপাতী হওয়াই সম্ভব। এই জন্য তাঁহার বাক্যগুলির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এ দেশের অতিপ্রধান সমাজনৈতিকের কথায়ও এতটা গুরুত্ব সম্ভবে না। তিনি রুশ-যুবকের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, অদ্যকার বঙ্গ-যুবকের অবস্থাও কতক সেইরূপ। অর্দ্ধশিক্ষা অনেক বঙ্গ যুবককে নষ্ট করিতেছে। এ দেশেও লোকে কহে 'বঙ্গ-যুবক শ্মশ্রুধারী হইয়া জাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া হেট কোট ধরিলেই জানিবে সে অধঃপাতে গিয়াছে।' হাক্সৌসেনের সহিত আমরাও এক বাক্যে কহি কথাটি ঠিক সত্য নহে। হেট কোটে এমন কি গরল আছে যে, তাহা পরিলেই অধঃপাতে যাইতে হইবে? তবে ইউরোপীয় হেট কোটে বঙ্গসুধীর যে আপত্তি, তাহা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ইচ্ছায় ও সুবিধার অনুরোধে।

কিন্তু কে বলিতে পারে যে বঙ্গযুবকের যে কএকটি স্বাভাবিক গুণ ছিল, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; এবং কেই বা সাহস করিয়া কহিবে বঙ্গযুবক পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ-ভাগ বর্জ্জিয়া গুণভাগ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে? সভ্যতার রাগে সুরঞ্জিত হইয়া যে সমস্ত কুহক বঙ্গযুবককে ভুলাইতে সক্ষম হইয়াছে, তন্মধ্যে নিরীশ্বরতা অতি ভয়াবহ।

"কাঠ কঠিন কৈল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।
কণয়া কলস বিষে বুড়াইয়া
উপরে দুধক পুর॥"

পাশ্চাত্য নিরীশ্বরতা বিজ্ঞানের বর্ম্মে আবৃত বলিয়া অভিমান করিত। কিন্তু যে দুইটি সূত্রের উপর উহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তদুভয়ের উপরেই বিজ্ঞান এক্ষণে সবলে

পদাঘাত করিয়াছে। এই দুইটি সূত্রের এ-কটি প্রাণের স্বয়ংজন্ম (Spontaneous generation) এবং দ্বিতীয়টি প্রাণীর ক্রমবিকাশ (Evolution of Species)। আমরা এস্থলে 'প্রাণ' শব্দ বিস্তৃত অর্থে প্রয়োগ করিলাম। এই অর্থে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। প্রাণের স্বয়ংজন্মের অর্থ এই যে অপ্রাণ জড় পদার্থ হইতে প্রাণী স্বতঃসম্ভূত হইতে পারে। মাংস পচিয়া পোকা পড়িল, দুর্গন্ধ মলপূর্ণ স্থানে পোকা ছিল না পোকা হইল, বোধ হয় এই সমুদয় দেখিয়া এইমত প্রথম পরিব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞান এক্ষণে সাব্যস্ত করিয়াছে যে, প্রাণী ভিন্ন প্রাণীর জন্ম হওয়ার কিছুমাত্র প্রমাণ বিদ্যমান নাই। পচা মাংসে যে পোকা হয় সেও অন্য প্রাণীর ডিম ফুটিয়া; প্রাণি-কারণ ব্যতীত প্রাণীর জন্ম হইতে কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় নাই। প্রাণীর ক্রমবিকাশসূত্র এই—"উদ্ভিদ্ ক্রমশঃ উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া জন্তু হয়। উহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, উদ্ভিদ্ নিশ্চল, জন্তুর চলিবার শক্তি আছে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের ও সর্ব্ব-নিম্ন শ্রেণীর জন্তুর মধ্যে পার্থক্য অতিঅল্প। নিম্নশ্রেণীর জন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও উন্নত হইয়া, নানা রূপ ধরিয়া ও নানা রূপ ত্যজিয়া শেষে বানর হইয়াছে এবং বানর হইতেই মনুষ্যের উৎপত্তি। এই উন্নতি ও বৃদ্ধি হইতে সহস্র সহস্র যুগ লাগিয়াছে।" প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পৃথিবীর স্তরে স্তরে পরীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কোথায়ও এই সূত্রের বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; পৃথ্বীকুক্ষিহইতে বিনিষ্ক্রান্ত অস্থিসমূহ কোথায়ও এক প্রাণী অপর প্রাণীতে পরিণত হইবার মধ্যাবস্থায় পরিদৃষ্ট হয় নাই। মীসরদেশীয় রক্ষিত শব ও নিনেভার খনিত ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করিতেছে যে, মানবশরীর পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, এখনও তাহাই আছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডেও ফ্রান্সে বৈজ্ঞানিকেরা আর নিরীশ্বতা লইয়া অভিমান করেন না এবং উভয় দেশেই নিরীশ্বতার স্রোত পরাবৃত্ত হইতেছে।* সেই স্রোত এক্ষণে আসিয়া বঙ্গে লাগিয়াছে। আমাদের আশা এই যে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যেরূপ এক্ষণে বৈজ্ঞানিক অভিহিত নিরীশ্বরতার স্রোত কাটাইয়া উঠিতেছে, ভারতভূমি যেরূপ অনেকবার নানা প্রকার নিরীশ্বরতার স্রোত কাটাইয়া উঠিয়াছে, বঙ্গদেশও সেইরূপ আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষার বা পাদশিক্ষার নিরীশ্বরতার স্রোত কাটাইয়া উঠিবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বিতীয় বিষময় ফল নীতি-প্রত্যাখ্যান। নীতিপ্রত্যাখ্যান ও নিরীশ্বরতা এক নহে। নিরীশ্বরবাদীরা নীতিপ্রত্যাখ্যান করে সত্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরবাদীদের মধ্যেও এক সম্প্রদায় আছে যাহারা নীতি মানে না। বঙ্গদর্শনে সে দিন লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গে এক নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে। প্রস্তাবলেখক এই সম্প্রদায়ের বঙ্গপন্থী নাম দিয়াছেন। আমরা ইহাদিগের নূতন নামকরণের প্র-

* এই বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও নিরীশ্বরতা কমিয়া আসিতেছে। একদল আছে তাহারা অবেদী (Agnostics)। অবেদীদিগের মতে মনুষ্য ঈশ্বর-সম্বন্ধে কিছুই জানে না ও জানিতে পারে না।

য়োজন দেখি না। ইহাদিগকে দেশীয় কোন নাম না দিলে, কোম্‌তের প্র-পরা-অপ শিষ্য বলিলেই চলিতে পারে। বঙ্গপন্থী-দের ধর্ম্মসূত্র কি তাহা প্রস্তাবলেখক সমগ্র কহেন নাই। কিন্তু তাহাদের মতের এই কএকটি কথা পাওয়া যাইতেছে যে, তাহারা কহে ঈশ্বরের পূজা অনাবশ্যক, পাপ ও পুণ্য মিথ্যা। প্রস্তাবলেখক আরও কহেন তাহাদের আর একটি মত এখনও পরিস্ফুট হয় নাই; তাহা এই 'মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা ক্রমে ঘুচিবে। ধূমকণার স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়া সমুদ্র হইয়াছে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়া সেইরূপ কি একটা হইবে।' এই 'কি একটা' কোম্‌তের Humanity র অস্ফুটচ্ছায়া, না নির্ব্বাণমুক্তির মূর্ত্ত্যন্তর-পরিগ্রহ তাহা সুবিজ্ঞ পাঠক মীমাংসা করিবেন। অর্দ্ধশিক্ষা বঙ্গপন্থীকে নষ্ট করিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান লোপ করিয়াছে এবং তাহার মনুষ্যত্ব হরণ করিয়াছে। শকুনের যেরূপ পূতিগন্ধময় শব-মাংসেই তুষ্টি ও তাহারই সে যেরূপ সন্ধান করে, বঙ্গপন্থীও সেইরূপ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোম্‌তদর্শনের যে টুকু ভ্রমপ্রমাদ সেই টুকুই গ্রহণ করিয়াছে। কোম্‌তদর্শনের গুণ-গরিমা তাহার বুঝিবার শক্তি নাই এবং সে তাহা বুঝিতেও চাহে না। কিন্তু কোম্‌তের অধর্ম্ম সে গ্রহণ করিয়াছে এবং হয় ত কোম্‌তজীবনের অন্য কোন ভাগ সে অনুকরণ করিতে সমর্থ না হইলেও তাঁহার কারাবদ্ধ অপরাধী পত্নীকে নির্জ্জনে প্রীতিদান অনুকরণ করিতে যত্নপর। আত্মার স্বাধীনতা অস্বীকার করিতে পৈতৃক অদৃষ্ট-বাদ তাহাকে শিখাইয়াছিল, সে আর এক পদ অগ্রসর হইল, আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বসিল। কিন্তু পৈতৃক পাপ-পুণ্য-জ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান এতদিন তাহাকে রক্ষা করিতেছিল, সে তাহাও বিসর্জ্জন দিয়া বসিল। স্থির করিল পাপ ও পুণ্য মিথ্যা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মিথ্যা। অহো কি শোচনীয় দৃশ্য! অদৃষ্ট-বাদের ক্রোড়ে বঙ্গযুবক আজন্ম লালিত, উহার বিষে তাহার পাপ-পুণ্য-জ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান বিলোপ করিতে পারে নাই; কিন্তু কোম্‌তের অধর্ম্মরূপ নূতন বিষে তাহার মনুষ্যত্ব হরণ করিল। বঙ্গদর্শনের প্রস্তাব লেখক ক্ষমা করিবেন, আমরা কোম্‌তের অপশিষ্যদিগের ধর্ম্মসূত্রকে ভবিষ্য হিন্দু-ধর্ম্মের অঙ্কুর মনে না করিয়া উহাকে বঙ্গ অধঃপাতে যাওয়ার প্রশস্ত পথ মনে করি। আমরা উহাকে সমাজের সাধারণ শত্রু বলিয়া জ্ঞান করি এবং যে কেহ এই ধর্ম্ম সূত্রের অথবা অধর্ম্ম সূত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া উহার শক্তি বিনাশ করিবেন তাঁহাকে বঙ্গের পরম সুহৃদ্ বলিয়া আদর করিব।

বঙ্গে অন্য যে সকল কুফল পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রসূত হইতেছে, তাহার প্রায় সমস্তই নিরীশ্বরতা ও নীতি-প্রত্যাখ্যানের অন্যতরের বা উভয়ের ফল মাত্র। আমরা তদালোচনায় প্রস্তাব দীর্ঘ না করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন্ ভাগ বাঙ্গালির অনুকরণীয় তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই প্রশ্ন মীমাংসা করিতে বাঙ্গালি চরিত্রের মূলগত অভাব কি, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় সেই অভাব মোচনের উপকরণ বিদ্যমান আছে কি না, তাহাই দেখা আবশ্যক।

মানব জাতি কোন্ নীতি-সূত্র অবলম্বন করিয়া কোথায় কিরূপে উন্নত হইয়াছে, নীতিমালার কোন্ দোষেই বা কোথায় কিরূপে অধঃপাতে গিয়াছে, মনুষ্য-মনের কোন্ বৃত্তির বিকাশে কোথায় কি অমৃত ফল প্রসূত হইয়াছে, কোন্ বৃত্তির অবহেলাতেই বা কোথায় কি গরল উৎপাদিত হইয়াছে, সমাজ-বিজ্ঞানের এই সকল জটিল তত্ত্ব যাঁহারা সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়াছেন,তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর আজি বঙ্গের এই দুর্দ্দশা কেন? তাঁহারা বলিবেন বঙ্গে মনুষ্য-মনের কোমল ভাব গুলির অস্বাভাবিক বিকাশ ও কঠোর বৃত্তিসমূহের একান্ত অবহেলাই উহার সর্ব্ব প্রধান কারণ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি, স্নেহ ও প্রণয়, দয়া ও দাক্ষিণ্য, লজ্জা ও নম্রতা এই সমুদয়ই কোমল ভাব ও প্রীতির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। সাহস ও পরাক্রম, আত্ম-নির্ভর ও অভিমান, অধ্যবসায় ও উন্নতি-কামনা এই সমুদয়ই কঠোর বৃত্তি ও শক্তির প্রকার-ভেদ। প্রীতি-জগতে বাঙ্গালিকে লইয়া সমগ্র মানবজাতি অভিমান ও গৌরব করিতে পারে, কিন্তু শক্তি-রাজ্যে বাঙ্গালি মনুষ্য-নামের কলঙ্ক। বাঙ্গালি প্রীতির অতিভক্ত সেবক, কিন্তু শক্তির অতি অকিঞ্চিৎকর সাধকও নহে। প্রীতির অতিসেবায় ও শক্তির একান্ত অবহেলায় মনুষ্যের যতদূর উন্নতি ও যতদূর অবনতি হইতে পারে, তাহা বাঙ্গালিতে সম্যক্ প্রকাশিত। মনুষ্যচরিত্রে যতদিন প্রীতির ও শক্তির সামঞ্জস্য না হয়, ততদিন উহা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। বাঙ্গালিচরিত্রে যতদিন প্রীতির ও শক্তির সামঞ্জস্য না হইবে, ততদিন বাঙ্গালি জাতিসমাজে উচ্চ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে উহা শক্তি-মূলক। মনুষ্যের প্রীতি যেরূপ অসীম, মনুষ্যের শক্তিও সেইরূপ অপরিমেয়। মনুষ্যের প্রীতি সর্ব্বদেশে প্রসারিত হইয়া ও সমগ্র ভুবন প্লাবিত করিয়াও নিঃশেষিত হয় না; এবং মনুষ্যের শক্তি সমগ্র জড় জগতের ও অন্য সমস্ত জীবের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াও তুষ্ট নহে। মনুষ্যের প্রীতি ভাবিতে গেলে হৃদয় মোহিত হয়, মনুষ্যের শক্তি চিন্তা করিলে হৃদয় স্তম্ভিত ও অবশ হইয়া পড়ে। ইউরোপবাসী শক্তির অতি প্রিয়-সাধক। সাধনায় সেখানে সোণা ফলিয়াছে এবং মনুষ্য পরাক্রমে শতমনুষ্য হইয়াছে। ত্রেতাযুগে দেবতারা রাবণের পরিচর্য্যা করিতেন; সূর্য্য তাহার দৌবারিক ছিলেন, ইন্দ্র তাহার মালাকর, চন্দ্র তাহার ছত্রধর, অগ্নি তাহার পাচক, বরুণ তাহার বারিবাহক, যম তাহার অশ্বভৃত্য এবং স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন। কলিযুগে সাধনার বলে দেবতারা ইউরোপবাসীর নিত্যসেবায় নিযুক্ত। সূর্য্য তাহার চিত্রকর, ইন্দ্র তাহার বার্ত্তাবহ ও দীপাধ্যক্ষ, অগ্নি তাহার রথবাহক, পবন তাহার পোতবাহী, বরুণ তাহার মলাপসারক এবং অগ্নি পবন বরুণ তাহার সর্ব্বকর্ম্মভৃত্য। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইউরোপবাসী শক্তিরাজ্যে মনুষ্য চরিত্রের আদর্শ।

এখন দেখা গেল যে বাঙ্গালি চরিত্রের মূলগত অভাব শক্তির অবহেলা এবং সেই

অভাব মোচনের উপকরণ পাশ্চাত্য সভ্যতায় পূর্ণভাবে, বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালি কি তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছে? সক্ষম হওয়া দূরে থাকুক বাঙ্গালি কি তাহা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে? দুঃখের সহিত, লজ্জার সহিত বলিতে হইবে বাঙ্গালি পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচক্যময় বহিরাবরণেই মুগ্ধ, উহার অন্তঃসার বাঙ্গালির এখনও উপলব্ধিই হয় নাই। ইউরোপবাসীর ন্যায় পরিচ্ছদধারী, তাহার ন্যায় পদবিক্ষেপায়াসী তাহার ন্যায় স্বরভঙ্গিকারী, তাহার ন্যায় পিতৃমাতৃত্যাগী বাঙ্গালি হাটে, ঘাটে, মাঠে পাওয়া যাইবে; কিন্তু তাহার ন্যায় শক্তিসাধক বাঙ্গালি কোথায়? প্রতিধ্বনি উত্তর দেয়—কোথায়? ও কোথায়? বাঙ্গালি শক্তি-সাধনা অভ্যাস করিতেছে না, পক্ষান্তরে প্রীতি-সেবা অবহেলা করিতেছে। জ্ঞাতিশক্র অপেক্ষা নির্ম্মম শত্রু নাই এবং গুরুত্যাগী শিষ্যের ন্যায় নির্লজ্জ গুরুনিন্দুকও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এতদিন যে প্রীতির বাঙ্গালি অন্ধস্তাবক ছিল,এখন সেই প্রীতির নিন্দায় সে ব্যগ্র ও উন্মত্ত। বলা অনাবশ্যক যে প্রীতির অবহেলাতে শক্তির সাধনা বুঝায় না। কিন্তু যে দেশে শিক্ষাভিমানী অশিক্ষিতেরা স্বজাতির ও স্বদেশের নিন্দা দ্বারাই স্বদেশানুরাগ প্রকাশ করে,সে দেশে যে প্রীতির অবহেলাই শক্তির সাধনা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বঙ্গযুবক, প্রীতির সেবা রক্ষা কর, পৈতৃক অমূল্য ধন খোয়াইও না এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্তির সাধনা শিক্ষা কর। মনে রাখিও, প্রীতিহীন শক্তিহীন মনুষ্য মানবমূর্ত্তিতে পশু অথবা পশু অপেক্ষাও অধম।

শ্রী বি।

মাছ কি মানুষ বড়?

" While man Exclaims—' See all things for my use,'
' See man for mine.'—Replies a pampered goose."

Pope.

মানব তুমি কি মৎস্য হইতে বড়?—তুমি অহঙ্কারভরে জগৎ তৃণজ্ঞান কর, আর বল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবই তুমি,—এ কথাকি ঠিক্? তুমি আপনাকে প্রাণিরাজ বলিয়া আস্পর্দ্ধাকর, বাস্তব তুমি কি ঐ উপাধির যোগ্য?—লোকে তোমাকে প্রাণিরাজ বলে বলুক, আমি বলিব না। যদি স্বভাব তোমাকেই বড় করিয়া থাকেন,তবে এস তোমার স্বাভাবিক গুণ আগে দেখাও? দেখাও কোথায় তোমার মহত্ব। তোমার উপাধির যোগ্য ক্ষমতা ও সম্মান কি আছে,আগে দেখাও। কেবল উপাধির পরিচ্ছদে আমি তো-

মার সম্মান স্বীকার করি না। শুদ্ধ সাধুতা এবং সদ্গুণই যে প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব তাহা তোমার কোথায়? তুমি আত্মম্ভরী, তুমি কার্য্যে স্বার্থপর। প্রকৃত প্রাধান্য লোকে দিতে বা হরণ করিতে পারে না, এরূপ স্বাভাবিক প্রধানতা তোমার কি আছে বল! ছি ছি— তুমি আপনি আপনার মাথায় মুকুট তুলিয়া দিয়া নাট্যশালার রাজার ন্যায় ক্ষণকাল দম্ভভরে বেড়াইয়া গর্ব্বভরে বলিয়া থাক, "হে পৃথিবীর নিকৃষ্ট প্রাণিগণ আমাকে জীবশ্রেষ্ঠ মানিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন কর।" ধিক্ তোমায়। বাহ্য-শোভাকর ক্ষণস্থায়ী সূত্ররাজি ব্যতীত তোমার দেহে আর কি মহত্ত্বের চিহ্ন আছে? তোমার শরীর ও মন কেবল ক্ষুদ্রতায় পরিপূর্ণ। তুমি সুন্দর ও বীর বলিয়া গর্ব্ব কর, কিন্তু তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় উলঙ্গ বিভৎস কদাকার ও অসভ্যের একশেষ। এবং শারীরিক বলে এত নিকৃষ্ট যে, একটি সামান্য পশুরে দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন কর। তুমি অগণ্য সৈন্যবলে দর্প করিয়া থাক—তোমার সিংহাসন অটল।—একবার বিজ্ঞানের মশারি উত্তোলন কর দেখি,—একটি মশকের দংশনে প্রাণভয়ে সিংহাসন ফেলাইয়া পলাইবে।—আর ক্ষুদ্রপ্রাণী বিশ্চিক ও মধুমক্ষিকার দংশনে তুমি উন্মাদপ্রায় হইয়া হায় হায় করিবে। অতএব বল দেখি, তুমি কি মৎস্য বড়?

যদি রাজ্যের বিস্তৃতি এবং অগ্র পশ্চাৎ জন্ম ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলেও তুমি মৎস্য হইতে অশেষ গুণে নিকৃষ্টতর। বাইবল ও হিন্দুশাস্ত্র উভয়ের মতেই মৎস্য অগ্রজ। দশাবতারের প্রথম অবতারই মীন। ('প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং, বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং, কেশব ধৃতমীন-শরীর জয় জগদীশ হরে'।) ডারউইন পর্য্যন্ত প্রকারান্তরে এ কথায় সায় দিয়াছেন।—মুশাও লিখিয়াগিয়াছেন মৎস্যই সকল জীবের পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে। এখন কে বড়, কে সর্ব্বাদৌ পৃথিবীর স্বত্ববান্, হে গর্ব্বিত মানব বিচার কর।

যদি বল প্রকৃতির তোমরাই সকল হইতে প্রিয় সন্তান। আমি তাহা মুক্তকণ্ঠে অস্বীকার করিব।—দেখ জলপ্লাবনে তোমরা নাশ পাইলে, কেন পাইলে, না তোমরা গর্ব্বিত, দুষ্ট ও পাপী। এই জন্য প্রকৃতির ভীষণক্রোধে তোমরা সমূল বিনষ্ট হইলে, কিন্তু নিরপরাধী উন্নতচিত্ত মৎস্যগণের কিছুই হইল না। তথাপি যদি তোমরা তর্ক করিয়া বলিতে চাও যে, মৎস্যও তোমাদের দশাপন্ন হইয়াছিল। তাহা এক কথায়ই বুঝাইয়া দিতে পারি।—পৃথিবী জলপ্লাবিত হইলে, সকল জীবের এক জোড়া করিয়া (কৃষ্ণের বটভেলকে বা নোয়ার গ্যাফার ভেলকে) রক্ষিত হইয়াছিল। পৃথিবীর যাহা কিছু সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং জলে মৎস্য না থাকিলে ঐ সকল জীব কি খাইয়া বাঁচিয়াছিল? সুতরাং তোমরা পাপী ও ঘৃণিত, তজ্জন্য বিধাতার কোপ শুধু তোমরাই ভোগ করিয়াছিলে, শুদ্ধমতি মৎস্যের কিছুই হয় নাই। প্রত্যুত তাহাদিগের রাজ্য এবং রাজ্যের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

তোমরা যখন একবারে নির্ব্বংশ হইয়া জলতল হইয়াছিলে, কে তখন জীবপ্রধান

হইয়া অসীম সাগররাজ্যে আনন্দে বিচরণ করিয়াছিল? মৎস্যের ন্যায় স্বভাবদত্ত অসীম রাজ্য তোমরা কবে ভোগ করিয়াছ? হে গর্ব্বিত মানব! তোমার মৃতশরীর মৎস্যের দল কত সমারোহ করিয়া আহার করিয়াছিল। তুমি যে অট্টালিকা লইয়া কত ধনগৌরব দেখাও, ভীম তিমি সামান্য মৃৎস্তম্ভজ্ঞানে ঘৃণা করিয়া এক এক নিক্ষেপণে সেরূপ কত শত শত অট্টালিকা চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। যে স্বর্ণখচিত মণি ও হীরকময় বহুমূল্য মুকুট তুমি মস্তকে পরিয়া আপনাকে কতই বড় ও ঈশ্বরানুগৃহীত মনে করিতে, মৎস্য-শিশুগণ সামান্য খেল্‌না বলিয়া অশ্রদ্ধাসহকারে তাহা লইয়া খেলা করিয়াছিল। যে পরম সুন্দরী রাজকুমারীগণ ফুলস্পর্শে বেদনা বোধ করিতেন, যাহার অর্দ্ধাঙ্গ পরপুরুষে দেখিলে পচিয়া যাইত, কোমল শয্যা স্পর্শে যাহার রক্ত শুষিয়া যাইত, সামান্য জলকীট তাহার সেই কোমল শরীরের মাংস চর্ব্বণ করিয়াছিল।---তুমি সামান্য আয়োজন করিয়া, নিমন্ত্রিত বন্ধুজনের ধন্যবাদ চাহিয়া থাক ও সামান্য গৃহে বসিয়া গর্ব্বিত হও।---মৎস্যরাজের সীমাশূন্য গৃহে তোমাদিগের রাশি রাশি স্তূপ স্তূপ সজ্জিত মৃতশরীর ভাবিয়া দেখ। ধলা কালা নিগ্রো, সাহেব, বাঙ্গালি, রাজা প্রজা, ধনী, দুঃখী, সুখী, সৌখীন কত রকমের খাদ্য আহরণ করিয়া বন্ধুজনকে বিপুল ভোজ দিয়াছিল!! তখন কে বড় একবার স্থিরমনে বিচার করিয়া দেখ।

জলমগ্নের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখনই তুমি মাপিয়া দেখ না? হে ক্ষুদ্র মানব, তোমাহইতে মৎস্যের রাজ্যসীমা প্রায় তিন গুণ অধিক, জলরাজ্যে তোমার কি আধিপত্য আছে বল। মৎস্য তোমার স্থলরাজ্যের একভাগও প্রায় অধিকার করিয়া রাখিয়াছে।

জলবাসী সামান্য প্রবাল কীটের অসাধারণ কার্য্য একবার তোমার কাজের সহিত তুলনা করিয়া দেখ, বিস্মিত হইবে। কি সামান্য ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া তুমি গঠনচাতুরী দেখাও, প্রবালকীটের কারিকরি, শ্রমশীলতা ও শোভানুভাবকতার কাছে উহা শতবার অধঃকৃত হইবে। ভারতসাগর হইতে মালবের দক্ষিণ পশ্চিম পর্য্যন্ত একটি প্রবালদ্বীপের সারি রহিয়াছে, উহা দৈর্ঘ্যে ৪৮০ ভৌগলিক-মাইল হইবে। আবার নবহলণ্ডের তীর দিয়া একটি অবিভক্ত প্রবালশৃঙ্খল রহিয়াছে, তাহাও ৩৫০ মাইলের ন্যূন হইবে না। এবং নবগিনিতে ৭০০ মাইলেরও অধিক বিস্তৃত একটি প্রবালগিরি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ছোট ছোট আর কত যে আছে তাহা বলা যায় না। কোথায় তোমার তাজমহল, আর কোথায় তোমার সেণ্টপলের মন্দির, আর কোথায়ই বা তোমার সামান্য প্লাইমাউথের বাঁধ?— একজন কবি * যথার্থই বলিয়াছেন যে, "জ্ঞানবান্ মানবের উৎকৃষ্ট ও সুরঞ্জিত হর্ম্ম্যরাজির তুলনায় এই ক্ষুদ্র প্রাণিকীটের চমৎকার সৌধমালা পরমাণুর সহিত বালুকণার প্রভেদ লক্ষিত হইবে। মিশরের প্রাচীন স্তূপই বল আর পিরামীডই বল, উচ্চতায় ইহার

* Jame's Montogomery's "Pelecan Island."

কাছে ক্ষুদ্রচূড়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে, আর সৌন্দর্য্যেও রত্নপ্রস্তরাদি শোভিত প্রাসাদসমূহকে অধঃকৃত করিবে।" এর-হেনবর নামে একজন স্বভাবদর্শী জর্ম্মণ প-ণ্ডিত, লোহিতসাগরে প্রবালদ্বীপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আহা নন্দনকাননের বিবিধ কুসুমরাজিসুশোভিত সৌন্দর্য্য এ আশ্চর্য্য সাগরউদ্যানের কাছে কি স্থান পাইতে পারে?"

প্রবালচরে মৃত্তিকান্তরসঞ্চয়েও অবশেষ মানববাসের উপযুক্ত স্থান হইয়া উঠে, মা-নব তথায় বাস করে। তখন জলবাসী প্র-বালকীট ও ক্ষুদ্র মৎস্যগণ উপহাসচ্ছলে ব-লিতে থাকে, "হে দুর্ব্বল মানব! গভীর সা-গর হইতে তোমার জন্য স্থান বান্ধিয়া উঠা-ইয়াছি,এখন আমাদের প্রজা হইয়া উহাতে বাস কর, এবং তদুপরি কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর, কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের গুণগান কর এবং করস্বরূপ তোমাদের রাশি রাশি মৃতদেহ ভোজনার্থে আমাদিগকে উ-পহার দাও।"—মানব! এখন ভাবিয়া দেখ কে বড়?

মানব তুমি জলচরের নিকট যে কত কারণে ঘৃণিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।—তুমি যে ধর্ম্ম ও জগতের যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও কবিতা লইয়া গৌরব কর, তাহা কোথা হইতে আসিল?—ব্যাস মুনির কথা স্মরণ কর। মৎস্যের সংস্রব তাহাতে ছিল বলিয়াই, মানবসংসারে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়াছ, বেদ বেদাঙ্গ পুরাণ ও সুমধুর কবিত্ব লইয়া এত অহঙ্কার করিতে পারিয়াছ। আর দেখ একদিগে হিন্দুধর্ম্ম, আর একদিগে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের বলেই তুমি এত দূর সভ্য হইয়াছ। তোমার জাতি কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছিল,—তাহাও মহান্ মৎস্যের কল্যাণে। এক ম্যাথু ব্যতীত খৃষ্টের একা-দশ জন ধর্ম্মযাজকই মৎস্যজীবী ছিল। গা-লিলিয়ান মৎস্যজীবী বলিয়া অদ্যাপি তা-হারা জগতে প্রসিদ্ধ। সাধ্বী শকুন্তলার পতিদত্ত অভিজ্ঞান দয়া করিয়া মৎস্যে রক্ষা না করিলে তাঁহার কি উপায় হইত? নারী-প্রধানা নিনিভাকে ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে কে রক্ষা করিয়াছিল? সাগর-তিমি স্বদেশ-প্রতীম জোনাকে হৃদয়ে না রাখিলে, তাঁ-হাকে কে বাঁচাইত? যে গঙ্গার চরণ সেবা করিতে ব্যস্ত হও, যাহার দর্শন একবার পা-ইবে বলিয়া কত কর,—মৎস্যসমাজে তাঁ-হার বাস। যে জ্ঞানের জন্য পণ্ডিত ও বি-জ্ঞানশাস্ত্রাধ্যায়ীর কত আদর কর, কে তা-হাদের মানসিক আলোক যোগায়? সৌধ-রাজি আলোকদানে দিবা করিয়া ঐশ্বর্য্যের মহিমা দেখাও, কে তাহা যোগায়? মু-ক্তার মালা ও প্রবালহার পরিয়া বড় মানুষ সাজ; কে সাজায়? সুন্দর চিরণীতে কুন্ত-লের শোভাবর্দ্ধন কর, উহা কে দেয়?

যদি রাজনৈতিক শক্তি বিবেচনায় তুমি অহঙ্কার করিয়া বড় হইতে চাও,তাহাও তো-মার বৃথা গর্ব্ব। সুরক্ষিত অটল ব্রীটন নৌ-বলে পৃথিবীর অদ্বিতীয়। গর্ব্বিত ইংলণ্ডের অজিত-পরাক্রম নৌযোধ কাহার কৃপায়? বৃটনের নৌবলগণ মৎস্যজীবী,মৎস্যই তাহা-দিগকে সাহস শিক্ষা দেয়। যত দিন সাগরে মৎস্যরাজি আনন্দে বিচরণ করিবে, ব্রীটন ততদিন অটল ও অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

ব্রীটন মৎস্যের কিঞ্চিৎ গৌরব করিয়া থাকেন। বৎসরান্তে গ্রিন্‌উইচ্ বা ব্লাক্‌ওয়ালের মৎস্য ভোজ না হইলে পার্লেমেণ্টের সভা আরম্ভ হইতে পারে না। মানব, তুমি একথা বলিতে পার মৎস্য তোমার জন্য, মৎস্যের জন্য তুমি নহ? যেহেতু অনেক মাছ ধরিয়া তুমি খাও। কিন্তু ইহাতেও ত মাছ ছোট হইল না। তোমার দুর্ভিক্ষ হইলে, মৎস্য আত্মত্যাগ করিয়া তোমার প্রাণ বাঁচায়, উহাতে তাহাদের আর একটি ফল হয়। ফল এই হয় যে, সংখ্যা কমিয়া যায়, নহিলে অত বড় রাজ্যেও তাহাদের স্থান হইত না। তুমি লোকসংখ্যা কমাইবার জন্য উপনিবেশ সংস্থাপনের চেষ্টা পাও এবং কত উপায় চিন্তা কর—এ বিষয়ে মহাত্মা মৎস্যের নিকট তুমি উপদেশ পাইবার যোগ্য।

মৎস্যগণের বংশবৃদ্ধি অতি আশ্চর্য্যজনক, অথচ তুমি ক্ষুদ্রমানব, একটি সন্তানের জন্য কত কামনা কর। দেখ দেখি তুমি কি নির্লজ্জ পরের সন্তানকে ধরিয়া তোমাকে পিতা বলিতে বল। চিরপ্রিয় প্রতিবেশীর উপকার না করিয়া বিদেশী এক বালক দ্বারা ঐশ্বর্য্য নষ্ট কর!! লীউ গ্রণহোক সাহেব বলেন, একটি সামান্য কড্‌মৎস্যের একবারে ৯৩৪৪৩২০০ ডিম্ব হয়, একটি রোহিত মৎস্যের ১০০০০০০, একটি বাটিকার ৫০০০০০ এবং ক্ষুদ্র একটি তপস্বী মৎস্যের ১০০০০ ডিম্ব একযোগে হয়। এবং ইহার সমস্ত গুলিনই অবশেষে বড় মৎস্য হইয়া দাঁড়ায়। বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধেও ইহারা তোমাপেক্ষা বড়।

শুদ্ধ যে বংশবৃদ্ধিগুণে মাছ তোমা হইতে বড় তাহা নহে; শারীরিক বল, গতিশক্তি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই উহাঁরা তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। উহারা অনায়াসে স্রোতের প্রতিকূলে দ্রুতবেগে যাইতে পারে এবং কোন কোন বৃহৎ মৎস্য বিনাকষ্টে গতিবান্ একখানি জাহাজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে, এবং হেলার্য় লেজের বাড়ি দিয়া শত শত আরোহী সহিত অতি বৃহদাকারের জাহাজকেও ডুবাইয়া দিতে পারে। টুনী, গিল্টহেড্, ও সালমন নামে এক জাতীয় মৎস্য আছে, উহারা তীর হইতেও অতি দ্রুতবেগে জলমধ্যে গমনাগমন করিয়া থাকে।

ক্ষণস্থায়ী মানব, তুমি ৬০ কি ৮০ বৎসর বাচিলেই মনে কর দীর্ঘকাল বাচিলে। মৎসের দীর্ঘজীবনের বিষয় এক বার ভাবিয়া দেখ। বাকুন সাহেব বলেন একটি কার্প মৎস্যই দেড় শত বৎসর বাচিয়া থাকে। অন্যান্য মাছ দুই শত বৎসরের অধিক কাল বাচিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে কৈশবলটারণ নামক স্থানে একটি মৎস্য ধৃত হইয়াছিল। ঐ মৎস্যের পাখনায় বিদ্ধ একটি অঙ্গুরী পাওয়া যায়, উহাতে গ্রীক ভাষায় একটি শ্লোক লিখিত ছিল। তাহাতে জানা যায় যে, যখন ঐ মৎস্য ধৃত হয়, তাহার ২৬৭ বৎসর পূর্ব্বে উহাকে নদী হইতে পুকুরে আনিয়া রাখা হয়। কিন্তু তিমির দীর্ঘজীবনের কাছে ইহাও অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। লণ্ডনে একটি তিমিকঙ্কাল প্রদর্শিত হইয়াছিল; একজন শারীরবিদ্যাবিশারদ-পণ্ডিত তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, ঐ তিমি

সম্ভবতঃ এক সহস্র বৎসর বাঁচিয়াছিল। তুমি সামান্য মানব, উহার কাছে সূর্য্য-পতঙ্গবৎ। বল, এখনও কি মৎস্য হইতে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবে?

শারীরিক বল ও বৃহদায়তনে জলবাসিগণ স্থলচর অপেক্ষায় অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। যে সকল জলচর সর্ব্বদা সাগরে বা নদীস্রোতে দেখা গিয়া থাকে, এ প্রস্তাবে কেবল তাহাদের বিষয়ই বিবৃত হইল। তা ছাড়া গভীর সাগররাজ্যে কত বড় বড় জীব বাস করে তাহার নিশ্চয়তা কি? পুরাণে বর্ণিত মকর, মামথ, সাম্বুদন, মেগাথেরিএস্ প্রভৃতির কথা কে না জানে?

মারমিড্ নামে এক প্রকার জলজীব একজন আমেরিকার সাহেব, এক স্থানে দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—ইহারা বিদ্যাধরী-তুল্য সুন্দর, এবং রজনীযোগে অতি সুমধুরস্বরে গান করিয়া থাকে। পুরাণোক্ত জলবাসী শংখ্যাদের তনয়ার রূপে শ্রীকৃষ্ণ মোহিত হইয়াছিলেন। গ্রীকপুরাণেও এইরূপ (Shell blowing Tritons & Dolfin-riding Nereids) নিরাদের বর্ণনা আছে,—উহা ভিনাস্ হইতে কম সুন্দর নহে। অদ্যাপিও তুমি সুন্দরীর গলদেশ বর্ণন করিতে, শঙ্খগ্রীবা বলিয়া উপমা দিতে লজ্জিত হও না। অতএব হে মানব! জলবাসী হইতে তুমি সৌন্দর্য্যেও শ্রেষ্ঠতর নহ।

তুমি যদি মণিমুক্তা এবং ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বড় হইতে চাও, তাহা হইলে কি অপূর্ব্ব ধনরাশি সাগরহৃদয়ে পড়িয়া রহিয়াছে একবার ডুবিয়া দেখ। লক্ষ পৃথিবীপতির ধন এক সাগরই যোগাইতে পারে। সাগরের ধন ত অতুলনীয়। কেবল সময় সময় তুমি যে কর দিয়া থাক, একবার তাহারই হিসাব করিয়া দেখ। কত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, মণি, মুক্তা ও হীরক বোঝাই, কত সুগন্ধি, সুখাদ্য, এবং কত সুন্দর বস্ত্র ও অস্ত্র বোঝাই জাহাজ ও নৌকা তুমি জলরাজকে হেটমুণ্ডে উপহার দিয়াছ ও দিতেছ; তাহাও ভাবিয়া দেখ। আর দেখ জলে ডুবিয়াও মৎস্যের উদরে স্থান পাইয়া যে পুণ্য ও নাম হয়, তোমার স্বর্গবাসী হইলেও তাহা হয় না। সুধাসিঞ্চিত লাইসিডাস নামক উৎকৃষ্ট কাব্য কি সূত্রে উৎপত্তি হইয়াছে, পুস্তকপাঠী মানব তাহা তুমি অবগত আছ। সুতরাং এখন আমার সহিত একমত হইয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর, তুমি মৎস্য হইতে নিকৃষ্ট, হীন, নির্ব্বোধ, নির্ধন, ক্রূর, কৃপণ, কঠিন, পাপী, নীচ ও ক্ষুদ্রমনা। *

* পশুপ্রকৃতির সহিত মনুষ্যপ্রকৃতির এই ভাবে তুলনা হইলে এই সৃষ্টজগতে মনুষ্য হইতে অধম আর নাই। কিন্তু মনুষ্য তথাপি মনুষ্য বলিয়াই পূজনীয়,—এবং তাহার উন্নতি ও অবনতি, মহত্ব ও মলিনতা, তাহার সম্পদ ও বৈভব, অভাব ও অপূর্ণতা, সমস্তই অসামান্য।— সঃ

—— ◦◦◦ ——

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। 'কাদম্বিনীর বিবাহ কি সম্বন্ধ? কলিকাতা, Published by H.C. Sharma S.'—ইহা একখানি নাটক, অর্থাৎ নাটকের আকারে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত, এবং মধ্যে মধ্যে গীত ও গজলে অলঙ্কৃত। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, ইহা নাটক হউক অথবা নভেল হউক, আমরা ইহার নামার্থ * লইয়াই বিষম বিভ্রাটে পড়িয়াছি, এবং যে গ্রন্থের বিস্‌মেল্লায়ই এইরূপ গলদ্, সেই গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক অর্থগ্রহ ও সমালোচনা করিতে পারিব কি না, সে বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছি।

আমরা আমাদিগের স্থূলবুদ্ধিতে স্থূলতঃ এই বুঝিয়াছি যে, গ্রন্থকার ব্রাহ্মসমাজের কোন এক সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ, এবং সেই সম্প্রদায়ের বিরোধিদিগকে ধার্ম্মিকের মত গালি দিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন ও আত্মপ্রসাদ লাভই তাঁহার এই গ্রন্থপ্রকাশের একমাত্র অভিপ্রায়। কিন্তু ধার্ম্মিক হইলেই যে মনুষ্য মনুষ্যত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায় কিংবা মনুষ্যপ্রকৃতির দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে পারে এমন নহে। সুতরাং আমাদিগের গ্রন্থকার ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক জ্ঞান করিয়াছেন যে, তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া পূজনীয় হইলেও মনুষ্যপদ-বাচ্য; তাঁহার ভয়ও আছে, ক্রোধও আছে। পাছে স্বনামপ্রকাশে স্বীকৃত-দায়িতায় গালি দিলে বিরুদ্ধপক্ষ তাহার প্রতিশোধ দেয়, এই তাঁহার ভয়;—এবং ব্রাহ্মসমাজের একটা প্রসিদ্ধ বিবাহ উপলক্ষে এত লোকে গালি দিল ও গলাবাজি করিল, অথচ তিনি কিছুই কহিতে পাইলেন না, এই তাঁহার ক্রোধ। 'কাদম্বরীর বিবাহ কি সম্বন্ধ' এই বাতপৈত্তিক নাটক; উল্লিখিত ভয় ও ক্রোধের মিশ্রণ জন্য ফল, অথবা অপরিপাক-জন্য উদ্গার।

ইহা বলা বাহুল্য যে, আমরা এইরূপ নাটকের পক্ষপাতী নহি। ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রলোকের অবশ্যই নানাবিষয়ে মত-ভেদ ঘটিতে পারে। কিন্তু মত-ভেদ ঘটিলেই নাটক লিখিয়া অথবা সংবাদপত্রে 'প্রেরিত' পাঠাইয়া তাহাকে অভদ্রের মত গালি দিতে হইবে, ইহা কে বলিয়াছে? ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রলোকের অবশ্যই নানা কারণে শত্রুতা ঘটিতে পারে। কিন্তু কাহারও সহিত শত্রুতা ঘটিলে, অমনিই যে তাহার ভার্য্যা, ভগিনী ও কন্যা প্রভৃতি প-

* 'বিবাহ কি সম্বন্ধ?' অর্থাৎ কাদম্বরীর বিবাহকে, বিবাহ বলিব, না সম্বন্ধ বলিব? অথবা, কাদম্বরীর বিবাহ, কি সম্বন্ধে? সামানাধিকরণ্যে? না, বৈয়ধিকরণ্যে? দোহাই ভগবান্ পাণিনি, কাত্যায়ন পতঞ্জলির, আমরা কোন দিগ্ দিয়াই 'বিবাহ কি সম্বন্ধ?' এই প্রশ্নগর্ভ বাক্যের অর্থ করিতে পারিতেছি না।

রিজনদিগকে নাটক লিখিয়া ব্যঙ্গচিত্রে চিত্র করিতে হইবে, ইহা কোন্ দেশীয় শিষ্টাচারের ব্যবস্থা? আর নাটক? যে দেশে এই রূপ নাটক লিখিত হয় ও পঠিত হয়, সেই দেশেও কি কখনও সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে? গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন, তিনি কি পণ্ডিত? তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন অগ্রনায়ককে চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব, তাঁহার কন্যাটিকে কাদম্বরী, কন্যাসদৃশী স্নেহাস্পদা অন্য একটি বিধবা যুবতীকে মহাশ্বেতা, বঙ্গের প্রান্তবর্ত্তী কোন এক পার্ব্বত্যপ্রদেশের রাজপুত্রকে উজ্জয়িনীর চন্দ্রাপীড় এবং কতকগুলি ব্রাহ্মভদ্রলোককে গন্ধর্ব্ব সাজাইয়া কলমে যাহা উঠিয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন, অতএব তিনি কি বুদ্ধিমান্! কিন্তু তাঁহার এমনই বিকট কল্পনা-শক্তি, এমনই ভয়াবহ কবিত্ব যে,—যে কাদম্বরী বাণভট্টের অলোকসামান্য চিত্রনৈপুণ্যে প্রীতির পুষ্পিত প্রতিকৃতি বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃতা রহিয়াছেন, সেই কাদম্বরী বাসরঘরে বসিয়া, মুখে ঘোমটা টানিয়া, ছড়া কাটিতেছেন; এবং যে মহাশ্বেতা চরিত্রের পবিত্র প্রতিভায় আজও জগতের পূজা পাইয়া আসিতেছেন, সেই মহাশ্বেতা,—সেই জলদগ্নিশিখারূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতা, আপনার প্রেম-ব্রত ও বৈধব্যব্রত যুগপৎ বিস্মৃত হইয়া, বার-বিলাসিনীর মত জঘন্যরসের ঘৃণ্যলহরী ছড়াইতেছেন। আমরা এস্থলে জটাধারী ও মহাশ্বেতার কথোপকথন হইতে কএকটি পংক্তি তুলিয়া দিতেছি। গ্রন্থকার কিরূপ অসাধারণ কবি, এই ক'টি পংক্তিতেই তাহার পরিচয় হইবে।—

"জটা। বড় সামান্য কথা হ'ল না। থাক্ ছুঁড়ী, আমি তোকেই না চাব!

মহা। আমাকে আর নাচাবে কি?—যে অবধি এই শুভঘটনার সূত্রপাত হইয়াছে, আমার চিত্ত দিবানিশি আনন্দে নৃত্য করছে!

জটা। রাখ্ তোর চিত্ত নিত্ত,—এই সভায় নাচ্‌তে হবে! *

মহা। লোক পাচ্ছনা বুঝি? কেন দিদিমাকে বায়না দেওগে না?

জটা। (জনান্তিকে) বায়না টায়না সব, হয়ে গেছে,—আয় না, মজা দেখ্‌বি?"†

বাঙ্গালি যাত্রাওয়ালারা বাবুদের মনোরক্ষার্থ সীতা ও কৌশল্যাকেও আসরে আনিয়া নৃত্য করাইয়া থাকে। বাঙ্গালি কবি যদি মহাশ্বেতা প্রভৃতিকে বাসরঘরে একবার নাচাইতে না পারেন, তবে তাঁহার আর বাহাদুরী কি? হা! বাণভট্ট, তুমি এখন কোথায়? তোমার মহাশ্বেতা, বৈধব্যের জটাবল্কলে পরিশোভিত হইয়া, কিরূপ নৃত্য করিতেছেন, একবার তুমি দেখিলে না!

* আমরা দেখিলাম, এই গ্রন্থে যেখানে নৃত্যের কথা, সেই খানেই বিস্ময়ের চিহ্ন (!)। ইহা কি হর্ষে, না বিস্ময়ে?—না, ভাবের বিহ্বলতাজনিত রস-সঞ্চারে?

† এই পংক্তিদ্বয়ে সুন্দর অনুপ্রাস আছে। যথা,—বায়না,—টায়না,—আয় না।
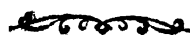
ভারতশক্তির মহোৎসব।

যেমন অন্ধকার আর আলোক প্রকৃতরূপে মিশিতে পারে না, সেইরূপ রাজনীতির সহিতও প্রীতির পরিমিশ্রণ হয় না। ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ ও চিরপ্রসিদ্ধ, এবং সহজেই লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়। কারণ, যে প্রীতি আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, আত্মনিগ্রহে পরাঙ্মুখ, সে প্রীতি প্রীতি নহে;—যে প্রীতি ক্ষতিলাভগণনা ও পরকীয় শক্তির অভিভববাসনাতেই অধীর রহে, সে প্রীতি প্রীতি নহে;—যে প্রীতি সারল্যের নিষ্মলবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্পের কুটিলগতি অবলম্বন করে, কুসুমের সুকুমার মাধুরীতে উদাসীন হইয়া প্রভুত্বের প্রমাদিনী মদিরার জন্য লালায়িত হয়, এবং নিখিল সংসারকে একটি বৃত্তস্বরূপ কল্পনা করিয়া আপনাকে তাহার কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে, সে প্রীতি প্রীতি নহে। কিন্তু প্রীতির সহিত পরিমিশ্রণ হয় না বলিয়া কবিতার সহিতও যে রাজনীতির মিশ্রণ হইতে পারে না, ইহা ভ্রান্তির কথা।

কবিতা প্রীতির মত কুসুম-বিলাসিনী, অথচ রাজনীতির মত বজ্রবিহারিণী; কবিতা ফুলে ফুলে বিচরণ করে, অথচ বিদ্যুতের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া,—বিদ্যুতের ন্যায় দ্রব বহ্নিতে পরিণত হইয়া শৈলে শৈলে ও সমুচ্ছ্রিত মেঘমণ্ডলে বিদ্যোতিত হইয়া থাকে। কবিতা কামিনীর কঙ্কণ-ঝঙ্কার ও সারস্বতী বীণার মৃদুনিক্কণের ন্যায় চিত্তহারিণী, অথচ আগ্নেয় গিরির দূরশ্রুত আরাবের ন্যায় ভয়বিধায়িনী। কবিতা কখনও বিনোদমালায় বিভূষিত, কখনও মুণ্ডমালায় অলঙ্কৃত। উহাতে বিরহিণীর অপরিস্ফুট বিলাপ ও ভুজঙ্গের পরিস্ফুট গর্জ্জন উভয়ই সমানভাবে প্রকাশিত হয়। উহা শিশুর ন্যায় হাসিতে জানে, কাঁদিতে জানে; অথচ বিমর্দ্দিত অভিমানের অন্তস্তলস্থ অনলরাশি উদ্গীরণ করিতেও অসমর্থ নহে। উহাতে কখনও 'নিবাত নিষ্কম্প' দীপ-শিখা, অথবা নিবাত স্রোতস্বিনীর অপরূপ শান্তি; কখনও বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের আস্ফালন ও শক্তির কল্লোল-গর্জ্জন;—কখনও বিনতি, কখনও বিদ্বেষ, কখনও অশ্রুমোচন, কখনও শোণিত-বর্ষণ। বস্তুতঃ কবিতা এই উভয় ধর্ম্মশালিনী। উহার এক নাম ললিত-বনিতা, আর এক নাম কালভৈরবী। উহার ভুবনমোহন মুখমণ্ডলের এক ভাগে বিভ্রম-বিলাস, আর এক ভাগে ভ্রূকুটিভঙ্গি। উহার সহিত প্রীতির যেরূপ এক-প্রাণতা আছে, রাজনীতিরও সেইরূপ এক-প্রাণতা রহিয়াছে;—এবং যাঁহারা এই নিগূঢ় সত্য উপলব্ধি করিতে চাহেন, অথবা যাঁহারা প্রেমের

প্রলাপ ও বিরহ-বিলাপে বিতৃষ্ণ হইয়া, রাজনৈতিক কবিতার উজ্জ্বল লাবণ্য দর্শন ও অস্ত্রঝঞ্ঝনা শ্রবণে অভিলাষী হন, ভারত-শক্তির শারদীয় মহোৎসব-স্বরূপ ত্রিলোক-দুর্লভ 'দৃশ্য কাব্য' তাঁহাদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ ও হৃদয়-তৃষ্ণার উদ্দীপনের জন্য নির্জ্জীব ভারতক্ষেত্রকে দুন্দুভিনাদে নিনাদিত করিতেছে।

যাহারা মূর্খ ও শিক্ষালোকে বঞ্চিত,—পুরোহিতের অনুরোধ ও প্রতিবেশীর অনুশাসন বিনা আর কোন কারণ যাহাদিগের মনের উপর কার্য্য করিতে পারে না, তাহারা যে এই রাজনৈতিক কাব্য অথবা জাতীয় কাব্যোৎসবের অর্থগ্রহ করিতে পারে না, ইহা বিস্ময়কর নহে। তাহারা তাহাদিগের সুচিক্কণ-বস্ত্রাবৃত ও সুগন্ধি তৈল-সেবিত স্থূল দেহ লইয়া দীর্ঘজীবী হউক। কিন্তু যাঁহারা সুশিক্ষিত ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন,—যাঁহারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও যে এই মহোৎসবের মর্ম্মার্থ পাঠে অসমর্থ, ইহা যেমনই বিস্ময়কর, তেমনই দুঃখজনক। ইহার প্রধান কারণ এই, তাঁহারা যখন কবিতার কুঞ্জে প্রবেশ করেন, তখন রাজনীতির ভৈরব গর্জ্জন ভুলিয়া যান; যখন রাজনীতির ভৈরব গর্জ্জনে বিভ্রান্ত হইয়া উঠেন, তখন কবিতার কণ্ঠমাধুরী বিস্মৃত হন। ভারতবাসীর এই জাতীয় উৎসব, ইতিহাস-বিশ্রুত অন্যান্য বিখ্যাত জাতির জাতীয় উৎসবের ন্যায়, সামান্য উৎসব নহে। ইহা জাতি বিশেষের প্রাণ-গত কবিতা ও প্রাণ-সঞ্জীবনী রাজনীতির অপূর্ব্ব মিশ্রণ। যিনি কবিতার আলোকে রাজনীতি ও রাজনীতির দীপ্তিতে কবিতা পাঠ করিতে না পারিবেন, এ উৎসব তাঁহার জন্য নহে। ইহাতে জীবন্মুক্তি অথবা নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রভৃতি কোনরূপ মুক্তির কথা নাই। আছে এক মাত্র শক্তিনিষ্ঠ সৌন্দর্য্যের কথা। যিনি জাতীয় শক্তির আরাধনায় কবিতার মহিমাময় সৌন্দর্য্য দেখিতে না পান, এ উৎসব তাঁহার জন্য নহে।

এই কাব্যোৎসবের আদিস্থান ভারতীয় আর্য্যের পৌরাণিক কাব্য;—এবং সংস্কৃত যাঁহাদিগের শিক্ষাপ্রদীপ, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, সেই সরস পৌরাণিক কাব্য মানবজাতির প্রথমোদ্গত কবিকল্পনার প্রমোদ-কুঞ্জ। সেখানে সকলই সুন্দর, সকলই মধুর। সেখানে মলয়-মারুত মধুর গন্ধ বহন করিয়া মৃদু হিল্লোলে প্রবাহিত হয়; বিহগাবলী মধুর কণ্ঠে গাইয়া গাইয়া মধুর স্ফূর্ত্তিতে উড়িয়া বেড়ায়;—মধুকর ও মধুকরী, ফুলের মধু ও প্রেমের সুধায় উন্মাদিত হইয়া, ত্রিতন্ত্রীর মৃদুগুঞ্জনের ন্যায় মধুরগুগুনে মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়। সেখানে তরঙ্গ ধীরে খেলে, তরঙ্গিণী ধীরে বহে;—চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কৌমুদী সরোবরের স্বচ্ছসলিলে দুলিয়া দুলিয়া নৃত্য করে, অথবা তরুলতার শ্যামলচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত হইয়া লজ্জার সজীব মাধুরী ছড়াইয়া দেয়। সেখানে শোভা ও সৌরভ মিলিত হইয়া সম্মিলনের সার্থকতা জন্মায়,—সেখানে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যেন প্রাণে প্রাণে জড়িত হইয়া নিত্য নূতন বিলাসে বিলসিত রহে। কিন্তু কাব্যের এই বিশাল নিকুঞ্জকাননের মধ্যে একটি নিভৃত ছায়ামণ্ডপ আছে। সেখানেও

সৌন্দর্য্য আছে; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য মধুর নহে; উহা রৌদ্ররসে রঞ্জিত, রৌদ্রভাবান্বিত, ভয়ঙ্কর। পতনোন্মুখ কুলিশ-কান্তিতে যে সৌন্দর্য্য, উহা সেই সৌন্দর্য্য। দামিনীর ক্ষণিক ভাতি অথবা দাবানলের নৈশ আলোকে যে সৌন্দর্য্য,উহা সেই সৌন্দর্য্য। উহা শরৎশশীর জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল কিংবা সুখপ্রদ নহে, প্রখর-মার্ত্তণ্ডদ্যুতির ন্যায় দুর্ব্বিষহ। সেখানে ভ্রমরের গুঞ্জন কিংবা স্রোতস্বিনীর কল-নিঃস্বন শ্রবণগোচর হয় না; কিন্তু উন্মত্ত স্রোতের উন্মাদন-ধ্বনি শ্রুতি নিপীড়ন করে,—এবং যে সকল চিন্তা হৃদয়কে উগ্রভাবে উদ্বেল করিয়া তুলে, ভয়ানকের প্রতি অনুরক্ত করায় এবং বহ্নির লেলিহান জিহ্বা ও বিষ-সর্পের বিস্তারিত ফণা লইয়া ক্রীড়া করিতে মতি জন্মায়, তাহাই অন্তরের অন্তরে আসিয়া আহৃত ও প্রত্যাহৃত হয়। সেই স্থানই ভারত-শক্তির ভজনাগৃহ, এবং আমরা যাহাকে শারদীয় উৎসব অথবা ভারত-শক্তির মহোৎসব বলিয়া অভিনন্দন করি, সেই স্থানেই সেই উৎসবের আদি উৎসব;—আরাধ্য দেবতা জাতীয় শক্তি, আরাধনা শক্তির বিকাশ ও শক্তির উচ্ছ্বাস। কবিতা আপনি সেখানে যোগিনী সাজিয়া শক্তির রাজনৈতিক মূর্ত্তিকে কবোষ্ণ রুধির-ধারায় তর্পণ করিতেছে, এবং—বরং দেহি, বলং দেহি, জয়ং দেহি ভয়ঙ্করি—এই-বলিয়া বরাভয়-করা মূর্ত্তিমতী শক্তির নিকট শক্তি যাচিতেছে।

এ উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান 'বোধন'। কিন্তু বোধন কাহার? না, শক্তির। শক্তি নিদ্রাগত, নিদ্রামৃত;—অতএব শক্তির উদ্বোধন কর। দারুদেহে অগ্নির ন্যায়, দুগ্ধরাশিতে নবনীতের ন্যায়, অথবা ধাতবপিণ্ডে বৈদ্যুতিকের ন্যায়, শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শয়ান রহিয়াছে;—অতএব শক্তির নিদ্রাভঙ্গে যত্নশীল হও। শক্তিই জগদ্যন্ত্রের নিয়ামিকা, নিয়তির অগ্রনায়িকা, অদৃষ্টের দৃষ্টি,অসাধ্যের সাধনী,—শক্তির সংস্পর্শ হইলে অন্ধ দিব্যনেত্র লাভ করে,বধির শ্রুতিপটুতা পায়, পঙ্গু পর্ব্বত-লঙ্ঘনে সমর্থ হয়,এবং লতার কোমল আঘাতে বটবৃক্ষের কঠিন কলেবর কিংবা পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া যায়;—অতএব শক্তির চৈতন্যসম্পাদনে ব্রতী হও। এই বিঘ্নসঙ্কুল ভব-সংসারের উর্ম্মিমালায় শক্তিই একমাত্র ভেলা,—দুর্ব্বলের বল, বিপন্নের বন্ধু, এবং ত্রাণার্থীর আশ্রয় স্থল; শক্তি বিনা জ্ঞানে জ্যোতি নাই, আর্ত্তনাদে মুক্তি নাই, অশ্রুজলে দয়ার দৃষ্টিপাত-সম্ভাবনা নাই;—অতএব শক্তির আবাহন কর।

আবার সেই আবাহন,—সেই অকালবোধন কিসের জন্য? মনুষ্য যে দেবতার আরাধনা করে, তাহার মুখ্য প্রয়োজন চিত্তের শান্তি, চিত্ত-বৃত্তির সংযম, ক্রোধাদি কলুষিত ভাবের প্রশমন এবং আত্মার শোধন। কেন না, হৃদয়ের দুর্ব্বার প্রবৃত্তি সকল যদি সংযত না হয়, হৃদয় যদি শান্তির অমৃত-নীরে অবগাহন না করে, হৃদয়ের মলিনতা ও আবিলতা যদি প্রক্ষালিত হইয়া না যায়, তাহা হইলে সে আরাধনার মূল উদ্দেশ্য কখনও সংসিদ্ধ হয় না। এই নিমিত্তই পৃথ্বীবিখ্যাত প্রধান সাধকেরা কর্দ্দম ও চন্দনকে সমান যত্নে সেবন করিতে বলিয়া-

ছেন, এবং ঔদাস্যকে ধর্ম্মের আদিবীজ জানিয়া সংসারের সুখ-সম্পদ-ত্যাগে মতি দিয়াছেন। এই নিমিত্তই তপস্যার পথপ্রদর্শক ঋষিতাপসেরা নিরুদ্যম নিরীহ জীবনকেই জীবনের শান্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—শত্রুমিত্রকে সমান জানিয়াছেন;—এবং যে হৃদয়ে অরুন্তুদ আঘাত দেয় ও সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নেয়, এই নিমিত্তই তাঁহারা তাদৃশ মর্ম্মান্তিক শত্রুরও মঙ্গলকামনার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এ বোধনে সকলই ইহার বিপরীত। ইহার প্রবর্ত্তক-ধর্ম্ম তপোবনের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। ইহা ঔদাস্যের পরিবর্ত্তে আধিপত্য, শান্তির পরিবর্ত্তে শৌর্য্য ও সংযমের পরিবর্ত্তে রাজনৈতিক সম্পদের জন্য আরাধনা করে;—এবং যে প্রতিবিধিৎসাকে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম পার্থিব পঙ্কিলতা জ্ঞানে পরিত্যজ্য বলিয়াছেন, ইহা সেই প্রতিবিধিৎসাকেই জীবন-সংগ্রামের অবলম্ব জ্ঞান করিয়া অগ্রে শক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা, এবং পশ্চাৎ সেই অনুপ্রাণিত শক্তির নিকট শত্রুসংহারের সংকল্প করে।—

"রাবণস্য বধার্থায়, রামস্যানুগ্রহায়চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃপুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামিবৈ।
শক্রেণাপিচ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি
বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্য-
স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥" *

অয়ি শক্তিস্বরূপিণি! জগন্ময়ি! রাবণের বধসাধন ও রামের প্রতি অনুগ্রহ বিধানের জন্য ব্রহ্মা একবার অকালে তোমার বোধন করিয়াছিলেন। আমিও আজি আশ্বিনী ষষ্ঠীর সায়ংসময়ে সেইরূপ তোমার বোধন করিতেছি। স্বর্গাধিপতি শক্র তোমারই বোধন করিয়া সুরলোকের রাজা হইয়াছেন; আমিও সেই হেতু রাজ্য, বৈভব ও প্রতিপত্তি বাসনায় তোমারই বোধনে কৃতসংকল্প হইব, এবং রামচন্দ্র যেমন দশাননকে নিধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার স্ফূরণে শত্রুর নিপাত সাধন করিব।

উপাসনার এ ভাব ভয়াবহ, উপাসকের এইরূপ সংকল্প আতঙ্কজনক। ইহার অন্তর্মূলে ঘনীভূত বেদনা, ঘনীভূত বিক্ষোভ, ঘনীভূত স্পর্দ্ধা ও ঘনীভূত পুরুষকার। কিন্তু এইরূপ সংকল্পই পুরুষকে পার্থিব জীবনের উপযোগী অজেয় গরিমা প্রদান করে; ইহাই ইচ্ছাকে লালসা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দৃঢ় ও বলসম্পন্ন করিয়া তুলে, এবং ইহারই প্রসাদাৎ ভীরু সিংহের বিক্রমে বিক্রান্ত হয় ও কর্দ্দম হইতে কালাগ্নি উঠে। মনুষ্য একদিনে মনুষ্য হয় না। তাহাকে একদিকে ভয়, আর একদিকে ভাবনা এবং তৃতীয়দিকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও কোমল সুখের উদ্ধৃত হইতে পারে। যথা,—

"ওঁ আগচ্ছমদ্গৃহে দেবি শক্তিভিরষ্টভিঃসহ।
পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্ব্বকল্যাণকারিণি।
এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয়-জয়প্রদে।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দেহিদেবি নমোস্তুতে।
চণ্ডি ত্বং চণ্ডরূপাসি সুরতেজোমহাবলে।
প্রবিশ্যাতিষ্ঠযজ্ঞেস্মিন্ যাবৎপূজাং করোম্যহম্।"

* কালিকাপুরাণ। শক্তির আবাহন বিষয়ক কবিতার কএকটি পংক্তিও এস্থলে

কোমলবাসনা আকর্ষণ করে,—এবং সে আকর্ষণের এইরূপ বিপাকে পড়িয়া পুনঃপুনঃ স্খলিত হয়,ও পুনঃপুনঃই পুনরুত্থানের জন্য যত্ন পাইয়া থাকে। এইরূপ বিপত্তিতে সংকল্পের দৃঢ়তাই মনুষ্যের অদ্বিতীয় বল। সুতরাং মনুষ্য যখন ভক্তির আসনে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনার গম্ভীরভাবে সংকল্প করে যে, সে ভয়-ভাবনা ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া মনুষ্য হইবে,—পতিত ব্যক্তির পশুভাব ও পাদ-দলিত অবস্থা হইতে পুনরুত্থিত হইয়া পুরুষের মত দণ্ডায়মান হইবে,এবং আরাধনার ধন শক্তিলাভে কৃতার্থ হইয়া নিজ জীবন কিংবা জাতীয় জীবনের উচ্চ-ব্রত উদ্‌যাপনে কায়মনঃপ্রাণে রত হইবে,—তখন তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করা অনুচিত নহে। সংকল্প স্বভাবতঃই শক্তির প্রস্রবণ। মনুষ্য যে বিষয়ে কেন প্রগাঢ় চিত্তে সংকল্প করুক না, অসাধ্য হইলেও তাহা ক্রমে সুসাধ্য হইয়া আইসে। যদি ঐ সংকল্প আবার অন্তর্গূঢ় বেদনা কর্ত্তৃক প্রণোদিত এবং উপাসনার ভাবে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পরিগৃহীত হয়, —যদি প্রয়োজন উহার চালনা করে, এবং কাব্য অথবা কবিতাময় ধর্ম্ম উহাকে অবলম্ব দেয়, তবে উহা কিরূপ সামর্থ্য প্রদান করিতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন।

বোধন ও সংকল্পের পর একবার এই উৎসবের উপাস্য দেবতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; —সেই কল্পিত শক্তিমূর্ত্তি কবিহৃদয়ের প্রদীপ্ত প্রতিভায় উজ্জ্বল হইয়া রূপের ছটায় কিরূপ ঝলসিয়া পড়িতেছে,—রূপ ও তেজ তরল-তরঙ্গে সূর্য্যকিরণের ন্যায় কিরূপ বিচিত্রলীলায় ক্রীড়া করিতেছে,তাহা নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ কর। দেখ,ঐ আদ্যাশক্তি,প্রকৃতির প্রতিকৃতি,—বিলম্বিত জটাভারে ভয়ঙ্করা, অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা,পাশবশক্তির সারভূত সিংহ-পৃষ্ঠে কি অনির্ব্বচনীয় ভীষণ-শোভায় শোভা পাইতেছে,—এবং শক্তির মৃণালায়ত দশবাহু, দশদিকে প্রসারিত হইয়া, খড়্গ-খেটক,চক্রত্রিশূল ও পাশাঙ্কুশ প্রভৃতি প্রহরণের প্রভায় কি ভয়ানক দৃষ্ট হইতেছে। আরও দেখ, দক্ষিণে ও বামে সম্পদ ও সারস্বত-বৈভবের প্রতিমাস্বরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতী,—তদুভয়ের উভয় পার্শ্বে সেনানায়ক ও গণনায়ক, * চতুষ্পার্শ্বে উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা প্রভৃতি অষ্টশক্তির অষ্টনায়িকা, †—পদতলে রক্তরক্তীকৃতাঙ্গ, রক্তবিস্ফুরিতলোচন, শূল-নির্ভিন্ন মহিষাসুর, এবং উর্দ্ধে,—শক্তিসাধকের শিক্ষা, দীক্ষা ও আদর্শস্থলে নীল-মেঘ-বলয়িত শ্বেত-পর্ব্বতের ন্যায় নিপীত-কালকূট নীলকণ্ঠ ভাবুকের হৃদয়কে কত ভাবে আকুল করিয়া উঠাইতেছে। কি অপূর্ব্ব কাব্য! কি অপূর্ব্ব

* গণনায়ক শব্দের ইংরেজী অনুবাদ Leader of the People অথবা Representative of the Popular Power.

† এই অষ্টশক্তির সঙ্গে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিকালে অথবা গভীর নিশীথে চামুণ্ডার যে আবাহন হয় তাহার ধ্যান এইরূপ—
"ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।"

দৃশ্য ! কি মনোহরচ্ছবি ! যে ইহা দেখিয়াও উৎফুল্ল না হয়,—শৌর্য্য ও সৌন্দর্য্যের এ-কত্র এইরূপ সমাবেশ দেখিয়াও সজীব-শক্তির আরাধনায় অনুরাগী না হয়, তাহার মৃৎপিণ্ডসদৃশ অসার হৃদয়কে ধিক্। সৃষ্টিনৈপুণ্যেই কবিত্বের চরম পরীক্ষা ও পরমোৎকর্ষ। যিনি এই পট আঁকিয়া রাখিয়াছেন, এই দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, কবিত্বের কল্পতুলিকা লইয়া রাজনীতির এই রমণীয় আ-লেখ্য লিখিয়া দেখাইয়াছেন;—যিনি মনুষ্যকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় আপনার কল্পনাসমুদ্রের অন্তর্নিহিত রত্নখনি হইতে এই জ্যোতির্ম্ময়ী রত্নমালা উ-দ্ধার করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, তাঁহার অতুল সৃষ্টিচাতুরীকে অভিবাদন করি।

এই দৃশ্যপটের চিত্রনিবেশে অতিগভীর চিন্তা ও অসামান্য ভাবুকতার পরিচয় রহি-য়াছে। ইহাতে শক্তির একদিকে জ্ঞানদার এবং আর একদিকে কমলার মূর্ত্তি সং-স্থাপন করিয়া স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ করা হই-য়াছে যে,—জ্ঞান-বল ও ধন-বল পৃথক্ পৃথক্-রূপে আদরণীয় ও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রয়োজনীয় হইলেও জাতীয় শক্তির পরিচালনার সময়ে জ্ঞান-বল বিনা ধন-বলের প্রয়োগ হয় না, এবং ধন-বল বিনা জ্ঞান-বলে অভীষ্টফল ফলে না। অপিচ, এই পটের একপ্রান্তে সেনানায়ক এবং আর একপ্রান্তে গণনায়কের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুনরপি বলা হই-য়াছে যে, সামাজিক বলের এই দুই প্রধান প্রতিনিধিকে একসূত্রে গাঁথিতে না পারিলে, শক্তির সর্ব্বাঙ্গীন মূর্ত্তি কিছুতেই কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হয় না। কিন্তু এই মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে নীলকণ্ঠই এই দৃশ্যপটে সাধকের শিক্ষাগুরু। ঐ নিশ্চলচ্ছবি,—নিমীলিত নেত্রে সাধক-বৃন্দকে ধীর গম্ভীর বাক্যে উপদেশ ক-রিতেছে যে, যদি শক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইতে চাও, তাহা হইলে ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া হিমাচলের ন্যায় অটল হও;—যদি প্রাকৃত-শক্তির প্রমত্ত প্রভাবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পুরুষের মধ্যে পুরুষ ও দেবতার মধ্যে দেবতা হইতে চাও, তাহা হইলে উদ্গীর্ণ হলাহলপানে প্রস্তুত হও। যাহারা ক্ষুদ্রজীব ও ক্ষুদ্রদেবতা, তাহারা মু-ক্তাপ্রবাল, মণিরত্ন ও অমৃতের জন্য লালা-য়িত রহুক। কিন্তু যিনি সুরাসুর সকলের পূজ্য, তাঁহার ভাগ্যে বিষ। যে যেকোন দুষ্কৃত করুক, তিনি তাহার ভার বহন করি-বেন; এবং শক্তিসমুদ্রের বিলোড়নে যাহা কিছু অপ্রিয়, অপ্রীতিকর ও দুঃখজনক সমু-দ্ভূত হউক, তিনি তাহাই গণ্ডূষজলের ন্যায় পান করিয়া ফেলিবেন। এ শিক্ষা ও এই অচিন্তনীয় দৃশ্য ভুলিবার নহে। যে সং-সারে অমিশ্রসুখ ও অমিশ্রসম্পদ দুর্ল্লভ প-দার্থ,—কুসুম কণ্টক-জালে বেষ্টিত ও মণি ফণিরক্ষিত;—যে সংসারে প্রভুত্ব ও প্রতি-পত্তি হিংসায় জড়িত এবং মহত্ব ও গৌরব বিদ্বেষের বিষ-দৃষ্টিতে সতত অভিভূত—যে সংসারে শক্তির সংঘর্ষণ হইলেই অগ্নিজলে এবং অমৃতের জন্য সিন্ধু মন্থন করিলেও গরল উঠে, সেই সংসারে ঐ নীলকণ্ঠ-মূর্ত্তির প্রতি স্থির দৃষ্টি না রাখিলে,—কণ্টকের আঘাত, সর্পের দংশন, অগ্নি ও বিষের জ্বালা সহিয়া লইতে সামর্থ্য উপার্জ্জন না করিলে, সাধনার

পথে একপদও উন্নত কিংবা অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে।

ইহার পর উপাসনা। একথা না বলিলেও অনুমিত হইতে পারে যে, দেবতা যেমন বীরারাধ্যা, উপাসনাও সেইরূপ বীরভাবে আতটপূর্ণা ও টলটলায়মানা। এ উপাসনার অবতরণিকা হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বীররসের উচ্ছ্বলিত বেগ,—বীরভাবের ভীম-ভঙ্গি ও লীলালহরী। ইহা উল্লাসময়, আড়ম্বরময়, ঘনঘটাপূর্ণ, ও রাজায়মান। যে উপাসনায় অশ্রু ঝরে, স্মৃতিরূঢ় দুরিতানলে হৃদয় দহে, ইহা সে উপাসনা নহে। যে উপাসনায় মন বিষয়-তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্ব্বেদ কিংবা বৈরাগ্যের আশ্রয় লয়, ইহা সে উপাসনা নহে। ইহাতে,—

"ধর্ম্মায় নমঃ, অধর্ম্মায় নমঃ,—জ্ঞানায় নমঃ, অজ্ঞানায় নমঃ,—বৈরাগ্যায় নমঃ, অবৈরাগ্যায় নমঃ,—খড়্গায় নমঃ, * পাশায় নমঃ,—জয়ায়ৈ নমঃ, বিজয়ায়ৈ নমঃ।"

ইহার মন্ত্রসকলও এইরূপ অদ্ভুত ও অভাবনীয়।—

"খাদয় খাদয়,—ছেদয় ছেদয়,
হন হন, দহ দহ, মারয় মারয়।
ছিন্দি ছিন্দি—ভিন্দি ভিন্দি,—
কিলি কিলি—চিকি চিকি,
পিব পিব রুধিরং।"

এই প্রকার রোমহর্ষণ শব্দনিবহেই এই উপাসনার আরাধনা ও প্রার্থনা, এবং শক্তিবিকাশের চিরপরিপন্থি কামাদি বৃত্তির উচ্ছেদনস্বরূপ পশুবলির পর, শত্রু-সংহারের বিচিত্র অভিনয় ও বিজয়-হলহলাতেই ইহার সমাপ্তি ও বিসর্জ্জনা।

তবে কথা এই, ভারতে এই বীররস-বিলাসি জাতীয় উৎসবে উৎসাহিত হইবার যোগ্য লোক এইক্ষণ কৈ? যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই, শক্তির উপাসনায় উপেক্ষা করিয়া, অবলাজনোচিত সুখের স্রোতে ফুলের মত ভাসিয়া যাইতেছে,—সিংহের কুলে জন্মধারণ করিয়া শৃগাল-বৃত্তিতে ক্ষুৎপিপাসার চরিতার্থতা সাধন করিতে শিখিয়াছে;—অসি ভাঙিয়া বাঁশি বানাইয়াছে, রুদ্রবেশ বিসর্জ্জন করিয়া রমণী সাজিয়াছে, এবং ঝটিকার ঘোর গর্জ্জনে ভীত হইয়া অঞ্চল-বায়ু নিষেবনে অঙ্গের বেদনা যুড়াইতেছে, সেই জাতিতে শক্তির এই উল্লাসময় উৎসবে উল্লসিত হইবার উপযুক্ত পুরুষ এইক্ষণ কোথায়? ইহা স্বীকার করি যে, এ উৎসবের আদ্যোপান্ত সমস্তই একটি রূপক মাত্র,—ইহা কবির সৃষ্টি ও কল্পবৃক্ষ। কিন্তু যে কল্পনা, তাড়িতের তরল স্রোতের ন্যায়, জাতীয় হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হইতে পারে,—যে কল্পনা শক্তির প্রীতি ভক্তি জন্মাইয়া আশা ও আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা সাধন করে,—যে কল্পনা বজ্র লইয়া খেলা করিতে শিক্ষা দেয়,

---

* খড়্গের এইরূপ মূর্ত্তি কল্পনা দৃষ্ট হয়।
"ওঁ কৃষ্ণং পিণাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপিণং।
উগ্রং রক্তাস্যনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনং।
রক্তাম্বরধরঞ্চৈব পাশহস্তং কুটুম্বিনং।
পিবমানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানংক্রব্যসংহতিং।"
পুনশ্চ।
"ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারোদুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোস্তুতে।"

সেই ক্রীড়াময়ী কল্পনার প্রতি আজিকার এ দুঃখের দিনে এইরূপ অবহেলা ও অবজ্ঞা কেন? এই ভারত কোন দিন সজীবশক্তির আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিয়াছে,—এবং উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্ব পশ্চিমে,—শৈল-শৃঙ্গে, সাগর-বক্ষে,—গ্রামে ও বনে, স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই শক্তির জয় শঙ্খ বাজাইয়া ও জয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া জাতীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছে। তখন হিমাদ্রির অভ্রভেদী মস্তক ভারতশক্তির বন্দনা করিত, সমুদ্রের তরঙ্গরাজি সেই শক্তির গভীর হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিত,—ভারতীর কর-ধৃত বীণা দীপক ও হিন্দোল প্রভৃতি বিবিধ উদ্দীপক রাগে তাঁহার স্তুতিগীত গাইত,—এবং শত্রুমিত্র সকলেই তাঁহার সম্ভজনীয় নামে দূর হইতে প্রণত হইত। এইক্ষণ সেই দিন আর নাই। সেই সুখ-সৌভাগ্য, সম্পদ-গরিমা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে;—সেই প্রতাপসূর্য্য অস্ত গিয়াছে। এইক্ষণ ভারতীয় নভোমণ্ডল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, ভারতের মুখ চন্দ্রমা বিষাদে মলিন। যদি কবিতার কল্পিত উৎসবও এই অন্ধকারকে ক্ষণকালের তরে শক্তির আলোকে আলোকিত করে, সহৃদয় ভারতসন্তানের আশাপূর্ণ অধীর প্রাণ তাহাতে আলোড়িত ও উন্মাদিত হইবে না কেন?

রাজপুতানার ইতিবৃত্ত

উপক্রমণিকা।—

প্রথম অধ্যায়।

ভূগোলবেত্তারা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর প্রতিকৃতি বলিয়া থাকেন। ভূগোলবিদ্যা-বিষয়িণী বিষয়পরম্পরার একত্র সমাবেশ সন্দর্শনে তাঁহারা যে আমাদের ভারতবর্ষকে একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কোন অংশেই যুক্তি বিরুদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা পৃথিবীর স্থানে স্থানে নানাবিধ চমৎকার জনক পদার্থ দর্শন করিয়া পরিশেষে আমাদের অধিষ্ঠানভূতা ভারত ভূমিকে সেই সকল নয়ন-তৃপ্তিকর সম্পত্তি-সম্পন্না দেখিয়া প্রীতি সহকারে উক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা কোন হিম-প্রধান প্রদেশে তুষার-ধবলিত শৈল শৃঙ্গ দর্শন করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে সর্ব্বেশ্বর জগদীশ্বরের অতুল কীর্ত্তির ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন;—গিরিনন্দিনী নির্ঝরিণীর স্ফটিক-নিন্দিত নির্ম্মল সলিলের রুণু রুণু পতন-তানে পুলকিত হইয়া বিভুর গানে মত্ত হইয়াছেন;—বিজন গহন কাননে সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদের ঘন ঘোর গভীর গর্জ্জন শ্রবণে ভীতিসম্বলিত চমৎকার রসে আপ্লুত হইয়া মনে মনে ভয়-ভঞ্জনের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়াছেন;—বালুকাময় দুর্গম মরুস্থলে জীবন রক্ষার উপ-

যোগী বিবিধ পদার্থের সমাবেশ দর্শনে করুণাময়ের অপার করুণায় বারংবার ধন্যবাদ করিয়াছেন;—কোনস্থানে উন্নত-পর্ব্বত-শিখর উর্দ্ধে গগন ভেদ করত শূন্যে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে দর্শনে পরম পুলকিত হইয়াছেন;—প্রবলসলিলা স্রোতস্বতীর তরঙ্গাভিঘাতে কত কত আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়ন গোচর করিয়াছেন;—ভূগর্ভ খনন করিয়া স্তর হইতে স্তরান্তরে গমন পূর্ব্বক কতই অদ্ভুত পদার্থের কঙ্কাল মাত্র দর্শন করিয়াছেন। কেবল যে তাঁহারা এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়াই আপনাদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন এমন নহে, ভূগোল বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের পত্রে পত্রে প্রকটন করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য জাতির নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কোন্ জাতি বা সভ্যতাশিখরের উন্নত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া নিম্নচারী অসভ্যমণ্ডলীর প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতেছে;—কোন্ জাতি বা করে শাণিতশরনিকর ধারণ পুরঃসর বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছে;—কোন্ জাতি বা বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে দিক্‌বিজয়ী হইবার জন্য সুতীব্র যন্ত্র সহকারে পৃথিবীর গতি, সূর্য্যের জড়ত্ব, নক্ষত্রমণ্ডলের সঞ্চার প্রভৃতির গণনা করিতে বসিয়াছেন;—কোন্ জাতি বা বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সভ্যপদাধিষ্ঠিত জনগণের প্রতি উপহাস করিয়া আম মাংস ভক্ষণ, অবিদ্যার আলোচন, মৃৎপিণ্ডাদি জড়ের উপাসনা প্রভৃতি কার্য্য পরম্পরা দ্বারা আপনাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক উলঙ্গভাবে বিচরণ করিতেছে, এ সকলও তাঁহাদিগের গ্রন্থ পত্রে মুদ্রিত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। তখন পর্য্যন্তও ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের চরণস্পর্শে কৃতার্থতা লাভ করে নাই। ভারতের চিত্তচমৎকারিণী শোভা তখনও তাঁহাদিগের নয়ন গোচর হয় নাই। তাঁহারা পৃথিবীর বহুলাংশ পরিভ্রমণ করিয়া যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন দেখিলেন,—উত্তরে গিরিকুলগর্ব্ব তুঙ্গশৃঙ্গ হিমালয়,দক্ষিণে সাগর-সলিল-সম্পৃক্ত কন্যাকুমারী, পশ্চিমে পঞ্চনদ-পরিপ্লুত পঞ্চালদেশ এবং পূর্ব্বে গিরিগহন-সমন্বিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ্ এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তিনী ভারতভূমি পৃথিবীর যাবতীয় রমণীয়তার আধার। তখন তাঁহারা ভারতের গুণ-গরিমা প্রকটিত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সমুদায় বর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এমন কি, দেবতারাও এখানে আসিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করেন। যথা;—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তুতে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥
কর্ম্মাণ্যি সংকল্পিততৎফলানি
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে
তস্মিল্লঁয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি॥
জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং বিলীনে,
স্বর্গ প্রদে কর্ম্মণি দেহ বন্ধম্।
প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা-

যে ভারতেনেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ॥”

বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়,
২৪। ২৫। ২৬ শ্লোক।

“দেবগণ এইরূপ গান করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও ধন্য, কারণ তাঁহাদের জন্মভূমি ভারতভূমি, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের আস্পদ। নির্ম্মল নিষ্পাপ লোকেরা এই কর্ম্মভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক ফল-কামনা-বিমুখ হইয়া যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা, পরমাত্মাস্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হন। আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, কবে আমাদের স্বর্গপ্রদ পুণ্য ক্ষয় হইবে এবং কবে আমরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিব, কারণ যাঁহারা সমুদায় ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য।”

এখন আর এ সকল পৌরাণিক বাক্যে সকলে তৃপ্তিলাভ করেন না। রামায়ণ-বর্ণিত বানররাক্ষসসংগ্রামজনিত বিবিধ বীভৎস ব্যাপার স্মরণে কেহ আর পুলকিত হন না। ভারতযুদ্ধ আর্য্যদিগের একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উহাকে যেরূপ চিত্রে রঞ্জিত করিয়াছেন, যদি তাহার শাখা পল্লবাদি পরিত্যাগ করিলে কেবল সারভাগের মধ্যেও কিয়দংশ সত্যরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলেও ভারতীয় আর্য্যগণ বীর-কুল-গৌরব তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর কোন অংশেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যায় আর যুদ্ধ ঘটে নাই। তত সৈন্য সামন্ত আর কখনই একত্রিত হয় নাই। সেই জন্যই কহিতেছি—ভারতযুদ্ধব্যাপার মনে হইলে আর্য্য-শোণিত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। রামায়ণ-বর্ণিত ব্যাপারের বহুকাল পরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। * প্রথমটি ত্রেতাযুগে, এবং দ্বিতীয়টি দ্বাপরযুগের শেষে সংঘটিত হয়। † ভারত ইতিহাসে একবার সেই এক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, তাহার পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কেবল গৃহবিচ্ছেদ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সবিতা এককালে অস্তমিত হই-

* হুইলার সাহেব একথা, স্বীকার করেন না। তিনি কহেন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের অনেক পরে রামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয় হইয়াছে। তিনি ‘আপনার গণ্ডা ষোল আনা’ প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে গুলি সাহেব দিগের ভাল লাগিতে পারে; আমাদের ত কোন মতেই ভাল লাগিল না। ভাল লাগিল না বলিতেছি, কিন্তু কোন্ দিন বা আমরা ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া ঐ কথাই লিখিয়া ফেলিব; কারণ অনুবাদ ভিন্ন আমাদের যে কোন ক্ষমতা নাই!

† আমাদিগের শাস্ত্রে সত্যত্রেতাদি যুগের যে বৎসর সংখ্যা লিখিত হইয়াছে, আমি তাহা মানিতে বলিতেছি না। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত বৎসর কাল পাওয়া যায়, তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বিতীয় ভাগে রামরাবণের যুদ্ধ ও তৃতীয় ভাগের শেষে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ধরিলে, পৌরাণিক অঙ্ক সংখ্যার হাত এড়াইতে পারা যায়।

য়াছেন, আর উদয়ের সম্ভাবনা নাই। এ রত্ন কে হারাইল?—আমরা আপনারাই। আমরা গৃহবিচ্ছেদে জ্বালাতন হইয়া, শত্রুর প্রতি দ্বেষপরবশ হইয়া, আপনাদিগের সর্ব্বনাশ আপনারাই করিলাম, বিজাতীয় বিপক্ষকে ভারতের গুপ্ত দ্বার দেখাইয়া দিলাম। ধনরত্নপরিপূর্ণ পেটিকার কুঞ্চিকা বিপক্ষের হস্তে প্রদান করিলাম, তাহাকে ভারতের সিংহাসনে বসাইয়া স্বহস্তে তাহার করে রাজদণ্ড ও মস্তকে মুকুট প্রদান করিয়া অবনত মস্তকে যুগ্ম করে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলাম।—অধিক কি কহিব, তাহার আজ্ঞায় স্বজাতিশোণিতে কর রঞ্জিত করিতে ত্রুটি করি নাই। এমন যে আমরা, আমাদিগকে ধিক্কার-চীৎকারে বার বার গালি প্রদান করি!

ভারতবর্ষে না ছিল কি? আমাদিগের কিসের অভাব ছিল? ভারতবাসিগণ পৃথিবীকে যাহা দেখাইয়াছে, যাহা উপদেশ দিয়াছে, তাহা পৃথিবীর অপর কোন স্থানেই পাওয়া যাইবে না। বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম্মবীরত্ব প্রভৃতি পুরুষকার ভারতমধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর এখন অনেক জাতিই সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু যখন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতি নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় কালাতিপাত করিত, নিরক্ষরভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, বন্যজন্তুর ন্যায় অযত্নসুলভ খাদ্যে উদর পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত, উলঙ্গ হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিত, বলিতে কি, বন্যজন্তু অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত না,—তখন আমাদের ভারতবর্ষ সভ্যতার উন্নতশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইয়ুরোপকে কে সভ্য করিল?—ভারতবর্ষ। যে সকল বিদ্যাপ্রভাবে ইয়ুরোপ এক্ষণে সভ্যতাশিখরে আরোহণ করিয়াছে, বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সে সকল বিদ্যার যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতেই ইয়ুরোপে নীত হইয়াছে, এ কথা এখন অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা পাঠকবর্গকে যে ইতিবৃত্ত উপহার দিবার জন্য দীর্ঘ প্রস্তাবনার অবতারণা করিলাম, এক্ষণে তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা আমাদের ভারতবর্ষ লইয়া যত কিছু স্পর্দ্ধা করি, রাজপুতানা তাহার মূলভিত্তি। রাজপুতানা যথার্থই বীরপ্রসবিনী। আমরা অধিক দিন পূর্ব্বের কথা বলিতেছি না, মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে রাজপুত বীরমণ্ডলী যে প্রকার বীরত্ব দেখাইয়াছেন, যদি কএক জন রাজপুতকুলগ্লানি কাপুরুষ, মুসলমানদিগের সহিত বৈবাহিকসূত্রে কুটুম্বত্ব সংস্থাপন করিয়া তাহাদিগের পদানত না হইত, তাহা হইলে ভারতের রাজলক্ষ্মী এত দিন কাহাকে আশ্রয় করিতেন বলিতে পারি না। কেবল জ্ঞাতিবিরোধ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই রাজপুতানার পতন হইয়াছে। বীরজননী রাজপুতানার ইতিবৃত্ত সহৃদয় পাঠকবর্গের মনোজ্ঞ হইবে বলিয়াই আমরা এই দুঃসাহসিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিলাম। রা-

মায়ণ ও মহাভারতের বর্ণিত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণের বংশধরেরা কে কোথায় গিয়া বাস করিলেন, কে কোন্ নগর সংস্থাপন করিলেন, কে পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন, এগুলি জানিবার জন্য কাহার চিত্ত না কৌতূহলোদ্দীপ্ত হইয়া উঠে! অদ্যাপিও যে তাঁহাদের বংশ এককালে লোপ প্রাপ্ত না হইয়া ভারতের স্থানে স্থানে বিরাজ করিতেছে, ইহা জানিলেও মনে আনন্দরসের উদয় হয়। রাজপুতের সাহস, রাজপুতের বিক্রম, রাজপুতের বীরত্ব, রাজপুতের স্বদেশহিতৈষিতা, রাজপুতের ধনসম্পত্তি ও তাহার সদ্ব্যবহার, এসকল লিপিবদ্ধ করিতেও শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। মোগল সম্রাটেরা স্ব স্ব জীবনবৃত্তমধ্যে আপনাদিগের প্রবল শত্রু রাজপুতগণের বীরবত্তা ও সাহসিকতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল মহাত্মা টড্ সাহেব রাজস্থানের পুরাবৃত্ত নামে যে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় নিম্ন লিখিত কতিপয় পংক্তি লিখিয়া আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যথা ;—

"The little exact knowledge that Europe has hitherto acquired of the Rajpoot states, has probably originated a false idea of the comparative importance of this portion of Hindusthan. The splendour of the Rajpoot Courts, however, at an early period of the history of that country, making every allowance for the exaggeration of the bards, must have been great. Northern India was rich from the earliest times ; that portion of it, situated on either side the Indus, form the richest satrapy of Darius. It has abounded in the more striking events which constitute the materials for history ; there is not a petty state in Rajsthan that has not had its Thermopylæ, and scarcely a city that has not produced its Leonidas. But the mantle of ages has shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration : Somnath might have rivalled Delphos ; the spoils of Hind might have vied with the wealth of the Lybian king ; and compared with the array of the Pandus, the army of Xerxes would have dwindled into insignificance. But the Hindus either never had, or have unfortunately lost, their Herodotus and Xenophon."

ধন্য মহাত্মা টড্! তুমি নিরপেক্ষ চক্ষে রাজস্থানের রাজপ্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীর, ও গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূগর্ভ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছ। তোমার গ্রন্থের কত কত পত্রে এরূপ সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালি পাঠককে ইহার কিরূপ অনুবাদ উপহার দিব? বঙ্গভাষার অবয়ব

এখনও এমন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, যে আমরা তদ্দ্বারা উপরিউক্ত বিষয়টি সাধারণের গোচর করি। সহজ কথায় এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, টড্ সাহেব কহিয়াছেন ‘এমন দেখি নাই, দেখিব না; হয় নাই, হইবেও না।’ আমাদের এ কথায় কেহ উপহাস করিবেন না। থার্ম্মপিলির ন্যায় সমরক্ষেত্র এবং লিওনিডাসের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ বীরপুরুষ জগতে দুর্লভ। ভারতীয় কুরুক্ষেত্র সদৃশ থার্ম্মপিলিক্ষেত্রের জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধ ও লিওনিডাসের কীর্ত্তি নিরুপম বলিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যখন মহাত্মা টড্ সাহেব রাজপুতানার প্রত্যেক প্রদেশে থার্ম্মপিলির ন্যায় স্মরণীয় স্থান এবং নগরে নগরে লিওনিডাসের ন্যায় স্মরণীয় ব্যক্তি ছিল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তখন পৃথিবীর মধ্যে আর কোন্ স্থান রাজস্থানের সমতুল্য হইতে পারে! টডের এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে বিন্যস্ত করিয়া আসন সম্মুখস্থ প্রাচীরে সযত্নে রক্ষা করা স্বদেশহিতৈষী হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি।

আমরা ভারতবর্ষের যে বিভাগের বিবরণ লিখিতেছি, তথাকার প্রচলিত ভাষায় তাহাকে রাজোয়ারা এবং সাধুভাষায় রায়থান কহে, এবং বোধ হয় এই শেষোক্ত শব্দ হইতেই ইহার নাম রাজস্থান হইয়াছে। আমাদিগের দেশীয় নামের মনোহারিত্ব সাহেবেরা দিন দিন নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের অনুকরণে আমরাও রায়থানকে রাজপুতানা বলিতে শিক্ষা করিয়াছি। এখন এমন হইয়াছে যে রাজপুতানা না বলিলে হয় তো রাজপুতেরাও চিনিতে পারিবেন না। ইহার পশ্চিমে সিন্ধু নদী, পূর্ব্বে বুন্দেল খণ্ড, উত্তরে শতদ্রুনদীর দক্ষিণস্থিত ‘জঙ্গলদেশ’ ও বালুকাভূমি এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় একলক্ষ চতুরস্র ক্রোশ হইবে। রাজপুতানার মধ্যে মিবার বা উদয়পুর, মাড়োয়ার বা যোধপুর, বিকানীর, কিষনগড়, কোটা, বুঁদী, অম্বর বা জয়পুর এবং জসলমীর এই কয়টি সুবিখ্যাত প্রদেশ সন্নিবেশিত আছে। যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজপুতগণের বংশবিবরণ ও নগর সংস্থাপন।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে ক্ষত্রিয়দিগের দুইটি বংশ বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে তাহার অনেক শাখা প্রশাখা ভারতবর্ষ মধ্যে বিস্তারিত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শাখাই বিলুপ্তপ্রায়, রাজস্থানে এখন ষট্ত্রিংশ মাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহারা তথায় ‘ছত্রিশ রাজকুল’ নামে বিখ্যাত। যে দুই আদিম বংশ হইতে ইহাদের অধিকাংশই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ নামে পরিচিত। সূর্য্যপুত্র বৈবস্বত মনু হইতে সূর্য্যবংশ এবং চন্দ্রপুত্র বুধ হইতে চন্দ্রবংশ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহার পর আবার সূর্য্য বংশ হইতে গ্রাহিলোট প্রভৃতি এবং চন্দ্র-

বংশ হইতে যদু প্রভৃতি বংশ এবং প্রসিদ্ধ শাখা চতুষ্টয়-সমন্বিত-অগ্নিকুল একত্রিত হইয়া ক্রমে ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে কতকগুলি নানা শাখা প্রশাখায় বি-ভক্ত, যে গুলির আদৌ বিভাগ নাই, তা-হাদিগের নাম 'এক'। নিম্নে ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের নাম লিখিত হইল। * যথা ;—

১ সূর্য্য, ২ চন্দ্র, ৩ গ্রাহিলোট্ বা গুহ-লোট্, ৪ যদু, ৫ তুয়ার; ৬ রাঠোর, ৭ কচ্-বহ, ৮ প্রমর, ৯ চাহুমান, বা চোহান, ১০ চালুক বা সোলাঙ্কি, ১১ পরিহার, ১২ চাত্তরা, ১৩ তাক বা তক্ষক, ১৪ জিঠ্, ১৫ হুন্ বা হুন্, ১৬ কাট্টী, ১৭ বল্ল, ১৮ ঝালা, ১৯ জৈৎবা বা কমারী, ২০ গোহিল, ২১ সারুপ, ২২ সিলার, ২৩ দাবী, ২৪ গোড়, ২৫ দোদা বা দর, ২৬ ঘরবাল, ২৭ বৃগুজ্জর, ২৮ সেঙ্গর, ২৯ শেকরবাল, ৩০ বৈসি, ৩১ দাহিয়া, ৩২ জোহিয়া, ৩৩ মোহিল, ৩৪ নিকুম্প; ৩৫ রাজপালী, ৩৬ ডাহিম। †

১ সূর্য্য।— হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, তাঁহার পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যপুত্র বৈবস্বত মনু। বৈবস্বতের নয় পুত্র ও ইলা

* রাজপুত ইতিবৃত্ত সংগ্রহকার মহানু-ভব টড্ সাহেব বংশাবলির পরিচয় লা-ভের জন্য পাঁচ ছয় খানি তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহাতে ছত্রিশকুলেরই নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু নামগুলি অন্যান্য তালি-কার সহিত ঠিক মিলন হয় না। ইহাতে বোধ হয়, ক্রমে নামও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় তালিকা বিখ্যাতনামা চাঁদ কবির গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, উহাতে রাজপুতদি-গের ছত্রিশকুল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু নামোল্লেখ সময়ে কবি ত্রিশটির অ-ধিক করেন নাই। 'কুমার পাল চরিত' গ্রন্থে দুইটি কুলতালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সংস্কৃত তালিকায় সাতাইশটি এবং গুজরাটী তালিকায় তেত্রিশটির অ-ধিক নাম পাওয়া যায় না। রাজপুত কুলজ্ঞ মগজী নামক সুপ্রতিষ্ঠিত কবির তালিকায় সম্পূর্ণ ছত্রিশটি নামই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাও নামে নামে ঠিক মিলন হয় না। সৌরাষ্ট্র দেশের তালিকাই সমধিক প্রা-মাণ্য বোধে টড্ সাহেব অন্যান্য তালি-কার সহিত মিলন করিয়া এবং রাজপু-তানা প্রদেশীয় নৃপতিনিচয়ের রাজধানীতে যে সকল নিদর্শন বর্ত্তমান আছে তাহা দে-খিয়া যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তা-হাই এখন আমাদের অনুকরণীয় হইয়াছে। কারণ তদপেক্ষা প্রামাণ্য নিদর্শন আর আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। টড্ সাহেব ছত্রিশ রাজকুল বজায় রাখিয়া কহিয়াছেন যে, এতদ্ভিন্ন হুল ও দাহি না-মক আর দুইটি কুল আছে।

† ইংরেজীতে প্রকাশিত দেশীয় শব্দের যেরূপ উচ্চারণগত বিভিন্নতা হয় তাহা পা-ঠকবর্গের অগোচর নাই। ইংরেজীই যখন আমাদের আদর্শ তখন এই নামগুলি শু-নিয়া হয় ত রাজপুতবর্গ কতই হাসিবে। করি কি—আমাদের উপায়ান্তর নাই। সা-হেবেরা যিনি যে রকম পারিয়াছেন সেই মত লিখিয়াছেন, আমরাও যে রকমে লেখা সুবিধা হয় তাহাই করিতেছি।

নাম্নী এক কন্যা। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইক্ষ্বাকু হইতে শাখাদ্বয়বিশিষ্ট সূর্য্যবংশ প্রাদুর্ভূত হয়। ইক্ষ্বাকুর দুই পুত্র, বিকুক্ষি ও নেমি; বিকুক্ষি হইতে অযোধ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত সূর্য্যবংশ অবতীর্ণ হয়। অযোধ্যানগর ইক্ষ্বাকুকর্ত্তৃক সংস্থাপিত। ইক্ষাকু হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত সপ্তপঞ্চাশৎ পুরুষ। এই বংশের বিখ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত কর্ত্তৃক রোহ্‌তস্‌ বা রোটাস নগর এবং তদীয় পৌত্র চম্পদ্বারা চম্পাপুরী সংস্থাপিত হয়। রাম-তনয় লব হইতে সৌরাষ্ট্রীয় সূর্য্যবংশ এবং মিবারের সিসোদিয়া রাজগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। কুশ সন্তান হইতে জয়পুরের কূর্ম্ম বা কচ্‌বহ্‌ বংশ অবতীর্ণ হইয়াছে। বৈবস্বত মনুর তৃতীয় পুত্রের তৃতীয় দৌহিত্র আনর্ত্ত কর্ত্তৃক আনর্ত্তরাজ্য ও তদন্তর্গত কুশস্থলী দ্বারকা সংস্থাপিত হয়। ইক্ষ্বাকুর দ্বিতীয় পুত্র নেমি হইতে মিথিলা দেশস্থ সূর্য্যবংশ প্রাদুর্ভূত হয়। নেমিপুত্র মিথি হইতে ঐ দেশের নাম মিথিলা হয়। এক্ষণে উহার নাম ত্রিহুত।

২ চন্দ্র।—সূর্য্যবংশ অপেক্ষা চন্দ্রবংশ সমধিক বিস্তৃত। ব্রহ্মার অপর এক পুত্রের নাম অত্রি, তাঁহার পুত্র সমুদ্র, সমুদ্রপুত্র চন্দ্র, তাঁহার পুত্র বুধ। বৈবস্বতমনুকন্যা ইলার সহিত বুধের গান্ধর্ব্যবিধানে বিবাহ হয়। ইহাঁদেরই সন্তানপরম্পরা চন্দ্রবংশ নামে বিখ্যাত। বুধপুত্র পুরূরবা, তাঁহার পুত্র আয়ু, আয়ুপুত্র নহুষ, তাহার পুত্র যযাতি হইতে তিনটি বৃহৎশাখা বহির্গত হইয়াছে। যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর চতুর্থ পুত্র ক্রস্থ হইতে ষষ্ঠ পুরুষ রাজা শশবিন্দু চেদিদেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় যে বংশবিস্তার করেন, তাহাতে শিশুপাল নামে সুবিখ্যাত রাজার জন্ম হয়। চেদিদেশ সম্ভবতঃ এখনকার চন্দেরী হইতে পারে। যদু হইতে চত্বারিংশ পুরুষ সাত্যতির তিন পুত্র, বেসনি, দেববৃত্ত এবং ওওুক। ওওুক হইতে যে দুইটি শাখা বিস্তৃত হয়, তাহার প্রথমটিতে কংস ও দ্বিতীয়টিতে বাসুদেবকৃষ্ণ জন্মপরিগ্রহ করেন। এই শেষোক্ত শাখায় শূর ও সেনী নামে দুই রাজা ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদের উভয়ের নামেই মথুরা প্রদেশ শৌরসেনী নাম গ্রহণ করিয়াছে। যদুর ষষ্ঠ পুত্র সত্যজিৎ হইতে হৈহয়বংশের উৎপত্তি। এই বংশে সহস্রবাহু অর্জ্জুন ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত নৃপবর্গ জন্মগ্রহণ করেন। যযাতির দ্বিতীয় পুত্র পুরু হইতে বিংশ ও একবিংশ পুরুষ দুষ্মন্ত ও ভরত। ভরতের অতি-বৃদ্ধ-প্রপৌত্র হস্তি দ্বারা হস্তিনাপুর সংস্থাপিত হয়। হস্তির তিন পুত্র, অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের চারি পুত্র, শান্তি, জন, ঋক্ষ, বৃহদিষু। শান্তি হইতে চতুর্থ পুরুষ হর্য্যশ্বের পাঁচ পুত্র, কাম্পিল্য, প্রবীর, বৃহদিষু, শ্রীঞ্জয় ও মুদ্গল। এই পঞ্চভ্রাতা একত্রে পঞ্চালরাজ্য সংস্থাপন করেন, এবং জ্যেষ্ঠের নামানুসারে রাজধানীর নাম কাম্পিল্যনগরী হয়। কনিষ্ঠ মুদ্গলের বংশে দ্রুপদরাজা জন্মপরিগ্রহ করেন। অজমীঢ়ের দ্বিতীয় পুত্র জন হইতে চতুর্থ কুশিকের পুত্র গাধী ও পৌত্র বিশ্বামিত্র। অজমীঢ়ের তৃতীয় পুত্র ঋক্ষের পৌত্র কুরু; কুরুর দুই পুত্র, সুধনু ও পরীক্ষিৎ। জ্যেষ্ঠের বংশে বিশাল পরাক্রম জরাসন্ধ জন্মগ্রহণ করেন।

কনিষ্ঠ পরীক্ষিৎ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ প্রতীপের শান্তনু ও বাহ্লিক নামে দুইপুত্র হয়। শান্তনুর পৌত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং বাহ্লিকের পৌত্র শল্য। দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, এই পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্র। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু, পৌত্র পরীক্ষিৎ এবং প্রপৌত্র জন্মেজয়। অজমীড়ের চতুর্থ পুত্র বৃহদিষুর ষোড়শ পুরুষ পরে বল্লতের পুত্রগণ হইতে পার্ব্বতীয় ভীল জাতি প্রাদুর্ভূত হয়। হস্তির দ্বিতীয় পুত্র দ্বিমীঢ়ের বংশে রিপুঞ্জয় ও বাহুরীত প্রভৃতি রাজগণ জন্মলাভ করেন। যযাতির তৃতীয় পুত্র উরু হইতে অষ্টম পুরুষ বিরুতের আট পুত্র, তন্মধ্যে দ্রুহ্য ও বভ্রু হইতে দুইটি শাখা প্রাদুর্ভূত হয়। দ্রুহ্যবংশীয় প্রচিত উত্তরে ম্লেচ্ছ দেশের রাজা হইয়াছিলেন। এই বংশে কর্শন রাজের চারি পুত্র, কালিঞ্জর, কেরল, পাণ্ড্য ও চোল। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয় স্ব স্ব নামানুসারে চারিটি রাজ্য সংস্থাপিত করেন। বভ্রু বংশীয় অঙ্গ কর্তৃক অঙ্গদেশ ও অঙ্গবংশ সংস্থাপিত হয়। এই বংশীয় পৃথুসেন কুরুক্ষেত্রসমরে উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষিতের অষ্টাবিংশ পুরুষ ক্ষেরণ রাজ হইতে পাণ্ডববংশ লোপপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার মন্ত্রী বিসর্ব্ব তদীয় প্রাণ সংহরণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিসর্ব্ব হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ সদপাল স্বীয় মন্ত্রী কর্তৃক নিহত হন। ঐ মন্ত্রীই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। জরাসন্ধের পৌত্র মারজরী হইতে দ্বাবিংশ পুরুষ রিপুঞ্জয় পৃথুদন-কর্তৃক নিহত ও সিংহাসনচ্যুত হন। পৃথুদনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র নন্দিবর্দ্ধন। শিশু নামক হিমালয় প্রদেশস্থ নাগবংশীয় রাজা নন্দিবর্দ্ধনের সিংহাসন অধিকার করেন। শিশুনাগ হইতে দশম পুরুষ মহানন্দ। ইনি প্রমর বা মোরী বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সিংহাসন চ্যুত হন। বিখ্যাতনামা অশোক রাজা চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক হইতে সপ্তম পুরুষ রাজা বৃহদ্রথ মগধ হইতে দূরীভূত হইয়া মধ্য ভারতবর্ষে ধারপ্রদেশে গমন পূর্ব্বক তথায় বসতি বিস্তার করেন।

(ক্রমশঃ।)

মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ

(পঞ্চম খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠার পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

মুসলমানশক্তি উন্নতির সোপানপরম্পরায় দ্রুতপাদবিক্ষেপে উঠিতে লাগিল। বসোরানগরী হস্তগত করিয়া সে শক্তি নিদ্রিত রহিল না। বলদৃপ্ত সেনাপতি খালেদ ডামাস্কস্ নগরী জয় করিতে লোলুপ হইলেন। এই নগরী পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত নগরী অপেক্ষা প্রাচীন; যেমন দেখিতে সুন্দর, বহুবিস্তীর্ণ, তেমনই সমৃদ্ধ ও গৌরবপূর্ণ। প্রকৃতির স্নেহপালিত ডামাস্কস্ লিবানন্ পর্ব্বতের শৃঙ্গমালায় সুসজ্জিত, মধ্য দিয়া ক্রুসোরা বা স্বর্ণনদী প্রবাহিত। মনুষ্যের কৌশল যে পর্য্যন্ত শোভাসম্বর্দ্ধনে সমর্থ, এই নগরীতে তাহা অবশিষ্ট ছিল না। এক দিকে রমণীয় নিকুঞ্জবন, মনোহর পুষ্পোদ্যান, নয়নরঞ্জন ফলপূর্ণ বাগানসকল; অন্যদিকে নির্ঝর-বিধৌত উর্ব্বরা ভূমিভাগ শ্যামলশস্যপূর্ণ।

কে না জানে ডামাস্কসের গোলাপ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ? বিলাস যদি কোথায়ও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে ডামাস্কসে। নগরী বিলাসসুখের বালশয্যা। সুগন্ধি জল, তৈল; উৎকৃষ্ট মদিরা; সুস্বাদু ফলনিচয়; রেসম ও পশমনির্ম্মিত বস্ত্রাদি; সুবাসপূর্ণ কুসুম, ধূপ, গুগ্গুল, চন্দন;—যে দিকে দৃষ্টিপাত কর ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথায়ও ডামাস্কসের তুলনা ছিল না। ডামাস্কস্ বাণিজ্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। ডামাস্ক্ নামক প্রসিদ্ধ পট্টবস্ত্র এবং ভল্ল তরবারি এই নগরীতেই প্রথম প্রস্তুত হয়। ইয়ুরোপ ও আসিয়ার সার্থবাহগণ এই নগরী প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া গণ্য করিত। ডামাস্কসের মেলা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ ছিল। কোন এক ইদানীন্তন ভ্রমণকারী এই নগরী সম্বন্ধে বলিয়াছেন,"কোন কোন লেবুর সুগন্ধে নগরীর চতুষ্পার্শ্বে অনেক মাইল পর্য্যন্ত আমোদিত। ডম্বুর ফলের বৃক্ষ সকল অতি বৃহৎ। দাড়িম্ব ও কমলালেবু অরণ্যে জন্মে। অদৃশ্যহস্তে সর্ব্বত্র বারিসিঞ্চন করিতেছে। যেখানে যাও, কলকলনাদিনী নির্ঝরিণী অথবা নিঃশব্দগামিনী ক্ষুদ্র তটিনী পথপার্শ্বে দেখিতে পাইবে। একটি হরিৎ-শোভিত ক্ষেত্র হইতে অন্যটিতে গমন করিতে হইলে, হাটিয়া হউক, সেতুর সাহায্যে হউক জলস্রোত অতিক্রম না করিলে যাইতে পারিবে না। এই সমস্ত শাখানদী পুরাকালের ন্যামানের প্রিয় নদী হইতে জাত। তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন, জর্দান্ নদী অপেক্ষা ডামাস্কসের ফারপার ও আব্রানা নদী ভাল কি না!"

যখন খালেদ ডামাস্কস্ অধিকার করিতে

কৃতসংকল্প হন, তখন তাঁহার নিজের দেড় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং সার্জ্জাবিলের সৈন্যগণ মাত্র সম্বল ছিল। কিন্তু তিনি সীরিয়ার সর্ব্বপ্রধান সেনানায়ক ছিলেন; আবু ওবিদার অধীনে যে সপ্তত্রিংশ সহস্র সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আদেশ করিলেন।

নীরসবালুকাপূর্ণ মরুভূমি যাহাদের বাসস্থান, তাহারা শ্যামলশস্যশোভিত ডামাস্কস্ নগরীর প্রাকৃতিক সম্পদ দর্শনে মোহিত না হইবে কেন? যখন সৈন্যগণ এক বর্ত্ম হইতে বর্ত্মান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিল, কুসুমসুবাসিত উপবননিচয়, দ্রাক্ষালতা-সমাকীর্ণ নিকুঞ্জরাজী, ফলপূর্ণ উদ্যানশ্রেণী নিরীক্ষণ করিয়া তাহারা মনে করিল মহম্মদ যে স্বর্গের কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই স্বর্গই বুঝি এই হইবে! দূর হইতে ডামাস্কসের মন্দিরচূড়াসমূহ অবলোকনে তাহারা আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃশব্দ করিতে লাগিল। তখন রোমসম্রাট্ হিরাক্লিয়স্ তাঁহার সীরিয়া প্রদেশ পরিদর্শনোপলক্ষে আণ্টিয়ক্ নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন আরবীয় সৈন্য অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার এই ধারণা ছিল যে, খালেদের সৈন্যগণ লুণ্ঠনব্যবসায়ী মাত্র; যুদ্ধ কাহাকে বলে তাহারা জানে না। হঠাৎ কোন স্থান আক্রমণ পূর্ব্বক লুণ্ঠনদ্রব্য হস্তগত হইলেই তাহারা প্রস্থান করে। সুতরাং সুদৃঢ় দুর্গরক্ষিত, বহুজনাকীর্ণ, অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ডামাস্কস্ নগরীর জন্য তিনি অণুমাত্রও ভীত হইলেন না। কেলোয়স্ নামক সেনাপতিকে পাঁচ সহস্র সৈন্যসহ ডামাস্কস্ রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন।

সেনাপতি কেলোয়স্ গমনসময়ে দেখিতে পাইলেন, চতুর্দ্দিকস্থ জনগণ দুর্গাদি নিরাপদ স্থানে গমনপূর্ব্বক আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেছে। বাম্বেক নগরীতে ললনাগণ আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইল, এবং বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হায় হায়! আরবীয়গণ উপস্থিত, কিছুতেই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিবে না। আরাকা, সাক্না, ট্যাড্মোর, বসরা তাহাদের হস্তগত হইয়াছে, এখন ডামাস্কস কে রক্ষা করিবে?" তাহাদের অবদ্ধ কেশরাশি, অশ্রুপূর্ণ নয়ন এবং সকরুণ বচনে কেলোয়সের হৃদয় আর্দ্র হইল।

কেলোয়স্ জিজ্ঞাসা করিলেন বিপক্ষের সৈন্যবল কত? তাহারা খালেদের সৈন্যসংখ্যামাত্র জানিত, সুতরাং বলিল দেড় সহস্র অশ্ব।

সেনাপতি বলিলেন, "আর চিন্তা নাই। অল্প দিন মধ্যে এই ভল্লে বিদ্ধ করিয়া খালেদের মস্তক এখানে আনয়ন করিব।

খালেদের সৈন্য আসিবার পূর্ব্বেই তিনি নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিতান্ত অহঙ্কারী ছিলেন; সৈন্যবিভাগে সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন বলিয়া, জনসাধারণের প্রিয়পাত্র সমরকুশল প্রাচীন সেনাপতি আজরেইলের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাকে পদচ্যুতিপূর্ব্বক নিক্রান্ত করিতে উদ্যত হওয়াতে নগরীর মধ্যে ভয়ানক আত্মকলহ আরম্ভ হইল।

এমন সময় খালেদ আবু ওবিদার সৈন্য-

সহ মিলিত হইয়া চত্বারিংশ সহস্র সৈন্য নগরীর বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। এই আকস্মিক বিপদে তৎকালে আত্মকলহ প্রশমিত হইল। তখন উভয় সেনাপতি অধিকাংশ সৈন্য লইয়া দুর্গ হইতে বাহির হইলেন।

দুই দল যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইল। খালেদ তাঁহার ভ্রাতা দিরার ইবিন্ আল্ আজওয়ারকে সঙ্গে লইয়া মুসলমান সৈন্যের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। আজওয়ার একটি উৎকৃষ্ট আরবীয় ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক ভল্লহস্তে বীরবেশে ভ্রাতার মনে আশা ও হর্ষের উদ্রেক করিতে লাগিলেন। খালেদ ভ্রাতাকে যশস্বী হইতে যথোপযুক্ত সুযোগ প্রদান করিবেন কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুতরাং অল্পসংখ্যক অশ্বারোহীসহ শত্রুবল পরীক্ষার্থ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি বলিলেন 'দিরার! তোমার পিতা এবং অন্যান্য বিখ্যাত মুসলমান সৈনিকগণের ন্যায় বীরোচিত কার্য্যানুষ্ঠানের এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদর্শনের সুযোগ এই উপস্থিত। সত্যধর্ম্মের আদেশ অনুসারে অগ্রসর হও, আল্লা তোমাকে রক্ষা করিবেন।'

দিরার ভল্ল সঞ্চালন পূর্ব্বক অল্পসংখ্যক সৈন্য সহকারে শত্রুশিবিরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। আক্রমণের আরম্ভেই চারিজন অশ্বারোহী তাঁহার হস্তে নিহত হইল। তখন একবার শত্রুব্যূহ হইতে বাহির হইয়া পদাতিকগণের প্রতি আক্রমণ করাতে ছয় জন তাঁহার নিজহস্তে শমন-সদনে প্রেরিত এবং অন্যান্য অনেক লোক অশ্ব-পাদ-দলিত হইলে ভারি গোলযোগ বাঁধিয়া উঠিল। খৃষ্টশিষ্য রোমীয় সৈন্যগণের শিক্ষা এবং নৈপুণ্য প্রশংসনীয় ছিল সংশয় নাই। তাহারা অল্পসময়মধ্যেই সেই বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করিয়া অগণ্য সৈন্যসহ দিরারকে আক্রমণ করিল। দিরার উভয় পক্ষের বল-বৈষম্য নিরীক্ষণ করিয়া পলায়ন শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে এমন আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইলেন যে, আরবীয়গণ উল্লাস ও প্রশংসার সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিল। আবদুলরহমানও সেইরূপ পরাক্রমের পরিচয় দিলেন। যখন বিপক্ষের অগণ্যসৈন্য, বল্লম, তরবারি প্রভৃতি লইয়া প্রত্যাক্রমণে প্রস্তুত হইল, তিনি বহুসংখ্যক সৈন্যের বিনাশসাধন পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইলেন।

খালেদ বিপক্ষগণের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টীয়ান সেনানায়কগণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। আজরেইল্ এবং কেলোয়সের এখনও বিদ্বেষভাব দূর হয় নাই। আজরেইল কেলোয়স্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'যখন তুমি দেশরক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছ, তখন তোমার যুদ্ধ না করিলেই নয়।'

কেলোয়সের অভিমান চূর্ণ হইল। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ না করিলেও নয়; অথচ তাদৃশ পরাক্রান্ত বিপক্ষের সহিত কোন্ প্রাণে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবেন? নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধদানে প্রস্তুত হইলেন। তিনি আক্রমণের প্রারম্ভেই পলায়ন করিতেন, কিন্তু খালেদ কৌশল পূর্ব্বক তাঁহার এবং তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধকরিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার পলায়নের উপায় রহিল না।

অনেকক্ষণ যুদ্ধকরার পর কেলোয়স্ অস্ত্রাহত হইয়া বিরত প্রায় হইয়াছেন, এমন সময় খালেদ একহস্তে বল্লম উন্নত করিয়া অন্য হস্ত দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার অশ্বহইতে বিযুক্ত করিলেন, এবং মৃতের ন্যায় আপন শিবিরে লইয়া গিয়া বন্দী করিলেন। মুসলমানগণের জয়ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ হইল।

পুনরায় আর একটি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক খালেদ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে দিরার বলিলেন, 'ভ্রাতঃ! তুমি কিছু কাল বিশ্রামকর, আমি তোমার স্থলে অভিষিক্ত হইয়া কিছু কাল যুদ্ধকরি।'

খালেদ অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, 'দিরার! আজ যে পরিশ্রম করিবে তাহার বিশ্রামের সময় কালই উপস্থিত হইবে। স্বর্গের সুখসেব্য প্রদেশে শান্তি ও বিশ্রামের অবধি থাকিবে না।'

যখন খালেদ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহার সহিত দুইটি কথা বলিবেন বলিয়া কেলোয়স্ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বাসঘাতক রোমানস্ তাঁহার কথা খালেদকে বুঝাইয়া দিল। কেলোয়স্ বলিল নগরী অধিকার করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে গবর্ণর আজরেইলকে হত করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টাকরা কর্ত্তব্য, নতুবা জয়লাভ তাদৃশ সহজ রহিবে না। এইরূপে প্রতিযোগীর প্রতি প্রতিহিংসাসাধনে কেলোয়স্ আপনার দেশের মস্তকে কুঠারাঘাত করিলেন!

খালেদ মনোমত উপদেশ পাইলে শত্রুর বাক্য গ্রহণেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং সৈন্যগণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া আজরেইল্‌কে নাম ধরিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন। আজরেইল্ অকুতোভয়ে অক্ষুব্ধহৃদয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সত্বর সম্মুখীন হইলেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া উভয়েই ক্ষণেক বিশ্রাম লাভার্থ কিঞ্চিৎ সময় লইলেন। খালেদ বিপক্ষের পরাক্রম দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

খালেদ বলিলেন 'তোমার নাম আজরেইল্?' (আরব্য ভাষায় এই শব্দের অর্থ যমদূত।)

আজরেইল বলিলেন, হাঁ।

খালেদ বলিলেন, 'আর বিলম্ব নাই, তোমার মিত্র আসিয়া শীঘ্রই তোমাকে জেহেনামের অগ্নিকুণ্ডে লইয়া যাইবে।'

পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আজরেইলের তুরঙ্গম অতি উৎকৃষ্ট ছিল। যখন বিপক্ষের আক্রমণ নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি কপট উপায় অবলম্বন করিলেন। পলায়ন করিতেছেন ভান করিয়া বহুদূরে চলিয়া গেলেন। যখন খালেদের অশ্ব ক্লান্ত হইল তখন যুদ্ধার্থ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। খালেদ কৌশলে পরাজিত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি হঠাৎ অশ্বহইতে অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষের অশ্বের সম্মুখপদে এমনই জোরে আঘাত করিলেন যে, এক পা দ্বিখণ্ড হইল, অশ্বটি আরোহিসহ ভূতলে গড়াইয়া পড়িল। খালেদ আজরেইলকে বন্দী করিয়া আপন শিবিরে লইয়া গেলেন। খালেদ বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মহত্ব ছিল না। তিনি পরাজিত বিপক্ষের প্রতি সদয় ব্যবহার

করিতেন না। আজরেইলের পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহাকে কেলোয়সের পার্শ্বে বসাইয়া উভয়কে মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাঁহারা অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিলেন। তখন তাঁহার আদেশে খৃষ্টিয়ান সেনাপতিদ্বয়ের মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইয়া অধিবাসিগণের প্রতি সতর্ক হইতে কঠোর আদেশস্বরূপ দুর্গমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডামাস্কস্ অবরোধ এক্ষণে অধিকতর পরাক্রমের সহিত চলিল। অধিবাসিগণ ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহাদের সেনাপতিদ্বয় হত হওয়াতে তাহাদের সাহস কমিয়া গিয়াছিল; অনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, সাহসী সেনানীগণ একবার বাহিরে আসিলে আর ফিরিয়া যাইত না। অবশেষে আর তাহারা বাহিরে আসিত না, নগরী দৃঢ় অবরুদ্ধ হইল। খালেদ অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া নগর-প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে, এবং আবুওবিদা অপরার্দ্ধ লইয়া পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নগরবাসিগণ খালেদকে একমণ স্বর্ণ এবং বহুমূল্যে ডামাস্কস্ নগরীতে প্রস্তুত দুইশত পরিচ্ছদ উপঢৌকন দিতে সম্মত হইয়া কিয়ৎকালের জন্য অবরোধ পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিল। কিন্তু খালেদ উত্তর করিলেন, তাহারা মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক করদানে সম্মত না হইলে, যাবৎ একটি প্রাণী জীবিত রহিবে সে পর্য্যন্ত যুদ্ধে বিরতি হইবে না।

আরবীয়গণ নগরী অবরোধ করিয়া আছে, এমন সময় একদা নগরাভ্যন্তরে সহসা জয়োল্লাস শ্রবণে চমকিয়া উঠিল। তাহারা শুনিতে পাইল যে, তাহাদের সাহায্যার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য আসিতেছে!

নগরবাসিগণ সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে, একদা নিশীথ সময়ে একজন দূতকে ছদ্মবেশে সম্রাট্ হিরাক্লিয়সের নিকট আণ্টিয়কে প্রেরণ করিয়াছিল। সম্রাট্ এত দিনে প্রকৃত অবস্থা বুঝিলেন এবং ওয়ার্ডান নামক একজন অভিজ্ঞ সেনানায়কের অধীনে এক লক্ষ সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন।

খালেদ তৎক্ষণাৎ সেই নবাগত বিপক্ষগণকে আক্রমণার্থ ধাবিত হইতেন। কিন্তু আবু ওবিদা বলিলেন, একদল সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদের গতিরোধে প্রয়াস পাওয়া এবং এদিকে নগরী অবরুদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। খালেদ সম্মত হইলেন। এবং প্রিয় ভ্রাতা দিরারকে এই কঠোর কার্য্য সাধনে পাঠাইয়া দিলেন। দিরার অল্প সৈন্য লইয়া অগণ্য বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণে উদ্যত হইলে সেনাপতি খালেদ তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, 'আমরা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, অসাবধানতার সহিত মরিলে আর কি লাভ হইল?' ভ্রাতার সহিত সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী প্রদানপূর্ব্বক আদেশ করিলেন, 'প্রকাশ্য যুদ্ধদানে প্রস্তুত না হইয়া সর্ব্বদা বিপক্ষ সৈন্যের পুরোভাগে রহিবে, এবং উচ্ছৃঙ্খল আক্রমণে বিপক্ষের গতিরোধ পূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত রাখিবে।'

দাবাগ্নির ন্যায় দিরারের পরাক্রম সে

উপদেশে প্রশমিত থাকিবার নহে। রফি ইবিন্ ওমিরা নামে অন্য এক ব্যক্তির সহিত ঐকমত্য হইলে তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যুদ্ধ না করিয়া এক পাও সরিবেন না। তাঁহারা আপন সৈন্যগণকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিলেন যে, অল্পসংখ্যক মুসলমান সৈন্যের নিকট কাফেরদিগের অগণ্য সৈন্যও অকিঞ্চিৎকর।

ভীষণ যুদ্ধনাদে শরীর কণ্টকিত হইল। দিরার কএকজন অনুচরসহ বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যগত হইয়া সেনাপতিকে হত করিতে প্রয়াস পাইলেন। শরীররক্ষকদিগকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধের প্রারম্ভেই সেনাপতির দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিলেন এবং পতাকাবাহীকে হত করিলেন। দিরারের অনুচরবর্গ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া রত্নখচিত খৃষ্টীয় চিহ্নযুক্ত পতাকা হস্তগত করিল, দিরার আক্রমণকারী বিপক্ষগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পতাকা হস্তগত এবং জয়োল্লাসে মুসলমানগণ কর্তৃক নীত হইয়াছে, এমন সময় ওয়ার্ডানের পুত্র দিরারের বামবাহু আহত করিল। বালকের দিকে ফিরিয়া, যেমন তাহার বক্ষঃস্থলে বল্লম দ্বারা আঘাত করিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আনিতে প্রয়াস পাইলেন, অমনি তাহার ফল সেই ক্ষত স্থানেই রহিয়া গেল। এইরূপে নিরস্ত্র হইয়া বল্লমের দণ্ডদ্বারা কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করার পর বিপক্ষগণের আক্রমণে অবসন্ন ও বন্দী হইলেন। মুসলমানগণ তাঁহার উদ্ধারার্থ ভীষণ যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। দিরার বন্দিবেশে শিবির হইতে দূরতর স্থানে নীত হইলেন। মুসলমানগণ পলায়ন করিত, কিন্তু রফিইবিন্ ওমিরা বলিলেন, 'যে পলায়ন করে সে ঈশ্বর ও মহম্মদকে পৃষ্ঠ দর্শন করায়। যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, স্বর্গ তাহাদের জন্য। যদি সেনাপতি মৃত হইয়া থাকে, ঈশ্বর জীবিত, তিনিই তোমাদের কার্য্য দেখিবেন।'

তাহারা একত্র হইয়া চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইল। আজ ভাগ্য তাহাদের প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন। একদা দশ সহস্র সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা শীঘ্রই খণ্ড খণ্ড হইত, কিন্তু খালেদ দিরারের দুরবস্থা এবং আপন সৈন্যের পরাজয় সংবাদ দূতমুখে শ্রবণ করিয়া অধিকাংশ সৈন্যসহ তাহাদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন।

খালেদ সেই স্থানে পঁহুছিয়া আর অণুমাত্রও অপেক্ষা করিলেন না, একটি কথাও বলিলেন না; তৎক্ষণাৎবিপক্ষগণকে আক্রমণ করিলেন। যেখানে পতাকা সেখানেই দিরার আছেন বিবেচনায়, কালের কুঠারাঘাতে অরণ্য-তুল্য বিপক্ষ মধ্য দিয়া পথ পরিষ্কার পূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে যখন শুনিলেন যে, দিরার একদল সৈন্যসহ বন্দিভাবে ইমিসায় প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ রফি ইবিন্ওমিরাকে এক শত অশ্বারোহীসহ তাঁহার উদ্ধারার্থ পাঠাইলেন। তিনি অতি দ্রুতগতিতে বিপক্ষগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের অনেককে হত ও আহত করিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য পলাইয়া গেল, রজ্জুবদ্ধ দিরারকে তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে পাইয়া উদ্ধার করিলেন।

রণোন্মত্ত মুসলমানসৈন্যের বল দৈববল অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রফি দিরারসহ প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন বিপক্ষের লক্ষ সৈন্য খালেদ কর্ত্তৃক এই অল্প সময়ে পরাজিত হইয়াছে, খালেদের সৈন্যসংখ্যা এক তৃতীয়াংশ হইবে। একদলের পর অন্য দল, তৎপর আর একদল, এইরূপে খালেদ রোমীয় সমগ্র সৈন্য পরাজয় করিয়াছেন। অধিকাংশ সৈন্য রণক্ষেত্রে নিদ্রিত! যে পলাইতে প্রয়াস পাইয়াছে, খালেদ রণরঙ্গে তাহার অনুসরণ করিয়া পথিমধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়াছেন!

খালেদের সৈন্য রণক্লান্ত এবং লুণ্ঠনদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া ডামাস্কস্ নগরী অবরোধার্থ অগ্রসর হইল। অস্ত্র শস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির আর অভাব রহিল না।

এদিকে সম্রাট্ হিরাক্লিয়স্ ওয়ার্ডানের লক্ষসৈন্য পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণে আপনার সীরিয়-সাম্রাজ্য রক্ষার্থ আণ্টিয়কের সিংহাসনে থর থর-কম্পিত হইতে লাগিলেন। শীঘ্র শীঘ্র সপ্ততিসহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আজিনাদিনে ওয়ার্ডানের অধীনে প্রেরণ করিলেন। এবং আদেশ দিলেন, এই সময় মুসলমানসৈন্য দুর্ব্বল এবং সংখ্যায় ক্ষীণ আছে, ত্বরায় তাহাদিগকে আক্রমণ কর।

খালেদ আবু ওবিদার সহিত পরামর্শ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যসহ আজিনাদিনে ধাবমান হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং নিজের সৈন্য, সংখ্যায় অল্প দেখিয়া নিকটস্থ সমস্ত মুসলমান সেনানীকে সৈন্য লইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে সাধারণ ঘোষণা প্রচার করিলেন। তিনি আমরু ইবিন আল আস্‌কে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন ;—

'খালেদ ইবিন ওয়ালিদ, আমরু ইবিন্ আল আসের নিকট।—করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, তিনি তোমার মঙ্গল করুন। সপ্ততিসহস্র গ্রীক ঈশ্বরের আলোক নির্ব্বাপণে উদ্যত, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে মুসলমান ভ্রাতৃগণ আজিনাদিনাভিমুখে যাত্রা করিল। আল্লা অবশ্যই ঐশতেজ রক্ষা করিবেন। তোমার সমগ্র সৈন্যসহ আজিনাদিনে আসিয়া উপস্থিত হও, ঈশ্বরানুগ্রহে সেখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।'

এই সংবাদ পাঠাইয়া খালেদ ডামাস্কস্ হইতে সমগ্র সৈন্য লইয়া আজিনাদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আবু ওবিদাকে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি খালেদ বর্ত্তমানে তাঁহার প্রধান সৈনাপত্য শোভা পায় না। সুতরাং আবু ওবিদা সমস্ত সম্পত্তি, অস্ত্র শস্ত্র, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার এবং লুণ্ঠনদ্রব্যাদি রক্ষায় নিয়োজিত রহিলেন।

সমস্ত সৈন্য ডামাস্কস্ হইতে অপসারিত হইবামাত্র, পিটার এবং পল নামক দুই ভ্রাতা নগরী হইতে বাহির হইল। পিটারের অধীনে দশসহস্র পদাতিক এবং পলের অধীনে ছয়সহস্র অশ্বারোহী ছিল। তাহারা মুসলমানদিগকে পশ্চাদ্দিক হইতে

আক্রমণ করিল। পল অশ্বারোহিগণসমভিব্যাহারে মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া কতক হত, অনেক আহত এবং অশ্বপদ-দলিত করিলে ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এদিকে পিটার পদাতিকগণসহ শিবিরসঙ্গীয় দ্রব্যজাত, অস্ত্রশস্ত্র, লুণ্ঠনদ্রব্য এবং অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তান হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিল।

খালেদ এই শোচনীয় সংবাদ শ্রবণমাত্র দিরার, আবদুল রহমান, রফি ইবিন ওমিরা এই বীরত্রয়কে প্রত্যেকের সঙ্গে দুই শত অশ্বারোহী লইয়া দ্রুতগতিতে বিপক্ষের প্রতিকূলে ধাবিত হইতে আদেশ দিয়া স্বয়ং সমগ্র সৈন্যসহ অনুসরণ করিলেন।

দিরার এবং তাঁহার সঙ্গীয়গণ শীঘ্রই অদৃষ্টের গতি পুনরায় অনুকূল করিয়া উঠাইলেন। পলের ছয়সহস্র অশ্বারোহী মধ্যে অতি অল্পই জীবিত রহিল এবং ডামাস্কসে ফিরিয়া গেল, অবশিষ্ট সমুদয় ভীষণ যুদ্ধে হত হইল। পল অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়নে প্রয়াস পাইয়া অকৃতকার্য্য ও বন্দী হইল। জয়ী আরবীয়গণের জয়োল্লাস সুখকর হইল না। কারণ তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, তাঁহাদের রমণীগণ বন্দী হইয়া গিয়াছে। দিরার যখন শুনিলেন তাঁহার ভগ্নী রূপবতী কোলা সেই বন্দী ও অপহৃতা ললনাগণমধ্যে একজন ছিলেন, তখন তাঁহার শোক দুঃখের পরিসীমা রহিল না।

এদিকে পিটার তাহার সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ডামাস্কস্ অভিমুখে যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি জলাশয়সমীপে তরুমূলে উপবেশন পূর্ব্বক লুণ্ঠনদ্রব্য বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দিরারের ভগ্নী কোলা পিটারের হইবেন স্থিরীকৃত হইলে, জয়ী সৈন্যগণ নিজ নিজ বস্ত্র-গৃহে গমন করিল, এবং পিটার মনের সুখে নানারূপ দিবাস্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। ললনাগণ বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক আপন আপন দুরদৃষ্টের বিষয় আলোচনা এবং বিলাপ করিতে সময় পাইল।

কোলা দিরারের উপযুক্ত ভগ্নী ছিলেন। তিনি সঙ্গীয় রমণীগণের ন্যায় বিলাপ বা ক্রন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন না। তাহাদিগকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিলেন 'কি ? আমরা বীরদুহিতা এবং মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এই সমস্ত পৌত্তলিক এবং নাস্তিক অসভ্য পাষণ্ড দাসগণের নিকট নত হইব ? তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিব ? প্রাণান্তেও তাহা পারিব না, পারিব না।'

ললনাগণমধ্যে হামজারাইট সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক ছিল। তাহারা প্রাচীন আমেলকাইট সম্প্রদায় হইতে জাত বলিয়া কথিত আছে। হিমিয়ার জাতীয় স্ত্রীলোকও ছিল। তাহারা বাল্যকাল হইতে যুদ্ধবিদ্যা ও নানারূপ সাহসিকতার কার্য্য দেখিয়া তাহাতে একরূপ দীক্ষিত ছিল। তাহারা অশ্বারোহণ, তীরচালন, ভল্লব্যবহার করণ সমস্ত কার্য্যেই শিক্ষিতা থাকাতে, এক্ষণে কোলার উৎসাহবাক্যে জাগরিত হইল। এবং বলিল 'আমরা কি করিব ? তরবারি বল্লম, ধনু কিছুইত নাই !'

কোলা বলিলেন 'এস আমরা বস্ত্রগৃহের দণ্ড সমস্ত অবলম্বন পূর্ব্বক যথাসাধ্য আত্মরক্ষায় প্রবৃত্তা হই। পরমেশ্বর আমাদিগকে

উদ্ধার করিবেন। যদি না করেন মরিয়া শান্তিলাভ করিব,দেশের কলঙ্ক হইবে না।' ওফীরা নাম্নী একজন সাহসিকা সীমন্তিনী এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার বাক্যে অন্য সকলে সম্মত হইয়া প্রত্যেকে এক একটি দণ্ড হস্তে লইল। কৌলা বলিলেন 'এস সকলে চক্রাকারে দণ্ডায়মান হই, একটি প্রাণীও যেন আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত ব্যর্থ করিয়া আপন আপন দণ্ডদ্বারা তাহাদের মস্তকে গুরু আঘাত করিবে।'

দিরারের যেমন বাক্য ও কার্য্যে দূরত্ব ছিল না, যেমন বলিতেন তেমনই তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন, কৌলার স্বভাবও সেইরূপ ছিল। তাঁহার বাক্য সমাপন হওয়া মাত্র একজন গ্রীক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল; কৌলা তাহাকে একাঘাতে মস্তকচূর্ণ করিয়া হত করিলেন।

এই গোলযোগে আমোদপ্রমোদলিপ্ত সৈনিকগণ বস্ত্রগৃহ হইতে বাহির হইল। তাহারা রমণীগণকে বেষ্টন পূর্ব্বক মিষ্টবাক্যে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু যে কেহ সমীপস্থ হইল তাহার আর প্রবোধ পাইতে বিলম্ব হইল না। পিটার দেখিল কৌলা রণরঙ্গিণী বেশে সগৌরবে দণ্ডায়মানা, যে কেহ নিকটস্থ হইতেছে তাহাকেই সংহার করিতেছেন! সুন্দরীর সেই সময়ের সেই মনোহর ভয়ঙ্কর রূপমাধুরী দেখিয়া সে একবারে মোহিত হইল। তাঁহার যেন কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে এই বলিয়া ঘোষণা প্রচার পূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কৌলার সেই ভীষণ ভাব প্রশমিত করিতে পিটার যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল। সম্পদ, সম্মান, সুখ সমস্তের ভাণ্ডার তাঁহার নিকট উদ্ঘাটন করিল। কৌলা তাঁহার পাশব ব্যবহারে অত্যন্ত ঘৃণা ও বৈরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক, পাষণ্ড,কুক্কুর, নরাধম, নাস্তিক প্রভৃতি শব্দে তাহার প্রতি অবজ্ঞাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণকে নারীহত্যায় প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন। তাহারা আজ্ঞা মাত্র তরবারি হস্তে আক্রমণ করিল। এই অসমযুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু এমন সময় খালেদ ও দিরার সেই স্থানে দ্রুত অশ্বচালনে উপস্থিত হওয়াতে তাহা হইল না। খালেদ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু দিরারের অশ্বপৃষ্ঠে জিন পর্য্যন্ত ছিলনা,তিনি বল্লম হস্তে উপস্থিত হইলেন।

এইরূপ অভাবনীয় ঘটনায় পিটারের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে তখন ললনাগণকে নিরস্ত্র প্রত্যর্পণ করিয়া যশোলাভে লোলুপ হইল। সে তাঁহাদিগকে বলিল 'আমাদেরও স্ত্রী এবং ভগ্নী আছে, তোমাদের সাহস ও আত্মরক্ষা প্রণালীদৃষ্টে সম্মান করি। তোমরা নির্ব্বিঘ্নে তোমাদের স্বদেশীয়গণের নিকট গমন কর।'

এই বলিয়া পিটার অশ্বের মস্তক অন্যদিকে ফিরাইবা মাত্র কৌলা একাঘাতে অশ্বপদ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, অশ্ব আরোহিসহ ভূতলে পতিত হইল। দিরার তৎক্ষণাৎ বল্লমে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন? এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিয়া বল্লমে বিদ্ধাবস্থায় সকলকে দেখাইলেন। অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

শত্রুগণ পরাজিত হইয়া নগরীতে পলায়ন করিল। তাহারা মুসলমান শিবির হইতে যে সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিল তদতিরিক্ত তাহাদের আপন অশ্ব, অশ্বতর, অস্ত্রশস্ত্র এবং সমগ্র ভাণ্ডার মুসলমানগণের হস্তগত হইল।

যুদ্ধাবসানে পল খালেদের শিবিরে নীত হইল। খালেদ তাহাকে তাহার ভ্রাতা পিটারের মস্তক দেখাইয়া বলিলেন, 'এই মুহূর্ত্তে যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না কর, তোমার পরিণামও এইরূপ হইবে।' পল ভ্রাতার মস্তক দর্শনে ক্রন্দন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল; এবং বলিল অতঃপর আর তাহার বাচিয়া থাকার বাসনা নাই। খালেদ বলিলেন, 'বিলক্ষণ!' তখন সঙ্কেত করা মাত্র পলের শিরশ্ছেদ হইল।

মুসলমান সৈন্য মূল শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া দেখিল আবু ওবিদা সমস্ত সৈন্য উপযুক্ত রূপে সমাবেশপূর্ব্বক শিবিরের রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন। ঐ স্থান হইতে ওয়ার্ডান এবং তাঁহার সৈন্যগণ কত দূরবর্ত্তী ছিল তাহা জ্ঞাত ছিলেন না বলিয়া আবুওবিদা তাদৃশ সতর্কতা অবলম্বন করেন। এক্ষণে জয়ী সৈন্যগণ রণক্লান্তির পর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অতীত যুদ্ধের ফল, বিগত বিপদ এবং ললনাগণের প্রশংসনীয় শৌর্য্য তাঁহাদের আলাপের প্রধান বিষয় হইল।

শ্রীব্রঃ—
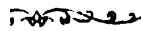
গ্রীক এবং হিন্দু।*

১২৮৩।

প্রথম প্রস্তাব।

ফলদ্বয় একই বৃক্ষে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন গতিদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে দোষ কাহার?—ফলের দোষ কি? কার্য্য কারণ সংযোগে যাহা ঘটিবার, তাহাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। অতএব নিয়তি প্রবলা। কৃত আয়োজনের উপার্জ্জিত ফলের নাম নিয়তি। ইহার অন্যতর আখ্যা ভাগ্য। নিয়তি আয়ত্বাতীত দোষ-গুণবিহীন, পরিচ্ছিন্ন, নিত্য স্বস্বভাবে প্রভাময়ী। যৎকর্ত্তৃক যে ভাবে ও যেরূপে অর্চ্চিত হয়েন, তাহার নিকট সেইরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। অতএব উপস্থিত শুভা-

* এই প্রবন্ধের প্রথম ৮।১০ পৃষ্ঠা একবার আর্য্যদর্শনে প্রকাশ হয়, কিন্তু প্রকাশের অবিলম্ব পরেই ইহাতে এত পরিবর্ত্তন হয় যে, প্রকাশিত অংশের সহ এক্ষণে সেই অংশের সাদৃশ্য অতি অল্পই। এই প্রবন্ধ ১২৮১ সালে লিখিতে আরম্ভ হইয়া ১২৮৩ সালে শেষ হয়। চিন্তাশক্তির প্রথম উদ্রেক কালে যাহা লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান চিন্তাপ্র-

শুভের কারণ অর্চনা প্রণালীকে বলিতে হইবে, নিয়তি নহেন। বৃক্ষস্থ ফল—জড়বস্তু, সে অর্চনার উপর স্বেচ্ছাবিহীন, সুতরাং অপরের ইচ্ছায় চালিত। কিন্তু মনুষ্য অজড় জ্ঞানময়, তাহারা স্বয়ং না অন্যের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া থাকে? এ জগতে বহুবিধ মহামহোপাধ্যায়গণ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া, এ বিষয়ের যথাশক্তি মীমাংসা করিয়া, এবং গ্রহণীয় সত্যজ্ঞানে তাহা মানবগণকে গ্রহণ জন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। দেশভেদে, লোকভেদে, বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র, এ বিষয়ে নিজ নিজ মীমাংসা, স্বয়ং ঈশ্বর-কৃত মীমাংসা জ্ঞানে, আজি পর্য্যন্ত এ জগতে প্রচার করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এত মীমাংসার একটি মীমাংসাও আজি পর্য্যন্ত জন-সমাজ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত গ্রহণ করিয়া, নবানুসন্ধানে ক্ষান্ত হইতে পারিল না। কেমন করিয়া হইবে?—হইবার ত কথা নহে! কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাও মনে ভাবিওনা যে মীমাংসা-প্রচারকগণ মিথ্যাবাদী, এবং জ্ঞানপূর্ব্বক আপনাপন মত প্রচারের দ্বারা সমাজের উপর জুয়াচুরি চালাইয়া গিয়াছে! তাহা নহে। তাহারাও স্বস্ব সীমায় যথাসম্ভব সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছে,—হইতে পারে, সে সত্য তোমার আমার জীবন-প্রবাহে প্রযুক্ত হইতে পারিলনা। বাইবেল শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য স্বেচ্ছাময়, শুভাশুভ যাহা কিছু, তাহার নিজ ইচ্ছা চালনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রুতি অনুসারে, কর্ম্মসূত্র মানবীয় ইচ্ছার পরিচালক; কিন্তু এ কর্ম্মসূত্রের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বাধীন ইচ্ছাই প্রবল। অতএব কথিত শাস্ত্রদ্বয়ের মতে বলিতে হইবে যে, মনুষ্য যথেচ্ছা নিয়তির অর্চনা করিয়া যথাসম্ভব ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমার সম্বন্ধেত দেখিলাম সে কথা সমগ্র খাটিতেছে না। দিনেকের তরেও জগৎ-সৃষ্টির দিন হইতে ইচ্ছাবশে অদৃষ্টপূর্ব্ব ফল লাভে সামর্থ্য দেখিলাম না, তবে কি এ স্বেচ্ছা আকাশ-কুসুম, কল্পনা মাত্র? শ্রুতির মতে যে কর্ম্ম-সূত্রের মূল স্বাধীন ইচ্ছা, সাংখ্যকারের মতে তাহার 'মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম্।' একথা নিতান্ত মন্দ নহে। ফলতঃ স্বেচ্ছায় অস্তিত্ব থাকিলেও, তাহা বিশ্বনিয়ন্তৃ-ইচ্ছা সমক্ষে অন্ধ, স্বয়ং কর্ম্মক্ষম নহে; কর্ম্মসূত্র প্রবল, এবং আপাতদৃষ্ট স্বেচ্ছা কর্ম্মসূত্ররূপ কারণের কার্য্য মাত্র। যে কর্ম্মসূত্র-বশে জড়বস্তু ফল চালিত হইয়া থাকে, অজড়বস্তু জ্ঞানময় মনুষ্যও তাহার দ্বারা পরিচালিত

ণালীর সহ যে তাহার কিছু রূপান্তর দৃষ্ট হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র বৈচিত্র নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমি আমার বর্ত্তমান চিন্তাপ্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া নানা কারণে তাহা সংশোধন করিতেও প্রস্তুত নহি। তা যাহাই হউক, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে পর্ব্বত, সমুদ্র, বন, নদী, গুহা, যতই কেন থাকুক না, কিন্তু যখন সমগ্র দেখিতে যাইবে, দেখিতে পাইবে, পৃষ্ঠস্থল ফলতঃ গোলাকার। পাঠক, আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিও, এখনও আমার প্রিয়শ্রোতা বাঞ্ছারামের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই।

হয় ;—জড় অজড় সকলেই কর্ম্মসূত্র-বশে দৃষ্ট বা অদৃষ্টপূর্ব্ব যথাসম্ভব ফল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এ কর্ম্মসূত্র কি? আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, নিয়ন্তা নিয়োজন-অনুরূপ প্রাপ্ত-শক্তি-প্রকৃতি হইতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া। স্বর্গে নক্ষত্রমণ্ডল, মর্ত্ত্যে পার্থিব বস্তু নিকর,এক কথায় এই বিশ্বস্থিত পরমাণুটি পর্য্যন্ত সেই মোহ-মন্ত্রে পরিচালিত।

যে কর্ম্মসূত্রকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও প্রকৃতিকা ক্রিয়া বলিয়া উপরে ব্যাখ্যা করা গেল, তাহার আবার মূলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেই কর্ম্মসূত্রের মূল নিয়ন্তৃ-নিযুক্ত নিয়ম, এবং উহা তাহার বাহ্য প্রচার মাত্র। যে হেতু উদ্দেশ্য হইতে নিয়মের উদ্ভব, অতএব নিয়ম এবং তৎপ্রচারণারূপি কর্ম্মসূত্র, সেই উদ্দেশ্যানুরূপ কর্ম্মসাধন জন্যই গতিশীল হইয়া থাকে! এখন বলা বাহুল্য যে কেবল ব্যক্তিগত মানবজীবন নহে, সমগ্র মানবীয় জীবন সমষ্টিও, অখণ্ডিত একত্ব ভাবে নিয়ন্তৃ-সম্ভব কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কর্ম্মসূত্রবশে যথানির্দ্দিষ্টপথে অবিরত গতিশীল হইয়া ছুটিতেছে। সেই মহদুদ্দেশ্যের বিভিন্ন ভাবযুক্ত বিভিন্ন দিক বা অংশ সমূহের ক্রম-পূর্ণতা সাধন করিয়া, সম্পূর্ণ পূর্ণতা অভিমুখে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সেই মানবীয় জীবন সমষ্টি, তত্তৎ অংশ সংখ্যা অনুসারে, খণ্ডে খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। জীবন সমষ্টির সেই খণ্ড সমূহের প্রতিখণ্ড, এক একটি বিভিন্ন জাতীয় জীবন। সেই জাতীয় জীবন যাহারা যাহারা অনুসরণ করিয়া থাকে বা করিতে বাধ্য, তাহাদের যে সমষ্টি তাহাকেই জাতি বলা যায়। এই জাতিসমূহের যে যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া, অর্থাৎ কর্ম্মসূত্র, তাহার অনুকূলা ;—অথবা কার্য্যক্ষেত্রে আদিষ্ট কার্য্য হইতে যাহাতে বিচলিত হইয়া পলাইতে না পারে, কর্ম্মসূত্র তৎপক্ষে একরূপ নিগড় স্বরূপ। প্রকৃতি তাহার অনন্তবিশ্রুত স্বরে নিরন্তরই এই ঘোষণা করিতেছে যে, তুমি যে কার্য্যক্ষেত্রে উদ্ভব হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ,সর্ব্বান্তঃকরণে সেই কার্য্যক্ষেত্রের অনুসরণ কর, যেহেতু তজ্জন্যই তোমার উৎপত্তি ; যদি ব্যতিক্রম করিতে চাও তবে ধ্বংস হইবে,—ধ্বংস ভিন্ন তোমার আর গত্যন্তর নাই। আমি ভারতীয় ব্রাহ্মণসন্তান, সহস্র গো উদরসাৎ, বা সর্ব্বাঙ্গ জামা টুপিতে ঢাকিয়া ফেলিলেও, আমার ভারতীয় প্রকৃতি ঘুচাইয়া ইয়ুরোপীয়ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবনা ; প্রত্যুত ধ্বংস-পথে কেবল সেই পরিমাণে অগ্রসর হইয়া আসিব মাত্র। একেবারে পরিবর্ত্ত—একেবারে ধ্বংস! এ সংসারে এক-জাতির যদি জাত্যন্তর পরিগ্রহণে সমর্থ থাকিত, বলিতে পারিনা, এজগতে যত জাতি বিনিময় হইত, তাহার সংখ্যা হইতে পারিত কি না। বোধহয় বিনিময় কার্য্য এতই বাহুল্যযুক্ত হইত যে, তাহার জন্য অসংখ্য বাণিজ্যাগার না খুলিলে কার্য্য চলিত না। কিন্তু তাহা হইবার নহে!*

---

* এতক্ষণ যে এই প্রবন্ধ লেখকের লেখায় স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব লোপ বলিতে

অতএব এ সংসারে সমগ্র মানব জাতির প্রতি অবলোকন করিলে, যতক্ষণ যাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা না হইবে, ততক্ষণ তাহার কাহাকেই ফেলিবার যো নাই। ফেলিবার সময় হইলে তোমাকে আমাকে তজ্জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না, তাহারা আপনা হইতেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবে। অতএব কার্য্য ফল যাহার, তাহার নিকট সকল কর্ম্মকারকই সমান ব্যাথার বস্তু। এই কথা মনে রাখিয়া জাতীয় জীবন সমালোচনা করিলে, ইহাই আলোচ্য যে কোন্ জাতি কিরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহার কার্য্য কি, এবং সে কার্য্যসমাধায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। কোন্ জাতি সাংসারিক ব্যাপারে ছোট, কোন্ জাতি বড়, এ আলোচনা উহা হইতে স্বতন্ত্র; এবং এরূপ আলোচনার যে মীমাংসা তাহা কেবল পাগলেরই তুষ্টিকর হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য শরীরী হওয়ায় কিয়দংশ পাগল বলিতে হইবে; অতএব সেই পাগলামির তৃপ্তি করিয়া, তৃপ্ত্যন্তে অবশ্যম্ভাবী গাম্ভীর্য্য ও গুরুকর্ম্মানুসরণ তাহার মনে উদয় করাইবার নিমিত্ত, ওরূপ মীমাংসার আবশ্যক হইয়া থাকে। জাতীয় ছোট বড়, ন্যস্তকার্য্যের গুরুত্ব লইয়া। যেমন একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ ও একজন শিল্পকার, উভয়ই সমাজের পক্ষে সমান আবশ্যকীয় বটে, কিন্তু তথাপি কার্য্যের গুরুত্ব হেতু মনস্তত্ত্ববিদের প্রথম আসন, দ্বিতীয় আসন শিল্পকারের। জাতীয় ছোটত্ব ও বড়ত্বও তদ্রূপ। আমাদিগের প্রস্তাবিত জাতিদ্বয়ের মধ্যে কে ছোট কে বড়, তাহা পাঠকেরা আপনাপনি আলোচনা দ্বারা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে মীমাংসা করিয়া লইবেন। তৎপক্ষে আমাদিগকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

ইহইতেছিল, এখন দেখা যাইতেছে যে সে লোপ বস্তুতঃ নহে, কেবল একদেশ দর্শন অনুরোধে। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, নতুবা আমাদের আত্মধ্বংসের ক্ষমতা আসিল কোথা হইতে। ফলতঃ আত্মধ্বংসের ক্ষমতা যদি প্রবন্ধ লেখক অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে আমি বড়ই চটিতাম, কারণ তাহা না হইলে যে সয়তানের ঘর বেবজায় হইয়া যায়। ইতি।—বাঞ্ছারাম। ১২৮৭।

একবংশত্ব সত্ত্বেও, হিন্দু এবং গ্রীক জাতির অবস্থাগত বৈষম্য, এই কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মসূত্রবশে উদ্ভূত। আদিতে আমি এবং একজন গ্রীক পৃথক্ ছিলাম না। আমার এবং একজন গ্রীকের পিতৃভূমি স্বতন্ত্র নহে, বাইবেল-ভূমিও নহে। পিতা মাতা স্বতন্ত্র, বা আদম্ ও ইবও নহে। কুলপতি স্বতন্ত্র বা মুসা নহে। রাজা স্বতন্ত্র বা দাউদ নহে। আমাদিগের উভয়েরই পিতৃস্থান সেই

"সপ্তর্ষিণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষি চরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং

এবম্ভূত সর্ব্বসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ। মূর্ত্তিমান্ সৌম্যরূপে যথায় সপ্তঋষি বাস করিতেছেন, যথায় সুধাস্রাবী কলনাদিনী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থান দেবর্ষিচরিতে পরিকীর্ত্তিত, এবং যথায় চৈত্ররথ কানন দেব-গন্ধর্ব্ব-বিলাস-যোগ্য প্রাকৃতিক-মাধুর্য্য পূর্ণভাবে বিস্তার করিতেছে, সেই স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ আমাদিগের পি-

ভূস্থান। আমাদের পিতা বিধাতার মানস-পুত্র স্বায়ম্ভুব,এবং মাতা বিধাতৃদুহিতা শতরূপা। কুলপতি সপ্তঋষি, অদ্যাপি যাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় গগণে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছেন। রাজেশ্বর প্রিয়ব্রত, সকাননা সাগরাম্বরা সসপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর তাঁহার আধিপত্য। মধুস্রাবী একই ভাষা, যুগযুগান্ত গত হইয়াছে, তথাপি আজি পর্য্যন্ত ভাষাদ্বয়ে শাব্দিক ও বৈয়াকরণিক একতা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এইরূপে একস্থানে, এক পিতৃদেবতার বশবর্ত্তিতায়, একদেবতাপূজক হইয়া, গ্রীক এবং হিন্দুগণ একজাতি থাকিয়া,একই ভাবে ও একই বৃত্তিশালী হইয়া, আহার বিহার বিলাস বিস্তার পূর্ব্বক কালযাপন করিতেন। ভিন্নতার নামমাত্রও পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু কোন সংযোগই চিরদিনের নহে! পিতাপুত্রে পৃথক্ হইয়া থাকে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক্ হইয়া থাকে, সুতরাং এ সংযোগও চিরদিন থাকিবার নহে। সংযোগে পালনযোগ্য ন্যস্ত-কার্য্য সমাধা হইলেই, একক হউক বা অপর নবসংযোগে হউক,নূতন আদিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বসংযোগ আর রক্ষা হইবার কথা নহে। কালবশে ইঁহাদেরও সংমিলন ভাঙ্গিল,মহদুত্তেজক অভাবের বৃদ্ধি হইল, স্বস্থান প্রচুর বোধ হইল না; অথবা যে কোন কারণের উপস্থিতিতেই হউক, আবশ্যক বোধে, পার্থক্য অবলম্বন পূর্ব্বক, ইঁহারা সুখলালসায় স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদৃচ্ছা অভিগমনে প্রবৃত্ত হইল। হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত অল্প ভ্রমণেই হলস্কন্ধে, হস্তে ধনুর্ব্বাণ, বিশাল হিমাদ্রিচূড়া লঙ্ঘন করিয়া, পুণ্যসলিলা সরস্বতী এবং পঞ্চনদের তটে অবতীর্ণ হইলেন। অন্য দিকে গ্রীকগণ বহুতর নদ নদী পর্ব্বত বনদেশ অতিক্রম করিয়া, বহুরক্তপাতে, বহুকষ্টে ও বহুশ্রমে, বহুদূর ভ্রমণান্তে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী হেলাসভূমিতে পদার্পণ করিলেন। স্ব স্ব উপনিবেশস্থলে পদার্পণ মাত্রেই শান্তিলাভ উভয়ের মধ্যে কাহারই ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই। উভয়েই উভয় দেশে পদার্পণ মাত্র দেখিলেন যে, তত্তৎস্থানের আদিম অধিবাসিগণ উভয়েরই নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে দণ্ডায়মান।—ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বী, দৈত্যকুল; হেলাসে পিলাসগি। উভয়েই উভয়কে দমন করিয়া, এবং দাসত্বপদে আনিয়া, আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপনের সূত্রপাত করিলেন। বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থাসঙ্কুল পথাতিক্রমের বিভিন্নতা পরিত্যাগ করিলে, উভয়জাতির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া দূরান্তরে পতিত হইলেও, বৃত্তির এখনও একতা ব্যত্যয় ঘটিয়া উঠে নাই বলিতে হইবে। কিন্তু এ একতা আর অধিকক্ষণ থাকে না। স্ব স্ব বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে ইঁহাদের প্রবেশ আরম্ভ হইল।

হিন্দু এবং গ্রীক, এতদুভয় জাতি যৎকালে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্ব স্ব গন্তব্য এবং অধিকৃত দেশদ্বয়ে পদার্পণ করিয়াছিল, সেই সময়ে, সেই স্মৃতিবহির্ভূত সময়ে, সমস্ত জগৎ ঘোর মূর্খতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। পার্শ্বস্থ মানব সমস্ত তখন একরূপ পাশববৃত্তি অবলম্বন করিয়া বনে বনে, গিরি-গহ্বরে, সমুদ্রবেলায়, ক্ষুব্ধচিত্তে আহার লালসায় যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়া-

ইত। মিসর এবং ফিনিসীয় সভ্যতার স্তিমিতালোক তখনও প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা বোধ হয় তত্তৎ দেশমধ্যে আবদ্ধ, এবং দেশবহির্ভাগের যে কোন বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক-বিরহিত ছিল। সুতরাং হিন্দু এবং গ্রীক উভয় জাতিই স্বীয় স্বীয় গন্তব্যপথের পরিচালক বন্ধু বা শত্রুস্বরূপ দ্বিতীয় কাহাকে প্রাপ্ত হয়েন নাই।

মানবচিত্ত শৈশবে বিচারবিহীন, বিকারবিহীন, দুগ্ধমথিত সদ্যনবনীতবৎ নির্ম্মল, কোমল, টল টল করিতেছে, পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলে, তাহাতে পায়ের দাগ বসিয়া থাকে। চক্ষু নলিন, নবীন, পূর্ব্বদর্শনশূন্য, অকপট! যে যে ভাবে নয়নসমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, চিত্ত তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে অবিকল সেই ভাবে গ্রহণ করিতেছে। এ সময়ে যে কোন বস্তু, ইচ্ছা করিলেই সেই নেত্র এবং চিত্তসমক্ষে, রোষ, তোষ, ভয়, বিস্ময়, মোহ প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই উৎপাদনে সমর্থ হয়। এ সময়ে প্রবলতা সহকারে যে যে ভাবে সেই চিত্তকে আকর্ষণ করিবে, উহা যথাদিষ্টরূপে সেই ভাবে আকর্ষিত হইয়া অনুরূপভাবে শিক্ষিত হইবে। গ্রীক জাতি এবং হিন্দুরা উভয়েই সেই প্রাচীনকালে যদিও ব্যক্তিগত বলবীর্য্য, সাহস ও বীরদর্প প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণে পরিপূরিত ছিল, কিন্তু সে সকল গুণ মানবীয় গুণগণনায় নিকৃষ্ট শ্রেণীতে অবস্থান করে। যে গুণের উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব বোধ হয়, যে জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশ ও দীপ্তিমান হইয়া থাকে, এমন রূপ গুণ ও জ্ঞানের আধারস্বরূপ মানবীয় জ্ঞানজীবনের তাহাদের এই শৈশবকাল। চিত্ত অনুরূপ শৈশবোচিত। এ সময়ের দর্শনস্থলীয়—একমাত্র জড়জগতস্থ ভৌতিক ব্যাপার। ফলতঃ বাহ্য জগত এ সময়ে যে ভাবে যে মূর্ত্তিতে চিত্ত আকর্ষণ করিবে, উহা সেই ভাবে আকর্ষিত, তাহাতে পূর্ণ ও শিক্ষিত হইবে। এই শিক্ষা বর্ত্তমান এবং প্রায় ভাবী জীবনপ্রবাহেরও পরিচালক হইয়া থাকে, বহুযত্নেও তাহার মোহ পরিত্যাগ করিতে কদাচিৎ সমর্থ হয়।

কিন্তু এস্থলে এক কথা বলা কর্ত্তব্য। উপরে যে মত প্রকাশিত হইল, তদ্দ্বারা যেন এরূপ বিবেচিত না হয় যে, একমাত্র বাহ্য জগৎই মানবজীবনের গতিচাতুর্য্য সুখসম্পাদনপক্ষে বলবতী, অথবা মানবপ্রকৃতি আত্মস্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহ্যজগতেই লীন হইয়াছে। এস্থলে একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা কর্ত্তব্য। আমরা এ প্রবন্ধারম্ভ হইতে কোথাও প্রকৃতি, কোথাও বাহ্যজগৎ, কোথাও বা মনুষ্যপ্রকৃতি, এবম্ভূত শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এই প্রত্যেক শব্দ কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? প্রকৃতি অর্থে যাহার নির্ব্বাচন ও ক্রিয়াফলে কর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি; যাহা কেবল নিয়ন্তার পরবর্ত্তী, কিন্তু আর সকলের আদি; যাহা নিয়ন্তার আজ্ঞাবশে যথাদিষ্ট কর্ম্মসূত্র নির্ম্মাণে নিরত রহিয়াছে; যাহা সর্ব্বব্যাপিনী, এবং যাহার আদি অন্ত কেবল নিয়ন্তার সন্নিহিত; তাহাই কেবল প্রকৃতিপদে বাচ্য। তদ্ব্যতীত প্রকৃতিস্থ আর সমস্ত

অর্থাৎ যাহা পরিদৃশ্যমান—তাহা বাহ্যজগৎ। আবার বাহ্যজগৎ এবং মানব-প্রকৃতি উভয়ে স্বতন্ত্র পদার্থ ; বাহ্যজগৎ নিয়ন্তৃ-ইচ্ছা-পরিচালিত, আর মনুষ্যপ্রকৃতি সেই নিয়ন্তৃ-ইচ্ছা-শয়নশায়ী হইলেও স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় ইচ্ছা পরিচালনে কিয়ৎ পরিমাণে সক্ষম। কিন্তু মানব প্রকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে স্বেচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন হইলেও, বিনা অবলম্বনে কার্য্যকরণে অক্ষম ; বাহ্যজগতের মুখাপেক্ষী, তাহার সহিত সংযোগ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না। অন্তর, মন, অহঙ্কার, প্রজ্ঞা, মেধা, মতি, মনীষা, জুতি, সমৃতি, ক্রতু, ইচ্ছা ইত্যাদি বৃত্তিনিচয় মনুষ্যপ্রকৃতির পৈতৃক সম্পত্তি, বাহ্যজগৎ হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। চার্ব্বাক বা ডারবিনশিষ্যগণ বলিতে পারেন যে, আদিমকাল হইতে চেতনাচেতন উভয়ের ক্রমান্বয় সংঘাতে উক্ত সমস্ত বৃত্তি উদ্ভাবিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহা হইলে হইতে পারে, এবং যে তাহা গ্রহণ করিতে চাহে, তাহারই পক্ষে গ্রহীতব্য। আমার পক্ষে, বিশ্বক্রিয়ার সহিত সহজে যাহা সামঞ্জস্য-সাধক, এবং যাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় এবং গ্রহণীয়। যাহা হউক ঐ সকল বৃত্তি মনুষ্যপ্রকৃতির আছে বটে, কিন্তু বাহ্যজগতের সংস্রববিরহে ঐ সকল বৃত্তি অকার্য্যকর। উহারা শাণিত অস্ত্র স্বরূপ কর্ত্তন-যোগ্য দ্রব্য পাইলে কার্য্য করিল, এবং সেই কার্য্যে যত্ন পূর্ব্বক প্রয়োজিত করিলে, হয়ত ধারেরও বৃদ্ধি হইল ; কিন্তু যদি তাহা না পাইল, তবে অকার্য্যকর হইয়া অবয়বটি মাত্র লইয়া পড়িয়া থাকে, এবং অব্যবহারে হয়ত মরিচা পড়ায় ধারের একেবারে ধ্বংস হয়। বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইলে পর, বৃত্তি লইয়া কি করিব ? আমার স্মৃতি আছে কিন্তু কি স্মরণ করিব ? স্মরণীয় বস্তু কোথায় ? আমার মনীষা আছে, কিন্তু কি লইয়া তাহা খাটাইব ?—যে লৌকিক বস্তু-মার্গ অবলম্বন ভিন্ন পারলৌকিক বস্তু অনুভবের সম্ভব শরীরীর অসাধ্য, সে বস্তু কোথায় ? আমার অহঙ্কার আছে, কিন্তু কাহার সহিত পার্থক্য দর্শাইয়া এই বোধের ভাব সম্যক উপলব্ধি করিব ?—তুলনীয় বস্তুর অভাব। আর আর বৃত্তি সম্বন্ধেও তত্তৎ প্রকার। এই সকল বৃত্তি নিয়োগ বা অনিয়োগে, উৎকর্ষ বা অপকর্ষভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা সাধারণ মানবীয় কার্য্যসমূহেও ইহা নিত্য প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। ফলতঃ বৃত্তিসমস্ত যদি বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, এবম্ভূত অকার্য্যকর হয় যে, তাহা হইলে মানবপ্রকৃতি অস্তিত্বসত্বেও, অস্তিত্ববিহীনতা অপেক্ষা অধমভাব প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় অবাঞ্ছনীয় এবং হেয়তম হইয়া উঠে। কিন্তু সর্ব্বদর্শী নিয়ন্তার তাহা অভিপ্রেত নহে।

অতএব মানবপ্রকৃতি বাহ্যজগতের সংযোগ ভিন্ন কার্য্যারম্ভে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমরা যাহা করি, আমরা যাহা বলি, বা আমরা যাহা ভাবি, সে সকলেরই ভাব অগ্রে আমরা বাহ্য জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি ; নতুবা সে সকল নিষ্পন্ন করিতে পারিতাম না। মানবচিত্তের সহ বাহ্য জগতের সংযোগ, প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিভাবে বিভাবিত হওয়া মাত্র, যদ্রূপ কোন বর্ণ

-বিশিষ্ট পুষ্প বা বস্তু বিশেষের সান্নিধ্যস্থিত স্ফাটিক পাত্র তদ্রূপ বিভাষিত হইয়া থাকে। বাসন্তপ্রদোষে তমসাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল দেখিয়া আমার মন সহসা তমসাচ্ছন্ন হইয়া ম্লানভাবে অভাবনীয় চিন্তামগ্ন হইল কেন? দেহপিঞ্জরে প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল, কি সকল কথা মনে হইতে হইতে আবার যেন ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেছে। কোথায় আকাশের দূরপ্রান্তে মেঘমালা ঝুলিতেছে, আর কোথায় আমি এই দূরসংসারকান্তারে পড়িয়া রহিয়াছি, তথাপি কেন উহার দ্বারা আমার চিত্ত আকর্ষিত হইয়া তাহাতে ভাবান্তর উপস্থিত হইল,—ঐ মেঘের সহ আমার মনের কি সম্বন্ধ বলিতে পার? কোকিলের কুহুস্বরে শ্রবণের তৃপ্তি; পূর্ণচন্দ্র দর্শনে চিত্তের প্রফুল্লতা; নক্ষত্র-খচিত নীল-চন্দ্রাতপ নভঃস্থল দর্শনে মনোমধ্যে স্বীয় অসারত্ব জ্ঞান এবং স্রষ্টার গরিমা; এবং দূরস্থ গীতবাদ্যধ্বনি শ্রবণে চিত্তের অস্থির প্রসন্নতা; নির্ঝরিণীপরিশোভিত গিরিগুহামধ্যস্থ কান্তারভাগ হইতে বহুবিধ বিহঙ্গরব মিশ্রিত প্রতিধ্বনিতে মনোমধ্যে জন্মান্তরীণ ভাবের উদয়; এ সকল কি কারণে হইয়া থাকে? ঊর্দ্ধে বিদ্যুদ্বজ্রাদিযুক্ত নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল; নিম্নে স্বচ্ছন্দ অন্ধকারময়ী রজনী, টিপ্ টিপ্ খদ্যোতমালা ঝলিতেছে, বিদ্যুৎঝলসে অন্ধকার আরও বর্দ্ধিত হইতেছে, পতঙ্গের ঝিঁ ঝিঁরব, জলের তর তর ধ্বনি, ভেকের কলরব, বায়ুর শন্ শন্ শব্দ, এবম্ভূত সময়ে চিত্ত কেন চমকিত, সঙ্কুচিত, এবং ভীত হইয়া, আত্মস্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই সেই ভাবে লীন হইয়া থাকে? কোথায় মানবচিত্ত, কোথায় সেই সেই পদার্থ, তথাপি তাহাতে কেন আকর্ষিত, উত্তেজিত এবং ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে?—কি কারণেই বা সেই ভাবান্তর ভাব, দৃশ্যাদৃশ্যভাবে আমার ভাবিকার্য্যবিশেষের প্রসূতিস্বরূপ হইয়া থাকে? এ চৌম্বকীয় গুণ ইহাদের মধ্যে কে সংযোজিত করিল?—যাহার আজ্ঞায় ফুল ফুটিতেছে, ফল পাকিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডল ঘুরিতেছে, পরমাণু উড়িতেছে, আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, উহা সেই বিশ্বকর্ম্মার কার্য্য। অথবা যাহারই হউক, এবং আমরা তাহা বুঝিতে পারি বা না পারি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, বাহ্যজগৎ ও মানবচিত্তের মধ্যে সমধর্ম্মিবস্তুসম্ভব একটি চৌম্বকীয় আকর্ষণ অবস্থান করিতেছে, ইহা লুকাইবার নহে, হারাইবার নহে, ধ্বংস হইবার নহে। এই আকর্ষণসূত্র যতই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হউক, যতই কূটমার্গ দিয়া গমন করুক, সেই কূটমার্গে যতই বিভিন্নভাবের সহিত মিলিত হইয়া আত্মগোপন করুক, আমরা তাহা দেখিতে পাই বা না পাই, কিন্তু যখন আয়োজন পূর্ণ হইবে এবং উপযুক্ত কালের সুবিধা পাইবে, তখন তোমার দ্বারা সে যথাসম্ভব কার্য্য করাইবেই করাইবে। পুনশ্চ এখানেই যে তাহার ক্ষান্তি হইল, তাহা নহে। এক বিষয়ের পূর্ণতা, আর এক বিষয়ের আরম্ভ মাত্র; এবং আমরা যাহাকে পূর্ণতা বলি, তাহা সেই পূর্ণতাসাধক কারণসমূহের সারসমাবেশ বলিয়া জানিও, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এ সারসমাবেশে ও তাহার উত্তরোত্তর কার্য্যকারণভাবত্বে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণের ধ্বংস

হইতেছে না; কেবল উত্তরোত্তর সার হ-ইতে আরও সারত্বে, সূক্ষ্ম হইতে আরও সূ-ক্ষ্মতায় পরিণত হইয়া যাইতেছে মাত্র; ফ-লতঃ ইহা তুলসীদাসের অঙ্ক ৭২ হউক, বা ৮১ হউক বা ৯৯ হউক, মূলে উহা নয়ের গুণ মাত্র। যাহা হউক ক্ষুদ্র হইতে মহৎ সমস্ত বিষয়েই বাহ্যজগৎ মানবচিত্তকে আ-কর্ষিত করিয়া, তাহার ভাবান্তর সাধন, ও আপন ভাবে ভাবযুক্ত করিতেছে। লৌহ-চুম্বকের ন্যায় পরস্পর গাত্রসংলগ্ন হইতেছে না বটে, কিন্তু লৌহ চুম্বকের কার্য্যাপেক্ষাও গুঢ়ভাবে গুরুতর কার্য্যসমূহ, বাহ্যজগৎ দূরে এবং মানবচিত্ত অন্তরে থাকিলেও, এতদুভ-য়ের মধ্যে সুসম্পন্ন হইতেছে। এই জন্য বলিতেছি যে, এতদুভয়ের সংযোগ, একের বিভাসে অপরের বিভাসিত হওয়া মাত্র। এ সংযোগ তোমার আমার বারণ বা রূপা-ন্তর করিবার ক্ষমতা নাই। কর্ম্মসূত্রবশে যথাসম্ভব সংঘটিত হয়।

বাহ্যজগতের ভাব একরূপ নহে, বহু-তর, অসংখ্য। ইহার মূর্ত্তিভেদে ভাবভেদ। মানবচিত্তের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ এককালে সেই সমস্ত ভাবে সংযোজিত হইতে গেলে, তিল তিলভাবে মানবচিত্তকে বিলীন হইতে হয়। পরন্তু একের অপার বিস্তার, অপরের সঙ্কী-র্ণতা বশতঃ, তদ্রূপ সমস্তভাব একদা সং-যোজন সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। এই নি-মিত্ত, একে একে, তিল তিল করিয়া, বাহ্য-জগৎ মানবপ্রকৃতিকে স্ব স্ব ভাবের শ্রেণি-বিশেষে আকর্ষণ করিয়া, উহার অনুরূপ ভাবান্তর উপস্থিত করিয়া থাকে। এই নি-মিত্ত উহার যখন যে ভাববিশেষে মানব-চিত্ত সংযোজিত, তখন তদ্বৎকার্য্য প্রস-বিত হয়। এই সংযোগ ও তাহার উত্তে-জনা যে কত গুরুতম ও কত গুঢ়ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহা উপরে কথিত হইয়াছে; পুনশ্চ ঐ সংযোগ ও উত্তেজনা যে আবার কেবল চিত্তেই সমাবেশ এবং তদতিরিক্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের ক্রিয়া বিশেষ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, তাহা কোন বিষয় হইতে উৎপন্ন আপন মনের ভাব হ-ইতে যে সমস্ত ক্রিয়া গুলি করিবার জন্য চিত্তে প্রসন্নতা উপস্থিত হয়, তাহাদের স-ম্বন্ধ মিলাইয়া দেখিলে জানিতে পারিবে। কোন বস্তু দৃষ্টে তোমার মন চকিতবৎ ভা-বান্তর প্রাপ্ত হইল; সেই ভাবান্তর প্রাপ্ত মনে তোমার যত গুলি কার্য্য করিতে ইচ্ছা জন্মিবে, জানিও সেই সমস্ত কার্য্য কলাপ, ও তাহাদের প্রসূতিস্বরূপ মানসিক ভাবা-ন্তর বিশেষ, উভয়েই এক জাতীয় পদার্থ; এবং সেই প্রসূতির তাহারা, ইচ্ছাগত থা-কুক বা ইচ্ছার কার্য্য পরিণতিতে দৃশ্যমান হউক, অবশ্যম্ভাবী সন্ততি। অতএব যে বস্তু হইতে ভাবান্তরের উৎপত্তি, সেই বস্তু, ভাবান্তর, ভাবান্তর হইতে উদ্ভূত ইচ্ছা, এবং সেই ইচ্ছাজনিত কার্য্য, ইহারা সকলেই সমধর্ম্মী পদার্থ এবং একসূত্রে গ্রথিত; প্রভেদমাত্র এই যে কেহ উৎপন্ন, কেহ উৎপাদক। সেইরূপ আবার সময়ান্তরে মন অন্যরূপ ভাববিশেষে সংযোজিত হ-ইলে, অন্যতর ফল প্রসবিত হয়। সান্নি-ধ্যস্থিত বস্তুবিশেষ হইতে স্ফাটিক পাত্র যে বর্ণ প্রাপ্ত হয়, আবার প্রতিকূলবর্ণ-বিশিষ্ট পদার্থসংযোগে যেমন সেই পূর্ব্ব প্রাপ্ত

বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে ; তেমনি বাহ্য জগতের কোন এক ভাবের সহ সংযুক্ত মানবপ্রকৃতি যদি অদৃষ্টপূর্ব্ব বা যে কোন প্রকারে আবার ভাববিশেষ দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎপরিমাণ অনুরূপ পূর্ব্বভাবের, এবং তদুৎপন্ন কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। দৃষ্ট বা অদৃষ্টপূর্ব্ব এই প্রতিকূল সংযোগবশেই, আমরা জাতিবিশেষে যে স্বভাবের কার্য্য নিয়ত প্রত্যাশা করিয়া থাকি, মধ্যে মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। যিনি এই তত্ত্ব সম্যক অবগত, এবং বাহ্যজগৎ ও মানবপ্রকৃতির সহ সম্বন্ধ অবধারণ পূর্ব্বক প্রত্যেক কার্য্যে উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য, এবং সম্বন্ধনিরূপণ করিয়া এতৎজাতীয় জীবনদ্বয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই তদ্বিষয়ে পটুতালাভে কৃতকার্য্য হইবেন ; এবং মানবজীবন-প্রবাহের অদ্ভুত কৌশল জ্ঞাত হইয়া, অপার আনন্দলাভে সমর্থ হইবেন।

বলিয়াছি যে জাতিদ্বয়ের জ্ঞানজীবনের এই শৈশবকাল। চিত্ত তরল, কোন একটি বস্তু সংঘাতে, সহসা বিপুল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়। সুতরাং এ সময়ে ইহারা বাহ্যজগতের যে যে ভাবের সহিত সংযোগে আসিয়াছে, তাহাতেই তরঙ্গায়িত হইয়া, অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই উভয় জাতি স্বস্ব উপনিবেশিত দেশে পদার্পণ করিলে পর, বাহ্যজগৎ কাহার নিকট কিরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া, প্রত্যেকের ভাবিজীবন-প্রবাহ, এবং তজ্জনিত শুভাশুভের কিরূপ ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, তাহা আপাততঃ প্রবোধার্থে অতি স্থূল স্থূল বিষয় লইয়া দেখা যাউক। এই স্থানে কিয়দ্দূর কিয়ৎ পরিমাণে বকল সাহেবের মত অনুসরণ করা যাইবে, যেহেতু এখানে তাহা অংশতঃ প্রয়োজন যোগ্য।*

---

* যশুভক্ষণে বকল সাহেব তাহার সভ্যতার ইতিহাস বিষয়িণী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যদি বা করিয়াছিলেন, তবে গোড়ায় "All rights reserved" শব্দটি লেখন নাই কেন? কার্লাইল বলিয়াছেন যে এক কেট্‌লির ঘায়ের ওয়াস্তায় মিরাবো ও ফরাসি রাজবিপ্লবের জন্ম, আমিও বলি এক "All rights reserved" শব্দের ওয়াস্তায় বাঙ্গালায় সাহিত্য বিপ্লবের উৎপত্তি। ফলতঃ এখন যে বাঙ্গালা মাসিক সাময়িক পত্র সমূহের বৈশাখের খণ্ড আশ্বিন মাসে বাহির হইতেছে, বকল সাহেব না থাকিলে, অর্দ্ধেক প্রবন্ধের অভাবে, ফিরে বৈশাখে তাহা বাহির হইত। বাঙ্গালা প্রবন্ধ লেখকদিগের এখন উলটিয়া পালটিয়া কেবল বকল সাহেবের শ্রাদ্ধ। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমাদের এ প্রবন্ধ লেখক বড় একটা বকল সাহেবের তোয়াক্কা রাখিবেন না, এখন দেখিতেছি তাহা আমার ভ্রম। সাময়িক বাতাস ইহারও গায় লাগিয়াছিল। এখনও দেখিতেছি, অন্ততঃ এই প্রবন্ধলিখনকাল পর্য্যন্ত দেখিতেছি, লেখক স্বীয় সাময়িক সময় অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইতি—বাঙ্গারাম। ১২৮৭।

আমি বলি ইহা তোমার মাথা আর মুণ্ডু! আবাগের বেটা ভূত ব্যাল্লিক, এতকাল শ্রোতাগিরি করিয়া শেষে এই গুরুমারা বিদ্যা জন্মিয়াছে!—প্রবন্ধলেখক।

ভারতীয়েরা স্বল্পপ্রাণ উত্তরকুরুবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া, সুখলালসায়, মনের সাহসে, অল্পশ্রমে, অনুরূপ স্বল্প-প্রাণ-নদী পর্ব্বত কানন প্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া, ভারতে উপনিবিষ্ট হইলেন। হয় ত এখানে উপনিবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহারা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে যেখানে যাইতেছি, সেখানকার বাহ্যজগৎও, আহার-প্রচুর অথচ উত্তর-কুরুবর্ষের ন্যায় চিত্তের সামঞ্জস্যসাধক হইবে। কিন্তু আশার কি বিপরীত ফল। তাঁহারা ভারতে পদার্পণমাত্র দেখিলেন যে ভারতীয় বাহ্যজগৎ অভূতপূর্ব্ব ভাববিশিষ্ট। ভয় বাৎসল্যের এককালে যুগপৎ উৎপাদক। উত্তরে বিশাল হিমাদ্রি গিরি শত শৃঙ্গে ধবল মূর্ত্তি ধরিয়া, বিরাট দেহে গগণ ভেদ পূর্ব্বক নক্ষত্র মণ্ডল স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পার্শ্বে সপ্তসিন্ধু বায়ু-বিক্ষোভিত সাগরতরঙ্গ অনুকরণ করিয়া বেগভরে প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণে গ্রামমণ্ডল,নয়নপথ অতিক্রম করিয়া, স্বভাবজাত ভীমমূর্ত্তিধারিণী নিবিড় বনভূমি, উন্নত-শির বৃক্ষাবলি গগণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভীষণ-স্বভাব শ্বাপদকুল রব তুলিয়া বনভূমি আলোড়িত ও দিগ্বলয় কম্পিত করিতেছে। ঊর্দ্ধে গগণ-সাগরে ঘোরদর্শন শকুন্তবর্গ সন্তরণ দিতেছে। নিম্নে বীভৎস-মুর্ত্তিবিশিষ্ট খলস্বভাব বিষধর সরীসৃপকুল, ধীরে ধীরে, মন্থরগমনে অতর্কিত ভাবে তৃণশস্প-সমাচ্ছন্ন হইয়া, পদে পদে পদক্ষেপে আশঙ্কা জন্মাইতেছে। ব্যোম মার্গে মেঘদল বিদ্যুৎ-বজ্রপাণি হইয়া, যদৃচ্ছা বিচরণ পূর্ব্বক বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া ফিরিতেছে। পবন দেব রোষভরে আমূল জগৎ কম্পনে রত। উত্তরকুরুস্থ হিমানী মুক্ত হইয়া, নিশানাথ এখানে যথার্থই সুধাংশু-অংশু, এবং দিন-দেব সহস্র রশ্মিতে বিভূষিত হইয়া; অচিন্তনীয় পুরুষ নিয়ন্তার প্রত্যক্ষ প্রভাব জ্ঞাত করিতে করিতে, উদয়গিরিহইতে অস্তশিখরে গমনাগমন করিতেছেন। নিশা নিবিড়, কখন বা নিবিড়তম হইয়া কেবল খদ্যোত-মালায়, কখন বা নীল উজ্জ্বল মণিখচিত চন্দ্রাতপতলে প্রদীপ্ত মণিসহস্রের স্তিমিতালোকে, প্রতিভাসিত হইতেছে। এদিকে বসুন্ধরা মাতৃস্নেহপরবশ হইয়া, অযাচিত ভাবে ফল মূল প্রভৃতি আহারীয় এবং আশ্রয়দানে, যেন শান্তনা এবং অভয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলতঃ বাহ্যজগৎ যেন এখানে আর্য্যগণকে রোষ ও ক্ষমামিশ্রিত বিকটভঙ্গিতে সদর্পে কহিতেছে, ‘দেখ এ তোমার করকা-নিহার-পীড়িত সামান্য-প্রাণ উত্তরকুরুবর্ষ নহে যে, যে কোন বিষয় সহজে সাধ্যায়ত্ত করিতে যাইবে; অনেক তেজে আসিয়াছিলে, দস্যুদল নিপাত করিয়া বড় দর্পিত হইয়াছ, কিন্তু আমার মূর্ত্তি দেখিলে ত! আমার বিকটহাস্য একবার দেখিবে?—না তাহা হইলে তুমি বাঁচিবে না। এখন দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র, দর্প দূর কর, আমার পায়ে নত হও, ভয়বিস্ময়ে নিয়ত আমাকে দর্শন ও আমার উপাসনা কর। খাইতে দিতেছি খাও, তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না; কিন্তু দেখিও,মাথা তুলিও না।”

আর গ্রীকভূমি দেখ! হিমানী-পীড়িত উত্তরকুরুবর্ষ হইতেও স্বল্প-প্রাণ। যাহারা

স্বস্থান পরিত্যাগান্তে বহুদূর অতিক্রম করিতে গিয়া, গ্রীস অপেক্ষা ভীষণতর জাগতিক মূর্ত্তিকে উপহাস করিতে করিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের নিকট ইনি কি ভয় প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন? ইহার প্রাণ স্বল্প, শক্তিও স্বল্প। দর্শনসম্পন্ন দৃঢ়তাযুক্ত মানবচিত্তকে মোহাভিভূত করিয়া, নিয়ত ভয়বিস্ময়ের অধীন রাখা ইহার কার্য্য নহে। ভারতে যেমন জাগতিক মূর্ত্তি দর্শনে মানবচিত্ত, বাহ্যজগতের নিকট আত্মপরাধীনতা স্বীকার করিয়া দাসবৎ রহিল, গ্রীকেরা তেমনি জাগতিক ভীষণতার অভাবে সাহস লাভ করিয়া, তদধীনতাসত্বেও তাহার উপর প্রভুর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। গ্রীসে জাগতিকমূর্ত্তি উর্দ্ধ অধে সামান্য-প্রাণ। সুতরাং, তাহার অসামান্য ভাবে ত কথনই নহে, যদিও বা অপরিচিততায় তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণমাত্র বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই ফিক্ররসের উপন্যাসস্থ ভেককুল যেমন জুপিতুরের নিকট যাচঞা করায়, তৎকর্ত্তৃক একখণ্ড কাষ্ঠদণ্ড তাহাদিগকে রাজা স্বরূপ প্রদত্ত হইলে, ভেকেরা তদাগমনে কিয়ংক্ষণ ভীত, কিন্তু পরক্ষণেই যেমন সেই ভয়ের অপনয়নে, রাজার উপর আরোহণপূর্ব্বক টিটিকার নৃত্য এবং তাহাতে মলমূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেবতার নিকট আর একটি রাজার প্রার্থনা করিয়াছিল; গ্রীকেরাও তদ্রূপ পরক্ষণেই সেই ভয়ের কারণসকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সদর্পে বাহ্যজগৎকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,'আর তোমার কি বিভীষিকা আছে উপস্থিত কর, ইহাতে কিছুই হইল না। পূর্ব্বে যে কিছু একটু ভয় ছিল, তোমার নিকট পর্য্যন্ত আসিতে বহু ঘটনায় তাহা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তোমার একটু ভয়প্রদর্শনে সুখ বোধ হইল, নির্ভয়তা আরও বাড়িল। তুমি ভাবিয়াছ, আমাদের জীবন-উপায় পদার্থ সমস্ত লুকাইয়া রাখিবে, তাহা পারিবে না; তোমাকে চিনিয়াছি, আমরা তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব।'

এখান হইতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে যে গ্রীক এবং হিন্দু, এতদুভয় জাতির চিত্তবেগ, পূর্ব্বে যাহা একই দিকে প্রবাহিত হইত, এখানে তাহা যথা-প্রকৃতি বিচালিত হইয়া, দ্বিধাভাবে বিপরীতদিকগামী হইতে লাগিল। হিন্দুরা বিনাযত্নে অনুকূলা বসুমতী হইতে স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্যপদবীতে পদার্পণ করিয়া মানবীয় ইতরবৃত্তি সমুদয় হইতে অবসর পাইলেন বটে, কিন্তু জাগতিকমূর্ত্তিতে ভীত, বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া, এবং তন্নিকটে পদে পদে দারুণতর আত্মন্যূনতা দর্শন করিয়া, আত্মনির্ভরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সে অবসরকাল, এই বাহ্যজগৎ কে,—কোথা হইতে ইহার এরূপ অদ্ভুতমূর্ত্তি,—উহার সঙ্গে সম্বন্ধ কি,—উহাই বা কোথায় যাইবে,—আমরাই বা কোথায় যাইব,—উহা কেন অথবা কাহার আজ্ঞাবশে আমাদের উপর এই প্রভুত্ব প্রচার করিতেছে,—এবং আমরাই বা কাহার নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া সেই প্রভুত্ব সহ্য করিয়া আসিতেছি, ইত্যাদি পারলৌকিক তত্ত্বে ব্যয়িত করিয়া; সেই তত্ত্বেই চিত্ত সমাহিত পূর্ব্বক স্থৈর্য্য লাভ করিল। আর

গ্রীকেরা প্রতিকূলা বসুমতীর কোপে পতিত হইয়া, ইতরবৃত্তিনিচয়ের বশবর্ত্তিতায়, বাহ্যজগতের সহ মল্লযুদ্ধ এবং কালে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিবায়, পূর্ব্বসঞ্চিত আত্মনির্ভরতা গুণ আরও দৃঢ়তর হওয়ায়, সেই পরিমাণে পারলৌকিকতত্ত্বে আস্থাশূন্য হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয়েরা একপক্ষে আত্মন্যূনতার আধার, আর একপক্ষে গ্রীকেরা আত্মসর্ব্বস্বতার আধার হইয়া উঠিল। এরূপ আত্মন্যূনতা এবং অলৌকিক শক্তির উপর আত্মনির্ভরতার গুণ,—ধর্ম্মবিষয়ে এবং চিন্তাবিষয়ে প্রাধান্যলাভ; এবং আত্মসর্ব্বস্বতার গুণ,—পার্থিব বিষয়ে প্রাধান্যলাভ ও তৎপরিমাণ অনুরূপ অলৌকিক শক্তির উপর আস্থাশূন্যতা। এই উভয়বিধ প্রাধান্য, জাতিদ্বয়ের স্ব স্ব কি সাংসারিক কার্য্য, কি ধর্ম্মবিষয়, জীবনের সমস্ত কার্য্যেই প্রকাশমান দৃষ্ট হয়। ইতি প্রথমঃ প্রস্তাবঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতাপসিংহ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যুবক যুবতী।

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। ঘোরসন্তপ্তা মেদিনী যেন চম্ চম্ করিতেছে। প্রচণ্ড রবিকিরণ প্রজ্বলিত বহ্নিবৎ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ সময়ে কুমার রতনসিংহ দেবলবর নগরের রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মহারাণা বা তাঁহার অধীনগণ দেবলবর রাজের সহিত সৌহার্দ্য রাখেন নাই। নানাকারণে মহারাণা বৃদ্ধ দেবলবর রাজের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যাহাতে বিরাগ তাঁহার অনুগতগণেরও তাহাতেই বিরাগ। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়াছে; মহারাণা এক্ষণে বৃদ্ধ রাজার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে সহচররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এক্ষণে আর কাহারও বিরাগভাজন নহেন। মহারাণার অপ্রীতি জন্মিবার পূর্ব্বে রতনসিংহ কখন কখন দেবলবর আসিতেন; কিন্তু যে পাঁচ বৎসর মহারাণা বৃদ্ধের উপর বিরক্ত ছিলেন, সে কয় বৎসরের মধ্যে কাহার সা-

* পাঠকবর্গ মুদ্রাযন্ত্রের অপদেবতার কথা শুনিয়াছেন। আমরা এবার মুদ্রাযন্ত্রের অপদেবতা কর্ত্তৃক প্রকৃতই নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছি। প্রতাপসিংহের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ বান্ধবের তৃতীয় সংখ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া তৎস্থলে ৯ম ও ১০ম পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব নিবেদন, যাঁহারা এই উপন্যাসটির আনুপূর্ব্বিকতা রক্ষা করিয়া পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ইহার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পর এই দুই পরিচ্ছেদ পাঠ করিবেন, এবং ইহার পর চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত অংশ মিলাইয়া লইবেন। সং

হয় যে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিবে! অদ্য পাঁচ বৎসর পরে রতনসিংহ আবার দেবলবর নগরের রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসিলেন,—

'রাজা কোথায়?'

দৌবারিক সবিনয়ে নিবেদিল,—

'তিনি গত তিন দিবসাবধি বাটী নাই,—কোথায় আমরা জানি না।'

কুমার বলিলেন,—

'তিনি আজি আসিবেন কথা ছিল। কেন আইসেন নাই বুঝিতেছি না।'

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—

'আমি আপাততঃ কিয়ৎকাল এখানে বিশ্রাম করিব।'

দৌবারিক বলিল,—

'অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সহিত আসুন।'

কুমার রতনসিংহ ভবনমধ্যে প্রবেশিলেন। দেবলবর রাজের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে পরম সমাদরে সঙ্গে করিয়া একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে লইয়া গেলেন। সেই প্রকোষ্ঠে একখানি তৃণাচ্ছাদিত পালঙ্ক ছিল; রতনসিংহ তাহার উপর উপবেশন করিলেন। দুইজন ভৃত্য বায়ুবীজন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে কুমার সেই খট্টিকোপরি গভীরনিদ্রাভিভূত হইলেন। অপরাহ্নকালে কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায়। আর এখানে অবস্থান করা বিধেয় নহে বিবেচনায় সত্বর মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একজন দাসী আসিয়া নিবেদন করিল,—

'কুমারী যমুনাদেবী মহাশয়কে জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহার পিতা দেবলবররাজ কার্য্যানুরোধে এখানে উপস্থিত নাই। মহাশয়ের পদার্পণে তাঁহাদের ভবন পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু মহাশয়ের সমুচিত অভ্যর্থনা তিনি কিছুই জানেন না। অতএব তাঁহার প্রার্থনা যে, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।'

কুমার জিজ্ঞাসিলেন,—

'কুমারী যমুনা এখন কেমন আছেন?'

'ভাল আছেন।'

রতনসিংহ বলিলেন,—

'কুমারীর সৌজন্যে আমি পরম প্রীত হইলাম। আমাদের আজি কালি কিরূপ অবস্থা তাহা অবশ্যই দেবলবররাজতনয়ার অবিদিত নাই। আমি সেই জন্যই সম্প্রতি তাঁহার নিকট-বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।'

দাসী প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে পুনরাগমন করিয়া নিবেদন করিল,—

'যুবরাজ! অদ্য সন্ধ্যা উপস্থিত সুতরাং অন্ধকারে রাত্রিকালে গমনে কষ্ট হইবে। এজন্য কুমারীর প্রার্থনা যে, পদার্পণে যাহাদিগকে পরমানন্দিত করিয়াছেন, আতিথ্য গ্রহণে তাহাদিগকে পবিত্র করুন।'

কুমার কিয়ৎকাল নিরুত্তরে থাকিয়া চিন্তা করিলেন; পরে কহিলেন,—

'তাহাই হইল। এ রাত্রি পূজ্যপাদ দেবলবররাজভবনেই অতিবাহিত করিব। বিশেষ যমুনা দেবীর যে যত্ন'—

দাসী বলিল,—

'রাজপুত্র! কুমারী যে কেবল আপনাকে এরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা নহে;

অতিথিসৎকার তাঁহার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। রাজার অর্দ্ধাধিক বৈষয়িক কার্য্য কুমারী নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রাজ্যস্থ দীন, দুঃখী, মহৎ তাবতে তাঁহাকে লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া জ্ঞান করে।'

রতনসিংহ বলিলেন,—

'না হইবে কেন? দেবলবররাজ যেমন ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার দুহিতাও অবশ্যই তদনুরূপ হইবে। কুমারী যে এত গুণবতী হইয়াছেন ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। কুমারী আমার অপরিচিতা নহেন; পূর্ব্বে আমার এখানে সতত যাতায়াত ছিল। গত পাঁচ বৎসর এখানে আসি নাই। কেন আসি নাই তাহা কুমারী অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।'

দাসী করযোড়ে কহিল,—

'এ দাসীরও তাহা অবিদিত নাই।'

দাসী প্রস্থান করিল; কিছুকাল পরে পুনরাগতা হইয়া নিবেদিল,—

'সায়ংসন্ধ্যার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত; অতএব যুবরাজ আগমন করুন।'

দাসী চলিল, কুমার তাহার অনুসরণ করিলেন।

সুপ্রশস্ত কক্ষে আহ্নিকোপযোগী আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত। কুমার তথায় গিয়া ভক্তিভাবে আরাধনা করিলেন। অতঃপর [illegible] করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিল। অনতিবিলম্বে কুমারী যমুনা তথায় আগমন করিলেন। যমুনার বয়স ষোড়শবর্ষ। তাঁহার দেহ পরিণত ও সুকুমার—সর্ব্বত্র টলটলিত। বর্ণ—প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল ও গৌর। কেশরাশি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; মুক্তামালবিজড়িত বেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। নয়নযুগল—টানা, স্থির, প্রশান্ত, উজ্জ্বল ও অসামান্য বুদ্ধির পরিচায়ক। তারাদ্বয় নিবিড়কৃষ্ণ। নাসিকা উন্নত; তদগ্র চিক্কণ; মধ্যনাসা বিদ্ধ, তাহাতে মূল্যবান্ মুক্তাসম্বলিত একটি নোলক লম্বমান। কর্ণদ্বয়ে দুই হীরকখচিত দুল বিলম্বিত। কণ্ঠ স্তরে স্তরে চিহ্নিত, তাহাতে জ্বলন্ত প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ সৌবর্ণচিক পরিশোভিত। হস্তদ্বয় স্থূল, গোল ও সুকুমার। প্রকোষ্ঠে হীরকখচিত স্বর্ণবলয় এবং বাহুতে তদ্বিধ তাড়্। তাঁহার পরিধানে অতি মনোরম ও স্বর্ণোজ্জ্বল পরিচ্ছদ।

যমুনা দেবলবর রাজের একমাত্র সন্তান। শতপুত্র হইলেও দেবলবররাজ যে আনন্দ না পাইতেন, এই কন্যা হইতে তদধিক আনন্দলাভ করিতেছেন। রাজকুমারী পিতার রাজকার্য্যের সহায়, আনন্দের হেতু, বিপদের বুদ্ধি ও গৃহকর্ম্মে কর্ত্রী। যখন যমুনা পঞ্চবর্ষ বয়স্কা, সেই সময় যমুনার মাতৃবিয়োগ হয়। দেবলবর-রাজ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। একে মাতৃহীনা, তাহাতে একমাত্র সন্তান, তাহাতে আবার একাধারে এত গুণ, সুতরাং যমুনা পিতার অসামান্য স্নেহের পাত্রী।

কুমারী যমুনা ব্রীড়াবনত বদনে তথায় আগমন করিলেন। রতনসিংহ মোহিত হইলেন। দেখিলেন, তিনি তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যাহাকে একাদশবর্ষীয়া বালিকা দেখিয়াছিলেন, সেই যমুনা এখন পূর্ণাঙ্গী। সে এখন যৌবনের সুরভিপূর্ণ

পুষ্পময় পথে প্রবেশ করিতেছে। আর সে বালিকার সে তরলহাসি, সে তরলভাব নাই; লজ্জা এখন তাহার সকল অঙ্গে মাখা। আর রতনসিংহ? রতনসিংহও এখন তেমন ক্রীড়াশীল বালক নহেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ক্রীড়ায় যাহার প্রধান আমোদ ছিল, আজি সে দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের বালক ও বালিকা বলা যাইত, আজি তাহারা যুবক ও যুবতী।

যমুনা অবনত মস্তকে লজ্জা-জনিত পরম রমণীয়ভাব সহকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ প্রদীপজ্যোতিঃ তাঁহার কর্ণস্থ হীরকে, নাসিকাস্থ মুক্তায়, কণ্ঠস্থ প্রস্তরে প্রতিভাত হইয়া জ্বলিতে লাগিল ও স্বভাব-সুন্দরীর শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করিল। রতনসিংহ কি জন্য সে স্থলে বসিয়া আছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন; কুমারী কি জন্য সেখানে আসিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। চিরপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের আজি এই নূতন ভাব! তাঁহাদের সময়ভাণ্ডার হইতে পাঁচটি বৎসর চুরি গিয়াছে। সেই অপ্রতুলতা তাঁহাদের এখন এই ব্যবহার শিখাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা বালক ও বালিকা ছিল এখন তাঁহারা যুবক ও যুবতী হইয়াছেন।

প্রথমে রতনসিংহ কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—

'কুমারি! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?'

যমুনা নতমুখে বলিলেন,—

'আপনি অনেক দিন আসেন নাই।'

'সেই জন্যই কি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?'

কুমারী একটু হাসির সহিত মিশাইয়া বলিলেন,—

'আপনিই বরং আমাদিগকে ভুলিয়াছেন। আগে তো আপনাকে এখানে থাকিবার নিমিত্ত এত বলিতে হইত না।'

'আমাদের এখন যে সময় তাহা তো তুমি জান।'

'তাহা হইলেও একবার দেখা না করিয়া যাইবার কথা বলা নিতান্ত অপরিচিতের ব্যবহার।'

দোষ কুমারের সুতরাং তাঁহারই পরাজয় হইল। এমন সময় সেই দাসী তথায় আসিল। তখন যমুনা তাহাকে বলিলেন,—

'কুসুম! পিতা বাটী নাই সুতরাং কুমারের ন্যায় ব্যক্তির যথোচিত অভ্যর্থনা হইতেছে না। উনি হয়ত কতই দোষ গ্রহণ করিতেছেন।'

রতনসিংহ বলিলেন,—

'তুমি আমার সহিত অত্যন্ত শিষ্টাচার আরম্ভ করিয়াছ; ইহা আমার পক্ষে এখানে এক প্রকার নূতন অভ্যার্থনা বটে।'

'নূতন কেন? আপনি যে এখন অপরিচিত নূতন লোক।'

আবার তাঁহারই পরাজয়। তখন রতনসিংহ বলিলেন,—

'পাঁচ বৎসর এখানে আসি নাই; হঠাৎ আসিলে যদি চিনিতে না পার—'

রাজকুমারী বাধা দিয়া কহিলেন,—

'যাহারা আপনার আত্মীয়তা শিথিল বলিয়া জানে, তাহারা পরের আত্মীয়তাও দৃঢ় বলিয়া মনে করিতে পারে না। আপ-

নাকে পাঁচ বৎসর পরে দেখিয়া চিনিতে পারিব না ?'

কুমারের তিনবার পরাজয় হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কুমারীর সহিত এতকাল পরে প্রথম সাক্ষাৎ দেবলবর-রাজের সম্মুখে হওয়াই বিধেয়। কারণ এই কালের মধ্যে কুমারীর বয়সের পরিবর্ত্তনের সহিত হয় ত তাঁহার মনেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। হয় ত বালিকা যমুনার সহিত যুবতী যমুনার মানসিক ভাবেরও অনেক বৈষম্য হইয়াছে। দেবলবররাজ বাটী না থাকায় কুমার সাক্ষাতের প্রস্তাব করেন নাই এবং সেই দোষ উপলক্ষেই তাঁহাকে যমুনা অদ্য এতাদৃশ অপ্রতিভ করিলেন। তখন কুমারী বলিলেন,—

'আপনি জল খাউন। আবার রাত্রির আহার্য্য প্রায় প্রস্তুত।'

রতনসিংহ ভাবিলেন, যমুনা আমাকে যথেষ্টই লজ্জা দিয়াছেন, কিন্তু আমিও তাঁহাকে একটা বিষয়ে শোধ দিতে পারি। ছাড়িব কেন ? প্রকাশ্যে বলিলেন,—

'দেবলবররাজকুমারী যে রাজধানীর সমস্ত নিয়ম জানেন না বা জানিয়াও পালন করেন না, ইহা আশ্চর্য্য!'

কুমারী সশঙ্কিতভাবে কুমারের মুখের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার হীরকখচিত কর্ণাভরণ দুলিতে লাগিল। কুমার দেখিলেন—অপূর্ব্ব! বলিলেন,—

'আমরা মহারাণার আদেশক্রমে পাতারি ভিন্ন আর কিছুর উপর আহার করি না, তাহা কি তুমি জান না ?'

তখন কুমারী চমকিত হইয়া দুইপদ পিছাইয়া গেলেন এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন,—

'ভগবন্ ভৈরবেশ! তুমিই জান এ হৃদয়ে মহারাণার আদেশের কি মূল্য। আমার এই ক্ষুদ্রজীবনের বিনিময়ে মহারাণার আজ্ঞালঙ্ঘনপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।'

আবার কুমারের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

'সর্ব্বনাশ! কুমার আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার দোষে এভুল ঘটে নাই। কুসুমের অমনোযোগিতায় ইহা ঘটিয়াছে। যাহারই জন্য হউক, আমিই অপরাধিনী—আমাকে মার্জ্জনা করুন।'

কুমার সানন্দে দেখিলেন, এই কুসুমসুকুমারীর কোমল অন্তরেও কেমন রাজভক্তি ও স্বদেশানুরাগের তাড়িতলহরী খেলিতেছে। ভাবিলেন, 'এ দেশ কখনই অধঃপতিত থাকিতে পারে না।'

কুসুম ব্যস্ততাসহ একখানি পাতা আনিয়া দিল এবং যমুনা খাদ্যদ্রব্য সমস্ত সেই পাতার উপর স্থাপন করিলেন এবং সেই স্বর্ণ-পাত্র দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে রতন সিংহ রাত্রে আর আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন,—

'বহুকাল পরে তোমাকে আজি দেখিয়া মন বড় আনন্দিত হইল।'

কুমারী কথার কোন উত্তর দিলেন না। একবার মুখ তুলিয়া প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে রতন সিংহের মুখের প্রতি চাহিলেন। সে দৃষ্টি কত কথারই কার্য্য করিল!

আবার রতনসিংহ কহিলেন,—

'আমি তো কালি প্রত্যূষেই গমন করিব। হয় ত তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।'

'কেন?'

'যে বিষম সমরায়োজন হইতেছে তাহাতে কে বাঁচিবে, কে মরিবে, কে বলিতে পারে?'

সুন্দরী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—

'ভবানী করুন মিবার যেন জয়ী হয়।

কুমার গাত্রোত্থান করিলেন। কুসুম তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বহিঃস্থ প্রকোষ্ঠে আসিবামাত্র প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং এক সুবিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শয়নার্থ একখানি তৃণাচ্ছাদিত খট্টা দেখাইয়া দিলেন। কুমার তথায় উপবেশন করিলে কর্ম্মচারী নিম্নে বসিয়া মহারাণা, যুদ্ধ, যবন ইত্যাদি নানাবিষয়ক আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। কর্ম্মচারী বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। কুমার শয়ন করিলেন—নিদ্রার জন্য, না চিন্তার জন্য? চিরকাল যাহাকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহাকে পাঁচ বৎসর পরে আজি একবার দেখিয়া এই অসিজীবী যুবকের হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; আজি তাঁহার শয্যা চিন্তার নিকেতন হইল; আজি তিনি সংসার নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; আজি কুমারী যমুনা তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কুমারের রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। আরও একটি নিরীহ প্রাণীর নিকট সে রাত্রি নিদ্রা ভাল করিয়া দেখা দেন নাই। তিনি যমুনা।

অতিপ্রত্যূষে রতনসিংহ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। যখন তিনি প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন তখন দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে যমুনা, তৎপশ্চাতে কুসুম। বিদায়দান ও বিদায়গ্রহণ সমাপ্ত হইল। ইতিহাসে তাহার বৃত্তান্ত লেখা নাই বটে, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, সেই বিদায়কালে রতনসিংহ 'পত্তন নগর যাইব' বলিতে 'প্রতাপসিংহ নগর যাইব' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পথে ভুলক্রমে অশ্বকে অনেকক্ষণ বিপরীত পথে চালাইয়াছিলেন। আর কুসুম লোকের নিকট গল্প করিয়াছিল যে, রতনসিংহ চলিয়া যাওয়ার পরে চারি পাঁচ দিন যমুনা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে 'কুমার' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় হরিণশিশুকে তিন দিন আহার দেন নাই। কিন্তু এ সকল আমাদের শুনা কথা,—আমরা ইহার কোন প্রমাণ রাখি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মস্তক বেদনা।

উদয়-সাগর বেষ্টন করিয়া যে অত্যুচ্চ প্রস্তরপ্রাচীর আছে, তাহার উত্তর ধারে পঞ্চাশটি পটমণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। দুইটি বস্ত্রগৃহ অত্যুৎকৃষ্ট বনাতে রচিত। তাহার উপরিস্থ স্বর্ণকলস রবিকিরণে ঝলসিতেছে এবং তাহার ঊর্দ্ধদেশে বাদসাহের নিশান উড়িতেছে। অবশিষ্ট পটমণ্ডপগুলি

তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। বাদসাহ আকবরের প্রধান সেনানায়ক মহারাজ মানসিংহ সোলাপুর জয় করিয়া আসিতেছিলেন। উদয়পুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহারাণা প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জন্মে। ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, মানসিংহ বাদসাহ আকবরের পুত্র সেলিমের সহিত আপনার ভগিনীর বিবাহ দেন। এজন্য তিনি তেজীয়ান্ রাজপুতদিগের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার পদপ্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হইলেও স্বজাতীয়েরা তাঁহাকে পতিত ও কলঙ্কিত বলিয়া নিন্দা করিত। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ মানসিংহ লোকের মনোভাব বুঝিতে অক্ষম ছিলেন না। এই কলঙ্ক বিদূরিত করিবার কেবল একই উপায় ছিল। সে উপায়—মহারাণা প্রতাপসিংহের অনুগ্রহ। মহারাণা রাজপুতকুলের চূড়া। তাঁহার কার্য্যের বা ইচ্ছার দোষ উল্লেখ করে, এত সাহস বা সেরূপ মতি কাহারও নাই। অতএব প্রতাপসিংহ যদি তাঁহাকে কৃপা করেন, যদি দয়া করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে আহার করেন, তবে আর কাহার সাধ্য তাঁহাকে ঘৃণা বা পতিত বলিয়া ধিক্কার দেয়। এই জন্য মহারাজ মানসিংহ স্থির করিলেন যে, মহারাণার ভবনে অতিথিস্বরূপে উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই অনুকম্পা করিবেন। মানসিংহ অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। প্রতাপের করুণালাভ করিতেই হইবে—এ অপমান আর সহিব না।

মানসিংহ শিবিরনিবেশ পূর্ব্বক সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি মহারাণার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী এবং অদ্য তাঁহার দ্বারে অতিথি। প্রতাপসিংহ পুত্র অমরসিংহসহ সমাগত হইয়া মানসিংহকে সমাদর করিলেন। এই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইল। একজন গৌরব ও তেজ বিক্রয় করিয়া ধন, সম্পদ্ ও ক্ষমতা লাভ করিয়া আনন্দিত; আর একজন ধন, সম্পদ্ ও ক্ষমতা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপনার অসীম গৌরব ও তেজের বলে বলীয়ান্ ও আনন্দিত; একজন অমিত-প্রতাপ বাদসাহের দক্ষিণ হস্ত—তাঁহার বিপদে সহায়, আনন্দে সুহৃৎ, মন্ত্রণায় সচিব ও অভ্যুদয়ের মূল; আর একজন, তাঁহার পরম শত্রু—তাঁহার পদের অবমাননাকারী, তাঁহার প্রতাপে অকাতর, তাঁহার দর্প হরণে চেষ্টান্বিত। একজন অগথা সম্পৎশালী, অত্যুন্নত-পদ-প্রতিষ্ঠাভাজন ও অসাধারণ সমরনিপুণ হইলেও বাদসাহের অধীন; আর একজন ধনজনগৃহশূন্য পথের ভিখারী হইলেও এ জগতে কাহারও নিকট মস্তক নত করেন না,—কাহারও অধীন নহেন। একজন রাজপুতকুলের চক্ষে ভ্রষ্ট ও পতিত; আর একজন তাহাদের চক্ষে স্বর্গের দেবতার ন্যায় ভক্তিভাজন ও তদ্রূপ সমাদরে পূজিত। একজন যাহা হারাইয়াছেন তাহা এ জীবনে আর পাইবার আশা নাই; আর একজন যাহা হারাইতেছেন, তাহা পুনরুদ্ধার করিবার শত সহস্র উপায় আছে। অদ্য এই দুই জন বিভিন্ন-অবস্থাপন্ন, বিভিন্ন-স্বভাবশালী, এবং বিভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। অদ্য বাদসাহ আকবরের প্রধান সেনাপতি, অম্বর রাজ্যের

অধীশ্বর মহারাজ মানসিংহ, রাজ্যহীন, অরণ্যবাসী, দরিদ্র প্রতাপসিংহের দ্বারে অতিথি—তাঁহার কৃপার ভিখারী!

সাক্ষাৎ, শিষ্টাচার, আলাপ সমাপ্ত হইল। তখন মানসিংহ বলিলেন,—

'মহারাণা রাজপুতকুলের চূড়ামণি। আপনাকে দেখিলেই মনে যেন কেমন অতুল আনন্দের উদয় হয়।'

মহারাণা পরিহাসস্বরে বলিলেন,—

'এ ধন-জন-শূন্য দুর্ভাগাকে দেখিয়া দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনানায়ক ও অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর অম্বররাজের আনন্দের কোনই কারণ নাই।'

মহারাজ মানসিংহ একটু অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন,—

'তুচ্ছ ধনসম্পত্তি ভূমণ্ডলে ছড়াছড়ি আছে, কিন্তু মহারাণা যে ধনে ধনী তাহা কয় জনের ভাগ্যে মিলে?'

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

'সকলে এ কথা বুঝে কি?'

'যে না বুঝে সে মূঢ়।'

'আপনি যখন এতদূর বুঝেন, তখন অবশ্য ইহাও বুঝেন যে, আমার যাহা আছে তাহা সকলেই ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারিত।'

সুচতুর মানসিংহ দেখিলেন কথা ক্রমেই তাঁহাকেই আক্রমণ করিতেছে। কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। বদন একটু একটু লজ্জিত ভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ; তিনি অদ্য অপমানও হাসিয়া উড়াইবেন; তিনি অদ্য ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য্যহানি করিবেন না। বলিলেন,—

'যে রাখে নাই সে আপনিই মরিয়াছে।—এখন মহারাণা আর কত দিন এমন করিয়া থাকিবেন?'

'যত দিন জীবন। নচেৎ উপায়ই বা কি?'

'উপায় কি নাই?'

মহারাণা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

'আছে—আপনাদের অনুসরণ করিতে পারিলে উপায় হয়। কিন্তু সে উপায় কখনই প্রতাপসিংহের গ্রহণীয় হইবে না।'

আবার মানসিংহের বদনমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল; তাঁহার ললাট দিয়া ঘর্ম্ম বাহিরিতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষু ঈষদশ্রু আবির্ভাব হেতু একটু উজ্জ্বল হইল। কিন্তু তিনি অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

'আপনি ভাবিয়া দেখুন কি কর্ত্তব্য। বলুন আর কি উপায় আছে? আপনি কি উপায়ে মান রক্ষা করিবেন?'

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

'যুদ্ধ করিব, জয় করিব। সাহসে কি না হয়?'

'স্বীকার করি, সাহসে অনেক মহৎকার্য্য হয়, কিন্তু মহারাণা সময়টা একবার বিবেচনা করুন।'

'সময় যে মন্দ সেও আপনাদের জন্য। আপনারা যদি আমাদের পক্ষ ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র আকবরকে আমরা তৃণের ন্যায় উড়াইয়া দিতাম। ভারতে আকবরের যত শ্রীবৃদ্ধি, আপনার হস্তের পরাক্রমই অধিকাংশ স্থলে তাহার কারণ। অম্বররাজের সেই পরাক্রান্ত হস্ত বিধর্ম্মী য-

বনসেবায় নিয়োজিত না হইলে, আকবর-বুদ্বুদ সময়-সলিলে মিশিয়া যাইত; তাহার নিদর্শনও থাকিত না।'

মানসিংহ বলিলেন,—

'যাহা হইয়াছে তাহা তো আর ফিরিবে না; এখন—'

মহারাণা বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

'এখন কি আপনি সকল শৃগালকেই লাঙ্গুলহীন দেখিতে ইচ্ছা করেন?'

মানসিংহ নীরব ও অধোমুখ। কিন্তু তিনি অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

'মহারাণার বীরত্ব বাদসাহ বাহাদুরের অবিদিত নাই। তিনি নিয়তই মহারাণার প্রশংসা করিয়া থাকেন।'

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

'যবনভূপালের গুণগ্রাহিতায় আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার নিকট সমগ্ররূপে আমার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিতেছি না, ইহাই দুঃখ।'

'কিন্তু মহারাণা! বাদসাহের পক্ষ যেরূপ বলবান্, তাহাতে এ পক্ষে জয়ের আশা বড় অনিশ্চিত নয় কি?'

মহারাণা বলিলেন,—

'জয় না হইলেও মানের আশা আছে। যে গৌরব এত দিন শিশোদিয়াকুল রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহা কাহার সাধ্য নষ্ট করে?'

'এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সে গৌরব রক্ষা করিতে যে আয়োজন চাই, তাহা মহারাণার আছে কি?'

'আমার যদি কিছুই না থাকে, তথাপি আমার আমি আছি; এবং যতক্ষণ আমি থাকিব, ততক্ষণ চন্দ্রবংশের গৌরব অটুট থাকিবে।'

'ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাহাই হউক। মহারাণা যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ রাজপুতজাতির ভরসা আছে। কিন্তু মহারাণাও তো চিরদিন নহেন।'

'তখন কি হইবে জানি না। সম্ভবতঃ তখন এ গৌরব বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু সে পাপে কখনই প্রতাপসিংহ পাপী নহে।'

মানসিংহ বলিলেন,—

'অবশ্য। কিন্তু আমি বলি যাহা থাকিবে না জানিতেছেন, তাহার জন্য এত ক্লেশ কেন করিতেছেন?'

প্রতাপসিংহের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, অথচ তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

'এ কথা আপনাদের মুখে ভাল শুনায়। মিবারের প্রতাপসিংহ ওরূপ কথায় কর্ণপাত করে না।'

আবার মহারাজ মানসিংহ নীরব। তিনি হস্তে বদনাবৃত করিয়া অধোমুখ হইলেন। কিন্তু তিনি অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

একজন কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিল,—

'আহার্য্য প্রস্তুত।'

প্রতাপসিংহ মানসিংহের মুখের প্রতি চাহিলেন।

মানসিংহ বলিলেন,—

'ক্ষতি কি?'

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

'আমি স্বয়ং একবার দেখিয়া আসি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

বহুক্ষণপরে অমরসিংহ আসিয়া সংবাদ দিলেন,—

'মহারাজ! অন্ন প্রস্তুত।'

মানসিংহ অমরসিংহের অনুসরণ করিলেন।

রাজ-প্রাসাদের সন্নিহিত এক মনোহর স্থান এই রাজ-অতিথির সৎকারার্থ নিরূপিত হইয়াছিল। তথায় স্বর্ণ-পাত্রে অন্নাদি খাদ্য সমস্ত বিন্যস্ত হইয়াছে; এক বৃক্ষপত্রে তথাবিধ আহার্য্য সমস্ত পরিস্থাপিত রহিয়াছে। মানসিংহ দেখিয়াই বুঝিলেন, পাতারি মহারাণার উদ্দেশেই পাতিত হইয়াছে। অতএব এত অপমান সহ্য করা নিষ্ফল হইবে না। চতুর্দ্দিকে চাহিলেন—মহারাণা সেখানে নাই। মনে একটু আশঙ্কা জন্মিল। বলিলেন,—

'রাজপুত্র! তোমার পিতা কোথায়?'

অমরসিংহ তাঁহাকে সেই স্বর্ণ পাত্র দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—

'মহারাজ উপবেশন করুন,—পিতা আসিতেছেন।'

মানসিংহ বলিলেন,—

'মহারাণা বৃক্ষ পত্রের উপর আহার করিবেন, আমাকে স্বর্ণ পাত্র কেন?'

অমরসিংহ বলিলেন,—

'তাহাতে হানি কি? মহারাণা যেরূপ কারণে বৃক্ষপত্রে আহার করেন মহারাজের সেরূপ কোন কারণ নাই।'

মানসিংহ পাত্র সমীপস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। বলিলেন,—

'যুবরাজ! মহারাণা কি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত আছেন?'

অমরসিংহ বলিলেন,—

'আপনি আহার করিতে আরম্ভ করুন—আমি তাঁহার সন্ধান করিতেছি।'

মানসিংহ বলিলেন,—

'তাহা কিরূপে হইবে? তাঁহাকে ফেলিয়া আমি কিরূপে আহার করিতে পারি? তুমি তাঁহার সন্ধান কর।'

অমরসিংহ প্রস্থান করিলেন এবং অনতি বিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন,—

'মহারাণা অনুমতি দিলেন—আপনি আহার করিতে পারেন। তিনি আসিতেছেন। একটু বিশেষ প্রয়োজন হেতু তিনি পার্শ্বস্থ প্রাসাদে গমন করিলেন। শীঘ্রই আসিবেন।'

তখন মানসিংহের মন সন্দেহে আচ্ছন্ন হইল। বুঝি বাসনা সফল হয় না। তখন ভাবিলেন, মহারাণার নিমিত্ত আহারের স্থান করা হইয়াছে, সেটা তো শিষ্টাচার ও কৌশল। আমাকে বুঝাইবার উপায় যে, তাঁহার স্থান পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল আহারে আপত্তি ছিলনা, কেবল একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব কার্য্যের প্রতিবন্ধকতায় আসিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল। হায়! এত অপমান সহিয়া, দ্বারে আসিয়া উপযাচক হইয়া আশার সফলতা হইল না। তিনি আচমন করত, অন্নদেবতার উদ্দেশে সমস্ত আহার্য্য উৎসর্গ করিয়া অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। প্রতাপসিংহ আসিলেন না। খাদ্য সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

'কুমার! প্রাসাদ তো অধিক দূর নহে। তুমি আর একবার যাও—দে-

খিয়া আইস কেন তাঁহার বিলম্ব হই-
তেছে।’

অমরসিংহ পুনর্ব্বার গমন করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন,—

‘মহারাজ! পিতা শিরোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যে এখন শীঘ্র আসিতে পারিবেন এমন বোধ হয় না। অতএব মহারাজ আর অপেক্ষা না করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করুন।’

মানসিংহ বুঝিলেন, প্রতাপসিংহ তাঁহার সহিত একত্রে আহার করিলেন না। মস্তক-বেদনা ওটা তো ছলনা। অপমান সার হইল, মনোরথ পূরিল না। এত ধৈর্য্য, এত সহিষ্ণুতা সকলই বৃথা হইল। স্থির প্রতিজ্ঞায় ফল ফলিল না। তিনি অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। অমরসিংহ দেখিলেন সেই জগজ্জয়ী, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ মানসিংহের নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। একবার ভাবিতেছেন, ‘এ অপমানের প্রতিশোধ দিব।’ অমনি ক্রোধে তাঁহার বক্ষঃস্থল ফুলিয়া উঠিতেছে। আবার তখনই অসাধারণ ধীরতা সহকারে সে রাগ নিবারণ করিতেছেন। বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর মানসিংহ বলিলেন,—

‘কুমার! তুমি অশেষ বুদ্ধিমান্ হইলেও বালক। তুমি বুঝিতেছ না মহারাণার কেন মস্তক-বেদনা উপস্থিত। কিন্তু মহারাণার বুঝিয়া দেখা উচিত, যাহা হইয়াছে তাহার আর হাত নাই; আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি আর ফিরিবার উপায় নাই; যে ভ্রম ঘটিয়াছে এক্ষণে তাহার সংশোধন করা অসম্ভব। তিনি রজঃপুত জাতির চূড়া; সেই জন্যই আমি আশা করিয়াছিলাম যে মহারাণা অদ্য আমায় জাতিদান করিবেন। কারণ তাঁহার কার্য্যের উপর আপত্তি করে এমন ব্যক্তি কে আছে? মহারাণা যদ্যপি আমার সহিত একত্রে আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহা হইলে আর কে আমার সহিত আহার করিবে? আর ভাবিয়া দেখ, ইহাতে মহারাণার লাভই বা কি হইল? মানসিংহের সহিত মিত্রতা অপেক্ষা শত্রুতা করা সুবিধা নহে। মানসিংহের ক্ষমতা মহারাণার অগোচর নাই। অদ্য তাঁহাকে এতদ্রূপে অপমানিত না করিলে সেই মানসিংহ তাঁহার চরণের দাস হইয়া থাকিত। সুতরাং দিল্লীশ্বরের সহিত বিরোধিতার ইচ্ছানুরূপ অবসান হইয়া যাইত, এবং তাঁহার সৌভাগ্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিত। আর এখন? এখন মর্ম্মপীড়িত, অপমানিত, চরণদলিত মানসিংহ মহারাণার আত্মীয় নহে। তাহার যাহা হউক মানসিংহ তাহা দেখিবে না। তাহা হইলে কি হইতে পারে, তাহার চিত্র দেখাইতে আমার বাসনা নাই।’

মানসিংহ নীরব হইলেন। এখনও মানসিংহের সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। এখনও তাঁহার কথায় ক্রোধ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই প্রবল। এই সময় একজন উন্নত কর্ম্মচারী তথায় প্রবেশিয়া কহিলেন,—

‘মহারাজ! মহারাণা আমাকে বলিতে বলিয়া দিলেন, যে তিনি আসিতে না পারায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার

শিরঃপীড়া অত্যন্ত প্রবল। আর তিনি বলিতে বলিলেন যে '—

কর্ম্মচারী চুপ করিল। মানসিংহ বলিলেন,—

'কি বলিতে বলিলেন, বলুন।'

'আর তিনি বলিতে বলিলেন যে, যে ব্যক্তি যবনের সহিত স্বীয় ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছে এবং সম্ভবতঃ যবন কুটম্বের সহিত একত্রে আহার করিয়া থাকে, তাহার সহিত মিবারেশ্বর কখন একত্রে আহার করিতে পারেন না এবং তাহারও এরূপ দুরাশাকে মনে স্থান দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।'

এতক্ষণে মহারাজ মানসিংহের সহিষ্ণুতার বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। আর তিনি ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। লোচনযুগল আরক্ত হইল। তিনি জাতীয় রীত্যনুসারে অভুক্ত উচ্ছিষ্ট অন্নের কিয়দংশ স্বীয় উষ্ণীষ মধ্যে রক্ষা করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। যাইবার সময় কহিলেন,—

'অমরসিংহ! তোমার পিতাকে বলিও যে, আমরা দুহিতা ভগ্নী প্রভৃতিকে যবন-অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছি বলিয়া অদ্যাপি তাঁহাদের সম্মান সংরক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমরা কি করিব? প্রতাপসিংহ স্বীয় শুভানুধ্যানে অন্ধ। বুঝিলাম, এ দেশে আর হিন্দুজাতির জয়ের আশা নাই। যবন-প্রতাপসমীপে সকলকেই নত হইতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছা কে খণ্ডাইতে পারে?'

মহারাজ মানসিংহ অশ্বে আরোহণ করিলেন এমন সময় মহারাণা প্রতাপসিংহ তথায় আগমন করিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া সাহঙ্কারে বলিলেন,—

'প্রতাপসিংহ! নিশ্চয় জানিও এ অপমান প্রতিশোধিত হইবে। যদি এই দুষ্কর্ম্মের যথোচিত প্রতিফল না পাও, তাহা হইলে জানিও আমার নাম মানসিংহ নহে।'

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

'মানসিংহ! তুমি কি আমায় ভয় দেখাইতেছ? জানিও বাপ্পা রাওয়ের বংশধর ভয় কাহাকে বলে জানে না। যে মুহূর্ত্তে তোমার ইচ্ছা হয় আসিও, প্রতাপসিংহ সর্ব্বদা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত থাকিবে।'

প্রতাপসিংহের পশ্চাতে দেবলবর রাজ দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

'পার যদি, তবে তোমার আকবর ফুফুকেও সঙ্গে লইয়া আসিও।'

মানসিংহ ব্যতীত আর যে যে সে স্থলে উপস্থিত ছিল, সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। মানসিংহের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি অশ্ব ফিরাইলেন। আবার কি ভাবিয়া আবার অশ্ব ফিরাইলেন। নিমেষের মধ্যে অশ্ব অদৃশ্য হইল। অমরসিংহ বলিলেন,—

'মানসিংহ যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, ইহার পরিণাম আমাদের পক্ষে কখনই শুভকর হইবে না।'

প্রতাপসিংহ হাসিয়া কহিলেন,—

'অমর! ভয় কি?'

'পিতঃ! ভয়ের কথা নহে। আমার বোধ হয় মানসিংহ এ অপমানের প্রতিশোধার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।'

'ভালই তো। দেবলবর রাজ, তুমি বেশ বলিয়াছিলে। ক্ষুদ্রহৃদয় মানসিংহ অদ্য শিক্ষা পাইয়াছে।'

অতঃপর যে স্থানে মানসিংহ আহার করিতে বসিয়াছিলেন তাহা পবিত্র গঙ্গা জল দ্বারা বিধৌত করা হইল এবং হল দ্বারা কর্ষিত হইল। যে যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন এবং গঙ্গাজল সংস্পর্শে পরিশুদ্ধ হইলেন। ধন্য, জাতিগৌরব! ধন্য তেজ! চণ্ডাল সংস্পর্শে যত অপবিত্রতা না জন্মে, এই অসীম সাহসী, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ যবন কুটম্বের সহিত একস্থানে উপস্থিতি ও কথোপকথন হেতু এই রাজপুতকুলপুঙ্গবেরা আপনাদিগকে তদধিক অপবিত্র মনে করিলেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী।

কবিবর কৃত্তিবাস পণ্ডিতের নাম প্রায় বঙ্গদেশীয় প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্ঠে এবং তদীয় রামায়ণ প্রত্যেকের হস্তে বিরাজিত, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, কবিবর রঘুনন্দন গোস্বামীর নাম বা শ্রীমদ্রামরসায়ন আজি পর্য্যন্ত সেরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইল না। ইহা বঙ্গদেশের এবং বাঙ্গালির নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বঙ্গদেশ যে শেষে নবেল, নাটকের ক্ষেত্রভূমি এবং বাঙ্গালির গৃহ যে সেই নবেল, নাটকের বজরা হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও গণকবর্গের অজ্ঞাত ছিল। ইহার শেষে আবার যে এখানে কি ফল ফলিবে, তাহা ভবিষ্যতই জানে। তা যাই হউক, এক্ষণে আর ভাবিলে কি হইবে? যাহা হইবার, তাহা হইবে, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। কিন্তু তা বলিয়া ভাল ভাল পুরাতন জিনিষগুলি যে, দেশের লোকের দোষে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার উপায় কি? বাঙ্গালি কি জন্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছে? আমরা ইহার প্রকৃত উত্তর চাই। বাঙ্গালির জাতীয় ভাষা কি?—সুখদুঃখের ভাষা কি?—স্বাভাবিক ভাষা কি?—এবং এমন কি, স্বপ্নেরও ভাষা কি?—না,—বাঙ্গালা। তবে বাঙ্গালা ভাষার এত অনাদর কেন? একজন পরসম্পর্কীয়া অনাথা ভিখারিণীও বিপদে পড়িয়া কোথাও না কোথাও আশ্রয় পায়, কিন্তু আমাদের আজীবন সম্পত্তি বাঙ্গালা ভাষার এরূপ দুর্দ্দশা কেন? ইহার প্রকৃত উত্তর বাঙ্গালি দিবে, না একজন সাহেবের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে? রঘুনন্দনের শ্রীমদ্রামরসায়ন মহাকাব্য বাঙ্গালা না ইংরাজি?—উত্তর, বাঙ্গালা। তবে, ভাই বাঙ্গালি! তুমি উহা পড় না কেন? কই, উত্তর দিলে না যে? যদি বল, ইচ্ছা নাই—থাকিলেও রুচি নাই, তাই পড়ি না। তাহা হইলে তোমার প্রকৃতরূপ উত্তর দেওয়া হইল না। এ-

রূপ অসার উত্তর বরং এক দিন একজন ব-ঙ্গদেশবর্জ্জিত লোকের মুখে শোভা পায়, কিন্তু তোমার মুখে কলঙ্কের উপর কলঙ্ক-রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। যাই হউক, তোমাকে আর বেশী বলিব না। সকলের মুখে শুনিতে পাই যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালিই বড় বুদ্ধিমান্। তবে এ বিষয়ে যেন তোমার তীব্রা বুদ্ধিই উত্তর দেয়—য-থার্থ উত্তর দেয়। নহিলে সকলে যাহা বলে, তাহা অসত্য, কিংবা "অতি বু-দ্ধির—"

যাই হউক, তুমি নিতান্তই যদি রঘুনন্দ-নের রামরসায়ন না পড়, তবে দয়া করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি একবার পাঠ কর। পাঠ করিলে কিছু না কিছু লাভ করিবে এবং আমিও আমার পরিশ্রমের ফল প্রাপ্ত হইব।

রঘুনন্দন গোস্বামী কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং কোন্ সময়েই বা তাঁহার সু-বিস্তীর্ণ শ্রীমদ্রামরসায়ন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ আমরা অনুসন্ধান করি-য়াও জানিতে পারি নাই। তদীয় গ্র-ন্থের কোন স্থানেও তাহার কিছুরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পরবর্ত্তী কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক পরে আমরা ই-হাঁর এবং ইহাঁর রামরসায়নের সময় নিরূ-পণ করিয়া বান্ধবের পাঠকমহোদয়গণের ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব।

কবিবর রঘুনন্দন, মহা প্রভু চৈতন্যদে-বের প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দের বংশোদ্ভূত। ইহা তিনি তাঁহার রামরসায়নের সমাপ্তিবি-ভাগে লিখিয়াছেন। নিম্নের বংশতালিকায় অর্থাৎ কুলজীতে তাহা বিবৃত হইল।

এই কুলতালিকানুসারে দেখা যাইতেছে যে, রঘুনন্দনের পিতার নাম কিশোরীমো-হন গোস্বামী এবং অগ্রজ তিন সহোদরের নাম বিশ্বরূপ, সঙ্কর্ষণ এবং মধুসূদন। রঘু-নন্দন সর্ব্বকনিষ্ঠ। রঘুনন্দনের মাতার নাম ঊষা, বিমাতার নাম মধুমতী এবং চারিজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম ক্রমান্বয়ে রামমো-হন, নারায়ণ, গোবিন্দ এবং বীরচন্দ্র। এ-তদ্ব্যতীত ইহাঁর তিনটি ভগিনী ছিল। ই-হাঁর পিতা কিশোরীমোহন গোস্বামী ইহাঁর রাশিনাম অনুসারে আর একটি নাম ভাগ-বত রাখিয়াছিলেন।

"পিতা রাশিঅনুসারে, আর এক নাম মোরে,
ভাগবত বলিয়া অর্পিলা।"
উত্তরকাণ্ড—১৮শ অধ্যায়।

রঘুনন্দনের মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত বংশীমোহন গোস্বামী ইহাঁকে এবং ইহাঁর ভ্রাতৃগণকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ইহাঁর দীক্ষাগুরু।

'শ্রীলালমোহন আর, শ্রীবংশীমোহন তাঁর,
কনিষ্ঠ শ্রীকিশোরীমোহন।
শ্রীমধ্যম প্রভু তায়, কৃপা করি মো সবায়,
করাাছেন মন্ত্র সমর্পণ ॥—(ঐ)

রঘুনন্দনের পিতাও একজন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

' কনিষ্ঠ সদ্গুণ ধাম, ভুবনে বিখ্যাত নাম,
বেদশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
অদ্বিতীয় ভাগবতে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমতে,
করিলা যে গ্রন্থ সুবিদিত ॥
সেই প্রভু মোর পিতা, উষা নাম মোর মাতা,
বিমাতা শ্রীমতী মধুমতী।'—(ঐ)

বর্দ্ধমানের সন্নিকটে মাড় নামক গ্রামে রঘুনন্দনের নিবাস ছিল।

'বর্দ্ধমান সন্নিধান, গ্রাম মাড় অভিধান,
তাহাতেই আমার নিবাস।'—(ঐ)

গোস্বামিবংশীয়েরা ৺ রাধাকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপাসক। ইহাঁরা যে চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের কলিযুগীয় অবতার বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং রঘুনন্দন গোস্বামীও তাহাই। বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তদীয় রামরসায়ন গ্রন্থের আদ্যকাণ্ডের প্রারম্ভে এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাধাশ্যাম, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি গৃহদেবতার ন্যায় রঘুনন্দন গোস্বামীর গৃহেও ৺-রাধামাধব নামে বিগ্রহ ছিলেন।

" শ্রীরাধামাধব বন্দো ঘরের ঠাকুর।
যাঁর কৃপালেশে হয় সব দুঃখ দূর।"
আদ্যকাণ্ড—১ম অধ্যায়।

এক এক জন পণ্ডিত বা গ্রন্থকার যেমন, নিজ গুণে গর্ব্বিত হইয়া ধরাকে সরাখানা দেখেন, রঘুনন্দন সেরূপ ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি সহবৎওয়ালা চৌকষ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ বৃথা অহঙ্কার বা ঔদ্ধত্যে নির্ম্মিত হয় নাই। তিনি যেমন বিজ্ঞ—তেমনি বিনয়ী ও নম্র; যেমন কবি—তেমনি সহৃদয়, সরল ও উদার ছিলেন। রামরসায়নের যেখানে সেখানে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে। আমরা তন্মধ্য হইতে একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

' কৃতাঞ্জলি হয়ে করি ব্রাহ্মণে প্রণাম।
যাঁহাদের কৃপালেশে পূর্ণ হয় কাম ॥
বৈষ্ণবচরণে মোর নতি অসংখ্যান।
কৃপা করি শুন সবে রামলীলা গান ॥
যদ্যপিহ আমি হই কুমতি কদর্য্য।
তবু শুনিবারে যোগ্য রামলীলাশ্চর্য্য ॥
নীচ জনে যদি জল জাহ্নবীর আনে।
সাদর অন্তরে কেবা না দেয় বয়ানে ॥
রামলীলা অসংখ্য অপার সীমা নাই।
আমি তাহে মহামূর্খ যথাশক্তি গাই ॥ '
আদ্যকাণ্ড—১ম অধ্যায়।

রঘুনন্দনের শিক্ষাগুরুর নাম গণেশ বিদ্যালঙ্কার। তিনি তাঁহার নিকট সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন তদীয় রামরসায়নের সপ্তকাণ্ডের প্র-

ত্যেক কাণ্ডের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে রামগুণ এবং রামায়ণ সংক্রান্ত অপরাপর বিষয় লইয়া এক একটি সংস্কৃতভাষার শ্লোক রচনা করিয়া বসাইয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ শ্লোকই সুমিষ্ট ও ভাবপূর্ণ। রঘুনন্দন যাঁহার নিকট সংশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এরূপ শ্লোক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে তাঁহাকেও প্রণাম করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ভুলেন নাই।—

'বন্দিয়ে গণেশ বিদ্যালঙ্কার চরণে।
জ্ঞান যোগ হয় যাঁর কৃপাবলোকনে॥'

আদ্যকাণ্ড—১ম অধ্যায়।

সকল সভ্যদেশেই দেখা যায় যে, অনেকে গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের পাত্রকে উপহার দিয়া থাকেন। এক্ষণে বঙ্গদেশেও এ প্রথার বহুল শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বেও যে ছিল না এমন নহে। তাহার অন্যতর সাক্ষী কবিবর রঘুনন্দন। তিনি তাঁহার রামরসায়ন অন্য কাহাকে অর্পণ না করিয়া, তাঁহার গৃহদেবতা ৺রাধামাধব জীউকে ভক্তিভাবে অর্পণ করিয়াছেন।

'এই ত হইল পূর্ণ রামরসায়ন।
বল সবে হরি হরি মঙ্গল বচন॥
করিলাম যেই রামবিলাস বর্ণন।
শ্রীরাধামাধবে ইহা করিনু অর্পণ॥
যেহেতুক শ্রীচরণ যুগল তাঁহার।
জীবনে মরণে গতি হয় ত আমার॥
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

উত্তরকাণ্ড—১৮শ অধ্যায়।

তবে এখানে একটি কথা উত্থিত হইতে পারে। কথাটি এই,—আজ কাল বঙ্গদেশে পুস্তকের প্রথমে উপহারপত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উহা রামরসায়নের শেষে কেন? এ কথার উত্তর এই,—রঘুনন্দনের সময় ইংরাজির দৌড়দার ঘটা ছিল না। কাজেই দেশীয় ধরণে রামরসায়ন ৺রাধামাধবের চরণে অর্পিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা রঘুনন্দনের শ্রীমদ্রামরসায়ন সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ মহাকাব্যের কথা সকলেই অবগত আছেন। সেই রামায়ণ অবলম্বন করিয়া অনেকে অনেক কাব্য, নাটক লিখিয়াছেন এবং কেহ কেহ উহার মর্ম্ম লইয়া, কেহ কেহ অনুকরণ করিয়া এবং কেহ কেহ বা অনুবাদ করিয়া রামায়ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা বজায় রাখিয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশের মধ্যে পূর্ব্বকালের দুইজন প্রসিদ্ধ বঙ্গকবিকে দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের মধ্যে একজন বাঙ্গালা ছন্দে বাল্মীকীয় রামায়ণের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এবং অপর জন বেশীর ভাগ অনুবাদ এবং কমের ভাগ স্বীয় কল্পনা ও কবিত্ব মিশ্রিত করিয়া এক একখানি রামায়ন রচনা করিয়াছেন। উপরিউক্ত দুই জনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কৃত্তিবাস এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি রঘুনন্দন।

কৃত্তিবাস নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি কথকদিগের মুখে রামায়ণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তদীয় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কথকেরা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনার্থ মূল ছাড়া অনেক উপকথা সংযোগ করিয়া কথকতা করেন, এবং এক গ্রন্থের এ-

কটি বিষয় অন্যান্য পুরাণাদি হইতেও গ্রহণ করিয়া মূলাতিরিক্ত করিয়া ফেলেন। সুতরাং কৃত্তিবাসকেও অধিকাংশস্থলে মূলছাড়া বিষয় লইয়া তদীয় রামায়ণের মধ্যে সন্নিবেশ করিতে হইয়াছে। তাহাতে আবার তিনি সংস্কৃত ভাষায়, বোধ হয়, অনভিজ্ঞ থাকায় মূলাংশ বজায় রাখিবার পক্ষে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া গিয়াছে। নিজে যদি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া বাল্মীকীয় রামায়ণের অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে, তাহার রামায়ণ মূল হইতে ব্রাহ্মণ শূদ্র তফাৎ হইত না। যাই হউক, তিনি মূলরক্ষার পক্ষে যেমন অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, কবিত্ব বিষয়ে তাহা হন নাই। তাহা হইলে বিভ্রাটের উপর বিভ্রাট ঘটিত। তাঁহার ভাষা গ্রাম্যদোষে দূষিত, এবং ছন্দোগতি অনেক স্থানে স্খলিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার সুকবিত্ব বজায় রহিয়াছে। আমরা তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িবার সময় আমরা মহর্ষি বাল্মীকিকে অনেক স্থানে ভুলিয়া যাই, কিন্তু সেই ভুলিয়া যাইবার দুঃখ টুকু কৃত্তিবাসের কবিত্বের গুণে কতকটা উপশমিত হইয়া যায়। কৃত্তিবাসের পসারের পক্ষে একাদশ বৃহস্পতির আশাতীত শুভদৃষ্টি পড়িয়াই আছে—নড়েও না—নড়িবেও না। ঈশ্বর করুন, নড়িয়াও কাজ নাই। কিন্তু বড় দুঃখ রহিয়া গেল যে, বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতাগণের মধ্যে প্রায় বার আনা লোক কৃত্তিবাস পড়িয়া পড়িয়া তাঁহাকেই একপ্রকার বাল্মীকি জানিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আসল মহাজনের খোঁজ খবর নাই, কেবল ফোড়ের মুখের জোরে তাঁহাকেই মহাজন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। এই বার আনা লোক কিরূপে প্রকৃত মহাজনকে একবার ভাল করিয়া চিনিতে পারে, সে বিষয়ে কি কেহ একবার যত্ন করিবেন না? বলা যায় না, সময়ে ইহারা তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারে। কিন্তু তবু কএক জন ভাল ভাল সেথোর বড় দরকার হইয়া উঠিয়াছে, নহিলে মহাজন কি কথা বলিয়াছেন, ফোড়ে তাহা ঠিক করিয়া না বলিয়া আপনার কথায় বুঝাইয়া দিলে মহাজন এবং এই বার আনা খরিদ্দারের প্রায় ষোল আনা ক্ষতি।

রঘুনন্দন গোস্বামী সংস্কৃত ভাষা জানিতেন, সুতরাং তিনি কথকদিগের নকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া, নিজের হস্তে বৃদ্ধ বাল্মীকির সংস্কৃত পুথি ঘাঁটিয়া বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ ছন্দোনিবদ্ধ পদ্যে শ্রীমদ্রামরসায়ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এইজন্য রামরসায়ন পাঠ করিতে বসিলে প্রাচীন আচার্য্য বাল্মীকি মুনিকে মহুর্মুহু দেখিতে পাই। কিন্তু তা বলিয়া যে ইনিও দুই এক আনা অংশে কৃত্তিবাস নহেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কৃত্তিবাস যেস্থলে আট আনা হিসাবে আসল মাটী করিয়াছেন, রঘুনন্দন সেস্থলে বড় জোর আট পাই। কৃত্তিবাস যেখানে আট পাই, হয় ত রঘুনন্দন সেখানে দুই পাই বা শূন্য ছাড়িয়াছেন। রঘুনন্দনের এরূপ করিবার তিনটি কারণ লক্ষিত হয়।—

প্রথম কারণ—এক ভাষার জিনিষ অপর ভাষার ছন্দে লিখিতে গেলে কিছু না কিছু ন্যূ-

নাতিরিক্ত হইবেই হইবে। যখন গদ্যেই এ-প্রকার হইয়া থাকে, তখন পদ্যের ত কথাই নাই। এবিষয়ে কৃত্তিবাসের আসল মূলের স্থলে যে সকল ন্যূনাতিরিক্ত সংযোজন ও বিয়োজন ঘটিয়াছে, তাহাতে আমরা দোষ দিতে পারিনা—দোষ দিতে গেলে আমা-দিগকেই দুষিত হইতে হইবে।

দ্বিতীয় কারণ—কল্পনা ও কবিত্ব। গদ্যে অনুবাদ করিতে গেলে, এই দুই পদার্থের প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু পদ্য লিখিতে গেলে প্রায়ই কবির মনে কেমন একটা ইচ্ছা আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। কিন্তু তা বলিয়া খোদার খোদ-গিরির বাড়া বাড়ি বড় ভাল নয়। আমরা রঘুনন্দনকে এরূপ খোদগিরি সম্বন্ধে কতকটা বাড়া বাড়ির টানের মুখে ভাসিয়া যাইতে দেখিতে পাই। তা যাই হউক তিনি স্বীয় কল্পনা ও কবিত্বের এবং তৎ-সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া একেবারে মূলে হাবাৎ করেন নাই। উর্দ্ধাধঃ চাহিয়া দেখিলে মূল স্থান বেশ লক্ষিত হয়।

তৃতীয় কারণ—পরকীয় বস্তু ও ভাব-সংকলন। আমরা রামরসায়ন পড়িতে প-ড়িতে দেখিতে পাই যে, রঘুনন্দন স্থানে স্থানে মহর্ষি বাল্মীকির বাম পার্শ্বে ভক্ত-কবি তুলসীদাসকে বসাইয়া, যেন বাল্মী-কির অভিমতি-অনুসারে, তুলসীদাসের নি-কট হইতে কোন কোন সামগ্রী, পসন্দ করিয়া, চাহিয়া লইয়াছেন। তিনি তাহা কোন কোন স্থানে স্বীকার করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থানে করেন নাই। আ-মরা স্বীকৃত স্থলের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

'এই স্থানে এক কথা করিব বর্ণন।
অনুগ্রহ করি শুন সব ভক্তগণ॥
শ্রীমান তুলসীদাস নিজ রামায়ণ।
উত্তর কাণ্ডেতে ইহা করেন বর্ণন॥
ভুষণ্ডী নামেতে কাক অজর অমর।
বহুকল্পজীবী রামচন্দ্র ভক্তবর॥
সুমেরু পর্ব্বতে নীল পর্ব্বত উপরি।
দিবা সরোবরে সেহ থাকে বাস করি॥
রাম অবতার কথা করিয়া শ্রবণ।
দেখিতে আইলা তিঁহ অযোধ্যা ভুবন॥
প্রভুর সুন্দর রূপ করি নিরীক্ষণ।
হইলা অত্যন্ত সুখ সমুদ্রে মগন॥
নানা খেলা দরশন করি সুখ পাই।
কিছুকাল বাস করি রহিলা তথাই॥
সর্ব্বদা থাকেন তিঁহ প্রভু সন্নিধান।
প্রভু তার সঙ্গে খেলা করেন বিধান॥

* * *

এক দিন প্রভু নিজ ছায়া নিরখিয়া।
ক্রন্দন করিলা বহু সাধ্বস পাইয়া॥
তাহা দেখি ভুষণ্ডী সংশয়যুক্ত মন।

* * *

তাহা দেখি ঐশ্বর্য্য দেখাব মনে করি।
তাহাকে ধরিতে প্রভু চলে ঢরি ঢরি॥
ধরিবার উদ্যম দেখিয়া কাকবর।
ভীত হৈয়া পলায়ন কৈলা স্থানান্তর॥

* * *

কিন্তু যেই স্থানে কাক করয়ে গমন।
পশ্চাতে রামের কর করেন দর্শন॥

* * *

এইরূপে বহুকাল করিয়া ভ্রমণ।

আপন আশ্রমে কাক করিলা গমন ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি
আদ্যকাণ্ড—৩য় অধ্যায়।

রঘুনন্দন তুলসীদাসের রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের যে স্থান হইতে ইহা প্রকৃতানুবাদ ও ভাবানুবাদের মিশ্রণে গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা সে স্থান দেখিয়া জানিতে পারিলাম বৃদ্ধবায়সবর ভূষণ্ডী গরুড়ের নিকট রামের বাল্যলীলা বর্ণনচ্ছলে ঐশ্বরিকী শক্তি সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছেন। নিম্নে তাহারও কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম।

'তৈসহিঁ বিনু হরিভজন খগেশা।
মিটে ন জীবনকের কলেশা ॥
হরিসেবকহিন ব্যাপ অবিদ্যা।
প্রভু প্রেরিত তেহি ব্যাপৈ বিদ্যা ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি
উত্তরকাণ্ড, ৩৫—৩৫ পৃষ্ঠা।

পাঠকবর্গ রামরসায়ন ও তুলসীদাস কৃত গ্রন্থে উদ্ধৃতাংশের অবশিষ্ট ভাগ পাঠ করিয়া মিলাইয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে ঘটনা ও ভাবগত সাদৃশ্য অনেক বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু বলিতে কি, অদ্ভুত রস বর্ণনায়, তুলসীদাস বেশী পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাই হউক, আমরা এই স্থল দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, রঘুনন্দন হিন্দী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তবে এখন দেখা যাইতেছে যে, তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী এই তিনটি ভাষা জানিতেন। এতদ্ব্যতীত পারসী বা উর্দ্দু জানিতেন কিনা তাহা বলিতে পারিনা। তাঁহার সময়ে নবাবী আমল ছিল। ইহাতে বোধ হয়, হয় ত ঐ দুইটি ভাষায় কিছু না কিছু জানিতেন।

এস্থলে আর একটি কথা বলিব। রঘুনন্দন বাল্মীকিকে বজায় রাখিয়া তুলসীদাসের নিকট হইতে যেমন মনোমত কতকগুলি সামগ্রী চাহিয়া লইয়াছেন, সেইরূপ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতেও কতক কতক গ্রহণ করিয়াছেন। রামরসায়নের আদ্যকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডেই উহার অধিকাংশ দৃষ্ট হয়। বাল্মীকি রামলক্ষ্মণাদির বাল্যলীলা প্রায় বর্ণনা করেন নাই বলিলেই হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার অধ্যাত্মরামায়ণের বালকাণ্ডে তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তুলসীদাস ও রঘুনন্দন উভয়েই সেই অংশ গ্রহণ করিয়া এবং তাহার সহিত আপনাপন কল্পনাপ্রসূতা বর্ণনা মিশাইয়া দিয়া রামের বাল্যলীলা লিখিয়াছেন। এই জন্য উভয়েরই রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে ঐ অংশ কতকটা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কৃত্তিবাসও রামচন্দ্রের বাল্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ইঁহাদিগের ন্যায় তত সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় নাই। তাহাতে গ্রাম্যবালকদিগের ক্রীড়ার ছায়া অনেকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। রাজকুমারের খেলা অবশ্য সাধারণ বালকদিগের অপেক্ষা দামী গোছের।

তুলসীদাস ও রঘুনন্দন অধ্যাত্মরামায়ণের যে অংশ লইয়া রামের বাল্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠক মহাশয় মিলাইয়া দেখিবেন। আমাদের উপর সমস্ত ভার দিলে চলে কই?

মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ সচরাচর তিন চারি প্রকার দেখা যায়। কাশী, বোম্বে

বঙ্গ এবং দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত বাল্মীকীয় রামায়ণ। তন্মধ্যে বোধ হয়, বোম্বে বা পাশ্চাত্য বাল্মীকীয় রামায়ণই অপর গুলির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমাদের বিবেচনায় ঐ রামায়ণে অপর গুলির ন্যায় ভেল প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমরা পাশ্চাত্য রামায়ণের সহিত বঙ্গীয় রামায়ণ মিলাইয়া দেখিয়াছি যে, উভয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক মতভেদ ও ঘটনাবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাশ্চাত্য রামায়ণ গদ্যে অনুবাদ করিতেছেন। আমিও সেই পাশ্চাত্য রামায়ণ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিতেছি। বালকাণ্ড হইতে সুন্দরাকাণ্ড পর্য্যন্ত পদ্যানুবাদ করিয়া আসিলাম, কিন্তু এই পাঁচ কাণ্ডের মধ্যে, বঙ্গীয় রামায়ণের সহিত অনেক স্থানে অনেক প্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হইল। মদনুবাদিত পদ্য রামায়ণের মধ্যে টীকায় এই সকল মতভেদ যথাসাধ্য প্রদর্শন করিয়াছি।

রঘুনন্দন গোস্বামীর শ্রীমদ্রামরসায়ন পড়িয়া দেখিলাম, উহা বঙ্গীয় বাল্মীকীয় রামায়ণ হইতে পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য বাল্মীকীয় রামায়ণের সহিত ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তা যাই হউক, উহা ত মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ বটে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রঘুনন্দন স্থানে স্থানে বিশেষতঃ আদ্যকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডে অধ্যাত্মরামায়ণ ও তুলসীদাসী রামায়ণের নির্ব্বাচিত স্থলগুলি হইতে কতকগুলি সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন। যদি তিনি ইহা না করিয়া, কেবল মহর্ষি বাল্মীকিরই শরণাগত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীমদ্রামরসায়ন নিখুঁত হইত। যদিও খুঁতগুলি বাছিয়া লওয়াতে দামী জিনিষ বই ফেল্‌নার হয় নাই, তবু উহা বাল্মীকির নয় বলিয়া রামরসায়নের পাঠকগণকে মধ্যে মধ্যে গোলোক ধাঁধায় পড়িতে হইবে। কিন্তু তাও আবার বলি, রামরসায়নে বাল্মীকির মূল বজায় আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় ইহাতে বেজায় কাণ্ড ঘটে নাই।

মহর্ষি বাল্মীকির অলৌকিক রামায়ণ (১) বাল বা আদি, (২) অযোধ্যা, (৩) অরণ্য বা আরণ্য, (৪) কিষ্কিন্ধা বা কিষ্কিন্ধ্যা, (৫) সুন্দর বা সুন্দরা, (৬) লঙ্কা বা যুদ্ধ এবং (৭) উত্তর বা উত্তরাকাণ্ড, এই সাত কাণ্ডে বিভক্ত। তুলসীদাস, কৃত্তিবাস এবং রঘুনন্দন তিন জনেই এই সাতটি কাণ্ড বজায় রাখিয়াছেন। তবে কি না নামকরণের একটু আধটু প্রভেদমাত্র লক্ষিত হয়। যথা—তুলসীদাসের বালকাণ্ড, কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ড এবং রঘুনন্দনের আদ্যকাণ্ড। পদ্মপুরাণে যে রামচরিত বর্ণিত আছে, তাহাতে অযোধ্যাকাণ্ড বাদ দিয়া ছয় কাণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। উহাতে বাল ও অযোধ্যাকাণ্ড একত্র করিয়া বালকাণ্ড বলিয়া লিখিত আছে। *

বাল্মীকীয় সংস্কৃত রামায়ণের এক এক কাণ্ডে ৭০, ৮০, ১১৯ এবং তদধিক সর্গ আছে। কিন্তু রঘুনন্দন তাঁহার রামরসায়নে ঠিক তেমন করিয়া সর্গবিভাগ করেন নাই। তিনি প্রত্যেক কাণ্ডের আকারের

---

* মদনুবাদিত পদ্যরামায়ণের বালকাণ্ডের চতুর্থ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ন্যূনাতিরেক বিশেষে সাত আটটি সর্গকে এক একটি অধ্যায় করিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তুলসীদাস এবং কৃত্তিবাস সংস্কৃত ধরণে সর্গ বা অধ্যায়ানুসারে গ্রন্থ রচনা করেন নাই, কিন্তু রঘুনন্দন গোস্বামী তাহা করিয়াছেন। তাঁহার রামরসায়নের প্রত্যেক কাণ্ডে যত-গুলি করিয়া অধ্যায় আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

আদ্যকাণ্ড ১২ ; অযোধ্যাকাণ্ড ১০ ; অরণ্যকাণ্ড ৮ ; কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১০ ; সুন্দরা-কাণ্ড ১২ ; যুদ্ধ বা লঙ্কাকাণ্ড ৩৬ এবং উত্তরা কাণ্ড ১৮ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন বালকাণ্ডের প্রথম চারি সর্গ এবং উত্তরাকাণ্ড বাল্মীকি প্রণীত নহে। এ প্রস্তাবে আমরা তাহার কিছুই বলিব না। এক্ষণে তাঁহারই কৃত বলিয়া স্বীকার করি, নহিলে বর্ত্তমান প্রবন্ধ ঠিক রাখিতে পারিব না।

মহির্ষি বাল্মীকি তদীয় উত্তরকাণ্ডের শেষ ভাগে সীতার বনবাস ও পাতালপ্রবেশ, লক্ষ্মণবর্জ্জন প্রভৃতি বর্ণন করিয়াছেন। উহা যে কিরূপ করুণরসোদ্দীপক তাহা আমা-দের সামান্য লেখনী বর্ণন করিতে সক্ষমা নহে। ঐ অংশকে বিয়োগান্ত ঘটনা এবং ইংরাজিতে ট্রেজেডি (Tragedy) বলে। রঘুনন্দন গোস্বামী তাঁহার রামরসায়নের উত্তরকাণ্ডে রামের রাজ্যপালন, ঐশ্বর্য্যসুখ-সম্ভোগ এবং প্রিয়তমা পত্নী সীতার সহিত দাম্পত্য প্রণয়ের আনন্দানুভব পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। কবি, বোধহয়, বিয়োগান্ত ব্যাপার ভাল বাসিতেন না; তাই আর অগ্রসর হন নাই। তাঁহার এক স্থানের লিখন ভঙ্গীতেও তাহাই প্রকাশ হই তেছে। নিম্নে সেই অংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

‘ এইরূপে প্রতিদিন শ্রীরঘুনন্দন।
করেন সর্ব্বদা নানা লীলা আচরণ॥
যদি বিধি দিত আয়ু কল্প পরিমাণ।
করিতাম তবে সে সকল লীলা গান॥
করিছিনু যেই কিছু মনোরথ আমি।
কৃপা করি পূর্ণ কৈলা তাহা সীতাস্বামী॥
এইত বর্ণিনু রাম বিলাস কিঞ্চিৎ।
আর লীলা প্রতি নাহি যায় মোর চিত॥’
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি
উত্তরকাণ্ড—১৮শ অধ্যায়।

রঘুনন্দন বাল্মীকীয় রামায়ণের উত্তরকা-ণ্ডের শেষের প্রয়োজনীয় অংশ দায়ে পড়িয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন—গোলেমালে হরি বোল দেন নাই। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে অপরাধী কি নিরপরাধী, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না।

কৃত্তিবাস এই অংশ তদীয় উত্তরকাণ্ডে রা-খিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ স্থল বাল্মীকির মতের বিপরীত। বাল্মীকীয় রা-মায়ণে রামলক্ষ্মণ প্রভৃতির অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া লড়াই ঝগড়া নাই—পুত্রের হস্তে পিতার পরাজয় নাই—মোহ নাই। কৃত্তিবাস তাহা পদ্মপুরাণ হইতে কথকগণের কথক-তানুসারে লিখিয়াছেন। আমরা পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের ১১২ (শেষ) অধ্যায় হইতে রা-মায়ণের উপক্রমণিকার মধ্য হইতে ঐ অংশ তুলিয়া দিলাম। উহাতে রামলক্ষ্মণ প্রভৃতির সহিত লবকুশের যুদ্ধ ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত সার লিখিত আছে।

'সীতায়া বনবাসোঽথ শোচতা লক্ষ্মণেনহি।
প্রাচেতসাশ্রমপ্রাপ্তিঃ সীতায়াঃ পরিপালনম্॥
তাপসীভিস্ততো জন্ম কুশস্য চ লবস্য চ।
লবেন সহ যুদ্ধে তু কালজিন্মস্তকচ্ছিদা।
শত্রুঘ্নস্য সসৈন্যস্য যুদ্ধায়োদ্যম উত্তমঃ।
পুষ্কলস্য ততো মূর্চ্ছা মারুতেঃ পতনংছলাৎ।
শত্রুঘ্নস্যাদি মূর্চ্ছাথ পুনর্মূর্চ্ছা লবস্য চ॥
লবং বদ্ধা রথে স্থাপ্য শত্রুঘ্নগমনং ততঃ।
জানক্যাঃ শোচনং তত্র কুশস্যাগমনং ততঃ॥
সৈন্যানাং পতনঞ্চৈব জয়ঃশ্রীরামপুত্রয়োঃ।
মারুতেঃ কপিরাজ্ঞোঽপি বদ্ধানয়নমাশ্রমে॥
সীতায়া বরদানাচ্চ সৈন্যানাং জীবনং পুনঃ।
কুশয়োর্বন্ধনামুক্তির্হয়স্য চ বিমোক্ষণম্॥'
ইত্যাদি।

এই অংশের সঙ্গেও কৃত্তিবাসের স্থানে স্থানে মতবৈপরীত্য লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস লঙ্কাকাণ্ডে রাবণপুত্র মহীরাবণবধ বলিয়া একটি আখ্যান লিখিয়াছেন। ঐ আখ্যানটি কৌশলময় হইলেও বাল্মীকির নহে। বাল্মীকির রামায়ণে উহা একেবারেই নাই। ইহা ছাড়াও, কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ডে বিভীষণপুত্র তরণীসেনবধ, রামচন্দ্র কর্তৃক অকালে দুর্গোৎসব এবং মন্দোদরীর নিকট হইতে ছদ্মবেশে হনুমৎকর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি কএকটি বিষয় লিখিয়াছেন। উহার সমস্তগুলি বা কতকগুলি কোন কোন পুরাণে বর্ণিত আছে; কিন্তু বাল্মীকিতে নাই। মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন, রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন গোস্বামী বাল্মীকির মতানুসারে রামরসায়নরচনা করিয়া তুলসীদাস বা কৃত্তিবাসের ন্যায় ঐ সকল পরকীয় বিষয় গ্রহণ করেন নাই।

এইবার আমরা রঘুনন্দনগোস্বামিবিরচিত শ্রীমদ্রামরসায়ন মহাগ্রন্থের সংক্ষেপে দোষ গুণ বিচার করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

প্রথমতঃ ভাষা।—কৃত্তিবাসের ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, ইহাঁর ভাষা স্থলে স্থলে ঠিক সেরূপ নহে। বোধ হয়, বেশী পরিমাণে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া রঘুনন্দন সকল স্থলে বাঙ্গালা ভাষার প্রাঞ্জলতা রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার ভাষা কৃত্তিবাসের ন্যায় বহুল পরিমাণে গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে। ব্যাকরণ ও ভাষাজ্ঞান থাকাতে রঘুনন্দন রামরসায়নকে অনেকাংশে বিশুদ্ধ করিয়াছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে রঘুনন্দন কৃত্তিবাসের ন্যায় পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও, একেবারে কঠিনভাষী নহেন। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে নিম্নে কএকটি অপ্রাঞ্জল এবং প্রাঞ্জল লেখা তুলিয়া দিলাম।—

অপ্রাঞ্জল পদ্য।

'আছিলা জটায়ু নিদ্রাসুখে প্রস্রবণে।'
আরণ্য—৫ম অঃ।

'অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকেতে করেন প্রত্যুত্তর॥'
সুন্দর—৮ম অঃ।

'রামদেহ অবেধ্য অচ্ছেদ্য শাস্ত্রে কয়।'
'কাক কঙ্ক গৃধ্র ঊর্দ্ধ কণ্ঠে রক্ত খায়।'
আরণ্য—৩য় অঃ।

'বিদ্যুজ্জিব বজ্রদংষ্ট্র প্রজঙ্ঘ প্রঘস।'
লঙ্কা—১৮শ অঃ।

প্রাঞ্জল পদ্য।

কিবা স্ব মধুর মূরতি,

জগজন অভিরাম।
ইন্দ্রনীলমণি, জলধর যিনি,
অসিত চিকণ ধাম ॥
অতি সুকোমল, চরণ কমল,
তাহাতে নূপুর বাজে।
করিকর জিনি উরুর বলনী,
পীত পটে কটি সাজে ॥' ইত্যাদি।
আদ্য—৭ম অঃ।

'হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব,
তা বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি।'
লঙ্কা—১১শ অঃ।

'তবে অতিপ্রভাতে উঠিয়া রঘুপতি।
বায়ুপুত্রে ডাকিয়া কহেন তাঁর প্রতি ॥
বাপধন শুন তুমি আমার বচন।
যাহ অতি শীঘ্র করি অযোধ্যা ভবন ॥'
ঐ—৩০শ অঃ।

'ইহা দেখি বড় রোখি অতিকায় অরি।
এড়ি বাণ ধনুখান কাটিলেন তারি ॥'
'রঘুবীর তিন তীর পুন ছাড়ি আঁটি।
সে কোদণ্ড চারিখণ্ড করিলেন কাটি ॥
ঐ—৮ম অঃ।

'এথা রঘুবর, করিতে সমর,
সুখেতে মগন হইয়া।
অতি সুকোমল, তরুর বাকল,
পরিলা কটিতে আঁটিয়া ॥
শিরে অবিকল জটার পটল,
বান্ধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া।
পরিলা বিকচ, কঠিন কবচ,
শরীরে সুদৃঢ় করিয়া ॥'
আরণ্য—৩য় অঃ।

এইরূপ আর কত উদ্ধার করিব? আমরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া অপ্রাঞ্জল পদ্যপংক্তি কএকটি উদ্ধার করিয়াছি; তাহার প্রমাণ এক এক পংক্তি ব্যতীত উপর্য্যুপরি দুইটি বা ততোধিক দেখিতে পাই নাই। কিন্তু প্রাঞ্জল পদ্যপংক্তির জন্য তাহা করিতে হয় নাই। ফল কথা, রামরসায়নের মধ্যে প্রাঞ্জলাংশ এত আছে যে, তাহা পাঠ করিয়াই আশা পরিপূর্ণ হইয়া যায়, অপ্রাঞ্জলাংশের দিকে তত লক্ষ্য হয় না।

দ্বিতীয়তঃ ছন্দঃ।—কৃত্তিবাসের রামায়ণে ছন্দঃপ্রণালী অপুষ্টা, অমার্জ্জিতা ও বিকলাঙ্গী, কিন্তু রামরসায়নের তাহা নহে। রামরসায়ন এ ঐশ্বর্য্যে সৌভাগ্যশালী। কৃত্তিবাসের পয়ারে ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯টি পর্য্যন্ত অক্ষর দেখা যায়, কিন্তু রঘুনন্দনের পয়ারে ১৪টির কম বা বেশী নাই। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর লেখনী নানাবিধ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ছন্দোভূষণে রামরসায়নকে বিভূষিত করিয়াছে। কিন্তু কৃত্তিবাসের লেখনী তাহা পারে নাই। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দোষী বলিতে পারি না। কেমনা একেত তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না, তাহাতে আবার রঘুনন্দনের অপেক্ষা অনেক প্রাচীন কবি। শুনিয়াছি, রঘুনন্দন নাকি এই উন বিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কবি।

রামরসায়নে যত প্রকার ছন্দঃ বিন্যস্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদিগের কেবল নামোল্লিখিত হইল, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ তুলিয়া দিতে পারিলাম না। ছন্দঃ যথা—পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, ললিত ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষোড়শাক্ষরী কাঞ্চী যমক,

ষোড়শাক্ষরী মল্লঝাঁপ, আদি যমক, মধ্য যমক, আদিমধ্যান্ত যমক, আদ্যন্তক যমক, আদিমধ্যযমক (আদি মধ্যান্ত যমকের সহিত ইহার পার্থক্য আছে),মধ্যান্ত যমক, ত্র্যর্থ শব্দান্তক যমক, ললিত চতুষ্পদী, তোটক, মল্লঝাঁপ (মালঝাঁপ,) ষোড়শাক্ষরী, নব চতুষ্পদী, জাতি, অন্তাদি যমক, নর্ত্তক-ত্রিপদী, কাঞ্চী যমক, দোধক, মাত্রাবৃত্তি চতুষ্পদী, তোটকে কাঞ্চী যমক, একাদশাক্ষরা উপজাতি, কবিত্বচ্ছন্দঃ, ষোড়শাক্ষরী অন্ত্যাদি যমক, প্রকারান্তর মাত্রাবৃত্তি, পজ্ঝটিকা, চামর, মাত্রাবৃত্তি চতুষ্পদী, সমস্বরার্দ্ধ পয়ার, মাত্রাবৃত্তি গীতচ্ছন্দঃ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, ইত্যাদি। এই সকল ছন্দের মধ্যে পয়ার দশ আনা, ত্রিপদী চারি আনা এবং অন্যান্য ছন্দঃ দুই আনা, এই পূরা ষোল আনা হইবে। এই সমস্ত ছন্দের মধ্যে দুই চারি প্রকার ছন্দঃ সকল স্থানে ঠিক্ থাকিতে পায় নাই। যমক প্রভৃতি কএক প্রকার ছন্দঃ লিখিতে কবিকে অনেক চিন্তা ও শব্দসম্পত্তির দিকে মনোযোগ করিতে হইয়াছে। সময়ান্তরে রামরসায়নের অন্তর্গত ছন্দঃসমূহের উদাহরণ সমেত উহার রীতি-প্রণালী সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিয়া বান্ধবের পাঠকমহাশয়গণকে উপহার দিবার চেষ্টায় রহিলাম।

তৃতীয়তঃ। অলঙ্কার।—(১) রামরসায়নের মধ্যে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার দুইই বিশেষরূপ আছে। কবি নিজের প্রতিভায় এবং প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের সাহায্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট উপমাদি অলঙ্কারে রামরসায়নকে সাজাইয়াছেন। (২) বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত প্রভৃতি রসেও রামরসায়ন বেশ রসাল হইয়াছে। এ বিষয়েও আমাদের একটি প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে।

চতুর্থতঃ ব্যাকরণ। কবিরা ব্যাকরণের ধার ধারেন না বটে, কিন্তু একেবারে না ধারিলে কাব্যের ধার কতকটা ভোঁতা হইয়া যায়। রামরসায়নের কবি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় সর্ব্বনাম ও ক্রিয়ার দিকে বার আনা ঠিক, কি চারি আনা বেঠিক। নিম্নে যদৃচ্ছোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে কবির এই দোষ প্রদর্শিত হইল।—

'পরিবারে কৈলুঁ* চীর বসন অর্পণ।'

অযোধ্যা—৯ম অঃ।

'কিন্তু তোমান্দের† দেখি আকার প্রকার।'

কিষ্কিন্ধ্যা—১ম অঃ।

'শুন শুন প্রধান প্রধান সেনাগণ।
কর তোরা শতবলী সঙ্গেতে গমন॥
যত্ন করি জানকী করিবে অন্বেষণ।
না করিবে কদাচ আলস্য আচরণ॥'

ঐ—৮ম অঃ।

'না পাইলে রামে মুই‡ খাইব গরল।

* কৈলু, করিনু বা করিলাম।

† তোমান্দের। আমরা আজিও বৃদ্ধদের মুখে এইরূপ 'তোমান্দের' 'তাহান্দের' শব্দ শুনিতে পাই, কিন্তু রঘুনন্দন ত এরূপ শব্দও জানিতেন—

'তোমাদের হবে ইথে নানাবিধ দুঃখ।'
'তাহাদের কাছে নাহি করিও পয়ান।'

কিষ্কিন্ধ্যা—৮ম অঃ।

‡ মুই—আমি। ইহা হিন্দী মৈঁ (উচ্চারণ ম্যায়)।

'না কহিতুঁ* তোমারে এ তুচ্ছ কর্ম্ম লাগি।'
আদ্য—১ম অঃ।

'পুত্রবার্ত্তা লাগি রাণী ভাবিতে ভাবিতে।
পুত্রের বিবাহবার্ত্তা পাল্য† আচম্বিতে॥'
ঐ—৯ম অঃ।

সরমা সীতাকে বলিতেছেন ;—

'সেইত রাবণ তোহে‡ দেখাইয়া ভয়।
গিয়াছে সভাতে মন্ত্র করিতে নিশ্চয়॥
যেই মাত্র বিদ্যুজ্জিহ্ব এথা হৈতে গেল।
তেঁই মাত্র¶ সেই সব মায়া নষ্ট ভেল।' **
লঙ্কা—২য় অঃ।

'মিতা দুই জনে কয়্য†† প্রেম আলিঙ্গন।'
লঙ্কা—২২ অঃ।

'কহিলেন তিঁহ‡‡ এথা নিজে আনিবারে।'
ঐ—ঐ।

---

* কহিতাম। হিন্দী কহতেঁ।

† পাইল, প্রাপ্ত হইল। দূর পূর্ব্বাঞ্চলীয় কোন কোন অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি যেরূপ কাব্যকে কাইব্যা, গব্যকে গইব্যা, মাল্যকে মাইল্য বলে, সেইরূপ এই পাল্যকে পাইল্য করিয়া লইয়া আবার লবর্ণের য (্য) ফলাটি ছাড়িয়া না দিলে আশু অর্থবোধ হইয়া উঠে না।

‡ তোহে—তোমারে বা তোমাকে। ইহা গ্রাম্য হিন্দী শব্দ। তুহ—তুমি, তোহার বা তুহার—তোমার, তোহে বা তুহে—তোমাকে। তু—তুই, তেরা বা তোরা—তোর, ইত্যাদি।

¶ তেঁইমাত্র—তৎক্ষণাৎ।

** ভেল—হইল। ইহা গ্রাম্যহিন্দী শব্দ।

†† কহিও।

‡‡ তিনি।

এইরূপ আরও কএক প্রকার সর্ব্বনাম ও ক্রিয়ার গোলযোগ আছে। এ গুলির অধিকাংশই প্রকৃত হিন্দী শব্দ বা উহার অপভ্রংশ। রঘুনন্দন গোস্বামী তুলসীদাসী হিন্দী রামায়ণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সহিত উহা মিশাইয়া দিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় হিন্দী ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গপুষ্টির উপযোগী শব্দ লইলেই ভাল হয়, আবল তাবল করিয়া কত গুলা লইলে ভাষার গায়ে কাঁটা বিধিয়া যায়। রামরসায়নে হিন্দী এবং আর কএক প্রকার শব্দ প্রবিষ্ট হইবার আরও একটি কারণ আছে। রঘুনন্দন গোস্বামী বৈষ্ণব। সুতরাং তিনি বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, এবং বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি পরম বৈষ্ণবদিগের কৃত রাধাকৃষ্ণ এবং চৈতন্যদেব সংক্রান্ত বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী অবশ্যই ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থে হিন্দীভাষার জমা বড়বেশী। কেন না ঐ সকল গ্রন্থ রচনার সময় বাঙ্গালাভাষা শৈশবদোলায় দুলিতেছিল। ইহাও রামরসায়নে হিন্দী ভাষা প্রবিষ্ট হইবার আর একটি কারণ।

এক্ষণে আমরা আর একটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের ডবল সংখ্যক বান্ধবে শ্রীযুক্তবাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'ঘনরাম চক্রবর্ত্তী' নামক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, ঘনরাম, রূপরাম, রঘুনন্দন প্রভৃতি কবিদের গ্রন্থাবলী আজিও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। আমরা বলি, রঘুনন্দনের শ্রীমদ্রামরসায়ন মুদ্রিত হইয়াছে। ২৪ বৎসর

হইল, ১৭৭৮ শকে প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা ৺ বেণামাধব দে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমি সেই মুদ্রিত পুস্তকের একখণ্ড আমার পদ্যরামায়ণের টীকার জন্য রাখিয়াছি। উহা হইতে প্রয়োজনানুসারে টীকাও সংগৃহীত হইতেছে। আমি কৃত্তিবাসী সাতকাণ্ড রামায়ণের সহিত উক্ত মুদ্রিত সপ্তকাণ্ডাত্মক শ্রীমদ্রামরসায়ন মিলাইয়া দেখিয়া জানিয়াছি, শেষোক্ত গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

আর্য্যজাতির কাব্য

'আনন্দেতে মেতে কাব্যরসপানে
যদি কাটাইবে ভেবেছ জীবনে,
কেন যাও তবে ভিন্নজাতি স্থানে
নাহি কি সুকাব্য ভারতভবনে ?
কবি কালিদাস ব্যাস তপোধন
শ্রীহর্ষ বাল্মীকি ভারতভূষণ,
কোথা বল কবি এদের মতন ?'

সমাজের আদিম সংস্থান হইতেই কাব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অধিক কি মনুষ্যের উৎপত্তি হইতেই কাব্যের উৎপত্তি হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতির সুচারু শোভা সন্দর্শন করিয়া উল্লাসিত আদিম মনুষ্য যে মানসিক ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাই কাব্য। তৎকালে সুরীতি এবং সুপ্রণালী অনুসারে রচনা অসম্ভব। আদিমকবির প্রকৃতিই অবলম্বন। আকাশস্থ উজ্জ্বল পদার্থসমূহ এবং পৃথিবীস্থ অদ্ভুত ভূতসকল তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করে। এই সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থকেই তিনি এক অসীম ও অদৃশ্য জগৎকর্ত্তার প্রতিরূপ বলিয়া মনে করেন। এই প্রকারে যেরূপ কাব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে কেবল মাত্র দেবতারূপে প্রতীয়মান জাগতিক পদার্থ সমূহের গুণকীর্ত্তন এবং তাহাদিগের প্রতি স্তব নিবেশিত হয়। অধিকাংশ ঋগ্বেদের মন্ত্র এই প্রকার কাব্যের আদর্শ। ক্রমশঃ যেমন সমাজের উন্নতি হইতে থাকে আর একবিধ কাব্য আবির্ভূত হয়। স্বদেশীয় খ্যাতবীরগণ ও মহাপুরুষদিগের উপর কবির দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি তাহাদিগের ইতিবৃত্ত এবং চরিত্র প্রকটিত করিতে উদ্যত হয়েন এবং কোন বিখ্যাত যুদ্ধ অথবা কোন বিখ্যাত মহাপুরুষ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন। বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারত দ্বিতীয় প্রকার কাব্যের উত্তম উদাহরণ। আর্য্যসমাজে উক্ত দ্বিবিধ কাব্যেরই প্রভূত সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যসমাজের কাব্যকৃতি অতিপ্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অন্য কোন জাতির অনুকৃতি নহে। প্রকৃত ইতিহাসের অসদ্ভাববশতঃ তাহার সময় নিরূপণ করা দুরূহ। সুতরাং কোন্ সময়ে যে আর্য্য

সমাজোদ্যানে কাব্য-কুসুম বিকসিত হইয়া ভারত আমোদিত করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিতে আমরা প্রয়াস পাইব না।

কাব্য কাহাকে বলে? কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করা অতি বিষম ব্যাপার। কবিই স্বয়ং বলিতে পারেন,—

'কবিত্ব যে কি বিত্ত জানি তা আমি।'

কবিত্বশক্তি নৈসর্গিক শক্তি কৃত্রিম হইতে পারেনা। আগ্নেয়পুরাণে লিখিত আছে,—

'নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং লোকে শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥'

অর্থাৎ জগতে মনুষ্যজন্মই দুর্লভ কিন্তু বিদ্যা আর দুর্লভ কবিত্ব দুর্লভ। কিন্তু কবিত্বশক্তি সমধিক সুদুর্লভ।

কাব্য-প্রকাশ নামক সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থকার পূজ্যপাদ মম্মটভট্ট বলিয়াছেন,—

'তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণৌ
অনলঙ্কৃতী পুনঃ কাপি।'

অস্যার্থঃ। অলঙ্কারোক্ত দোষরহিত প্রসাদমাধুর্য্যাদিগুণবিশিষ্ট স্বভাবোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত শব্দ এবং অর্থের নাম কাব্য। কোন স্থলে অলঙ্কার অস্ফুট হইলেও তদ্দ্বারা কাব্যত্ব হানি হইবে না। এ লক্ষণের অনুসারী হইলে বহুবিধ ঈষদ্দোষদুষ্ট উত্তম কাব্যকে কাব্য বলিতে পারা যায় না। এবং যদ্রূপ শৌর্য্য প্রভৃতি গুণ আত্মার ধর্ম্ম, তদ্রূপ প্রসাদাদি গুণ কাব্য রসের ধর্ম্ম, রস অঙ্গিস্বরূপ, কিন্তু প্রসাদাদিগুণ অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং অঙ্গী যে রস তাহার উল্লেখ না করিয়া অঙ্গস্বরূপ প্রসাদাদি গুণের উল্লেখ করিলে, প্রাণিযুক্ত দেশ না বলিয়া শৌর্য্যাদিযুক্ত দেশ বলিলে যেরূপ অসঙ্গতদোষ ঘটে, সেইরূপ দোষ হয়। অতএব উপরি উক্ত স্বরূপনির্ণয় সম্যক্ নহে। পুনর্ব্বার যাঁহারা বলেন,—

'অদোষং গুণবৎ কাব্যং অলঙ্কারৈরলঙ্কৃতং।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্ব্বন্ কীর্ত্তিঞ্চ প্রীতিঞ্চ বিন্দতি।'

তাঁহারাও সমীচিনবক্তা নহেন। তবে কাব্যের স্বরূপ কিরূপে নির্ণীত হইবেক জিজ্ঞাসা করিলে সাহিত্যদর্পণকার কবিরাজ বিশ্বনাথ আচার্য্য উত্তর দিতেছেন,

'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।'
'স্যাৎ চমৎকৃতিমৎ কাব্যং।'

রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। যে বাক্য পাঠ অথবা শ্রবণ করিবামাত্র পাঠক কিংবা শ্রোতার চিত্তে ব্রহ্মানন্দ সহোদর (ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে যে অনুপম আনন্দ অনুভব হয় তৎসদৃশ) অলৌকিক চমৎকারকারা আনন্দ সমুদ্ভব হয়, তাহাই কাব্যনামে অভিধেয়। উক্ত অলৌকিক সহৃদয়মাত্রবেদ্য আনন্দ চর্ব্বণা অর্থাৎ আস্বাদের নাম রস।

এক্ষণে কাব্যকে 'কল্পনাসম্ভূত প্রকৃতির এবং মনোবৃত্তির চমৎকাররসাত্মক বাক্যচিত্র' বলিলে বোধ হয় এক প্রকার লক্ষণ হইতে পারে। অলৌকিক চমৎকার ভাবোদ্বোধিনী মানসিক শক্তি বিশেষের নাম কল্পনা। লক্ষণ দ্বারা কাব্যের স্বরূপ সরল ভাষায় সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব।

ইউরোপীয় সুধীরবুদ্ধি পণ্ডিতেরা কবিত্ব এবং কাব্যের কিরূপে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন তাহা একবার আলোচনা করা যাই-

তেছে। ইতালী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি হ-রেশ (Horace of Italy) বলিয়াছেন, 'কবি স্বাভাবিক পদার্থ, কৃত্রিম নহে। কবিত্বশক্তি প্রকৃতিসিদ্ধ, প্রযত্নসিদ্ধ নহে।' 'Poeta nascitur non fit' &c 'A poet is born and not made' ভুবনবিখ্যাত সেক্ষপিয়ার (Shakespeare) লিখিয়াছেন;—

'As imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.'
M. N. D. Act. V.

'অজ্ঞাত পদার্থরূপ যেমন কল্পনা
করেন সংগ্রহ যত্নে একত্রিয়া নানা।
প্রতিভা প্রভাবে তাহা কবির লেখনী
আকারেতে পরিণত করেন অমনি।
বস্তুতঃ পদার্থ যাহা নহে কোন কালে
নাম ধাম দেন তারে কবিত্বের বলে।'

প্রসিদ্ধ রচনাকার হ্যাজলিট্ (Hazlitt) বলিয়াছেন 'Poetry is the language of the imagination and the passions. It relates to whatever gives immediate pleasure or pain to the human mind.' কল্পনা এবং মনোবৃত্তির ভাষার নাম কাব্য। কাব্যের এতাদৃশ চমৎকারিত্ব যে, শ্রবণ অথবা পাঠমাত্র মানবহৃদয়ে সুখ বা দুঃখের তৎক্ষণাৎ উদ্রেক হইয়া থাকে। বিখ্যাত সুলেখক মেকলে (Macaulay) বলেন 'By poetry we mean the art of employing words in such a manner as to produce an illusion on the imagination, the art of doing by means of words what the painter does by means of colours.' মনোমধ্যে আনন্দসম্মোহকর অলৌকিক চমৎকার ভাব উদ্বোধনে সমর্থ বাক্যবিন্যাসের নাম কাব্য। চিত্রকর বর্ণ রচনা দ্বারা যেরূপ কার্য্য করেন, কবি বাক্যবিন্যাস দ্বারা অবিকল তদ্রূপ কার্য্য করেন। মেকলে অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন, 'মানবহৃদয় ব্যক্তকরণে একমাত্র কাব্যই সমর্থ। মুখমণ্ডলে এবং বহিরাকারে লক্ষ্যমাণ স্বভাব ও মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিতেই চিত্রকর, ভাস্কর এবং অভিনেতা সমর্থ। কিন্তু আকৃতি প্রভৃতি মানসিক ভাবসমূহের অস্পষ্ট এবং অনেক স্থলে ভ্রমজনক লিঙ্গমাত্র। কেবল বাক্য দ্বারাই মানবহৃদয়ের আন্তরিক ভাব বর্ণনা করা যাইতে পারে। বাহ্যজগৎ, সুখদুঃখের চক্রবৎ পরিবর্ত্তন, প্রকৃত মানবচরিত্র, সামাজিক মানবচরিত্র, বাস্তবিক পদার্থনিচয় এবং নানাবিধ কল্পনাসম্ভূত অলৌকিক অথচ ভাবনার যোগ্য (মনোমধ্যে যাহার চিত্র নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে) পদার্থসমূহ ইত্যাদি সমস্ত বাহ্য এবং অন্তরজগতই কাব্যের আলম্বনস্থল।'

কিরূপে কবিতার উৎপত্তি হয়? ইহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বোধ হয় প্রথমে কতকগুলি নিরর্থক শব্দমাত্র লইয়া গান হইত। ক্রমে দেবতাদিগের স্তুতি বিষয়ক বাক্যসমূহ লইয়া গান হইতে লাগিল। তৎপরে স্বদেশপ্রসিদ্ধ মহাবীরগণের কীর্ত্তিসূচক

কথা সকল গানের বিষয় হইল। এইরূপে ক্রমশঃ চলিতে চলিতে হয় ত শ্লোকাকারে দৈবাৎ বাক্য উচ্চারিত হইল এবং ঐ বাক্য সুশ্রাব্য অনুভব হওয়াতে উহার অনুকরণে ছন্দের সৃষ্টি হইল। এই প্রকারে চরণবদ্ধ কবিতার উৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রকৃত উৎপত্তিক্রম কি না তাহা কেহই বলিতে পারেন না, যেহেতু সে বিষয় অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন প্রাচীনকালরূপ গুহার অভ্যন্তরে নিহিত। লিখিত আছে যে বাল্মীকির মুখ হইতে অকস্মাৎ চরণবদ্ধ অনুষ্টুপ শ্লোক নির্গত হইয়াছিল, এবং সেই চরণবদ্ধ কবিতার প্রথম আবিষ্কার। সে যাহাই হউক কবিতার সহিত যে সঙ্গীতের নিকট-সম্বন্ধ তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কারণ হর্ষে এবং বিষাদে মনের ভাব বিবিধস্বরে স্বতঃই মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দেবস্তুতিগানেই কবিতার উন্নতি।

ভারতে এত অধিক কাব্যের প্রাচুর্য্য হইয়াছিল কেন, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে এপর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভারতবাসী আর্য্যেরা কাব্যপ্রিয় ছিলেন। তাহা স্বভাবতঃই সম্ভবে। ভারতের ভূমি উর্ব্বরা, অল্প পরিশ্রমেই জীবনযাত্রার উপযোগী সামগ্রীনিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবসর যথেষ্ট থাকে। শারীরিক পরিশ্রম হইতে অতিরিক্ত অবসর থাকিলে মনঃস্রোত স্বভাবতই আভ্যন্তরিক বেগ ধারণ করে, ধ্যান এবং চিন্তার আতিশয্য হয়। তাহার একটি ফল কবিত্ব। এই নিমিত্ত ভারতীয় আর্য্যগণ কাব্যপ্রিয় ছিলেন এবং ভারতভূমিতে এত কবি জন্মিয়াছিলেন। কাব্য লিখিবার আর একটি অবান্তর হেতু থাকিতে পারে। যদ্যপি গদ্যলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুবোধ এবং সুগম হয়, কিন্তু পদ্যে লিখিত শ্লোকগুলি অতি সুশ্রাব্য ও শ্রীতিকর, এবং সহজে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা যায়। এই নিমিত্ত বোধ হয় আর্য্যগণ গদ্যে রচনীয় ইতিহাস প্রভৃতিও পদ্যে রচনা করিতে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাব্য যে কেবল পদ্যমাত্রেই নিবদ্ধ তাহা নহে। চমৎকার রসাত্মক বাক্য হইলেই কাব্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং কাব্য পদ্যময়, গদ্যময় অথবা গদ্যপদ্যমিশ্রিত সর্ব্বপ্রকারই হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত ভাষার অবান্তর শাখাভেদ স্বরূপ প্রাকৃত ভাষাতে এবং অপভ্রংশ ভাষাতে অথবা নানাবিধ ভাষাতেও কাব্য রচিত হইতে পারে। তাহা কাব্যবিভাগকালে বিশেষরূপে উল্লেখ করা যাইবে।

শব্দ এবং অর্থ কাব্যের শরীর। সুতরাং কাব্য রচনার ভিন্ন ভিন্ন রীতি আছে। পদের সংঘটনার নাম রীতি। রীতি চতুর্বিধ ; বৈদর্ভী কিংবা কোমলা, গৌড়ী, পাঞ্চালী এবং লাটী। সমাসরহিত অথবা অল্পসমাসবিশিষ্ট ললিতাত্মক মাধুর্য্য প্রকাশক বর্ণ রচনার নাম বৈদর্ভী রীতি। সমাসবহুল আড়ম্বরযুক্ত রচনার নাম গৌড়ীরীতি। বৈদর্ভী এবং গৌড়ী রীতির মধ্যস্থানীয় রচনার নাম পাঞ্চালীরীতি। বৈদর্ভী এবং পাঞ্চালীর মধ্যস্থিতা রচনা লাটী রীতি। এতদ্ভিন্ন বহু বিধ রচনা আছে তাহা এস্থলে উল্লেখ করা হইল না। কাব্যের দোষ অনেক প্রকার। যাহারা

কাব্যের অপকর্ষসাধন করে তাহারাই কাব্যের দোষ-শব্দে বাচ্য। পরুষ দুঃশ্রাব্য বর্ণনা, অশ্লীল বর্ণনা, অনুচিতার্থ প্রয়োগ, অপ্রযুক্ত শব্দ প্রয়োগ, অবাচকশব্দ প্রয়োগ, গ্রাম্যতা প্রভৃতি কাব্যের অনেক দোষ আছে, তৎসমুদয়ের এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন না থাকায় উল্লিখিত হইল না। কাব্যের গুণ ত্রিবিধ; মাধুর্য্য, তেজস্বিত্ব এবং প্রসাদ। যে রচনা পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠকের চিত্ত আর্দ্রপ্রায় এবং আহ্লাদপূর্ণ হয়, সে রচনার মাধুর্য্য গুণ আছে। এই মধুর রচনাতে অতি অল্প সমাস ঘটিত থাকে। যে রচনা পাঠ করিলে চিত্ত বিস্তৃত এবং প্রদীপ্ত হয়, সে রচনা তেজস্বিনী। ইহাতে সমাসের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে এই গুণের নাম ওজোগুণ। যে রচনা পাঠমাত্র সমস্ত চিত্ত একবারে ব্যাপ্ত হয় তাহা প্রসাদগুণবিশিষ্টা রচনা। ইহার অর্থনৈর্ম্মল্য এবং চমৎকারিত্ব একবারে সহৃদয় হৃদয়কে আকর্ষণ করে। এতদ্ভিন্ন সৌকুমার্য্য ঔদার্য্য প্রভৃতি অনেক গুণ আছে। ইহারা কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করে এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কাব্যের গুণ কহে। উক্তির বিচিত্রতার নাম মাধুর্য্য, অর্থের বিমলতার নাম প্রসাদ, সাভিপ্রায়তার নাম ওজঃ, পরুষবর্ণনারাহিত্যের নাম সৌকুমার্য্য এবং গ্রাম্যতার অভাবের নাম উদারতা।

এক্ষণে কাব্যবিভাগ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। কাব্য দৃশ্য এবং শ্রব্যভেদে দ্বিবিধ। অভিনয়াদির দ্বারা যে কাব্য দর্শনের যোগ্য তাহাকে দৃশ্য কাব্য বলে। দৃশ্য কাব্য অভিনয় যোগ্য এবং রূপক নামে অভিধেয়। রূপক দশবিধ, তন্মধ্যে নাটক, প্রকরণ, প্রহসন প্রভৃতি সচরাচর চলিত। এ প্রবন্ধে নাটক আমাদিগের প্রতিপাদ্য নহে। ইহাতে কেবল মাত্র শ্রব্য কাব্যের আলোচনা করা যাইবেক, অতএব এস্থলে নাটকের বিষয় আলোচনা করিতে আমরা বাধ্য নহি। প্রবন্ধান্তরে আমরা দৃশ্যকাব্যের বিশেষ আলোচনা করিব।

দৃশ্যকাব্য ভিন্ন সমস্তই শ্রব্যকাব্য। ইহা পাঠ এবং শ্রবণের নিমিত্ত, অভিনয়ের নিমিত্ত নহে। ইহা পদ্যময় এবং গদ্যময় ভেদে দ্বিবিধ। ছন্দোবদ্ধ পদ পদ্য। পদ্য কাব্যের ভেদ বিবিধ; মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষ। গদ্য কাব্যের ভেদও বিবিধ; কথা, আখ্যায়িকা, আখ্যান। গদ্যপদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূকাব্য। বিবিধ-ভাষা-বিনির্ম্মিত কাব্যের নাম করম্ভক। এবংবিধ অনেক প্রকার ভেদ আছে তাহা পৃথক্ লক্ষিত করিবার প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত ভেদের লক্ষণ যথাস্থানে নিবেশিত হইবেক।

অতঃপর আমরা সংক্ষেপে আর্য্যজাতির কাব্য শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত এস্থলে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঋগ্বেদ সংহিতা আর্য্যভূমির প্রাচীনতম কাব্য গ্রন্থ। ঋগ্বেদ সংহিতার তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ জগতে আর নাই। আর্য্যভূমির কাব্যোদ্যানের সর্ব্ব-প্রথম প্রস্ফুটিত অক্ষয় কুসুম নিচয় ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রথিত রহিয়াছে—তাহার সৌরভে সমস্ত ভারত সৌরভিত। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রতিমন্ত্রে প্রাচীন

কালোপযোগী সারল্য, ঔদার্য্য এবং নৈসর্গিক গম্ভীর ভাব বিরাজমান। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, আদিত্য, সোম, বায়ু প্রভৃতি ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহের আরাধ্য দেবতা। অনেক মন্ত্রে চিন্তাশীলতা, দার্শনিকভাব, তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রভৃতিও পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। বেদরচয়িতা বিদ্বান্ মেধাবী ঋষিগণ অতি সরলভাবে তাঁহাদিগের স্তোত্রসমূহ রচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতা আর্য্যদিগের কবিত্বের প্রাচীনতম আদর্শ এবং প্রতিভাশক্তির প্রাচীনতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। কাব্যের রীতি এবং প্রণালী তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ছন্দ এবং চরণবদ্ধ কবিতার উৎপত্তি হইয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রতিমণ্ডলে বিবিধ প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার এক প্রকার উৎকর্ষসাধিত হইয়াছে এবং সমাজের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে। বৈদিক ভাষা এবং আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ প্রভেদ। বৈদিক অনেক শব্দ, উপসর্গ ইত্যাদি এক্ষণে অপ্রচলিত হইয়াছে। আখ্যাত অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক ধাতুর রূপ অনেক বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেক নিপাত অর্থাৎ অব্যয় শব্দ আর এক্ষণে ব্যবহৃত হয় না। ঋগ্বেদের সময় যে উচ্চারণ প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা এক্ষণে আর সমাদৃত হয় না। উচ্চারণ প্রণালীর নিয়মানুসারে কোন কোন মন্ত্রের দুই তিন প্রকার ছন্দ হইতে পারে। বৈদিকশিক্ষা এবং নিরুক্তগ্রন্থ ব্যতিরেকে বেদপাঠ সাধ্যাতীত। ঋষিগণ ধন, ধান্য, পশু, নিরাপদ, বিজয়, শত্রুনাশ প্রভৃতির নিমিত্ত দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহা মন্ত্ররূপে রচনা করিয়াছেন। ভাষা অতি প্রাঞ্জল, আড়ম্বরহীন এবং স্বাভাবিক, কিন্তু বৈদিক প্রক্রিয়া না জানা থাকিলে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়।

ঋগ্বেদের সময় কাব্যের রীতি ও প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। রীতি ও প্রণালীর পরিচয় আমরা রামায়ণে প্রথম দেখিতে পাই। ইহাতে সূর্য্যবংশের রাজগণের বর্ণনা। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী সরযূনদীতীরস্থ অযোধ্যানগরী ছিল। রামায়ণ কবিকুলগুরু বাল্মীকির রসময়ী লেখনীর মুখবিনির্গত। ভারত সরোবরে কবিতাকমলের আদিকবি বাল্মীকি। যৎকালে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা তখন উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরূঢ়া। বেদচতুষ্টয় সর্ব্বশাস্ত্রোপরি শোভমান, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন সর্ব্বত্র বহুল, বৈষয়িক বিদ্যোপযোগি অর্থশাস্ত্র অনেকত্র প্রচারিত এবং সাহিত্যাদির বিস্তর প্রচার। রামায়ণ যে সময়ের কাব্যগ্রন্থ তৎকালে সাহিত্যের বিষয় বলা বাহুল্য মাত্র। রামায়ণের কাব্যরসতরঙ্গ নাচিতে নাচিতে অনেকদূর উপস্থিত হইয়াছিল। ইয়ুরোপে গ্রীসদেশের আদিকবি হোমারের হৃদয়ে প্রতিঘাত করিয়া তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়াছিল। ভবভূতির প্রণীত উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি একদা মধ্যন্দিন সময়ে তমসা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কোন ব্যাধ বনচর ক্রৌঞ্চদ্বয়ের একটিকে বাণবিদ্ধ করিল। তৎক্ষণাৎ বাল্মীকির মুখ হইতে অকস্মাৎ স্বয়ং প্রকাশমান অনুষ্টুপছন্দে এ-

কটি শ্লোক নির্গত হইল। সে শ্লোকটি এই

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকং অবধীঃ কামমোহিতং॥'

এতদ্দর্শনে ভূতভাবন ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিলেন 'হে মহর্ষে তুমি বাঙ্ময়ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ হইয়াছ, তোমার আর্ষচক্ষু অব্যাহতজ্যোতি হউক। তুমি আদিকবি হইলে অতএব তুমি রামচরিত প্রণয়ন কর।' আর একস্থলে লিখিত আছে যে বাল্মীকির মুখ হইতে অকস্মাৎ 'পাদবদ্ধোক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ' পদ্য নির্গত হইয়াছিল। প্রাতিশাখা নামক বেদের শিক্ষাগ্রন্থে বাল্মীকি নামক জনৈক বৈয়াকরণের নাম আছে। সে বাল্মীকি যে রামায়ণকর্ত্তার অনেক ঊর্দ্ধতন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণসদৃশ প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট পদ্যগ্রন্থ অতি বিরল। মধ্যে মধ্যে চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী রচনা অনেক আছে। রামায়ণের রচনাপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার প্রাচীনতা প্রতীত হইবেক।

বেদব্যাসের মহাভারত ইহার পরবর্ত্তী। মহাভারত অতি বৃহৎ গ্রন্থ। সভাপর্ব্বের চমৎকার বর্ণনা এবং স্ত্রীপর্ব্বের করুণরসাশ্রিত রচনা প্রকৃত কাব্যের নিদর্শনস্থল। কিন্তু সাধারণতঃ ইহার রচনা রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং পরিষ্কৃত নহে। আবৃত্তিমাত্র সকল স্থল বুঝিতে পারা যায় না। মহাভারতের আদিপর্ব্বে এবং বনপর্ব্বে নীতিগর্ভ এবং হিতোপদেশঘটিত প্রস্তাব অনেক আছে। মহাভারতে পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে এবং আনুষঙ্গিক নানা পৌরাণিক বিষয়ও সংকলিত হইয়াছে। ইহার রচনা-প্রণালী আলোচনা করিলেই রামায়ণ অপেক্ষা ইহার আধুনিকত্ব স্ফুট হইবে।

উপরি উল্লিখিত রামায়ণ এবং মহাভারত কাব্যগ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু ঐতিহাসিকগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। এই গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

কালিদাস, ভট্টি, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির হস্তে সংস্কৃত কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। যদিও ভবভূতি কোন কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মালতীমাধব, বীরচরিত এবং উত্তরচরিতে কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র এবং কবিশিরোমণি বলিয়া বিখ্যাত। প্রবাদ আছে কালিদাস প্রথমে অত্যন্ত মূর্খ ছিলেন। পরে একদা মনোদুঃখে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কোন নদীর জলে অবগাহন করিলে পর সরস্বতীদেবীর প্রসাদে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে,তুমি তোমার হস্তস্থিত পাত্র জলে পরিপূর্ণ করিয়া সেই জল পান কর। কালিদাস তাহাই করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল কবিতা নির্গত হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ স্ত্রীকে বলিলেন 'অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ' কোন বিশেষ কথা আছে। তদনন্তর তাঁহার স্ত্রীর অনুরোধে তিনখানি

কাব্য রচনা করিলেন, তাহাদিগের প্রথম শব্দ ' অস্তি ' ' কশ্চিৎ ' এবং ' বাক্ '। কুমারসম্ভবের আরম্ভে ' অস্তি ' শব্দ, রঘুবংশের আরম্ভে ' বাক্ ' শব্দ এবং মেঘদূতের আরম্ভে ' কশ্চিৎ ' শব্দ। আর একটি প্রবাদ আছে যে, একদা কালিদাস মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে বিক্রমাদিত্যের একজন নরযানবাহকের অভাব হওয়াতে তাঁহার পরিজনেরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে না পাইয়া অবশেষে কালিদাসকে সামান্যজন মনে করিয়া ধরিয়া আনিল এবং বিক্রমাদিত্যের যান বহিতে নিযুক্ত করিল। কালিদাস অনভ্যস্তকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। তখন বিক্রমাদিত্য বলিলেন—

' ক্ষণং বিশ্রম্যতাং জাল্ম: স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।

কালিদাস আর মৌন থাকিতে পারিলেন না, অমনি বলিয়া উঠিলেন,—

' প্রলপত্যেষ বৈধেয়: স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।
তথা ন বাধতে স্কন্ধোযথা'বাধতি বাধতে।'

রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, যানবাহক সামান্য মনুষ্য নহে এবং অবিলম্বে যান হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, স্বয়ং কবিচূড়ামণি কালিদাস তথায় বর্ত্তমান। তখন বিনীতভাবে কালিদাসকে অনুনয় এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া পুরস্কারের সহিত বিদায় করিলেন।

কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ। তিনি বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে প্রধান রত্ন ছিলেন। ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, বরাহমিহির, এবং বররুচি অন্য অষ্টরত্ন। ধনিক আর একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। কাব্যের উৎপত্তি, বিস্তার এবং অপকর্ষ একটি শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

' বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরং।
যা সূতেঽমরসিংহশঙ্কুধনিকান্ সেয়ং জরানীরসা
শূন্যালঙ্কারণাস্খলনং মৃদুপদা কং জনং নাশ্রিতা ॥ "

অস্যার্থঃ। বাল্মীকি হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্যাসের দ্বারা লীলাবিশিষ্ট এবং প্রকাশিতগুণ হইয়া কোমলা কবিতা কালিদাসকে বরণ করিলেন। যে কবিতা এককালে অমরসিংহ, শঙ্কু এবং ধনিক প্রভৃতিকে প্রসব করিয়াছিলেন সেই কবিতা এক্ষণে নীরস, অলঙ্কারহীন, এবং মৃদুপদরহিত হইয়া কোন্ ব্যক্তিকেইবা না আশ্রয় করিয়াছেন? কালিদাসের কবিশ্রেষ্ঠতা একটি শ্লোকে ব্যক্ত আছে, যথা—

" পুষ্পেষু জাতি নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ॥

পরপ্রস্তাবে আমরা কালিদাসের কাব্য সমূহের পরিচয় প্রদান করিব। শ্রীরঃ

আয়ুর্ব্বেদ

১২৮৩ সনের ফাল্গুণ চৈত্র মাসের বান্ধবে আয়ুর্ব্বেদ শীর্ষক যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্বতন অবস্থা ও বর্ত্তমান অবনতির কারণ এবং কি কি উপায়ে উহার পুনরুন্নতি হইতে পারে, তদ্বিবরণ সঙ্ক্ষেপতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং পূর্ব্বতন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ যে মৃত শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া শিষ্যদিগকে শারীরতত্ত্বের শিক্ষা প্রদান করিতেন তাহারও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যগণ শারীরতত্ত্বে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং অস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে কতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন, এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়েই বা কিরূপ কৃতী ছিলেন, তাহা অনেকেই অনবগত। অতএব আমরা আয়ুর্ব্বেদোক্ত শারীরতত্ত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালনবিধি, স্বাস্থ্য পালনোপায়, ও অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী প্রভৃতি কতিপয় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত মূল প্রমাণসহ ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। আর্য্যগণ শারীরতত্ত্বে কিরূপ পারদর্শী ছিলেন তাহাই প্রথমতঃ প্রদর্শিত হইবে।

যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইবে, তন্মধ্যে পাঠকগণ দেখিবেন যে মহামতি ভাবমিশ্রপ্রণীত 'ভাবপ্রকাশ' নামক গ্রন্থ হইতেই অধিকাংশ প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাঠকগণের ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মূল প্রাচীন গ্রন্থের সম্পূর্ণ মতানুসারী। ইহাতে বিশেষ এই যে, চরক ও সুশ্রুত প্রণীত মূলগ্রন্থে নানাস্থানে বিশৃঙ্খল ভাবে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে, ভাবমিশ্র তাহা শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক সুশৃঙ্খল ভাবে একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং উক্ত মূল গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত বিষয় অস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে, ভাবমিশ্র তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমরা ভাবপ্রকাশ হইতেই অধিকাংশ প্রমাণ গ্রহণ করিব। তাহাতে পাঠকগণ এরূপ মনে ভাবিবেন না যে, ভাবপ্রকাশগ্রন্থ অনেক পরবর্ত্তী বলিয়া তাহার প্রমাণ অগ্রাহ্য। কারণ ভাবপ্রকাশগ্রন্থ পরবর্ত্তী হইলেও চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মূল গ্রন্থেরই ছায়া, কচিৎ কচিৎ সামান্য বৈলক্ষণ্য আছে। এমন কি ভাবপ্রকাশে মূলগ্রন্থের অনেক বচন অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাঠকবর্গের নিকটে আমাদিগের ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে উদ্ধৃত চরক সুশ্রুত গ্রন্থের অনেক বচন ভাবপ্রকাশের অন্যান্য কথার সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়া

আমরা উহার প্রমাণস্থলে কেবল ভাবপ্রকাশেরই নাম নির্দ্দেশ করিব। অনেক স্থলে বাহুল্যভয়ে প্রমাণ বাক্যের একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া 'ইত্যাদি' শব্দে শেষ করিব, পাঠকগণ উহা বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিলে তত্তৎ গ্রন্থ দেখিলেই জানিতে পারিবেন।

পরিশেষে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে আমাদিগের অবলম্বনীয় গ্রন্থমধ্যে কোন কোনস্থলে যাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই, তাহা আমরা আবশ্যক বোধে পাঠকবর্গকে বিশদরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত স্বীয় বোধানুরূপ যুক্তির অনুসরণ করিব। সুতরাং ঐ লেখাটুকু গ্রন্থের অতিরিক্ত হইবে।

শারীর-তত্ত্ব

অঙ্গ ও উপাঙ্গ বিভাগ।

পূর্ব্বতন শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, শরীরকে প্রধানতঃ আট অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার এক এক অংশকে এক একটি অঙ্গ বলা যায়। যথা—

অঙ্গ

১। মস্তক। ২ গ্রীবা। ৩ বাহু। ৪ বক্ষঃ। ৫ উদর। ৬ পার্শ্ব। ৭ পৃষ্ঠ। ৮ সিক্থ (উরু মূল অবধি পাদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্থান)। *

উপাঙ্গ।

কেশ, মস্তলুঙ্গ (মস্তিষ্ক) ললাট, ভ্রূ, নেত্র, নেত্রান্তর্গত তারকা, দৃষ্টিভাগ, কৃষ্ণ-গোলক, শ্বেতভাগ, বর্ত্ম, পক্ষ্ম, অপাঙ্গ

---

* আদ্যমঙ্গং শিরঃ প্রোক্তং তদুপাঙ্গানি কুন্তলাঃ। তস্যান্তর্মস্তলুঙ্গঞ্চ ললাটং ভ্রূযুগন্তথা। নেত্রদ্বয়ং তয়োরন্তর্বর্ত্তেতে দ্বে কনীনিকে। দৃষ্টিদ্বয়ং কৃষ্ণগোলৌ শ্বেতভাগৌচ বর্ত্মনী। পক্ষ্মাণ্যপাঙ্গৌ শঙ্খৌচ কর্ণৌ তচ্ছস্কুলীদ্বয়ং। পালীদ্বয়ং কপোলৌ চ নাসিকাচ প্রকীর্ত্তিতা। ওষ্ঠাধরৌচ সৃক্বণৌ মুখং তালু হনুদ্বয়ং। দন্তাশ্চ দন্তবেষ্টশ্চ রসনা চিবুকংগলঃ। দ্বিতীয়মঙ্গং গ্রীবাতু যয়া মূর্দ্ধা বিধার্য্যতে। তৃতীয়ং বাহুযুগলং তদুপাঙ্গান্যথ ব্রুবে। তত্রোপরি মতৌ স্কন্ধৌ প্রগণ্ডৌ ভবতস্তথঃ। কফোণীযুতং তদধঃ প্রকোষ্ঠযুগলন্তথা। মণিবন্ধৌ ততো হস্তৌ তয়োশ্চাঙ্গুলয়োদশ। নখাশ্চ দশ তে স্থাপ্যা দশচ্ছেদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ। চতুর্থমঙ্গং বক্ষস্তু তদুপাঙ্গান্যথ ব্রুবে। স্তনৌ পুংসস্তথানার্য্যা বিশেষ উভয়োরয়ং। যৌবনাগমনে নার্য্যা পীবরৌ ভবতস্তনৌ। গর্ভবত্যাঃ প্রসূতায়াস্তাবেব ক্ষীরপূরিতৌ। হৃদয়ং পুণ্ডরীকেণ সদৃশং স্যাদধোমুখং। জাগ্রতস্তদ্বিকশতি স্বপতস্তু নিমীলতি। আশয়স্তত্তু জীবস্য চেতনাস্থানমুত্তমং। অতস্তস্মিংস্তমোব্যাপ্তে প্রাণিনঃ প্রস্বপন্তি হি। কক্ষয়ো র্ব্বক্ষসঃ সন্ধী জক্রুণী সমুদাহৃতে। কক্ষে উভে সমাখ্যাতে তয়োঃ স্যাতাংচ বংক্ষণৌ। উদরং পঞ্চমং চাঙ্গং ষষ্ঠং পার্শ্বদ্বয়ংমতং। সপৃষ্ঠবংশংপৃষ্ঠন্তু সমন্তং সপ্তমংস্মৃতং। উপাঙ্গানিচ কথ্যন্তে তানি জানীহি যত্নতঃ। শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা ইত্যাদি। * * সিক্থিনীত্বঙ্গমষ্টমং। তদুপাঙ্গানিচ ক্রমো জানুনী পিণ্ডিকাদ্বয়ং। জঙ্ঘে দ্বে ঘুণ্টিকে পার্ষ্ণীতলেচ প্রপদে তথা। পাদাবঙ্গুলয়স্তত্র দশতাসাং নখাদশ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(নেত্রপ্রান্ত) শঙ্খস্থান (ভ্রূপুচ্ছের উপরিভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যবর্ত্তি স্থান) কর্ণ, কর্ণরন্ধ্র, কর্ণপালী, গণ্ডস্থল, নাসিকা, ওষ্ঠ, অধর, সৃক্কণী (ওষ্ঠপ্রান্ত) মুখ, তালু, হনু, দন্ত, দন্তবেষ্টক মাংস, জিহ্বা, চিবুক, গলদেশ, এই সমস্ত মস্তকের উপাঙ্গ।

স্কন্ধ, প্রগণ্ড (স্কন্ধের নিম্ন অবধি কনুইর উপরিভাগ পর্য্যন্ত স্থান), কফোণী (কনুই), প্রকোষ্ঠ (কনুইর নিম্ন হইতে মণিবন্ধের উপর পর্য্যন্ত), মণিবন্ধ (প্রকোষ্ঠ ও হস্ত তলের মধ্যবর্ত্তি স্থান), হস্ত, হস্ততল, হস্তাঙ্গুলি, নখ, এই সমস্ত বাহুর উপাঙ্গ।

স্তন, হৃদয়, জত্রু (কক্ষা ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিদ্বয়), কক্ষা (বগল), কক্ষাবঙ্ক্ষণ (বক্ষঃস্থল ও কক্ষার মধ্যস্থল), এই সমস্ত বক্ষঃস্থলের উপাঙ্গ।

প্লীহা, ফুক্‌ফুস্, যকৃৎ, ক্লোম (জলবাহিশিরাসমূহের মূল স্থান), বৃক্ক (উদরস্থমেদঃধারক যন্ত্র), অন্ত্র, কটী, উণ্ডুক (পক্বাশয়স্থ মলধারক যন্ত্র), ত্রিক (পৃষ্ঠবংশেরনিম্নস্থ অস্থিখণ্ড), বস্তি (মূত্রাশয়), বঙ্ক্ষণ (বাধিস্থান), মেঢ্র, যোনি, বৃষণ (অণ্ডকোষ), পায়ু (মলদ্বার), নিতম্ব, কুকুন্দর, এই সমস্ত পৃষ্ঠের উপাঙ্গ।

উরু, জানু, জঙ্ঘা, ঘুণ্টিকা, পাদ, পাদপার্শ্ব, পাদতল, পাদাঙ্গুলি, এইসমস্ত সক্‌থির উপাঙ্গ।

গ্রীবা, উদর ও পার্শ্বের কোন উপাঙ্গ নাই।

উপরোক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গমধ্যে, মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, মেঢ্র, যোনি, বক্ষঃ, জিহ্বা, তালু, চিবুক, বস্তি, গ্রীবা প্রভৃতি এক এক-সংখ্যক। হস্ত, পদ, নাসিকা, ভ্রূ, কর্ণ, নেত্র, হনু, শঙ্খ, স্কন্ধ, গণ্ড, কক্ষা, জত্রু, স্তন, বৃষণ, পার্শ্ব, স্ফিক্ (নিতম্ব), জানু, জঙ্ঘা, বাহু, উরু প্রভৃতি দুই দুই সংখ্যক। *

শারীরযন্ত্র—বিবরণ।

হৃৎপিণ্ড।

ইহা শ্বেতবর্ণ পদ্মসদৃশ মাংসপিণ্ড, বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে অধোমুখে অবস্থিত। রক্তপরিপূর্ণ, জীব ও চৈতন্যের অধিষ্ঠান। পদ্ম যেরূপ বিকসিত ও সঙ্কুচিত হয়, হৃৎপিণ্ডও তদ্রূপ সময়ে সময়ে বিকসিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ইহার বিকাশ অবস্থায় প্রাণিগণ সচেতন থাকে। সঙ্কুচিত অবস্থায় অচৈতন্য থাকে। নিদ্রাবস্থায় হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। †

প্লীহা।

ইহা রক্তজ, হৃৎপিণ্ডের অধোভাগে বাম দিকে অবস্থিত। ইহা রক্তবাহি শিরাসমূহের মূল। ‡

ফুক্‌ফুস্।

ইহা রক্তফেণজ, হৃৎপিণ্ডের অধোভাগে

---

* মস্তকোদরপৃষ্ঠনাভিললাটচিবুকবস্তিগ্রীবা ইত্যেতা একৈকাঃ। কর্ণনেত্রনাসাভ্রূ শঙ্খাংসগণ্ডকক্ষস্তনবৃষণপার্শ্বস্ফিক্‌জানুবাহূরুপ্রভৃতয়ো দ্বে দ্বে। (সুশ্রুতঃ)

† পুণ্ডরীকেণ সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধোমুখং। জাগ্রতস্তদ্বিকসতিস্বপতশ্চ নিমীলতি। হৃদয়ং চেতনাস্থানমুক্তং সুশ্রুতদেহিনাং তমোঽভিভূতে তস্মিংস্ত নিদ্রা বিশতি দেহিনাং। (সুশ্রুতঃ)

‡ শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতোহৃদয়াদধঃ। রক্তবাহিশিরাণাং সমূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

বামদিকে অবস্থিত। ইহা শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা দূষিত বায়ু নিঃসরণ ও বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করতঃ সর্ব্বদা রক্ত পরিষ্কার করে। * ইহার মুখ কণ্ঠনালী-সংযুক্ত।

যকৃৎ।

ইহা রক্তজ, হৃৎপিণ্ডের অধোভাগে দক্ষিণদিকে অবস্থিত। ইহা রঞ্জক নাম পিত্তের অধিষ্ঠান। †

ক্লোম।

ইহাও হৃদয়ের অধোভাগে দক্ষিণদিকে অবস্থিত, ইহাই জলবাহিশিরাসমূহের মূল ও তৃষ্ণানিবারক। ‡

বৃক্ক।

ইহা দ্বিসংখ্যক। মেদ ও রক্তের সারভাগ হইতে সমুৎপন্ন। ইহা জঠরস্থ মেদের পুষ্টিকারক। উদরের দুই পার্শ্বে দুইটি অবস্থিত। §

উণ্ডুক।

ইহা পক্কাশয়মধ্যস্থ মলধারক যন্ত্র। ¶

বস্তি।

ইহা নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, পায়ু, মেঢ্র ও বঙ্ক্ষণ স্থানের মধ্যভাগাভ্যন্তরে অধোমুখে অবস্থিত, একদ্বারবিশিষ্ট, স্নায়ুসমূহে নির্ম্মিত। ইহা মূত্রাশয়। *

নাভি।

ইহা আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্ত্তী, শিরাসমূহের মূল-স্থান ও শিরা দ্বারাই নির্ম্মিত। †

গর্ভাশয়।

যেমন শঙ্খনাভি ত্রি আবর্ত্ত (পেচ) বিশিষ্ট, তদ্রূপ স্ত্রীলোকের যোনিদেশও ত্রি আবর্ত্ত বিশিষ্ট। উহার অভ্যন্তরস্থ তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থিত। ইহা পিত্তাশয় (অগ্ন্যাশয়) ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্ত্তী। গর্ভাশয়ের আকৃতি রোহিত মৎস্যের মুখের ন্যায়, মুখবিবর সূক্ষ্ম ও মধ্যস্থান বৃহৎ, কিন্তু গর্ভাশয়ের মুখবিবর সূক্ষ্ম হইলেও উহা সময়ে সময়ে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ‡

---

* হৃদয়াদ্বামতোঽধশ্চ ফুফ্ফুসোরক্তফেণজঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

† অধোদক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াৎযকৃতঃ স্থিতিঃ। তত্তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতং। (ভাবপ্রকাশঃ)

‡ অধস্তু দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোমতিষ্ঠতি। জলবাহিশিরামূলং তৃষ্ণাচ্ছাদনকৃন্মতং। (ভাবপ্রকাশঃ)

§ মেদঃ শোণিতয়োঃ সারাৎবৃক্কয়োর্যুগলং ভবেৎ। তৌ তুপুষ্টিকরৌ প্রোক্তৌ জঠরস্থস্য মেদসঃ। (ঐ)

¶ যকৃৎ সমন্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ যথান্ত্রাণি সমাশ্রিতা। উণ্ডুকস্থং বিভজতে মলং মলধরাকলা। (সুশ্রুতঃ)

* বস্তির্নাভিপৃষ্ঠকটীগুদবঙ্ক্ষণশেফসাং। মধ্যে বস্তিতনুত্বক্ চ একদ্বারোহ্যধোমুখঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

† যাবত্যস্তু শিরাঃ কায়ে সম্ভবন্তি শরীরিণাং। নাভ্যাং সর্ব্বানিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ। নাভিস্থাঃ প্রাণিনাংপ্রাণাঃ প্রাণান্নাভির্ব্যুপাশ্রিতা। শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

‡ শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনি স্ত্র্যাবর্ত্তা সা প্রকীর্ত্তিতাঃ। তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা। যথা রোহিতমৎস্যমুখং ভবতিরূপতঃ তৎসংস্থানাং তথারূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ॥ (সুশ্রুতঃ)

মেঢ়্

ইহা পৌরুষচিহ্ন, বীর্য্য ও মূত্রবাহী, গর্ভাশয়ে বীজপ্রবেশক। ইহা গ্রীবা ও হৃদয়নিবন্ধনী অধোভাগগতকণ্ডরাসমূহের প্ররোহ। *

বৃষণ (অণ্ডকোষ)।

ইহা মেদ ও কফরক্তের সারাংশ সম্ভূত। বীর্য্যবাহিশিরাধারক ও পৌরুষাবহ। †

পায়ু।

ইহা মাংসনির্ম্মিত, সার্দ্ধচতুরঙ্গুলপরিমিত, শঙ্খাবর্ত্তসদৃশ ত্রিবলি-বিশিষ্ট। ইহার আভ্যন্তরিক প্রথম বলি সার্দ্ধাঙ্গুলি প্রমাণ, প্রবাহিণী নামে খ্যাত। তদধোভাগে দ্বিতীয়বলি সার্দ্ধাঙ্গুলি প্রমাণ, উৎসর্জিনী নামে খ্যাত। তদধোভাগে তৃতীয়বলি একাঙ্গুলি প্রমাণ, সঞ্চরিণী নামে খ্যাত। তদধঃ অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত স্থানকে পায়ুমুখ বলা যায়। ইহাই মলনিঃসরণ পথ। ‡

যোনি।

ইহা স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়, শঙ্খনাভি সদৃশ ত্রি-আবর্ত্তবিশিষ্ট। ইহাই শুক্রগ্রহণ ও আর্ত্তবশোণিত নির্গমনের পথ।

স্থূল অন্ত্র।

গলনালী হইতে পায়ুমুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত উদরব্যাপী যে একটি অতি স্থূল নাড়ী আছে, তাহাকেই স্থূল অন্ত্র বলে। ইহা পুরুষের সার্দ্ধত্রিব্যাম পরিমিত এবং স্ত্রীলোকের ত্রিব্যাম পরিমিত। এই স্থূল অন্ত্র মধ্যেই ভাগে ভাগে সমস্ত আশয়াদি অবস্থিত আছে। এই স্থূল অন্ত্রের উর্দ্ধমুখ গলনালী সংলগ্ন ও অধোমুখ পায়ুমার্গ-সংলগ্ন। * এতদ্ভিন্ন সূক্ষ্ম অন্ত্র অনেক আছে।

শিরা প্রভৃতি—বিবরণ।

শিরা।

ইহা সন্ধিসমূহের বন্ধনী, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ও রসরক্তাদি ধাতু বহন করিয়া থাকে। ইহার মূলস্থান নাভি, যেমন পদ্মকন্দ হইতে সমুৎপন্ন মৃণালপ্রতানসমূহ জলমধ্যে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ নাভিমূল হইতে সমুৎপন্ন শিরাপ্রতানসমূহ সমস্ত শরীরে ব্যাপিত হইয়া থাকে। যেমন জলপ্রণালী দ্বারা ক্ষেত্রস্থ ধান্য পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ সারবাহিশিরাসমূহ দ্বারা সমস্ত শরীর পরিপোষিত হয়। প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি কার্য্যে ইহার বিশেষ উপযোগিতা। বৃক্ষপত্রমধ্যে যেরূপ বিস্তৃত শিরা দেখা যায়, শরীরস্থ মাংসমধ্যেও শিরার আকৃতি তদ্রূপ। †

---

* কণ্ডরাণাং প্ররোহঃ স স্থানং তদ্বীর্য্যমূত্রয়োঃ। সএব গর্ভস্যাধানং কুর্য্যাৎ গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়াঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

† বৃষণৌ ভবতঃ সারাৎ কফাসৃগ্‌ভ্যাং চ মেদসাং। বীর্য্যবাহিশিরাধারৌ তৌ মতৌ পৌরুষাবহৌ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

‡ গুদস্যামানং সর্ব্বস্য সার্দ্ধং স্যাচ্চতুরঙ্গুলং। তস্য স্যুর্ব্বলয়স্তিস্রঃ শঙ্খাবর্ত্ত নিভাস্তুতাঃ॥ প্রবাহিণী ভবেৎপূর্ব্বা সার্দ্ধাঙ্গুলমিতা মতা। উৎসর্জ্জিনীতু তদধঃ সা সার্দ্ধাঙ্গুল সম্মিতা। তস্যাধঃ সঞ্চরিণী স্যাৎ একাঙ্গুল সমামতা। অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণং তু বুধৈর্গুদমুখং মতং। মলোৎসর্গস্য মার্গোয়ং পায়ুর্দেহে বিনির্ম্মিতঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

* সার্দ্ধত্রিব্যামান্যন্ত্রাণি পুংসাং স্ত্রীণামর্দ্ধব্যামহীনানি। (সুশ্রুতঃ)

† সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ

তন্মধ্যে মূল শিরা ৪০ চত্বারিংশৎ। যথা —বাতবাহিনী ১০, পিত্তবাহিনী ১০, কফবাহিনী ১০,রক্তবাহিনী ১০। উক্ত বাতবাহিনী মূল শিরা ১০টি হইতেই ১৭৫টি শিরা উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে সক্‌থিদ্বয়ে ৫০, বাহুদ্বয়ে ৫০,পায়ু ও মেঢ্রাশ্রিত ৮, পার্শ্বদ্বয়ে ৪,পৃষ্ঠে ৬, উদরে ৬, বক্ষঃস্থলে ১০, গ্রীবাতে ১৪, কর্ণদ্বয়ে ৪, জিহ্বাতে ৯, নাসাতে ৬, নেত্রে ৮।

পিত্তবাহিনী মূলশিরা ১০টি হইতেও ১৭৫টি শিরা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার বিভাগও বাতবাহিনী শিরার বিভাগের ন্যায়, কেবল নেত্রদ্বয়ে ৮ স্থানে ১০, এবং কর্ণদ্বয়ে ৪ স্থানে ২, এই মাত্র প্রভেদ।

কফবাহিনী মূলশিরা ১০টি হইতেও ১৭৫ শিরা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার বিভাগও বাতবাহিনী শিরা বিভাগের ন্যায়, কেবল গ্রীবাতে ১৪ স্থানে ১৬, কর্ণে ৪ স্থানে ২।

রক্তবাহিনী মূলশিরা ১০টি হইতেও ১৭৫টি শিরা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার বিভাগও বাতবাহিনী শিরা বিভাগের ন্যায়। সর্ব্বসমষ্টি শিরা সংখ্যা ৭০০ শত।

দূষিত বাতবাহিনী শিরা অরুণ বর্ণ হইয়া থাকে। এবং দূষিত পিত্তবাহিনী শিরা নীলবর্ণ এবং দূষিত কফবাহিনী শিরা শ্বেতবর্ণ ও শীতল, এবং দূষিত রক্তবাহিনী শিরা রক্তবর্ণ ও নাতি উষ্ণনাতি শীতল হইয়া থাকে। *

শিরাঃ। নাভ্যাং সর্ব্বা নিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ। শরীরং সকলৈশ্চৈতচ্ছিরাভিঃ পোষ্যতে সদা। প্রণালীভিরিবারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্যবৎ। প্রসারণাকুঞ্চনাদিক্রিয়াভিঃ সততং তনৌ। শিরাএবোপকুর্ব্বন্তি তাঃ স্যুঃ সপ্তশতানি তু। যথা ক্রমদলে সাক্ষাৎ দৃশ্যন্তে প্রততাঃ শিরাঃ। তথৈব দেহিনো-দেহে বর্ত্তন্তে সকলে শিরাঃ॥ (ভাব-প্র-কাশঃ)

ব্যাপ্ন বন্ত্যভিতোদেহং নাভিতঃ প্রসৃতাঃ শিরাঃ। প্রতানাঃ পদ্মিনীকন্দাৎ বিসাদীনাং যথা জলং॥ তাসাং মূলশিরাশ্চত্বারিংশত্তাসাং বাতবাহিন্যোদশ কফবাহিন্যোদশ দশরক্তহিন্যঃ। তাসান্তু বাতবাহিনীনাং বাতস্থান-গতানাং পঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি। তাবত্য এব পিত্তবাহিন্যঃ পিত্তস্থানে কফবাহিন্যশ্চ কফস্থানে রক্তবাহিন্যশ্চ যকৃৎপ্লীহোঃ এবমেতানি সপ্তশিরাশতানি ভবন্তি। তত্র বাত বাহিন্যঃ শিরা একস্মিন্ সক্‌থ্নি পঞ্চবিংশতিঃ। এতেনেতরসক্‌থি বাহূচ ব্যাখ্যাতৌ। বিশেষতস্তু কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশত্তাসাং গুদমেঢ্রাশ্রিতাঃ শ্রোণ্যামষ্টৌ দ্বে দ্বে পার্শ্বয়োঃ, ষটপৃষ্ঠে, তাবত্য এবচোদরে, দশ বক্ষসি। একচত্বারিংশৎজত্রুণঃ ঊর্দ্ধং, তাসাং চতুর্দ্দশ গ্রীবায়াং কর্ণয়োশ্চতস্রঃ। নবজিহ্বায়াং, ষট্ নাসিকায়াং, অষ্টৌ নেত্রয়োঃ এবমেতৎ পঞ্চসপ্তত্যধিকশতং বাতবহানাং শিরাণাং ব্যাখ্যাতং। এষএব বিভাগঃ শেষাণামপি। বিশেষতস্তু পিত্তবাহিন্যো নেত্রয়োঃ দশ কর্ণয়োর্দ্বে। শ্লেষ্মবহাস্তু ষোড়শ গ্রীবায়াং কর্ণয়োর্দ্বে। এবমেতানি সপ্তশিরাশতানি সবিভাগানি ব্যাখ্যাতানি॥ (সুশ্রুতঃ)।

* তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনাশিরাঃ।পিত্তদুষ্টাশ্চনীলাশ্চ শীতাগৌর্য্যঃ স্থিরাঃ কফাৎ। অসৃগ্বহাস্তুতারক্তা স্যুশ্চনাত্যুষ্ণশীতলাঃ। (সুশ্রুতঃ)

স্নায়ু

ইহা শিরার প্রকারান্তর মাত্র। বিশেষ এই শিরা মৃদুপক্ক, স্নায়ু খরপক্ক, শিরাই অধিকাংশ মেদের স্নেহযুক্ত হইয়া স্নায়ু রূপে পরিণত হয়। ইহা মাংস, অস্থি, মেদ, ও সন্ধির বন্ধনকারিণী। এবং শিরা হইতেও অধিক সুদৃঢ়। *

স্নায়ুর সংখ্যা ৯০০ শত, তন্মধ্যে শাখাগত (হস্তপদাদি, গত) ৬০০ শতকোষ্ঠগত (পার্শ্বপৃষ্ঠপ্রভৃতিগত) ২৩০, গ্রীবার উর্দ্ধভাগগত ৭০।

শাখাগত-স্নায়ুর বিশেষ সংখ্যা।

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে ৬। ৬ হিসাবে ৬০। পাদতল, কূর্চ্চ (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যস্থান), ও গুল্ফ স্থানে ৬০। জঙ্ঘাদ্বয়ে ৬০। জানুদ্বয়ে ২০। উরুদ্বয়ে ৮০। বঙ্ক্ষণদ্বয়ে ২০। সর্ব্ব সমষ্টি ৩০০ শত।

প্রত্যেক হস্তাঙ্গুলিতে ৬। ৬ হিসাবে ৬০। হস্ততল, কূর্চ্চ ও মণিবন্ধে ৬০। প্রকোষ্ঠদ্বয়ে ৬০। কফোণীদ্বয়ে ২০। প্রগণ্ডদ্বয়ে ৮০। কক্ষাদ্বয়ে ২০। সর্ব্ব সমষ্টি ৩০০ শত।

কোষ্ঠগত---স্নায়ুর বিশেষ সংখ্যা।

কটীদেশে ৬০। পার্শ্বদ্বয়ে ৬০। পৃষ্ঠে ৮০। বক্ষঃস্থলে ৩০। সর্ব্ব সমষ্টি ২৩০।

গ্রীবার উর্দ্ধভাগগত স্নায়ুর বিশেষ সংখ্যা।

গ্রীবাতে ৩৬। মস্তকে ৩৪। সর্ব্ব-সমষ্টি ৭০।

স্নায়ু চতুর্ব্বিধ।

প্রতানবতী, বৃত্তা, পৃথু, শুষির।

সক্থি ও বাহুদ্বয়ে প্রতানবতী স্নায়ু। সমস্ত সন্ধিস্থানে বৃত্তাস্নায়ু। আমাশয়, পক্কাশয় ও বস্তিস্থানে শুষির (মধ্যেছিদ্রযুক্ত) স্নায়ু। পার্শ্ব, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, ও মস্তকে পৃথুলা স্নায়ু। *

কণ্ডরা।

ইহাও স্নায়ুর প্রকারান্তর মাত্র। মহৎ-স্নায়ু সমূহকেই কণ্ডরা বলা যায়। প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি কার্য্যে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। ইহার সংখ্যা ১৬ ষোড়শ। †

---

* মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরাস্নায়ুত্বমাপ্নুয়াৎ। শিরাণাং হি মৃদুঃপাকঃ স্নায়ূনান্তু ততঃ খরঃ। স্নায়বোবন্ধনানি স্যুর্দেহে মাংসাস্থিমেদসাং। সন্ধীনামপি যত্তাস্তু শিরাভ্যঃ সুদৃঢ়াঃ স্মৃতাঃ। * * শতানি নব জায়ন্তে শরীরে স্নায়বোনৃণাং। তাসাং বিবরণং ক্রমঃ শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ। শাখাসু ষট্‌শতানি স্যুঃ কোষ্ঠে ত্রিংশত্ শতদ্বয়ং। গ্রাবায়াং মূর্দ্ধদেশে তু স্নায়ূনাং সপ্ততিঃ স্মৃতাঃ। ইত্যাদি। (ভাবপ্রকাশঃ)।

* স্নায়ুচতুর্ব্বিধা বিদ্যাত্তাস্ত সর্ব্বা নিবোধমে। প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথুশ্চ শুষিরাস্তথা। প্রতানবত্যঃ শাখাসু সর্ব্বসন্ধিষু চাপ্যথ। বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ। আমপক্কাশয়ান্তেষু বস্তৌচ শুষিরাঃ খলু। পার্শ্বোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ॥ (সুশ্রুত)

† মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরাস্তাস্ত ষোড়শ। প্রসারণাকুঞ্চনয়োর্দৃষ্টস্তাসাং প্রয়োজনং। চতস্রো হস্তয়োস্তাসাং তাবন্ত্যং পাদয়োঃ স্মৃতাঃ গ্রীবায়ামপি তাবন্ত্যস্তাবন্ত্যঃ পৃষ্ঠসঙ্গতাঃ।

তত্র পাদহস্তগতানাং কণ্ডরাণাং নখাঃ প্ররোহাঃ গ্রাবানিবন্ধনানামধোভাগগতানাং প্ররোহো মেঢ্রং। পৃষ্ঠনিবন্ধনমাং প্ররোহাঃ নিতম্ব মূর্দ্ধোরুবক্ষোহক্ষস্তনপিণ্ডাঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

তন্মধ্যে হস্তদ্বয়ে ২। ২ হিসাবে ৪, পাদদ্বয়ে ৪, গ্রীবাতে ৪ এবং পৃষ্ঠে ৪।

হস্তপাদগত কণ্ডরার প্ররোহ নখ। গ্রীবানিবদ্ধ অধোভাগগত কণ্ডরার প্ররোহ মেঢ্র। পৃষ্ঠনিবদ্ধ কণ্ডরার প্ররোহ নিতম্ব, মস্তক, ঊরু, বক্ষঃ, স্তনপিণ্ড।

ধমনী।

ইহাও শিরাবিকৃতি। স্থূল শিরা সমূহই ধমনী নামে খ্যাত। যেমন পদ্মমৃণাল মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তদ্রূপ ধমনী মধ্যেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ইহার মূলস্থান নাভি। *

মূল ধমনীর সংখ্যা ২৪ চতুর্ব্বিংশতি। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগত ১০, অধোগত ১০, তির্য্যগ্গত ৪।

ঊর্দ্ধগত ধমনী সমূহ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভা (হাই), ক্ষব (হাচি), হাস্য, কম্প, বাক্য, রোদন ও গীতাদি বহন করে। এই ধমনীসমূহই হৃদয়গত হইয়া প্রত্যেকে তিনভাগে বিভক্ত হওত ত্রিশসংখ্যক হইয়াছে।

তন্মধ্যে বাতবাহিনী ২, পিত্তবাহিনী ২, কফবাহিনী ২, রক্তবাহিনী ২, রসবাহিনী ২। শব্দ, স্বাদ, রূপ ও গন্ধগ্রাহিণী ৮, বাগ্বাহিনী ২, শব্দকারিণী ২, নিদ্রাজননী ২, জাগরণকারিণী ২, অশ্রুবাহিনী ২, এবং স্ত্রীলোকের স্তন্যবাহিনী ও পুরুষের স্তনমূলে শুক্রবাহিনী ২। এই ধমনীসমূহই নাভির ঊর্দ্ধভাগে উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, স্কন্ধ, গ্রীবা ও বাহু ধারণ ও পোষণ করে। অধোভাগগত ধমনীসমূহ বাত, মূত্র, বিষ্ঠা, শুক্র ও আর্ত্তবশোণিত প্রভৃতিকে অধোদিকে বহন করে। নাভির অধোভাগগত এই ধমনীসমূহ পিত্তাশয় (অগ্ন্যাশয়) গত হইয়া প্রত্যেকে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ত্রিশসংখ্যক হইয়াছে।

তন্মধ্যে বাতবাহিনী ২, পিত্তবাহিনী ২, কফবাহিনী ২, রক্তবাহিনী ২, রসবাহিনী ২ স্থূল অন্ত্রপ্রতিবদ্ধ অন্নবাহিনী ২, জলবাহিনী ২, বস্তিগত মূত্রবাহিনী ২, স্ত্রীলোকের আর্ত্তববাহিনী ও পুরুষের শুক্রবাহিনী ২। স্ত্রীলোকের আর্ত্তবনিঃসারিণী ও পুরুষের শুক্রনিঃসারিণী ২। স্থূলান্ত্র প্রতিবদ্ধ মলনিঃসারিণী ২। এই দ্বাবিংশতি। এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ঠ ৮ টি ধমনী তির্য্যগ্গত ধমনীসমূহকে স্বেদাদি অর্পণ ক্রিয়া দ্বারা আনুকূল্য বিধান করে। এই অধোভাগগত ত্রিশসংখ্যক ধমনী নাভির অধোভাগস্থ পক্বাশয়, কটী, মূত্র, পুরীষ, পায়ু, বস্তি, মেঢ্র ও সক্থি প্রভৃতিকে ধারণ ও পোষণ করে।

তির্য্যগ্গত ধমনী চতুষ্টয় শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ইহার সংখ্যা অনির্ণেয়। এই ধমনীসমূহ দ্বারা সমস্ত শরীর সচ্ছিদ্র, জালযুক্ত গবাক্ষবৎ ব্যাপিত। এই ধমনীসমূহের মুখ প্রত্যেক রোমকূপ সংলগ্ন। ইহাদিগের মুখ দ্বারাই ঘর্ম্মনির্গত হয়। এবং ইহারাই চর্ম্মোপরিকৃত তৈলাদি অভ্যঙ্গ, পরিষেক, অবগাহন ও আলেপনাদির বীর্য্য

---

* ধমন্যোনাভিতোজাতাশ্চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যয়া। দশোর্দ্ধগা দশাধোগা শেষাস্তির্য্যগ্গতাঃ স্মৃতাঃ। তত্রোর্দ্ধগা ইত্যাদি। (ভাবপ্রকাশঃ)

যথাস্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষুচ। ধমনীনাং তথা খানি রসোযৈরুপচীয়তে। (সুশ্রুতঃ)

অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়। এবং ইহা দ্বারাই স্পর্শবোধ হইয়া থাকে।

স্রোতঃ। *

ইহাও এক প্রকার শিরাবিকৃতি। ইহা দ্বারা মনঃ, প্রাণ, অন্ন, পানীয়, বায়ু, পিত্ত, কফ, রসরক্তাদি ধাতু,উপধাতু, ধাতুমল,মূত্র, পুরীষ ও স্তন্য প্রভৃতি শরীরমধ্যে সঞ্চরণ করে। ইহা অসংখ্য। তন্মধ্যে প্রাণবহ ২, ইহার মূলস্থান হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনীসমূহ। অন্নবহ ২, ইহার মূলস্থান আমাশয় ও অন্নবাহিনী ধমনীসমূহ। জলবহ ২, ইহার মূল তালু ও ক্লোম স্থান। রসবহ ২, ইহার মূল হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনী। রক্তবহ ২, ইহার মূল যকৃৎ, প্লীহা ও রক্তবাহিনী ধমনী। মাংসবহ ২, ইহার মূল স্নায়ু, ত্বক্ ও রক্তবাহিনী ধমনী। মেদঃবহ ২, ইহার মূল কটী ও বৃক্কদ্বয়। মূত্রবহ ২, ইহার মূল বস্তি ও মেঢ্র। পুরীষবহ ২, ইহার মূল পক্বাশয় ও পায়ুস্থান। শুক্রবহ ২. ইহার মূল স্তন ও বৃষণস্থান (অণ্ডকোষ)। আর্ত্তববহ ২,ইহার মূল গর্ভাশয় ও আর্ত্তববাহিনী ধমনীসমূহ। †

জাল। ‡

ইহা নিরন্তর সূক্ষ্মরন্ধ্রবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ জালাকৃতি পটল (পড়্দা) বিশেষ। শরীর মধ্যে ইহার সংখ্যা ১৬ ষোড়শ। তন্মধ্যে শিরাজাল ৪, স্নায়ুজাল ৪,মাংসজাল ৪, অস্থিজাল ৪। ইহা মণিবন্ধ ও গুল্‌ফস্থানাশ্রিত। যথা—এক এক মণিবন্ধে ও এক এক গুল্‌ফে শিরাজাল ১,স্নায়ুজাল ১, মাংসজাল ১, অস্থিজাল ১।

রজ্জু। *

পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে বিস্তৃত চারিটি মাংসরজ্জু থাকে। ইহা দ্বারা পেশীসমূহের বন্ধনকার্য্য সম্পাদিত হয়।

সেবনী। (সেলাই) †

ইহা বিশ্লিষ্ট চর্ম্মদ্বয়ের সংযোগকারিণী, সংখ্যা ৭। তন্মধ্যে মস্তকে ৫। মেঢ্রে ১। জিহ্বাতে ১।

রন্ধ্র। ‡

শরীর মধ্যে ইহার সংখ্যা ৯। যথা নেত্রে ২, নাসিকাতে ২, কর্ণে ২, মুখে ১,পু-

* মনঃ প্রাণান্নপানীয়দোষধাতূপধাতবঃ। ধাতূনাঞ্চ মলামূত্রং মলমিত্যাদয়ঃ স্তনৌ সঞ্চরন্তি হি যৈর্ম্মার্গৈস্তানি স্রোতাংসি সঞ্জগুঃ। বহূনি তানি সংখ্যায় শক্যন্তেনৈব ভাষিতুং। (ভাবপ্রকাশঃ)

† তত্র প্রাণবহেদ্বেতয়োর্মূলং হৃদয়ং রসবাহিন্যশ্চধমন্য ইত্যাদি। (সুশ্রুতঃ)

‡ নিরন্তররন্ধ্রাণি করকলিতানি সমূহিতানিচ জালানীব জালানি। জালানিতু শিরাস্নায়ুমাংসাস্থ্যামুত্তবন্তিহি। তানি চত্বারি চত্বারি সর্ব্বাণ্যেব চ ষোড়শ॥ তানি মণিবন্ধগুল্‌ফ সংস্থতানি ইত্যাদি। (ভাবপ্রকাশঃ)

* মহত্যোমাংসরজ্জবশ্চতস্রঃ পৃষ্ঠবংশ মুভয়তঃ পেশীনিবন্ধনার্থং। দ্বে বাহ্যে আভ্যন্তরেচ দ্বে। (সুশ্রুতঃ)

† সপ্তসেবন্যঃ শিরসিবভক্তাঃ পঞ্চ জিহ্বাশেফসোরেবৈকাঃ তাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ শস্ত্রেণ। (সুশ্রুতঃ)

‡ শ্রবণনয়নবদনঘ্রাণগুদমেঢ্রাণি নবস্রোতাংসি নরাণাং বহির্ম্মুখানি এতান্যেবচস্ত্রীণাং অপরাণিচত্রীণি দ্বেস্তনয়োরধস্তাদ্রক্তবহঞ্চৈকং। (সুশ্রুতঃ)

রুষের মেঢ্রে ও স্ত্রীলোকের প্রস্রাবদ্বারে ১। পায়ুমার্গে (মলদ্বারে) ১।

এদদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের আরও তিনটি রন্ধ্র অধিক আছে, যথা—স্তনদ্বয়ে ২ ও যোনিমার্গে ১।

সন্ধি। *

সন্ধিদ্বিবিধ, চেষ্টাবন্ত ও স্থির। তন্মধ্যে সক্‌থিদ্বয়, বাহুদ্বয়, হনুদ্বয়, ও কটীদেশে চেষ্টাবন্তসন্ধি। তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে স্থিরসন্ধি।

শরীর মধ্যে অস্থিসন্ধি, পেশীসন্ধি, স্নায়ুসন্ধি, ও শিরাসন্ধি আছে। তন্মধ্যে পেশী, স্নায়ু ও শিরার সন্ধি অসংখ্য। অস্থিসন্ধির সংখ্যা ২১০। যথা—

এক এক পাদাঙ্গুলিতে ৩। ৩ হিসাবে ২৪। পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ২। ২ হিসাবে ৪। গুল্‌ফদ্বয়ে ২, জানুদ্বয়ে ২, বঙ্ক্ষণদ্বয়ে ২।

এক এক হস্তাঙ্গুলিতে ৩। ৩ হিসাবে ২৪, হস্তাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ২। ২ হিসাবে ৪, মণিবন্ধদ্বয়ে ২, কূর্পরদ্বয়ে ২, কক্ষধরদ্বয়ে ২।

কটীদেশে ৩, মেরুদণ্ডে বা পৃষ্ঠবংশে ২৪, পার্শ্বদ্বয়ে ২৪, বক্ষঃস্থলে ৮, গ্রীবাদেশে ৮, কণ্ঠে ৩, হৃৎপিণ্ড, ক্লোম ও ফুপ্‌ফুসনিবদ্ধ নাড়ীসংযুক্ত ১৮, দন্তমূলে ৩২, কণ্ঠমণিতে ১, নাসিকাতে ১, নেত্রকোষে ২, ভ্রূর উপরে ২, শঙ্খের উপরে ২, হনুদ্বয়ে ২, গণ্ডদ্বয়ে ২, কর্ণদ্বয়ে ২, শঙ্খদ্বয়ে ২, মস্তককপালে ৫, মস্তকে ১।

মর্ম্মস্থান। *

যেস্থানে অনেক শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধির সম্মিলন হইয়াছে, তাহাকে মর্ম্মস্থান বলাযায়। উহা পঞ্চপ্রকার যথা—

১। মাংসমর্ম্ম। ২ শিরামর্ম্ম। ৩ স্নায়ুমর্ম্ম। ৪ অস্থিমর্ম্ম। ৫ সন্ধিমর্ম্ম। তন্মধ্যে মাংসমর্ম্ম ১১ একাদশ। শিরামর্ম্ম ৪১ একচত্বারিংশৎ। স্নায়ুমর্ম্ম ২৭ সপ্তবিংশতি। অস্থিমর্ম্ম ৮ অষ্ট। সন্ধিমর্ম্ম ২০ বিংশতি।

মাংসমর্ম্ম—যথা

তলহৃদয় (হস্ততল ও পাদতল) ৪। ইন্দ্রবস্তি (জঙ্ঘার মধ্যস্থান ও প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থান) ৪। পায়ু ১। স্তনরোহিত (স্তনদ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগে দ্বিঅঙ্গুলি পরিমিত স্থান) ২।

শিরামর্ম্ম—যথা—

নীলা (কণ্ঠনালীর উভয়দিকস্থিত ৪টি ধমনী), মাতৃকা (গ্রীবার উভয়দিকস্থিত ৮টি, শিরা), শৃঙ্গাটক (নাসিকা, কর্ণ, চক্ষুঃ ও জিহ্বার সন্তর্পণকারিণী ৪টি শিরা), অপাঙ্গ, স্থপনী (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান), ফণ (নাসারন্ধ্রের উভয়দিকস্থিত শিরা), স্তনমূল (স্তন-

---

* সন্ধয়স্তু দ্বিবিধাশ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ। শাখাস্বহন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তস্তু সন্ধয়ঃ। শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াহি স্থিরাবুধৈঃ। সংখ্যাতস্তু দশোত্তরে দ্বেশতে। তেষাং শাখাস্বষ্টষষ্টিরেকোনষষ্টিঃ কোষ্ঠে গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং ত্র্যশীতিঃ। একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যামিত্যাদি × × × অস্থাস্ত সন্ধয়োহ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। পেশীস্নায়ু শিরাণাস্তু সন্ধি সংখ্যা ন বিদ্যতে। (সুশ্রুতঃ)

* সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ুসন্ধিমাংসাস্থিসম্ভবঃ। মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ। সপ্তোত্তরশতং সন্তিদেহে মর্ম্মাণি দেহিনাং। তান্যেকাদশ মাংসেস্যুরষ্টাবস্থিষু সন্তিহি। সন্ধীনাং বিংশতিস্তানি ইত্যাদি। (ভাবপ্রকাশঃ)

দ্বয়ের অধোভাগে দ্বিঅঙ্গুলপরিমিত স্থান), অপলাপ (স্কন্ধদেশের অধোভাগে ও পার্শ্বের উপরিভাগে যে স্থান), অপস্তম্ভ (বক্ষঃস্থলের উভয়দিকবর্ত্তি-বাতবাহিনী নাড়ীদ্বয়), হৃদয়, নাভি, পার্শ্বসন্ধি, উর্ব্বী (উরুর মধ্যভাগ), লোহিতাক্ষ (উর্ব্বীর ঊর্দ্ধভাগ ও বঙ্ক্ষণসন্ধির অধোভাগে উরুমূলে অবস্থিত), বৃহতী (স্তনমূল হইতে পৃষ্ঠবংশ পর্য্যন্ত)।

স্নায়ুমর্ম্ম। যথা,—

আণি (জানুর ঊর্দ্ধভাগে ত্রিঅঙ্গুলি পরিমিত স্থান), বিটপ (বঙ্ক্ষণ ও বৃষণের মধ্যভাগ), কক্ষধর (বক্ষঃস্থল ও কক্ষার মধ্যভাগ), কূর্চ্চ (অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যভাগের ঊর্দ্ধভাগ), কূর্চ্চশির (গুল্‌ফসন্ধির অধোভাগ ও মণিবন্ধের অধোভাগ), বস্তি, ক্ষিপ্র (অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যভাগ, স্কন্ধদেশ, বিধুর (কর্ণপৃষ্ঠের অধোভাগ), উৎক্ষেপ (শঙ্খস্থানের উপরিভাগ হইতে কেশান্ত পর্য্যন্ত)।

অস্থিমর্ম্ম। যথা,—

কটীকতরুণ ২ (পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে শ্রোণীকাণ্ডস্থ অস্থিদ্বয়), নিতম্ব ২। অংসফলক ২। শঙ্খস্থান ২।

সন্ধিমর্ম্ম। যথা,—

জানু। কূর্পর (কনুই), সীমন্ত (মস্তক মধ্যাস্থ ৫টি সন্ধি), অধিপতি (মস্তকের মধ্যস্থানস্থ রোমাবর্ত্ত), গুল্‌ফ, মণিবন্ধ, কুকুন্দর (নিতম্বের উপরে নাতিনিম্ন যেস্থান আছে) কৃকাটিকা (গ্রীবা ও মস্তকের সংযোগস্থান), আবর্ত্ত (ভ্রূর উপরিভাগ ও নিম্নভাগ)।

এই সমস্ত মর্ম্মস্থানের প্রতি অস্ত্রচিকিৎসকদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে বলিয়াই ইহার পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ এই সমস্ত মর্ম্মস্থান কোনরূপে আহত হইলে নানাবিধ অনিষ্ট হইতে পারে, এবং কোন কোন মর্ম্মস্থানে তীব্র আঘাত লাগিলে সদ্য প্রাণনষ্ট হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ।

শ্রীহঃ—

কৃষ্ণরাম দাস।

বঙ্গীয় সাহিত্য যতই পর্য্যালোচনা করা যায় ততই তাহার মধ্য হইতে নূতন নূতন অবশ্য-জ্ঞাতব্য নানাবিধ বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়; ততই নব নব কবির নূতন নূতন তান আমাদের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করে—কাহারও রচনাচাতুর্য্য—কাহারও ভাবমাধুর্য্য—কাহারও মনোহর শব্দবিন্যাস আমাদের কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিতে থাকে; বঙ্গীয় ভাষা একটি কুল কুল নিনাদিনী ধীরবাহিনী স্রোতস্বতী; দুর্গম গিরিগহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া নানাবিধ রমণীয় স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে—কোথাও বা সুন্দর স্বভাবজাত অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া আপনার মোহন নিনাদ

আপনিই শ্রবণ করিতেছেন; নিকটে কোন প্রাণীর সমাগম নাই—তরঙ্গ আপনার তটেই প্রতিহত হইতেছে—আপনার মোহন ধ্বনি আপনি শুনিয়াই মুগ্ধ হইতেছেন; যদি কেহ পথভ্রমে, কিংবা তৎস্রোতাভিমুখে গমন করিয়া সেই দুর্গম অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করেন তাহা হইলে তিনি সেই বিজন বনে—সেই গম্ভীর বিপিনে সেই বীণাঝঙ্কারবৎ মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইবেনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়জন সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, —কেই বা সেই বিনোদরব শুনিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন,—করিয়া ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদন করেন? দুই একজনকে তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত দেখা যায়; কিন্তু কই তাঁহারা ত কেহই দুর্গম অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন নাই; যতদূর সহজে যাওয়া যায় তাঁহারা ততদূর পর্য্যন্তই গিয়াছেন—যেস্থান হইতে যাহা দেখিবার তাহাই দেখিয়াছেন—কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকারময় নিবিড় কাননে প্রবেশ করিতে কেহই সাহসী হন নাই—সেই কানন কিরূপ তাহা তাঁহারা অবগত নহেন;—তাঁহারা কেবল বহুদূর হইতে সেই কষ্টপ্রবেশ্য বিজন বনের সীমান্ত রেখা দর্শন করিয়াছেন মাত্র—করিয়া তাহাতেই প্রীত হইয়াছেন—তাহাতেই মুগ্ধ হইয়াছেন; আর অধিক দেখিবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই বন বিজন হইলেও হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল নহে—ইহাতে নানাবিধ সুন্দর মহীরুহ আছে—সুন্দর বিহঙ্গকুল সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে; দেখিতে আরও সুন্দর আরও মনোহর; ইহাতে অনুসন্ধিৎসুগণের ভয়ের কোন কারণই নাই। তবে বিস্তৃত অরণ্যানী তাহাতে মনুষ্যের গমনাগমন নাই, সুতরাং নানাপ্রকার আগাছা ও কণ্টকতরু জন্মিয়া তাহার পথ আরও দুষ্প্রবেশ্য করিয়াছে; প্রবেশ করিতে হইলে সময়ে সময়ে সেই সকল কণ্টকে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে পারে; সুতরাং এই সামান্য যন্ত্রণার জন্য অনেকে তৎপ্রবেশ সুখকর বিবেচনা করেন না। কিন্তু তাহার মধ্যে একবার কোন রূপে প্রবেশ করিতে পারিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা হইবেনা—অধিক অগ্রসর হইতে ইচ্ছা জন্মিবে; সেই স্থান তখন সুখময় শান্তিনিকেতন বলিয়া জ্ঞান জন্মিবে; একে সেই নিবিড় বন স্বভাব-জাত বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ, তাহাতে সেই ধীরবাহিনী প্রবাহিণীর মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতধ্বনি,—কেনা তাহাতে প্রীত হইবেন,—কাহার না হৃদয়ে আনন্দস্রোত বহিতে থাকিবে! বলিয়াছি বঙ্গীয় সাহিত্য এইরূপ কুল কুল নিনাদিনী নাতিবেগশালিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী; ইহার উত্তাল তরঙ্গমালা নাই, গম্ভীর নির্ঘোষ নাই, প্রবল ঘূর্ণীবারি নাই; ইহার তরঙ্গ অতিধীর, নির্ঘোষ শ্রবণ-সুখকর রমণীয় গীতি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ইহার গিরিগহ্বর; কাশীরাম, কৃত্তিবাস ইহার তটস্থিত পুণ্যতীর্থ; মুকুন্দরাম, ঘনরাম, রূপরাম, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম, রঘুনন্দন, ইহার তীরস্থিত সেই স্বভাব-জাত-বৃক্ষপরিপূর্ণ দুষ্প্রবেশ্য অরণ্যানী; রামপ্রসাদ ইহার স্বভাবের বৈচিত্রতাময় সুন্দর গণ্ডগ্রাম; ভারতচন্দ্র রমণীয়কারুকার্য্যখচিত সুরম্য হর্ম্ম্যমালা-সম-

ম্বিত মনোহর নগর; এবং অধুনাতন কবিগণ ইহার সমুদ্রসঙ্গম স্থল; কোথায় ইহার অন্ত হইবে কে বলিতে পারে।—এক্ষণে অনন্ত সমুদ্রসহ মিশ্রিত হইতে চলিল, আমরা ইহার তটস্থিত সেই অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেদিন ঘনরামকে পাঠক সমক্ষে ধরিয়াছি; অদ্য কৃষ্ণরামকে লইয়া তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত।

আমরা অদ্য শীর্ষদেশে যাঁহার নাম প্রদান করিয়াছি, সেই কৃষ্ণরাম দাস একজন সামান্য কবি নহেন; কিন্তু ইনি অনেকেরই নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত—তাঁহার কৃত গ্রন্থ অনেকেরই অপঠিত। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। আমরা অধুনা কোন কবির একটি সামান্য কবিতা মাত্র পাঠ করিলেও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকি; কিন্তু এরূপ গ্রন্থ অপঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেনাপতি উল্ফ্ (General Wolfe) কুইবেকের যুদ্ধের পূর্ব্বদিন ইংরাজী কবি গ্রে প্রণীত এলিজি (Elegy written in a country church yard) নামক কবিতাটি পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, কল্য যুদ্ধে শত্রু দিগকে জয় করা অপেক্ষা এরূপ কবিতার রচয়িতা হওয়া আমি অধিক শ্লাঘনীয় বিবেচনা করি; উঃ কবিগণের কি উচ্চ আসন—তাঁহাদের সিংহাসন কি মহান্—ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত রাজপুরুষ বা বলদর্পিত সেনাপতি সকলেই এই শ্লাঘনীয় আসন প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। আবার কি পরিতাপের বিষয় এই সুধাসম আসন যাঁহারা অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক্ষণেও সাধারণে অপরিচিত, তাঁহাদের নাম অশ্রুত। কৃষ্ণরাম সম্বন্ধেও তাহাই, তাঁহার কৃত বিদ্যাসুন্দর এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। পাঠক, আমরা দুইখানি বিদ্যাসুন্দরেরই পরিচয় জানিতাম; প্রথম ভারতচন্দ্রের ও দ্বিতীয় রামপ্রসাদের কৃত; কিন্তু তাহাই সম্পূর্ণ নহে। বঙ্গ ভাষায় আরও দুইখানি বিদ্যাসুন্দর আছে। ইহার এক খানি কৃষ্ণরাম প্রণীত ও অপর খানি প্রাণরাম চক্রবর্ত্তিবিরচিত। তাহা হইলেই সর্ব্ব সমেত চারি খানি বিদ্যাসুন্দর বর্ত্তমান আছে। হয়ত আরও আছে, আমরা তাহার কোন সংবাদই জানি না; তবেই পাঠক, দেখুন দেখি আমাদের অনুসন্ধান কত সামান্য, কত অকিঞ্চিৎকর। অদ্য আমরা কৃষ্ণরাম-বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বলিব; প্রাণরামের পুস্তক সম্বন্ধে পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর তৎপ্রণীত কালিকামঙ্গল নামক গ্রন্থের অন্তর্গত; ভারতচন্দ্রেরও এইরূপ অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত; প্রাণরামের সুন্দরও তাঁহার প্রণীত কালিকামঙ্গলের অন্তর্নিবিষ্ট, কৃষ্ণরামের গ্রন্থের প্রথমেই গণেশ-বন্দনা। যথা,—

'নমো গণেশায়।
সর্ব্বগত মহামতি, স্থূল তনু খর্ব্ব অতি
প্রণমহ দেবগণরায়।
স্তুতি করি করপুটে, ভরসা মঙ্গল ঘটে,
পতিত পাবন বরদায়॥' ইত্যাদি

তৎপরে নানা দেবদেবীর বন্দনা আছে। এই সমুদায় বন্দনা পরিসমাপ্তির পর বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। যথা;—

'সুন্দর সুন্দর নাম রাজার নন্দন।
পূজিয়া পরমদেবী করিল গমন॥
স্বপনে শিবার কথা সত্য মনে লয়।
পাইব রমণীমণি আনন্দ হৃদয়॥
জনকেরে না কহিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কাব্যশিরোমণি॥'
ইত্যাদি।

এইস্থলে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে ইহা কিছু বিভিন্ন হইতেছে; কৃষ্ণরামের সুন্দর স্বপ্নে দেবী কালীর আদেশ পাইয়া বিদ্যা লাভার্থ জনক জননীকে কিছুই না বলিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু ভারতচন্দ্রের সুন্দর বীরসিংহ-প্রেরিত ভাটের নিকট হইতে সমুদায় বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং বিরলে তাহার নিকট হইতে বিদ্যার সমাচার পাইয়া জনক জননীকে না বলিয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে প্রস্থান করেন; ভারতচন্দ্রের সুন্দর ছয় মাসের পথ ছয় দিনে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণরামের সুন্দর সেরূপ সুবিধা পান নাই;—তাঁহাকে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; কেন না কালিকা-দেবী তাঁহার প্রতি সুন্দরের কি প্রকার ভক্তি অবগত হইবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া নানাবিধ দুর্গম বন, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুন্দর যাইতেছেন; সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর নদী; নদী পার হইবার কোন উপায় নাই, তিনি ভাবিতে আছেন, এমন সময়ে একজন ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন কালী মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, শিবমন্ত্র গ্রহণ করুন; তাহা হইলে আপনার সকল কার্য্যই শিবময় হইবে; সুন্দর কালীমন্ত্র ত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, মায়ানদী ইত্যাদি অন্তর্হিত হইল—এবং তৎক্ষণাৎ

'হইল আকাশবাণী শুন কবিবর।
কুতূহলে যাও বীরসিংহের নগর॥

সুন্দর গন্তব্য স্থানের অনুসরণ করিলেন; এবং নির্ব্বিঘ্নে অভিলষিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; পথের এরূপ ঘটনা আর কোন বিদ্যাসুন্দরে নাই।

তৎপরেই পুরপ্রবেশ; পুরপ্রবেশ করিলে ভারতচন্দ্র যেরূপ তাহার বর্ণন ও রক্ষিগণের বিবরণ দিয়াছেন, কৃষ্ণরামও সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; এবং এ বিষয়ে উভয়ের বর্ণনা প্রায় একই প্রকার। আমরা এই স্থলের বর্ণনা উভয় গ্রন্থ হইতেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

'প্রথম গড়েতে কালা গোরের নিবাস।
ইঙ্গরাজ, ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি, ফরাস॥
দিনামার, এলামান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ, মল্লিক, সেখ, মোগল পাঠান॥'
ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর।

'ঠাঁই ঠাঁই দেখে তথা, বুরুজে কামান পাতা,
দশ বারো সের ধরে গুলি।
থাকে দিবা বিভাবরী, বাহিরে বিক্রম করি,
পরিচ্ছদ নানা অস্ত্রশালী॥
উড়ে কত লাল বনা, প্রথমে পাঠান সেনা;
খোরাসানী মোগল সকল।
সোণার বরণ তনু, গোঁপ দাঁড়ী শোভে জনু,
মেরুশৃঙ্গে বাঁধিল চামর।' ইত্যাদি

কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর।

তাঁহার পরে সুন্দরের কদম্ব তরুর মূলে বিশ্রাম; এবং তাঁহার অনুপম রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া নারীগণের আপনাপন পতিনিন্দা উভয়েই বর্ণন করিয়াছেন; তবে কৃষ্ণরামের রচনা অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের রচনায় কিঞ্চিৎ রসবাহুল্য; তৎপরেই মালিনী-সাক্ষাৎ; কৃষ্ণরামের মালিনী হীরা নহে,—ইহার নাম বিমলা।

ভারতচন্দ্রের হীরা বৈকালী ফুল তুলিতে আসিয়া দূর হইতে হঠাৎ সুন্দরকে দেখিয়া ফেলে; তাঁহার বিষয়ে পূর্ব্বে আর কাহারও নিকট হইতে শ্রবণ করে নাই। যথা—

'মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সে পাড়া॥
হেরিয়া হরিল চিত বলে হরি হরি।
কাহার বাছনি রে নিছনি লয়ে মরি॥'
ইত্যাদি।

'কিন্তু কৃষ্ণরামের বিমলা পূর্ব্বেই লোকমুখে সুন্দরের আগমনবার্ত্তা পাইয়াছিল। যথা;—

'মালিনী বিমলা নাম,গিয়াছে বিদ্যার ধাম,
দিতে পুষ্প যোগান নিয়ম।
সদনে আসিতে সুখে,শুনিল লোকের মুখে,
তরুতলে রূপ মনোরম॥' ইত্যাদি।

কবিরঞ্জনের হীরাও এইরূপ লোকমুখে প্রথমে সুন্দরের পরিচয় পাইয়াছিল। যথা—

'মালাকার দারা হীরে,পুষ্প দিয়া ঘরে ফিরে,
যেতে পথে শুনে লোকমুখে॥'
ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের হীরা অধিক বুদ্ধিসম্পন্না, সুচতুরা; ছল করিয়া আপনার মনোভাব গোপন করিতে জানে; কিন্তু কবিরঞ্জন বা কৃষ্ণরামের মালিনী তেমন নহে। গুণাকরের হীরা সুন্দরকে দেখিয়া আপনা ভুলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনার মনের ভাব অধিক প্রকাশ করে নাই। এদিকে কবিরঞ্জন ও কৃষ্ণরামের মালিনী সুন্দরকে দেখিয়াই আপনা ভুলিয়া তাহাদের মনে যাহা ছিল,তাহাই তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিল।—বিদ্যাসংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ই অজিজ্ঞাসিত হইয়াও অম্লানবদনে সেই তরুতলেই বলিয়া ফেলিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের হীরা কেমন উপযুক্ত সময়ে, কেমন চতুরতা সহকারে তাহা ব্যক্ত করিয়াছে। কৃষ্ণরামের সুন্দর এই কদম্বতলেই

'প্রতিজ্ঞা করিল এই নৃপতির বালা।
যেজন বিচারে জিনে তারে দিবে মালা॥'
ইত্যাদি।

বিদ্যাসংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ই অবগত হইয়া পরে বিমলা মালিনীর আবাসগৃহে উপনীত হইলেন; আমাদের বিবেচনায় এই স্থলে গুণাকর যথার্থ-ক্ষমতা দেখাইয়াছেন ও তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কৃষ্ণরামের সুন্দর বিমলার গৃহে আসিয়াই নদীতীরে কালীপূজা করিতে গিয়াছিলেন; তৎপরে পুষ্পময় শ্লোক রচনা, মাল্য গ্রন্থন ইত্যাদি। সুন্দর মালিনীকে হাটে প্রেরণ করিয়া নিজে মালা গাঁথিতে বসিলেন, পরে বেশাতির হিসাব; গুণাকরে এই বেশাতির হিসাব ইহার অনেক পূর্ব্বে আছে; এই স্থলের রচনা উভয়ের প্রায় একই প্রকারের। আমরা উভয় হইতেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।—

'আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।

অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আনি চিনি॥
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥'
ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর।

'অগুরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে।
চক্ষু ঠিকুরিয়া যায় আছে কি পাইতে॥
জায়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই।
আনিয়াছি কিন্তু কিছু, আমি বলি তাই॥'
ইত্যাদি।
কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর।

তৎপরে সুন্দররচিত মালা লইয়া বিমলার বিদ্যার মন্দিরে গমন; সুন্দরের পরিচয় প্রদান ও বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শনের পরামর্শ ইত্যাদি বর্ণিত আছে; তাহা ভারতচন্দ্রের বর্ণনার মত মনোহর না হইলেও অপ্রাতিকর নহে। তৎপরে সুড়ঙ্গ খনন; উভয়েরই কালীর প্রসাদে; সে স্থলের রচনা এইরূপ;—

'হইল আকাশবাণী সদয়া অভয়া।
সুখে গিয়া কর বিভা রাজার তনয়া॥
বিদ্যার মন্দির আর বিমলার ঘর।
হইল সুড়ঙ্গ পথ অতি মনোহর॥
চন্দ্রকান্ত মণি কত জ্বলে ঠাঁই ঠাঁই।
রজনী দিবার পর অন্ধকার নাই॥'
ইত্যাদি, কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর।

ইহার পরেই বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের তথায় উপস্থিত; তৎপরে পরিচয় ও বিচার। পরস্পর সাক্ষাতের পরেই নানাপ্রকার কথোপকথন হইতেছিল—উভয়েই কি করেন মনে মনে আঁচাআঁচি করিতেছিলেন এমন সময়

'গিরি মাঝে দৈব যোগে
ময়ূর ডাকিল হেন কালে॥' কৃষ্ণরাম

বর্ত্তমান রাজবাটীর নিকটে গিরিশিখরে শিখীর কেকারব অপ্রাসঙ্গিক; কেন না বর্দ্ধমানে কোন পর্ব্বত বা শিখর নাই; তবে কৃষ্ণরাম এই পর্ব্বতের অস্তিত্ব কোথা হইতে সূচনা করিলেন। সুন্দর এই স্থলের প্রশ্নের যে সংস্কৃত উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে পর্ব্বতের উপরে শিখী ডাকিতেছে এইরূপ থাকায়, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-সময়ে (সেই সংস্কৃত উত্তরের অনুরোধে) 'হেন কালে পর্ব্বত-শিখরে শিখী ডাকিল,' এইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। সুন্দরের উত্তর সেই সংস্কৃত শ্লোক এইরূপ;—

'গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাং।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥'

এইরূপ আর একটি উত্তর আছে, তাহাতেও এই পর্ব্বতশিখরের উল্লেখ আছে। কবিরঞ্জনও এইজন্য এইরূপে পর্ব্বতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। যথা;—

'হেনকালে পর্ব্বত শিখরে শিখী ডাকে॥
হাস্যযুতা সখী প্রতি কহে কমলিনী।
সুলোচনা! সুধাও কিসের রব শুনি॥'

ভারতচন্দ্রও এই সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সময়ে পর্ব্বতের উপরে ময়ূর ডাকিল এরূপ লেখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন;—

'হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহ পাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে।

প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরে এইস্থলে ভারতচন্দ্রেরই অনুসরণ করিয়াছেন। যথা;—

'বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাড়িল আহ্লাদ।
হেনকালে ময়ূর করিল কেকানাদ॥
সুন্দর কেমন কবি বুঝিতে পদ্মিনী।
সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে সজনী॥'

তদনন্তর গান্ধর্ব্ববিবাহ, ইত্যাদি প্রায় সকলেই একই প্রকার লিখিয়াছেন। তৎপরে গর্ভপ্রকাশ ও চৌরধরণ; চৌরধরণ বৃত্তান্ত ভারতচন্দ্রে কিরূপ তাহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু কৃষ্ণরাম, কবিরঞ্জন ও প্রাণরামের চোরধরা পালা স্বতন্ত্র ও তিনজনেরই এক প্রকার। তাহা এইরূপ—বিদ্যার মন্দিরে সিন্দূর লেপন করিলে তদ্রাগে রঞ্জিত বসন রজকালয়ে প্রাপ্ত হইয়া চোরধরা হইল। কৃষ্ণরাম চোর ধরিবার আর একটি কৌশল বিস্তার করিয়াছিলেন; যথা—কোটাল কলাবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণতনয়াকে ঔষধপ্রদানভাগে বিদ্যার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া তাঁহার নিকট হইতে সমুদয় রহস্য প্রাপ্ত হইবার জন্য পাঠাইয়া দেয়; কিন্তু বিদ্যা তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন। সুতরাং কোটাল তাহাতে বিফলমনোরথ হয়। কবিরঞ্জনও এইরূপ বিদ্যু ব্রাহ্মণীকে বিদ্যার মন্দিরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রজকগৃহে বস্ত্র ধরিয়াই মালিনীর গৃহে চোরের সন্ধান, তৎপরে তথা হইতে সুড়ঙ্গপ্রকাশ ইত্যাদি ঘটনাগুলি সকল বিদ্যাসুন্দরেই প্রায় একরূপ। তবে কৃষ্ণরামের সুন্দরকে একবার নারীবেশ ধরিয়া আপনাকে গোপন করিতে হইয়াছিল, এইটিই অধিক।

কৃষ্ণরাম-প্রণীত বিদ্যাসুন্দরের স্থূল বৃত্তান্ত পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলাম; এক্ষণে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

এইবার আমরা মহা গোলযোগে পতিত হইলাম; তিনি গ্রন্থমধ্যে কোথাও তাঁহার বিশেষ বিবরণ দিয়া যান নাই। কৃষ্ণরাম কোন্ সময়েই বা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন সুন্দর উপায় নাই। তিনি কোন রাজার নাম পর্য্যন্তও স্বীয় গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করেন নাই যে, তাঁহার সময় ধরিয়া তাঁহার সময়ের কথঞ্চিৎ নির্ণয় হইবে। কেবল তাঁহার বাসস্থান কোথা ছিল, তাহা একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন ও একস্থলে তাঁহার পিতার নামও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা;—

'নিমতা গ্রামেতে বাস, নামে ভগবতী দাস,
কায়স্থ কুলেতে উৎপত্তি।
হইয়া যে একচিত, রচিল কালীর গীত,
কৃষ্ণরাম তাঁহার সন্ততি॥'

ইহাতে জানা যাইতেছে তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন; ভগবতী দাস তাঁহার পিতা এবং নিমতা গ্রাম তাঁহার বাসস্থান ছিল। এই নিমতা কোথায় তিনি তাহা ও একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা;—

'ভাগিরথী পূর্ব্বকূলে ডাকপাক নাম।
কলিকাতা, বন্দিনু নিমতা যথা ধাম॥
ভবানীর পাদপদ্ম হৃদে সদা ভাবি।
রচিল পাঁচালী ছন্দে কৃষ্ণরাম কবি॥'

তাহা হইলেই নিমতা গ্রাম ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে—কলিকাতার নিকট। বরাহনগর নামক উপনগর কলিকাতার সন্নিহিত এবং বরাহনগরের ঠিক্ পূর্ব্বদিক সংলগ্ন নিমতা গ্রাম; এই গ্রামই আমাদের কবির

জন্মস্থান। পূর্ব্বতন কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহই আপনার সুন্দর পরিচয় প্রদান করেন নাই, সুতরাং আমাদিগকে নানা প্রকার গোলযোগে পতিত হইতে হইয়াছে। আমরা যত কবি দেখিয়াছি তন্মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এমন আর কেহই করেন নাই। তন্মধ্যে কবিকঙ্কণ আপনার দেশের অবস্থা ও কবিরঞ্জন আপন পরিবারের অবস্থা সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন; রামপ্রসাদ, পরিবারের যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এত পরিষ্কার যে এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। দুঃখের বিষয় অন্য কোন কবিই সেরূপ করেন নাই।

'ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মুল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট, শান্ত, দয়াবন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী।।
সেই বংশ সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয়।।
তদগ্রজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর, কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া।।'

কবিরঞ্জন-বিদ্যাসুন্দর।

ইহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বর্ণনা; অন্যস্থলে,—

'জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ-লক্ষ্মীদেবী।
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি।।
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মী নারায়ণ-দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস।।
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ, কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম।।
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা।।
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তাঁরে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা।।
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া।।'

অন্যস্থলে,—

'শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ সুতা।'

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর।

পাঠক ইহাতেই দেখিবেন কবিরঞ্জন কেমন সুন্দর রূপে আপনার পরিবারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, অপর কোন কবিই এরূপ করেন নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক কৃষ্ণরাম কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; তিনি স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে কোন স্থানেই কোন প্রকার শক কিংবা কোন রাজা বা প্রবল জমীদারের নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করেন নাই। আমরা মুসলমান শাসন-সময়ের যত কবি দেখিতে পাই তাঁহারা প্রায় সকলেই কোন না কোন রাজা বা কোন প্রবল জমীদারের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ দেখি। সুতরাং তাঁহারা নিজ গ্রন্থ মধ্যে কোন প্রকার শকের উল্লেখ না করিলেও সেই কবির আশ্রয়স্থানীয় রাজা বা জমীদারের সময় ধরিয়া তাঁহাদের সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে; এবং সে প্রকার নির্ণয় সর্ব্বথা ভ্রমসঙ্কুল না হইতেও পারে। রাম-

প্রসাদ আপনার গ্রন্থমধ্যে পরিবারের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন শকের উল্লেখ করেন নাই; অথচ তাঁহার আশ্রয়-স্থানীয় রাজার নাম অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ধরিয়া লইলেই তাঁহার সময়ের অনেকটা নিরূপণ হইল। কিন্তু কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে তাহার কোন সুযোগই পাওয়া যাইতেছে না; নিম্‌তা গ্রামে অনুসন্ধান করিলে, তাঁহার নাম পর্য্যন্তও শুনা যায় না; কিংবা সঠীক কোন সংবাদই প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তবে ইহার উপায় কি? পাঠক, একটি অপ্রশস্ত উপায় আছে, সেইটি একবার দেখুন; প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রণীত কালিকা মঙ্গলের একস্থলে লিখিয়াছেন;—

'বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিম্‌তা যাঁর বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রাম প্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা মঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥'

প্রাণরাম বিদ্যাসুন্দর।

তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইতেছে বিদ্যাসুন্দর রচনার প্রাধান্য কৃষ্ণরামের; কারণ তিনিই প্রথমে বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন করেন; তাঁহার পরে রামপ্রসাদ ও পরিশেষে ভারতচন্দ্র। ইহা যদি গণ্য করিতে হয় তাহা হইলে ইহাও স্বীকার্য্য যে কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বসাময়িক কবি। ভারতচন্দ্র ১৬৭৪ শকে বা ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্নদামঙ্গল রচনা সমাপ্ত করেন; তাহা হইলে কৃষ্ণরাম এই সময়েরও পূর্ব্বে আপনার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। অথবা ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে ও কৃষ্ণরাম তাহার প্রথম সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এইরূপ হইতেছে। কৃষ্ণরাম যে সময়ে জীবিত ছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় হয়ত সে সময়ে দেশবিখ্যাত হন নাই, কিংবা দেশীয় কবিগণের সমাদর করিতে তখনও আরম্ভ করেন নাই—কেন না তাহা হইলে কবি কৃষ্ণরাম কখনই তাঁহার সুনাম আপনার গ্রন্থে সংযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিত হইবার সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না;—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অকলঙ্ক নাম আপনার গ্রন্থে সংযুক্ত করিয়া পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিতেনই সন্দেহ নাই। আবার এদিকে গুণগ্রাহী, রাজা কৃষ্ণরামের মত কবি প্রাপ্ত হইলে কখনই তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেন না, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা অবশ্যই করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বা তাঁহার সভায় কোন কৃষ্ণরাম কবির অস্তিত্ব দেখিতে পাই না। ইহাতেই বিশেষরূপে অনুমিত হইতেছে যে, কৃষ্ণরাম, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না; তিনি কাহারও আজ্ঞায় পুস্তক রচনা করেন নাই, তাহা কৃষ্ণরাম একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা;—

নিম্‌তা নামেতে গ্রাম।
বৈকুণ্ঠ সমানধাম।
স্বপনে যেমন,　　　কহিলা তেমন
রচিল কিষণরাম॥

তাহা হইলেই তিনি কাহারও আজ্ঞায় ইহা রচনা করেন নাই; স্বপ্নের আদেশে রচনা করিয়াছেন মাত্র। কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে আর

সুন্দর বৃত্তান্ত কোন ক্রমেই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না; যদি কখন তাহা লাভে কৃতকার্য্য হই তাহা হইলে পুনরায় তৎসমস্ত পাঠকসমক্ষে উপস্থিত করিব ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

বিবিধ

প্রণয়ের ইজারা।

A Question of Law.

এ পৃথিবীতে প্রণয়ের কায়েমী পত্তন অর্থাৎ স্থায়ী বন্দোবস্ত বড় অল্প দৃষ্ট হয়। তাদৃশ প্রণয়ের দাতা ও গৃহীতা,—মালিক ও দখলকার উভয়ই সৌভাগ্যবান্। সাধারণতঃ সর্ব্বত্র যে প্রণয় দৃষ্ট হইয়া থাকে,তাহা প্রণয়ের ইজারা মাত্র। যেমন ইজারা মহাল বৎসরে বৎসরে অথবা দু চারি পাঁচ বৎসরের অন্তরে নূতন বন্দোবস্তের অধীন হয়, ঐরূপ প্রণয় মহালেরও বৎসরে বৎসরে, অথবা দু চারি পাঁচ বৎসর পরে নূতন পত্তন হয়,—এবং ইজারার বিলি বন্দোবস্তে যে সকল নিয়ম দেখা যায়, প্রণয়ের বিলি বন্দোবস্তেও ঠিক্ সেই সকল নিয়মই অবলম্বন করা হয়।

ইজারা বন্দোবস্তের এক নিয়ম ডাকপত্তন। মালিক কিংবা মালিকের প্রতিনিধি মহালের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া নিলাম ডাকিতে বসেন,—এবং যে আসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মূল্য ডাকে, তাহার নিকটই মহাল পত্তন করেন। প্রণয়-মহালেরও এইরূপ। সেখানেও মালিক কিংবা মালিকের কোন ঘনিষ্ঠ স্বজন ঐরূপ নিলাম ডাকিতে থাকেন; এবং যে ব্যক্তি সাহস করিয়া সকলের উপর উচ্চ ডাক দেয়, তৎকালের জন্য তাহার হাতেই মহাল তুলিয়া দেন। নয়সো রূপায়া এক,—নয়সো রূপায়া দো,—দেখ যায়;—বড় সস্তা যায়;—এইরূপ অল্প জমায় প্রণয়ের এমন মহাল আর পাইবে না,—নিবে ত এই বেলা নেও,এমন সুখের মহাল সকল সময়ে ঘটিবে না,—এইরূপে ডাক হইতে থাকে এবং যে আসিয়া 'নয়সো রূপায়া তিন' বলে, সেই মহালের দখলকার হইয়া বসে।

নয়সো রূপায়া একটা কথার কথা; কিন্তু ফল কথা এই যে, যেমন কোন না কোন রূপ সেলামি বিনা সায়র মহালের পত্তন হইতে পারে না, সেইরূপ কোন না কোন রূপ সেলামি বিনা প্রণয়ের ইজারা মহালেরও পত্তন হয় না। প্রভেদ যাহা কিছু দৃষ্ট হয়,তাহা সেলামির প্রকার-ভেদে। কোন মহালের সেলামি পাঠা কলা, কোন মহালের সেলামি পাদ-লেহন;—কোন মহালের সেলামি স্তুতির ভেট, কোন মহালের সেলামি স্বর্ণাভরণ। মাতালের প্রণয় পাট্টা করিলে ইজারার সেলামি মদ, এবং গেঁজেলের প্রণয় পাট্টা করিলে ইজারার সেলামি গাঁজা। আর, সরল-মতি শিশুদিগের প্রণয় মহাল ইজারা লইলে সেখানকার সেলামি

মধুর কথা, মিঠাই মণ্ডা, অথবা দুই একখানি মনোহর খেলেনা। এই শেষোক্ত মহালে মুনাফার অতি অল্প প্রত্যাশা থাকিলেও ঝঞ্ঝাট বড় কম এবং কোন রূপ জ্বালা যন্ত্রণা ও বাজে জমা নাই।

ইজারা বিলির আর এক নিয়ম কর্ণাকর্ণি। মালিক মহালের ডাক করিতে সাহস পান না, এই জন্য প্রার্থীদিগের সহিত কর্ণাকর্ণি করেন; এবং কে কত বেশী বলে, তাহা কর্ম্মচারীর মুখে গোপনে শুনেন। তৃতীয় নিয়ম ধ'রে গছানো। মহালে কোন রূপ খুঁত কি খতরা আছে; কেহ প্রকাশ্য রূপে মহাল ডাকে না, গোপনেও নিতে চায় না। এইরূপ স্থলে মালিক আপনিই প্রার্থী হইয়া,—সেলামি ও মালিকানার মাত্রা কমাইয়া, কোন না কোন ব্যক্তিকে কিছুকালের জন্য মহাল গছাইয়া দেন। প্রণয়ের ইজারাতেও এই দুই নিয়মের প্রচলন আছে। ইহাতেও স্থলবিশেষে ঐপ্রকার কর্ণাকর্ণি হয়, এবং স্থলবিশেষে ঐরূপ ধ'রে গছানো দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দিকেই যেরূপ নিয়ম খাটাও, প্রণয়ের ইজারা বিলি মালিকের যেমন অনিষ্টকর, ইজারাদারেরও তেমনই ক্ষতিকর। জমা জমির ইজারাতে ইজারার মূল জিনিসটা পুনরায় প্রায় পূর্ব্বের অবস্থাতেই ফেরত পাওয়া যায়। প্রণয়ের ইজারার মূল জিনিসটা হৃদয়; হৃদয়টিকে ইজারার ম্যাদের পর ঠিক্ পূর্ব্বের অবস্থায় পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। কোন ইজারাদার উহাতে একটুকু কালি ঢালিয়া দেয়, তাহা আর উঠে না; কেহ উহার ফুলের বাগান বিনাশ করিয়া আপনার প্রয়োজনে কাঁটাবনের সৃষ্টি করে, তাহার আর উন্মূলন হয় না। সুতরাং মালিক শেষে মহাল লইয়া বিপদে পড়েন। ইজারাদারের অনিষ্ট ইহা অপেক্ষাও অধিক। তুমি ইজারাদার, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পাঠা কলা যোগাইতেছ, কিংবা মনুষ্যত্বের সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি দিয়া পাদ-লেহন করিতেছ। কিন্তু মহাল যে দুদিন পরেও তোমার হাতে থাকিবে, তাহা কে বলিতে পারে?—তুমি ইজারাদার, মালিকের মন পাইবার জন্য, কখনও বানর সাজিয়া নৃত্য করিতেছ, কখনও বিদূষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কান্নার কথায়ও খিল খিল করিয়া হাসিতেছ,—কখনও স্তুতির ভেট মাথায় লইয়া দ্বারে পড়িয়া রহিয়াছ, কখনও ভেটের নৌকায় জাতি-মান ও কুল-ধর্ম্ম প্রভৃতি তোমার যাহা কিছু ছিল, তাহা বোঝাই করিয়া ঘাটে পড়িয়া আছ। কিন্তু মহাল যে দুমাস পরেও তোমার হাতে থাকিবে, তাহার বিশ্বাস কি? এমন অবস্থায় ঐ পাদ-লেহন প্রভৃতি শোবনী ক্রিয়া এবং সর্ব্বস্ববিক্রয়ই কি তোমার শেষ দক্ষিণা নহে? দেখ কত লোক ঐরূপ ইজারা লইয়াছে এবং ইজারাদারি করিয়া পরিশেষে দেউলিয়া বনিয়াছে ও কেইল হইয়াছে। তোমার কি দেউলিয়া বনিতে ও একবারে কেইল হইতেও দুঃখ কিংবা লজ্জা ভয় হয় না?

এই ভবের হাটে সময়ে সময়েই এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, অমুকের সহিত অমুকের পূর্ব্বে বড় প্রণয় ছিল, এইক্ষণ সে প্রণয় বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু যাঁহারা

রিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্, তাঁহারা এইরূপ সংবাদে বিস্মিত হন না। তাঁহারা জানেন যে ঐপ্রকার স্থলে প্রণয়ের স্থায়িবন্দোবস্ত ছিল না; শুধু প্রণয়ের ইজারা ছিল। ইজারার মেয়াদ ফুরাইয়াছে ও প্রণয় ভাঙিয়াছে;—জলরেখা জলে ধুইয়া গিয়াছে।

গ্রাম্যসভ্যতার সরঞ্জাম।

নাগরিক সভ্যতার সরঞ্জাম সমূহ সকলেরই চক্ষে পড়ে, সুতরাং সকলেই তাহা জানে। কিন্তু গ্রাম্য সভ্যতার সরঞ্জাম বিষয়ে নগরবাসী সভ্যদিগের সেইরূপ অভিজ্ঞতা নাই। সেই সরঞ্জামের তালিকা করিলে তন্মধ্যে এই কয় পদ সামগ্রী বিশেষরূপে পরিগণিত হইতে পারে।—

১নং গরনেটের একটি চায়নাকোট* অথবা হাল ফ্যাশনের একটি লেজকাটা ওয়েষ্টকোট।—২নং এক জোড়া রঙিল মোজা। ৩নং একখানি পিচের লাঠি।—৪নং এক জোড়া বাঁকানো জুল্‌ফীময় এলবার্টী তেরি।—৫নং তিনখানি মেয়েলো উপন্যাস।—৬নং দুখানি সৌখীন নাটক—এবং ৭নং একখানি স্ত্রীশিক্ষা অথবা স্ত্রীর প্রতি উপদেশ বিষয়ক গ্রন্থ। যেখানে এই সাতটি সামগ্রীর সমবায় দেখিবে, জানিবে সেখানেই গ্রাম্য সভ্যতার আলোক পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে দুই এক পদ মাল না থাকিলেও কষ্টে স্বষ্টে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু কোনরূপ একখানি নাটক না হইলেই চলে না; কারণ অন্তঃপুরে বসিয়া, বৎসর ভরিয়া অভিনয় শিক্ষা গ্রাম্য সভ্যতার একটা প্রধান লক্ষণ;—আর, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের একখানি পুস্তকও একান্ত অপরিহার্য্য; কারণ পুথি পত্র চর্চ্চা ও লেখা পড়ার ভার প্রায়শঃই পুরসুন্দরীর প্রতি। যাঁহারা একটুকু বেশী সভ্য, তাঁহাদিগের হাতে চারি পাঁচ মাসের পুরাতন একখানি ছেঁড়া খবরের কাগজ,—খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য একখানি প্রেরিতপত্রের সপ্তম বারের মুশাবিদা, অথবা এক খানি চাঁদার ফর্দ্দও পরিলক্ষিত হয়।

* Vide IndraNath's Kalpataru.

গ্রাম্যদেবতা।

কালে গ্রাম, নগর, জনপদাদির অবস্থান্তর হয়; কালে শব্দাদিরও অর্থান্তর ঘটে। যথা, 'সন্দেশ' শব্দের প্রাচীন অর্থ বার্ত্তা কিংবা সংবাদ, আধুনিক অর্থ মিঠাই। গ্রাম্যদেবতা শব্দেরও এইরূপ অর্থান্তর ঘটিয়াছে। গ্রাম্যদেবতা বলিলে আগে বুঝাইত গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী প্রাচীনতম বট-বৃক্ষের শাখারোহী ভূত;—উহার এইক্ষণকার অর্থ গ্রামের দলপতি, কুবুদ্ধির মন্ত্রগুরু ও কুচক্রের মন্ত্রনায়ক। বঙ্গের অধিকাংশ গ্রামেই ইদানীং এইরূপ দুই একটি গ্রাম্যদেবতার অধিষ্ঠান আছে। লোকের সহিত লোকের বিবাদ সৃষ্টি,—যেখানে মিত্রতা আছে সেখানে শত্রুতার উৎপাদন, মিথ্যা মোকদ্দমা, মিথ্যা দুর্নাম রটনা,—সমক্ষে স্তুতি, পরোক্ষে নিন্দা, প্রজার প্রতিকূলে ভূস্বামীকে ও ভূস্বামীর প্রতিকূলে প্রজাবর্গকে পরিচালন করা, গ্রাম্যদেবতার নিত্যকর্ম্ম। কিন্তু ইহা ছাড়া কতকগুলি নৈমিত্তিক কর্ম্ম আছে। তাহার উল্লেখ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। মহাত্মা

জ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন যে, ঘেঁটু ঠাকুর * ও জরাসুরের যেমন পূজা হয়, গ্রামের উপকণ্ঠস্থিত চণ্ডাল-শ্মশানে শনিমঙ্গলের অমানিশায় গ্রাম্যদেবতারও সেইরূপ পূজা হওয়া উচিত। নহিলে উপদ্রবের নিবৃত্তি নাই, এবং গ্রামেও শান্তির আশা নাই। পূজার উপকরণ ছেঁড়া চুল, ছিন্ন নখ, গোময়াদি পঞ্চগব্য, অর্দ্ধদগ্ধ অন্ত্যজ-শবের গলিত মাংস এবং নীলদর্পণের শ্যামচাঁদ।

* ইহাঁর সংস্কৃত নাম ঘণ্টাকর্ণ অথবা ঘণ্টেশ্বর। ইনি মঙ্গলের পুত্র এবং খস খুঁজলী ও পাঁচরা রোগের দেবতা।

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। 'প্রভাত-প্রতিভা, কাব্য। শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত।'—প্রভাত-প্রতিভা গ্রন্থকারের প্রথম রচনা হইলেও ইহাতে ভাবুকতা এবং রচনানৈপুণ্যের বিশিষ্ট পরিচয় আছে, এবং লেখক কালে প্রশংসিত হইবেন বলিয়া আমাদের আশা হইয়াছে। ইহার একটি কবিতা এইরূপ,—

"হাসলো বিজলি!— নাচলো বিজলি!
নীরদের কোলে দুলি দুলি দুলি
চম্পক চরণে নাচলো বালা।
অধর ফুটিয়া, হৃদয় ফাটিয়া
সোনার হাসিটি আসুক ছুটিয়া
সরায়ে হৃদির তামসজালা!"

এই প্রকার মধুর রচনা ও সরস পদাবলী এই গ্রন্থে অনেক আছে। কিন্তু গ্রন্থকারের একটি বড় লজ্জাজনক দোষ দেখিয়াছি এবং তাঁহারই উপকারার্থ তাহা দেখাইয়া দেওয়াও উচিত মনে করিতেছি। লোকে আপনা হইতে উচ্চতর ব্যক্তির ভাব ও লিখন-ভঙ্গীর অনুকরণ করে। তিনি অনুকরণের সঙ্গে স্থানে স্থানে শব্দাদিও অপহরণ করেন। এইরূপ অনুকরণ অসহনীয় এবং যিনি প্রভাত-প্রতিভার মত উপাদেয় কাব্য রচনা করিতে পারেন, তাঁহার সম্পর্কে ক্ষমার অযোগ্য। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"হায়! ভ্রান্ত আমি—চিন্তিনু কি কথা!
আর্য্যবংশ আর আছে কি ভারতে?
আর্য্য—আখ্যা এবে অলীক বচন!
আর্য্য ভারতের সুদূর স্বপন।
* * *
'হায়! কি কহিলি স্মৃতি পাগলিনি!
আর্য্য নাম কেন ধ্বনিলি ভারতে?"

নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"আর্য্য! আজি এ ভারতে
নিষ্ঠুর! এ নাম কেন ধ্বনিলে আবার?"
ইত্যাদি।

পাঠকবর্গ এই দুইটি কবিতা মিলাইয়া পড়িতে পারেন। পুনশ্চ, নবীনচন্দ্রের প্রেমোন্মাদিনী নামক কবিতায় আছে,—

"প্রিয়তম,
দুইটি বছর আমি কুল-পিঞ্জরের পাখী
করেছি তপস্যা তব কুল-পিঞ্জরেতে থাকি"

আমাদিগের গ্রন্থকার 'দুইটি'র স্থলে 'কয়টি' করিয়া লিখিয়াছেন,—

"প্রিয়তমে !
কয়টি বছর আমি থাকিয়া পিঞ্জরে !
করেছি তপস্যা কত—"

নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"আন ছুরি চিরি বক্ষঃ দেখাই তোমারে,
আন ছুরি চিরি বক্ষ,
দেখাই স্মৃতির কক্ষ"

গ্রন্থকারও পুনঃপুনঃই লিখিয়াছেন,—

"আন ছুরি চিরি বক্ষ
দেখাই হৃদয় কক্ষ" (ইত্যাদি ।)

এইরূপ নকলনবিশীতে কবিত্বের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি বিনষ্ট হয়। কবিত্ব যদি হৃদয় হইতে আপনি উৎসারিত না হয়, তবে উহা কবিত্বের আবৃত্তি মাত্র। যখন কেহ আপনার হৃদয়ের আবেগে অধীর হইয়া এইরূপ বলে যে,—'আন ছুরি, চিরি বক্ষ, দেখাব তোমায়'—তখন সেই আবেগ, সেই অসহ্য বেদনা অন্যদীয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু যখন কেহ ঐ কথা কটি কণ্ঠস্থ করিয়া বিনা আবেগেও ঐরূপ বলে, তখন হৃদয়ে বিরক্তি বিনা আর কোন ভাবেরই সঞ্চার হয় না।

২। 'ভারতে দুঃখ। প্রথম খণ্ড। শ্রীহরবন্ধু দত্ত প্রণীত।'—ইহা পৃথুরায় ও মামুদঘোরীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অবলম্বনে লিখিত একখানি নূতন কাব্য; এবং যদিও ইহার তিনটি মাত্র অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু লেখক যে একবারে অকর্ম্মণ্য লোক নহেন, এই তিন অধ্যায়েই তাহার নিদর্শন আছে। এখানির রচনা প্রভাত-প্রতিভার মত মিষ্ট নহে, কিন্তু অধিকতর প্রাঞ্জল। আমরা যে এই দুখানি কাব্যের এক সঙ্গে সমালোচনা করিলাম, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, এই উভয়েরই আদর্শ এক। প্রভাত-প্রতিভা অবকাশ-রঞ্জিনীর অনুকৃতি, এখানি পলাসির যুদ্ধের অনুকৃতি; অনুকরণ চিহ্নও উভয়ত্রই মাত্রাভেদে পরিলক্ষণীয়। পলাসির যুদ্ধের আরম্ভে আছে,—

"দ্বিতীয় প্রহর নিশী নীরব অবনী,
নিবিড় জলদাবৃত গগণ মণ্ডল ;"—

ভারতদুঃখের আরম্ভেও ঐরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"গভীরা তামসী নিশি আঁধার সকল,
বিভীষণ ঘনঘটা বিস্তৃত গগণে,"

কাব্যের আরম্ভ হইতে শেষ সর্ব্বত্রই এইরূপ অনুকরণ। ইহার যুদ্ধবর্ণনা যে পলাসিযুদ্ধের যুদ্ধবর্ণন সম্মুখে রাখিয়া লিখিত হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"পাখীগণ কলরব করি ব্যস্ত মনে,
পশিল কুলায়ে ডরে ;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়া হাঁফাল সঘনে।"

ইহাতে আছে,—

"ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে উড়িল গগনে,
ত্যজি নিজ নীড় শাখী,
কাননের যত পাখী,
ছুটিলেক ভীতচিতে বনচরগণে।"

নবীন,—

"আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
কাঁপাইয়া ধরাতল
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল সে ভীমরব ফাটিয়া গগন।"

গ্রন্থকার,—

"আবার ভীষণ স্বরে গর্জ্জিল কামান,

বেষ্টি রাজ-অন্তঃপুরে,
রজনীর অন্ধকারে,
নীরব কাননগিরি করি কম্পমান।”

পলাসির যুদ্ধে যুদ্ধাবসানে সিরাজ-সেনাপতি মোহনলালের বক্তৃতা, এই গ্রন্থে পৃথুরাজ-সেনাপতি বীরধ্বজের বক্তৃতা। সেই বক্তৃতায়ও যেখানে যে কথা, এই বক্তৃতায়ও সেখানে সেই কথা। কেবল এই মাত্র প্রভেদ;—পলাসির যুদ্ধ অতি উচ্চশ্রেণির কাব্য, এখানি তাহা নহে।

৩। ‘যুব-রঞ্জিনী। প্রথম ভাগ, খণ্ড-কাব্য। শ্রীতারিণীচরণ সেন প্রণীত। শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মৈত্রকর্ত্তৃক প্রকাশিত।’—এখানি অনুকৃতির অনুকৃতি, কিন্তু অনুকরণ যে সকল স্থলেই নিন্দনীয় হইয়াছে, এমন নহে। ইহার কোন কোন কবিতায় যুবরঞ্জনের উপযোগী ভ্রমরগুঞ্জন আছে। যথা,—

“সে মুহূর্ত্ত,—
সে মুহূর্ত্ত নিদাঘের, সান্ধ্যসমীরণ

* * *

“সে কাহিনী
শুনিয়া লজ্জার রেখা প্রেয়সী-অধরে
দেখা দিল; নতমুখে কহিল আমারে”

* * *

“সে মুহূর্ত্ত
“বুঝেছিল রঘুশ্রেষ্ঠ, মৈথিলীর সনে।”

ইহার আদর্শ কবিতাটি এইরূপ,—

“সে মুহূর্ত্ত
মানব জীবনে সে যে কহিনুর মণি,
সে মুহূর্ত্ত জীবনের পূর্ণিমা রজনী,
সে মুহূর্ত্ত হায় আমি,
কোথা ছিনু নাহি জানি
সে মুহূর্ত্ত নহে এই মানবজীবন,
অহো সেই মাদকতা,—আত্মবিস্মরণ।”

কিন্তু আদর্শ কবিতায়,একটি মাত্র শ্লোকে তিন চারিবার ‘সে মুহূর্ত্ত’ আছে,ইহাতে ‘সে মুহূর্ত্ত’ ও ‘যে মুহূর্ত্ত’ ন্যূনতঃ অষ্টাদশবার উল্লিখিত হইয়াছে।

৪। দেশাচার। মূল্য দুই আনা। কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।—ইহাও একখানি কাব্য। যথা—

“ধন্য দেশাচার!
কত যে মহিমা তব কে বলিতে পারে?”

লেখকের আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়া; তাঁহার দুই একটি কবিতাতে কোন কোন স্থলে প্রশংসার সামগ্রীও আছে।

৫। ‘কমল-কলিকা। প্রথম ভাগ। জনৈক বঙ্গমহিলা কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীহরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।’—শিক্ষার স্বাদ মাত্রে পুলকিতা পুর-ললনার পক্ষে এ উদ্যম মন্দ নহে। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার অভিভাবক দিগের নিকট উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, কালে ছোট ছোট পদ্য লিখিতে পারিবেন। তিনি গ্রন্থের আরম্ভে সরস্বতী স্তোত্রের এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

‘তালেশা, রাগেশী বাণী; সুবীণা বাদিনী।’

প্রকাশক নিম্নে ইহার টীকা দিয়াছেন,—
(১) ‘তাল-ঈশা—তালেশী; তালের ঈশ্বরী’
(২) ‘রাগ-ঈশী—রাগ-কর্ত্তৃ।’রাগসৃষ্টিকারিণী’
কমল-কলিকা বলিয়া আখ্যাত কোমল কবিতায় এইরূপ টীকার প্রয়োজন বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু বালিকার কি দোষ?

৬। ‘ফুলবালা। গীতি কাব্য, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রথম খণ্ড।’—এ-

খানি কাব্য বটে। ইহার কল্পনা চিত্তহারিণী,—রচনা সেইরূপ না হইলেও প্রীতিদায়িনী। কবি গোলাপ, কদম্ব, কৃষ্ণকেলি, সূর্য্যমুখী ও রক্তজবা প্রভৃতি কুসুম কল্পনার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, এবং ইহার প্রত্যেকটিকেই কল্পনার বর্ণ তুলিতে আঁকিতে যত্ন পাইয়াছেন। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে। দুই একটি বর্ণনা সংকবিযোগ্য।

৭। 'লুক্রেশিয়া। খণ্ডকাব্য। শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় বিরচিত।'—ইহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহার রচনা প্রগাঢ়,রসভাবের উদ্দীপনাও পরিস্ফুট। আমরা গ্রন্থকারের সহৃদয়তার পরিচয়ার্থ নিম্নে দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"দিবস হইল শেষ
অস্তাচলে গেল দিনমণি।
পরিয়া আপন অপরূপ বেশ
ধীরে ধীরে শ্যামাঙ্গিনী আসিল রজনী।
ঝিল্লী পেচকাদি যত নিশাচর
প্রকাশিল নিজ কণ্ঠস্বর
ক্রমে দিক্ সমুদয়
হইল আঁধার ময়
গম্ভীর নূতন সাজে সাজিল ধরণী
দৃশ্য মনোহর!

২

নীরব জগতে আজি
বহিতেছে মৃদু সমীরণ।
পরশে তাহার কাঁপে তরুরাজি
প্রকৃতি কি চারু শোভা করেছে ধারণ!
বসে লুক্রেশিয়া কক্ষে আপনার,
একাকিনী অর্গলিত দ্বার।
প্রফুল্ল বদনশশী
নীরবে আছেন বসি
কল্য পতি আসিবেন করিয়া শ্রবণ,
আনন্দ অপার।"

কালীপ্রসন্ন বাবু কোন কোন স্থলে পাপের চিত্রে পদ্মকান্তি ঢালিয়াছেন। ইহা না করিলেই ভাল ছিল।

৮। 'নীতি-কবিতাবলী। বয়স্থদিগের নিমিত্ত বিরচিত।'—গ্রন্থের আবরণপত্রে রচয়িতার আত্মপরিচয় নাই,কিন্তু ইহা যে শ্রীযুক্তবাবু ঈশানচন্দ্র বসুকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহার পরিচয় আছে। ইহা সুরুচিসম্পন্ন সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের বাঙ্গালা গ্রন্থালয়ে স্থান পাইবার যোগ্য এবং বিদ্যালয়ে প্রচলনার্হ। বাঙ্গালায় ছাত্রশিক্ষার জন্য এইরূপ কবিতাপুস্তক অধিক আছে কি না,সে বিষয়ে আমাদিগের গভীর সন্দেহ। ঈশান বাবু প্রতিভান্বিত কবি নহেন, কিন্তু বড় পরিপক্ক লোক। তিনি যাহা করেন তাহাই সুন্দর হয়; তাঁহার প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থই লোকের উপকারে আইসে। এখানিও নিশ্চয়ই লোকের উপকারে আসিবে। ইহার অনেক কবিতা নূতন,—যে গুলি পুরাতন, সে গুলিও নূতন পরিচ্ছদে পরিহিত, নূতনবৎ প্রীতিপ্রদ।

আমরা এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্র পড়িয়া এক ফোটা চোখের জল ফেলিয়াছি। সর্ব্বদুঃখসংহারিণী বীণাপাণি গ্রন্থকারের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির অমৃত সিঞ্চন করুন।

গ্রীক এবং হিন্দু

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পুরাবৃত্তবিদ্ পণ্ডিতগণের দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উত্তর কুরু হইতে যে যে জাতি বহির্গত হইয়া, বিভিন্ন দেশে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, কালে ঐতিহাসিক গণনায় পরিগণিত হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে হিন্দু, গ্রীক এবং রোমক, এই তিন জাতির মধ্যে রোমকেরা সর্ব্বপ্রথমে আদিস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ইতালি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপরে গ্রীকেরা বহির্গত হয়। এবং সর্ব্বশেষে, রোমক এবং গ্রীকদিগের স্থানান্তর হওনের কিছুকাল পরে, ভাবী হিন্দুজাতিদিগের পিতৃপুরুষেরা আদিস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভারতে আগত হইয়া, পঞ্চনদের ধারে এবং সরস্বতিতটে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া জাতীয় গৌরব বিস্তারে রত হইয়াছিল। পুরাবৃত্তবিদ্‌দিগের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রীকেরা গন্তব্য স্থানে অগ্রে উপস্থিত হইলেও, বহুপরে আগত হিন্দুদের আঢ্যতা এবং সভ্যতা কি কারণে গ্রীকদিগের অপেক্ষা বহুপূর্ব্বে উদয় হইয়াছিল, এবং পরিণামে কেনই বা পরে উদিত গ্রীকসভ্যতা, হিন্দুসভ্যতাকে বহুল বিষয়ে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা অগ্রে আলোচ্য।

উপরেই আভাষিত হইয়াছে যে, মানবের সামান্যতর বৃত্তি সমুদয় যতদিন স্বচ্ছলতার সহিত পরিতৃপ্ত না হয়, ততদিন তন্নিমিত্ত ব্যস্ততা বশতঃ অন্য বিষয়ে মানবগণ মনঃসংযোগ করিতে অপারগ হইয়া থাকে। হিন্দুরা এই অপারগতা হইতে,প্রায় ভারতে আগমনের দিন হইতেই বোধ হয় নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ভারতের যে স্থানে যাও, তথায়ই স্বচ্ছসলিলা নদী সকল প্রবাহিত,—বর্ষাগমে পল্বল দ্বারা সন্নিকটস্থ ভূমি সমস্তকে উর্ব্বরা করিতে পটু। স্বভাবতঃ ভূমি সর্ব্বত্র এরূপ অনুকূলা যে, অতি অযত্নপূর্ব্বক এক মুষ্টি বীজ ছড়াইলেও অল্পদিনে তাহার ফল লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়; এবং হয় ত আবার সে প্রাচীনকালে ভূমি অক্ষুণ্ণ থাকাতে, অনেক স্থানে শস্য যদৃচ্ছা উৎপন্ন এবং বিকীর্ণ হইয়া থাকিত। যেখানে যাও, কানন সকল যতই ভীষণ দর্শন হউক, বৃক্ষাবলী পরিপক সুস্বাদু ফলভরে সর্ব্বত্রই অবনত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বত সকলও সর্ব্বত্র ফল রস জল প্রদান করিয়া পথিকের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া থাকে। অথবা সংক্ষেপে, আকবরের রাজস্ব-সচীবের কথায়, এদেশ এতই সৌভাগ্যশালী যে, বিধাতা ইহার অধিবাসীদিগের নিমিত্ত বৃক্ষের উপরেও, দুই দুই রুটি ও এক পেয়ালা জল রা-

খিয়াছেন। হিমাদ্রি এবং সন্নিকটস্থ পর্ব্বত সমূহ রত্নাধার, ইচ্ছা করিলেই তাহা হইতে নানা রত্ন উত্তোলিত ও ব্যবহৃত হইতে পারে। যে দেশের এমন অবস্থা, সেখানকার অধিবাসীর আর সামান্য-বৃত্তি-পরিতৃপ্তি-বিষয়িণী চিন্তা কোথায়? ইহার ফল, হিত অহিত, উভয়ই আছে।

মনুষ্যের স্বভাব এই যে সমবেতসাধ্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আজ্ঞাদাতা এবং আজ্ঞা প্রতিপালক, এতদুভয় পর্য্যায় সংস্থাপন না করিলে, সে কার্য্য আয়ত্ত এবং সাধন করিতে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে, হয় ত অন্তে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়ে। কোন নূতন সমাজ সংস্থাপন করিতে হইলেও, এই নিয়ম অভিনীত হইয়া থাকে। যাহারা অপেক্ষাকৃত গুণসম্পন্ন, তাহারা পর্য্যায়ভেদে নেতার পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং যাহারা অল্পগুণসম্পন্ন তাহারা নীত হয়। নেতৃগণ, বুদ্ধি কৌশল বা বল, যথাসম্ভব পরিচালন দ্বারা, নীত ব্যক্তিগণকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষণ, এবং তাহাদের স্বস্থানে সংস্থিতি সাধন করিয়া থাকে। নীতগণও কৃতজ্ঞতাবশে, এবং প্রাপ্ত-উপকারের বিনিময় স্বরূপে, সৌভাগ্যের অংশ, নেতাদিগের উচ্চ নীচ পর্য্যায় অনুসারে তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে। এই নিয়ম হইতে সময়-সংযোগে নেতাগণ ক্রমে রাজা, রাজপারিষদ বা ভূম্যধিকারী প্রভৃতি আঢ্যশ্রেণিতে স্থাপিত হয়। এই শ্রেণীস্থের সংখ্যা স্বভাবতঃ, এবং কার্য্যগতিকে অল্প। অপরাপর ব্যক্তিগণকে কালে উহাদের আঢ্যতাবশে, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, উহাদের আজ্ঞাকারী হইতে হয়। সুতরাং নিম্নশ্রেণীস্থবর্গের আজ্ঞাধীনতা অবস্থা হেতু, কালে কালে আঢ্যেরা তাহাদিগকে খাটাইয়া, আপনাদের পূর্ব্ব হইতে পুষ্ট সৌভাগ্য, আরও পুষ্ট করিয়া লইতে ক্ষমবান হয়। কিন্তু এখনও এ অবস্থাতেও লোক দাসবৎ আজ্ঞাকারী, বা উচ্চ এবং অধমের মধ্যে অপরিমিত ব্যবধান স্থাপন, এ সকল ঘটিয়া উঠে না। অধম শ্রেণী এখনও, অপরের জন্য না খাটিলেও, আপন ভাগ্যমাত্রে নির্ভর করিয়া, স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছলতার সহিত সময় অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়। এবং উচ্চশ্রেণীও, ইহাদিগকে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইলে, উহাদের উপর হেয়ভাব ও অনাদর প্রদর্শনে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে সমর্থ হয় না।

কিন্তু অতঃপর এই যে অবস্থা বৈষম্য—তাহার যথাভাবে স্থিতি বা তাহার বৃদ্ধি বা হ্রাসতা; দেশের শীতাতপ, উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতা গুণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। যথা প্রকৃতি শরীর সঞ্চালন এবং শারীরিক কার্য্যসাধনোপযুক্ত শরীরজ তাপরাশি, পার্শ্বস্থ বায়ুরাশির সংস্পর্শে, তাহার শৈত্য বা উষ্ণতা অনুসারে, হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শৈত্যের যথায় তাপের হ্রাস হয়, তথায় তাপের সমতা রক্ষার্থে, ক্ষতিপূরণ জন্য মাংস, মাদক বা তৈলাক্ত দ্রব্য, আহারার্থে প্রয়োজন হয়; এবং পরিশ্রম দ্বারা শরীর সঞ্চালন ও বস্ত্রাদি দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ শৈত্য হইতে সর্ব্বদা শরীর রক্ষার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। আর যথায় উষ্ণতা হেতু তাপের বৃদ্ধি হয়, তথায়

তদ্রূপ আহারের অপ্রয়োজন; সাধারণ ফল মূল্য, শস্য প্রভৃতি অল্পায়াসলভ্য দ্রব্যই প্রচুর বলিয়া গণ্য হয়। শ্রম দ্বারা তাপবৃদ্ধির অনাবশ্যক। অনুপার্জ্জিত তাপেই অলসতা বৃদ্ধি হওয়ায়, পরিশ্রম করিতে মানবচিত্ত প্রবৃত্তিশূন্য হয়। পরন্তু শরীরে কোন প্রকার আবরণেরও অনাবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ প্রায়ই সজল এবং উর্ব্বরা। কিন্তু যদি জলশূন্য অনুর্ব্বরা হয়, তাহা হইলে আবার সজল ও উর্ব্বরা উষ্ণদেশ, এবং নির্জ্জল ও অনুর্ব্বরা উষ্ণদেশের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত দেশের বায়ু সজল ও উত্তপ্ত এবং উর্ব্বরা; শেষোক্ত দেশের বায়ুও উষ্ণ বটে, কিন্তু শুষ্ক, এবং দেশে জলশূন্যতা হেতু ভূমি অনুর্ব্বরা। এই নিমিত্ত শেষোক্ত দেশের লোকেরা দুষ্প্রাপ্য আহারীয়ের নিমিত্ত বাধ্য হইয়া, শ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে সক্ষমও হইয়া থাকে; কারণ জলীয় বাষ্পযুক্ত উষ্ণ বায়ুমধ্যে দেহ হইতে তাপ নির্গমন পক্ষে যে প্রতিবন্ধক জন্মে, শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে সে প্রতিবন্ধক জন্মে না বলিয়া, তাহাদের শ্রমজনিত তাপ সহ্য করিতে ক্লেশ বোধ হয় না, এবং এতৎ কারণে ও অবস্থা গুণে প্রথমোক্ত দেশের অধিবাসী অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমপ্রিয় ও কষ্টসহ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত সজল, উর্ব্বরা ও উত্তপ্ত বঙ্গদেশস্থ, এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বরা, নির্জ্জল ও প্রায় সমপরিমাণে উত্তপ্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ অধিবাসীদিগের মধ্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এখানে দেখিতে পাইবে যে, এক জন বাঙ্গালী কতদূর অলস, পরিশ্রমকাতর, ভীরু এবং দুর্ব্বল, আর একজন হিন্দুস্থানী কতদূর উদ্যোগী, পরিশ্রমপ্রিয়, সাহসী এবং সবল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় আবার শীতপ্রধান দেশেরও দুইরূপ অবস্থা আছে। যথায় শৈত্যের ভাগ অত্যন্ত অধিক এবং বায়ু সজল, তথায় ভূমি একেবারে অনুর্ব্বরা, এবং আহারীয় অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, অথচ তাপবৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন; সেখানকার লোকের চিরকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দুঃখভোগ করিতে জীবন অতিবাহিত হয়, সুখের দিন ভাগ্যে একদিনও ঘটেনা। আর যেখানে শৈত্যভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং বায়ু শুষ্ক, এবং ভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা, সেখানে লোকে নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা অভাব পরিপূরণ করিয়া, চিত্তের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমটির আদর্শস্থল,—লাপলাণ্ড প্রভৃতি উত্তর কেন্দ্রস্থ দেশ সমুদয়। আর দ্বিতীয়টির আদর্শস্থল,—পৃথিবীর সমমণ্ডলস্থ দেশ সমূহ

যথায় দেশ সজল এবং উত্তপ্ত এবং ভূমি উর্ব্বরা, তথায় কষ্টসাধ্য মাংস, মাদক বা তৈলাংশ দ্রব্য প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের অপ্রয়োজন হেতু, মানবেরা অনায়াসলভ্য ফল মূল শস্যাদি সংগ্রহ দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয়। এবং শৈত্যপ্রধান দেশে তাপবৃদ্ধি করণ জন্য বায় বাহুল্য এবং কষ্টসাধ্য যে সকল গাত্রাবরণের সর্ব্বদা আবশ্যক হয়, এখানে তন্নিমিত্ত তাহাদের সেরূপ ভাবিতে হয় না। এক কথায় অন্ন বস্ত্র যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহা অল্পায়াসেই লাভ হইয়া থাকে। মাল-

থুস নামক জনৈক ইংরাজ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লোকতত্ত্ব-নিরূপণ-বিষয়িণী পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই অন্ন বস্ত্রের স্বচ্ছলতা হইলেই, মানবের বংশ অবস্থান্তর অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র যথাপরিমিত, কখনও কখনও বা অধিক স্বচ্ছলতা হেতু অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একথা নিতান্ত অসত্য নহে। সুতরাং এই মত ধরিতে গেলে উক্তরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট দেশে অচিরাৎ লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই লোকবৃদ্ধিসহকারে আহারীয় বস্তুর অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্যতা উপস্থিত হওয়ায়, তাহা অপেক্ষাকৃত শ্রম-উপার্জ্জনীয় হইয়া থাকে। তাহা হইলে কাজে কাজেই শ্রমজীবীর সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ে, কাজেই পরিশ্রমের মূল্যও কমিয়া যায়; এবং এই সুযোগে পূর্ব্বার্জ্জিত ধনযুক্ত সৌভাগ্যশালীগণ অল্পব্যয়ে অধিক শ্রম বিনিময়ে পাইয়া, বহুধন সঞ্চয় বা যথা অভিপ্সিত কার্য্যকরণে সমর্থ হয়; এবং অন্য দিকে শ্রমশালীরা সেই পরিমাণে নির্ধন, এবং সৌভাগ্যশালীদের পদানত হইয়া আইসে। এই নিমিত্ত এবম্ভূত দেশমধ্যে অতি অল্প দিনেই, উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী, স্পষ্টরূপে স্থাপিত এবং তাহাদের মধ্যে অপরিমিত বিষয়বৈষম্য ঘটিয়া উঠে;—সুতরাং সামাজিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষের ভাব সর্ব্বজনীন না হইয়া, একচেটিয়া ভাবে উচ্চশ্রেণিস্থের উপরে অর্পিত হয়। আঢ্য বা উচ্চশ্রেণীরা সম্পত্তিলাভে, আলস্যপ্রিয়তা গুণবিশিষ্ট মনুষ্যদিগের ইতরবৃত্তিসমূহের স্বভাব সুলভ, সুতরাং আশু সুখোৎপাদক, বিলাসবিস্তারে রত হয়; এবং যে বুদ্ধি অন্যাবস্থায় অপরাপর বহুবিধ গুরুতর কার্য্যে ব্যয়িত হইত, এক্ষণে তৎপক্ষে অল্পই ব্যয় করিয়া, অধিকাংশ অভিনব বিলাসদ্রব্যের উদ্ভাবন, সৃষ্টি ও তাহার ব্যবহার এবং রক্ষণকার্য্যে, নিয়োজিত করা হয়। তাহার সিদ্ধি পক্ষে লোক সকলও আজ্ঞাকারী থাকায়,দেশমধ্যে অচীরে শিল্প, কারু, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কার্য্যের প্রাদুর্ভাব এবং প্রাচুর্য্য হওয়ায়, অনুগামিনী সভ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সভ্যতা সমাজের মধ্যে উচ্চতর ভেদযুক্ত হওয়ায়, সর্ব্বজনীন হইতে পায় না, সুতরাং উহা আভ্যন্তরিক না হইয়া বাহ্যিকভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে, এবং যখন ইহার ধ্বংশকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন হয় ত সমাজকে একেবারে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইতে হয়; নয় ত এমন মুমূর্ষাবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে যে, তাহাকে পুনর্ব্বার সজীব করিতে বহুযত্ন ও বহুকাল ব্যয়িত হইবার আবশ্যক।

বকল সাহেবলিখিত সভ্যতাবিষয়িণী ইতিহাস গ্রন্থ আপাততঃ আমার হস্তে উপস্থিত নাই; কিন্তু যতদূর স্মরণ হইতেছে, তাহাতে তাঁহার মত এই যে, এইরূপ ধনবৈষম্য হইতেই মিসর দেশের আদিম সভ্যতার উদ্ভব হয়। ঐ সভ্যতা বাহ্যিক দৃষ্টে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যাহাই থাকুক, ফলতঃ উহা সর্ব্বজনীন ছিল না। সকল শ্রেণীতে সমভাবে বিকীর্ণ হয় নাই। উচ্চশ্রেণীস্থেরা যেমন অপরিমিত ধনশালী হইয়া বিলাসরত হইয়াছিল; নিম্নশ্রেণীস্থেরা তেমনি নিঃসম্বল ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া, কোনরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে, কালক্ষেপ করিত, এবং

সর্ব্বদা আঢ্যগণের পদাবনত থাকিত। এতদূর পদাবনত থাকিত যে আঢ্যেরা যাহা মনে করিতেন, তাহাদের দ্বারা তাহাই সম্পাদন করিয়া লইতেন। মিসর দেশীয় পীরামিড প্রভৃতি প্রাচীন কার্য্যসমূহকে তৎপক্ষে সাক্ষ্যস্থল স্বরূপ অনেকে তাহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া থাকেন। এই পীরামিড সকল, ইউরোপীয় গণনায় পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য কীর্ত্তিমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু সপ্তাশ্চর্য্যের আর ছয়টি কতকাল হইল ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সপ্তম আশ্চর্য্য পীরামিডগণ, অচল ও অটলভাবে, বিরাটবেশে, মেঘমুকুটে শিরোভূষিত করিয়া, অদ্যাপি দর্শকের মনে বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব যুগপৎ উৎপাদন করিয়া, মিসরীয়দিগের বিগত গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কত কালস্রোত ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহারা সেই একই ভাবে অবস্থান করিতেছে; আবার কত কালস্রোত যে সেইরূপে অতিক্রম করিয়া কত যুগযুগান্ত অবস্থিতি করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই স্থানে যত পীরামিড আছে, তন্মধ্যে গিজা নগরের পীরামিড, যাহা খুপ নামক মিসর অধিপতির সমাধি মন্দির বলিয়া নিরূপিত হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং বিস্ময়কর। হিরোদোতস নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক ইতিহাসবেত্তার হিসাব অনুসারে, এই পীরামিড নির্ম্মাণ করিতে প্রতিনিয়ত লক্ষাধিক লোক নিয়োজিত ছিল। এবং কুড়ি বৎসরে এই নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। এতদর্থে শ্রমজীবী রক্ষা করিতে ৩,৮৪০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। এবম্ভূত কীর্ত্তি এত স্বল্প ব্যয়ে নির্ম্মাণ, শ্রমজীবীর সংখ্যা অতি সুলভ ও আজ্ঞাকারী না হইলে সমাপন হইতে পারে না। সাহজাঁহার তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে এরূপ কথিত যে, ৭৫০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। মিসর দেশীয় কার্ণাক নগরস্থ প্রাচীন দেবমন্দিরের ন্যায় আশ্চর্য্য কাণ্ডও বহু সুলভতা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। উহা কিরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড তাহা বর্ণনাতীত। ইহার আয়তন এবং আকৃতি বিস্ময়কর। ইহার একটিমাত্র হল অর্থাৎ দালানের স্তম্ভাবলী দেখিয়া বিখ্যাত ভ্রমণকারী সাম্পলিওন বিস্ময়সহকারে এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন,—"The imagination which in Europe rises far above our porticoes, sinks abashed at the foot of the 140 Columns of the hypostyle hall of Kernak." ফলতঃ মিসরের শ্রমজীবীরা কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ ছিল, যদি এ দূরতর সময়েও বহুবিপ্লবে রূপান্তর-প্রাপ্ত তাহাদের বংশধরদের দ্বারা কিছুমাত্র প্রতীত হইবার সম্ভব থাকে, তবে মিসরীয় ফেলাদের অবস্থা বারেক পর্য্যালোচনা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। মিসরের সভ্যতা, ধনবত্তা, কীর্ত্তি এবং সামান্য শ্রেণিদিগের দুরবস্থা, যেরূপ যেরূপ কারণ হইতে উপস্থিত হইয়াছিল, ব্যাবিলন সাম্রাজ্যেও তদ্রূপ তদ্রূপ কারণের অস্তিত্ব থাকায়, তদ্রূপ তদ্রূপ ফল ফলিয়াছিল। বাইবেল গ্রন্থোক্ত ব্যাবিলনের ধনবত্তা, সামান্য শ্রেণীর উপর অত্যাচার, ব্যাবিলনপতির ঐশ্বর্য্য, মিডদেশীয়া অমিতা নাম্নী ব্যাবিলনরাজমহিষীর সন্তোষার্থে মনোহর অট্টালিকা

এবং গগনোদ্যান প্রভৃতি ইহার পরিচয় স্থল।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি বহুবিধ বিভিন্নাকারের ও বিভিন্ন স্বভাবের বটে, কিন্তু সমগ্র ধরিতে গেলে, মিসর যে শ্রেণীতে, ইহাকেও সেই শ্রেণীতে গণনা করা যায়। ইহাও উত্তপ্ত ও সজল, এবং অধিকন্তু ইহা অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বরতা গুণ-সম্পন্ন। আহারীয় দ্রব্যের অভাব নাই; এজন্য অতি অল্পদিনেই ধনসঞ্চয়, এবং নিম্নশ্রেণীর অবস্থাও পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে আরও নিম্নতর, এবং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধনবৈষম্যও বিপুলভাবে জন্মিয়াছিল। আর্য্যেরা আপন অভীষ্ট পরিপূরণার্থে, আপনাদের স্বদলস্থ নিম্নশ্রেণী ব্যতীত, আর একদল দাসবৎ লোক পদানতভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা ভারতের আদিম অধিবাসী, আর্য্য-অস্ত্রতেজে বশ্যতায় আসিয়া দাসপদে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই সময়ে সমস্ত জগৎ পশুবৎ লোক দ্বারা অধিবেসিত থাকায়, বহিঃশত্রু হইতে নির্ভাবনায়, এবং এরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের রীতি অনুসারে আর্য্যসন্তানেরা সজল গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের অলসভাব প্রাপ্ত এবং অবসরপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু এমন অবস্থায় মানবের যে পরিমাণে বিলাসরত, এবং তজ্জনিত ব্যাবিলনের গগনোদ্যান প্রভৃতির ন্যায় অদ্ভুত বিলাসবস্তুর উদ্ভাবন হওয়া যেরূপ সম্ভব, এ সকল হইতে পায় নাই। তাহার কারণ আছে। চিন্তা-উত্তেজক বাহ্য-জগৎ-পরিবৃত আর্য্যদিগের চিত্ত পারলৌকিক বিষয়ে অধিক পরিমাণে সমাহিত থাকায়, অবসরকাল এবং চিন্তাশক্তি কেবল বিলাসভোগে ও বিলাসপোষক বস্তু উদ্ভাবনে ব্যয়িত না হইয়া, মনস্তত্ব বা তথাবিধ আনুসঙ্গিক বিষয়ে, সম বা তদধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত প্রথম হইতেই ভারতের সভ্যতায় বিলাসজনিত শিল্পকার্য্য, সমতাযুক্ত হইয়া বা তদপেক্ষাও নিম্নতর পরিমাণে, মনস্তত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানাদিসহ পাশাপাশিভাবে, একত্রে উদ্ভাবিত ও অল্পদিনেই পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সহসা উদিত সভ্যতার বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে, অগ্রে গ্রীকদিগের প্রকৃতিভেদে সভ্যতার উদয় বিষয়ে আলোচনা কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য।

বাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে, ভারত যদ্রূপ বহুমূর্ত্তি বিশিষ্ট, গ্রীকদিগের অধিবাসিত ভূখণ্ড তদপেক্ষা যদিও বহুলাংশে ন্যূন, কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে তাহাদের সন্নিবেশ বশতঃ গাঢ়তা পূর্ণ, এবং বৈচিত্রের আধিক্যরূপে, প্রতীয়মান হয়। ইহার উৎপন্ন ফলও তদ্রূপ হওয়ার কথা। যাহা হউক এই সামান্য আয়তনের মধ্যে ইহার ভাববৈচিত্র এত অধিক যে, তাহার তুলনায়, দূরবিক্ষিপ্ততা হেতু ভারতীয় বৈচিত্রও যেন কেমন মলিন বোধ হয়, যদিও বস্তুতঃ তাহা নহে, বরং বহুগুণে আধিক্যশালী। এই ক্ষুদ্র সীমান্তর্বর্ত্তী ভূভাগ ক্রমান্বয়ে পর্ব্বত, নদী, সমতল ক্ষেত্র, উপত্যকা, অধিত্যকা প্রভৃতিতে বিভাজিত হইয়া বহুতর ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশমালায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রদেশের প্রত্যেকে এত ক্ষুদ্র যে, ইহাদের পরিমাণফল কয়েক বর্গক্রোশের

অধিক হইবে না। বোধ হয় আমাদের এক একটি পরগণাও স্থানবিশেষে তাহাদের অপেক্ষা বৃহৎ হইবে। এই সকল প্রদেশের মধ্যে উত্তরে থেসালি ও এপিরুস, উভয়ে পিন্দুস নামক পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। থেসালি চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমধ্যে আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র, মধ্যস্থলে একটি নদী প্রবাহিত, ভূমি উর্ব্বরা। এপিরুস উত্তর দক্ষিণে পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা আকৃষ্ট, ভূমিতল বন্ধুর এবং অনুর্ব্বরা। এতদুভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ক্রমাগত দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে প্রধাবিত হইয়া মধ্যগ্রীসকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, উহার পশ্চিমভাগে ইটোলিয়া ও আর্কানিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। ইহাদের মধ্য দিয়া আকিলৌস নামক গ্রীসদেশীয় সর্ব্বপ্রধান স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া করিন্থ সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। এ উভয় দেশ পর্ব্বত ও বনময়, এবং সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে সম অনুকুল না থাকায়, বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা দস্যুবর্গের দ্বারা অধিবেশিত ছিল।

এই মধ্যদেশের পূর্ব্বভাগ, গ্রীকবিদ্যাবুদ্ধি ও বীরত্বের আকরস্থল। যে পর্ব্বতমালা ইহাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, তাহা পূর্ব্বদিকে সমুদ্র হইতে অদূরবর্ত্তীভাবে প্রধাবিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং থেসালি হইতে পূর্ব্ব-মধ্যদেশে আসিতে হইলে, ঐ পথের এক পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে সমুদ্র। এই পথ দিয়া আসিতে হইলেই, বিখ্যাত গিরিসঙ্কট থার্ম্মপলি অতিক্রম করিতে হয়। এই পূর্ব্বভাগের পূর্ব্ব উপকূল চাপিয়া লোক্রিয়া নামক প্রদেশ। লোক্রিয়ার পশ্চিমে ডোরিস এবং কোকিস নামক প্রদেশদ্বয়। কোকিস প্রদেশের মধ্য দিয়া পার্ণাস্সস নামক পর্ব্বতশ্রেণী। ইহারই উপরে গীতিবিষয়িণী অধিনায়িকা দেবীগণের অবস্থান, এবং পর্ব্বতের পাদদেশে বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌জ্ঞাপক আপলো দেবের মন্দির। কোকিসের দক্ষিণে বিওতিয়া নামক প্রদেশ। ইহা চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ, এবং জলনির্গমনের পথশূন্য। এ নিমিত্ত ভূমি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত থাকায় তাহা উর্ব্বরতা গুণবিশিষ্ট, এবং তাহা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু বায়ু সর্ব্বদা সজল ও কুজ্ঝটিকাময়। বিওতিয়ার দক্ষিণে আটিকা প্রদেশ। এতদুভয় প্রদেশের মধ্যভাগে পর্ব্বতশ্রেণী। আটিকার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমে সমুদ্র। এখানকার বায়ু শুষ্ক ও ভূমি নির্জ্জল, কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বিবিধ প্রকার ফলের উৎপাদন পক্ষে উপযোগী। আটিকার পশ্চিমে মিগারিস। এখান হইতে দক্ষিণ দেশে যাইতে হইলে, করিন্থ যোজক দিয়া যাইতে হয়; কিন্তু এই পথে পর্ব্বতের বাধা এত অধিক যে, স্থলপথ অপেক্ষা দক্ষিণ দেশে যাইতে জলপথই অধিক সুগম।

উত্তরদেশ অপেক্ষা দক্ষিণ দেশ নদীবিরল ও পর্ব্বতময়। ইহার উত্তরে আর্গোলিস। এই আর্গোলিস প্রদেশ আবার বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে বিভক্ত। এই সামান্য স্থানের মধ্যেই আবার প্রকৃতিবৈচিত্র এত যে, কোথাও কলম্বা কমলা প্রভৃতি লেবু পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, আবার কোথাও কিছুই উৎপন্ন হয় না। ইহার পশ্চিমে আকৈয়া।

মধ্যভাগে আর্কেডিয়া; চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা প্রাকারের ন্যায় বেষ্টন করিয়া, অন্যান্য দেশ হইতে ইহাকে ছেদ সম্বন্ধ করিতেছে। দক্ষিণে মেসিনা ও লাকোনিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। এতদুভয় দেশ যদিও পর্ব্বতময়, কিন্তু অনুর্ব্বরা নহে। মেসিনা প্রদেশে খর্জ্জুর প্রভৃতি ফল এবং বিবিধ শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। এই প্রদেশেই সুবিখ্যাত স্পার্টা নগরী, ইউরোতাস নামক নদীর তটে অবস্থিত ছিল। আর্কেডিয়ার পশ্চিমে ইলিস নামক প্রদেশ। এই প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত অলিম্পিয়া ক্ষেত্রের অবস্থান।

গ্রীসদেশের এই প্রকৃতিবৈচিত্রে লক্ষিত হইবে যে, এই ক্ষুদ্রায়তন দেশের মধ্যে প্রদেশভেদে কতই স্বভাব-বিভিন্নতা। কোন প্রদেশ হয় ত একেবারে প্রায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত; আবার তদ্বিপরীতে কোন কোন স্থান নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ, বহির্ভাগের আর সমস্ত স্থান হইতে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন, বহুদূর অতিক্রম না করিলে সমুদ্রের মুখ দেখিবার যো নাই। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশ যেন স্বভাব কর্ত্তৃক বিভাজিত হইয়া, প্রত্যেকে আত্মস্বাতন্ত্র্যসহ নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পরের যেরূপ আকৃতিভেদ, গুণভেদও তদনুরূপ। কোন প্রদেশ একেবারে উর্ব্বরতা গুণ বিশিষ্ট, শস্য প্রচুর, ফল-রস-জলে পরিপূর্ণ। আবার কোন প্রদেশ একেবারে সে সকল বিষয়ে বঞ্চিত, জীবন ধারণের সমস্ত পদার্থের জন্যই, তাহার অধিবাসীদিগকে অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। কোথাও নিবিড় বনভূমি, কোথাও কর্করপূর্ণ সমতল ক্ষেত্র, কোথাও বা অবিরল শস্যচূড় সকল বায়ুহিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে; আবার সর্ব্বত্রই উপলখণ্ডবর্দ্ধিত গিরিশ্রেণী এই সকলকে পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত করিতেছে। এই পর্ব্বতশ্রেণী ও বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ অতিক্রম করিয়া গতায়াত করিতে হয় বলিয়া, গতায়াতের পক্ষে স্থলপথ দারুণ কষ্টকর; সুতরাং জলপথ অতিশয় সুগম।

স্থলভাগ ছাড়িয়া জলভাগের প্রতি নেত্রপাত কর। পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ সমুদ্র দেখ ধীর, মৃদু, মন্থরগতি। গ্রীসের অভ্যন্তরে প্রায় সর্ব্বত্রেই ইহা এতদূর প্রবেশ করিয়াছে যে, গ্রীস বহুপ্রদেশে বিভক্ত হইলেও কেবল আর্কেডিয়া ভিন্ন, আর সকল প্রদেশেরই সমুদ্রতটে একটি না একটি বন্দর স্থাপিত থাকায় সমুদ্রে গমনাগমন পক্ষে তাহাদের সুবিধার অভাব ছিল না। এই সমুদ্রের সর্ব্বত্র দ্বীপশ্রেণীতে এরূপ আকৃষ্ট যে, তাহার জন্য সমুদ্রের অস্থিচর্ম্ম অবশেষ। ঐ সকল দ্বীপ অধিকাংশ পর্ব্বতময়, আবার কোনটি অতি উর্ব্বরা, কোনটি বা মধ্যমপ্রকৃতি, কিন্তু সকলেই রম্যদর্শন ও বাসযোগ্য। ঐ সকল দ্বীপ আয়তনে বৃহৎ নহে, আকৃতিতে ক্ষুদ্র, এবং পরস্পর পরস্পরের এত সন্নিকটে অবস্থান করে যে, একটিতে উত্তীর্ণ হইয়া, তাহা দেখিতে দেখিতে আর একটিতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। এইরূপে ইউরোপখণ্ড গ্রীস হইতে নির্গত হইয়া স্বচ্ছন্দে আসিয়া খণ্ডে উপনীত হইতে পারা যায়। এবং এই গতায়াতের সুবিধাক্রমে, অতি অনুকূল বাণিজ্যবায়ু, হেলাসপণ্ট হ-

ইতে ক্রীট দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীসের পূর্ব্ব উপকূলের অনুকূল মূর্ত্তিবশতঃ, তথায় জাহাজ ও নানাবিধ পোত রক্ষার্থে সুন্দর সুন্দর বন্দর সকল সংযুক্ত। পশ্চিম সমুদ্রও দ্বীপাবলী-সংযুক্ত, কিন্তু পূর্ব্বসমুদ্রের ন্যায় নহে। পূর্ব্বসমুদ্র অপেক্ষা উহা আয়তনে বৃহৎ, স্বভাবও অপেক্ষাকৃত উগ্র। উপকূলভাগ পূর্ব্ব উপকূলের ন্যায় অনুকূল নহে। ইহা উচ্চ এবং দুরারোহ পাহাড়ে আবৃত; সমস্ত উপকূলভাগ ভ্রমণ করিলে কদাচ একটি সুন্দর বন্দর পাওয়া যায়।

এক্ষণে গ্রীসের পার্শ্বস্থ দেশসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ কর। এই মৃদু সমুদ্র অতিক্রম করিলে, একদিকে সুসভ্য ও বিক্রমশালী মিসর, এবং উত্তর আফ্রিকার উপকূলস্থ বলসম্পন্ন কার্থেজ প্রভৃতি অন্যান্য স্থান; অন্য দিকে সমুদ্রপ্রিয় ফিনিসীয় এবং আসিয়াস্থ অন্যান্য ধন, সৌভাগ্য ও বলসম্পন্ন প্রদেশনিচয়। অপর পার্শ্বে নবপরাক্রম-বিস্ফুরিত শিশু ইতালী। গ্রীসের অধিবাসীদিগের পক্ষে যেরূপ সমুদ্র গতায়াতের সুবিধা, এই সকল প্রতিবেশী দেশসমূহেরও তদ্রূপ। এবং গ্রীসে যে যে কারণে মনুষ্যকে মনুষ্যপদবীতে স্থাপন করিতে পারে, এ সকল দেশেও বিষয়-বিশেষের বৈচিত্র-সাধক কারণ-বিশেষের ক্ষীণতা বা পুষ্টতার প্রতি লক্ষ্য না করিলে, সেই সেই কারণের নিতান্ত ন্যূনতা ছিলনা।

জনৈক ফরাসিস বিজ্ঞপ্রবর নাকি এরূপ কহিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যে কোন দেশের মানচিত্র প্রদান করিলে, এবং তদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যজাত ও পদার্থনিচয় কীর্ত্তন করিলে,তিনি বলিয়া দিতে পারেন যে,সেই দেশবাসীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক হইয়া কিরূপ কার্য্যফল প্রসব করিবে, এবং মানবীয় ইতিহাসের কোন্ পর্য্যায়ে অবস্থান এবং কিরূপ গণনায় আসিবে। একথা যদি সত্য সত্য সম্ভব হয়, পাঠক বলিতে পার যে, গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট দেশের অধিবাসীবর্গ কিরূপ অবস্থা সম্পন্ন হইবে?

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এরূপ স্বভাব বিশিষ্ট দেশের প্রদেশসমূহ, পরস্পর পরস্পর সম্বন্ধে এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে যে, যেন কাহারও সঙ্গে কাহারও সংস্রব নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান এবং স্বতন্ত্র। প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে দুর্গম ব্যবধানের অভাবে, উভয় প্রাদেশিক অধিবাসীদিগের মধ্যে গতায়াত সুগম, এবং তাহা হইতে স্বত-উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে, উভয়ে যেমন একসূত্রে বদ্ধ এবং একপ্রকৃতি বিশিষ্ট ও একপ্রকৃতিযুক্ত হইয়া, একজাতিত্বে পরিগণিত হয়; এখানে প্রদেশপরম্পরার ব্যবধানদুর্গমতা হেতু, এক প্রদেশের অধিবাসীদিগের সহ অপর প্রদেশের অধিবাসীদিগের তদ্রূপ গতায়াতের সুগমতা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ঘনিষ্টতা, এতদুভয়ের অভাব নিবন্ধন, প্রত্যেক প্রদেশ প্রথমকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর প্রদেশ সমূহ,যেন ভিন্ন সীমা বিশিষ্ট ভিন্ন দেশরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রাদেশিক এইরূপ স্বাতন্ত্র্য হইতে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাবও পরিবর্দ্ধিত এবং তদুৎপন্ন অহঙ্কার বোধ প্রকৃষ্টরূপে হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য

যে, এতদ্রূপ কারণোৎপন্ন অহঙ্কারবোধ ভাবী পার্থিব-গৌরবের ভিত্তিস্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের মধ্যে ভূমির উর্ব্বরতা গুণ সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে আবশ্যকাধিক জীবনোপায় বস্তু সমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে, আবার কোথাও বহুশ্রমেও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া দুষ্কর। অতএব কালে লোকবৃদ্ধিসহ লক্ষিত হইবে যে, কোন কোন প্রদেশ বহুপরিবারবৃদ্ধি সত্বে, আহারপ্রাচুর্য্যে অত্যন্ত সচ্ছলতাযুক্ত। আবার কোন কোন দেশকে হয়ত তদভাবে একেকালে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত যে কোন বস্তু, যাহা অপরের নিকট লোভনীয়,তদ্দ্বারা বিনিময় ও ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন ব্যতীত, সকলের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্য অন্যান্য দেশের সহ তুলনায়, এখানে প্রত্যেক প্রদেশ অধিবেশিত হওয়ার অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পরেই, পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। প্রদেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ স্বতন্ত্র, তাহাতে এই বাণিজ্যসূত্রে, দূরদর্শীতা, বিজ্ঞতা এবং লোকচরিত্র-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিদেশবাণিজ্যের যে সকল আনুসঙ্গিক ফল, সেই সকল ফললাভ হইয়া থাকে। ক্রমে লোকবাহুল্যতায় যখন বাণিজ্যের আধিক্য হয়, তখন এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে দুর্গম স্থলপথের ক্লেশ বিশেষরূপে অনুভূত হইতে থাকে; এবং সেই অনুভবশক্তি হইতে প্রতিকার স্বরূপ জলপথে গমনাগমনের প্রবর্ত্তনা হয়, এবং এই প্রবর্ত্তনের ক্রম-পুষ্টতায় তদ্রূপ গমনাগমনের ক্রমে অথচ শীঘ্র শীঘ্র উৎকর্ষ সাধিত হইতে থাকে। এরূপ ক্রমাগত গতায়াত ও সংস্রবে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা উপস্থিত হইয়া, সকল প্রদেশের অধিবাসীরা অন্তরে অন্তরে স্বতন্ত্রতাযুক্ত থাকিলেও বাহ্যিকে একজাতিত্বের আকার ধারণ করে। বিশেষতঃ রীতি নীতি পথে পূর্ব্বশিক্ষাশূন্য এরূপ প্রাদেশিকদিগের মধ্যে, একের রীতি নীতি অপর দ্বারা বিচালিত, একের ধর্ম্মতত্ব প্রভৃতি অপরেরদ্বারা গৃহীত, সহজে এবং বিনাযত্নে আপনা হইতে হইয়া থাকে। যাহা হউক, তাহা হইলেও, বহুকাল ধরিয়া অবলম্বিত যে মানবীয় মনের স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা, তাহা তদ্বারা অপলোপ হইতে পায় না; প্রত্যুত তদ্বারা স্বাতন্ত্র্য ভাবের মলভাগ পরিত্যক্ত হইবায়, তাহা মার্জ্জিত হইয়া থাকে। এজন্য বাহ্যিকে একজাতিত্বভাব দৃষ্ট হইলেও ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়ভাব বিরাজ করিতে থাকে।

বাণিজ্যদ্বারা এবম্ভূত আহার স্বচ্ছলতা সাধিত হইলে, পরিমাণ অনুসারে ক্রমে লোক বৃদ্ধি হইয়া, দেশের মধ্যে যখন স্থানসঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হয়, তখন, দেশত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। এরূপ উপনিবেশ স্থাপন পক্ষে ঘন-সন্নিকটস্থ ঘন-সন্নিবিষ্ট দ্বীপাবলী এবং অপরাপর ভূখণ্ড যেরূপ অগ্রে মনোনীত হওয়ার সম্ভব, সেরূপ অন্য স্থান নহে। এজন্য ক্রমে সেই সকল উপনিবেশিত, কালে তদ্রূপ উপনিবেশ সমূহের বিস্তার সাধন, এবং তজ্জন্য নূতন নূতন

স্থান সকল মনোনীত করা হইয়া থাকে। এবং ইহা হইতে ক্রমে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তার, এবং তজ্জনিত ধনসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। যে সমুদ্র-যাত্রার সুযোগে এই দেশ শ্রীবৃদ্ধি যুক্ত হইবার কথা, ইহার প্রতিবেশিবর্গেরও তদ্রূপ সুবিধা; সুতরাং তাহাদেরও ইহাদের সঙ্গে একই সময়ে ধন-সঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হওয়ার সম্ভব। অথবা যদি তৎপক্ষে কাহারও ন্যূনতা হয় অথচ সে পূর্ণতার স্বাদ জ্ঞাত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অপরের ক্ষতিকরণ ভিন্ন আকাঙ্ক্ষার আশু পূরণের উপায়ান্তর নাই। যেহেতু আপনার হীনতা দর্শনে অপরের অপরিমিত ধন দ্বারা আত্ম পরিপোষণ করার প্রবৃত্তি,পার্থিব-সুখ-বিমোহিত মানবের মনে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু এক পক্ষে হীনতা না থাকিলেও, তদ্রূপ মানবের মনে ঐ প্রবৃত্তির ক্রীড়া লক্ষিত হওয়ার অসদ্ভাব নাই; অতএব প্রতিবেশীবর্গের নিকট হইতে সর্ব্বদা আক্রমণের সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বী হইলেও এবং আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোনসূত্রে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকিলেও, বাহ্য শত্রুর পক্ষে প্রতিযোগিতায়, এক এক প্রদেশ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিযোগিতার অসমর্থ হেতু, সকলে সংমিলিত হইয়া একযোগ হওয়া কর্ত্তব্য। এই একতা ক্ষণিক নহে,সর্ব্বদা আবশ্যক, সুতরাং তৎসাধন একমাত্র কথায় গাঢ়রূপে এ চলচিত্ত-সময়ে সুসম্পন্ন হয় না। অতএব একতা বন্ধনোপযোগী বস্তুর আবশ্যক, এনিমিত্ত কোনরূপ পর্ব্বোপলক্ষে জাতীয় সংমিলন আবশ্যক হয়। তথাপি প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণের বহ্বায়তন হেতু, ইহারা প্রতিযোগিতার উদ্দেশে একতা সত্বেও সংখ্যাতে সামান্য গণনায় আইসে। কিন্তু প্রতিবেশীরা যেরূপ পার্থিব-সুখ সর্ব্বস্বতা হেতু দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী, ইহারাও তদ্রূপ পার্থিব-সুখসর্ব্বস্বতা হেতু আত্মধন রক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমন স্থলে সংখ্যায় যেমন সামান্য, তাহার পরিপূরণার্থে একমাত্র বীরকার্য্যে পারদর্শিতা এবং বীরত্বে খ্যাতিলাভ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বাহিরের শৈত্যগুণে অন্তরস্থ তাপ যেমন ঘণিভূত হইয়া থাকে, তেমনি যত বৈদেশিক প্রতিবেশিরা ইহাদের উপর শত্রুতাচরণ করিবে; এবং তন্নিমিত্ত ইহারা যত বিদেশীয়দিগের উপর বিতৃষ্ণা-যুক্ত হইবে, ততই ইহাদের আত্মস্বত্বের উপর মমতা এবং স্বদেশ রক্ষণে বীরত্ব প্রতিভাষিত হইতে থাকিবে। মানব চিত্ত অনেক সময়ে বিস্মৃতিযুক্ত হয়; আপন ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি, সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়বৎ থাকে, কিন্তু বিষয় বিশেষ অনুসারে কবিত্বদ্বারা সেই ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিলে সে জড়তা তিরোহিত হইয়া, মানব সতেজ ও উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এবম্ভূত দেশমধ্যে বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ-প্রিয়তা মনোমধ্যে উদয় করার যত আবশ্যক, তত অন্য বিষয়ের নহে। যে দেশের যেরূপ মতি গতি, তাহাদের হইতে প্রকৃতি সেইরূপ বস্তুই উৎপাদন করাইয়া থাকেন; সুতরাং সাহিত্য কাব্যাদি অভূতপূর্ব্ব মনুষ্য-মুখ-প্রচারিত দেববাক্য হইলেও, এখানে তাহা

দেশের উপযোগীতা অনুসারে বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ-হিতৈষিতার জীবিতভাবে পরিপূর্ণ হইবে। এবং এবম্ভূত দেশেই কেবল ইতিহাসের মূল্য অবধারিত ও তাহার উৎপত্তি সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বগত বীরপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপে বিমোহিত হইয়া, চিরনেত্রপথে আদর্শরূপে তাহাকে স্থাপিত করণের আকাঙ্ক্ষায় ভাস্কর্য্যের উৎপত্তি ও তাহার উৎকর্ষ সুসাধিত হয় *।

বাহ্যজগৎ ইহাদিগের নিকট সামান্য বেশে প্রতীয়মান হওয়ায়, এবং প্রাকৃতিক অদ্ভুত কার্য্যকলাপের সঙ্কীর্ণতা হেতু, ইহাদের চিত্ত পারলৌকিক তত্ত্বে তাদৃশ আকর্ষিত হওয়ার সম্ভব নাই। এ নিমিত্ত ইহাদের পরলোক বিভীষিকা পূর্ণ এবং দেবতত্ত্ব নিতান্ত অমানুষিক হইবার নহে। এতদুভয়েরই ইহাদের নিকট দেব-মাননীয়, উভয় ভাবের সামঞ্জস্য-সাধক আকৃতি ধারণ করা সম্ভব। পরলোক ভীষণ হইতে ভীষণতর নহে; এবং দেবতারাও অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, বিকট সাজ, বিকট কায, বা বিকটমূর্ত্তি বিশিষ্ট নহে। সকলেই মানবের ন্যায় মানবীয় ক্রীড়াযুক্ত;—তাহার সহিত মানবের সহানুভূতি জন্মিতে পারে এতদ্রূপ। পরলোক সামান্য বিভীষিকাযুক্ত বলিয়া মানবচিত্তকে তাহা হইতে উদ্ধারকল্পে বিষম-আকুলতাযুক্ত হইয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া হাবু ডুবু খাইতে হয় না। সুতরাং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বের উদ্ভাবনের অভাবে, সাধারণ দেবতত্ত্বেই মানবচিত্ত সতত সন্তোষযুক্ত এবং তাহাতে ভয়বিরহিত। উভয়ের অভাব এত যে, মানব দেবতা হইতেও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-রক্ষণে অপরিমিত যত্নশীল।

মানবচিত্ত পার্থিব বিষয়ে এরূপ সংলগ্ন হওয়াতে, তদ্বিষয়ক যে কোন বিষয়ে সম্যক হস্তক্ষেপে শিথিল-প্রযত্ন হয় নাই। সুতরাং সকল বিষয়ের পরিরক্ষক রাজনীতিতে যে ইহারা সম্যক হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? স্বতন্ত্রতা প্রিয়তায়, প্রত্যেক প্রদেশ এক এক রাজ্য, আবার কোন স্থানে এক প্রদেশের মধ্যেই চারি পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্য। এতদ্রূপ ক্ষুদ্র রাজত্বের মধ্যে, রাজা স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে পরিচিত, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শিত হওয়াতে, আত্মদেবত্ব রক্ষণে সমর্থ হয়েন না। এবং রাজনীতির বিস্তারস্থান অল্পায়তন হওয়ায়, প্রজামাত্রেই তাহা আয়ত্ব করিয়া, তাহাদের দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত, এবং আবশ্যক হইলে তাহার প্রতিকার করণে সহজে উদ্যত হয়। এ নিমিত্ত এখানে সর্ব্বদা রাজবিপ্লব, এবং প্রজাবিদ্রোহ হওয়ার সম্ভব। শাসনপ্রণালী এই কারণে কখন বা রাজতন্ত্র, কখন বা তাহা ঘুচিয়া সাধারণতন্ত্র, আবার কখন বা সম্ভ্রান্ততন্ত্র, ইত্যাদিরূপে যখন যাহা বলবতী, তখন তাহা প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কখন বা দেশ আত্মকলহজাত রক্তধারায়

---

* এ বুড় বকেশ্বরা কতক্ষণে থামিবে? নব অনুরাগী লেখক আর ইচোড়ে পাকা কাঁঠাল, দুই সমান। ইহাপেক্ষা দুই দণ্ড "ঊনবিংশ শতাব্দী" কীর্ত্তন ও "দেশের মঙ্গল" গীত করিলে তবুও স-য়টার যৎকিঞ্চিৎ সদ্ব্যয় হইত। ইতি—বাঞ্ছারাম। ১২৮৭

স্নাত হয়। কথন বা আবার রাজা-প্রজা-সংমিলনে দেশমধ্যে সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে। এরূপ স্থানে প্রজামাত্রেই অল্প বিস্তর রাজনীতি বিশারদ; তন্মর্ম্মজ্ঞ এবং তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আস্থাযুক্ত হইয়া, আপনাপন কার্য্যকলাপ পরিশোধিত করিয়া থাকে।

গ্রীকদিগের অবস্থা অবিকল এইরূপ। ইহার প্রত্যেক প্রদেশ এক এক বিভিন্ন দেশ স্বরূপ; এবং প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী এক এক বিভিন্ন জাতি স্বরূপ। কেহ কাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। ভারতীয়দিগের অবস্থা তদ্রূপ নহে। আর্য্যেরা যে সময়ে সপ্তসিন্ধুতটমাত্র স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন; এবং যথা হইতেই তাঁহাদের ভাবী অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়; সেই স্থান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, যথায় কালে বংশবিস্তারে ক্রমোপনিবেশিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বত্রেই প্রায় একপ্রকৃতি যুক্ত হওয়ায়, গ্রীসের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যযুক্ত প্রদেশবিভাগের ফল ফলিতে পায় নাই। উপনিবেশিত স্থানসমূহ সর্ব্বত্রেই গতায়াত-সুলভ, এবং ঘনিষ্ঠতাযুক্ত। এই ঘনিষ্ঠতা আবার দস্যুবর্গের ভয়ে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে যেরূপ আদিম অধিবাসী দৈত্যবর্গের দ্বারা উত্যক্ত হইয়াছিলেন, গ্রীসেও তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যবর্গ না ছিল এমন নহে। কিন্তু গ্রীস যেমন সঙ্কীর্ণায়তন, তাহারাও তেমনি সঙ্কীর্ণসংখ্যক, সুতরাং গ্রীকেরা অতি অল্পশ্রমেই তাহাদের সমগ্র বল চূর্ণ করিয়া পদাবনত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় দৈত্যেরা, সংখ্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকারাশির ন্যায় অপরিমিত এবং অভেদ্যস্থান ব্যাপিয়া বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। আর্য্যেরা কিয়দংশের বলচূর্ণ করিয়া পদাবনত করিয়াছিলেন বটে, তথাপি অবশিষ্ট এত ছিল যে, তাঁহাদের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত। এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন হেতু যিনি যেখানে অবস্থিতি করুন না কেন, সকলকেই অখণ্ডিত একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইত। এই সূত্র আমূলত পরিচালিত বলিয়া, হিন্দুসন্তানমাত্রেই কি ভিতরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকারে প্রথমকালে একজাতি ছিলেন। গ্রীকেরা তদ্বিপরীতে প্রথমকাল হইতেই প্রদেশভেদে সম্পূর্ণই বিভিন্ন জাতিস্বরূপ হইয়াছিল। আবার গ্রীকেরা যখন একজাতিস্বরূপ আকার ধারণ করিল, তখনও চির-প্রবুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যভাব অন্তরে অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল। তখন, ভারতীয়েরা বংশ বাহুল্যতায়, যদিও বিভিন্ন প্রদেশে অধিবেশন ও বিভিন্ন রাজ্যস্থাপন পূর্ব্বক যেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন, তথাপি চির-প্রবুদ্ধ একতাভাব তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপলোপ হইল না। এ নিমিত্ত গ্রীকদিগের যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাবী গৌরবের সোপানস্বরূপ, ভারতীয়েরা সে স্বাতন্ত্র্যভাব প্রাপ্ত হইলেন না; এবং অহঙ্কার বোধেও অতি হীনতা প্রাপ্ত হইলেন,—যেহেতু এতদ্বোধের প্রথম বাধকতা বাহ্যজগতের নিকট আত্মখর্ব্বতা জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ নিরন্তর বাহ্যশত্রু-ভয়ে স্বাতন্ত্র্যভাবের ও তদুৎপন্ন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অভাব। একতার আবশ্যক প্রধানতঃ বাহ্যশত্রুর বিপক্ষে এবং স্বাধীনতা

রক্ষণে; একতার আবশ্যক-উপযোগী-কার্য্য-কাল সর্ব্বসময়ে নহে; সুতরাং একতাসাধক যদি আর সমস্ত কার্য্যকরী গুণের অভাব না থাকে, তবে প্রদেশপরম্পরায় মিত্ররাজ্যরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই একতার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। অতএব হিন্দু ও গ্রীক-চরিত্রে একতা এবং স্বাতন্ত্র্যবিষয়িণী কথিত ভাবদ্বয় সম্বন্ধে ইষ্টানিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অন্তরস্থ একতার অভাব গ্রীকদিগের মধ্যে তত অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে নাই, যত ভারতীয়দের মধ্যে লৌকিক মহত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অভাব ও অহঙ্কার-বোধের ক্ষীণতা অনিষ্ট উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রত্যুতঃ গ্রীকদিগের পক্ষে এখানে ক্ষতি অপেক্ষা লাভের ভাগই অধিক।

গ্রীসের ভূমি, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উর্ব্বরতা গুণে সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে আবশ্যকীয় জীবনোপায় বস্তুসমূহ অপরিমিতভাবে উৎপন্ন হয়, কোথাও বা একেবারে নগণ্য। যে সকল ভূমিখণ্ড উর্ব্বরতা গুণ-বিশিষ্ট, তাহা যদি ভারতবর্ষীয় ভূখণ্ডের তুলনায় আনা যায়, তাহা হইলে গ্রীসের উর্ব্বরতা গুণকে অনুর্ব্বরতার মধ্যে গণ্য করিতে হয়। এজন্য ভূমির উর্ব্বরতাগুণ উপলব্ধ করিতে, গ্রীকদিগকে বহুবুদ্ধি ও বহুশ্রমব্যয় এবং বহুকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই বহুবুদ্ধি ও বহুপরিশ্রমব্যয় হেতু, এতদুভয়ের অভাব-বিশিষ্ট ভারতীয়দের অপেক্ষা, গ্রীকদিগের উদ্ভাবনীশক্তি ও শ্রমসহিষ্ণুতা, এতদ্‌গুণদ্বয় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং বহুকাল তদর্থে অতিবাহিত করিবার ফলে, ভারতীয়দের অপেক্ষা গ্রীকদিগের অবসর, তদুৎপন্ন চিন্তা, তজ্জাত উদ্ভাবনী শক্তি এবং তজ্জনিত সভ্যতা বহুকাল পরে উদিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ভূমির এই নিকৃষ্ট উর্ব্বরতা হইতে ফললাভের উপযুক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং তজ্জনিত যে দর্শন ও দৃঢ়তা, তাহা লাভ হইলেও, দেখা যাইতেছে যে, তথাপি দেশমধ্যে সমস্ত প্রাদেশিকগণকে, যদি কেবল আপনাপন প্রাদেশিক উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে অনেককে অনাহারে থাকিতে হইবে। পুনশ্চ শীতপ্রধান দেশের আহারও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় সামান্য নহে; একে ভূমি উৎপাদিকাশক্তিতে এমত হীন, তাহাতে আবার আহারীয় যাহা আবশ্যক তাহা গুরুতর ও শ্রমসাধ্য। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত লোভনীয় যে কোন বস্তুর সহ বিনিময় ও বাণিজ্য ব্যতীত, একের আহার বিষয়ক অভাব, অপরের তদতিরিক্ত অপরাপর আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব, এতদুভয় অভাব নিবারণ না হওয়ায়, সকলের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত মানবীয়-স্বভাবে ক্ষুৎপিপাসা, আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ নিবারণ-বাঞ্ছার প্রথম উদ্রেকেই, এবং সভ্যতাসূর্য্যের উদয়কালেই বলিতে হইবে, গ্রীকেরা প্রদেশপরম্পরায় বিনিময় ও বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এবং এই সকল প্রদেশ, পরস্পরের মধ্যে আদিমকালে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাকায়, এই বাণিজ্য তৎকালে বিদেশবাণিজ্যের আকার

ধারণ করিয়াছিল। পরন্তু ইহাতে বলিতে হইবে যে, বিদেশবাণিজ্য হইতে আত্মোন্নতিকল্পে যে যে ফললাভ হইবার কথা, এই সূত্রে গ্রীকেরা সেই ফল কিয়ৎপরিমাণে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এস্থলে যদি ভারতীয়দের সহ তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এরূপ এরূপ কারণের অভাবে, প্রথম অবস্থায় তাহাদের কোনরূপ বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। যখন কালসহকারে বিলাসের বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখনই প্রদেশ পরম্পরায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ বাণিজ্য প্রধানতঃ বিলাসবস্তুর খাতিরে, সুতরাং তজ্জন্য আগ্রহ গাঢ়তায় আহারীয়-বস্তু-বাণিজ্য অপেক্ষা ন্যূন। আবার এখানে প্রদেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা-যুক্ত, তাহাতে এবম্ভূত বাণিজ্য কখনই বৈদেশিক বাণিজ্যের আকার ধারণ করিতে পারে নাই। ভারতীয়েরা কখনও স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বাণিজ্য করিতেন কি না, তাহা এখানে আলোচ্য নহে; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, প্রথমকালে কখনই নহে। পরবর্ত্তী সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদেশের দ্রব্য ভারতে আনীত, এবং ভারতের দ্রব্য বিদেশে নীত হইতেছে। কিন্তু ইহার মূলানুসন্ধান করিলে প্রতীত হইবে যে, এরূপ বিনিময় ভারতীয়েরা স্বয়ং সর্ব্বদা বিদেশে গমনাগমনের দ্বারা সম্পন্ন করিতেন না। বিদেশীয়েরাই তাঁহাদের দেশে আগমন পূর্ব্বক সমাধা করিয়া যাইত।

যে অভাবসূত্রে গ্রীকদিগের প্রথম বাণিজ্যের উদ্ভব, তাহাতে মূল হইতেই সেই বাণিজ্যের বিস্তৃত আকার ধারণ করিবার কথা; এবং লোক বৃদ্ধি সহকারে যে তাহা আরও বিস্তার প্রাপ্ত হইবে, তাহা এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী। এই বাণিজ্য নিত্য ব্যাপার স্বরূপ, সুতরাং গ্রীসের ন্যায় দুর্গম স্থল পথে ইহা সমাধা করা ক্রমে অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে; আবার অন্যদিকে সুগম সমুদ্র সর্ব্বদা প্রলোভিত করিয়া থাকে। একদিকে ক্লেশ, অন্যদিকে সুবিধা যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে মানবচিত্তের উদ্ভাবনীশক্তি সুবিধাকে আয়ত্ব করিবার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে তেজস্বিনী হইয়া থাকে। কাজেই বাণিজ্য প্রবর্ত্তনার অল্পকাল পরেই গ্রীকদিগের মধ্যে সমুদ্র গমনাগমনের আরম্ভ হয়। এই নিমিত্ত প্রাচীনকালের অতি দূরতর সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে গ্রীকেরা সমুদ্র গমনাগমন পক্ষে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীতে যদিও সমুদ্র যাত্রার দুই একটি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা যে গ্রীকদিগের ন্যায় পুষ্টতা-সম্পন্ন তাহা কখনই নহে। গ্রীকেরাই যে অতি প্রাচীন কাল হইতে সমুদ্র যাত্রার পক্ষে অতিশয় দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। হোমারের সময়ে দেখা যায় যে, জাহাজের আকৃতি সামান্য ছিল; এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপ ও উপকূলভাগে যাতায়াত ছিল মাত্র, কৃষ্ণসাগরের পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ পরিজ্ঞাত ছিলনা, এবং মিসর কেবল জনশ্রুতিতে পরিজ্ঞাত ছিল মাত্র। কিন্তু যে কোন বিষয়েরই নিয়ত ব্যবহারে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, গ্রীসে তন্নিমিত্ত অচিরকাল মধ্যেই সমুদ্র যাত্রার

উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, আর ভারতে তদভাবে তাহাদের যে কিছু সমুদ্র যাত্রার প্রবর্ত্তনা ছিল, তাহা অতি হীনভাবেই বর্ত্তমান ছিল, এবং কালে তাহার অতি অল্পই উৎকর্ষ সাধিত হয়। আবার লক্ষিত হইবে যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে কেবল গ্রীকেরাই যে আত্মদেশ মধ্যে আপনাপনি লিপ্ত থাকিত এরূপ নহে, ইহাদের প্রতিবেশী ফিনিসীয় প্রভৃতি জাতিরাও অতি প্রাচীনকাল হইতে সমুদ্র যাত্রায় প্রবৃত্ত হওয়ায়, গ্রীসে আসিয়া সর্ব্বদা বাণিজ্যাদি করিত। ইহাদের সহিত গ্রীকেরা পোত-চালনের কৌশল ও বাণিজ্যতত্ত্ব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ে, তৎ তৎ পক্ষে উৎকৃষ্ট কৌশল সকল অধিক প্রকারে শিক্ষা করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অস্ত্রচালন ও পার্থিব চতুরতার শিক্ষাও এ সূত্রে নিতান্ত অল্প হয় নাই। কারণ ইয়ো, মিডিয়া প্রভৃতি স্ত্রীহরণবৃত্তান্ত ও তদানুসঙ্গিক ঘটনাবলী তৎপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতের আদিমকালে দেশমধ্যে এরূপ বৈদেশিক গমনাগমন একেবারে ছিল না বলিতে হইবে।

ক্রমে লোকবৃদ্ধিসহকারে দেশমধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, ভারতীয়েরা যেমন ব্রহ্মর্ষি হইতে ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে মধ্যদেশ, ক্রমে সমগ্র উত্তরদেশ, পরে দক্ষিণাবর্ত্তেও জনস্থান স্থাপন পূর্ব্বক উপনিবেশিত করিয়াছিলেন; গ্রীকেরাও তদ্রূপ দেশমধ্যে স্থান-সঙ্কীর্ণ হইলে, ক্রমে ক্রমে সন্নিকটস্থ দ্বীপাবলী, তাহাতেও সঙ্কুলান না হইলে, আসিয়া মাইনর প্রভৃতি দূরতর স্থানে উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হয়েন। গ্রীকেরা যখন এইরূপ ছড়াইয়া বিভিন্ন দেশগত হইলেন, এবং প্রতিবেশিবর্গ যখন প্রবল হইয়া পরধনলোভে আত্মোন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে ইহাদের উপর শত্রুতাসাধন করিতে লাগিল, তখন সাধারণ শত্রুর প্রতিযোগিতায় ইহাদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এইরূপ একতাবন্ধনের নিমিত্তই অলিম্পিক, ইস্থমিয়ান প্রভৃতি পর্ব্বের সৃষ্টি। এবং শত্রুর অপেক্ষা অল্পসংখ্যক হওয়ায়, সামর্থ্যে তাহাদের প্রতি উপযুক্ত প্রতিযোগিতার নিমিত্ত, ঐ ঐ পর্ব্বসময়ে শরীর-পরিচালক ও বলবিধায়ক ক্রীড়া কৌতুকের অভিনয় হইত। এই নিমিত্তই সর্ব্বত্র বলের অর্চ্চনা, সর্ব্বত্রই সামাজিক নিয়মাবলীর মধ্যে বল প্রতিপোষক নিয়মাবলীর প্রাধান্য। এই নিমিত্তই স্পার্টা নগরে লাইকার্গসের অদ্ভুত নিয়মাবলীর উদ্ভাবন হয়; উহা দৈহিক বল বাহুল্য উৎপাদনের অনুরোধে, প্রাকৃতিক বৃত্তিনিচয়কেও ধ্বংশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; —উহার প্রভাবে জননী সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পুরুষ আপন স্ত্রীকে আত্ম অপেক্ষা বলিষ্ঠ পুরুষের সহবাসকরিতে অক্লিষ্টমনে উপদেশ দিয়াছে। এই বলের উত্তেজন সাধন হেতু, হোমারের চিরনূতনত্বময় কাব্য;—এবং ইহারই পরিপোষকরূপে টিটিয়স প্রভৃতি কবিগণের গীতি কাব্যের উৎপত্তি। ইহার তুলনায় ভারতীয় কাব্য পর্য্যালোচন কর, যদিও কোনস্থানে বীররস ক্ষণিক উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা করুণরসের ও বৈরাগ্যভাবের অসীমস্রোতে কোথায় যে ভাসিয়া যায়, তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যায় না। আবার দেখ

গ্রীসে এই বলের প্রভাবে এবং বহিঃশত্রুর উত্তেজনায় বর্দ্ধিত স্বদেশ-প্রিয়তার মোহিনী শক্তির মোহে, সালামিস, থার্ম্মপলি প্রভৃতি তীর্থ নিচয়, গ্রীকদিগের বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ প্রিয়তার চিরসাক্ষ্যরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আর ভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াও, উহা তপঃ-সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি;—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ধনুঃশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের মুখে যোগ আখ্যা শিক্ষা করিতেছেন। সে যাহা হউক, আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রীকেরা এরূপ সুন্দর বল ও সাহস প্রাপ্ত হইয়া বহু সময়ে তাহা স্বজাতীয় রক্তপাতে অপব্যয়িত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ভারতীয়েরা তৎপরিবর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাবে সুখসংমিলনে বাস করিয়া, পরস্পর পরস্পরের হিতকামনায় রত হইয়া, মনের সুখে পরলোকের আশায় আশ্বস্ত রহিয়া স্বচ্ছন্দভাবে জীবনাতিবাহিত করিতেন। ইঁহাদের মধ্যেও যে আত্ম কলহ ছিল না এরূপ নহে। নতুবা কুরু পাণ্ডবাদির যুদ্ধ কল্পনা কোথা হইতে আসিল। কিন্তু যাহা ছিল,তাহা গ্রীকদিগের আত্মকলহের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যায়। ভারতীয়দের এই আত্মকলহ-বিরলতা আভ্যন্তরিক একতার ফল। এবং গ্রীকদিগের মধ্যে ঘনঘন যে আত্মকলহ এবং তাহাতে যে বলবীর্য্য ব্যয়িত হইত;—প্রদেশ পরম্পরায় অন্তরে অন্তরে স্বাতন্ত্র্যভাব, এবং আপনাপনির মধ্যে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি-সম্বন্ধে কেহ কাহারও নিকট ন্যূনতা এবং কেহ কাহারও নিকট বাধ্য-বাধকতা স্বীকার না করাই এরূপ অযথা অপব্যয়ের মূলীভূত কারণ।

ইতি দ্বিতীয় প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজপুতানার ইতিবৃত্ত।

(৪র্থ খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠার পর।)

৩। গ্রাহিলোট—ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে গ্রাহিলোট কুল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা রাজস্থান মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মত। রঘুপতি রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র লব হইতে এই কুল সমুৎপন্ন হইয়াছে। মিবারের সিংহাসন ইঁহাদিগের অধিকৃত এবং ইহাঁরাই রাণা নামে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। মিবারবিবরণে গ্রাহিলোটদিগের বিষয় বিশদরূপে বিবৃত হইবে, এক্ষণে কেবল মাত্র কয়েকটি বাক্যদ্বারা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। কনকসেন নামক জনৈক রঘুবংশীয় রাজা খৃষ্টীয় শকের দ্বিতীয় শতাব্দে কোশলরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৌরাষ্ট্র প্রদেশে গমন করিয়া তথায় সূর্য্যবংশের সংস্থাপনা করেন। এই বংশ

সৌরাষ্ট্রদেশে বল্লভী সিংহাসনে আরোহণ করেন। গাজনী নামে একটি রাজধানী সংস্থাপিত হয়। ষষ্ঠশতাব্দীতে তথাকার সূর্য্যবংশীয় রাজা শিলাদিত্য সপরিবারে যবনগণ কর্ত্তৃক রাজ্যবহিষ্কৃত হন। শিলাদিত্যের মৃত্যু সময়ে তদীয় মহিষী গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে গ্রহাদিত্যের জন্ম হয়। এই পুত্র ইদরনামক একটি ক্ষুদ্রতম রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় নামানুসারে আপনার বংশের গ্রাহিলোট নাম প্রদান করেন। ক্রমে এই বংশ অহর * নগরে আপনাদিগের সিংহাসন স্থাপন করেন, সেই সময় হইতেই ইহাদিগের নাম অহর্য্য হয়। চিতোর নগর এই সময়েই ইহাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই বংশীয় রাহুপ ও মাহুপ দুই সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাহুপ চিতোর সিংহাসনের স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রমরবংশীয় নরপতি বিশেষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজধানী ডুঙ্গরপুর অধিকার করেন। কনিষ্ঠ মাহুপ শিশোদা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া অহর্য্য ও গুহলোট † নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিশোদী নাম গ্রহণ করেন। এক্ষণে শিশোদী বলিলে গ্রাহিলোটকুল বুঝায় বটে, কিন্তু সমগ্র গ্রাহিলোটের অংশবিশেষ বলিয়া ইতিহাসে পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রাহিলোট কুল চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত। যথা;—

১ অহর্য্য, ২ মাঙ্গুলি, ৩ শিশোদী, ৪ পিপর, ৫ কালুম, ৬ গোহর, ৭ ধর্ণিয়া, ৮ গোদা, ৯ মুগরাজা, ১০ ভিমলা, ১১ কামকোটক, ১২ কোটিচা, ১৩ সোরা, ১৪ উহর, ১৫ উজির, ১৬ নিরূপ, ১৭ নাদোরী, ১৮ নাধোত, ১৯ উজক্র, ২০ কুচরা, ২১ দোসদ, ২২ বাটেবার, ২৩ পহা, ২৪ পুরোত। ইহার মধ্যে ডুঙ্গরপুরে অহর্য্য, আরণ্য প্রদেশে মাঙ্গুলি, মিবারে শিশোদী এবং মাড়োয়ারে পিপরগণের অবস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। কালুম হইতে নিরূপ পর্য্যন্ত দ্বাদশশাখা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অতি অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ হইতে চতুর্ব্বিংশ শাখা লুপ্তপ্রায়।

৪ যদু।—চন্দ্রবংশ হইতে যত শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটিই যদুকুলের ন্যায় প্রতিভাশালী নহে। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রস্থানের পর বলদেব ও যুধিষ্ঠির দ্বারকা ও ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে সিন্ধুনদের অপর তীরে গমন করেন। তাঁহারা কলেবর পরিত্যাগ করিলে কৃষ্ণসন্তানেরা কিছুদিন পঞ্চনদের নিকটবর্ত্তী স্থানে * থাকিয়া শেষে জাবুলিস্থান পর্য্যন্ত গমন করেন। তত্রত্য অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পুনর্ব্বার সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া তথায় শালবাহন পুর নামে এক নগর সংস্থাপন করেন। আবার তথা হইতে বিদূরিত হইয়া শতদ্রু ও গারা নদী পারস্থ বিখ্যাত ভারতীয় মরুস্থলে উপনীত হইয়া তত্রত্য লঙ্গা, জোহিয়া, মো-

* আনন্দপুর অহর। রাণাদিগের সুবিখ্যাত রাজধানী উদয়পুর অহরের অতি নিকটে স্থাপিত।

† মিবার-বিবরণে বিশদরূপে বিবৃত হইবে।

* ঐস্থান চারিদিকে গিরিসংকটময়। অদ্যাপি উহাকে "যদুকা ডাঙ্গা" কহে।

হিলা প্রভৃতি বন্যজাতিদিগকে দূরীকরণ পূর্ব্বক ১১৫৭ খৃঃঅব্দে ক্রমান্বয়ে তানোট, দেরবল ও জসলমেরের নগর * সংস্থাপিত করিলেন। এই শেষোক্ত নগর যদুভট্টীদিগের বর্ত্তমান রাজধানী। ভট্টীরা গারানদীর দক্ষিণ পারস্থিত বহুবিস্তীর্ণ জনস্থান অধিকার করিয়া প্রবলপরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। রাঠোরদিগের অভ্যুদয়ে ভট্টীগণ হতবীর্য্য হইয়া পড়ে। ভট্টীরাই যদুকুলের অষ্টশাখার মধ্যে প্রধান। ইহাদিগের পরই জারিজগণ সমধিক গণনীয়। ইহারাও সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। কৃষ্ণের একটি নাম শ্যাম, সেই জন্য ইহারা আপনা দিগকে শ্যামপুত্রও বলিয়া থাকে। সিন্ধু দেশে কতকগুলি শ্যামপুত্র আছে, তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে তাহাদিগকে মুসলমান ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। ইহারা আদি পুরুষের নাম ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা আপনাদিগের বংশ পরিচয়ে কহে যে পারসীক জাম হইতে তাহাদের বংশ আবির্ভূত হইয়াছে। ইহাদিগের এক ক্ষুদ্র রাজার উপাধি এখন পর্য্যন্ত জামরাজ বলিয়া পরিচিত আছে। কিরোলীর রাজগণ যদুবংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইহারা আপনাদিগের পৈত্রিক নিবাস সৌরসেনীর সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই। সুপ্রসিদ্ধ বিয়ানা দুর্গ ইহাদিগেরই অধিকারভুক্ত ছিল; ক্রমে তথা হইতে বিদূরিত হইয়া ইহারা চর্ম্মোন্নতী (চম্বল) নদীর পশ্চিম পারে কিরোলী ও পূর্ব্বপারে সুবলগড় সংস্থাপিত করে। সুবলগড়ের অধিকার ভুক্ত প্রদেশের নাম যদুবতী ছিল। পরে উহা সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। কিরোলীর অধিকারস্থ শ্রীমথুরা অভিধেয় অতি ক্ষুদ্র স্বাধীন ভূমিখণ্ড যদুবংশীয়দিগের হস্তগত আছে। যদুকুল অষ্টশাখায় বিভক্ত। যথা;—১ যদু (কিরোলীর রাজা), ২ ভট্টী (জসলমেরের রাজা), ৩ জারিজ (কচ্ছ ও ভুজের রাজা), ৪ সুমযচা (সিন্ধুদেশীয় মুসলমান), ৫ সুদযচা, ৬ বিদমন, ৭ বুদ্দা, ৮ সোহা। শেষোক্ত শাখা চতুষ্টয়ের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

৫। তুয়ার।—চন্দ্রবংশের শাখাবিশেষ হইতে তুয়ার কুল সমুদ্ভূত হইয়াছে। রাজপুত কুলজ্ঞেরা কহেন পাণ্ডবদিগের শাখাবিশেষ হইতে এই কুল সমুৎপন্ন। রাজকীয় ষট্ত্রিংশৎ কুলের মধ্যে ইহা যে একটি গণনীয় শাখা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিক্রমাদিত্য এই কুলেরই প্রদীপ ছিলেন। * এতদ্ভিন্ন তুয়ারদিগের আরও অনেক পরিচয়ের স্থল আছে। যুধিষ্ঠিরাদির পর ৮০০ বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থ জনশূন্য ও ধ্বংসপ্রায় ছিল; ৭৯২ খৃঃ অব্দে অনঙ্গপাল তুয়ার ঐ নগর পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া প্রজা সংস্থাপন করেন। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে বিংশতিজন তুয়ার বংশীয় রাজা রাজত্ব করিলে, ১১৬৪

* এই নগর ভট্টীদিগের রাজধানী হইবার পূর্ব্বে লোদরওয়া পত্তন রাজধানী ছিল।

* ভারতের ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি বিক্রমাদিত্য পাওয়া যাইতেছে। পুরাতত্বজ্ঞ মহাশয়েরা অদ্যাপি বিক্রমাদিত্যের গোল মিটাইতে পারেন নাই। সৌভাগ্যের বিষয় যে সব বিক্রমাদিত্যগুলিই কোন না কোন গুণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

খৃঃ অব্দে তুয়ার বংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গপাল সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার পুত্র সন্তান ছিল না, চোহান বংশীয় জগদ্বিখ্যাত পৃথ্বীরাজ ইহাঁরই দৌহিত্র। এই পৃথ্বীরাজ মাতামহের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তুয়ারদিগের এসকল গৌরব আর কিছুমাত্র নাই, অধিকন্তু কোন বীর্য্যবান তুয়ারকেও আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না *। চর্ম্মোন্নতী নদীর দক্ষিণপারে তুয়ারগড় এবং জয়পুরের অন্তঃপাতী তুয়ারবতী পত্তন ভিন্ন আর কোন অধিকারই এখন তাহাদের হস্তে নাই। এ দুটিও অন্যান্য রাজপুত রাজ্যের ন্যায় স্বাধীন ভাবাপন্ন নহে।

৬। রাঠোর।—রাঠোরের আদিপুরুষ লইয়া অনেক বিবাদ বিসংবাদ আছে। তাহাদিগের বংশাবলী পত্রে রামের দ্বিতীয় পুত্র কুশ হইতে রাঠোর বংশ সমুৎপন্ন বলিয়া লিখিত আছে। তাহা হইলেই তাহারা শ্রেষ্ঠ সূর্য্য বংশীয় বলিয়া যে পরিচয় দেয় তাহা অসঙ্গত নহে। রাজপুত কবিগণ কহেন রাঠোরেরা কশ্যপ বংশীয়। কশ্যপের ঔরসে অসুর-জননী দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যের জন্ম হয়; রাঠোরগণ সেই বংশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আমরা এই উভয় মতের কোনটিরই পোষকতা করিতে পারি না। ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে, কান্যকুব্জ বা গাধীপুরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাহারা সিংহাসনাধিষ্ঠিত ও অত্যন্ত বলবীর্য্য সম্পন্ন ছিল। চন্দ্রবংশীয় অজমীঢ়ের পঞ্চম নিম্ন পুরুষ কুশিক, তাঁহার পুত্র গাধী, এবং তৎপুত্র বিশ্বামিত্র। গাধীপুর ইহাঁদিগের রাজধানী। কুশিক হইতে তদ্বংশীয়েরা কৌশিক নাম ধারণ করিয়াছে। রাঠোরেরা এই কৌশিক বংশ বলিয়াই অনেক বিজ্ঞ স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। পরে কোশল রাজ্যস্থিত সূর্য্যবংশীয়দিগের সহিত ইহাদিগের বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণের কিছু কাল পূর্ব্বে ভারতের একচ্ছত্রিত্ব লইয়া তুয়ার, রাঠোর, ও চোহান বীরগণ পরস্পর যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই সকলের সর্ব্বনাশ হয়। বলিতে কি সেই আত্মকলহে ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের কর-কবলিত হয়। প্রসিদ্ধ রাঠোর বীর জয়চন্দ্রের পতনে কান্যকুব্জের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে তদীয় পুত্র মাড়োয়ার প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম শিবজী; এই শিবজী হইতে রাঠোরদিগের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি পুনঃস্থাপিত হয়। মন্দোরের অগ্নিকুল-সম্ভূত পরিহারদিগের পতনে মাড়োয়ারের সিংহাসন রাঠোরদিগের করতল-গত হয়! মোগল সম্রাটেরা যত যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তাহার অর্দ্ধেক গুলি রাঠোর বীরবর্গের সহায়তাবলে সম্পাদিত হইয়াছিল। "লাখ তলবার রাঠোরাণ" বাক্যে অনুমিত হয় যে, সম্রাট সৈন্য মধ্যে লক্ষ রাঠোর সেনা সন্নিবেশিত ছিল। ধাঁদুল, ভাদাইল, চাকিত, খোকরা, বাহ্‌রা, রামদেব, কত্রি, হাতুন্দা, মলবৎ, সুন্দু, মুহোলি, গোগাদেব, জয়সিংহ, জোরা প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি শাখায় রাঠোর কুল

* অনেক মহারাষ্ট্রীয় বীরের আদিপুরুষ তুয়ার বংশীয়।

বিভক্ত। মাড়োয়ার বিবরণে রাঠোরদিগের বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইবে।

৭। কচ্ বহ।—ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কচ্ বহেরা রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বংশীয়দিগের দ্বারাই নরবররাজ্য সংস্থাপিত হইয়া মুসলমানাধিকার সময় পর্য্যন্ত হস্তগত ছিল, এক্ষণে উহা সিন্ধিয়া রাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইহাঁরা দশম শতাব্দীতে মিনা প্রভৃতি অসভ্য লোকদিগকে পরাজয় করিয়া অম্বর রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। তৎপরে বৃগুজরদিগের নিকট রাজোর প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করেন। দিল্লির চোহান রাজ সভায় কচ্ বহেরা বহুকাল সম্মানের সহিত প্রভুত্ব করিয়াছেন। মোগল সম্রাটদিগের সময়েও অম্বরেশ্বরগণ সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কচ্ বহ কুলে পৃথ্বীরাজ নামে এক অমিত পরাক্রম নরপতি ছিলেন, পৃথ্বীর সপ্তদশ পুত্র, তন্মধ্যে ৫ জন শৈশবাবস্থায় কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়। অপর দ্বাদশ পুত্রকে তিনি অম্বরের অন্তর্গত দ্বাদশটি প্রদেশ প্রদান করেন; দ্বাদশ কোটরী বলিয়া তাহারা বিখ্যাত *। পৃথ্বীরাজের পূর্ব্বে ঐ বংশীয় উদীকর্ণের পুত্র পিতৃআশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমৃতশীর নামক স্থানের অধিকার গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করেন। উদীকর্ণের পৌত্র শেখজী * হইতে যে বংশ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার নাম শেখাবৎ। ইহাদের স স্থাপিত রাজ্যের নাম শেখাবতী †।

৮। প্রমর।—প্রমরবিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে পুরাণপ্রথিত সুবিখ্যাত অগ্নিকুলের সংক্ষেপ ইতিবৃত্তের প্রয়োজন। যখন আমাদিগের দেশে বৈদিক ধর্ম্মের দিন দিন ক্ষীণ অবস্থা হইতে লাগিল, তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে আর্য্যধর্ম্মদ্বেষী দৈত্যদিগের বিনাশ সাধনের জন্য যে সকল বীর সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরা ভারতে অগ্নিকুল বলিয়া প্রথিত ‡। রাজপুতানার মধ্যবর্ত্তী পবিত্র আবু পর্ব্বতের উপরি এই যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ বৌদ্ধদিগের যুদ্ধ হয়। অদ্যাপি সে অগ্নিকুণ্ড বর্ত্তমান আছে। অগ্নিকুল চারিভাগে বিভক্ত, প্রমর, চোহান, শোলাঙ্কি ও পরিহার। প্রমর সমধিক খ্যাতিপ্রতিপত্তিসম্পন্ন। ইহা যে

* বারো কোটরী বলিয়া খ্যাত; পৃথ্বীর দ্বাদশ পুত্র হইতে এই দ্বাদশ শাখা সমুৎপন্ন হয়। ইহারা অম্বরের অধীন এক একটি প্রদেশের অধ্যক্ষতা করেন, এবং প্রয়োজন হইলে বিপক্ষপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করেন।

* একজন মুসলমান ফকিরের স্মরণার্থ এই নাম হয়।

† আমরা জয়পুরবিবরণে শিখাবতী লিখিয়াছি, কিন্তু তাহা শেখাবতী হইবে।

‡ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলন হওয়ায় বৈদিকধর্ম্মের লোপ হয়। বৌদ্ধেরা নাগ বা তক্ষকবংশ বলিয়া প্রথিত আছে। বৌদ্ধতীর্থঙ্কর পরেশনাথের পতাকায় সর্প অঙ্কিত থাকে। বৌদ্ধদিগকে বিনাশের জন্য অগ্নিকুলের সৃষ্টি; কিন্তু অগ্নিকুলসম্ভূত অনেক লোক যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ বুঝা যায় না

পঞ্চত্রিংশৎ শাখা বিস্তার করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকেই স্থানে স্থানে রাজত্বলাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের এই রাজ্য-বিস্তৃতি বিষয়ে "পৃথিবীই প্রমরের" এইরূপ একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত ছিল। "নকোট মরুস্থলী" নামে তাহাদের অধিকার প্রথিত হইত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ নয়ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রমরদিগের অধিকারস্থ থাকে। প্রমরেরা যে সকল নগর সংস্থাপন বা অধিকার করে,তন্মধ্যে মাহিষ্মতী,বার,মাণ্ডু,উজ্জয়িনী, চন্দ্রভাগা, চিতোর, আবু, চন্দ্রাবতী,মৌ, মইদানা, পরমাবতী, অমরকোট, বেখর,লদর্ভ এবং পত্তন এই কয়টি সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রমরগণ অনহলবাবার শোলাঙ্কিদিগের ন্যায় ধনসম্পন্ন অথবা চোহানদিগের ন্যায় বীর্য্যবান্ ছিলনা বটে,কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা সুবিস্তৃত রাজ্যভোগ করিত। তাহাদিগের জ্ঞাতি পরিহারেরাও প্রমরদিগের নিকট করদরূপে আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করিত। হৈহয়বংশীয় রাজাদিগের আদিম নগরী মাহিষ্মতী প্রমরদিগের প্রথম রাজধানী হয়, তাহার পর বিন্ধ্যপর্ব্বতক্রোড়ে ধারানগর ও মাণ্ডু সংস্থাপিত হয়। উজ্জয়িনীও তাহাদিগের দ্বারা সংস্থাপিত। গ্রাহিলোটদিগের অধিকারের পূর্ব্বে চিতোর নগর প্রমরদিগেরই হস্তগত ছিল। রামপ্রমর যখন তিলঙ্গনায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ কবি চাঁদ সে সময়ের অত্যন্ত শ্লাঘনীয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহেন, "রামপ্রমর ভারতবর্ষে একচ্ছত্রী ছিলেন, ষট্ত্রিংশৎ রাজকুলকে তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন; কেহুরকে কটাইর, রায়পাহাড়কে সিন্ধু উপকূল,তুয়ারকে দিল্লী, চাটরাকে পত্তন, চোহানকে সম্বর, কামধ্বজকে কান্যকুব্জ, পরিহারকে মরুদেশ, চারণকে কচ্ছদেশ ইত্যাদি প্রকার দানের দ্বারা রামপ্রমর বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।" যত দিন পর্য্যন্ত জগতে হিন্দুসাহিত্যের নাম জাগ্রত থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত ভোজপ্রমর* ও তাঁহার নবরত্নময়ী সভার নাম কেহই বিস্মৃত হইবে না। মোরিরাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং বিক্রমবিজয়ী শালিবাহন প্রমরবংশীয় †। সেরসাহের নিকট পরাজিত হইয়া মোগলসম্রাট হুমায়ুন প্রাণভয়ে পলায়ন করত যাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যাঁহার গৃহে গুণিগণাগ্রগণ্য আকবর জন্মগ্রহণ করেন, সেই অমরকোটেশ্বর প্রমরবংশীয়। প্রমরবংশীয় বিজোলি রাও মহারাণা সভাধিষ্ঠিত যোড়শ সম্মানার্হ অধ্যক্ষের মধ্যে এক জন ছিলেন। পঞ্চত্রিংশতি প্রমরশাখার মধ্যে প্রধান গুলির বিষয় বিবৃত হইতেছে। ১ মোরি—চন্দ্রগুপ্ত এবং চিতোরের পূর্ব্বরাজগণ এই শাখা সমুৎপন্ন। ২ সোডা—গ্রীক ইতিহাসবেত্তাদের মতে সগ্‌দি; ধাত নগরীয় রাজগণ এই কুলসম্ভূত। ৩ শঙ্কলা—পুগলরাজগণ এবং মাড়োয়ার নিবাসীদিগের মধ্যে এই শাখা দৃষ্ট হয়। ৪ খীর—ইহাদিগের রাজধানী খীরালু। ৫ উমরা—৬ সুমরা—পূর্ব্বে আরণ্যপ্রদেশে বাস ছিল, এক্ষণে ইহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছে ৭ বিহিল—চন্দ্রাবতীর রাজগণ। ৮ মৈপাবৎ

* ইনিও এক বিক্রমাদিত্য।

† তুয়ার বিক্রমাদিত্য নামে প্রথিত।

—মিবারের অন্তর্গত বিজোলিয়াজ। ৯ বলহার—উত্তর মরুস্থলীতে দৃষ্ট হয়। ১০ অমৃত—মালবের অন্তর্গত অমৃতবর প্রদেশের রাজগণ। ১১ কাবা—পূর্ব্বে সৌরাষ্ট্রে ছিল এখন সিরোহী প্রদেশে দৃষ্ট হয়। ১২ রেহার, ১৩ ধুন্দা, ১৪ মোরুতী, ১৫ হরেয়ার—ইহারা মালব প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে আধিপত্য করে। নিকুম্ভ, দেব, ধুন্দ, কাহোরী, পুনী, কোহিলা, খেজুর, চাওণ্ডা প্রভৃতি অবশিষ্ট গুলির মধ্যে কোন কোনটি একবারে বিলুপ্তপ্রায়, আর কোন কোনটি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছে।

৯। চোহান—ব্রাহ্মণেরা বৈদিকধর্ম্মবিলোপকারী ভ্রষ্টাচারদিগকে বিনাশ করিবার জন্য দেবদেব মহাদেবের প্রীত্যর্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞাগ্নি হইতে প্রথমে যিনি আবির্ভূত হইলেন, তাঁহাকে যোদ্ধার লক্ষণশূন্য বোধ হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাগারের দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই প্রতিহারী হইতে প্রতিহার বা পরিহার বংশের উৎপত্তি। ব্রাহ্মণেরা দ্বিতীয়বার আহুতি প্রদান করিলে. তাঁহাদিগের চলু অর্থাৎ গণ্ডূষে এক বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। চালুক বলিয়া তাহার নামকরণ হইল। অগ্নিকুণ্ডসম্ভূত তৃতীয় জনের নাম প্রমর। কিন্তু কেহই ধর্ম্মদ্বেষী দৈত্যদিগের বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য না হওয়ায়, মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার দেবারাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। এবার তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হইল। যজ্ঞাগ্নি হইতে সুদীর্ঘকলেবর, উন্নত-ললাট, কৃষ্ণকেশ, ঘূর্ণিত নয়ন, প্রশস্তবক্ষ, বীভৎসদর্শন, অসিচর্ম্ম-শর-শরাসনসমন্বিত চতুরঙ্গ বিশিষ্ট অঙ্গল (অনল) নামা চোহান বীর সমুদ্ভূত হইলেন। সিংহবাহিনী শক্তিদেবী আবির্ভূতা হইয়া চোহান বীরকে "রণজয়ী হও" বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন; "আশাপূর্ণা" * দেবী "তোমার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হউক" বলিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। দৈত্যপতি নিধন প্রাপ্ত হইল, অনুচরবর্গ পাতাল-তলে পলায়ন করিল, ব্রাহ্মণেরা নিষ্কণ্টক হইলেন। কুলপত্রিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আদিপুরুষ অঙ্গল চোহান হইতে দিল্লীর রাজাধিরাজ পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত উনচত্বারিংশ পুরুষ। অজমীরে চোহানবংশীয়দের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। উক্তবংশীয় অজয়পালনামা জনৈক বিখ্যাত বীরপুরুষ কর্ত্তৃক অজমীরদুর্গ সংস্থাপিত হয়। সম্বর হ্রদের তীরবর্ত্তী সম্বর নগরে চোহান বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা সম্বরী রাও নামে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে চোহানেরা ক্রমে ক্রমে সেই প্রদেশেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পুরাবৃত্তপাঠে চোহানদিগের রণকীর্ত্তির ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাণিক রায়ের রণদক্ষতায় ওয়ালিদ্ সেনাপতি কাসিমকে রণসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। গজনীপতি মামুদ যখন আজমীরের মধ্য দিয়া সৌরাষ্ট্র প্রদেশ জয় করিতে যাইতেছিলেন, তখন আজমীরের অধীশ্বর ধর্ম্মধীরাজ তাঁহাকে এরূপ প্রবল পরা-

* চোহানদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম আশাপূর্ণা। ইনিও ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ মাত্র।

ক্রমে আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, ভারতের চিরশত্রু মামুদকে পরাজিত হইয়া লজ্জায় পলায়ন করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মধীরাজের পুত্র বিশালদেবও একবার ধর্ম্মদ্বেষী যবনদিগকে আপনার বলবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের কথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র. ইতিহাসপাঠকের হৃদয়ে তাহা স্তরে স্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। চোহানদিগের মধ্যে অনেকেই স্বীয় ভূমি সম্পত্তি রক্ষার জন্য ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বর দাসই প্রথমে পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। চোহানেরা চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত। যথা ;—চোহান, হর, খিচি, সনিগর্‌রা,দেওরা,পাবিয়া, সাঞ্চোরা, গোয়েলোয়াল, ভাদুরিয়া, নর্ভান, মলানী, পূর্বিয়া, সুরা, সদ্‌রেচা, সংক্রেচা, ভুরেচা, বালেচা, তসেরা, চাচেরা, রোসিয়া, চুণ্ডু, নাকুম্প, ভাওয়ার, বাংফট। ইহার মধ্যে কোটা, বুঁদী ও সাঞ্চোরের চোহান,গাগ্রোণ ও রঘুগড়ের খিচি, সিরোহির দেওরা, ঝালোরের সনিগর্‌বা, ইহারাই সমধিক প্রসিদ্ধ, অদ্যাপি ইহাদিগের শিরায় চোহানশোণিত প্রবাহিত বলিয়া বোধ হয়।

১০। চালুক বা সোলাঙ্কি—প্রমর ও চোহানদিগের যতদূর পর্য্যন্ত প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, চালুকদিগের ততদূর পাওয়া যায় না। ইহারা যে সে সময়ে খ্যাতিপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ছিল না এমন নহে, কেবল নিদর্শনপত্রের অভাবেই ইহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল সাধারণের অগোচর রহিয়াছে। রাজপুতগণের কবিবাক্যে অবগতি হইতেছে যে, রাঠোরদিগের কান্যকুব্জাধিকারের পূর্ব্বে চালুকেরা খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কুলপত্রিকা পাঠে অবগতি হয়, লুকোট (লাহোর) নগরে চালুকদিগের বাস ছিল। ভট্টীরা যখন পঞ্চনদ সমীপবর্ত্তী প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপনোদ্দেশে উপনীত হয়, তখন মুলতান ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ডে লাঙ্গা * ও তোগ্রা জাতি বাস করিত, তাহারা ভট্টীদিগের প্রতি যার পর নাই শত্রুতা করিয়াছিল। ইহারা মলবর উপকূলস্থিত কল্যাণ প্রদেশের রাজবংশসম্ভূত। অদ্যাপি তথায় ইহাদের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা কল্যাণের শোলাঙ্কিবংশসম্ভূত। অহ্নলবর পত্তনের চাওরাবংশে শোলাঙ্কিবীজ পতিত হইয়া তথায় তাহাদিগের বংশবিস্তার হয়। জয়সিংহপুত্র শোলাঙ্কি যুবক মূলরাজ কল্যাণ হইতে অহ্নলপত্তনের অধীশ্বর ভোজরাজের নিকট আগমন পূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করেন। কালে ভোজ-দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অপুত্রক ভোজরাজের মৃত্যু হইলে ৯৩১ খ্রীঃ অব্দে তদীয় জামতা মূলরাজ সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ রাজ্য পালন করেন। এই ভোজরাজ ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে চাওরা বংশীয় ছিলেন। মূলরাজের পুত্র চামুন্দের রাজত্ব সময়ে চিরশত্রু গজনীপতি মামুদ অহ্নলবর পত্তনের যাবতীয় ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। ইহার ন্যায় ধনসম্পত্তিশালী নগর ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল না। ইহার বাণিজ্য অতি বি-

* লাঙ্গাদিগকে মালখানী কহিত। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কেহ মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মালখাঁ নাম ধারণ করে।

স্তৃত ছিল, সুতরাং লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমানা ছিলেন। অহ্লনপত্তন দুর্দ্দান্ত যবনকরে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া কিছুকাল নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন থাকে; তৎপরে মূলরাজ হইতে সপ্তমপুরুষ সিদ্‌রায় জয়সিংহ * যখন সিংহাসনাধিকারী হইয়া রাজত্ব ভোগ করেন, সে সময়ে অহ্লবর পত্তন পুনরায় পূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে ধনরত্নসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নগর হইয়া উঠে। ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে ইহাদিগের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, যদি বীর্য্যবত্তায় তাহার কিয়দংশও হইত, তবে ইহারা ভারত মধ্যে ধনে, মানে, কুলে সকল জাতীর শীর্ষস্থান অধিকার করিত তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দ্বাবিংশতি সংখ্যক ক্ষুদ্র প্রদেশের উপর সিদ্‌রায় জয়সিংহের আধিপত্য ছিল। এই প্রদেশ গুলি কর্ণাট হইতে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিদ্‌রায়ের অযোগ্য উত্তরাধিকারী কোন কারণবশতঃ পৃথ্বীরাজ চোহানের বিষনয়নে পতিত হইয়া অধিকারচ্যুত হন। চোহানবংশীয় কুমারপাল সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইনিও বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠবল ছিলেন। সাহেবুদ্দিনের প্রতিনিধিবর্গ কুমারপালরাজত্বের শেষ-সময় হইতেই দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। কুমার পালের উত্তরাধিকারী বল্ল মূলদেব হইতেই অহ্লবরে চোহান রাজত্ব বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ইহার পরেই পুনর্ব্বার শোলাঙ্কিবংশ সিংহাসনে সংস্থাপিত হইল। বাঘরাও নামে সিদ্‌রায়ের এক পুত্র হইতে বাঘেল বংশের উৎপত্তি হয়। উক্তবংশীয় বিলালদেব অহ্লের সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক যবনকরবিনষ্ট দেবমন্দিরাদির সংস্কার আরম্ভ করিলেন। সোমনাথের মন্দির আবার পূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। অহ্লবর পত্তন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ আলাউদ্দিন সকল সুখ হরণ করিল। এই দুর্ব্বৃত্ত দুরাচারবর্গ লোভপরবশ হইয়া গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের অনেক সমৃদ্ধিশালি নগর ও জনস্থান এককালে উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধদিগের পবিত্র পর্ব্বত শত্রুঞ্জয় শিখরে যে আদিনাথের মন্দির ছিল, তাহা বিনষ্ট করিয়া তথায় মুসলমান দরবেশদিগের আরাধনার জন্য মস্‌জিদ প্রস্তুত হইল; বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি দূর করিয়া দিল, এবং ধর্ম্ম পুস্তক সমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। অহ্লবরের প্রাচীর ভূমিসাৎ করিয়া দুরাচারেরা তাহার ভিত্তি পর্য্যন্ত খনন করত দেবমন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট প্রস্তরাদিদ্বারা তাহা সংপূরণ করিল। এই সময়ে শোলাঙ্কিরা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। প্রায় একশত বর্ষ পর্য্যন্ত অহ্লবরের সিংহাসন শূন্যপ্রায় থাকার পরে, কোন অলক্ষিতপূর্ব্ব কারণে শোলাঙ্কিবংশীয় এক ব্যক্তিই উক্ত নৃপাসনে আসীন হইলেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে শোলাঙ্কি বংশীয় কোন. কোন শাখা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, মজঃফর নামক জনৈক শোলাঙ্কি মুসলমান গুজরাটের সিংহাসন অধিকার

* এল এদ্রেসী নামক নিউবিয়া দেশীয় ভূগোলবেত্তা সিদ্‌রায় জয়সিংহের সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তিনি জয়সিংহকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াছেন।

করে। সম্ভবতঃ মজঃফর নগর ইহার দ্বারাই সংস্থাপিত হয়। ইহার পুত্র আহাম্মদ সিংহাসনারোহণ করিয়া মহা সমৃদ্ধিশালি আহাম্মদাবাদ নগর সংস্থাপন করে। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব হইতেই অনেক শোলাঙ্কি নানা স্থানে গমন পূর্ব্বক তত্তৎপ্রদেশে অধিকার বিস্তার পূর্ব্বক বদ্ধমূল হইয়াছিল। শোলাঙ্কি ষোড়শ বিভাগে বিভক্ত। যথা;—১ বাঘেল,—বাঘেলখণ্ডের রাজা, রাজধানী বন্ধুগড়; পীতাপুরের রাও; থিরডের রাও ইত্যাদি। ২ বীরপুরা—লুনাবরের রাও। ৩ বেহিলা—মিবারের অন্তর্গত কল্যাণপুরের রাও। ৪ ভূর্ত্তা—৫ কালাচ—জসলমেরের অন্তঃপাতী বারু, তেকৃরা ও চাহির প্রদেশে বাস; ইহারা ঘোরতর নৃশংস দস্যু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৬ লাঙ্গা—মুলতানের মুসলমান। ৭ তোগ্রা—পঞ্চনদের মুসলমান। ৮ বিক্রু—পঞ্চনদের মুসলমান। ৯ সূর্কি—দাক্ষিণাত্যবাসী। ১০ শিবুরিয়া—সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত গির্ণারবাসী। ১১ রাওকা—জয়পুরের মধ্যস্থিত থোডানিবাসী। ১২ রাণিকিয়া—মিবারের অন্তর্নিবিষ্ট দায়সুরী নিবাসী। ১৩ খাক্‌রা—মালবের মধ্যে আলোট ও জৌরাবাসী। ১৪ টণ্টিয়া—শকুনবাড়ী প্রদেশস্থ প্রসিদ্ধ দস্যু। ১৫ অলমেচা—স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। ১৬ কলামর—গুজরাট।

(ক্রমশঃ।)

সূর্য্য।

সূর্য্যের বিবরণ আমরা বাল্যকালে স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়দের নিকট যাহা শুনিয়াছি বা যাহা শিখিয়াছিলাম, তাহা বলিতে গেলে কিছুই নহে। অদ্যাপি যে সকল ব্যক্তি ইউরোপীয় ভাষা জানেন না, তাঁহারা মনে করেন এক দিন ক্ষুদ্র বাঙ্গালা বহিতে সূর্য্য বিষয়ে যাহা পড়িয়াছিলেন তাহাই প্রচুর। ফলতঃ সূর্য্যসম্বন্ধে দিন দিন এত তত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে যে, তদ্বিষয় অনুশীলন করিলেও বিষম বিস্ময় জন্মে। অদ্য আমরা অতি সংক্ষেপে সূর্য্য বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিব।

আমাদের এই পৃথিবীর মত ১২,০ পৃথিবী একত্র করিলে যত বড় হয় সূর্য্য ঠিক তত বড়। যদি এ কথায় সূর্য্যের বৃহৎ অবয়ব মনে ধারণা না হয়, তবে আর দুই রকমে বুঝাইব। পৃথিবী হইতে চন্দ্র গড়ে ২,৩৭,৬০০ মাইল দূরে থাকিয়া আপন কক্ষে ভ্রমণ করে। এই চন্দ্রকক্ষের দুইটির সমান সূর্য্য। অথবা যদি এরূপভাবে পৃথিবীকে সূর্য্যের মধ্যদেশে বসান যায় যে, চন্দ্র নিজ কক্ষ ঘুরিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তথাপি চন্দ্রকক্ষ সূর্য্যপৃষ্ঠ হইতে ১,৮৭,০০০ মাইলেরও অধিক নীচে থাকিবে।

পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯,১০,০০,০০০ মাইল দূরে অব-

স্থিত। এত দূর হইতে দেড় মিনিটে রশ্মি আসিয়া ধরাপৃষ্ঠে পড়ে। রশ্মি এক সেকেণ্ড সময়ে ১,৮৬,০০০ মাইল দূরে যাইয়া থাকে। আলোকের গতির ঠিক এই পরিমাণে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অতি দূরবর্ত্তী যে সকল নক্ষত্র মিটি মিটি করিতে থাকে, তাহাদের আলোক আসিয়া পৃথিবীতে পৌছিতে ৩,৫০০ বৎসর কালের আবশ্যক। মোজেসের সময় নক্ষত্রের বিক্ষিপ্ত আলোক এত দিনেও পৌছিয়াছে কি না সন্দেহজনক।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯,১০,০০,০০০ মাইল দূরে থাকিলেও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে উহা ১,৮০,০০০ মাইল নিকট আনিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। বোধ হয় উত্তরকালে যন্ত্রবলে উহা হইতেও নিকট দেখা যাইবে।

অনন্ত নভোমণ্ডলে একটি উজ্জ্বল পিণ্ড ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সূর্য্যকে আমরা এই অবস্থায় দেখিতে পাই। কিন্তু সূর্য্যলোক হইতে তথাকার অধিবাসীগণ এই পৃথিবীকে বোধ হয় একটি চণকের ন্যায় দেখিতে পান, কি দেখিতেই পান না।

সূর্য্য যে পরিমাণে বৃহৎ সে পরিমাণে ইহার গুরুত্ব অতি অল্প, ইহার আকার পৃথিবী হইতে ১২,০০,০০০ গুণ বড় হইলেও ওজনে পৃথিবী হইতে মাত্র ৩,০০,০০০ গুণ অধিক। সূর্য্যের চারি ভাগের এক ভাগই কেবল গভীর গহ্বরময়। কিন্তু গহ্বরতা-জনিত অভাব উহার অতি বিপুল দেহ পূরণ করিয়া লইয়াছে। সুতরাং অনুগত নক্ষত্ররাজি উহার আকর্ষণ অভাবে অচল ও বিশৃঙ্খল হইতে পারে না। সূর্য্যশরীরের বিপুলতা নিবন্ধন আরও একটি সুবিধা এই হইয়াছে যে, উহার প্রভূত উত্তাপ ও আলোকদাম উহার সঙ্গীয় সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ এবং সর্ব্বশ্রেণীস্থ নক্ষত্রমণ্ডলী সমভাবে ভোগ করিতে পারে।

সূর্য্য এবং উহার সহচর গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রবৃন্দ সমবেত হইয়া কত যুগ যুগান্ত হইতে এমন একটি পরমাশ্চর্য্য যন্ত্রস্বরূপ হইয়া প্রতিনিয়ত আপন নির্দ্দিষ্টপথে ঘুরিতেছে যে, অদ্যাপি এই প্রকাণ্ড ও আশ্চর্য্য যন্ত্রের কোন বিশৃঙ্খলভাব ঘটে নাই!!

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রভূত রশ্মিরাজির নিদানভূত প্রকাণ্ড সৌরজগৎ সৃষ্টির অদ্বিতীয় পদার্থ নহে। জ্যোতির্বিজ্ঞানানুসারে ধরিয়া দেখিলে ইহাও অন্যান্য নক্ষত্রের ন্যায় একটি বড় নক্ষত্রমাত্র। অনন্ত নভোমণ্ডলে যে সংখ্যাতীত নক্ষত্রমালা দেখা যায়, ইহাদিগের মধ্যস্থলে এক একটি বড় নক্ষত্র সংস্থাপিত হইয়া কতকগুলিন নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের অধিনায়করূপে কার্য্য করিতেছে। ঐ বড় নক্ষত্রকেই আমরা সূর্য্য বলি। এই সূর্য্য ইহার নির্দ্দিষ্ট সঙ্গীয় নক্ষত্রগণ লইয়া একটি যন্ত্রস্বরূপ চলিতেছে। এই সৌরযন্ত্র একটি নহে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য সৌরযন্ত্র সৃষ্টির নানা দেশে বিরাজ করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, সৌরযন্ত্রও সংখ্যাতীত। প্রকৃতির এই মনোহর রহস্য স্থিরচিত্তে ভাবিলেও শরীর ও মন বিস্ময় ও আনন্দজলে আপ্লুত হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত অসংখ্য সূর্য্যের কথা থাকুক। আমরা প্রতি দিন যে সূর্য্য প্রাতে

মধ্যাহ্নে এবং দিবার সকল সময়ে দেখিতে পাই, সেই সূর্য্যের বিষয়ে যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাই এস্থলে বক্তব্য।

সাধারণতঃ এইরূপ বোধ হয় যে,সূর্য্য একটি নিষ্কলঙ্ক জ্যোতিঃপূর্ণ মণ্ডল। এবং সেই জ্যোতিষ্কশরীর নিয়ত আমাদের এই দিগে রহিয়াছে, বহু চেষ্টার ফলে জানা গিয়াছে যে, সূর্য্য ঠিক ঐরূপ নহে। এবং উহার সকল স্থান সমান বা একরূপও নহে। সূর্য্য ও পৃথিবীর আবর্ত্তন প্রণালী ঠিক একই রীত্যনুসারে হইয়া থাকে। তবে বিভেদ এই মাত্র যে, পৃথিবীর ন্যায় দ্বাদশ ঘণ্টায় উহার কক্ষাবর্ত্তন না হইয়া পঞ্চবিংশতি দিবসে নিষ্পন্ন হয়।

সূর্য্য-শরীরে কতকগুলিন কাল কাল দাগ দেখাযায়, ঐ সকল দাগকে সাধারতঃ সূর্য্য-কলঙ্ক বলে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যও কলঙ্কলাঞ্ছিত। কিন্তু আশ্চর্য্য যে ঐ সকল কলঙ্ক কোন সময় বড় বড় ও কোন সময় ছোট ছোট দেখা-গিয়া থাকে। এবং উহা সর্ব্বদা এক রকম থাকে না। আবার কখনও বা দেখাযায় ঐ সকল দাগ যেখানে ছিল, সেখান হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন সূর্য্যের গতিবশতঃই এরূপ বিসদৃশ লক্ষিত হয়। ফলতঃ সূর্য্য-কলঙ্ক সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, অদ্যাপি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এবং পণ্ডিতগণ তাহা জানিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন।

সূর্য্য-গাত্র কৃষ্ণবর্ণ এবং উহার শরীরের চারিদিক ব্যাপিয়া এক স্তর উজ্জ্বল পদার্থ আছে। ঐ পদার্থ হইতে সূর্য্য ও পৃথিবীর দিগে আলোক এবং কিরণ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উহারই নাম (Photosphere) আলোক চক্র। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে গ্লাসগো-নিবাসী উইলসন সাহেব এই স্থির করিয়াছিলেন যে, ঐ আলোকচক্রের স্থানে স্থানে ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র দিয়া সূর্য্যের প্রকৃত কৃষ্ণ শরীর দেখা গিয়া থাকে। এখনকার পণ্ডিতগণের মতানুসারে উইলসন সাহেবের এ সিদ্ধান্ত একবারে অপ্রামাণ্য নহে।

উল্লিখিত কালদাগ আবার সকল সময় কালো দেখাযায় না। সময় সময় উহার মধ্য দিয়া মশালের (Faculae) আলোকের মত এক প্রকার ভয়ঙ্কর আলোকজিহ্বা ধক্ ধক্ করিয়া বাহির হয়। এই কৃষ্ণগহ্বর সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে আশ্চার্য্য পরিবর্ত্তন করে। এক দিনের মধ্যে এমন কি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইহার বিষম বৈষম্য দেখা গিয়া থাকে। কখন কখন এই গহ্বর-কলঙ্কের আকার এরূপ প্রকাণ্ড হয় যে, পঞ্চাশ হাজার মাইলও তাহার বিস্তৃতির তুলনায় সামান্য। এই পৃথিবীর ন্যায় কএকটা পৃথিবী এক যোগে ঐ বিশাল গহ্বরে ফেলাইয়া দিলেও অবাধে ডুবিয়া যাইতে পারে।

সূর্য্যগ্রহণ সময়ে যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে জানা গিয়াছে যে সূর্য্যের উপরিভাগ সমান নহে। যখন চন্দ্রশরীর সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন দেখা গিয়াছে যে, আলোক-চক্রের চতুষ্পার্শ্ব হইতে বিশাল পর্ব্বত প্রমাণ লোহিত বর্ণাত্মক কোন পদার্থ উর্দ্ধে ও চারি দিগে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আলোক-চক্রের প্রজ্বলিত রশ্মিরাজি চাপা

পড়িলেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন ফরাসি জ্যোতির্ব্বিদ্ এই অবস্থার একটি ফটোগ্রাফ্ তুলিয়াছিলেন। উহাতে গ্রহণ কালীন সূর্য্য ও আলোক ঢাকা পড়িলে যে আলোকের প্রতিবিম্ব চারিদিগ দিয়া ছড়াইয়া পড়ে, তাহার সুন্দর চিত্র উঠিয়াছে। তিনি ঐ সময় ইহাও দেখিয়াছিলেন যে, প্রভূত আলোক ও অগ্নিস্রোত মহাবেগে ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় সহস্র সহস্র মাইল দূরে উঠিতেছে। এবং ঐ সকল রক্তবর্ণ অনলজিহ্বা যেন সূর্য্যগাত্র বিদীর্ণ করিয়া আগ্নেয়গিরির তপ্ত উচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রভূত বলে নিঃসৃত হইতেছে। এরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, ঐ বিশাল অনলশিখা আলোক-চক্র ছাড়াইয়াও ৭২০০০ মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিত বলেন যে, যদিও ইহা অগ্নিস্রোত বা অগ্নিশিখার ন্যায় দেখা যায়, ফলতঃ উহাতে দহনক্রিয়া একবারেই নাই। উহা কতকগুলিন তপ্তোজ্জ্বল বাষ্প সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেখানে অক্‌সিজন কি অন্য বায়ু দাহন ক্রিয়ার পোষকতা করে, সেই খানেই আগুন ধরিতে পারে। সুতরাং ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, ঐ স্থানে হাইড্রোজান ব্যতীত আর কোন বায়ু নাই। তাহা না হইলে ঐ অনলশিখায় সমস্ত পুড়িয়া ছারখার করিয়া ফেলিত।

আলোক-চক্র অবিশ্রাম তরঙ্গ-সঙ্কুল। যেন দ্রবাগ্নির মহাসাগর প্রচণ্ড ঝড়ে আন্দোলিত হইয়া প্রতিনিয়ত বিশাল আগ্নেয় উর্ম্মিমালা উদ্গীরণ করিতেছে। এই তরঙ্গান্বিত আলোকদাম সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং অন্যান্য নক্ষত্রবৃন্দকে উজ্জ্বল করিতেছে। নিরন্তর তরঙ্গ প্রবাহে আলোক এবং তাপ ইহা হইতেই জন্মিতেছে। কি কি অনুকরণে আলোক-চক্র প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, তাহা নূতন আবিষ্কৃত এক প্রকার বিশ্লেষণ (Spectroscope) যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে। আশ্চর্য্য এই ইহাদ্বারা সূর্য্য প্রভৃতির ন্যায় যে কোন জ্যোতিষ্ক শরীর পর্য্যবেক্ষিত হউক, উহা যতদূরেই কেন থাকুক না, অনায়াসে বলিয়া দিতে পারা যায় যে, উহা কি কি দ্রব্যের সংমিশ্রণে গঠিত। সুতরাং এই উপায়ে জানা গিয়াছে যে সূর্য্যে সোডিয়াম্ (Sodium) ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ (Magnecium) বেরিয়ম্ (Barium) ও লৌহের প্রভূত বাষ্প বিরাজিত রহিয়াছে। এবং তন্মধ্যে হাইড্রোজান্ (Hydrogen) বায়ুও একটি প্রধান উপকরণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

আলোক-চক্রের অব্যবহিত পরেই এক স্তর তপ্তোজ্জ্বল হাইড্রোজান বায়ু আছে। তাহার নাম (Chromosphere) বর্ণ-চক্র। যে ভয়ঙ্কর মহাশিখার কথা বলা গিয়াছে বর্ণ রাজ্যই তাহার উদ্ভব-স্থান। ইহার পরেই ধাতব বাষ্প এবং উহা হইতে সঞ্চিত মেঘ-চূর্ণ-ময় আর একটি প্রশস্ত স্তর আছে। এই স্তর হইতে আলোক নির্গত হয়। উত্তাপ মন্দীভূত হইলে আলোক নির্গম হয় না। এই জন্যই আলোক চক্রে নিয়ত বিষম তরঙ্গ হইতেছে।

ঐ তরঙ্গের আবেগে যাহা উষ্ণ তাহা নিরন্তর ঊর্দ্ধগত হইতেছে এবং শীতল পদার্থ বেগে নীচে আসিয়া পড়িতেছে। সূর্য্য কলঙ্কে যে সময় সময় মশালের ন্যায় বিশাল

প্রজ্বলিত শিখা দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ তরঙ্গ প্রবাহে উষ্ণীভূত ঊর্দ্ধগামী বায়ু বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাহা কাল দেখাযায় উহাও ঐ তরঙ্গ-বিতাড়িত স্নিগ্ধপদার্থ,—বর্ণ-চক্র হইতে আলোক-চক্রের গহ্বর মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে।

এখন দেখা যাউক সূর্য্য ও উহার সঙ্গীয় গ্রহ মণ্ডলী কিরূপে এবং কি কি উপাদানে সৃষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্ব দেশীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থেই লিখিত আছে, পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। একথা একপ্রকার সত্যই। যাহা কঠিন বা ইন্দ্রিয়-বোধগম্য নহে, তাহাকে সাধারণতঃ ‘কিছু নয়’ ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ?

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, আদিতে কিছুই ছিল না। শুদ্ধ কতগুলিন নিহারিকায় (Nebulae) অনন্ত শূন্যরাজ্য ব্যাপিত ছিল। কোন কোন পণ্ডিত এই সকল নিহারিকা বা মেঘচুর্ণকে নক্ষত্রাণু বলিয়া থাকেন। কেন না উহাই নক্ষত্র সকলের শরীরোপকরণ। এই নিহারমালা বা নক্ষত্রাণুরাশি কতিপয় প্রাকৃতিক শক্তি যোগে বহুকালে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া একত্রীভূত হয়। এই যে স্থল জল ধাতু পর্ব্বত জীব শস্য, এমন কি যে বায়ু আমরা গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করি, ইহাও ঐ নিহারিকা সমষ্টিভূত—অবস্থা এবং শক্তি ভেদে মাত্র রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাহা বুঝাযায়।

এই নিহারিকা রাশির সংখ্যা কত ও আদিতে উহা কি পরিমাণে বিস্তৃত ছিল কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। সমস্ত বিশ্বসংসার ইহাতে পূর্ণ হইয়া থাকাও অসম্ভব নহে, অদ্যাপি ইহা সংসারে থাকিয়া বহুল নূতন নক্ষত্ররাজি গঠন করিতেছে। হর্শেল সাহেব ইহাদিগের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তিনি দূরবীক্ষণ দ্বারা পাঁচহাজার হইতেও অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নূতন নক্ষত্র বা নক্ষত্রাণুর ক্ষুদ্র সমষ্টি আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে হর্শেল সাহেবের আবিষ্কার্য্যের বিবরণ এস্থলে কিছু লিখিব না।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি জ্যোতির্ব্বিদ্ ডাক্তর প্লে, তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রহতত্ত্বে * লিখিয়াছেন যে, নিহারিকার সমষ্টি সংঘটনা কেবল মাধ্যাকর্ষণের ফল। তাঁহার মতে—প্রথমতঃ কতকগুলিন নক্ষত্রাণু সমষ্টিভূত হইয়া প্রকাণ্ড একটি পিণ্ড হয়। পরে ক্রমে আরও নক্ষত্রাণুরাশি সংযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডাকারে তাহার শরীরের চারিদিগ ঘেরিতে থাকে। ঐ সমস্ত পিণ্ডরাশি প্রবল আকর্ষণ বশতঃ বিষম ঘুর্ণিত হইতে থাকে এবং অবশেষ তাহা হইতে চক্রাকারে কতগুলিন বিচ্ছিন্ন এবং ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই বিক্ষিপ্ত চক্র ভাঙ্গিয়া এবং ছড়াইয়া পড়িয়াই গ্রহ নক্ষত্র হইয়াছে। তিনি বলেন শনিশ্চক্রই ইহার সুন্দর উদাহরণ স্থল। সূর্য্য, চক্রেশ্বর হইয়া প্রকৃতি-নির্ণীত যথাপথে উহাদিগকে চারিদিগে রাখিয়া চালাইতেছে।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতেন যেরূপ

* **Mecanique Celeste Par. La. Place.**

পৃথিবী, এইরূপ আর মাত্র সাতটি গ্রহ আছে। কিন্তু বাস্তব এইরূপ গ্রহই একশত চৌত্রিশটির ন্যূন নহে। ইহাদের নাম পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর ছোট ছোট যে কত আছে, তাহার সংখ্যা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহার কোন কোনটা পৃথিবীর আকর্ষণে পড়িয়া ছুটিয়া পড়ে। ইহাকেই সাধারণতঃ উল্কাপাত বলিয়া থাকে, এই গুলি উপগ্রহ বলিয়া বাচ্য।

একরূপ নিশ্চিত হইয়াছে যে, এই পৃথিবী সূর্য্যগাত্রের অংশ নির্ব্বিশেষ *। সূর্য্যে যাহা আছে ইহাতেও তাহা আছে। ইহা সূর্য্যগাত্র হইতে যদিও ছুটিয়া পড়িয়া শীতল হইয়া গিয়াছে, তথাপি পূর্ব্বতাপ অদ্যাপি ইহার শরীর হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। আগ্নেয় পর্ব্বতাদি ইহার নিদর্শন স্থল।

আর একটি কথা বলিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

আমরা যে তাপের কথা বলিলাম, এবং যে তাপ সূর্য্যে আছে,ইহার উৎপত্তি কিরূপে হইল?--উত্তর, শক্তি বা আকর্ষণই ইহার কারণ। অণুরাশি পরম্পরায় ভয়ঙ্কর সংঘাত উপস্থিত হইলেই তাপের উৎপত্তি হয়। অনন্ত রাশি প্রমাণ নিহার-সাগরের প্রচণ্ড হিল্লোলেই সূর্য্যকে নিয়ত উত্তাপ যোগাইতেছে, সূর্য্য আবার তাহা অনুবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডলীকে যোগাইতেছে।

যখন যে ভাবেই উত্তাপের উৎপত্তি হউক না কেন এ উত্তাপ আর কাহারও নহে 'সূর্য্যের'। খনিজ কয়লা উদ্ভিজ্জ হইলেও সূর্য্য উত্তাপ উহাতে পূর্ণ থাকে। আমরা অগ্নি দ্বারা সেই উত্তাপ তাহা হইতে মাত্র বিযুক্ত করিয়া থাকি।

* পৃথিবী ও সূর্য্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে অসংখ্য প্রাচীন অদ্ভুত ও রহস্যজনক মতামত গ্রীক্, ফরাসি, জর্ম্মণ, কালডিন, লাটিন, মোহক, হিন্দু ও মুসলমান পুরাণাদি হইতে সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

পঞ্চতেওতার ইতিহাস ১ম খণ্ড।

মানসিক অপরিপাক।

দৈহিক বিকাশের ন্যায় আমাদিগের মানসিক বিকাশও রস-পরিপাক-সাপেক্ষ। আমাদিগের দৈহিকতন্তুসমূহ ও চিন্তা-পরম্পরা সম-প্রণালীতে সংগঠিত হইয়া থাকে। ব্যবহারক্ষম হইবার পূর্ব্বে উভয়েরই অপক্ক উপাদান গুলিকে প্রকৃত প্রস্তাবে একই প্রকার প্রক্রিয়ার বশবর্ত্তী হইতে হয়।

আমাদিগের দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ পাক-ক্রিয়ার জন্য পৃথক্ যন্ত্রমালা আছে। প্রত্যেকটি তাহার নিজের নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া নির্ব্বাহের পক্ষে, অর্থাৎ যে জাতীয় অশন প্রস্তুত করা যাহার কার্য্য তৎপ্রতিপাদনে, এবং যে যে মূল পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রত্যেকের উপচারবর্গ বিষয়ভেদে অস্থি,

মাংস অথবা মস্তিষ্কোৎপন্ন বস্তু (চিন্তাদি) স্বরূপে পরিণত হইবার যোগ্য হয় তত্তৎপ্রবর্ত্তনে, সম্যক্ উপযোগী। উভয়েরই নির্ম্মাণপ্রণালী অতি সূক্ষ্ম এবং উভয়েই বিশৃঙ্খলা ও ব্যাধির অধীন।

সাধারণতঃ আমরা আমাশয় বা জঠরকেই একমাত্র পরিপাকযন্ত্র বলিয়া জানি। বস্তুতঃ পাকপ্রণালী বলিতে কতকগুলি যন্ত্রসমষ্টি সমন্বিত শরীরাপেক্ষা পঞ্চগুণ দীর্ঘ একটি প্রণালীকে বুঝায়।

এই সমুদায় যন্ত্রের প্রত্যেকটি স্বস্ব অধিকারে অপর কোনটির অপেক্ষা অপ্রধান নহে। তাহারা সকলে ভুক্ত দ্রব্য জারণে সহায়তা করে, উহার সারাকর্ষণ সুখকর করিয়া দেয়, এবং দৈহিক তন্তু সমূহের অপচয় ও উপচয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যোপযোগী সামঞ্জস্য রক্ষার্থ অবশ্যপ্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন পরম্পরার সুসাধ্যতা সম্পাদন করে।

সূক্ষ্মতা ও শক্তির কি এক অদ্ভুত একত্র সংস্থানদ্বারা এই সকল যন্ত্র নির্ম্মিত ও পরিচালিত হইয়াছে তাহা মনে ধারণা করা যায় না। ইহারা প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ মণ্ডলের মিলনদ্বারা প্রস্তুত ভুক্তদ্রব্যকে স্বায়ত্ত করিয়া তাহার ব্যষ্টীকরণ করে, তন্ন তন্ন করিয়া উহার জারণ মারণক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, যে উপাদান যে দেহবিধানের হিতকর তাহা নির্ব্বাচন করে, এবং পরিশেষে তাহাদিগকে গড়িয়া পিটিয়া আমাদের শরীরাবয়ব-বিশেষে পরিণত করে। অপিচ এই সংযুক্ত ক্রিয়া এমনই চমৎকারজনক যে প্রকৃতি তৎসাধক যন্ত্রমালা আমাদিগের আয়ত্তের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, যেন পাছে প্রক্রিয়া আরম্ভ হইলে আমরা কোনরূপ ব্যাঘাত উৎপন্ন করি বলিয়া নিবারণ করিবার জন্য।

আহারের পর শরীরের উৎকৃষ্ট শোণিতাংশ আকৃষ্ট হইয়া দ্রাবক রস, (অর্থাৎ যদ্দ্বারা ভুক্তদ্রব্য দ্রবীকৃত হয় সেই সকল রস) যে যে উপাদানে নির্ম্মিত তত্তদুপাদানবস্তু যোগাইতে থাকে। আমরা যখন নিদ্রিতাবস্থায় থাকি তখনও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র 'গ্রন্থি' এই অতি সূক্ষ্ম-সংযোগ-জাত রস সমূহের চয়নক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকে। আমরা আপন আপন কর্ম্মে যাই, আর এই জীবনবৃক্ষের ক্ষুদ্র শিকড়গুলি দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া দৈহিক বৃদ্ধির উপকরণগুলিকে একবার উদরসাৎ করে আর বার উগরাইয়া দিতে থাকে। আমরা বড় বড় মৎলব ফাঁদিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয় ও রেলপথ গড়িতেছি, নগর উপনগরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছি, আর ওদিকে যে পরার্দ্ধকোটি কোষাণু সমষ্টিতে আমাদের শরীর নির্ম্মিত, তাহারা নিঃশব্দে আমাদের আত্মার ভৌতিক আশ্রয় গৃহের কত ঠাঁই গড়িতেছে, কত ঠাঁই মেরামত করিতেছে, এবং কাল ও ব্যাধির আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষাক্ষম করিতেছে।

স্নায়ুকেন্দ্র সমূহে আগমনবার্ত্তা না জানাইয়া যব-পরিণত খাদ্যও এই দেহ-পোষক প্রণালীর প্রবেশমুখ অতিক্রম করিতে পারে না। উহা আস্বাদনরূপ সঙ্কেত করিবামাত্র জঠর অমনি উহাকে গ্রহণ ও ধারণ করিবার জন্য সজাগ হইয়া উঠে। পরিপাক-যন্ত্র যখন দম-যুক্ত হইয়া চলিতে থাকে তখন একটি প্রশান্ত আনন্দ অনুভূত

হয়, এবং এই আনন্দ আমাদের জীবনের উপভোগ্যতার মাত্রা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। স্বচ্ছন্দ আহারের পর অবয়বে যে প্রসন্নতা লক্ষিত হয়, যে সম্ফূর্ত্তি বলাধান ও উৎসাহের সমাবেশ হয়, তাহা আমাদিগের অভ্যন্তরীণ অদ্ভুত যন্ত্র পরম্পরার ক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক। তখন নাড়ী দ্রুতগামিনী হয়, দেহোত্তাপ বর্দ্ধিত হয়, কোন ক্রিয়ারই ক্রিয়ান্তরের সহিত সঙ্ঘর্ষণ হয় না —চক্রের মধ্যে চক্র ঘুরিতে থাকে, এবং সমস্ত দেহযন্ত্রে সুর বাঁধা থাকে। সর্ব্বত্রই সুমিল, এবং সেই সুমিলের ফল স্বাস্থ্যময়ী সংস্কার-ক্রিয়া।

সেইরূপ, উচ্চতর পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধেও এই সদৃশ-ন্যায় বর্ত্তমান। মস্তিষ্ক আমাদিগের মানসিক খাদ্যের সুমহৎ আধার। ইন্দ্রিয়গণ যে কোন উপকরণ সংগ্রহ করে, জারণ, মারণ ও সারাকর্ষণ জন্য তত্তাবতকেই মস্তিষ্কমধ্যে বহন করিয়া থাকে। পরন্তু এই পরিপাক যন্ত্রের একটি মুখ না হইয়া পাঁচটি মুখ। সর্ব্বপ্রকার ভুক্তদ্রব্যের গমনার্থ একটি মাত্র দীর্ঘ প্রণালী না হইয়া এই উর্দ্ধতন জঠরের অনেকগুলি মার্গ। অধিকন্তু প্রত্যেক বাহকচ্ছিদ্র স্বানুরূপ অশন মাত্র শোধনাস্তে বহন করে। চক্ষুর শব্দগ্রাহিতা নাই, কিংবা কর্ণের তেজোগ্রাহিতা নাই। যে তরঙ্গাশ্রয়ে চিন্তাশক্তিও বোধশক্তির উপহারভূত বাহ্য বস্তু প্রবাহিত হইবে, তাহা যদি যথাযথ না হয় তাহা হইলে উহা প্রবেশ করিতে পাইবে না।

অতএব মানসিক পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকেই সহায়কারী। যে ইন্দ্রিয় যে জাতীয় অশন বহন করিয়া সাধারণ ভাণ্ডার পূর্ণ করে, সেই জাতীয় অশনকে নির্ব্বাচন করাই তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। দর্শন, শ্রবণ, রসনা, ঘ্রাণ, ও স্পর্শ ইহারা সকলেই আমাদিগের মানসিক শক্তি, গুণ ও ধর্ম্মের সহিত বিশিষ্ট সম্বন্ধ রাখে। বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে ইহারা অপরিহার্য্য। মস্তিষ্ক না থাকিলে মনঃ-পদার্থ থাকিত না। যদি ইন্দ্রিয়গ্রাম বিলুপ্ত হইত তাহা হইলে মস্তিষ্কের কিছুই করিবার থাকিত না। চিন্তার উপাদান-সামগ্রী এই পাকযন্ত্রে প্রক্ষিপ্ত না হইলে ইহার ক্রিয়া কার্য্যতঃ রহিত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে রুদ্ধ কর, ভাববিকাশ স্তম্ভিত, অথবা তৎপ্রায় হইবে, ঠিক্ যেমন ডিম্বের উপর একস্তর প্রলেপ দিলে জীবন-সঞ্চার স্থগিত হইয়া যায়—পক্ষিণী তাহাতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাপ দিলেও তাহার শাবক কখনো চিচিকুচী রব করিবে না।

এবম্প্রকারে উপযোগ গৃহীত হইয়া পরে তাহার পরিপাক সম্পন্ন হয়। একবার যথারীতি চিন্তার উপকরণ গুলি আহৃত হইলে স্বাস্থ্যশালী মস্তিষ্ক তাহাদের রক্ষাভার গ্রহণ করে। অপিচ এই পাচন ক্রিয়াও ভৌতিক পরিপাকের ন্যায় আনন্দজনক। সকর্ম্মক মানসচর্চ্চার আমোদের সহিত কোন আমোদেরই তুলনা হয় না। শোণিতস্রোতঃ শিরোদেশে উন্নীত এবং মস্তিষ্কের কুটিল-বাহিনী নাড়ী সমূহে প্রবাহিত হইয়া উহার ক্রিয়াকারিতার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন পূরণ করে। চিত্তবৃত্তি

সকল পরিস্ফুট হয়, এবং ভাবপ্রবাহ বহিতে থাকে। পুরাতন উপাদানচয়ের নূতন নূতন সংযোগ আপনা হইতে উদিত হয়। চিন্তার কলিকাগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করে। আবেগ গুলি ইচ্ছা ও বুদ্ধির সহিত কতই রঙ্গ করে। মন কবিতাশ্রয়ে উড্ডীন, কিংবা দর্শনের ক্রোড়ে স্থিরাসীন হয়। স্বাস্থ্যোপযোগী মস্তিষ্ক চালনা মানবোপভোগ্য আনন্দের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ—উহা সম্মোহক, উদ্দীপক, ও এমন কি উন্মাদক।

যদি এই দুই প্রকারের পরিপাকক্রিয়া বিশৃঙ্খলার বশবর্ত্তী না হইত, তাহা হইলে আমাদের সুখের সমষ্টি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইত। কিন্তু ইহাই নিয়ম যে, যে দৈহিক যন্ত্র যত সুকুমার, এবং মানবীয় সৌখ্যের সহিত যাহার সম্বন্ধসীমা যত বিস্তৃত, তাহার ব্যাধি-প্রবলতাও তত অধিক; এবং উক্ত দ্বিবিধ পরিপাক যন্ত্রের সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যভিচার নাই।

অপেক্ষাকৃত অতি অল্প লোকেই ন্যূনাধিক পরিমাণে অপাক না ভুগিয়া সমস্ত আয়ু কাটাইতে পারে। যদিও স্বীকার করা যায় যে তাবৎ শিশুই নির্দ্দোষ জঠর লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে দন্তোদ্গমকালে অজীর্ণ লক্ষণাক্রান্ত না হইয়া শতের মধ্যে দশটির বেশি উতরায় না। ভোজনক্ষম হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের ভুক্ত-পাচক-প্রণালী বিপর্য্যস্ত হইয়া বসিয়া থাকে। আর মানসিক অপাকের কথা যদি বল, যেসকল বালক কিছু কাল বিদ্যালয়ে গিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই ভুক্তভোগী। ফলতঃ সূতিকাগৃহের বিপদাশঙ্কা বহুতর হইলেও, ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে যে "বাল্যশিক্ষা" যাহার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহার উপার্জ্জন নিমিত্তক বিপদাশঙ্কা তদপেক্ষাও অধিকতর। কারণ জন্মকালে অর্দ্ধ বিকশিতমাত্র বাল-মস্তিষ্ক অতি ধীরে ধীরে তাহার বৃত্তিনিচয়ের পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হয়, এবং তদবস্থ বৃত্তিগুলি সুতরাং দুর্ব্বল ও বিশৃঙ্খলা-প্রবণ থাকে।

যদি সমাজের গুরুতর মর্ম্মস্থান ও শক্তি-বিকাশের সহিত উপস্থিত বিষয়ের সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহার আন্দোলন করিতাম না। কিন্তু যখন তাহা রহিয়াছে তখন আমরা এই মানসিক অপাকের হেতু ও ফল-পরম্পরার অনুসন্ধান না করিব কেন? যদি অন্য কোন ব্যাধি ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণে প্রবল হইত তাহা হইলে আপনারা কেহ বা সুশ্রূষাকারী, কেহ বা রোগী হইতেন, আর আমি বান্ধবে প্রবন্ধ না লিখিয়া স্বীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতাম।

মস্তিষ্কের ক্রিয়ার যাথাতথ্য রক্ষার পক্ষে সর্ব্বাদৌ উহার স্বাস্থ্যভাব প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্য সংযোগ বর্জ্জিলে, পরে দ্রষ্টব্য উহার আহারের মাত্রা ও গুণের উপযোগিতা। রুচি, বুভুক্ষা ও পাচনশক্তির বিচার করিতে হইবে। কারণ অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য সম্বন্ধে যেমন অভিলাষ ও আনুরক্তির নিয়মন কর্ত্তব্য, মাস্তিষ্ক্য আহার সম্বন্ধেও সেইরূপ অধ্যয়ন ও অনুধাবন প্রণালীর নিয়ম বিধান নিতান্ত আবশ্যক। মন যখন যাহা চায়

না, এবং যাহার উপভোগে অক্ষম, এমন কোন গ্রন্থ, সে যতই কেন ভাল হউক না, পাঠকরা, আর অন্নাশয়কে রুচিবিরুদ্ধ ন্যক্কারাকর্ষক পদার্থরাশি দিয়া বোঝাই করা, এ দুইই সমান। উক্ত পদার্থের মূলোপাদানগুলি হয়তো হিতকারী হইতে পারে, কিন্তু ওরূপ করিয়া অমন সময়ে, দেহতন্ত্রের উপর জবরদস্তি করিয়া চাপাইলে পদার্থ সমূহের মধ্যে যে অখণ্ডনীয় যোগ্যযোজ্যতার নিয়ম আছে, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

আমাদের সকলেরই বিশেষ বিশেষ প্রকারের মানসিক অন্নের জন্য প্রজ্ঞা-বা-সহজজ্ঞান-সম্ভূত অভিলাষ বর্ত্তমান থাকে; উহা বিকৃতিপ্রাপ্ত না হইলে, ত্বরায় হউক, বিলম্বে হউক, বিকশিত হয়, এবং কি প্রকার জ্ঞান আমাদিগের হিতকর হইবে তাহার নির্দ্ধারণে সহায়তা করে। যদি স্বেচ্ছাপ্রবর্ত্তিত ও অপ্রাকৃত শাসনের দ্বারা সেই প্রজ্ঞাকে নির্য্যাতন করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে মানসিক অপাক-রোগ-গ্রস্ত হইয়া ভুগিতে হইবে। এই প্রজ্ঞা কেবল ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে না, পরন্তু একই পাত্রে কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হয়। আমরা কেহই সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থ একাসনে বসিয়া, কিংবা এক মাসের মধ্যে পড়িতে পারি না—না সকল রকমের অন্নব্যঞ্জন এক ভোজনে খাইতে পারি—কিন্তু, তথাচ, কৌমার ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে কোন না কোন সময়ে, হয় তো, সকলগুলিই আমাদিগের উপভোগ্য ও ব্যবহার্য্য হইতে পারে।

নিতান্ত ব্যাধিবিকৃত না হইলে বুভুক্ষানিয়ামিকা প্রজ্ঞা সূক্ষ্মরূপে পরিপাক-ক্ষমতার প্রতি, ও জীবতন্ত্রের মুখ্য অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। এবং এ কথা অন্নাশয়ের পক্ষে যেমন, মস্তিষ্কের পক্ষেও তেমনই খাটিবে।

জীবনের গতির সহিত যেমন আমাদের পরিচিতবর্গের পরিবর্ত্তন হয়, তেমনি মানসিক অভাবেরও দিন দিন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যাহাকে আ'জ কা'ল "ফেশন" বলে, এই পরিবর্ত্তনের কিয়দংশ নিঃসন্দেহ তন্মূলক, কিন্তু ইহা নির্বিচ্ছিন্নভাবে খেয়াল বা আগন্তু ঘটনার উপর নির্ভর করে না। যে সকল বাহ্যশোভা সম্পাদক গুণ আমরা প্রথমতঃ অন্বেষণ করি, তাহা চিরদিন আমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখে না, ও রাখিতে পারে না। দুষ্ট ক্ষুধাই উহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারে। আমাদের অন্তর্ভূত ভাব-রাশির (যে সকল চিন্তা ও অনুভূতি অলঙ্কারসাধন মাত্র নহে, কিন্তু ব্যবহারোপযোগীও বটে, তাহাদের) পরিস্ফুরণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শিশুদিগের পক্ষে দুগ্ধই যথেষ্ট, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক নরনারীর অন্য প্রকার ভোজ্য দ্রব্য চাই।

মনুষ্যসমাজে যাঁহাদিগের উপর গুরুভার অর্পিত আছে, এবং যাঁহারা ইহার কর্ম্মপরিচালকতার দায়িত্ব রাখেন, তাঁহাদের দেখা উচিত যে আমাদিগের দ্বারা যেমন যেমন প্রয়োজন সাধন করাইতে চাহেন, তেমনি তেমনি প্রকারে আমাদের মানসিক ভোজনের আয়োজন করিয়া দেন; অধিকন্তু আমাদের পরিবর্ত্তনশীল ভুক্ত-দ্রব্য-পরি-

পাক-ক্ষমতার প্রতিও দৃষ্টি রাখেন। এসকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্ট না রাখিয়া আমাদের ভোজন পাত্র সাজাইয়া দিয়া,তার পরে যদি আশা ভরসা করেন যে, আমাদিগের অবিবেচনার ফল তাঁহাদিগকে ভুগিতে হইবে না, তবে সে দুরাশা মাত্র। সকল মনের অভাব ও প্রয়োজন একই প্রকারের ভাবিয়া তাহাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করা যেমন বিকৃতবুদ্ধির চিহ্ন, তেমনি অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায়, সংকল্পে ও বিনিয়োগে, আমাদিগের মানসিক যোগ্যতা যে নিত্য নিত্য নূতনভাব ধারণ করে, এই প্রত্যক্ষ সত্যের অপলাপ করাও অনল্প দূষণীয়। যদি এই তুলা-সাম্যকে লক্ষ্যস্থলে না রাখিয়া আমরা অধ্যয়ন ও অনুধাবনের কোনরূপ ব্যবস্থা বা আচরণ করি,তাহা হইলে মানসিক অপাক ও তদানুষঙ্গিক অহিত-ফল-পরম্পরা অবশ্যম্ভাবী।

অপিচ, চিন্তার আকরস্থান সকল পরিবর্ত্তিত না করিলে বৃত্তি নিচয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যোপযোগী সাম্য রক্ষা হইয়া উঠে না। যদি আমরা নিয়তই একই গ্রন্থকর্ত্তার রচনাবলী পাঠ করি, আর একই উৎস হইতে নিয়ত জ্ঞান আহরণ করি, তাহা হইলে আমাদের মস্তিষ্ক এক-চাক্ষুষ জ্ঞানে ও অর্দ্ধস্ফুট সত্যেতেই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এবম্প্রকারে উহার ভাবশ্রেণী কেবল খর্ব্বাকৃত ও অতৃপ্ত হয়, এমন নহে,পরন্তু অবশিষ্ট বৃত্তিগুলিও চালনাভাবে অশক্ত ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং শরীরের পক্ষে যেমন, মনের পক্ষেও যথাসম্ভব সেইরূপ মিশ্রিত খাদ্যের নিতান্ত আবশ্যকতা।

রীতি-শিক্ষা বা কায়দার অনুরোধে যে সমস্ত বিদ্যা উপার্জ্জিত হয়, তাহাদের মূল্যবত্তার বিষয়ে প্রামাণিক বর্গের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। রীতিশিক্ষার দ্বারা মনের বলাধান হয়, তাহাতে সংশয় নাই, যেমন ব্যায়ামচর্চ্চাদ্বারা ভৌতিক পরিপাক-শক্তি ও দৈহিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক লোকের সম্বন্ধে ইহাতে ইষ্টানিষ্টের সম্পূর্ণ অভাব প্রতীয়মান হয়। কেবলই রীতিশিক্ষাতে যাঁহাদের শিক্ষা পর্য্যবসিত হয়, এবং সুতরাং জ্ঞানবৃক্ষের কতকগুলি নীরস ফলমূলে চিত্তভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়, তাঁহাদিগের সহিত সেই গল্পোক্ত ভেকের তুলনা হইতে পারে যে সীসকন্দুক খাইয়া হজম করিতেও পারে নাই, অথচ তাহার ভারে লাফাইতেও পারিত না।

মস্তিষ্কচালনা দ্বারা মস্তিষ্কের সমধিক পরিস্ফুরণ হয়, এবং উহার পরিপাক-শক্তি উত্তেজিত হয়। কিন্তু তথাবিধ চালনাকালে উহার স্বাস্থ্যোপযোগী ক্রিয়া-নির্ব্বাহের পক্ষে যে সকল ভৌতিক উপকরণের প্রয়োজন তাহা যোগান আবশ্যক। জ্ঞানের কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া চাই, অন্যথা বিদ্যার্থী কেবল শাস্ত্র-মল্লই হইতে পারিবেন, শাস্ত্র প্রণেতা হইতে পারিবেন না।

যিনি মানসিক মল্লকৌশলসাধনে অতিরিক্ত পরিমাণে রত থাকেন, তিনি কখনই বাদানুবাদরূপ তুষমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া মনের স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ অতিভোজন ও শ্রমাল্পতা দ্বারা যেমন মানসিক অপাক জন্মিবার সম্ভাবনা, অল্পভোজন ও শ্রম-বাহুল্যেও সেইরূপই জ্ঞেয়।

এক দিবস একটি ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক একপ্রকার অতি,কষ্টপ্রদ ও দুর্দ্দম্য শিরঃপীড়ার চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিল। এই শিরঃপীড়া কএক মাস ধরিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে উপস্থিত হইত, এবং অপরাহ্ণ দুইটা পর্য্যন্ত থাকিত। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "তুমি স্কুলে পড় কি ?" উত্তর "হাঁ"। "কত দিন যাবৎ স্কুলে পড়িতেছ ?" "তিন বৎসর।" "এখন তোমাকে কখানা পুস্তক পড়িতে হয় ?" "আটখানা।" এটি মানসিক অপাকের রোগস্থল ; অতিভোজন ও চাপাচাপির দরুণ অপাকের উৎপত্তি ; সে পীড়াগ্রস্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি ? যদি আট রকমের আটখানি ভোজনপাত্র, সময় নাই, অসময় নাই, খাবার ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক, জোর করিয়া জঠরের ভিতর পুরিতে থাকা যায়, তাহার ফল কি হইবে ?

এস্থলে মানসিক অন্নরাশি পরিগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অঙ্গীভূত হয় নাই ; গরিব বালকের মনের উপর একটি বোঝা চাপিয়াছিল, যাহা অপরিপাচ্য, এবং তাহার বৃত্তিচয়ের সম্পূর্ণ প্রতীপগামী।

মস্তিষ্ক তাদৃশ ব্যবহারের প্রতিবাদী হইয়াছিল, এবং তাহার সাময়িক শিরোবেদনা ট্রেণের লাল নিশানের ন্যায়, পুরোবর্ত্তী বিপদের সঙ্কেতচিহ্নমাত্র। সুতরাং তাহার চিকিৎসা তাহাকে স্কুল হইতে তফাৎ করা, এবং সমধিক বুদ্ধি-সঙ্গত খাদ্যপানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। বালক দুই সপ্তাহেই আরোগ্যলাভ করিল।

যেমন খাবার ইচ্ছা কিয়ৎপরিমাণে থাকিতে থাকিতে খাওয়া ক্ষান্ত করাই ভাল, মনের পুষ্টিসাধন উদ্দেশে ধীশক্তির যে ভোজন ব্যাপার তৎসম্বন্ধেও সেইরূপ করাই শ্রেয়ঃ। যদি আমরা নানাবিধ বিষয় অথবা নানা গ্রন্থকর্ত্তার রচনা, কিংবা প্রতিনিয়তই পাঠ বা অধ্যয়ন করিতে থাকি, তাহা হইলে মনঃসংযোগ ক্রমশই শিথিল হইয়া আইসে, আগ্রহের ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে, এবং চিত্ত আর চিন্তার উপকরণ বস্তু-সমূহের প্রতি ততটা লালসা দেখায় না। যাহাতে বুভুক্ষা রাজী নয়, তাহাতে পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়। স্বাদগ্রহের অভাব পরিপূর্ণতার পরিচায়ক। অতএব মস্তিষ্ক-কর্ম্মও যথাসময়ে আরম্ভ করিবে, এবং যথা সময়ে বর্জ্জন করিবে।

সুবিখ্যাত ডাক্তর বেঞ্জামিন রশ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে পাঠ করিবার নিয়মকে প্রশস্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; কারণ তাহা হইলে সুষুপ্তিকালে ভাবসমুদয় সুজীর্ণ হইতে পারে। অনেকের পক্ষে এ অভ্যাস মন্দ নয় বটে।

কিন্তু অনেকের মানসিক অপাক এই রাত্রিতে পাঠ জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এই একটু বিশেষ দেখিবেনযে, ওসময়ে অল্প পাঠেতেই লোকের অসুখ উৎপন্ন করে। একটি বুদ্ধিমতী কুলযুবতী এক বৎসর ধরিয়া কষ্টকর প্রাতঃকালিক শিরোবেদনায় ভুগিতেছিলেন। রাত্রি চারিটার পর তাঁহার আর ঘুম হইত না, রুচি পূর্ব্বক আহার করিতে পারিতেন না, এবং কিছুই ভাল লাগিত না। তিনি রুগ্ন বা বিষণ্ণ হয়েন নাই, অথচ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও সর্ব্বদাই ক্লিষ্টভাব।

তাঁহার স্বাভাবিকী স্ফূর্ত্তি শিরঃপীড়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কিন্তু নির্ব্বাণ হয় নাই। সকল প্রকার ঔষধ দিয়া দেখা হইল, কিন্তু কিছুতেই উপকার হইল না। অবশেষ অনুমান করা গেল, অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইল, তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে গৃহকর্ম্ম সারিয়া শয়ন করিবার পূর্ব্বে কোন দিন এক ঘণ্টা, কোন দিন দুই অথবা তিন ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিতেন; তাহার পর শুইতেন, এবং প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিতেন মাথা ধরিয়াছে। তাঁহার স্বামী কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেন, প্রতি শনিবারে বাটীতে আসিতেন। তিনি রবিবারে তাঁহার পাঠ লইতেন, এবং যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যাইতেন, রমণীটি সপ্তাহ ধরিয়া সেই পাঠ অভ্যাস করিতেন।

তখন এই অভ্যাসকেই অনিষ্টের মূল স্থির করা গেল। তাঁহার মস্তিষ্ক এই অসময়ের খোরাক হজম করিতে পারে নাই। সেই জন্য মানসিক অপাক এবং তাহারই ফল এই সকল রোগ লক্ষণ। পরিপাক সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হইলে অনেকের পক্ষে মানসিক ভোজনটা নিদ্রা যাইবার কিছুকাল পূর্ব্বে হওয়াই ভাল।

ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক শাস্ত্রবিশেষের আলোচনা দ্বারা যেমন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। শাস্ত্রীয় বুদ্ধির পুষ্টি সাধনার্থে বিশেষ শাস্ত্রের অনুশীলনই সমধিক উপযোগী,—এমন বিশেষ শাস্ত্র,মন যাহার স্বাদ-গ্রহণে ও আত্মীভূত-করণে বিশিষ্টরূপ যোগ্যতা রাখে। কিন্তু এই শক্তি ও তাহার বিকাশের পক্ষে সাধারণ-বিষয়ক বোধ সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়। যেমন প্রকৃতির সর্ব্বত্র, তেমনি মানব চেষ্টিতের সর্ব্ববিভাগেও অগ্রে সাধারণ, পরে বিশেষ। যদি আমরা এই নিয়মের বৈপরীত্য উপস্থিত করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে প্রক্রিয়া-ভ্রংশ ও উন্নতি-প্রতিরোধ তাহার ফল হইবে। কারণ চিত্তবৃত্তির পরিস্ফুরণ ক্রমসাধ্য ব্যাপার, এবং ভূয়োদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি-ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অন্যে সারা জীবন খাটিয়া যাহা সম্পন্ন করিয়াছে, তুমি যদি ধন অথবা যশোলাভের লালসা কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া, অল্পসময়ের মধ্যে তাহা বা ততোধিক কিছু করিয়া তুলিতে চাহ, তাহা হইলে জানিও সে তোমার বিষম ভুল, এবং তোমার মানসিক বৃত্তিসমূহের উপর সেই ভুলের ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হইবেই হইবে। জ্ঞানের দৃঢ়সন্নিবেশ দ্বারা চিত্তের রক্ষাকার্য্য সংসাধিত না হইলে, বুভুক্ষাকে ক্রমানুযায়ী শাসন ও শিক্ষার পরিবর্ত্তে খেয়াল ও আগন্তু ঘটনার দ্বারা পরিচালিত করিলে, যে যে বস্তুশ্রেণী পরিগৃহীত হইবে, তাহা পরিপাক করণের এবং ব্যবহারে আনয়নের ক্ষমতা ক্রটিত হইলে, নির্ম্মল ধীশক্তির পরিবর্ত্তে মানসিক অজীর্ণরোগ প্রবল হইবে। তুমি যে অশন গ্রহণ করিয়াছ তাহা তোমার পক্ষে নিতান্ত গুরুপাক হইয়া দাঁড়াইবে।

এইরূপ অজীর্ণরোগীতে সংসার পরিপূর্ণ। লোকে বিশেষ-নিষ্ঠ প্রতিভার বিকাশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে না, আপন আপন গন্তব্য পথ আগেই স্থির করিয়া বসে। কেবল

দাম্পত্য সম্বন্ধেই অযথা মিলন হয় এমন নহে। সকল দোষই কখনও সময়ের হইতে পারে না। আমরা আপন দোষেই আঘাটায় পড়িয়া হাবু ডুবু খাই। মস্তিষ্কের পরিপাক ক্ষমতার বিষয় ভাবি না, এবং অন্য চিন্তায় বিব্রত হইয়া স্ব স্ব নৈসর্গিক রুচি ও আসক্তিকে উপেক্ষা করি।

অনেকে জ্ঞানের টটামটি উপার্জ্জন করিয়াই মনে করে তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রীয় প্রসঙ্গই চর্ব্বণ-ভক্ষণ ও পাচন-ক্ষম হইয়াছে। অনেক সাময়িকপত্রসম্পাদক এই শ্রেণীর লোক। তাহারা সমাজের চাকন-দারের কার্য্য করে, এবং এতাবৎ তাহাদিগের ব্যবহার্য্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদৃশ লোকের হস্তে সমর্পিত হইলে বিশেষ বিদ্যার মানের হানি হয়। ফলতঃ, মানসিক অজীর্ণ উৎপন্ন করিতে এমন আশু ও অমোঘ উপায় আর নাই। উত্তম, অধম, বা মধ্যম, মাস্তিষ্ক্যখাদ্য যেমন হইবে চিন্তার প্রত্যেক কণায় তাহার গন্ধ ছাড়িবে।

আবার কতকগুলি বিশেষবিদ্যাপটু লোকের একটি সুমহৎ ভ্রম এই যে, তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা একশাস্ত্রে খাটিয়াছেন বলিয়া সকল শাস্ত্রেই অধিকারী হইয়াছেন। তোমার যদি বিশেষ-নিষ্ঠ শক্তি থাকে, সেই শক্তি কি, তাহার নিরূপণ করা এবং তাহার শ্রেষ্ঠতম ফল ফলাই কি যথেষ্ট গৌরবের হেতু নহে?

রসায়ন বিদ্যায় ডাক্তর প্রীষ্টলীর স্বভাবসিদ্ধ পটুতা ছিল; তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রচর্চ্চা অস্বাভাবিক। এক অম্লজান বা অক্সিজেনের আবিষ্কারেই, যতদিন মনুষ্য শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে, ততদিন তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু তিনি যে সপ্ততি খণ্ড ধর্ম্মবিষয়ক বাদানুবাদ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল চিরকাল অত্যুগ্র মানসিক অপাকের উদাহরণস্থলে বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু এই অদ্ভুত পুরুষ যে ভুল করিয়াছিলেন সেই ভুল নিয়তই চলিতেছে। বিজ্ঞান বিষয়ে যাহাদের প্রতিভা আছে, তাহারা হয় ত প্রাণপণ শক্তিতে কাব্য নাটক লিখিতেছে, তাহারা যে কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া চলিতেছে তাহা বুঝিতেও পারে না। যাহাদের বুদ্ধি-শক্তি সাহিত্য চর্চ্চার উপযোগী তাহারা অদ্ভুত ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার পথ ছাড়িয়া অপথে গিয়া স্বশক্তির বহির্ভূত বস্তুর পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। চিন্তাচক্রের প্রত্যেক রেখাতেই ঐ ভুল। তাই দেখ প্রচলিত সাহিত্যে মানসিক অপাকের ভূরি ভূরি চিহ্ন। সকলে যদি "আপন চরকায় তেল দেয়" তো এই কিম্ভূত কিমাকার দৃশ্য থাকে না।

সেই সকল স্থলেই মানসিক দুষ্পরিপাকের সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় ফল প্রত্যক্ষ হয়, যেখানে চিত্তবলের হীনতার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও সামাজিক তারতম্যবোধ নষ্টধার হইয়া পড়ে। কারণ, শুনিতে অদ্ভুত হইলেও, ফলতঃ এই প্রকার রোগ প্রাচীনরূপে পরিণত হইয়া থাকে, এবং তখন উচিত ভক্ষ্য হজম করিবার অক্ষমতা ব্যতীত, ভক্ষ্যের উপর বদ্ধ অরুচি জন্মিয়া যায়; এবং এমন কতকগুলি রোগ-লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ লোক পর্য্যন্ত অসুখী ও জ্বালাতন হইয়া উঠে।

ইতালীয় কবি হোরেস বলিয়াছেন কবিরা খিট্‌খিটে লোক হইয়া থাকে। শ্রমশীল শাস্ত্র-ব্যবসায়ী মাত্রেই কিয়ৎপরিমাণে ভেতুর; কিন্তু ইহার একটা সীমা আছে, তদতিরিক্ত খিট্‌খিটেমি হইলে সেটা মানসিক রোগ-লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যতক্ষণ মন স্বচ্ছন্দে কার্য্য করে, তা' মন্দ গতিতেই হ'ক আর শীঘ্রগতিতেই হ'ক, ততক্ষণ ধাক্কা বা ঘেঁস লাগে না। মস্তিষ্ক এলাইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু উচিত খোরাক ও মাঝে মাঝে বিশ্রাম পাইলে উহা আবার সামলাইয়া উঠে। উহা প্রত্যয়াতীত কাজ দিতে পারে, অন্যে কি, তদধিকারীই ঠাহর পাইবেন না সে কত কর্ম্ম করিয়াছে। কারণ প্রকৃতির বিরাটশক্তিগুলির ন্যায় উহা নিঃশব্দে ও নির্ঝঞ্ঝাটে আপন কর্ম্ম সমাধা করে। কিন্তু যখন দেখিবে কোন লোক বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কাজ বেশি হইয়াছে বলিয়া বলে, বা ভাবে, অধিক খাটনি বলিয়া বেজার হয়, আত্মকর্ম্ম বৃহৎ বা বহুগুণ করিয়া দেখে, এবং মনে করে সকলের ভাবনা ও দায়িত্ব তাহারই ঘাড়ে চাপিয়াছে, তখন জানিবে তাহাকে বিষম (হয় ত অসাধ্য) অপাক রোগ ধরিয়াছে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য।

প্রতাপসিংহ।

(চতুর্থখণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠার পর।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাবী ভূপতি।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সাহারজাদা সেলিমের যে চিত্র দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র তিনি সেরূপ সুচারু বর্ণে চিত্রিত হন না। তাঁহার চরিত্রের দুই ভাব। এক ভাব দেখিলে, তিনি স্বর্গের দেবতা; এক ভাব দেখিলে, তিনি নরকের প্রেত। এক ভাব দেখিলে, তিনি পূজা ও ভক্তির সামগ্রী; আর এক ভাব দেখিলে, তিনি ঘৃণা ও অরুচির বিষয়। তাঁহার হৃদয়ে যেমন অতি মহৎ অপার্থিব মনোবৃত্তি সমস্ত নিহিত ছিল, তেমনি তথায় অতি জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতা, ভোগাশক্তি ও নীচতা বাস করিত। তাঁহার কত কার্য্যে অতুল তেজস্বিনী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত, আবার তাঁহারই কত কার্য্যে দারুণ হিতাহিতবোধবিহীনতা প্রকাশ পাইত। তিনি যখন দরবারে বসিতেন, তখন আবুল ফজেলের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও মানসিংহের ন্যায় সাহসী বলিয়া বোধ হইত; আবার তিনি যখন বিলাসগৃহে বসিতেন, তখন তাঁহার নীচতা ও অদূরদর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখা যাইত। তিনি যখন রাজকার্য্যের মন্ত্রণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন সময়ে সময়ে চতুর-চূড়ামণি আকবরও মনে মনে তাঁহার নিকট হারি মানিতেন; আবার তিনি যখন

ভ্রষ্টমতি, তোষামোদী পারিষদগণে পরিবৃত থাকিতেন, তখন তাঁহাকে নির্ব্বোধের একশেষ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সমস্ত দোষ ও গুণ একত্রিত করিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সাহারজাদা সেলিমের চরিত্রে দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক। তাঁহার শান্ত-স্বভাব, তাঁহার মিষ্টভাষা, তাঁহার সরলতা, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার লোকানুরাগিতা প্রভৃতি অসংখ্য সদ্‌গুণ একত্রিত করিয়া তুলায় আরোপ করিলে, গুণের দিক গুরুভার হেতু অবনত হইয়া পড়ে।

অতি সুসজ্জিত মর্ম্মর প্রস্তরের এক মনোহর প্রকোষ্ঠে সন্ধ্যার পর সাহারজাদা সেলিম উপবিষ্ট আছেন। তোষামোদী, অসৎ-স্বভাব পারিষদগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। চতুর্দ্দিকে অগণ্য স্ফটিক আলোকাধারে অগণ্য আলোকমালা জ্বলিতেছে। অপূর্ব্ব গন্ধদ্রব্যের অপূর্ব্ব গন্ধে প্রকোষ্ঠ আমোদিত। দুইজন অপ্সরা সদৃশী রূপসী নর্ত্তকী, ভুবনমোহন পরিচ্ছদে ও ভূষণে আপনাদের পাপকায়া বিভূষিত করিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকৃত নৃত্য ও গীত দ্বারা অনিয়মী, অদূরদর্শী যুবক শ্রোতৃবর্গের ইন্দ্রিয়তৃষা বলবতী করিতেছে। আবেশভরে তাহাদের আয়তলোচন কখন যেন মুকুলিত হইয়া আসিতেছে, আবার কখন তাহা হইতে বাসনার তীব্র গরল বাহিরিয়া দর্শকগণকে বিচেতন করিতেছে; কখন তাহা হইতে প্রণয়ের অতি স্নিগ্ধ সুধা স্যন্দিত হইয়া সকলকে বিহ্বল করিতেছে এবং কখন বা তাহা হইতে কটাক্ষের তীক্ষ্ণ তাড়িৎ তাহাদের মর্ম্মভেদ করিতেছে। এই ঘোর মাদকতাতেও যুবকগণের তৃপ্তি নাই; সিরাজ হইতে সমানীত, স্বর্ণ-পান-পাত্রস্থ, উজ্জ্বল সুরা তাঁহাদের অস্থির বুদ্ধিকে আরও চঞ্চল ও আরও অপ্রকৃতিস্থ করিতেছে। সেলিম এইরূপ বিকৃত সংসর্গে বসিয়া অনবরত সুরাপান করিতেছেন এবং রূপোন্মত্ত ও মদোন্মত্ত হইয়া নিয়ত চীৎকার করিতেছেন।

কে বলে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব? মনুষ্য যদি বুদ্ধিমান তবে নির্ব্বোধ কে? আর কোন্ জন্তু স্বেচ্ছায় এরূপে স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করে? আর কোন জন্তু মনুষ্যের ন্যায় নিরন্তর নিয়মাবহেলন করিয়া স্বাস্থ্য, সুখ ও আনন্দ বিধ্বংসিত করে? আর কোন্ প্রাণী ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত করিয়া অকালে কাল-সমুদ্রে ডুবিয়া যায়? মনুষ্যের ন্যায় ভ্রমপরায়ণ জীব আর কোথায় আছে? ফলতঃ এক পক্ষে মনুষ্যের কার্য্যবিশেষ দেখিয়া যেমন বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারা যায় না, তেমনি পক্ষান্তরে তাহাদের ভ্রান্তি দেখিয়া ইতর প্রাণীগণের যদি বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে, তাহারাও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না। মনুষ্যের স্বাধীন বুদ্ধিই তাহাদের উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই হেতু।

নর্ত্তকী নাচিতেছে এবং লীলা ও লালসাসূচক ভঙ্গীসহ গাহিতেছে। দুইটি গানের পর তাহারা তৃতীয় গান ধরিল;—

'পিও বঁধু মধু কমল কোমলে।
রহে না রস, সখা ফুল শুকালে॥'

সেলিম চীৎকার স্বরে কহিলেন,—

'ঠিক্ ঠিক্। বহুত আচ্ছা। মদ'।

একজন তৎক্ষণাৎ একপাত্র সুরা দিল। সেলিম পান করিলেন। গায়িকা আবার গাইল ;—

'থাকিতে সময়,
লুঠো রসময়,
জানত যৌবন ফিরে না গেলে॥'

সেই ভ্রষ্টমতি যুবকগণ প্রপংসাসূচক ও সন্তোষজ্ঞাপক এতই শব্দ একসঙ্গে বলিল যে, তথায় একটা বিকট গোল পড়িয়া গেল। সেলিম তখন এক রমণীর বদন-শোভা দেখিতে দেখিতে এতই বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে পান-পাত্র পড়িয়া গেল ; তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

গায়িকা গাহিতে লাগিল,—

'এ ফুল নূতন,
রস-নিকেতন,
কি হইবে বঁধু সুধু রাখিলে॥'

আবার সেই বিকট চীৎকার ধ্বনি। সেলিম বলিলেন,—

'বটে তো। তা কি হয়? মদ।'

গায়িকা আবার গাইতে লাগিল,—

'কে আছ রসিক,
প্রেমের প্রেমিক,
লও এ রতন যতনে তুলে॥' *

তখন সেলিম,—'আমি, আমি—এই যে আমি আছি' বলিয়া টলিতে টলিতে উঠিলেন এবং একজন গায়িকার হাত ধরিয়া বদন চুম্বন করিলেন। সকলে 'হো' 'হো' শব্দে হাসিয়া উঠিল। সেলিম চৈতন্যশূন্য—হিতাহিত-বোধ-রহিত। একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল,—

'বাদসাহ বাহাদুর ও মহারাজ মানসিংহ সাহারজাদাকে স্মরণ করিতেছেন।'

সেলিম রমণীর হাত ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু অবলম্বনহীন হইয়া শরীর স্থির রাখিতে পারিলেন না—তথায় পড়িয়া গেলেন। সহচরেরা একে একে প্রস্থান করিল। সেলিম বলিলেন,—

'আঃ! দিবারাত্র স্মরণ করিলে আর পারা যায় না। বল গিয়া, আমি এখন যাইতে পারিব না।'

আবার বলিলেন,—

'না না না—বল গিয়া আমি যাইতেছি। তুমি যাও আমি যাইতেছি।'

দুইবার তিনবার সাহারজাদা উঠিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অগত্যা ভারতের ভাবী ভূপতি সুরাপহতচেতন হইয়া জঘন্য চিন্তা ও অশ্লীল অনুধ্যান করিতে করিতে সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজরাজমোহিনী।

আগরা নগরের যমুনা তীরস্থ একটি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে দুইটি যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। যে যুবতী অদ্বিতীয়া সুন্দরী, যাঁহার লাবণ্যে গৃহ উজ্জ্বল, যাঁহাকে দর্শনমাত্র দেবী বিবেচ-

---

* এই গীত রাগিণী ঝিঁঝিট ও তাল দাদরায় সমাবিষ্ট। 'বিঁধিয়া লে গেইহো মেরে মাছারিয়া' ইত্যাদি প্রচলিত হিন্দী গানের অনুরূপ।

নায় মোহিত ও চমকিত হইতে হয় এবং যাঁহার বর্ণ, গঠন, শিক্ষা, কমনীয়তা, ভঙ্গী সকলই অমানুষী, অপার্থিব সেই সুন্দরী মেহেরউন্নিসা *। অপরা তাঁহারই সহচরী-আমিনী। মেহেরউন্নিসার বয়স ষোড়শ বর্ষের অধিক নহে। যাঁহার সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা ভুবনবিখ্যাত, আমরা সেই রমণীকুল ললামভূতা তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া হাস্যাস্পদ হইব না। প্রবাদ আছে বিশ্বপতি কোন বস্তুই দোষশূন্য করেন নাই। পদ্ম ও গোলাবে কণ্টক আছে; ময়ূরের পদ দেহের অযোগ্য। কিন্তু মেহেরউন্নিসা সেই প্রবাদের ব্যাবৃত্তিস্থল। তাঁহার দেহে, স্বভাবে, কার্য্যে কিছুতেই দোষের সংস্পর্শ দেখা যায় না।

রাজরাজমোহিণী মেহেরউন্নিসার সকল কার্য্যই সুরুচির পরিচায়ক। তাঁহার পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা প্রভৃতি তাঁহার সংরুচির সাক্ষ্য দিতেছে। মেহেরউন্নিসার পিতা ধনবান নহেন সুতরাং গৃহের শোভা সম্বিধানার্থ মহামূল্য দ্রব্য সমস্ত ক্রয় করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কিন্তু যাঁহার গৃহে মেহেরউন্নিসার জন্ম, তাঁহার অন্য শোভায় প্রয়োজন ? মেহেরউন্নিসা সামান্য সামান্য দ্রব্যে গৃহ, দ্বার, ভবনসংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্যান প্রভৃতি এমনি সুশৃঙ্খল ও সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন যে, দর্শনমাত্র তাহা চিত্তকে আকর্ষণ করে। মেহেরউন্নিসার পরিচ্ছদ মূল্যবান না হইলেও তাহা এমনি সুরুচিসঙ্গত ও পরিষ্কার ও তাহা এমনি দেহ আবরণ করিয়া আছে যে, তাহা মহামূল্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। মেহেরউন্নিসা সহচরীকে বলিতেছেন,—

'আমিনি! তুমি কি আমাকে এতই অসার, অপদার্থ বিবেচনা কর ? তুমি কি ভাব আমার অন্তর এতই জঘন্য ? প্রণয়বৃত্তি মনুষ্য হৃদয়ের উচ্চতার পবিত্র নিদর্শন। সেই পবিত্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আমি কি পাশব বৃত্তির অনুসরণ করিব ?'

আমিনী একটু চিন্তার পর কহিল,—

'মেহেরউন্নিসে! ভাবিয়া দেখ তুমি কি হইবে। ধন বল, সম্পত্তি বল, পদ বল, প্রভুত্ব বল সংসারে মনুষ্যজীবনের যাহা কিছু প্রার্থনীয় সাহারজাদা সেলিমের তাহার কিছুরই অপ্রতুল নাই। সেই সমস্ত দুর্লভ সুখের অংশিনী হওয়া কি সামান্য ভাগ্যের কথা ? মেহেরউন্নিসা তুমি ভাবিয়া দেখ।'

মেহেরউন্নিসা বিষাদব্যঞ্জক হাস্য করিয়া কহিলেন,—

'আমিনি! আমি তোমার জীবনের প্রধান প্রার্থনীয় সুখের সহিত আমার হৃদয়ের অতুল সুখের বিনিময় করিতে ইচ্ছা করি না। একমাত্র অমূল্য নিধি প্রেম আমার প্রার্থনীয়। যদি তাহা পাই তাহা হইলে দারিদ্র্যও আমি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি।'

আমিনী বলিল,—

'তুমি যাহা চাও, তাহাই কেন্ না

* কোন কোন ইতিহাসে গিয়াসুদ্দীন তনয়ার অমীরুন্নিসা এই নাম লিখিত আছে। যে সুন্দরী কালে নুরজাহান নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা সকলের বিবরণ বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই।

পাইবে? সাহারজাদা সেলিম বাহাদুর তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। তুমি শুন নাই, তিনি তোমার নিমিত্ত উন্মাদপ্রায় হইয়াছেন।'

মেহেরউন্নিসা একটু লজ্জিতা হইলেন। বলিলেন,—

'আমিও যে সেলিম বাহাদুরের রূপের প্রশংসা অথবা তাঁহার অত্যুন্নত পদের প্রতিষ্ঠা করি না, এমন নহে। প্রত্যুত তাঁহার ন্যায় সুন্দর পুরুষ আমি আর দেখি নাই।'

মেহেরউন্নিসার চিত্ত একটু ভাবান্তরিত হইল; তিনি ক্ষণেক নীরব হইলেন। আবার কহিলেন,—

'কিন্তু তিনি আমাকে ভাল বাসেন না। তাঁহার হৃদয়ে এখন ভালবাসা নাই। তবে কখন যে তাঁহার হৃদয়ে ভালবাসা জন্মিতে পারে না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি আমার নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন —একথা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে উন্মত্ততা স্বতন্ত্র কারণে জন্মিয়াছে, তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। স্বর্গীয় প্রণয় সে মত্ততার কারণ নহে—ঘৃণিত ভোগানুরক্তি ও লিপ্সা তাহার হেতু। আমিনি! জগতে যে কিছু কষ্ট আছে, আমি তাহা হাসিতে হাসিতে সহ্য করিতে পারি, তথাপি আমি স্বর্গীয় সুখ সম্বেষ্টিত হইয়াও কাহারও জঘন্য মনোবৃত্তি সংসাধনের পাত্র হইয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং সাহারজাদার প্রস্তাব আমার অরুচিকর। আমিনী আবার কহিল,—

'তুমি বুঝিতেছ না—সাহারজাদা তোমাকে বিবাহ করিবেন। বিবাহিতা স্ত্রীকে ভাল বাসিবে না, ইহা কি সম্ভব? আর দেখ সেলিম ভবিষ্যতে বাদশাহ হইবেন। তিনি বাদশাহ হইলে মনে কর তখন তোমার কত সুখ হইবে।'

মেহেরউন্নিসা বলিলেন,—

'সেলিম যে ভবিষ্যতে বাদসাহ হইবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় রূপবান ও অত্যুন্নত ব্যক্তির ভার্য্যা হইতে কে না ইচ্ছা করে? তাঁহার সহধর্ম্মিণী হওয়া আমি আনন্দের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু যখন মনে হয় যে, সেলিম কেবল রূপভোগ বাসনায় আমার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছেন, তখনই আমার চৈতন্য হয়; তখনি ভাবি যদি মন না পাইলাম তবে সিংহাসন, ধন, সম্পত্তি কিসের জন্য। তখন আমি স্থির করি যে, জীবন যায় সেও স্বীকার, তথাপি আমি পদ গৌরবে বিমোহিত হইয়া সেলিমের নিকট দেহ বিক্রয় করিব না।'

সুন্দরী নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

'সেলিম আমাকে বিবাহ করিবেন সত্য কিন্তু বিবাহ করিলেই যে ভালবাসিতে হয়, ইহা বাদশাহদিগের শাস্ত্রে লেখে না—মনুষ্যের কোন সমাজেই এরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। আর দেখ, পিতা শের আফ্‌গানের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। যখন সে সম্বন্ধ স্থির হয়, তখন আমিও তাহাতে সম্মতি দিয়াছি। সুতরাং আমি ধর্ম্মতঃ তাঁহারই পত্নী হইয়াছি। অধুনা আমি যদি অন্য মত করি, তাহা হইলে পিতাকে অপমানিত করা হয়, আমাকে ধর্ম্মে পতিতা হইতে হয় এবং সম্ভবতঃ শেরকেও মনক্ষুণ্ণ

করা হয়। অথচ আমার বিশেষ লাভ কিছুই নাই, বরং আমাকে সুবর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় যাবজ্জীবন কষ্টই পাইতে হইবে। যে কার্য্যে এত অনর্থপাতের সম্ভাবনা সেরূপ গর্হিত কার্য্য কেন করিব? আরও বিবেচনা কর শের সেলিমের ন্যায় অত্যুন্নত পদশালী নহেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সেলিমের অপেক্ষা বিস্তর গুণ আছে। তিনি বিজয়ী, নম্র, শান্ত-স্বভাব, মিতাচারী, প্রেমিক, বীর ও কর্ম্মঠ। সেলিমের এ সকল গুণ কখন না হইতে পারে এমন নয়, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার তাহা নাই। তবে বিধাতা তাঁহাকে যে অত্যুচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাঁহাকে যে অতুলনীয় রূপরাশি প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই নারীহৃদয়ে লোভ উদ্দীপক। আমার হৃদয়ে সে সমস্তের লোভ হয় না, এমন নহে। কিন্তু আমি সে লোভ দমন করিতে জানি; আমি ভাল মন্দ চিনিতে পারি। আমার হৃদয় এত অসার নহে যে, আমি পবিত্র সুখের সহিত, অপবিত্র সুখের বিনিময় করিব; স্বর্গীয় আনন্দের সহিত ঘৃণিত লিপ্সার পরিবর্ত্তন করিব এবং কাঞ্চনমূল্যে পিত্তল ক্রয় করিব।'

আমিনী কহিল,—

'পুত্রের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য হয়ত বাদশাহ আকবর তোমার পিতার নিকট অনুরোধ করিবেন। সম্রাটের আদেশ তিনি কখনই অন্যথা করিতে পারিবেন না। তখন তুমি কি করিবে?'

মেহেরউন্নিসা চারুমুখে একটু হাসিয়া বলিলেন,—

'সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। আকবরের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, বাগ্দত্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহ দিতে বলিবেন, ইহা অসম্ভব। আর পিতাও যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া আমার অন্যত্র বিবাহ দিবেন, তাহাও বোধ হয় না।'

আমিনী আবার কহিল,—

'তোমার অপেক্ষা কাহারও অধিক বুদ্ধি নাই। আপনার ভাল মন্দ তুমি যেমন বুঝিবে, এমন কে বুঝিবে? কিন্তু দেখিও, ভাই, পরিণামে যেন আর মনঃপীড়া না পাইতে হয়।'

মেহেরউন্নিসা সুগোল নবনীতবিনিন্দিত কমনীয় ভুজবল্লী ঊর্দ্ধোত্থিত করিলেন এবং প্রেমাশ্রুপূর্ণ সফরী সদৃশ নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—

'সকলই তাঁহার ইচ্ছা!'

আমিনী কার্য্যান্তর ব্যপদেশে চলিয়া গেল। ইতিহাস-প্রথিতা, জগদ্বিখ্যাতা সুন্দরী মেহেরউন্নিসা সেই স্থানে বসিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভাসমতী হইলেন।

সূর্য্যমণি।

১

'গগণ প্রাঙ্গণে রজতের থালা
কে লয়ে পলায়'? ভাবিয়ে আকুলা
উষা বিনোদিনী প্রকৃতির বালা
চারিদিকে চায়;
বিনা সূত্রে গাঁথা তরল-আকার
শিশিরের হার গলে ছিল তার
ছড়ায়ে পড়িল হায়!

২

শিশির-মুকুতা তরুলতা সবে
লুকাইয়ে রাখে সুঘন পল্লবে,
জড়ায় উরসে মাথায় আসরে
কুসুম সুন্দরী;
সুখের প্রভাতে নবীন-যৌবনী
চারু সূর্য্যমণি পেয়ে সেই মণি
ধরিল কি শোভা মরি!

৩

প্রকৃতি-সোহাগে রঞ্জিত অধর
সরমে হইল আরো গাঢ়তর,
কাঁপায়ে কুন্তল সে হিম-ঝালর
ফেলিল ধরায়;
অন্তরের জ্বালা ঘুচিল অমনি—
সতী সূর্য্যমণি হাসিল আপনি
জগতে হাসাল হায়!

৪

তোরি মত ফুল অবনি-উপরি
কুচিন্তা-পরশে কত নর নারী
ধরম-পথিক উঠেরে শিহরি,
কুচিন্তা পলায়;
বিজয়-আমোদে হাসে নর নারী,
পুণ্যের লহরি সে হাসি-মাধুরী
জগতে শিখায়ে যায়!

৫

নবীন গগনে নবীন তপন
মুখে নব হাসি—নবীন কিরণ,
নবীনতাময় করি ত্রিভুবন
দেখা দিল আসি;
স্বরয মণিরে চুমিল আদরে,
মোহি সে আদরে তরল অধরে
বালার ধরে না হাসি!

৬

সুখদ প্রভাতে সুখদ যৌবনে
প্রণয় কি ধন জানেও না জানে,
সরল জ্ঞানেতে তরুণ তপনে
উপহার দিল;
একমাত্র সার যাহা ছিল তার
দিল বালা তার সরল হিয়ার
ভালবাসা অনাবিল!

৭

হায় সূর্য্যমণি, হায় সরলতা,
নারীর নির্ভর, নরের শঠতা
সূর্য্যমুখী হেরি এখনি সবিতা
ভুলিবে তোমায়;
আঁধার-ছায়ায় পড়ে রবে হায়,
দেখিবে না হায় দেখেও তোমায়,
সতিনী হাসিবে তায়।

৮

তোর দশা যথা চারু সূর্য্যমণি,
তোর দশা যথা সরলা রমণি,
কবির (ও) সে দশা—তারকারমণি
জীবন-ব্যোমেতে;
ক্ষণকাল তরে প্রতিভা বিতরে;
ঢাকেরে অম্বরে আসিয়ে সত্বরে
নিন্দা-মেঘ কোথা হ'তে।

৯

তোর দশা যথা চারুসূর্য্যমণি,
তোর দশা যথা সরলা রমণি,
গুণী যেই জন, তার (ও) একাহিনী
এ ক্লেশ-জগতে;
কেহ নাহি দেখে, এক পাশে থাকে,
আপন সৌরভ আপনাতে রাখে,
শুক্তি বসে মুকুতাতে!

১০

তোর দশা যথা চারু সূর্য্যমণি,
কত ঘরে ঘরে চারু শিশুমণি
পুণ্য-কণ্ঠহার—চন্দন-লেপনী,
মাতৃকণ্ঠে দোলে;
দুই এক বার হাসিটি হাসিয়া,
মাতারে মোহিয়া পিতারে মোহিয়া,
শোয় কৃতান্তের কোলে।

১১

তোর দশা যথা চারু সূর্য্যমণি,
এ মরুভূমিতে সরসী-রূপিণী,
ধরার দেবতা, আনন্দের খণি,
বঙ্গের রমণী,
দুই এক দিন আদর লভিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সিন্দূর মুছিয়া
হয়রে অঙ্গার-প্রাণী।

১২

তোর দশা যথা লো ফুলসুন্দরি,
কত শত দেশ, নগর, নগরী
গৌরব-সাগরে ভরে রে গাগরি;
পায় সে সলিলে
এক কালিদাস অর্দ্ধ ভবভূতি;
শেষেতে শুকতি হায়রে নিয়তি
ক্রমশঃ কলসে তোলে!

১৩

তোর দশা যথা কুসুমের মণি,
দুঃখ-বরপুত্র আমিও তেমনি,
পোহায়ে গিয়াছে সুখের রজনী
দুঃখের বিলাপে;
হয়েছে লেখনী দুঃখ-নির্ঝরিণী,
আনন্দ-প্লাবিহী ধরিতে লেখনী
এ অবশ কর কাঁপে!

১৪

কর না'ক রাগ, কুসুম সুন্দর,
তোর এ সুখের সুখের বাসর—
'বউ কথা কও' বসি শাখীপর
রঙ্গ করে কত;
ফুলবালা-দল ঢলে পড়ে হাসি,
উলু দেয় আসি তোমারে সম্ভাষি
বায়ু সদা রঙ্গে রত!

১৫

করি সুখ স্নান প্রভাত শিশিরে,
পরি নব সাটী সহাস অন্তরে,
মনোমত বর বরিয়া রবিরে,
পূরিল গো সাধ;
মেঘ মুক্ত থাকে গগণের ছবি,
সদা মুখ ছবি নেহারে গো রবি,
কবি করে আশীর্ব্বাদ। (শ্রীফুলকবি।)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। 'নিশীথে শৈলেন্দ্র শিখরে। শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রণীত।'—এই কাব্য সম্বন্ধে যন্ত্রাধ্যক্ষ লিখিয়াছেন যে, "ইহা একজন অল্প বয়স্ক যুবা দ্বারা রচিত। সমাজ-সংস্কার ইঁহার মূল উদ্দেশ্য। ইঁহার মতে বাঙ্গালিদিগের স্ত্রৈণতা তাহার প্রধান প্রতিবন্ধক। এই নিমিত্ত ইনি রূপকচ্ছলে বাঙ্গালিদিগের স্ত্রীপরায়ণতার প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন।" এই উদ্দেশ্য মহান্, কিন্তু কবিতা উদ্দেশ্যের অনুরূপিণী হয় নাই। রচনা অনেক স্থলেই নীরস ও কর্কশ।

২। "মানস-কুসুম। প্রথম খণ্ড। বাক্সা শিশু-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপারশনাথ দাস কর্তৃক প্রণীত।"—এই গ্রন্থখানি বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের জন্যই লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যদি ইহাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হইয়াছে। তিনি ভ্রমরের প্রতি সম্ভাষণে লিখিয়াছেন,—

"জানি জানি ওহে, তোমার কি দোষ,
প্রেমিক রসিক রায়,
চির কাল যার শঠতা অভ্যাস,
ছাড়িতে পারে কি তায়?
হাসি হাসি আসি, ব'স হে কমলে,
প্রথম মিলন কালে;
মধুমাখা কথা, কহিয়ে তখন,
ভাসাও সুখের জলে।
'আর না যাইব, তোমা সব ছাড়ি,
বলহে এমনি ছলে,
আপনা পাসরি, নলিনী তখন,
প্রেমের আবেশে গলে।
ঃ ঃ ঃ
মনে করে তারা, বুঝিবা ভ্রমরা,
অভ্যাসের বশ হয়ে,
গিয়াছিল কোন্ কণ্টকিত ফুলে,
মধু পানের আশায়।" ইত্যাদি

গ্রন্থকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিদ্যালয়ের নিয়মাদি তিনি যেরূপ জানেন, আমাদিগের সেইরূপ জানা সম্ভবপর নহে, শিক্ষক আপনার ছাত্রদিগকে এইরূপ কবিতার ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে সমর্থ হন, কি না, তিনিই তাহার বিচার করুন। তাঁহার অন্যান্য কবিতাতেও এইরূপ প্রেমের কথা, বিরহের কথা, উচাটন মনের কথা এবং মন চুরির কথা আছে। গ্রন্থকারের নিন্দা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু তিনি এই সকল কদর্য্য অথচ উচ্ছিষ্ট বিষয় লইয়া অকারণ কেন কবিতা লিখিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি

অমৃত।

অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

" য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

মনুষ্যের প্রাণ অমৃতের জন্য লালায়িত। চক্ষু এই বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্য্যসমুদ্রের মধ্যে অমৃতের জন্য সন্তরণ করিতেছে। শ্রুতি অমৃতেরই জন্য তৃষাকুল হইয়া, সজল-জলদের গম্ভীর নির্ঘোষ, বিহঙ্গের কূজন, বীণার ঝঙ্কার এবং প্রিয়জনের প্রণয়-মধুর প্রিয়সম্ভাষণ পান করিতেছে। কল্পনা ও বুদ্ধি ঐ একই তৃষ্ণারই অধীন হইয়া কখনও নভঃস্থ সৌরজগতে এবং কখনও নয়নের অতিসন্নিহিত জীবজগতে, কখনও সাগরে, কখনও পর্ব্বতে, বিচরণ করিতেছে। মনুষ্য জানে না,—মনুষ্য বুঝে না; কিন্তু মনুষ্যের প্রাণ, প্রাণের অভ্যন্তরীণ শক্তির মঙ্গলময় মধুর শাসনে, অজ্ঞাতসারে ও লুক্কায়িতভাবে অমৃতের জন্য অধীর। কেন না প্রাণের একমাত্র অবলম্ব অমৃত।

জ্ঞানে বড় সুখ। জ্ঞানের সাধক গ্রন্থপত্রে কীটের মত মগ্ন রহিয়াছে, অথবা চক্ষুকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরতর দূরে প্রেরণ করিয়া, কিংবা অনুবীক্ষণের সাহায্যে নিকটতর নিকটে আনয়ন করিয়া,সাধারণবুদ্ধির অগম্য তত্ত্বে প্রবেশ করিতেছে। শীতে তাহার শীত বোধ নাই,গ্রীষ্মে তাহার গ্রীষ্ম জ্ঞান নাই। সে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়াও আপনার মত্ততায় আপনি প্রমত্ত। পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর সুবর্ণরাশি তাহার চিত্তকে চঞ্চল করে না। ধনীর ঘৃণা, পদস্থের অবজ্ঞা, মূর্খের অভিমান এবং মানীর নিষ্ঠুর দৃষ্টি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে প্রকৃতির পরমারাধ্য পবিত্র মূর্ত্তির ধ্যানযোগে জীবন্মৃত। বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবায়ু তাহা হইতে দূরে বহে,—সমাজযন্ত্রের আবর্ত্ত ও বিবর্ত্তনিবহ দুরন্ত সমুদ্রের ভয়াবহ আবর্ত্তের ন্যায় চিরদিনই তাহা হইতে দূরে রহে। সে সংসারে নির্লিপ্ত, ভোগবাসনা ও বিষয়তৃষ্ণার অস্পৃশ্য ও অনধিগম্য। সে নির্ম্মলমতি নিযুটনের ন্যায় প্রকৃতির দুগ্ধপোষ্য শিশু। তাহার জীবনের গতি জ্ঞানার্ণবে। কিন্তু জ্ঞানে এই তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা কেন?—না, জ্ঞানের অভ্যন্তরে অমৃত। জ্ঞানে যদি জ্ঞানামৃত না থাকিত, তাহা হইলে কবিকল্পনা জ্ঞানদাকে সরস্বতী বলিয়া আহ্বান করিত না,—এবং কি কবি, কি বৈজ্ঞানিক, কি দর্শনবেত্তা কি ঐতিহাসিক, কেহই পৃথিবীর ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সেই সারস্বতী শক্তির আরাধনায় আত্মসমর্পণ করিতে পারিত না। অনেক লোক জ্ঞানারণ্যে প্রবেশ করিয়া অমৃত ভুলিয়া অস্থি চর্ব্বণ করে,এবং

সাধনার শেষ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া আপনার নীরস-নিষ্ঠুর চিন্তাজালে আপনি জড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা দুর্ভাগ্য। যিনি জ্ঞানের প্রকৃত সাধক, তাঁহার পরমভোগ্য অমৃত।

জ্ঞানে আর প্রেমে সজাতীয়তা কিংবা সাদৃশ্য না থাকিলেও প্রেমে বড় সুখ। প্রেমে ফুলের মধু, প্রেম প্রতপ্ত মদিরা। এই নিখিল জগৎ ঐ মধু, ঐ মদিরার জন্য লালায়িত। অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্তও ঐ মধু এবং ঐ মদিরা পান করিলে, তৃষ্ণা পূর্ণ হইবার নহে। বহ্নি যেমন আহুতি লাভে অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, প্রাণ-নিহিত প্রেম-তৃষ্ণাও আহুতিলাভে সেইরূপ বাড়িতে থাকে ও জ্বলিয়া উঠে। উহার প্রবৃত্তি আছে, নিবৃত্তি নাই,—আদি আছে, অন্ত নাই, এবং আবাহন আছে, বিসর্জ্জন নাই। উহা বিশ্বব্যাপিনী,—জগন্ময়ী। যে, জীবনের কোন না কোন ক্ষণে, প্রেমের তৃষ্ণায় আকুল হয় নাই, সে জীবিত নহে। প্রেমে স্বর্গসুখের এই পূর্ব্বস্বাদ কেন?—না, উহাতে অমৃত আছে। জনক জননী যখন সন্তানের স্নেহে বিগলিত হইয়া সন্তানের নবোদ্গত জীবনে নবজীবন লাভ করেন, তখন তাঁহারা অনুভব করিতে পান যে, ঐ স্নেহ রূপান্তরে প্রেমামৃত। ভ্রাতা যখন ভ্রাতার কণ্ঠে নির্ভর করিয়া, এবং বন্ধু যখন বন্ধুর অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া আপনার ক্ষীণদেহে আশাতীত সামর্থ্য লাভ করেন, তখন তাঁহারা অনুভব করেন যে, ঐ নির্ভরের ভাব ভাবান্তরে প্রেমামৃত। আর, প্রীতিবদ্ধ দম্পতী, যখন নয়নে নয়ন মিলাইয়া, একে অন্যের নয়নে নিজ নিজ হৃদয়ের অন্তস্তোমুখ আদর্শবিম্ব দর্শন করেন, এবং প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত হইয়া বিশ্বজনীন প্রাণ-সমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গে ভাসিতে থাকেন, তখন তাঁহারাও প্রত্যক্ষ বুঝিতে পান যে,ঐ আত্মবিনিময়ই অমল, অক্ষয় প্রেমামৃত। প্রেমে যদি অমৃত না থাকিত,তাহা হইলে পৃথিবীর অসংখ্য প্রাণ উহার জন্য অহর্নিশ আকুল রহিত না।

কিন্তু যেমন অনেকে, জ্ঞানের অন্বেষণে, বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া, অমৃতভ্রমে অস্থি চর্ব্বণ করে; সেইরূপ প্রেমের অন্বেষণেও অনেকে ততোধিক ভয়ঙ্কর বিপাকে বিভ্রান্ত হইয়া, অমৃত বলিয়া গরল পান করে। তাহারা হতভাগ্য। যিনি প্রেমের প্রকৃত সাধক,তাঁহার পিপাসা ও পরমা তৃপ্তি অমৃতে।

এই সংসারে জ্ঞানভ্রান্ত ও প্রেমভ্রান্তের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। জ্ঞানভ্রান্তের হৃদয় আশার শ্মশান;—ঘন-গভীর তিমিরাবৃত, নীরস, নীরব। সেখানে চক্ষু আছে, কিন্তু সে চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না; কর্ণ আছে, কিন্তু সে কর্ণ কাহারও প্রাণ-প্রদ সম্ভাষণে প্রীত কি অনুপ্রাণিত হয় না। যেদিকে চাও, সেই দিকেই দগ্ধ অস্থি, দগ্ধ কঙ্কাল, দগ্ধকঙ্কর-বাহি দগ্ধ সমীর। অহো কি ভয়ঙ্কর ভাব! হে অতীতসাক্ষি অভ্রভেদি পর্ব্বত! তুমি ঐ যে তোমার উন্নত মস্তকে তুষার-ভার বহন করিয়া এই চঞ্চলজগতে অচল রহিয়াছ,—বৃষ্টির মুষলধারে, বজ্রের মুহুর্মুহুঃ আঘাতে, এবং ঝটিকার ভীমাবর্ত্তে মুহূর্ত্তের তরেও ভ্রুক্ষেপ না করিয়া পৃথিবীর পরিবর্ত্তপ্রবাহ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ,—মনুষ্য বৃথাসুখের লালসায় বৃথাশ্রমে ক্লান্ত হইয়া

কিরূপে বিড়ম্বিত হইতেছে, তাহা দেখিতেছ, বল তুমি'কি জান? পর্ব্বত নিস্পন্দ, নীরব। হে উত্তালতরঙ্গময় গভীর সমুদ্র! তুমি ঐ যে তোমার দিগন্তপ্রসারিত বিশাল বক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া,—তরঙ্গের পৃষ্ঠে তরঙ্গ দোলাইয়া, তরঙ্গমালায় খেলিয়া খেলিয়া, কখনও অট্টহাস্যে হাসিতেছ, কখনও ক্ষিপ্তের মত নৃত্য করিতেছ,—কখনও আতঙ্কস্ফুরণে গর্জ্জিতেছ, কখনও ক্রোধস্ফুরণে ফুলিয়া উঠিতেছ, কখনও মনুষ্যের সুখ-দুঃখ,হর্ষবিষাদ একই গ্রাসে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছ,—কখনও আপনার অতলস্পর্শ গহ্বর হইতে অমূল্য রত্ন আনিয়া মনুষ্যের হস্তে তুলিয়া দিতেছ,—কখনও জীবের দুঃখে দ্রব হইয়া বিলাপ করিতেছ,—কখনও জীবহৃদয়ে অনন্তের আভা ফলাইতেছ, বল তুমি কি জান? সমুদ্র নিস্তব্ধ, নীরব। হে ফলোন্মুখ পাদপ, অয়ি ফুলময়ি লতিকে, হে চন্দ্র, হে সূর্য্য, হে অগণ্য নক্ষত্রনিচয়, বল তোমরা কি জান?' এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ ও নীরব। এ ভাব বস্তুতঃই মনুষ্যপ্রাণের অসহনীয়। এই অমৃতময় সুন্দর জগতে হৃদয়ে এইরূপ অন্ধকারের ভার লইয়া, উদাসীন, অনাশ্রয় ও অবলম্বহীনের মত অবস্থান করা বস্তুতঃই নিতান্ত ক্লেশকর। কিন্তু যাঁহার জ্ঞাননেত্র অমৃতস্পর্শে উন্মীলিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে তাঁহার কি শান্তি, তাঁহার কি সুখ! পর্ব্বত ও সমুদ্র যামিনীর নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে তাঁহার সহিত কথোপকথন করে, তরু,লতা সমীরভরে দুলিয়া দুলিয়া তাঁহার হৃদয়কে আনন্দে দোলায়িত রাখে, সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সৌন্দর্য্যের বিবিধ মূর্ত্তিতে তাঁহার চিত্তকে মোহিত করিয়া তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণারও তর্পণ করিতে রহে, এবং এই অনন্তজগৎ তাঁহার আত্মায় অনন্তের আশা উদ্দীপন করিয়া তাঁহাকে উচ্চতর হইতে উচ্চতর সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া তুলে।

প্রেমভ্রান্ত ততোধিক শোচনীয়। সে আপনার বিকৃত লালসার স্বয়মিচ্ছু বন্দী। সে আপনার চক্ষে আপনি ইচ্ছা করিয়া ধূলিক্ষেপ করে,—আপনার শ্রুতিকে আপনি যত্নসহকারে বধির করিয়া রাখে। সে কখনও বিষসর্পকে চন্দনলতা বলিয়া কণ্ঠহার করে, এবং পরিশেষে সর্পবিষে জর্জ্জরিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে;—কখনও বা অসুর কি পিশাচের ক্রুরগতি কিংবা কদর্য্যমতি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার মনুষ্যত্বকে আপনি বিনাশ করিয়া ফেলে। তখন যাহা স্বভাবতঃ ভাল, তাহাই তাহার নিকট মন্দ হয়; এবং যাহা স্বভাবতঃ মন্দ তাহাই তাহার নিকট ভাল লাগে। তখন সুলোকে, সৎকথায় ও সৎপ্রসঙ্গে তাহার বিরাগ জন্মে; এবং কুলোকে, কুকথায় এবং নিকৃষ্ট সংসর্গেই তাহার মন অনুরক্ত হয়। তখন সে আলোক ছাড়িয়া অন্ধকারে লুকাইতে পারিলেই সুখানুভব করে,—আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমান ক্ষণের পঙ্কিলমোহে নয়ন মুদিয়া ডুবিয়া থাকিতে পারিলেই তাহার ক্ষণিক তৃপ্তি জন্মে। সে তখন আপনাতে আপনি লজ্জিত, সতত মেঘাচ্ছন্ন, সতত শোকপূর্ণ;—আপনাতে আপনি ঘৃণান্বিত,তাহার অন্তরে মুর্মুরদাহ,অথচ আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্ত তৃষ্ণা। তাহার বিবেক তখন বাতাহত দীপশিখার ন্যায় নিভু

নিভু জলে,—দেখি দেখি বলিয়াও দেখিতে পায় না ;—তাহার হৃদয় তখন বিষাদময় সুখের বিষদংশনে অস্থির হইয়া ডুবু ডুবু হয়, উঠি উঠি বলিয়াও উঠিতে পারে না। তখন সর্ব্বত্রই তাহার অবিশ্বাস, এবং কৃত্রিম মাদকতা ও কৃত্রিম অভিমানেই তাহার আত্মার বিরাম। এ অবস্থা যেমন ভয়াবহ, তেমনই বিপত্তিজনক। মনুষ্য যখন এই অবস্থায় আপতিত হইয়া পিপাসার ঘূর্ণপাকে বিঘূর্ণিত হয়, শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করে, এবং মিত্রকে শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে দূরে পলায় ; আপনাকে আপনি এড়াইয়া থাকিতে চাহে, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিতে আরম্ভ করে,—আপনার সর্ব্বনাশ-সাধনে আপনি উন্মত্তের স্থায় যত্নপরায়ণ হয়, তখন তাহাকে দেখিলে কাহার অন্তঃকরণ না ব্যথিত হয় ? তরী নদীর স্রোতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, কর্ণধার নাই ;—তরুমূলে পতিত শুষ্কপত্র বাতচক্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া যাইতেছে,—স্থির গতি নাই। এ মূর্ত্তি দর্শনে কাহার চিত্ত না দুঃখভরে অবসন্ন হয় ? কিন্তু যাঁহার প্রেম অমৃতস্পর্শে পবিত্র, অমৃতস্পর্শে শীতল, তাঁহার কি শান্তি, তাঁহার কি সুখ ! এই সংসার তাঁহার নন্দনকানন, ইহার সর্ব্বত্রই পারিজাতশোভা, পারিজাতসৌরভ এবং প্রীতির মন্দাকিনী। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হয়, কিন্তু কখনও আবিল হয় না ;—হৃদয় আনন্দের নিত্য নূতন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়, কিন্তু কখনও আপন্ন হয় না,—এবং চিত্ত অনভ্র গগনের জ্যোৎস্নার মত সকল সময়েই টল টল রহে, কিন্তু কখনই অতৃপ্তি, অবসাদ ও মৃত্যুমুখে ঢলিয়া পড়ে না। যাহা নির্ম্মল তাঁহাতেই তাঁহার অনুরাগ ;—এবং তাঁহার অনুরাগ অন্তরের উচ্চতম কামনার সহিত অভেদবন্ধনে জড়িত ও মিশ্রিত। তাঁহার মমতা বিবেকসম্মত এবং বিবেক মমতার সাহচর্য্য ও সহানুভূতিতে স্নেহাবনত। তাঁহার উৎসাহ বিষাদে অবসন্ন হয় না, আত্মার প্রসন্নকান্তি ক্রমশঃ পরিম্লান হইয়া নিভিয়া যায় না, এবং অন্তঃকরণ প্রীতি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির চিরকলহে সজীব নিরয়ে পরিণতি পায় না। তিনি ধন্য, তিনি দেবতা, তিনি সৌভাগ্যবান্। মনুষ্যের মন এই জন্যই মনুষ্যকে অনুপ্রাণনার মাহেন্দ্রক্ষণে এই বলিয়া উপদেশ দেয় যে,—যদি জ্ঞানে ও প্রেমে কৃতার্থ হইতে চাও, তাহা হইলে অমৃতসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড় এবং অমৃতের তরঙ্গে মরালের মত ভাসিয়া ভাসিয়া অমৃতে বিলীন হও।

যাহারা ভাগ্যদোষে জন্মান্ধ অথবা বুদ্ধিদোষে কর্ম্মান্ধ,—স্মৃতি যাহাদিগের বৃশ্চিকদংশন এবং আশা যাহাদিগের অন্ধকার, তাহারা হয়ত বিস্ময়ের অপরিব্যক্ত শ্লেষে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে,—এই অমৃতসমুদ্র কোথায় ? ইহা কি কবিকল্পনা, না প্রকৃত পদার্থ ? ইহার অস্তিত্ব কি অনুভূত হইতে পারে ? মনুষ্যের মন উচ্চতর আলোকে আলোকিত হইয়া এই প্রশ্নেরও উত্তর করিয়াছে, এবং ইতিহাসের প্রথম সৃষ্টি ও মানবহৃদয়ের প্রথম বিকাশ হইতেই বলিয়া আসিতেছে যে, এই অমৃতসমুদ্র অন্তরে ও বাহিরে,—ইহারই অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব,—ইহা হইতেই জগ-

তের শোভা, সামর্থ্য ও সুখ। আমরা এই প্রত্যক্ষজগতের স্থূল ও সুক্ষ্ম, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এবং দ্রব ও ঘন পদার্থসমূহে যে সৌন্দর্য্যের এক রমণীয় আবরণ দেখি, তাহা কি?—না ঐ অমৃতসমুদ্রের অমৃততরঙ্গ। বিজ্ঞান এই বহিঃস্থ জগতের সমস্ত বস্তুতেই যে অদৃশ্য শক্তির আনন্দময়ী লীলা নিরীক্ষণ করিয়া আপনার ভাবে আপনি বিহ্বল হয়, তাহা কি? —না, ঐ অমৃতসমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। এই বিশ্বব্যাপি প্রাণসমুদ্রে আশা ও উল্লাস এবং সুখ ও হর্ষের যে অনন্ত লহরী অনন্তভঙ্গিতে খেলিতেছে, তাহা কি?—না, ঐ অমৃতসমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। আর, ভাবুকের হৃদয় ও প্রেমিকের প্রাণ, যে তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করে, —জ্ঞানের অগম্যকে অন্তরে স্পর্শ করিয়া শীতল হয়, তাহা কি?—না, ঐ অমৃতসমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। আমরা যে কিছুই দেখিতে পাই না, কিছুই বুঝিতে পাই না, ইহার এমন অর্থ নহে যে, ঐ অমৃতসমুদ্র দূরে রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, আমরা আপনারাই বিপাকবদ্ধ ও ভোগমুগ্ধ হইয়া আপনা হইতে দূরে পড়িয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অন্তরের অন্তরতম প্রাণ তথাপি অমৃতের জন্য তৃষ্ণায় আকুল। যখন এই বিপাকের বন্ধন ছিন্ন হইবে এবং মোহের আচ্ছাদন তিরোহিত হইয়া যাইবে,—তখন সেই দূরস্থ অমৃতসমুদ্রকে আমরাও অন্তঃস্থ দেখিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিব; এবং আমাদিগের প্রাণ, মন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অমৃতের স্রোতে ঢালিয়া দিয়া অনন্তের দিকে প্রবাহিত হইব।

পরশুরামের শোণিততর্পণ

সাগরের যেন নীল জলরাশি,
বিভেদ করিয়ে উঠিছে প্রকাশি,
রতনের চারু সুবিমল হাসি,
তেমনি উঠিছে উষা।
প্রভাতী মঙ্গল পাখীরা গাইল
প্রকৃতি বিবিধ কুসুমে পূজিল
তরুণ অরুণ পরাইয়া দিল
কিরণ-কিরীট ভূষা। (১)

নিখিল তারকা রূপের প্রভায়,—
হীরকের ফুল, গগনের গায়—
মুকুল মঞ্জরী তরুর শাখায়
হাসিছে কুসুম সনে;
ভাই বোন যেন গলাগলি করি
নববধূ উষা-রূপের মাধুরী
দেখিছে, নবীন পল্লব উপরি
বসিয়ে সরল মনে। (২)

আকাশের গায় জলদের দল,—
সহস্র সহস্র সোণার আঁচল,—
ভূষণে সাজিয়ে হইয়ে উজ্জ্বল
হিমালয় পুরে যায়।
যেন গিরিজার হইবে বিবাহ,
আনন্দে ছুটিছে জলদ প্রবাহ,
বুঝিবা আজিই সে শুভ পুণ্যাহ,
পুলকে পাগল প্রায়। (৩)

কিংবা চিরশত্রু বাসবের সনে,
যুঝিবারে যেন গগন প্রাঙ্গণে

ছুটিছে ভূধর শত প্রসরণে
প্রমত্ত চঞ্চল গতি;
ক্রোধে রক্তাকার দেহের বরণ
গরবে ধরণী ছোঁয় না চরণ
প্রাণে উত্তেজনা বৈরনির্য্যাতন
বধিতে অমরাপতি। (৪)

ফুটিছে সরসে কমলের দল
ছুটিছে পুলকে ভ্রমর সকল
লুঠিছে সমীর নব পরিমল
আবেশে অবশ কায়।
কখন কমল কুমুদ ছাড়িয়া
বেল, যুঁই, জাতি, কামিনী লইয়া
পড়িতেছে যেন ঢলিয়া ঢলিয়া
ইহার উহার গায়! (৫)

অদূরে হিমাদ্রি,—ভারত প্রাচীর
অনন্ত, আয়ত, মূরতি গম্ভীর
চেয়ে আছে যেন তুলি ঊর্দ্ধশির
সভয়ে ভূধর রাজ;
পারেনা চাহিতে নিম্ন ধরাতলে
পঞ্চ রক্তহ্রদ গর্জ্জিয়া উছলে
সফেণ তরঙ্গ ছুটে মহাবলে
ভীষণ ব্যাপার আজ! (৬)

প্রচণ্ড অনন্ত দ্বাদশ মিহির
মহাজ্যোতির্ম্ময় বিরাট শরীর
অঞ্জলি পূরিয়ে লইয়ে রুধির
দাঁড়ায়ে হ্রদের পাশে।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-মূলে ধৃত উপবীত
ডাকিছে গম্ভীরে পৃথিবী স্তম্ভিত
শত মেঘমন্দ্রে নভ বিকম্পিত
সমীর না বহে ত্রাসে! (৭)

বামকক্ষতলে মহা তীক্ষ্ণ ধার
জিনি অষ্ট বজ্র ভীষণ কুঠার
সদ্যোষ্ণ শোণিত ঝরিছে তাহার
রক্তস্নাত কলেবরে,
এ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, অনন্ত বিমানে,
উত্তরাভিমুখে চাহি ঊর্দ্ধপানে,
বেদমন্ত্রে পিতৃপুরুষে আহ্বানে
ভীষণ ভৈরব স্বরে! (৮)

কন্দরে কন্দরে হয় প্রতিধ্বনি,
আতঙ্কে হিমাদ্রি কাঁপিছে অমনি;
ভয়ে পশুকুল পরমাদ গণি
পশিছে বীজন বনে;
মত্ত ঐরাবত শুণ্ড ঊর্দ্ধ করি,
চমকি আতঙ্কে, মৃগেন্দ্র কেশরী
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বানর বানরী
দৌড়িছে একই সনে! (৯)

কাঁপে তরুলতা পল্লব মুকুল,
নীহার-নিসিক্ত কাঁপে ফল ফুল
নীরবে শাখায় কাঁপে পাখিকুল
আপনা পাসরি সবে;
গ্রহ নক্ষত্রাদি সহিত অম্বর
কাঁপিতেছে ঘন করি থর থর
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙ্গিছে সাগর
সে মহাভীষণ রবে। (১০)

হে ঋচীক আদি পিতৃদেবগণ!
নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশ বার
সমস্ত ভারত,—সমস্ত সংসার,
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার
লয়েছি অঞ্জলি ভরি;
আমি যামদগ্ন্য—ক্ষত্রিয়-অন্তক
সৃজিয়াছি এই সমস্ত পঞ্চক
ক্ষত্রিয় শোণিতে,—রক্তগঙ্গোদক,—
এস হে তর্পণ করি। (১১)

এসে পিতৃদেব দেখ একবার,

আমি ভৃগুরাম সন্তান তোমার
তব শত্রুকুল করেছি সংহার
নাহি আর একজন;
দেখিয়ে করহ নয়ন সার্থক
শত্রুরক্ত পূর্ণ সমস্ত পঙ্কক
আমি তব পুত্র শত্রুসংহারক
তুষিব তোমার মন। (১২)

হে পিতঃ! তোমার তুষিবারে মন
মাতৃহত্যাপাপ করেছি ভীষণ,
বধিয়াছি চারি ভ্রাতার জীবন
ভীষণ কুঠার ধরি।
সে বজ্র কুঠারে দেখ আর বার
তব শত্রুকুল করিয়ে সংহার
সেই অনুগত সন্তান তোমার
শোণিত তর্পণ করি। (১৩)

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা নাহি ছিল জ্ঞান,
ছয় ঋতু ছিল একই সমান,
গভীর নিশীথ, কিবা দিনমান,
হিম, রৌদ্র, বৃষ্টিধার,
সুখ, দুঃখ কিছু ভাবি নাই মনে
একটু মমতা ছিল না জীবনে
বধিয়াছি শত্রু যুঝি প্রাণপণে
একেশ্বর অনিবার! (১৪)

এই দেখ বুক্ষে কত শরাঘাত
শত ছিন্ন দেহ দেখহ সাক্ষাৎ
অজস্র ধারায় হয় রক্তপাত
তবু নাহি অবসাদ।
অগ্নিময় গোলা,—আগ্নেয়াস্ত্র কত
এই বক্ষ লক্ষ্যে বর্ষিত নিয়ত
তথাপি উদ্যম হয় নাই হত,
হইনি পশ্চাৎ-পাদ! (১৫)

বিজন গহনে, ভীষণ প্রান্তরে
উপত্যকা দেশে, পর্ব্বত শিখরে
কত জনপদে, নগরে নগরে
নদী সরোবর ধারে,
করিয়ে সহায় একই কুঠার
অগণ্য সংখ্যক এক একবার
তব শত্রুকুল করেছি সংহার
যেখানে পেয়েছি যারে! (১৬)

নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশবার
সমস্ত ভারত,—সমস্ত সংসার
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার
লয়েছি অঞ্জলি ভরি।
ওহে পিতৃদেব! তব আশীর্ব্বাদে
পূর্ণ মনস্কাম হয়েছি অবাধে
দেখ এসে পিতঃ কত যে আহ্লাদে
শোণিত-তর্পণ করি। (১৭)

হৃদয়ের কক্ষে, শিরায় শিরায়,
অস্থি মর্জ্জাগত সূক্ষ্ম কৈশিকায়,
স্নায়ু কেন্দ্রে কেন্দ্রে,—শাখা প্রশাখায়
ছুটিছে বৈদ্যুত বল।
এই দণ্ডে গিয়ে বাসনা আবার
তব শত্রুকুল করিব সংহার
শত্রুশূন্য ধরা—কি করিব আর?
হলো না আশার ফল! (১৮)

কিন্তু যদি থাকে একজন আর,
চৌদ্দলোক পাল রক্ষা করে তার
জীবন; তথাপি করিব সংহার
ধ্রুব এ অব্যর্থপণ।
হইব না ভীত বিষ্ণু-সুদর্শনে,
কিংবা বাসবের বজ্র সঙ্ঘর্ষণে,
বরুণের পাশ সহস্র ক্ষেপণে,
করিব তুমুল রণ। (১৯)

"নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশবার

সমস্ত ভারত, সমস্ত সংসার
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার
লইব অঞ্জলি ভরি;
ওহে পিতৃদেব তব আশীর্ব্বাদে
পূর্ণ মনস্কাম হয়েছি অবাধে
দেখ এসে পিতঃ কত যে আহ্লাদে
শোণিত তর্পণ করি।"(২০)

এই মহাশব্দ
ভূধরে কন্দরে হ'য়ে প্রতিধ্বনি
অনন্ত অম্বর বিদারি অমনি
কাঁপায়ে নক্ষত্র শুক্র সোম শনি
পৌঁছিল স্বর্গের দ্বারে;
সপ্ত-সুরলোক-তোরণ অর্গল
এক এক করি খুলিল সকল
দেখে পিতৃগণ আনন্দে বিহ্বল
ভাসিলা সুখাশ্রু ধারে! (২১)

ছুটিলা বিমানে পিতৃ দেবগণ
ভাতিল অম্বরে অমর কিরণ,
বাজিল স্বর্গীয় মধুর নিক্কণ,
বর্ষে পারিজাত ফুল;
ভয়-সঙ্কুচিতা পৃথিবী, আবার
অভয় পাইয়া সুর করুণার
মৃত দেহে প্রাণ পাইল, তাহার
নাচিল মরম মূল। (২২)

তেমনি কুসুম পল্লবে শোভিল,
পাপিয়া কোকিল সুধা ঢেলে দিল,
নিরুদ্ধ পবন নিশ্বাস ছাড়িল
ভাঙ্গিল মোহের ঘুম।
ভ্রমিতে লাগিল স্তব্ধ ভূমণ্ডল,
গতিরুদ্ধ সৌর নক্ষত্র সকল,
মহাজ্যোতির্ম্ময় নব গ্রহদল
গেল সে প্রলয় ধূম! (২৩)

নক্ষত্রে নক্ষত্রে স্থাপিয়া চরণ
নামিতে লাগিলা পিতৃদেবগণ
অনন্ত উজ্জ্বল প্রসন্ন বদন
আনন্দে অবশ প্রাণে;
দেখি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিধিৎসার
বীর যামদগ্ন্য বীরত্ব আধার
কহিতে লাগিলা,—"সন্তান আমার"
চাহিয়া ভার্গব পানে। (২৪)

কহিতে লাগিলা, "সন্তান আমার
অনন্ত ক্ষত্রিয় করিয়া সংহার
দিয়ে প্রতিশোধ পিতৃবৈরিতার
শোণিত তর্পণ করি;
বলিতে হৃদয়ে কত যে আহ্লাদ
লভিয়াছ বৎস! দেবের প্রসাদ
আমরাও এই করি আশীর্ব্বাদ
তোমার বীরতা স্মরি! (২৫)

"যে কোন জাতির অধীনতাবশে
প্রেত অত্যাচার হৃদয়ে পরশে
নিরখিলে এই মহাতীর্থে এসে
সমস্ত পঞ্চক হ্রদ,
সপ্তম স্বর্গের উপরে সংস্থিত
গন্ধর্ব্বচারণ সুর নিসেবিত
সেই পুণ্য স্থান লভিবে নিশ্চিত
স্বাধীনতা মুক্তিপদ। (২৬)

"কিংবা তব কীর্ত্তি নগরে নগরে
যে দেশে গাহিবে প্রতি ঘরে ঘরে
দিনান্তে, মাসান্তে, অথবা বৎসরে
একমনে একবার,
ধ্রুব সত্য এই,—দেবের প্রসাদ
ধ্রুব পিতৃগণ করি আশীর্ব্বাদ
ধ্রুব সত্য নিত্য অনন্ত আহ্লাদ
সে স্বর্গ নিবাস তার!"(২৭)

প্রতাপসিংহ।

(৭ম সংখ্যা, ৩৩৩ পৃষ্ঠার পর।)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হৃদয়ের বিনিময়।

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি এক হৃদয় অপর হৃদয়কে আকর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে তাড়িতের শক্তিবিশেষ সহযোগে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি জন্মে; চুম্বক বস্তুতঃ লৌহ বিশেষ। হৃদয়ের পক্ষেও তাহাই বটে। এ বিশ্বসংসারে হৃদয়ের ছড়াছড়ি আছে; কিন্তু কই কয়টা কয়টার দিকে ধাবিত হয়? কয়টা কয়টার জন্য মরে ও বাঁচে? কয়টা কয়টাকে হাসায় ও কাঁদায়? হায়! এ সংসারে কয় জন কয় জনের জন্য ভাবে? সকল হৃদয় যদি সকল হৃদয়ের দিকে ধাইত, সকলে যদি সকলের জন্য ভাবিত,—তাহা হইলে এ সংসার স্বর্গ হইত—তাহা হইলে মনুষ্য দেবতা হইত—তাহা হইলে মানুষ হৃদয়ে হৃদয় চালিতে শিখিয়া সকল ক্লেশ, সকল জ্বালা নিবারণ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না—সকল হৃদয় সকল হৃদয়ের দিকে ধায় না। এক হৃদয়-নিঃসৃত প্রেমরূপ পবিত্র তাড়িত সংস্পর্শে যদি অপর হৃদয় আলোকিত হয়, তাহা হইলে সেই হৃদয়যুগল, পরস্পর আকর্ষণসূত্রে বদ্ধ হয়। মানুষের হৃদয়ের গতি এইরূপ। ইহাকেই লোকে ভালবাসা, প্রণয়, মায়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি নানাবিধ প্রকারে ভেদকরে। বস্তুতঃ তৎসমস্তই একপ্রকার বৃত্তি—সকলই হৃদয়ের আকর্ষণ মাত্র। স্বার্থত্যাগ ইহার কার্য্য। এই স্বার্থত্যাগের অপেক্ষা পবিত্র মহৎ কার্য্য ক্ষুদ্র মানব আর করিতে পারে না। এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যিনি যত স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই তত অবিনশ্বর হইয়া যুগযুগান্তরে পরম্পরাগত মানববৃন্দের হৃদয়ে, দেবতার ন্যায় আরাধিত হইতেছেন। যে মহানুভাব দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনার প্রাণ সমরক্ষেত্রে বলি দিয়াছেন; যিনি অজ্ঞ লোকের ভ্রম ভঞ্জনার্থ নিরন্তর শরীর পাত করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন; যিনি বিপন্ন মানবের বিপদ উদ্ধারার্থ আত্ম সুখ শান্তি বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বার্থত্যাগের বীর। তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় ব্যক্তি-সাধারণের দুঃখ ও দুরবস্থা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়াছে। এ জগৎ সেরূপ দেবতাদের নাম কখনও ভুলিবে না। যে এ জগতে স্বার্থত্যাগের মহিমা বুঝিতে না পারে, তাহার সহিত কখনও আলাপ করিও না। তাহার হৃদয় পাষাণে গঠিত; সে মনুষ্য নামের অযোগ্য।

স্বার্থত্যাগই ধর্ম্মের মূলভিত্তি—সমাজ সংস্থিতির আধার। মূলে ভালবাসা না থাকিলে স্বার্থত্যাগ করা যায় না। পিতা পুত্রকে ভালবাসেন বলিয়াই পুত্রের সন্তোষের নিমিত্ত নিজের সুখ লক্ষ্য করেন না। জননী অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর হইয়াও সন্তানের নিমিত্ত আহার্য্য সংগ্রহ করেন। সক্রেতিস্ সত্যের প্রণয়ে বিমোহিত ছিলেন বলিয়াই সত্যের অনুরোধে জীবন দিতে কাতর হন নাই। রামমোহন রায় ধর্ম্মপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই কোন সামাজিক ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া মনে করেন নাই। চৈতন্যদেব প্রেমের তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই অন্য কোন সুখই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এ সকলই ভালবাসার জন্য স্বার্থত্যাগের ঘটনা। অতএব সকল ধর্ম্মেরই মূল ভালবাসা অর্থাৎ স্বার্থত্যাগ। যে ধর্ম্ম ভালবাসার পথ ছাড়িয়া অন্য উপায়ে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয় তাহা পশুর ধর্ম্ম—তাহা মনুষ্যের গ্রহণীয় নহে। মনুষ্যের মুক্তি ভালবাসায়, উন্নতি ভালবাসায়, বিকাশ ভালবাসায়, আনন্দ ভালবাসায় এবং চরমোৎকর্ষ ভালবাসায়। অধিকের কথা ছাড়িয়া দেও; একজন একজনের জন্য মরিতে পারে, একজন আর একজনের হাসি দেখিলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়, একজনের যাতনা দেখিলে আর একজন তদধিক কাতর হয়, একজনের বিপদ দেখিলে আর একজন আপনাকে তদধিক বিপন্ন মনে করে, একজনের শোকাশ্রু দেখিলে আর একজন সেই স্থলে সমশোকাশ্রুপাতে তাহার অশ্রুজল বাড়াইয়া দেয়, ইহার অপেক্ষা পবিত্র, স্বর্গীয় উদার ও দেবভাব আমি আর কিছু জানি না। মনুষ্য সমাজ যত প্রেমের আদর করিতে শিখিবে,প্রেমিকদের যত দেবতা বলিয়া পূজা করিতে শিখিবে, ততই জগতে স্বর্গ হইবে, ততই মানুষ অনন্ত প্রেমে ডুবিয়া জরা মৃত্যু বিস্মৃত হইবে। এই যে প্রেম ইহা সমভাবে নর নারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে পারে। কিন্তু মানব জাতির হৃদয় এতই ঘৃণিত ও কলুষসংকুল যে অনেকেই নারীর সহিত নরের যে ভালবাসা তাহার উদারতা প্রণিধান করিতে পারেন না, বরং তাহা একটু লজ্জারই কথা বলিয়া মনে করেন। ধিক্! তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে! নর নারীর প্রেমে স্বতঃই জীব সংস্থিতি সংরক্ষণার্থ এবং স্রষ্টার সাক্ষাৎ অভিপ্রায়সংগত যে পবিত্র সম্বন্ধ বিশেষের আবির্ভাব হয়, তাহা তুমি নানাবিধ সামাজিক কারণে একটু লজ্জার আবরণে ঢাকিলে ঢাকিতে পার। কিন্তু সে প্রেম (যদি তাহা চপল লিপ্সা হেতু না হয়) লজ্জার কথা? তাহা দুর্ব্বল-হৃদয়তার চিহ্ন? তাহা ক্ষুদ্র মনুষ্যের অবলম্বনীয়? যে ব্যক্তি এই কদর্য্য বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে সে সমাজের প্রবল শত্রু—তাহাকে সর্পের ন্যায় ভয় করিও। কি ভালবাসা ক্ষেত্র বিশেষে লজ্জার কথা? ভালবাসা লজ্জার কথা একথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিও এবং সে অপূর্ব্ব দার্শনিকের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিও। যদি এ পাপ-তাপ-পূর্ণ ক্ষুদ্র পৃথিবীতে কিছু পবিত্রতা থাকে, তবে সে পবিত্রতা যেখানে হৃদয়ের বিনিময় ঘটিয়াছে, সেই

স্থলেই আছে। যেখানে প্রেমিক তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র পাপীর কথায় বাহির হইয়া চন্দ্রের সুধা খাইতে ও কুসুমে শয়ন করিতে শিখিয়াছে, সেই খানে আছে। সেই প্রেমিক—যে কেন হউক না—তাহারা পূজনীয়। তাহাদের দ্বারা পাপ হয় না, দুষ্কর্ম্ম তাহাদের চিত্তে আইসে না। এমন উদার প্রেম—নরনারী ইহার আশ্রয় হইলে ইহা লজ্জার কথা হইবে? ছিঃ ছিঃ!

আমরা সে দিন যখন রতনসিংহকে দেবলবর নগরে দেখিয়াছিলাম, তখন বুঝিয়াছিলাম যে, কুমারী যমুনা ও কুমার রতনসিংহ হয় ত পরস্পর পরস্পরের নিকট চিত্ত হারাইলেন। আমাদের সে সন্দেহ মিথ্যা নহে। কারণ সেই দিনের পর রতনসিংহ আরও তিন দিন অকারণে দেবলবর নগরের রাজভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা সে তিনবারই বাটী ছিলেন এবং রতনসিংহকে পুত্রের ন্যায় সমাদর করিয়াছিলেন। কুমারী যমুনাও তাঁহার সহিত অপেক্ষাকৃত সরলভাবে আলাপ করিয়া তাঁহাকে অতুল আনন্দিত করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার যখন রতনসিংহ চলিয়া যান তখন তিনি ভুলক্রমে অসি ফেলিয়া গিয়াছিলেন এবং মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহা লইয়া গিয়াছিলেন। আর তিনি চলিয়া গেলে কেহ কেহ বলে যে, বহুদূর তিনি গন্তব্য পথের বিপরীত পথপ্রবাহী হইয়াছিলেন। কুমারী যমুনাও সে দিন শারীরিক অসুস্থতার ছল করিয়া কিছু আহার করেন নাই এবং কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন নাই। এই সকল কার্য্য-কারণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে, এই যুবক যুবতী বুঝি পরস্পর চিত্ত হারাইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ সত্যতা কি অসত্যতার দিকে বিনত হয়, তাহা আমরা অবিলম্বেই জানিতে পারিব। যদি সন্দেহ সত্য হয় তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, স্বার্থত্যাগের অগ্নি-পরীক্ষায় এই যুগলপ্রেমের স্বর্ণকান্তি কিরূপে বিভাসিত হয়। সেই জন্যই আমরা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উক্তবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, দেবলবররাজ বহুদিনাবধি কুমার রতনসিংহের সহিত দুহিতার বিবাহ দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কন্যার তদ্বিষয়ে অভিপ্রায় কি জানিবার নিমিত্ত কুসুমের প্রতি ভারার্পণ করেন। কুসুম কুমারীর হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, সুতরাং সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার অনুরাগের কথা রঞ্জিত করিয়া ব্যক্ত করে। বৃদ্ধ রাজার মুখে এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া কুমারীকে গিয়া জানাইল যে, কুমার রতনসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, ত্বরায় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। দেবলবররাজও কুসুমের মুখে কন্যার মনের ভাব জানিতে পারিয়া অবসরক্রমে মহারাণা প্রতাপসিংহের নিকট এই ব্যাপার নিবেদন করিলেন। মহারাণাও নিরতিশয় সন্তোষসহকারে এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধ

উভয়পক্ষ হইতেই এক প্রকার স্থির হইয়া গেল। কেবল মুসলমানদিগের সহিত বিরোধের অবসান হইলেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবার অপেক্ষা রহিল।

প্রণয়িযুগল কিন্তু ঘোর উৎকণ্ঠায় ভাসিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহারও মনের ভাব অবগত নহেন। কুমার ভাবিতেছেন, 'কুমারী যমুনার সহিত বিবাহ হইলে সুখের সীমা রহিবে না; কিন্তু কুমারীর হৃদয়ের ভাব কি? যদি অন্য কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কুমারীর প্রেমাস্পদ হয়, তবে সকলি বিড়ম্বনা। অতএব না বুঝিয়া একার্য্যে সম্মতি দিব না। মহারাণা আদেশ করিলে তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিব, আমি অতুলনীয়া যমুনা কুমারীকে তাঁহার অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া বিষাদ সমুদ্রে ডুবাইতে চাহি না।' কুমারীর মনের ভাবও অবিকল সেইরূপ। সুতরাং এ বিবাহ সম্বন্ধে লোকে যাহাই মনে করুক পাত্রপাত্রী মনে মনে কতই দুঃখের ও সুখের প্রতিমা ভাঙ্গিতেছেন ও গড়িতেছেন। উভয়েই ভাবিতেছেন পুনরায় সুযোগ পাইলেই অপরের হৃদয়ের ভাব জানিতেই হইবে।

অবিলম্বেই সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। দেবলবর নগর সন্নিহিত ভগবতী চিন্দিনেশ্বরী দেবীর যত্নের ক্রটী হওয়ার সংবাদ মহারাণার গোচর হইল। মহারাণা কুমার রতন সিংহের উপর তাহার যথাবিহিত তত্বাবধারণের ভারার্পণ করিলেন। তদুপলক্ষে দিবস চতুষ্টয় দেবলবররাজভবনেই কুমারের অধিষ্ঠান হইল। এই চারিদিবসের মধ্যে উভয়ে নানাবিধ সময়ে ও নানাপ্রকারে উভয়ের হৃদয় জানিলেন। কি জানিলেন? যাহা জানিলেন তাহাতে প্রত্যেকের এই বোধ হইল যে, অপর তাঁহাকে যত ভালবাসেন তাঁহার প্রেম হয়ত তাহার সমতুল্য নহে। এ সন্দেহ যে প্রণয়ের মূলে থাকে সেখানে প্রণয় অকৃত্রিমভাবে ও অমিত পরিমাণেই থাকে। অতএব এই যুগল হৃদয়ের শুভবিনিময়ই ঘটিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বেলা প্রহরেক সময়ে শৈলম্বর নগরের এক নিভৃত রাজপ্রকোষ্ঠে শৈলম্বররাজ ও কুমার অমরসিংহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যে যে রাজপুতকুলভূষণগণ স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত, অচিরে যবনেরা উঁদয়পুর আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া তাঁহারা আহার, নিদ্রা সুখ সম্ভোগ ইচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া নিয়তকাল বিপদ নিরাকরণের উপায় বিধানে নিরত। শৈলম্বররাজ মহারাণার একজন প্রধান কুটুম্ব। এই বীরবংশ চিরকাল পুরুষ-পরম্পরাক্রমে মহারাণাগণের জন্য অকাতরে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন ও আবশ্যকমতে জীবনও বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। সম্প্রতি মিবারের বিপদে বর্ত্তমান শৈলম্বররাজ যৎপরোনাস্তি চিন্তাকুল। তিনি বারংবার মহারাণার নিকট গমন করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেছেন। মহারাণার সহিত শেষসাক্ষাৎ সময়ে তিনি কোন নিগূঢ় কারণে কুমার অমরসিংহকে সঙ্গে লইয়া আইসেন, কুমারের আসিবার ইচ্ছা ছিল—পরন্তু স্বয়ং সহসা

আগমন করার অপেক্ষা আহূত হইয়া আসা তাঁহার পক্ষে সমধিক সুবিধাজনক হইল।

শৈলম্বররাজ মহারাণা প্রতাপসিংহ অপেক্ষা বয়ঃপ্রবীণ, এজন্য কুমারগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। শৈলম্বররাজ পুত্রহীন। বাল্যকালে অমরসিংহ সতত শৈলম্বররাজভবনে আগমন করিতেন। শৈলম্বররাজ ও তাঁহার মহিষী পুষ্পবতী তাঁহাকে তৎকাল হইতে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সম্প্রতি কুমার বহুদিন পরে আগমন করায় সকলে অপরিমিত আনন্দিত হইলেন। অন্তঃপুরমধ্যে মহিষী কুমারের সুখসেবনার্থ নানাবিধ আয়োজনে লিপ্তা। শৈলম্বররাজ কুমারকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"অমর! তোমার কি বোধ হয়? মিবারের কি জয়াশা নাই?"

"মিবারের জয়াশা নাই, একথা কেমন করিয়া বলি? যে মিবার ভ্রমেও কাহারও নিকট ন্যূনতা স্বীকার করে নাই, সম্প্রতি যে সেই মিবারের এককালে অধঃপতন হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

শৈলম্বররাজ কহিলেন,—

"কিন্তু বৎস আকবরের উদ্যম বড় সহজ নহে। নীচাশয় মানসিংহ শুনিতেছি স্বয়ং আসিবে।"

কুমার কহিলেন,—

"কিন্তু আর্য্য! ইহা কি আপনার বোধ হয় যে, আমাদের এত যত্ন ব্যর্থ হইবে। সত্য বটে অনেক রাজপুত স্বদেশগৌরব ত্যাগ করিয়া আকবরের পদলেহনে রত হইয়াছে, তথাপি আমাদের কি এমন বল নাই যে, আমরা যবনগণকে সাহারা পার করিয়া দিতে পারি?"

শৈলম্বররাজ কহিলেন,—

"অমর! যবনেরা যে আমাদের কিছুই করিতে পারে না তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তবে কথা এই যে, স্বজাতিশত্রু বড় ভয়ানক। মানসিংহ, সাগরজি প্রভৃতি রাজপুতকুল-গ্লানি বিভীষণগণ আমাদের যুদ্ধের প্রকৃতি, বল, সাহস, উপায় সকলি অবগত আছে। তাহাতে আবার মানসিংহ মহারাণা কর্ত্তৃক ঘোরতর অপমানিত হইয়াছে। সুতরাং এবারকার যুদ্ধ যে বড় সহজ হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

কুমার বলিলেন,—

"আপনার কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমরা কি এমন কোন সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারি না, যাহাতে শত্রুর বুদ্ধি ও বল পরাভূত হইবার সম্ভাবনা?"

শৈলম্বররাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"আমাদের সৈন্যসংখ্যা যতই হউক, তাহা বিপক্ষগণের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অল্প সৈন্য সুকৌশলে ও স্থান বুঝিয়া স্থাপিত করিয়া রাখিলে অধিকতর কার্য্য হইবার সম্ভাবনা।"

কুমার বলিলেন,—

"আপনার পরামর্শ সারবান্। কোন্ স্থান আপনার অভিপ্রেত?"

আবার অনেকক্ষণ চিন্তার পর শৈলম্বররাজ বলিলেন,—

"বোধ হয় হল্‌দিঘাটের উপত্যকাই উ-

ত্তম স্থান। কারণ যবনগণ সেই পথ দিয়াই মিবারে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। অতএব সেই পথ অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলে যবনের জয়াশা থাকিবে না।”

কুমার বলিলেন,—

“আপনি উত্তম স্থির করিয়াছেন। সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই হলদিঘাট ব্যতীত অন্য স্থান দিয়া মিবারে প্রবেশ করা যবনদিকের সুবিধা হইবে না। অতএব সেই পথ নিরুদ্ধ রাখাই সৎপরামর্শ। আরও দেখুন, হলদিঘাট অবরুদ্ধ রাখিতে যেরূপ সৈন্যবলের প্রয়োজন, অন্য কোন স্থান অবরুদ্ধ করিতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হইবে।”

শৈলম্বররাজ। তুমি যদি আমার অগ্রে রাজধানীতে গমন কর, তাহা হইলে এই প্রস্তাব মহারাণাকে জানাইয়া রাখিবে, পরে আমিও তাঁহাকে এই কথা জানাইব। তাহার পর সৈন্য সংগ্রহের কথা। আমার অধীনে বোধ করি ৫০০০ পাঁচ সহস্র সৈন্য গিয়া মহারাজার ধ্বজার নিম্নে দণ্ডায়মান হইবে। তবে তুমি যদি তিন চার দিন এখানে থাকিতে পার তাহা হইলে ঐ সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। কারণ প্রজাবর্গ যদি জানিতে পারে যে, তুমি স্বয়ং সৈন্যসংগ্রহার্থ এখানে আসিয়াছ তাহা হইলে রোগী বা দুর্ব্বল, বৃদ্ধ বা যুবা, নর বা নারী উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া,উঠিবে এবং স্ব স্ব ধন প্রাণ জগৎপূজ্য মহারাণার প্রয়োজনার্থ পরিস্থাপিত করিবে।

“যে আজ্ঞা—আমি চারি পাঁচ দিন অপেক্ষা করিলে যদি অধিকতর উপকার হয় তবে তাহাই করিব। কিন্তু আর্য্য! যাহারা অক্ষম, যাহারা কাতর, তাহারা যেন রাজভক্তির উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া অনর্থক ক্লেশ না পায়।”

এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া নিবেদন করিল,—

“কুমার আসিয়াছেন শুনিয়া মহিষী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। অতএব যদি কুমারের এখানে আর কোন প্রয়োজন না থাকে, তিনি তাহা হইলে পুরমধ্যে আগমন করুন।”

অমরসিংহ সম্মতির প্রার্থনায় শৈলম্বর রাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি সম্মতি-সূচক ইঙ্গিত করিলে কুমার পরিচারিকার সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গ্রীক এবং হিন্দু

তৃতীয় প্রস্তাব।

ভারতে ভারতীয় মানবচিত্ত ভারতের অদ্ভুত প্রকৃতি দর্শনে, ক্রমে ক্রমে মনস্তত্ত্ব ও পারলৌকিক চিন্তায় এরূপ সমাহিত হ-ইল, যে পর পর অদৃশ্য ভেদ করাই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। গ্রাক জীবনের উদ্দেশ্য এই যে পর-জীবন থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে অধিক যায় আসে না; কিন্তু ইহ জীবন আত্মধন ও সুখ-সম্ভোগে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিলেই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা হইল। অত-এব ভারতীয় জীবন ঠিক ইহার বিপরীত। ভারতচিত্ত উত্তর-দক্ষিণ—পূর্ব্ব—পশ্চিম, চতু-র্দ্দিকেই যাবতীয় প্রাকৃতিক কার্য্যমাত্রে এক-মাত্র অদৃষ্ট-হস্ত বলবান্ ও দুর্দ্দমনীয় দে-খিয়া, ভয়বিস্ময়ে আত্ম-লুপ্ত হইয়া, সর্ব্ব-পরিচালক অদৃষ্টহস্তে আত্মসমর্পণ করি-লেন। 'আমি কে'—'কোথা হইতে আসি-য়াছি',—'কেন এ সংসারে অবস্থিতি', —'আ-মার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি,'—'কোথায় যা-ইব,'—'এ বাহ্য জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি,'—এবং 'কাহার আজ্ঞায় এই বাহ্য জগৎ পরিচালিত হইতেছে;' মানব-চিত্ত এই সকল প্রশ্ন আপনাকে আপনি জি-জ্ঞাসা করিতে করিতে, নিগূঢ়ভাবে আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল। চিন্তারও সীমা নাই, আত্ম-লোপেরও সীমা নাই; তথাপি চিত্তের শান্তি কোথায়? চতুর্দ্দিকে যে দিকে তাকাই, কেবল একমাত্র স্বচ্ছন্দ তিমিররাশি দিগ্বলয়কে বিনষ্ট করিয়া, বিকটবেশে যুগপৎ হৃদয়কে আকম্পিত ও আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর,—তাহার উপর—তাহার উপর,—তথাপি কোথাও ইহার সীমা দেখিতে পাই না। আশা-নিরাশা-সম প্রায় তরঙ্গপতিতবৎ কূলশূন্য কাল-তরঙ্গে কেবল হাবুডুবু খাইয়া হাহাকার মাত্র সার। হাবুডুবু-হাহাকারের ঘটা পা-ঠক একবার দেখিতে চাও কি? ঐ দেখ একজন প্রাচীন, কিন্তু তখনও নবাগত, বৈ-দিক ঋষি, কিরূপ ঘোরতরঙ্গে পতিত হইয়া কিরূপ হাবুডুবু খাইতে খাইতে কি ঘোর অস্ফুট চীৎকার করিতেছে! সে চীৎকারের ধ্বনি এরূপ দিগন্ত-বিশ্রুত যে তাহার শব্দ এতদূরেও আমাদের কর্ণগত হওয়ার পক্ষে কিছুমাত্র ক্রটি হইতেছে না;—

"ন অসদ্ আসীদ্ নো সদ্ আসীৎ তদানীং
নাসীদ্ রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিম্ আবরীবঃ কুহকস্য শর্মন্নম্ভঃ কিম্
আসীদ্ গহনং গভীরম্॥ ১
ন মৃত্যুর্ আসীদ্ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যাঃ
অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একং তস্মাদ্
হ অন্যদ্ ন পরঃ কিঞ্চনাস॥ ২

তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে অপ্রকেতং
সলিলং সর্বং আ ইদম্।
তুচ্ছ্যেন আভ্ব্ অপিহিতং যদ্ আসীৎ তপসস্
তদ্ মহিনা অজায়তৈকম্॥ ৩
কামস্ তদ্ অগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ
প্রথমং যদ্ আসীৎ।
সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন্ হৃদি
প্রতীষ্যাকবয়ো মনীষা॥ ৪
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মির্ এষাম্ অধঃ স্বিদ্
আসীদ্ উপরি স্বিদ্ আসীৎ।
রেতোধাঃ আসন্ মহিমানঃ আসন্ স্বধা
অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ॥ ৫
কো অদ্ধা বেদ কঃ ইহ প্রবোচৎ কুতঃ
আজাতা কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবাঃ অস্য বিসর্জনেন অথা
কো বেদ যতঃ আবভূব॥ ৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্ যতঃ আবভূব যদি বা
দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥ ৭
ঋঃ বেঃ। ১০মঃ। ১২৯ সূঃ।

—সেই আদিতে সৎ, অসৎ, রজো বা ব্যোম্, ইহার কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। বলিতে পার এ সকল কিসের দ্বারা আবরিত ছিল,—বা কাহার অভ্যন্তরেই বা এ সকলের বীজ নিহিত ছিল? যাহাতে আবরিত ছিল, তাহা কি জল?—না "গহনম্‌গভীরম্"? তখন হয়ত মৃত্যু বা অমৃতত্ব ছিল না, রাত্রি বা দিবার প্রভেদ ছিল না, কেবল একমাত্র, যাহার অন্তর বা ঊর্দ্ধে কেহ নাই, যিনি আপনাতেই নির্ভর করিয়া শ্বাস ক্রীড়া নিরত, একমাত্র তিনিই বর্ত্তমান ছিলেন। অগ্রে কেবল অন্ধকার গূঢ়তম অন্ধকারে আবৃত, এবং সর্ব্বত্র "অপ্রকেতম্ সলিলম্" দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। এবং সেই একমাত্র যিনি তুচ্ছস্বরূপ এবং তুচ্ছদ্বারা আবৃত ছিলেন; তপোদ্বারা পুষ্টতা যুক্ত হইলেন। মনের প্রাথমিক বীজস্বরূপ কাম সর্ব্বাগ্রে তাহা হইতে উৎপন্ন, এবং কামহইতে রেতঃ উৎপন্ন হইল। সদসদের সংযোগ-রজ্জুস্বরূপ ইহার অবস্থিতি, কবিগণ আপনাপন অন্তঃকরণে বুদ্ধিদ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন। যে রশ্মি জগৎ-ব্যাপ্ত হইয়া বিস্তৃত, তাহা কি অধঃ না উপরে অবস্থিত ছিল? রেতঃ, মহিমা, এবং স্বধা কি নিম্নে ও মহাশক্তি ঊর্দ্ধে ছিল? এই সৃষ্টি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে?—কে ইহার সৃষ্টি করিল? কে জানে?—কে কহিতে পারে? দেবতারা কি পারেন? তাঁহারা ত এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, অতএব তাঁহারাই বা কেমন-করিয়া কহিবেন? অতএব কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কে বলিবে? যাহারা সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছে, তাহাদের ত জানিবার সম্ভব নাই। যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ, যিনি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তিনি কি এ তত্ত্ব জানেন? হয় ত তিনি এ তত্ত্ব জানিতে পারেন, অথবা হয় ত তিনিও ইহা জানেন না।—

পিঞ্জরবদ্ধ মানবচিত্ত পিঞ্জরমুক্ত হইবার জন্য উন্মত্তবৎ ছট্‌ফট্ করিতেছে,—পিঞ্জরের দ্বারাবদ্ধ। বিনষ্ট-দিক-অন্ধকারে ভ্রান্ত পথিক নিদর্শনী আলোক-দর্শন লালসে এদিক ওদিক্ ধাবিত হইয়া কুশ কাঁটায় রক্তারক্তি হইতেছে,—কোথাও নিদর্শনী আলোকের

চিহ্ন নাই। আর্য্যঋষি যখন এই ঘোর চিন্তাতরঙ্গে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছেন, তখন গ্রীকচিত্তের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। প্রকৃতি যেখানে যতই ক্ষীণবেশে থাকুক, মানবচিত্তে পারলৌকিক ভাবের আবির্ভাব করিবেই করিবে, প্রভেদ কেবল বিভীষিকা ও বিস্ময় বিষয়ের ন্যূনেতর ভাব। অতএব গ্রীকচিত্ত যখন দেখিল যে পারলৌকিক ভাব আবির্ভাবের হাত আর ছাড়াইবার যো নাই, তখন যাহা হউক তাহার একটা উপায় আবশ্যক। নতুবা চিত্ত প্রবোধ মানিতেছে না। ভাল! তাহাই হইবে। ইহারা আদত কাজের লোক, হাতে হাতে ফল চাহি, নতুবা হাওয়ায় দড়ি বাঁধিয়া কি হইবে, অতএব অদৃষ্ট বিষয়ের জন্য অধিক হাবু ডুবু খাইবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি মাত্রেই স্থির হইল যে "গহনম্ গভীরম্" (Chaos) হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। কিন্তু কেন হইল? কে করিল? তাহা বৈদিক ঋষি বসিয়া ভাবুন, আমার ভাবিবার আবশ্যক নাই; কেন হইল, কে করিল, তাহাতে আমার আবশ্যক কি? যেই করুক, যে কারণেই হউক, উহা হইয়াছে;—উহা আছে, এবং আমি আছি,—উহা আমার সকল রকমের অভাব পূরণ করিতেছে, ইহাই যথেষ্ঠ; আর অধিক কি আবশ্যক? চিত্তের এ নিষ্পত্তি শেষ নিষ্পত্তি, ইহার উপর তর্ক খাটে না। অতএব গ্রীকচিত্ত অম্লানমুখে তাহার উপরে ঢাল চাপা দিয়া আহার করিতে করিতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া নিরূপণ করিতেছেন। পৃথিবী হইতে উরেনস অর্থাৎ তারকামণ্ডলবেষ্টিত আকাশের উৎপত্তি হইল। অনন্তর পৃথিবী এবং আকাশ এতদুভয়ের মধ্যে প্রণয় সংস্থাপন হইলে, উরেনসের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে দ্বাদশ তিতান, সিক্লোপিস ত্রয় ইত্যাদির জন্ম হইল। ইত্যাদি, ইত্যাদি। ক্রমে বহুদেবের উৎপত্তি হইল, কিন্তু ইহাদের সকলেই তাৎকালিক মানবচিন্তায়ত্ত সুখের জন্য লালায়িত, সুতরাং পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, হত্যা, পিতৃহত্যা প্রভৃতি দ্বারা স্ব স্ব বিভবে স্থাপিত হইলেন;—অথবা অন্য কথায় কল্পনামার্গে আর একদল উচ্চশক্তি ও উচ্চবিভবশালী গ্রীকের উপস্থিতি হইল। যাহা হউক ইহারা উচ্চ এবং দেবতা, সুতরাং ইহাদিগকে মান্য করিতে হইবে; কিন্তু তাহার প্রতিদান চাহি, নতুবা ও সকল আমা হইতে হইবে না। অতএব গ্রীকদেবতা কখনও ভূমি চসিয়া চাস করিতে লাগিলেন, কখন বা মদ চোঁয়ান সাহায্য করেন, কখন বা ভাল অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত, আবার কখন বা রণস্থলে যাইয়া বীরগণের সাহায্যে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। দেবতাই হউন, আর যিনিই হউন, বিনা খাটুনিতে খাইবার যো নাই। দানাদান বিজ্ঞান হাতে হাতে। গ্রীকদিগের দেবতা হওয়াও দায়! প্রকৃতি হারি মানিলেন, তাঁহার পারলৌকিক ভাব লৌকিকে আসিয়া পরিণত হইল। *

* এই প্রবন্ধে অন্তে পরিশিষ্টরূপে গ্রীক পুরাণের সার সংগ্রহ করিয়া গ্রীক দেবদেবীর একটি সবিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করা যাইবে। বঙ্গীয় পাঠকের অনেকেই সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাত না থাকায়, এখানে তাহাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ যথা সাধ্য পরিহার

এক্ষণে ভারতচিত্তের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। দারুণ ঘূর্ণবায়ুতে ঘোরতিমিরে পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় আকুল হইয়া ঘুরিতেছেন। কিন্তু ঘূর্ণ বায়ু বা ঘোর তিমির ইহার কেহই স্থায়ী নহে। ক্রমে ঘূর্ণবায়ু সাম্য হইল, প্রচণ্ড বায়ু ধীরে ধীরে নামিয়া সুখস্পর্শ শীতল বায়ুতে পরিণত হইল। ঘোর-অন্ধকার ক্রমে ক্ষীণ অন্ধকারে আসিল, পূর্ব্বদিক ফরসা ফরসা বোধ হইতে লাগিল; —আরও ফরসা—আরও ফরসা, ক্রমে জাগতিক বস্তুনিকর নয়নপথে আসিল। পূর্ব্ব অশান্তির অপলোপে মন রমণীয়তার পূর্ণভাবে পরিপূরিত হইবায়, সমগ্রদৃশ্যের যখন যে খণ্ড নয়নকে আকৃষ্ট করিতেছে, তাহাই যেন অভিনব নূতন সৃষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।—আর্য্যঋষি এখন পথ পাইয়া প্রতি প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবতা বিশেষের অবস্থান ও কর্তৃত্ব দেখিতে পাইলেন। এ বহুদেবকল্পনা গ্রীকদিগের অপেক্ষা উচ্চতর হইলেও, মনের শান্তি পূর্ণভাবে উদয় করিতে পারিল না। আর্য্যঋষি আবার সর্ব্বশান্তিবিধায়কের অনুসন্ধানে ফিরিলেন। এ দিকে ফরসার উপর আরও ফরসা হইতে হইতে সূর্য্য আসিয়া উদিত হইলেন, দিক সকল হাঁসিতে লাগিল; ভ্রান্ত পথিক এখন দেখিল যে যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হইলাম, দৃশ্যের প্রতি পুনঃদৃষ্টি করিয়া তখন হৃদ্বোধ হইল, যে আমার মানসিক আগ্রহে যাহাদিগকে নূতন নূতন সৃষ্টি বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, তাহারা বস্তুতঃ নূতন সৃষ্টি নহে,—উহা এক মহাসৃষ্টির অংশমাত্র। আর্য্যঋষিও তাঁহার বোধসূর্য্যের উদয়ে দেখিতে পাইলেন,—

"সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভির্ একম্
সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।"—

ঋঃ বেঃ। ১০ম। ১১৪ সূঃ

—সুবর্ণস্বরূপ যে দেব ঋষিগণ দ্বারা বহুবিধরূপে কল্পিত হইয়া স্তুত হইয়াছেন, তিনি একমাত্র।

পুনশ্চ

"বিশ্বতশ্চক্ষুর্ উত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুর্ উত বিশ্বতস্পাৎ।
সম বাহুভ্যাং ধমতি সম্ পতত্রৈর্ দ্যাবাভূমী জনয়ম্ দেবঃ একঃ॥"

ঋঃ বেঃ। ১০ম। ৮১ সূঃ

—যে একমাত্র দেব স্বর্গ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি করণ-কালীন বাহু এবং পক্ষ চালনা করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বচক্ষু, বিশ্বমুখ, বিশ্ববাহু এবং বিশ্বপদ।

বিদেশীয়বর্গের সংশ্রব-ফলে মনস্তত্ত্ববিদ্যায় আগ্রহের উৎপাদন হওয়াতে, তত্ত্বনিরূপণ করিতে গিয়া যখন গ্রীসীয় বিজ্ঞপ্রবরগণ কেহ অগ্নি, কেহ বায়ু, কেহ জল, পৃথিবীর আদি-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, অথচ কোন কূল কিনারা পাইয়া উঠিতেছেন না; অথবা যখন সক্রেতিস প্রভৃতি বিজ্ঞগুরুগণ, 'দেখি—দেখি—দেখিতে পাই না', এরূপভাবে কুজ্ঝটিকা-অন্ধকারে অভীষ্টবস্তুর অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন; তাহার বহুপূর্ব্বে,—তাহার শত শত বৎসর পূর্ব্বে, বৈদিকঋষি পারলৌকিকতত্ত্বরসে উ-

করা গেল; কারণ তদ্রূপ উল্লেখে কোন ফল হইত না, প্রত্যুত তাহাতে অনেক গোলমাল জন্মাইয়া দিত।

রূপ গীত গান করিয়া আত্মকৃতার্থ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় চিত্ত ক্রমে ক্রমে পারলৌকিকতত্ত্বে এরূপ সমাহিত হইল যে, মানবচিত্ত পর পর অদৃশ্য ভেদ করিতে ক্রমাগত উৎসাহবান্ হইয়া, মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং পরলোকেই সমস্ত নির্ভরতা সিদ্ধান্ত করিয়া, পার্থিব সমস্ত বিষয়েই আস্থাশূন্য ; এবং তাহা ক্ষণমাত্রের বস্তু এরূপ বোধ করিয়া, তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত শিথিলযত্ন হইলেন। সংসার অনিত্য, সংসারস্থ পদার্থ অনিত্য, সংসার কেবল বাসাবাড়ি স্বরূপ ; পরলোকই মূল বাসস্থান এবং স্বয়ং এই বিশ্বপতি সেই বিশ্ববাসস্থানের পিতৃ-দেবতা। অতএব ভারত-ঋষি ক্রমে প্রত্যক্ষ-ভেদ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষে উঠিলেন বটে, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, তাই বলিয়া তাঁহাকে বিভীষিকাময়-শূন্যে বিনা-অবলম্বনে দুলিতে হইল না। তাঁহার জীবন-উদ্দেশ্য ও জীবন-গতির, যাহা তৎপক্ষে শ্রেষ্ঠতম অবলম্বনীয় হইতে পারে, তাহাই তাঁহার অবলম্বন স্থলীয় হইল। তরঙ্গ-ঘাত-বিঘাতিত নৌকা বহুকষ্টে কিনারায় আসিল ;—আনন্দ-দায়ক অনুকূল কিনারায় আসিল। শান্তি লাভ করিলেন। এখন সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতীয়দিগের অবলম্বন পারলৌকিক সুখ, গ্রীকদিগের অবলম্বন পার্থিব সুখ। ভারতীয়দিগের উপাস্য-ইষ্ট বিশ্ব-পরিচালক দেবতা ; গ্রীকদিগেরও উপাস্য-ইষ্ট দেবতা বটে, কিন্তু কিরূপ দেবতা, তাহা উপাসনার উদ্দেশ্য দ্বারা অবধারণ কর। ভারতীয়দিগের উপাসনার উদ্দেশ্য পারলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভ, এবং প্রাপ্ত-মঙ্গলের নিমিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ; গ্রীকদিগের উপাসনার উদ্দেশ্য ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ। দেবতাকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের কারণ-অভাব ; কারণ, যাহা আমি পাইয়াছি বা যাহা আমার আছে, তাহা আমারই হক প্রাপ্য তাই পাইয়াছি, তাহাতে দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ? এখনও যেমন যেরূপ উপাসনা করিব, তাহার তেমনি প্রতিদান চাই। অতএব ভারতীয়দের দৈবকার্য্য বিষ্ণুপ্রীতিকামার্থে ; আর জমা-খরচ-বিজ্ঞানবিৎ গ্রীকদিগের দৈবকার্য্য আত্মপ্রীতি-কামার্থে। এ সংসারক্ষেত্রে যে চিত্তের অবলম্বনীয় বস্তু যেরূপ, সে চিত্তের এ সংসারোপযোগী কর্ত্তব্য বোধ ও নীতি-মার্গও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রীকদিগের কর্ত্তব্য বোধ ঐশ্বর্য্য-লাভ ; ভারতীয়দিগের কর্ত্তব্য বোধ ধর্ম্ম-লাভ। ভারতীয়দিগের নীতিমার্গ, যে কোন উপায়ে হউক ধর্ম্মবিধায়ক ; গ্রীকদিগের নীতিমার্গ, যে কোন উপায়ে হউক, ঐশ্বর্য্য-বিধায়ক। এতৎকারণে ভারতীয়েরা ধীর, শান্ত, বিনীত, সর্ব্বভূতে সমান দয়াবিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে আগ্রহবান্। আর গ্রীকেরা উদ্ধত, বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত ; ক্ষমতার পক্ষপাতি,—যাহার বল অধিক, সেই অধিকারী, সেই ব্যক্তিই পূজনীয় ; হিত ও দয়া আত্মহিতে সমাবিষ্ট। বলা বাহুল্য যে এ উভয় গুণই, উভয় জাতির উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে, উভয়তঃ কার্য্যকর।

উপরে যাহা কথিত হইল, তাহার একটি উদাহরণ দেখা যাউক। ভারতীয় এবং গ্রীকেরা

যখন আপনাদের স্ব স্ব উপনিবেশ ভূমিতে পদার্পণ করেন, তখন উভয়কেই তত্তৎদেশজ আদিম অধিবাসীদিগের নিকট বলবিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে পদানত করিয়া তাহাদিগের বাসস্থান দখল করিতে হইয়াছিল। আদিমগণের উপর উভয়েই আত্মপ্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতে তাহারা শূদ্র, গ্রীসে তাহারা পিলাসগী। ভারতীয়দিগের নিকট শূদ্র যেরূপ সম্বন্ধ-যুক্ত, গ্রীকদিগের নিকট পিলাসগীও তদ্রূপ। কিন্তু এখন দেখ এই উভয়জাতি, আপনপদাবনত আদিম অধিবাসীদিগের উপর কেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভারতীয়দিগের নিকট মানব যতই হীনাবস্থায় থাকুক না কেন, তথাপি প্রত্যেক মানব ঈশ্বরের প্রতিরূপ স্বরূপ, অতএব কাহাকেও একবারে হেয় ভাব প্রদর্শন করিলে, তাহা ঈশ্বরের প্রতি করা হয়। ভারত-সন্তান তেমন কার্য্যে কখনও সাহসী হইতে পারেন না। সুতরাং শূদ্রেরা সহস্র গুণে অন্ত্যজ হইলেও, তাহারা মানবীয় অধিকার হইতে চ্যুত হইতে পারে না। এজন্য শূদ্রেরা দাস্যবৃত্তি অবলম্বী হইলেও তাহারা সামাজিক স্বাধীনতা হইতে কোন অংশে বঞ্চিত নহে, এবং রাজদ্বার ভিন্ন, কি আপন প্রভু, কি অপর কেহ, কাহারই নিকট আপন সদসদের জবাবদেহি করিতে হইত না। পুনশ্চ এই শূদ্রেরা দাসত্ব হইতে হীনত্ব-প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং পূর্ব্ব পশুভাবহইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে পিলাসগীদিগের অবস্থার প্রতি অবলোকন কর, দেখিতে পাইবে যে মানুষ হইয়া, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মানুষকে কতদূর পশুভাবে ব্যবহার করিতে পারে। এই পিলাসগী দাসেরা গো মেষাদি আর আর পশুপালের সঙ্গে সমজাতীয় অস্থাবর সম্পত্তি-বিশেষ। সমাজের সঙ্গে গো মেষাদি পশুপালের যে সম্বন্ধ, ইহাদেরও সেই সম্বন্ধ। সুতরাং সামাজিক স্বাধীনতায় ইহারা একবারে বঞ্চিত। প্রভুই সর্ব্বে সর্ব্বা, রাখিলে রাখিতে পারেন; মারিলে মারিতে পারেন। প্রভুরাও ইহাদের উপর ততোধিক অত্যাচার করিতেন, এবং যখন ইচ্ছা যাহার প্রাণদণ্ড বা প্রাণ রক্ষা করিয়া রোষ বা তোষ জ্ঞাপন করিতেন। সময়ে সময়ে এই হতভাগ্যদিগকে অরণ্যচর পশুর ন্যায় পালে পালে এককালে নিপাত করিবার পক্ষে, উদাহরণ বিরল নহে। এখানে দেখ, ইহ লৌকিক ঐশ্বর্য্যপ্রিয়তা-গুণ-জনিত স্বার্থ সাধন হেতু মনুষ্যচিত্ত কিরূপ মনুষ্যত্ব পরিত্যাগকরণে সমর্থ। পিলাসগীরা ইহাদের দাস্য, কৃষি, পশুপাল-রক্ষা ইত্যাদি শ্রমসাধ্য, সামাজিক-বোধে হেয়, কার্য্য সমূহ নির্ব্বাহ করিত।

ভারতীয়দিগের সাহিত্য, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি সকল প্রকার বিদ্যাতেই পারলৌকিক তত্ত্ববোধের আধিক্য লক্ষিত হয়। মনস্তত্ত্ব সেই বোধের পরিপোষক বলিয়া তৎসম্বন্ধে যতদূর উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, ততদূর আর কোন বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং তাহার সমানও আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার তুলনে গ্রীকদিগের মনস্তত্ত্ব বাল-চপলতা বলিলে হয়। ব্যবহার শাস্ত্র যদিও একটি

স্বতন্ত্র বস্তু, তথাপি তাহা সেই পারলৌকিক বোধের সহ এতদূর ঘনিষ্ঠতায় আসিয়াছিল; অথবা পারলৌকিক বোধযুক্ত চিত্ত হইতে উদ্ভব হওয়ায় এরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, যে অন্য কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না; এবং বলা বাহুল্য যে ইহার উন্নতিকল্পেও কোন অংশে ক্রটি হয় নাই। এই বিষয়ের সত্যতা, ভারতীয় প্রাচীন ব্যবস্থা শাস্ত্র এবং সমপ্রাচীনত্ব-ভাবযুক্ত স্পার্টাদেশীয় লাইকর্গস প্রণীত ব্যবস্থাশাস্ত্র, এতদুভয়ের তুলনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে। লাইকর্গসের ব্যবস্থাশাস্ত্র, কিরূপে সমাজের লৌকিক স্বচ্ছন্দতা সাধিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমাজের মঙ্গলের জন্য পারিবারিক স্নেহের দমন,অসুখকর খাদ্য ভোজন, ইচ্ছার অনভিপ্রায়েও লোকসংমিলনে বাস,চৌর্য্যাদির উৎসাহ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ফল কথা এতদর্থে কোন নৈতিক বিষয় বা মনুষ্যত্বকে যদি তাহার নিকট বলি দিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি সামাজিক মঙ্গলসাধনে যত্নপর হও। সকল বিধিরই উদ্দেশ্য বাহ্যসম্পদ্ সাধন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐরূপ-সোলনের বিধি দেখ, রোমকদিগের ব্যবস্থাগ্রন্থ দেখ, একই উদ্দেশ্য; সেই ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর হিন্দুদিগের ব্যবস্থাগ্রন্থ দেখ, ঠিক ইহার বিপরীত। ধর্ম্মবোধে যে যে বিষয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত এবং সেই পবিত্রতা ও ধর্ম্মসঞ্চয় যাহাতে যাহাতে হইতে পারে, তাহারই সংসাধন পক্ষে প্রায় অধিকাংশ বিধি পর্য্যবসিত হইয়াছে। তজ্জন্য যদি লৌকিক নীতি ও বাহ্য সম্পদ্ বলি দেওয়া হয়, তাহাতেও ক্রটি হয় নাই। বাহ্যসম্পদ্ সমস্তই যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই,তথাপি যাহাতে পরলোকে স্বচ্ছন্দতা লাভ হইতে পারে, এরূপ পবিত্রতা সাধনে ক্রটি না হয়। লাইকর্গস বাহ্য সম্পদের অনুরোধে, অসম্পন্ন-অবয়ব বা ক্ষীণদেহ। শিশুহত্যায় কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন নাই, বা তাঁহার মনে কিছুমাত্র বিষাদ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দুরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, মানুষ দূরে থাকুক, কোন একটি ইতরজাতীয় প্রাণিবধজনিত নিমিত্তের ভাগী হইলেও, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পরলোকের পথ-পরিষ্কারক অঙ্গ-পবিত্রতা সাধন করিতেন। এতদপেক্ষা এতদুভয়ের বিভিন্নতা এবং হিন্দু ও গ্রীকচিত্তেরও গতিবিষয়ক সুন্দর দৃষ্টান্ত, আর কি হইতে পারে।

এক্ষণে এতদুভয় জাতির বিদ্যা ও বিবিধশাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্ব নিয়ম অনুসরণ করিলে বলিতে হইবে যে, যে বিদ্যা উপপাদ্য অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে Theoritical কহে, তাহাকে হিন্দুরা; এবং যে বিদ্যা আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ যাহাকে ইংরেজিতে practical কহে, তাহাতে গ্রীকেরা; উৎকর্ষ লাভ করিবার কথা। বস্তুতঃ তাহাই। হিন্দুদিগের বিদ্যার ভিত্তি উপপাদিকা শক্তি অর্থাৎ ইংরেজিতে Theory, গ্রীকদিগের বিদ্যার ভিত্তি আনুষ্ঠানিক শক্তি অর্থাৎ ইংরেজিতে Practical. এই কারণে আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ এবং তদানুসঙ্গিক উচ্চশ্রেণিস্থ গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে আর্য্যদিগের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। বিশেষ

শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ব্যতীত হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধন হইতে পারিত না, তাহাতে আবার যে দেশ যত গ্রীষ্মপ্রধান সে দেশে তত রোগ হয়, এবং যেরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তই হউক, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা কে না ভাল বাসে। এই সকল কারণে হিন্দুরা প্রথম হইতেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে, অতি অল্পদিনেই সুফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং এই সূত্রে বহুবিধ রাসায়নিক, পাশব ও উদ্ভিত্তত্ত্বও সেই সময়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত হয়। উহা এত প্রাচীন সময়ে সংসাধিত হইয়াছিল যে, হয় ত গ্রীকেরা তখন মিসরীয়দিগের নিকট ভৈষজ্যবিদ্যা কর্জ্জ করিবেন বলিয়া ঋণখৎ লিখিতে বসিয়াছেন মাত্র। ভারতীয় এই ভৈষজ্যবিদ্যা কালক্রমে আরও উৎকর্ষ প্রাপ্ত এবং অন্যান্য জাতিদ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই ভারতীয় ঔষধই গ্রীক ভূমিতে গিয়া, গ্রীক এবং মিসরীয় অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ভারতে পুনরাগমন পূর্ব্বক "ইউনানি দাওয়াই" বলিয়া হকিম সাহেবদিগের দ্বারা প্রচারিত হইতেছে।

জ্যোতিষ ও গণিতসম্বন্ধেও ভারতীয়েরা বহুবিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং অপরাপর অনেক জাতিকে শিক্ষা দিয়াছে। এ মত যদি সত্য হয়, যে—"চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহমণ্ডলীর অদৃষ্টপূর্ব্ব গতিবিধি এবং বিস্ময়কর প্রাকৃতিক কার্য্য কলাপ দর্শনে আদি মানবের মনে যে বিস্ময় উৎপাদন ও নৈসর্গিক শক্তিবোধ জন্মে, তাহা হইতেই কালক্রমে দেবতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, এবং সেই সকল চিত্তমোহকর পদার্থ দেবপদে বরিত হয়;" তাহা হইলে স্বচ্ছন্দতাযুক্ত মানবচিত্ত যে আপন অবসরকালের কিয়দংশ সেই সেই দেবতত্ত্বভেদ ও দেবতার স্বভাব ও গতিবিধি নিরূপণে ব্যয়িত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীনকালে যে যে দেশ স্বচ্ছন্দতাযুক্ত ধনসঞ্চয় করিয়া অল্পদিনেই সভ্যতার উদ্ভাবক অবসর লাভ করিয়াছে, সেই খানেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কোন না কোনরূপ চর্চ্চা এবং তাহাতে প্রতিপন্নতা লাভ সিদ্ধ হইয়াছে। এই নিমিত্ত প্রাচীন জ্যোতিষতত্ত্ব সমালোচনায় মিসর, ব্যাবিলন, চীন বা ভারতবর্ষের নাম যেরূপ অগ্রে গণনায় আসিবে; গ্রীস কি রোম কিংবা তদ্রূপ অন্যান্য দেশের নাম সেরূপ গণনায় আসিবে না। মিসরদেশে এত প্রাচীনকালে জ্যোতিষিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় যে, কথিত আছে খৃষ্টীয় শকের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসরীয়েরা রাশিচক্র ও দ্বাদশ রাশি নিরূপণ এবং তাহাদের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এবং ইহাও কথিত আছে যে, ইহারাই পাশ্চাত্যভূমে সর্ব্বপ্রথম সপ্তাহ বিভাগ এবং গ্রহগণের নামানুসারে তদন্তর্গত দিবস সকলের নামকরণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ তত্ত্বও তাহাদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত ও উদ্ভূত হয়। ঐরূপ চীনদিগের জ্যোতিষিক তত্ত্ব নিরূপণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কথিত হয় যে, খৃষ্টীয় শকের ২৬৯৭ বৎসর পূর্ব্বে হোয়াংসির রাজত্ব সময়ে নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত ও তাহাদের অনেকের গতি নিরূপিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা এই সপ্রমাণ হইতেছে যে, যদিও ঐ তারিখ সন্দেহস্থলীয় হয় এবং ঐ

নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ যদিও নামে মাত্র এবং সামান্য আকারের বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে চীনেরা অতি প্রাচীনকালেই জ্যোতির্বিদ্যায় মনঃসংযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ব্যাবিলনবাসী ও কাল্ডিয়াবাসীরাও জ্যোতির্ব্বিদ্যা-আলোচনায় প্রাচীনত্বে ন্যূন নহে। তাহারাও বহু প্রাচীনকালে বহুবিধ নূতন তত্ত্বাদি আবিষ্কার করিয়াছিল। কোন কোন পুরাবৃত্তবিদ্ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে, যে জাতি অধিক পরিমাণে ভ্রমণশীল, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হেতু, দিক ও সময় নিরূপণ উপলক্ষে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে। এবং সেই সূত্র হইতেই সর্ব্ব প্রথমে গ্রহ নক্ষত্রাদি আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হয়। একথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য বটে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের এরূপ ভ্রমণশীল অবস্থায় আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত জ্যোতিষিক বিষয় সমস্ত যে জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন স্থায়ি ফল প্রসব করিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রীকেরা অনাশ্রমী ভাবে বহুকাল ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যদ্রূপ গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয় দিগকে তাহার শতাংশের একাংশও ঘুরিতে হয় নাই, পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্কান্দিনেবীয়েরা আবার গ্রীকদিগের অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে নিরাশ্রমী ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন স্থলে বলিতে হইবে যে স্কান্দিনেবীয় দিগের মধ্যেই তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথম জ্যোতিষিক জ্ঞানের উৎপান ও বিস্তার সাধন হইয়াছিল। কিন্তু কোথায়? ফলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে এই স্কান্দিনেবীয়দিগের মধ্যে জ্যোতিষ বিষয়ক গণনীয় জ্ঞান কিছুই ছিলনা। গ্রীক দিগের মধ্যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে জ্যোতিষ-বিষয়ক জ্ঞান অতি সামান্য ও অগণনীয় ছিল। ঐ সময়ের অব্যবহিত পর হইতেই ইহারা মিসরীয় ও কাল্ডিয় জাতিদিগের নিকট হইতে উক্তবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, এবং বলিতে হইবে যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতেই ইহারা গণনীয় জ্ঞান যথা কথঞ্চিৎ মাত্র লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে জ্যোতিষ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা অতোলিক্ষ সচল গোলক, ও গ্রহগণের উদয়াস্ত সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপরে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অরিস্তরিক্ষ এবং ইরত-স্থিনিস ও আর্কিমিডিস জ্যোতিষের সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের দেখ, তাঁহাদের ঋগ্বৈদিক গাথা সমূহ কোন দূরতর কালে প্রস্তুত ও গীত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি তাহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক বহুতর সারতত্ত্ব সমূহের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত সামবেদীয় গোভিলীয় নবগ্রহশান্তি পরিশিষ্ট, এবং অথর্ব্ববেদীয় নক্ষত্রকল্প, গ্রহযুদ্ধ, নক্ষত্র গ্রহোৎপাত লক্ষণ, কেতুচার, রাহুচার, এবং ঋতুকেতু লক্ষণ, ইত্যাদি প্রাচীনতম গ্রন্থে সাক্ষ্য দিতেছে যে, অতি প্রাচীনকালেই জ্যোতির্বিষয়ক জ্ঞান ভারতে অপরিমিতভাবে উন্নতি লাভ

করিয়াছিল। তৎপরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে আর্য্যভট্ট,ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় গণ ইহার কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এখানে তাহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। ভারতীয়দের জ্যোতিষতত্ব সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহ সম্বন্ধযুক্ত। কি প্রাচীনকালে, কি বর্ত্তমানকালে, ধর্ম্মবিষয়ক ক্রিয়াকলাপ এতৎ সাহায্যে নিরূপিত দিন ক্ষণের উপর এরূপ নির্ভর করে, যে একের অভাবে অপরটি হইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র, এতদুভয়ের উৎপাদনমূল কিয়দংশে পৃথক্ হইলেও, প্রাকৃতিক শক্তি-বিমোহিত প্রাচীন ভারতে উহারা অনিতিবিলম্বেই এরূপ সংমিলিত হইয়াছিল, যেন একই বস্তুর উহারা দুই বিভিন্ন অংশদ্বয় রূপে প্রতীয়মান হয়। ভারতে যখনই জ্যোতিষ বিষয়ক কোন নূতন তত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, তখনই আর্য্য ঠাকুরেরা ইহাকে বিজ্ঞানবিষয়িণী জ্ঞানোন্নতি বলিয়া না ধরিয়া, দেবপ্রসাদে যেন ধর্ম্মবিষয়ক নূতন জ্ঞান লাভ হইল বলিয়া ধরিয়াছেন। এবং কেবল এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়াই ভারতে যতদিন উন্নতির কাল ছিল, পর পর আরও নূতন তত্ব উদ্ভাবনে রত হইয়াছিলেন, ইহাদের উদ্ভাবিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রথমে আরবদিগের কর্ত্তৃক দেশান্তরিত হয়, পরে কালসহকারে ইউরোপ প্রভৃতি দেশে নীত হইয়াছে, অন্ততঃ লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।

পরবর্ত্তী সময়ে যদিও সাহিত্য বিষয়ে ভারতীয়েরা অপরিমিত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের সৃষ্ট বহুবিষয়, কালে যদিও অনেকের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল; তথাপি অতি প্রাচীন কালীয় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যঠাকুরদিগের সাহিত্য, কল্পনাবহুল প্রায় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থেই সমাহিত হইয়াছে। কেবল একমাত্র, এবং জগতের একখানি সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য, মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু তথাপি ঐ রামায়ণে ধর্ম্ম এবং দেব বিষয়ক প্রসঙ্গের আধিক্য এত অধিক পরিমাণে আছে, যে কেবল আমরাই উহার ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বাতন্ত্র্যভাব নির্ব্বাচন করিলাম; কিন্তু প্রগাঢ় গোঁড়ামি-সম্পন্ন হিন্দুধর্ম্মাশ্রয়ী কোন ব্যক্তি কখনই তাহা করিবে না। উহা তাহাদের মনে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া এতদূর প্রতীত যে, কাব্য বলিয়া নহে, কেবল পবিত্র ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই উহাকে পাঠ ও সমাদর করিয়া থাকে। এবং বিশ্বাস এই যে উহা পাঠ করিলে, পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া পুণ্যলোকে অবস্থান লাভ হয়। যাহা হউক আমরা রামায়ণকে কাব্য বলিয়াই ধরিলাম। বলা বাহুল্য যে এই রামায়ণ একখানি জগতের অতি অতুলনীয় কাব্য, মহৎ এবং সর্ব্বত্র রস-মাধুর্য্য ও রমণীয়তা ভাবে পরিপূর্ণ। এই কাব্যগ্রন্থ আমাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি হইতে এতই উচ্চে অবস্থান করে, যে তৎসম্বন্ধে ভাল কি মন্দ যাহাই বলিতে চাই,যেন তাহাতে কেমন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হয় এবং আপনা-

পনি ধৃষ্টতা বোধে কুণ্ঠিত হই। ফলতঃ এই গ্রন্থ কাব্য-বিষয়ে চরমোৎকর্ষ। বাহ্য ও অন্তঃ পদার্থ মাত্রের মাধুর্য্য-সন্দর্শনে হৃদয় উদ্বেলিত ও চিত্ত বিকম্পিত হইয়া, সেই মাধুর্য্য যখন বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহা কাব্য *। মাধুর্য্য অর্থে যে কেবল বাসন্ত দক্ষিণানিলের স্নিগ্ধ-স্পর্শ বা তথাবিধ বস্তু, তাহা নহে; তমসাচ্ছন্ন নিশি, নিবিড় ঘনঘটা, বিদ্যুৎ,বজ্রাগ্নি বা কোন বিভৎস বস্তু, সকলেতেই এই মাধুর্য্য বিদ্যমান আছে। একথা শুনিয়া প্রাচীন আলঙ্কারিক পণ্ডিত হয় ত বলিবেন যে মধু হইতে যখন মাধুর্য্য, তখন বিভৎস হিংসা প্রভৃতি ব্যাপারে, ভীষণদৃশ্য বা ঘটনাবলীর মধ্যে মাধুর্য্যের সম্ভবতা কোথায়! কিন্তু পাঠক! জানিবে যে চিত্ত যখন যে রসের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা যাহা পূরণ করিয়া তৎস্থানে তদনুগামী অবশ্যম্ভাবী তৃপ্তির উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাকেই সেই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের মাধুর্য্য বলা যায়। যদি ইংরেজি নাটককারের য়িয়াগোর খলচরিত্র-পাঠে,পাঠক,তোমার মনে কখন খল-চরিত্র-অনুভব-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হওয়ায় তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় যে সে দুরন্ত খলচরিত্রও মাধুর্য্যশূন্য নহে; বরং তথায় খলচরিত্রের পূর্ণপ্রতিভাসে, মাধুর্য্যগুণ সাধারণ পরিমাণের অতীত। চিত্তের বস্তুবোধ যখন বস্তুসংযোগে প্রতিভাসিত হইয়া আত্মরূপ প্রকাশ করে, তখনই মাধুর্য্যের সঞ্চার হয়; অথবা সেই প্রতিভাসক্রিয়াই মাধুর্য্য; এবং এই প্রতিভাস যত পরিস্ফুট ও পূর্ণভাবে হইতে থাকে, বলা বাহুল্য যে, তথায় মাধুর্য্য সেই পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন ও পূর্ণ। অতএব চিন্তা এবং কল্পনা-সাপেক্ষ বস্তুবোধ, যেরূপ সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম দর্শনোপরি স্থাপিত হইয়া বস্তু সংযোজিত হয়, এবং চিত্ত যে ভাবে আপ্লুত হইয়া সেই দর্শনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; তদুৎপন্ন কাব্যও সেই পরিমাণে বৈচিত্র ও মাধুর্য্যপ্রচুর অথবা তাঁহার স্বল্পতাযুক্ত, এবং সেই সেই ভাবে পরিপূরিত হইয়া, অনুরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। চিন্তা এবং কল্পনাদক্ষ ও ধর্ম্মভাবপরিপূরিত ভারতভূমিতে যে রামায়ণের ন্যায় পূর্ণচিত্রযুক্ত এবং দেবধর্ম্মসম্পন্ন, বিবিধবৈচিত্রশালী ও নানারসবিশিষ্ট মহাকাব্যের উৎপত্তি হইবে ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিলে হয়। রামা-

* বলি বক্কেশ্বর মহাশয়, এবার? 'কাব্য-কবি-বাঙ্গলা কবির' কাব্য আর এখনকার এই কাব্য, একি দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তির লেখা?—ঠিক করিয়া বল, নতুবা এবার তোমার টিকি রাখা দায় হইবে! মনে ভাবিও না যে সংশোধন করিয়া এখনকার কথার সহিত এক মিল করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু ফুস্! হরিবোল্। মনে পড়িয়াছে, একদিন কথায় কথায় প্রবন্ধ লেখক বলিয়াছিলেন যে, 'কাব্য—কবির মধ্যে কাব্যের আভ্যন্তরিক দৃশ্য ও ছবি, আর এখানে যে ছবি তাহা বাহ্যিক দৃশ্যের এবং তাহাও অংশতঃ'। ইতি।—বাঞ্ছারাম। ১২৮৭।—ভাল জলধর দাদা, আমি ভালই লিখিয়া থাকি আর মন্দই লিখিয়া থাকি কিন্তু এবেটা ব্যল্লিকের এত মাথা ব্যথা কেন? জ্বালায় যে অস্থির! ইতি।—প্রবন্ধ লেখক।

য়ণের সহ পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে আর এক বিরাটভাব-বিশিষ্ট মহাকাব্য গণনায় গণিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহা মহাভারত। ইহার বিষয় এখানে আর অবতারণা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ইহাও যে কিরূপ স্বভাবের কাব্য, তাহা হিন্দুসন্তান মাত্রেই ক্ষণেক চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন। যে প্রাচীনকালে রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখনকার অপর কোন শ্রেণীর কাব্য বা নাটক বা অপর কোন সাহিত্য পুস্তক কালের সঙ্গে এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তবে প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে ঐ সকলের ক্ষণিক উল্লেখ সকল দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাহাদেরও তখন নিতান্ত অপ্রচার ছিল না। সে যাহা হউক আমাদের হাতে যাহা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা সে প্রাচীন কালের তুলনায় অতিঅল্প দিনের। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ভারতীয় কাব্য নাটক সাহিত্য প্রাচীনই হউক, আর আধুনিকই হউক, তাহারাসকলেই প্রায় পুরাণাদি যে কোন ধর্ম্মপুস্তকের কোন না কোন ঘটনা লইয়া নির্ম্মিত। যেখানে ইচ্ছানুরূপ পৌরাণিক ঘটনা পুরাণাদিতে না মিলিয়াছে, লেখক সেখানে অভাবপক্ষে পৌরাণিক ঘটনাবলীর অনুরূপ ঘটনা কল্পনা করিয়া লইয়া আপনার অভাব পূরণ করিয়াছে।

এক্ষণে একবার গ্রীকদিগের সাহিত্য-সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে দিব্য একখানি বড়বাজারের মণিহারীর দোকান সাজান রহিয়াছে; ইহাতে না আছে এমন বস্তু নাই, অথচ সম্মুখে সব মজুত, এবং সকলই সম্মুখে থরে থরে সাজান আছে; সকলেই দেখিতে চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে, দৃশ্য প্রলোভনে বাহিরের খরিদদার ভিতরে টানিয়া আনে, অথচ সকলেরই দাম কম। আর ভারতীয় সাহিত্য সংসার?—উহা আমাদের দেশীয় অলঙ্কারব্যবসায়ী স্বর্ণকারের দোকান, নতুবা ঐ দেখ বাঁকমল, পঁইচে, বাউটি, হাঁসুলি, এসব উহার দোকানে ঐ সাজান রহিয়াছে কেন? মোটা-মোটা, গোর্দা-গোর্দা, মণিহারীর দোকানের শতাংশের এক অংশও ত নয়নরঞ্জক নহে! খরিদদার আপাততঃ দেখিলেই উপহাসে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু ভ্রাতঃ আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তোমার আমার উহা নয়নরঞ্জন না করুক, তোমার আমার উহাতে দরকার থাকুক বা নাই থাকুক; যে সোণার মর্ম্ম বুঝে সে ঐ দোকান ভিন্ন সোণার তল্লাসে অন্য দোকানে যাইবে না। ঐ গহনাগুলি নমুনামাত্র, উহা দেখিয়া যদি কেহ দোকান চিনিয়া লয়, তাহার পর খরিদদার বুঝিয়া তেমন তেমন গহনা সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া দেখান যাইবে। ভারত-সাহিত্যের ভাব এই যে চিন্তনীয়কে অবলম্বন মাত্র করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত আবশ্যক বোধে, একেবারে অচিন্তনীয়কে লইয়া উপস্থিত করে; আর গ্রীকসাহিত্যের ভাব এই যে, যে চিন্তনীয় অপরের দ্বারা অনাবশ্যকবোধে বিনা দর্শনে পরিত্যক্ত হয়; ইহা সেই চিন্তনীয়কে সর্ব্বতোভাবে দর্শনযোগ্য ও বৈচিত্রময়ী, তাহা দেখাইয়া তৎপ্রতি তোমার মোহ উৎপাদন

ও তাহাতে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ভারতে রামায়ণ যে শ্রেণীর মহাকাব্য, গ্রীকভূমে হোমারের ইলিয়দও সেই শ্রেণীর মহাকাব্য। উভয়েরই মূল ঘটনা প্রায় এক, এবং উভয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া। উভয়েরই ভাব ও রসবৈচিত্র অপরিসীম। উভয়ই নবরসাধার, উভয়েতেই ঐশ্বর্য্য বিস্তার। এখন এ দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখ চিত্তে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। রামায়ণপাঠে ক্রমান্বয়ে বাসন্ত-সাংসারিক-সুখ-মাধুরীতে মোহিত হইলাম; পরে স্নেহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া হৃদয়শূন্য করিলাম; ক্রমে মুখে হাহাকার করিতে করিতে দারুণ দুঃখ-তরঙ্গে ডুবিলাম;—কিন্তু সহসা এ কি শব্দ, এ রণশঙ্খ কোথায় বাজিতেছে! হৃদয় শব্দে শব্দে মাতিয়া উঠিল; চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল, হুঙ্কারধ্বনিতে দিক নিনাদিত! মার—মার, ধর—ধর রব!—একি প্রলয় কাল উপস্থিত, না শিব সংহার-শূল ধারণ করিয়াছেন? আবার ঐ দেখিতে দেখিতে সেই সকল ছায়াবাজিপ্রায় কোথায় লুকাইল। উহা লুকাইতেছে, কিন্তু যেমন লুকাইতেছে, উহার পার্শ্বে আবার ঐ স্নিগ্ধ পূর্ণচন্দ্রবৎ কি উদয় হইতেছে?—আহা কি চিত্র, কি মধুর সুখ চিত্র, কি মধুর সংসার-সুখ চিত্র! কিন্তু হায়! উহার মাধুরীতে হৃদয় আপ্লুত হইতে না হইতেই কাল মেঘ আসিয়া আবার সকল আবরিত করিয়া ফেলিল, স্বপ্নবৎ সকলে কোথায় লুকাইল, একি দারুণ তমোরাশি!—দিক শূন্য হইল, হৃদয় শূন্য হইল,—কোথায় শান্তি! কোথায় শান্তি! এ কর্ম্ম ক্ষেত্রের কর্ম্ম ত দেখিতেছি ফুরাইয়া গেল, তবে আর আমার এ শান্তি কোথায় মিলিবে, কোথায় এ শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইবে।—পাঠক! বলিতে পার কোথায় হইবে? তাই বলিতেছিলাম যে রামায়ণ পড়িয়া নানা রসে নানা ভাব তরঙ্গে দুলিলাম বটে, কিন্তু শেষে এমন অশান্তি জন্মাইয়া দিয়া গেল, যে শান্তির আশায় টুকনি হাতে বনে যাইতে হয়।

এক্ষণে হোমারের ইলিয়দ-সংসারে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ। দ্বারদেশে সরক্ত খর্পরমুণ্ড ঝুলিতেছে; ভয় পাইও না, প্রবেশ কর। কিন্তু এ কি! সম্মুখেই এ কি, এ দারুণ প্রলয় অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া, লক্ লক্ জিহ্বায় যেন বিশ্ব গ্রাস করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গে ছুটিয়া, ছুটিয়া উঠিতেছে। দেখিতেছ না উহা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড;—গ্রীসবাসিগণের দুরন্ত ক্রোধাগ্নি কালানলরূপে, গম্ গম্ শব্দে, তাপে উত্তাপে যাহা স্পর্শ করিতেছে তাহাই দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। পাঠক! ইহা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ। জন্মেজয়ের যজ্ঞে ইন্দ্র-সিংহাসনের আশ্রয়ে নাগরাজ তক্ষক পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু এ দারুণ যজ্ঞে সে পরিত্রাণের আশাও নাই। বীরবর্গের নিশ্বাস-বায়ুতে সমর-ইন্ধনে এ দারুণ অগ্নি নিরন্তর দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। হাস্য, বিভৎস, অদ্ভুত, শান্তি, যে কোন রস সে অগ্নি সাম্য করিতে ঢালিয়া দিতেছে; তাহাতে সাম্য হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষণেক ম্লান হইতেছে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই রৌদ্র হইতে রৌদ্রতর ভাবে, গম্ গম্ শব্দে, লক্ লক্ শিখায়, আকাশ গ্রাস করিতে ছুটিয়া উঠি-

তেছে। একা রুদ্রমূর্ত্তি সংহার-শূল হস্তে দণ্ডায়মান; যে কোন মূর্ত্তি নিকটে আসিতেছে, তাহাই সেই রুদ্রতেজে মিলিয়া গিয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। ইলিয়দের রস মাধুর্য্য সর্ব্বত্র পূর্ণাবয়ব। কিন্তু এ প্রবল রৌদ্ররসের মধ্যে তাহাদের সমাবেশ, ঠিক যেন কুসুম-কোমলা কামিনীগণকে দুরন্ত শার্দ্দূলগুহায় নিক্ষেপের ন্যায়। রাবণকে সংহারার্থে মৃত্যু শর সঞ্চালন কালীন, সেই শরকে অব্যর্থ করিবার জন্য, তাহার পর্ব্বে পর্ব্বে দেবতাবর্গের অধিষ্ঠান সাধন করা হইয়াছিল; ইলিয়দে দেববর্গ ও দেবশক্তির অবতারণাও তদ্রূপ। যে কল্পনাশক্তি রামায়ণে নিরন্তর লৌকিককে অলৌকিকত্বে পরিণত করিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে; সেই কল্পনাশক্তিই ইলিয়দে সর্ব্বদা অলৌকিককে লৌকিকত্বে আনিবার চেষ্টা পাইয়াছে। যদিও শেষোক্তের সে চেষ্টার কোথাও ত্রুটি দেখা যায়, তাহা কল্পনা বা কবির দোষ নহে; লৌকিকের ন্যায় অলৌকিক সর্ব্বদাই আয়ত্ত সাধ্য নহে, সেই জন্যই রামায়ণে লোকের রুচি অরুচির প্রতি বড় একটা বিশেষ খাতির নাই; কবির বাঞ্ছার সহিত সংমিলিত হইয়া কল্পনা যতদূর ইচ্ছা ছুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইলয়দে তাহা নহে, সকলেই সম্ভবের মধ্যে, সকলেই সীমার ভিতর, এবং সর্ব্বত্রই লোক-রুচির সহ সামঞ্জস্য পক্ষে যাহাতে ব্যতিক্রম না হয় তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পদে পদে। রামায়ণে নিহিত রত্নরাশি অমূল্য; কিন্তু গায় অনেক মলা জন্মিয়াছে; পাণ্ডিত্য অদ্ভুত কিন্তু বিশ্ব আয়ত্ত করিতে হস্ত প্রসারিত, সুতরাং গাঁজাখুরীও অনেক। ইলিয়দের রত্নরাশিও বহুমূল্য; যদিও অমূল্য নহে বটে, কিন্তু এমন চাক্‌চিক্যশালী যে তাহার কাছে অমূল্য রত্নও দাঁড়াইতে লজ্জা বোধ করে, পাণ্ডিত্যও অদ্ভুত। কিন্তু সীমান্তর্বর্ত্তী ও প্রকৃতিসহ, সুতরাং গাঁজাখুরীও কম। পাঠক! এখন বলিতে পার রামায়ণ বড় কি ইলিয়দ বড়?—কেহই বড় নহে, কেহই ছোট নহে। আপন আপন ঘরে উঁহারা আপনি আপনার রাজা। যে যখন যাহার ঘরে প্রজাভাবে যাইবে, সেই তখন তাহাকে বড়ভাবে দেখিতে পাইবে।

কিন্তু সে যাহা হউক, পাঠক মহাশয়! আমরা যাহা দেখিতে এখানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা ফেলিয়া অন্য কথায় সময়ই কাটাইতেছি। দেখ পুনর্ব্বার অগ্নিকুণ্ডে কি দহিতেছে। ইলিয়দের বিংশসর্গ বাহির কর। বহুতর রসপ্রক্ষেপ আহুতিস্বরূপে পরিণত হওয়ায়, অগ্নিকুণ্ড কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। কেবল মানবীয় যুদ্ধে আর রণতৃষা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। এক্ষণে যুদ্ধার্থে দেবদল বিভাগে বিভক্ত হইয়া মানবসংযোগে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার লক্ষবলি। আহুতিপাতরূপে মহাসর্পসকল ধড়ফড় করিয়া আসিয়া পড়িতেছে। লক্ লক্ জিহ্বায়, ধক্ ধক্ করিয়া, সধূম অগ্নিশিখা, উন্মত্ত অট্টহাস্যের ন্যায় আলোকান্ধকারে গগণব্যাপ্ত করিয়া, যুগান্ত-মূর্ত্তির ন্যায় সমুপস্থিত। আকাশে কাল মেঘ, বিদ্যুৎ বজ্রপাতে দিগবলয় কম্পিত হইতে লাগিল। ভার ভরে পৃথিবী টল্ মল্ করিয়া দুলিতেছে। সূর্য্য শশী কাল তি-

মিরে আচ্ছাদিত থাকিয়া থাকিয়া প্রকৃতির চমকবৎ, অগ্নিশিখায় আমূলত জগৎ ক্ষণিক আলোকিত হইতে লাগিল। কি অদ্ভুত,কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এবার নাগরাজ তক্ষকের পতন,—ত্রয় ভরসা হেক্তরের পতন হইবে। হেক্তর পড়িল। অভাবনীয় আহুতিলাভে, অভাবনীয় বলপ্রাপ্তে,অগ্নিশিখা জগৎ গ্রাস করিতে ধাবমান হইল। আকাশে দেবতা, পৃথিবীতে মানুষ, সকলেই সশঙ্কিত। কবি তখন স্বষ্টিনাশের আশঙ্কায়—আত্মনাশের আশঙ্কায়-অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য অন্দ্রমেকি,প্রিয়াম ও তৎপরিজনবর্গের করুণা-রস ঢালিতে লাগিলেন। অপরিমিতভাবে ঢালিতে লাগিলেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু একেবারে নির্ব্বাপিত হইল না উপরে শীতল হইল, কিন্তু ভিতরে এখনও অগ্নি গম্ গম্ করিয়া আস্ফালন করিতেছে। একটু বাতাস পাইলেই ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এখনও সেই চিতার মধ্য হইতে মার মার শব্দে হেক্তর ও পারক্লুসের আত্মা চীৎকার করিয়া আপনাপন পক্ষকে প্রতিশোধ লইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। এখনও চীৎকার করিয়া সাবধান করিতেছে, দেখিও যেন গ্রীকসুন্দরী হেলেনা ও স্পার্টার রত্নরাশি হস্তান্তর হইতে না পায়। সুতরাং এ অগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই, আবার জ্বলিয়া উঠিবার সময় প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র। ইলিয়দও কিয়ৎকাল ধর্ম্মপুস্তক ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু রামায়ণের তুলনায় তাহা দুই দিনের জন্য বলিলে হয়।

হোমরের পর আর্কিলোকুস হইতে পরবর্ত্তী সময়ের যাবতীয় কবি ও নাটককারগণের আর কেহই প্রায় ধর্ম্মশাস্ত্র বা মনস্তত্ত্ব-বহুল বিষয় লইয়া গ্রন্থ রচনা করেন নাই। যদিও বা কেহ কোথায় দেবতাদিগের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা প্রায় দেবতাদিগকে উপহাস করিবার উদ্দেশ্যেতেই অধিক। এবং এই উপহাসের চূড়ান্ত আরিষ্টফানিসের গ্রন্থে সাধিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই সকল গ্রন্থকারের রচনা অধিকাংশই সামাজিক ও রাজনীতির,বা ব্যক্তিবিশেষের দোষ-অংশ হউক বা গুণ-অংশ হউক,ইহা লইয়া রচিত। যথায়ই দোষাংশ বাহুল্যের অস্তিত্ব, তাহা রাজদ্বারেই হউক, বা আপন ঘরেই হউক, কাহারও কবির কটাক্ষ হইতে নিস্তার পাইবার যো নাই। আর্কিলোকুসের প্রধান গ্রন্থ তাহার শ্বশুর লিকাম্বিসের বিপক্ষে। ঐ গ্রন্থ কটাক্ষ এবং ব্যঙ্গোক্তিতে এরূপ পরিপূর্ণ যে লিকাম্বিস তজ্জন্য ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছিল। রাজপুরুষ হইলেও যে কবির বাক্যবাণ হইতে নিস্তার নাই, তজ্জন্য কেবল আরিষ্টফানিস কৃত লিশিস্ত্রাতা নামক নাটকের নামমাত্র উল্লেখ করিলাম। এই আরিষ্টফানিসের বাক্যবাণ হইতে মানবগুরু সক্রেতিসেরও নিস্তার ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যসংসার বিলোড়ন করিলে এতদ্রূপ শ্রেণীর কোন রূপ গ্রন্থ পাওয়া যায় কি না বলিতে পারি না। আধুনিক সংস্কৃতে থাকিলে থাকিতে পারে।

ইতি তৃতীয় প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্বম্ভর পাণি

অনেকেই মহাত্মা বিশ্বম্ভর পাণির নাম শ্রবণ করেন নাই। যদি এদেশে পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার তাদৃশ আদর থাকিত, তাহা হইলে এই উজ্জ্বল রত্নটি কি আজিও খণিগর্ভে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিত? বাস্তবিক, এক সংস্কৃত ভাষার অনাদর হেতু ভারতবর্ষের এবং এই বঙ্গদেশের কত কত গুণী ব্যক্তিও অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ হইবার দুইটি কারণ দেখা যায়।—প্রথম কারণ ইংরেজি ভাষার প্রভাব এবং দ্বিতীয় কারণ দেশীয়দিগের সেই অর্থকরী ইংরাজি ভাসার প্রতি সর্ব্বতোভাবে আসক্তি-প্রকাশ। এক সামান্য অর্থের লোভে মহার্থ সংস্কৃত ভাষা আজ কি না নিরর্থক হইয়া গেল! হায়,ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি? এই জন্যই কবি বিশ্বম্ভর পাণি সাধারণের অপরিচিত।

"বিশ্বম্ভর পাণি, জিলা হুগলীর অন্তঃপাতী সেনহাট গ্রামে ১৭০৭ শাকে কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে,তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও অঙ্কবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন; তদ্ভিন্ন পারস্য ও ইংরাজি ভাষাও কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনুমান ২৭। ২৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি জগন্নাথ দেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। তথায় সমুদয় অবলোকন করিয়া, জগন্নাথদেবের লীলাবর্ণন করিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মে। তৎকালে তিনি সংস্কৃত ভাষার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না; কিন্তু জগন্নাথদেবের লীলা সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত, সুতরাং সংস্কৃতপাঠ ব্যতিরেকে অভিলষিত লীলাবর্ণন সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য পুরুষোত্তমধাম হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, সবিশেষ যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে, সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অল্পদিনেই সংস্কৃত ভাষায় একপ্রকার ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, বিশ্বম্ভর বাবু,জগন্নাথ দেবের লীলাসংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইবার অভিলাষে, উৎকলখণ্ড অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দিন পরে (১৭৩৭ শকে) ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় পয়ার প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে অনুবাদ পূর্ব্বক, জগন্নাথ-মঙ্গল নামে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত ও সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করেন। অনন্তর তিনি জগন্নাথমঙ্গল গান করাইবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া, কালাবতী পদ্ধতিক্রমে খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া, বহুসংখ্যক পদাবলী সঙ্কলন করিলেন এবং উপযুক্ত বেতনদান পূর্ব্বক কতিপয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া, সঙ্গীতশিক্ষা করাইতে লাগিলেন। জগন্নাথমঙ্গলসঙ্গীত সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ

আছে। এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠাব্যাপারে ও সঙ্গীতকার্য্য সমাধানে বিশ্বম্ভর বাবু অন্যূন চল্লিশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

" অতঃপর তাঁহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা রচনায় অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগ জন্মে। ক্রমে ক্রমে তিনি বৃন্দাবনপ্রত্যুপায়, প্রেমসম্পুট, ভক্তরত্নমালা ও কন্দর্পকৌমুদী নামে গ্রন্থ রচনা করেন। বৃন্দাবনপ্রত্যুপায় পদ্মপুরাণের অন্তর্গত পাতালখণ্ডের অনুবাদ, প্রেমসম্পুট বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপ্রণীত পুস্তকের অনুবাদ,ভক্তরত্নমালা নানা গ্রন্থ হইতে ভক্তগণের চরিত্র আহরণ পূর্ব্বক সঙ্কলিত, কন্দর্পকৌমুদী আদিরসময় কাব্য। এই সকল গ্রন্থ ভাষায় সঙ্কলিত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত রচনাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। বোধ হয়, বিশ্বম্ভর বাবু সর্ব্বশেষে সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

" বিশ্বম্ভর বাবু অত্যন্ত পরিশ্রমশীল মনুষ্য ছিলেন। কেহ কখন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে আলস্যে কালহরণ করিতে দেখেন নাই। তিনি বিলক্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তির রক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত, বিষয় কার্য্যে বহু সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত। বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যে অবকাশ পাইতেন তাহাতেই সংস্কৃত অধ্যয়ন ও পুস্তক সঙ্কলন করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও অতিশয় সৎস্বভাবশীল ছিলেন। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরতা গুণও বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার ভূম্যধিকারে (জমিদারীতে) প্রজারা পরম সুখে কালযাপন করিত। তাহাদিগকে কখন ভূম্যধিকারীর অবিচার বা অত্যাচার নিবন্ধন কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। যাহাতে প্রজারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, তিনি তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন।

"এই সমস্ত অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইতে পারে, বিশ্বম্ভর বাবু সাধারণ লোক ছিলেন না। এদেশে বিষয়কর্ম্ম, বিদ্যাভ্যাস ও গ্রন্থরচনা এ তিনের সমবায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বম্ভর বাবু এই তিনে আসক্ত থাকিয়া জীবন ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রীতিচরিত্র সর্ব্বাংশে দোষস্পর্শশূন্য ছিল। যাঁহারা বিশ্বম্ভর বাবুকে জানেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ এদেশে ঈদৃশ ব্যক্তি সচরাচর নয়নগোচর হয় না।

" বিশ্বম্ভর বাবু, ১৭৭৬ শাকের আষাঢ় মাসের সপ্তবিংশ দিবসে কলিকাতা নগরে দেহযাত্রা সংবরণ করিয়াছেন।

" ইদানীং এতদ্দেশে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন নিতান্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায়, বিশ্বম্ভর বাবু শূদ্রজাতীয় হইয়া সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"সঙ্গীতমাধব সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত। বিশ্বম্ভর পাণি, জয়দেবপ্রণীত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক, এই পুস্তকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার জীবদ্দশায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া উঠে নাই। ১৭৮২ শাকে তদীয় মধ্যম তনয় শ্রীযুত বাবু যশোদাকুমার পাণির যত্নে ও ব্যয়ে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।"

আমরা সময়ান্তরে কবি বিশ্বম্ভরের জগন্নাথমঙ্গলের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু অদ্য তদীয় সঙ্গীতমাধবের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্গীতমাধব আটভাগে বিভক্ত। নিম্নে সেই আট ভাগের তালিকা প্রদত্ত হইল।—

প্রথম বিভাগে দৈনন্দিনলীলাবর্ণনে রাত্র্যন্ত লীলাকথন।

দ্বিতীয়	”	প্রাতর্লীলাকথন।
তৃতীয়	”	পূর্ব্বাহ্নলীলাকথন।
চতুর্থ	”	মধ্যাহ্নলীলাকথন।
পঞ্চম	”	অপরাহ্নলীলাকথন।
ষষ্ঠ	”	সায়াহ্নলীলাকথন।
সপ্তম	”	প্রথমরাত্রিলীলাকথন
	”	মহানিশালীলাকথন।

কবিবর জয়দেব যে প্রণালীতে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণন করিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন, সঙ্গীতমাধবেও তাহাই দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতমাধবের কবি যে, জয়দেবের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি প্রথম বিভাগের একস্থলে জয়দেবের স্মরণ করিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

“ব্রজপতিসুতলীলা যা হি রম্যাতিরম্যা
প্রতিপদললিতা যা যাষ্টকালৈর্ব্বিভক্তা।
প্রথয়িতুমধুনা তাং গীতবন্ধৈশ্চ পদ্যৈঃ
কবিনৃপজয়দেবাদানহং সংস্মরামি॥”

গীতগোবিন্দে যেরূপ কিয়দংশ শ্লোক ও কিয়দংশ গীত পর্য্যায়ক্রমে নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।

আমরা প্রথমে এতন্নিবিষ্ট শ্লোকগুলির বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া, পরে গীতের বিষয় বলিব।

এই গ্রন্থের মধ্যে অনুষ্টুপ্, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরা, বসন্ততিলক, উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিলা, মণিমালা, তূণক, তোটক, মালিনী, ছায়া, শোভা, শিখরিণী, চিত্রলেখা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, পজ্ঝটিকা প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দে শ্লোকসমূহ গ্রথিত হইয়াছে। সেই শ্লোকে শব্দবিন্যাস, ভাব ও মাধুর্য্য একত্র সমাবেশিত হইয়াছে; কিন্তু উচ্চদরের কবিত্ব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক ন্যূন।

সঙ্গীতমাধবের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোনিবদ্ধ যে কএক প্রকার শ্লোক আছে, নিম্নে তাহাদের মধ্য হইতে কএক প্রকারের উদাহরণ উদ্ধার করিয়া দিলাম। ইহাতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, বিশ্বম্ভর বাবু সংস্কৃতছন্দশাস্ত্রে কিরূপ পারদর্শী ছিলেন।

“শ্রীগুরুং করুণাসিন্ধুং সর্ব্বশক্তিপ্রদং বিভুম্।
তত্ত্বাতীতং সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপং প্রণমাম্যহম্॥” ১

—“জয়তি নিভৃতকুঞ্জে রাধয়া মাধবস্য
শ্রুতিপরমরলীলা শ্রীযশোদাসুতস্য।
ঘনরসময়মূর্ত্তের্ভক্তবাঞ্ছাপ্রদস্য
সততমবতুবো নো বল্লবীবল্লভস্য॥” ২

—“শ্রীবৃন্দাবিপিনং পরাৎপরপদং গুহ্যাতিগুহ্যং মহৎ
প্রেমানন্দরসাপ্লুতং সুখময়ং সম্মোদদং শাশ্বতম্।
সন্তানক্রলতাবলীসুকুসুমৈঃ সৌরভযুক্তং পরং
বায়ূদ্ধূতপতঙ্গজাজলকণৈঃ সিক্তাতিশীতং ভজে॥” ৩

"রাত্র স্তেকী রশারীমধুপকলরবৈর্ব্বো-
ধিতৌ তৌ সখাভী
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবলসিতবপুষৌ প্রেম-
মাধুর্য্যপুরৌ।
দৃষ্ট্বান্যোন্যাঙ্গচিহ্নং রতিরণজনিতং জা-
তহাসৌ যুবানৌ
তদ্ভাবাবিষ্টচিত্তৌ সমুদিতপুলকৌ ত-
ল্পগৌ সংস্মরাম ॥" ৪

"অথালিবর্গা বৃষভানুপুত্র্যাঃ
সংশোধ্য গেহাদিকমম্বুজাক্ষাঃ।
বেশোপযুক্তা চ যানি তানি
তদ্দেশগেহে স্ম নিবেশয়ন্তি ॥" ৫

"বৃষভানুসুতা ব্রজভূমিপতেঃ
প্রিয়নন্দনভোজনশেষমতঃ।
স্বসখীনিচয়েন সমং সুমুখী
পরিভুজ্য পরং সুখমাপ বহু ॥" ৬

"স্বকং প্রিয়াকুণ্ডমুভে হরিস্তদা
বিলোক্য রাধাবিরহাকুলো ভৃশম্।
দ্বিজং পশুং বৃক্ষলতাগৃহাদিকং
রাধাময়ং সর্ব্বময়ং প্রপশ্যতি ॥"

"প্রিয়সখি কুত্রাস্তে স সুধন্যে।
শ্রীরাধে তব কুণ্ডারণ্যে।
হে সখি তত্রাসৌ কিং কুরুতে॥
নৃত্যং শিক্ষতি মাধবদয়িতে ॥" ৮

"অতঃ স্বপত্নীভিরয়ং বিধুর্ম্মুদা
সংক্রীড়তে মৎপুরতঃ স্বয়ং যদি।
তদা সুতৃপ্তাতিভবামি নিশ্চিতং
শ্রীরাধিকেদং পরিহাতোহব্রবীৎ ॥" ৯

"পিকালিশারীশুকনাদসেবিতং
প্রসূনসদ্গন্ধযুতং মনোরমম্।
পূর্ণেন্দুকান্ত্যুজ্জ্বলকাননং হরিঃ
সমীক্ষ্য রাসায় চকার মানসম্ ॥" ১০

এতদ্ব্যতীত আরও কএকপ্রকার ছন্দঃ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে কথা এই যে, গীতগোবিন্দের অন্তর্গত ছন্দঃসমূহে যতদূর গুণপণাসহকারে উচ্চদরের চমৎকারিত্ব রক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে ততদূর হয় নাই। তা না হউক, কিন্তু এ সমস্ত ছন্দের সৌন্দর্য্য অবশ্য পাঠককে পরিতুষ্ট করিতে পারে। যদিও স্থলে স্থলে দীর্ঘ দীর্ঘ সন্ধি-সমাস একত্র হইয়া কোমলতা নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু বেশীর ভাগে তাহা না হওয়াতে পাঠকের পাঠকষ্ট সমুৎপন্ন হয় না।

এই বার আমরা সঙ্গীত মাধবের গীত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব।

জয়দেবের গীত গোবিন্দের ধরণে ইহাতে অনেক গুলি গীত নিবদ্ধ হইয়াছে। উহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত পঞ্চাশটি। ভাষায় মিত্রাক্ষর ছন্দঃ লেখা যত সহজ, সংস্কৃতে তত নহে। যে সে ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায় মিত্রাক্ষর ছন্দঃ রচনা করিতে পারে না। বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথমে কবিবর জয়দেব সংস্কৃত মিত্রাক্ষর ছন্দের পথ প্রদর্শন করেন। তাহার পর আমরা আরও দুই চারি জন সংস্কৃত কবিকে অত্যল্প ভাগে ঐরূপ ছন্দঃ রচনা করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা জয়দেবের অনুকরণে রচিত হইয়াও আশামত হয় নাই। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, বিশ্বম্ভর বাবু এবিষয়ে জয়দেব ব্যতীত বঙ্গদেশীয় অপরাপর সংস্কৃত মিত্রাক্ষর ছন্দঃ লেখকের অপেক্ষা অনেকগুণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তবে যে, ইহাঁরও গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন দোষ নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সংস্কৃত মিত্রাক্ষরের ভাষা

যত কোমল অথচ ভরাট হইবে, ততই পাঠককে মোহিত করিতে পারিবে। তাহা না হইয়া শব্দ কাঠিন্য ও মিল দোষ থাকিলে, নানাবিধ প্রস্ফুটিত ও সৌরভ যুক্ত কুসুমাকীর্ণ শয্যাতলে কতকগুলি গুপ্ত কণ্টকের ন্যায় এক একবার সুখভঙ্গ করিয়া ফেলিবে। সঙ্গীত মাধবের কতকগুলি গীতের স্থানে স্থানে, সেইরূপ দোষ-কণ্টক রহিয়া গিয়াছে। যাই হউক, যদি বিশ্বম্ভর জীবিত থাকিতেন, বোধ হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এই দোষগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কবি রাধাকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা বর্ণনে রাত্র্যন্ত লীলা, প্রাতর্লীলা প্রভৃতি আট প্রকার লীলা বর্ণন করিয়াছেন। সেই লীলা বর্ণনাবলীর অন্তর্গত গীত সমূহে, সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে যথা ক্রমে ভৈরবাদি রাগরাগিণী সংযোগ করিয়াছেন। এরূপ করাতে কে না তাঁহাকে সঙ্গীত শাস্ত্রেও দক্ষ বলিবেন? তিনি যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার এই প্রস্তাবোক্ত জীবনীতেও উল্লিখিত হইয়াছে। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা বেহাগে প্রভাতবর্ণন, ললিতে মধ্যাহ্নবর্ণন, সারঙ্গে সন্ধ্যাবর্ণন এবং পুরবী বা গৌরীতে মধ্যরাত্রি বর্ণন গাহিয়া বসে। বিশ্বম্ভর বাবু তাহা করেন নাই, কেন না তিনি সঙ্গীতানভিজ্ঞ ছিলেন না।

নিম্নে সঙ্গীতমাধব হইতে কএকটি গীতের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নমুনা তুলিয়া দিলাম।

"বিকসিতকুসুমচয়ৈরমণীয়ম্
প্রেমরসাপ্লুতমতিকমনীয়ম্।
বৃন্দাবনবনমজভবসেব্যম্
পরমসুখাস্পদমনিশং নব্যম্ ॥" ১

"অতিকারুণ্যৌ নবতারুণ্যৌ ললিতাদিকপরিবারৌ।
ত্রিভুবনসারৌ লোচনতারৌ বিশ্বম্ভরহৃদ্ধারৌ।" ২

"রাগরঞ্জিতলোচনং ঘনমাধুরীময়মূর্ত্তিম্
ভাবিনীভরভাবভাবিতমাশ্রিতাশয়পূর্ত্তিম্।
রক্তলক্তক কজ্জলাঞ্চিতবক্ষসাতিসুশোভম্
হীরমৌক্তিককৌস্তুভাচিতকণ্ঠকং জনলোভম্ ॥" ৩

"কিং ত্রপসে নিজপরিজনগণতঃ কথয় সহৃদয়বাণীম্।
সুমুখি হরিপ্রিয়মনুক্লান্তবতাসি নন্থ মনোহহমিদানীম্ ॥" ৪

"লোলিতমুক্তাফলযুতসুনসং জিতশশিশকলললাটনিদেশম্ ॥
শ্রীবৎসাঙ্কিতমণিবৃতবক্ষসনতনুমনোহরবেশম্ ॥" ৫

"জয়তি জয়তি ভুবি গিরিবরধরণঃ
শতদলজলরুহরুচিজিতচরণঃ।
অঘবকশকটবিকটভয়হরণঃ
কৃপয়তু মাং চরণাশ্রিতশরণঃ ॥" ৬

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধার করিতে পারিলাম না। সঙ্গীত মাধবের কোন গীতে এক এক স্থলে ছন্দঃ-দোষও পরিলক্ষিত হয়। তা যাই হউক, সমুদয়ে ধরিতে গেলে গীতগুলি মনোহর ও সুন্দর হইয়াছে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও আমরা বিশ্বম্ভর বাবুকে কবিবর জয়দেবের সমকক্ষ বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার প্রথমশ্রেণীর একজন কৃতকার্য্য শিষ্য বলিতে কুণ্ঠিত নহি। শ্রীরাজ—

চন্দ্র।

আজি নির্ম্মুক্ত গগণে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছে। উহার এই অমল জ্যোৎস্নায়, জ্যোৎস্নাবিধৌত প্রকৃতির এই মনোহর ভবনে, বসিয়া বসিয়া আজি সুখের সঙ্গীত গাইব; এবং কখনও আশার উল্লাসে, কখনও চিন্তার গাম্ভীর্য্য ভারে, হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটন করিয়া উহার মর্ম্ম-নিহিত কথা গুলি একে একে পর্য্যালোচনা করিব। ঐ দেখ নির্বাত তড়াগবক্ষে কুমুদপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া আপনার হৃদয় আপনি কিরূপ খুলিয়া দিয়াছে; আর অদূরে ঐ বিশাল পদ্মা, স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত কান্তিতে, অভিমানভরে, কিরূপ মন্দ মন্দ চলিয়া যাইতেছে। আমার হৃদয় এই দৃঢ় পঞ্জর-রাশি উত্তোলন করিয়া স্ফীত অথবা প্রস্ফুটিত হউক কি না হউক, সুখের আবেশে, এবং ভাবের বেগবত্তায়, নদী ও পুষ্প, আজি কেহই আমার সমান নহে। পৃথিবীতে আজি আমার হৃদয়ের উপমা অথবা আশ্রয়স্থান নাই, উহার উপমা এবং আশ্রয়স্থান, ঐ সুদূর গগণের সুহাস চন্দ্রমা। মৃত্তিকার পৃথিবী মৃত্তিকার দেহপিঞ্জরকে আবদ্ধ করিয়া রাখুক, আজি আমার আত্মা উহার সমস্ত শৃঙ্খল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্বর্গের সেই উর্দ্ধ দেশে আরোহণ করিবে, এবং সেখানে ঐ নভঃপট্টবিলম্বিত চন্দ্র ও গ্রহাদির সঙ্গে সংলাপ করিয়া; তৃষ্ণার তৃপ্তি, এবং আকাঙ্খার আভোগ জন্মাইবে।

কে বলে আমি ক্ষুদ্র জীব? আমি মনুষ্যের কণ্ঠে কথা কহি, কিংবা মনুষ্যের দেহ ধারণ করি দেখিয়া কেহ বলিওনা আমি ক্ষুদ্র জীব। আমি ভূমিতে অবস্থান করি, উর্দ্ধে উঠিতে পাই কি না পাই, আমি ভূমির উপকরণে জীবন যাপন করি, স্বর্গের অমৃত আমার ভোগ্য বস্তু হউক কি না হউক; আমি ঐ পঙ্কিল পুকুরে অবগাহন করি, দেবাদিসেবিত পূত মন্দাকিনী দেখিয়া থাকি কি না থাকি, কিছুতেই আমি ক্ষুদ্র নহি। আমার আজিকার প্রশ্ন এই "চন্দ্র তুমি বড়, না আমি বড়"।

তুমি লক্ষ্যাধিক ক্রোশ উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর একার্দ্ধ নিরীক্ষণ করিতেছ, আর আমি এই বর্গ হস্ত-পরিমিত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখস্থ বস্তুও সুচারুরূপে দৃষ্টি করিতে পাই না। তোমার জ্যোৎস্নারাশি তোমার শ্বেতাঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া, আজি এই পৌর্ণমাসীর রাত্রিতে প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। তোমার ঐ রশ্মিনিচয় বনদেবীর মুকুলিত কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত করিয়া দিতেছে, চকোরের তৃষাতুর কণ্ঠে অমৃতধারা ঢালিতেছে, এবং স্রোতস্বিনীর শ্যামল অঙ্গে রজতস্রোত মিশাইয়া দিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রদ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আর আমি কীটের ন্যায় সংসারের এই ভীষণ সাগরে নিঃসহায় সন্তরণ করিতেছি এবং ওতপ্রোত

হইতেছি ;—আমি তারস্বরে চীৎকার করিলেও,তাহা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে না ; এবং ক্রোধের ভীষণ গর্জ্জনেও কাহারও চৈতন্য উদ্বোধিত, অথবা সম্মুখস্থ বালুবিন্দু বই অন্যত্র বিকম্পিত হয় না। সুতরাং দৃষ্টব্যে তুমি আমা হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তুমি আমার কি দেখিতে পাও ? তুমি আমার যে চক্ষু দেখ,সে চক্ষু তোমাকে দেখে না ; তুমি আমার যে অঙ্গে তোমার শীতল জ্যোৎস্নারাশি ঢালিয়া দেও, সে অঙ্গ সেই শীতবারিতে সুখানুভব করে না। আমি এ দেহের গৌরব করি না ;—যে দেহ কদোষ্ণ বারিতে দ্রবীভূত হয়, এবং সামান্য শীত সন্নিপাতেই ঘমিয়া যায়, যে দেহ বৃক্ষপত্রের মত নিয়ত প্রকম্পিত রহে এবং আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় ফুৎকারেই নিভিয়া যায়; বায়ুর প্রতি পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে যে দেহের বিলয়-সম্ভাবনা, সে দেহের আর গৌরব কি ? কিন্তু রাজার পর্ণকুটীর দেখিয়া তুমি অহঙ্কার করিও না যে, রাজশক্তি তোমার নিকট হীনপ্রভ। আমার দেহ এইরূপ পর্ণকুটীর,—স্বতঃনিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল ; কিন্তু আমার শক্তি উহার অভ্যন্তরস্থিত মনোবল। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তার কারণ,উহারা কর্ত্তা নহে;—কর্ত্তা মনুষ্যের মন,—দেখে সে, শুনে সে, এবং তাহার দেহযন্ত্রকে চালায় সে। মন মুহূর্ত্তের তরে নিদ্রাবেশে নিস্তেজ হইলে,চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হয়, কর্ণের সচকিত দ্বারে অর্গল লাগিয়া যায়, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি অচেতন ভাবে উহার পুনরুজ্জীবন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। মনোরাজ্য এই অনন্তব্যাপি বিশ্ব ;—তুমি আর কে ? তুমি লক্ষ ক্রোশ ঊর্দ্ধে বিচরণ কর, তোমার লক্ষ গুণ দূরের নক্ষত্রও আমার মনের নিকট হস্তধৃত পুত্তলিকা ; তুমি আজ হইতে আরম্ভ করিয়া একমাসে পৃথিবীকে একবার পরিবেষ্টন করিবে, আমার মন প্রতি মুহূর্ত্তে এই অনন্ত বিশ্ব একবার পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। আমার এই মনোশক্তির নিকট তোমার সামান্যশক্তি কি ? না, জীবন্ত প্রবাহের নিকট সরোবরের শান্তোদক। মূর্খ সে, যে মনুষ্যনামকে অসম্মানের জ্ঞান করে, এবং মানব জীবনকে সমীরোত্থিত ভস্ম হইতেও লঘুমনে করিয়া শুধু প্রদর্শনের জন্য উহাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা পায়, ইতর প্রবৃত্তি তাহাকে সাহস এবং উৎসাহ দেউক,কিন্তু বুদ্ধি বলিবে যে, সে প্রবীণতা ও প্রবলতার ভার বহনে অসমর্থ হইয়া তাহার আত্মার অভ্যন্তরনিহিত শক্তিকে প্রকৃত রূপে পরিমাণ করিতে শিক্ষা করে নাই।

চন্দ্র তুমি পরাধীন; আমি লোকতঃ পরতঃ পরাধীন হইলেও স্বভাবতঃ স্বাধীন। এই বিশ্ব সংসারে তোমার এক বই দুই গতি নাই ; আমার গতি অনন্ত, অসংখ্য প্রকারের। পৃথিবীর বিলয় পর্য্যন্ত তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষা ছাড়িয়া একপদ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে পার না। আমি কখন পর্ব্বত-গহ্বরে, কখন পর্ব্বত শৃঙ্গে, কখন মরুপ্রান্তরে, কখন সাগর পৃষ্ঠে ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হই। তুমি শক্তিপরিচালিত ; পৃথিবীর দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে সংবদ্ধ, এবং সেই শৃঙ্খলাকর্ষণেই নিয়ত বিঘূর্ণিত। আমিও যে শক্তি

পরিচালিত, একথা অস্বীকার করিতে পারি না। এই নিরবলম্ব জীবনতীর্থে একটুকু আশ্রয়স্থান যোগাইবার জন্য সাধ্য সহকারে সংসারে প্রবেশ করিয়া পায়ে শৃঙ্খল পড়িয়াছি। সুতরাং সংসারের নিয়মশক্তিই আমার পরিচালক। আমি ঐ শৃঙ্খল দ্বারা সমাজে আবদ্ধ রহিয়াছি, এবং উহা দ্বারাই হৃষ্ট, পুষ্ট, এবং অনুপ্রাণিত হইতেছি। কিন্তু এ শৃঙ্খল কি? না প্রীতির পুষ্পমালা ও বিঘট্টিত প্রেমের উদ্বেলিত অশ্রুহার। এ শৃঙ্খলে ধাতব পদার্থের কাঠিন্য ও কলঙ্ক রেখা নাই, ইহা কোমল হইতে কোমল, মধুর হইতে মধুর, এবং পবিত্র হইতেও পবিত্র। যখন মনুষ্য, শরীরের জড়তায়, বাহ্যিক শক্তির উগ্রতায়, নিরাশার হতাভিমানে এবং ভ্রান্তিজনিত বৈরাগ্যে সংসারের দারুণ কোলাহল ছাড়িয়া অরণ্যের শান্তি উপভোগ করিতে বাসনা করে, যদি তখন অদূরে, কোথাও প্রণয় সম্ভাষণের বংশিধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে অমনি সে কুরঙ্গের ন্যায় অধীর ও উন্মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে; এবং বিগত বাসনার জন্য অনুতাপ করিয়া আগ্রহ সহকারে বলিতে থাকে, 'আমি অরণ্যের শান্তি চাই না, সংসারের শৃঙ্খলেই আমার সুখ।' যখন মনুষ্য স্নেহে স্নেহ, প্রীতিতে প্রণয়, এবং প্রণয়ে প্রণয় না পাইয়া, এবং কল্পনার যানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গের দুন্দুভিনিনাদে মোহিত হইয়া এই কুতন্ত্র সংসারকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয়, যদি তখন কোনরূপ প্রেমের অস্ফুট গীতিতে তাহার হৃদয়তন্ত্রী আহত হয়, তাহা হইলে অমনি সে স্বপ্নোত্থিতবৎ দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষুর্দ্বয় মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করে, এবং বুদ্ধি ভ্রান্তির জন্য আপনাকে তিরস্কার করিয়া করুণস্বরে বলিতে থাকে, 'আমি স্বর্গের তরল সুধা চাই না, সংসারের শৃঙ্খলেই আমার সুখ।' আর যখন মনুষ্য ভোগের পূরণজনিত শৈথিল্যের প্রতিক্রিয়ায় বিরাগকল্পনা করিয়া, অথবা ভোগের অতৃপ্তি ও ক্ষুধায় অঙ্কুশতাড়িত হইয়া, শ্বশুরনিবাসের ন্যায়, এই সংসারনিবাস হইতে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করে, যদি তখন মূর্ত্তিমতী স্নেহরূপিণী মাতা, অথবা প্রাণপ্রিয়তমা পত্নীর বিমর্ষ নয়নে, নির্ঝরিণীর পরিষ্কৃত বারিধারার ন্যায়, পবিত্র অশ্রুধারা বিগলিত হইতে দেখিতে পায়, তাহা হইলে অমনি সে কৃতজ্ঞতার ভারে দ্রবীভূত হইয়া পড়ে, এবং বিগত বিভ্রাটের জন্য আপনাকে আপনি ধিক্কার দিয়া প্রেমের গদ্গদকণ্ঠে বলিতে থাকে, 'আমি প্রকৃতির স্বাধীনতা চাই না, এই সংসারশৃঙ্খলেই আমার সুখ।' সুতরাং চন্দ্র, এক্ষণে তুলনা কর, তোমার শৃঙ্খলে আর আমার শৃঙ্খলে প্রভেদ কি?

তুমি ভোগ্যবস্তু, অথবা ভাণ্ডারগৃহ, আমি ভোক্তা। তুমি অবিশ্রান্তধারায় রজতরশ্মি ঢালিয়া দিতেছ, আমি অক্ষুণ্ণমনে তাহা উপভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি। তোমার এই পদসেবাও আমার বাসনার উপযোগিনী। অতিতৃপ্তি এবং অতৃপ্তি উভয়ই সমান, এবং অতিতৃপ্তি অধিকতর অনিষ্টজনক। তাই তুমি সময়ে সময়ে তোমার আলোকপাত্র দূরে লইয়া যাইতেছ; আমি সেই অবসরে, অন্ধকারে শুষ্ক অঞ্চলে

আমার সিক্ত নয়ন একবার মুছিয়া লই-তেছি। আলোক চিরকালই ভাল লাগে না। যাহারা আলোকব্যবসায়ী, যাহারা প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আলোকের নিকট রহিয়া রহিয়া চক্ষুর্জ্যোতি বিনষ্ট করিয়াছে, তাহারা জানে আলোকের চিরসাহচর্য্য কি ভয়ানক। আর ঐ যে পলিত কেশ, স্খলিত চর্ম্ম বৃদ্ধেরা কীর্ত্তির অক্ষয় আলোকে একবারের জন্য বহির্গত হইয়া, জীবনের সমস্ত সুখ শান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়াছে, উহারাও জানে, আলোকের একায়ত্ততা কি ভয়াবহ। উহারা আলোক পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে যাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আলোক উহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। সুখী তাঁহারা যাঁহারা কীর্ত্তির আলোক ও অন্ধকার এই উভয়ের মিশ্রণসুখ অনুভব করিয়াছেন; এবং ধন্য তাঁহাদিগকে, যাঁহারা হলাকর্ষণে নিযুক্ত রহিয়া রাজোপাধি গ্রহণের জন্য আহূত হইয়াছেন, এবং পদোচিত কর্ম্মসমাধান করিয়া পুনরায় হলাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন।

তোমার সুন্দর বদন যত কেন সুখপ্রদ হউকনা, আমি দিবস যামিনী উহা দেখিতে চাই না। বৈচিত্র এবং পরিবর্ত্তেই সুখের স্বাদ অনুভূত হয়। আজি তোমার পূর্ণাবয়বে পূর্ণ যৌবনের বিলাসচ্ছটা দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। ক্রমে প্রভাত পদ্মের ন্যায় উহা মলিন হইতে থাকিবে, ও কিয়দ্দিবস পরেই লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়া যাইবে; এবং তখন অমাবস্যার সেই ঘোরান্ধকারে, সেই ভীষণ বিষাদকূপে, হৃদয় আপনা হইতেই তোমার স্মৃতির আরাধনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইবে।

তুমি পরকীয় আলোকে আলোকিত হও, আমরা মনুষ্য জাতি, স্বনাম প্রসিদ্ধ; এবং আমাদিগের মধ্যে যাহারা জাতীয় গৌরব তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, পরপুচ্ছে দেহ পুষ্ট করে, আমরা তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। আমাদিগের অবলম্ব এই পদ, সম্বল এই বাহু, এবং পরিচালক অন্তঃসূত্র হৃদয়ের বৃদ্ধি। আমরা এই মাত্র সহায় সম্পদ লইয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছি; এবং যদি গৌরবের আলোকে কোন দিনও পৃথিবীর চক্ষু আকর্ষণ করি, তবে ইহাদিগের দ্বারাই করিব। পরকীয় প্রতিভা আমাদের হৃদয়ে উৎসাহের উত্তেজনা করিতে পারে, কিন্তু উহা আমাদিগের অঙ্গে প্রতিফলিত হয় না। আমরা পরপিণ্ডে উদর পোষণ, অথবা পরপদ লেহন করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করি বটে, কিন্তু আমরা পরের নামে, কখনও নাম ধারণ করি না। বংশ গৌরব, সম্বন্ধ গৌরব এবং ততোধিক দাসত্ব-গৌরব অভিমানী মনুষ্যের মনে কখনও স্থান পাইতে পারে না; এবং যাহারা ঐরূপ গৌরবে গা ফুলাইয়া ভূমির একাঙ্গুলি ঊর্দ্ধ দিয়া বিচরণ করে, তাহাদের নাম অকালকুষ্মাণ্ড বংশকলঙ্ক, রাজশ্যালক শাক্টায়ন, অথবা সাহেবের চাপরাশী; সমাজে চিরদিনই তাহারা ঘৃণার চক্ষে অবলোকিত হয়।

তোমারও শক্তি তুলনায়, আমারও শক্তি তুলনায়, এবং বোধ হয় পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থেরই শক্তি তুলনায়। আজি এই পৌর্ণমাসীর রাত্রিতে সূর্য্য বহুদূরে গমন করিতেছে; মধ্যে এক পৃথিবীর অন্ত-

রাল, এবং কোটী পৃথিবীর ব্যবধান, তাই তুমি আজি পূর্ণচন্দ্র,—ক্ষুদ্রালোকসম্পন্ন নক্ষত্র গুলিকে খরকিরণ প্রভাবে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছ। কিন্তু যতই সূর্য্য তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, ততই তোমার তেজোরাশি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইবে, এবং ততই তুমি নাম ধারণ করিবে—দ্বিতীয়ার চন্দ্র, তৃতীয়ার চন্দ্র, চতুর্দ্দশীর চন্দ্র, এবং অবশেষে অমাবস্যার অনৃত চন্দ্র। আর আমিও আজি এই মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান;—দক্ষিণে আমার স্বজন পরিবার, পূর্ব্বে আমার ভৃত্যমণ্ডলী, উত্তরে ইতর সাধারণ, এবং পশ্চিমে আমার প্রভুবর্গ। সুতরাং যখন দক্ষিণ দিকে নেত্রপাত করি, তখন সে নেত্রে প্রেমের বারি ঝরিতে থাকে, মুখে প্রেমের বাষ্প উদ্গীরিত হয়, এবং সমস্ত আকৃতিতে শান্তির একরূপ মধুর প্রলেপ আসিয়া পড়ে। যখন পূর্ব্বদিকে নিরীক্ষণ করি, তখন নয়নের প্রেমবারি শুকাইয়া গিয়া উহাতে অগ্নির সঞ্চার হয়, মুখে ফেণায়মান নিষ্ঠীবন বহির্গত হইতে থাকে, এবং হস্ত পদাদির উল্লম্ফন প্রলম্ফন ও আঘূর্ণনে, আকৃতিতে বন্যশার্দ্দূলের এক ভয়াবহ ছায়া আসিয়া পতিত হয়। যখন উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, ঘৃণা, দয়া, মমতা, সহানুভূতি প্রভৃতির এক আশ্চর্য্য মিশ্রণে হৃদয়ের এক অপরিব্যক্ত, অভূতপূর্ব্ব অবস্থা জন্মে। স্থূলকথা, মনুষ্যের উপর মনুষ্যের যে সকল বৃত্তি কার্য্য করে, তাহার সকল গুলিই সমবেত হইয়া, এককালীন প্রকাশিত হইতে চেষ্টা পায়। তাই মুহূর্ত্তের মধ্যে ভ্রূ আকুঞ্চিত আবার বিস্ফারিত, নেত্র অশ্রুধারায় আপ্লুত, আবার ক্রোধাগ্নিতে পরিপূর্ণ, দন্তপংক্তি নিষ্কোষিত আবার অবরুদ্ধ, এবং হস্তপদাদি ঈষদান্দোলিত আবার স্তম্ভিত হইতে থাকে। এবং যখন সর্ব্বশেষে পশ্চিম দিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি, অমনি নয়নের পাতা পড়িয়া যায়, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে থাকে, শরীরে রোমাঞ্চ ও ঘর্ম্মের উদয় হয়, এবং বিভীষিকার আরও শত রকমের অভিনয় করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় হা করিয়া থাকি। তখন দক্ষিণদিকে বিস্ময়ের চক্ষু আমার উপর নিপতিত হয়, পূর্ব্বদিকে অবজ্ঞার করতালি ও উপহাসের টিট্কারি কর্ণে প্রবেশ করে, এবং উত্তর দিকে হর্ষ ও বিষাদ, দুঃখ ও অনুতাপের অর্দ্ধস্ফুট আলাপ হৃদয়কে অধিকতর দগ্ধ করে। শক্তির তুলনা কি আশ্চর্য্য!

আর একটি কথা বলিয়া, চন্দ্র আজি তোমার নিকট আমি বিদায় লইব। সেটি তোমারই গৌরবের কথা। তুমি এই পৃথিবী ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহাকে আলো প্রদান করিতেছ; কিন্তু এই আলোকদান বই তোমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই;—সম্মান অথবা প্রতিপত্তির পুরস্কার তোমার প্রার্থনীয় নহে। মনুষ্য যে স্থান দেখে নাই, ভূলোকচিত্রে যে স্থান অঙ্কিত হয় নাই, যে স্থানে আলোক প্রদান করিলে, তাহা পৃথিবীর কোন উপকারে আসে না, কোন জীবজন্তুও দেখিতে পায় না, সেই অগম্য, অযথা স্থানেও তুমি নিরপেক্ষ হইয়া, এবং দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া, নিঃস্বার্থভাবে আলোক বিতরণ করিতেছ। কিন্তু আমার কার্য্যের

বল মনুষ্যচক্ষু, কার্য্যের স্থল মনুষ্যনিবাস, এবং পরিণাম যাহাই হউক, উদ্দেশ্য মনুষ্যের প্রশংসা। যেমন জীবজগতে প্রাণ-বায়ু, তেমনই আবার কার্য্যজগতে প্রশংসা বায়ু। আমি প্রশংসার মদিরাগন্ধে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতেও দ্বিরুক্তি করি না; কিন্তু যেখানে প্রশংসা নাই, গৃহের অতি সামান্য নিকটবর্ত্তী হইলেও আমি সে স্থানে যাই না। আমাকে যদি কমলকুসুম বল, তবে মনুষ্যচক্ষু আমার সূর্য্য,—আমি উহার দৃষ্টি পাইলে প্রস্ফুটিত হই, আর উহার দৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া যাই। হায় কবে তোমার নিঃস্বার্থবৃত্তি শিক্ষা করিতে সমর্থ হইব? আমি যদি আত্মনির্ভরে, উচ্চশিক্ষার অবলম্বনে, এবং নিঃস্বার্থপরতার অব্যাহত অভিমানে মনুষ্যচক্ষুকে উপেক্ষার বায়ুতে উড়াইয়া দিয়া, কার্য্যকেই কর্ত্তব্য, কার্য কেই উদ্দেশ্য, এবং কার্য্যকেই পুরস্কার স্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর এই পার্থিব দুর্গন্ধময় শৈবালে জড়িত না হইয়া, স্বর্গের অমল সুধা, এবং পুণ্যের পুষ্পাগুলি প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। শ্রী.শা—

আয়ুর্ব্বেদ।

(ষষ্ঠ সংখ্যা, ২৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

দোষ-বিবরণ।

বায়ু, পিত্ত ও কফই দেহধারণের মূল। ইহারা বিকৃত হইলে দেহকে নষ্ট করে। অবিকৃত থাকিলে দেহকে বর্দ্ধন করে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা ধাতু ও মলাদি দূষিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে দোষ বলা যায়। এবং বিসর্গ (স্নেহাদি দ্বারা পোষণ) আদান (রসাদি শোষণ) ও শীতোষ্ণাদি বিক্ষেপণ দ্বারা দেহকে ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু বলা যায়। এবং রসরক্তাদি ধাতুসমূহকে মলিন করে বলিয়া ইহাদিগকে মল বলা যায়। *

* বায়ুঃ পিত্তংকফশ্চেতি ত্রয়োদোষাঃ সমাসতঃ। বিকৃতাবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তিতে বর্দ্ধয়ন্তি চ। * * ধাতবশ্চ মলাশ্চাপি দুষ্যন্তোভির্যতস্ততঃ। বাতপিত্তকফাএতে ত্রয়োদোষাইতিস্মৃতাঃ। তে ধাতবোপি বিদ্বদ্ভিঃ গদিতা দেহধারণাৎ। বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলাযথা। ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা। মলাশ্চতে রসাদীনাং মলিনীকরণান্মতাঃ॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

বায়ুর স্বরূপ।†

বায়ু স্বয়ং পিত্ত, কফ ও মলাদির পরিচালক, শীঘ্রকারী, রজোগুণময়, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, শীতল, লঘু ও চলনশীল, এবং বায়ু, পিত্তযুক্ত

† দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ। রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ রুক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ। * * * দাহকৃৎতেজসাযুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ। বিভাগকরণাদ্বায়ুঃ প্রধানং দোষসংগ্রহে॥ (ঐ)

হইলে দাহকারক, ও কফযুক্ত হইলে শীতকারক হইয়া থাকে। রসরক্তাদি ও মলমূত্রাদির বিভাগ করণহেতু এবং পিত্ত ও কফের পরিচালনহেতু দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান।

এক বায়ুই স্থান, নাম ও কর্ম্মভেদে পঞ্চ প্রকার। যথা—

কণ্ঠস্থ বায়ু উদান, হৃদয়স্থ বায়ু প্রাণ, নাভিমণ্ডলস্থ বায়ু সমান, মলাশয়স্থ বায়ু অপান, সর্ব্বশরীরসঞ্চারী বায়ু ব্যান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (১)

পঞ্চবিধ বায়ুর কার্য্য।

কণ্ঠস্থ উদানবায়ু, উর্দ্ধগতি দ্বারা বাক্য, গীত ও হাস্যাদির প্রবর্ত্তন করে। হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু মুখাগত হইয়া অন্নপানীয়াদিসমূহকে অন্তঃপ্রবিষ্ট করায়। এই প্রাণবায়ুই দেহধারণের প্রধান অবলম্বন। আমপক্কাশয়সঞ্চারী সমানবায়ু, পাচক নামক পিত্ত সংযুক্ত হইয়া অন্নাদিসমূহকে পরিপাক করে। এবং রসরক্তাদি ধাতু ও মলমূত্রাদির পার্থক্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পক্কাশয়স্থ অপান বায়ু, যথাকালে মল, মূত্র, শুক্র, আর্ত্তবশোণিত ও গর্ভকে আকর্ষণ করে। সর্ব্বশরীরসঞ্চারী ব্যানবায়ু, লোমকূপ দ্বারা শরীর মধ্যে রসাদি আকর্ষণ করে। এবং ঘর্ম্ম ও রক্তকে বহিঃপ্রবর্ত্তন করায়। এই বায়ু দ্বারাই গতি, অপক্ষেপ, উৎক্ষেপ, নিমেষ ও উন্মেষাদি ক্রিয়া সুসমাহিত হইয়া থাকে। (২)

পিত্তের স্বরূপ।

পিত্ত, উষ্ণ, দ্রব, পীতবর্ণ অথবা নীলবর্ণ, সত্ত্বগুণবহুল, সরণশীল, লঘু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, কটুরস, পাকবৈগুণ্যে কখনও অম্লরস হইয়া থাকে।

একই পিত্ত, স্থান, নাম ও কর্ম্মভেদে পঞ্চ প্রকার। যথা—অগ্ন্যাশয়স্থ পিত্ত পাচক, যকৃৎপ্লীহস্থপিত্তরঞ্জক, হৃদয়স্থ পিত্ত সাধক, নেত্রস্থ পিত্ত আলোচক, এবং সর্ব্বশরীরস্থ চর্ম্মগত পিত্ত ভ্রাজক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (৩)

পঞ্চবিধ পিত্তের কার্য্য।

পাচক পিত্ত, ভুক্ত বস্তুর পরিপাক করে, এবং রস, মূত্র, ও পুরীষ প্রভৃতির পার্থক্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এবং স্বস্থানে থা-

(১) উদানস্তদনুপ্রাণঃ সমানোঽপান এবচ। ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থানপ্রভেদতঃ। কণ্ঠে হৃদি তথাধস্ত্যৎ কোষ্ঠবহ্নে মলাশয়ে। সকলেঽপি শরীরেঽসৌক্রমেণ পবনোবসেৎ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(২) উদাননামযস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ। তেন ভাষিতগীতাদিপ্রবৃত্তিঃ ** যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্। সোন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃপ্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে। ** আমপক্কাশয়চরঃ সমানোবহ্নিসংগতঃ। সোন্নংপচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তিহি। ** পক্কাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ং। সমীরণঃ শকৃন্মূত্র শুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ। ** কৃৎস্নদেহচরো ব্যানোরসসংবাহনোদ্যতঃ। স্বেদাসৃকশ্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি। গত্যাপক্ষেপণোৎক্ষেপনিমেষোন্মেষণাদিকাঃ। প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাং। (ভাবপ্রকাশ)

(৩) পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরং। সরং কটু লঘু স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণমম্লন্তু পাকতঃ। পাচকং রঞ্জকঞ্চাপি সাধকালো-

কিয়াই শরীরস্থ পঞ্চমহাভূতগত অগ্নির বল বর্দ্ধন করে।

রঞ্জকপিত্ত, রস ধাতুকে রঞ্জিত করিয়া শোণিতরূপে পরিণত করে। সাধকপিত্ত, বুদ্ধি, মেধা, ও স্মৃতি শক্তির উদ্দীপন করে। আলোচক পিত্ত দ্বারা রূপদর্শন ক্রিয়া সাধিত হয়।

ভ্রাজকপিত্ত শরীরের কান্তিসম্পাদক। এবং এই পিত্তই চর্ম্মোপরিদত্ত প্রলেপ ও মর্দ্দিত তৈলাদির পরিপাক করিয়া থাকে। (১)

কফের স্বরূপ।

শ্লেষ্মা, শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণভূয়িষ্ঠ, ও মধুর-রস। পাক বৈগুণ্যে কখনও লবণ রস হইয়া থাকে।

একই শ্লেষ্মা নাম, স্থান, ও কর্ম্মভেদে পঞ্চপ্রকার। যথা— আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা ক্লেদন, হৃদয়স্থ শ্লেষ্মা অবলম্বন, কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা রসন, শিরঃস্থ শ্লেষ্মা স্নেহন; সন্ধিস্থ শ্লেষ্মা শ্লেষণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (২)

পঞ্চবিধ কফের কার্য্য।

আমাশয়স্থ ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা, স্বশক্তি প্রভাবে কঠিন ভুক্ত বস্তু সমূহকে ক্লিন্ন করে, এবং অন্যান্য হৃদয়াদি শ্লেষ্ম স্থান সকলকে উদক দান দ্বারা উপকৃত করে।

হৃদয়স্থ অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা, রস যুক্ত আত্ম বীর্য্যদ্বারা হৃদয়ের অবলম্বন ও ত্রিক সন্ধারণ করিয়া থাকে।

কণ্ঠস্থ রসন নামক শ্লেষ্মা, কটু, তিক্ত, ও কষায়াদি রস সমূহের অবরোধ করায়।

শিরঃস্থ স্নেহন নামক শ্লেষ্মা, স্নেহদান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তি সাধন করে।

সন্ধিস্থ শ্লেষণ নামক শ্লেষ্মা, সমস্ত সন্ধির সংশ্লেষ বিধান করিয়া থাকে। (৩)

ধাতু বিবরণ।

ধাতু সপ্তপ্রকার। যথা—

১। রস, ২। রক্ত, ৩। মাংস, ৪। মেদ, ৫। অস্থি, ৬। মজ্জা, ৭। শুক্র, ইহারা স্বয়ং অব-

---

চকে তথা। ভ্রাজকঞ্চেতি পিত্তস্য নামানি স্থানভেদতঃ। অগ্ন্যাশয়ে যকৃৎপ্লীহ্নোর্হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে। ত্বচি সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ। (ভাবপ্রকাশ)

(১) পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনং রসমূত্রপুরীষাণিবিরেচয়তি নিত্যশঃ। * * রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ। যত্তু সাধকসংজ্ঞং তৎ কুর্য্যাৎ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিং। যদালোচকসংজ্ঞং তদ্রূপগ্রহণকারকং। ভ্রাজকং কান্তিকরিস্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদিপাচকং। (ঐ)

(২) শ্লেষ্মাশ্বেতোগুরুঃস্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা। তমোগুণাধিকঃস্বাদুর্বিদগ্ধো-লবণোভবেৎ। কফস্যৈতানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ। রসনঃস্নেহনশ্চাপি শ্লেষণঃ স্থানভেদতঃ। আমাশয়েঽথ হৃদয়ে কণ্ঠেশিরসি সন্ধিষু। স্থানেষ্বেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ। (ভাব প্রকাশঃ)

(৩) ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমাত্মশক্ত্যপরাণ্যপি। অম্বুগ্রহৈস্তিচ শ্লেষ্মস্থানান্যুদককর্ম্মণা। রসযুক্তাত্মবীর্য্যেণ হৃদয়স্থাবলম্বনং। ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ। উভাবপি ততঃ সৌম্যৌতিষ্ঠতশ্চান্তিকে যতঃ। যতো রসান্বিজানীতো রসনারসনৌ সমৌ॥ স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ। শ্লেষণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং সংশ্লেষং বিদধাত্যসৌ। ঐ

স্থিত থাকিয়া অবিকৃতাবস্থায় দেহকে ধারণ ও পোষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু বলা যায়। (১)

১। রসের স্বরূপ।

সম্যক্ পক্কভুক্ত বস্তুর সার ভাগকে রস বলাযায়। ইহা দ্রব, শ্বেতবর্ণ, শীতল, মধুর রস, স্নিগ্ধ, ও গতিশীল। (২)

রসের স্থানও কর্ম্ম।

রস, সর্ব্বদেহ সঞ্চারী হইলেও ইহার প্রধান অধিষ্ঠান হৃদয়। ইহা আমপকাশয় সঞ্চারি-সমান-বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া প্রথমতঃ হৃদয়ে আগমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, তৎপরে হৃদয় হইতে ধমনী মার্গদ্বারা গমন করিয়া প্রথমতঃ রক্তাদি ধাতু সকলকে পরিপোষণ করে। তদনন্তর শৈত্য, স্নিগ্ধত্ব, ও পোষকত্বাদি গুণে সমস্ত দেহকে উপকৃত করে। (৩)

২। রক্তের স্বরূপ।

রসধাতু, যকৃৎগত হইয়া রঞ্জক নামক পিত্তদ্বারা রক্তিমবর্ণতা ও পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহাকে রক্ত বলা যায়। ইহা স্নিগ্ধ, গুরু, চলনশাল ও স্বাদুরস। পাকবৈগুণ্যে কখনও অম্লরস হইয়া থাকে।

রক্তের স্থান ও কর্ম্ম।

রক্ত, সর্ব্ব শরীরস্থ হইলেও ইহার প্রধান অধিষ্ঠান যকৃৎও প্লীহা। যকৃৎও প্লীহাতে থাকিয়াই অন্যত্র সংস্থিত রক্ত সমূহের পরিপোষণ করিয়া থাকে। ইহাই জীবনের প্রধান অবলম্বন। (৪)

৩। মাংসের স্বরূপ।

রক্ত, স্বীয় অগ্নিদ্বারা পক্ব ও বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হইয়া মাংসরূপে পরিণত হয়। (৫)

মাংস পেশীর স্বরূপ।

উষ্মযুক্ত বায়ু, স্রোতঃ পথ সকলকে ভেদ করিয়া ইতস্ততঃ গমন পূর্ব্বক মাংস সমূহে প্রবেশ করিয়া উহাকে নানাভাগে বিভক্ত করে। এই বিভক্ত মাংস সমূহকেই মাংস পেশী বলা যায়। শরীরিগণের শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পর্ব্ব ও সন্ধি সমূহ মাংস পেশীদ্বারা সংবৃত থাকিয়াই সবল ও স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম হয়। (৬)

(১) এতে সপ্ত স্বয়ংস্থিত্বা দেহং দধতি যত্ নৃণাং। রসাসৃকৃমাংসমেদোঽস্থিমজ্জা-শুক্রাণি ধাতবঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(২) সম্যক্ পক্বস্য ভুক্তস্য সারোনিগদিতোরসঃ। সতুদ্রবঃসিতঃশীতঃ স্বাদুঃস্নিগ্ধশ্চলোভবেৎ। (ঐ)

(৩) সর্ব্বদেহচরস্যাপি রসস্য হৃদয়ং স্থলং। সমানমরুতা পূর্ব্বং যদয়ং হৃদয়েধৃতঃ। আরুহ্য ধমনীর্গত্বা ধাতূন্ সর্ব্বানয়ং রসঃ। পুষ্ণাতি তদনু স্বীয়ৈর্ব্যাপ্নোতি চ তন্নুংগুণৈঃ। (ঐ)

(৪) যদা রসো যকৃৎ যাতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ। রাগংপাকং চ সংপ্রাপ্য স ভবেৎ রক্তসংজ্ঞকঃ। রক্তং সর্ব্বশরীরস্থং জীবস্যাধারমুত্তমং। স্নিগ্ধং গুরু চলংস্বাদু বিদগ্ধং পিত্তবদ্ভবেৎ। যকৃৎপ্লীহাচ রক্তস্য মুখ্যং স্থানং তয়োঃ স্থিতং। অন্যত্র সংস্থিতবতাং রক্তানাং পোষকং ভবেৎ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৫) শোণিতং স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চ-ঘনীকৃতং। তদেব মাংসং জানীয়াত্তস্য ভেদানপি ব্রুবে। (ঐ)

(৬) যথার্থমুষ্মণা যুক্তোবায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ। অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশী-

মাংস পেশীর সংখ্যা ও স্থান।

মনুষ্য-শরীরে মাংস পেশীর সংখ্যা ৫০০ পঞ্চশত। তন্মধ্যে শাখাগত (অর্থাৎ সক্থিদ্বয় ও বাহুদ্বয়) ৪০০ চারিশত। কোষ্ঠ স্থানে ৬৬ ষট্‌ষষ্টি। গ্রীবার উর্দ্ধভাগে ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ।

শাখা-গত।

এক এক পাদাঙ্গুলিতে ৩। ৩ তিন তিন হিসাবে ১৫ পঞ্চদশ খানি মাংসপেশী। পাদাগ্রে ১০ দশ। পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্ট ১০ দশ। গুল্ফ ও পাদতলে ১০ দশ। গুল্ফ ও জানুর মধ্যভাগে ২০ বিংশতি। জানুস্থানে ৫ পঞ্চ। উরুস্থানে ২০ বিংশতি। বঙ্ক্ষণ স্থানে ১০ দশ। এক সক্থি মধ্যে সমষ্টি ১০০ শত। দ্বিতীয় সক্থি মধ্যেও ঐরূপ ১০০ শত মাংসপেশী।

এক এক হস্তাঙ্গুলিতে ৩। ৩ হিসাবে ১৫ খানি মাংসপেশী। হস্তাগ্রে ১০। হস্তোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্ট ১০। মণিবন্ধ ও হস্ততলে ১০। মণিবন্ধ ও বাহুর মধ্যভাগে ২০। বাহু মধ্যে ৫। বাহুর উর্দ্ধভাগে ২০। বাহু ও কক্ষার সন্ধি স্থলে ১০। এক বাহু মধ্যে সমষ্টি ১০০ শত খানি মাংসপেশী। দ্বিতীয় বাহু মধ্যেও ঐরূপ ১০০ একশত খানি মাংসপেশী।

কোষ্ঠ-গত।

পায়ুতে ৩ তিন। মেঢ্রে ১। তৎসেবনীতে ১। অণ্ডকোষে ২। নিতম্ব দ্বয়ে ১০। বস্তিশীর্ষে ২। উদরে ৫। নাভিতে ১। পৃষ্ঠের উর্দ্ধভাগে উভয়দিকে ১০। পার্শ্বদ্বয়ে ৬। বক্ষঃস্থলে ১০। স্কন্ধদ্বয়ে ৭। হৃদয় ও আমাশয়ের মধ্যভাগে ২। যকৃতে ২। প্লীহাতে ২। উণ্ডুকে ২। কোষ্ঠমধ্যে সমষ্টি ৬৬ খানি মাংসপেশী।

গ্রীবার উর্দ্ধভাগ-গত।

গ্রীবাতে ৪ খানি। হনুদ্বয়ে ৮। কাকলক বা কণ্ঠমণিতে (অর্থাৎঘুণ্টিকা) ১। গলদেশে ১। তালুতে ২। জিহ্বাতে ১। ওষ্ঠদ্বয়ে ২। নাসাতে ২। দ্বিনেত্রে ২। গণ্ডদ্বয়ে ৪। কর্ণদ্বয়ে ২। ললাটে ৪। মস্তকে ১। গ্রীবার উর্দ্ধভাগে সমষ্টি ৩৪ চৌত্রিশ খানি মাংসপেশী। (১)

বিভজতে তথা। * * শিরাস্নায়ুস্থি পর্ব্বাণি সন্ধয়শ্চ শরীরিণাং। পেশীভিঃ সংবৃতানাত্র বলবন্তি ভবন্তি হি। (সুশ্রুতঃ)

(১) পঞ্চপেশী শতানি ভবন্তি, তাসাং চত্বারি শতানি শাখাসু। কোষ্ঠে ষট্‌ষষ্টিঃ গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং চতুস্ত্রিংশৎ। একৈকস্যান্তু পাদাঙ্গুল্যাং তিস্রঃ তিস্রস্তাপঞ্চদশ। দশপ্রপদে। পাদোপরি কূর্চ্চ-সন্নিবিষ্টাস্তাবত্য এব। দশ গুল্ফ তলয়োঃ। গুল্ফজান্বন্তরে বিংশতিঃ। পঞ্চ জানুনি। বিংশতিরূর্ব্বৌ। দশ বংক্ষণে। শতমেব মেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতর সক্থি বাহূচ ব্যাখ্যাতৌ। তিস্রঃপায়ৌ। একামেঢ্রে। সেবন্যাং চাপরা। দ্বে বৃষণয়োঃ। স্ফিচোঃ পঞ্চপঞ্চ। দ্বে বস্তিশিরসি। পঞ্চোদরে। নাভ্যামেকা। পৃষ্ঠোর্দ্ধ সন্নিবিষ্টাঃ পঞ্চপঞ্চ দীর্ঘাঃ। ষট্‌পার্শ্বয়োঃ। দশ বক্ষসি। অক্ষকাংসৌ প্রতি সমন্তাৎ সপ্ত। দ্বেহৃদয়ামাশয়য়োঃ। ষট্‌যকৃৎ-প্লীহোণ্ডুকেষু।

গ্রীবায়াং চতস্রঃ। অষ্টৌহন্বোঃ একৈকা কাকলকগলয়োঃ। দ্বেতালুনি। একা জিহ্বায়াং। ওষ্ঠয়োর্দ্বে নাশায়াংদ্বে দ্বেনেত্রয়োঃ।

এতদপেক্ষায় স্ত্রীলোকের ২০ বিংশতি খানি মাংসপেশী অধিক আছে। যথা—

গর্ভাশয়ে,গর্ভাশয় ছিদ্রসংস্থিত ৩ তিন ও শুক্রার্ত্তব প্রবেশিনী ৩। যোনির অভ্যন্তর মুখাশ্রিত ২। যোনির বহির্ভাগে স্রোতঃপার্শ্বদ্বয়স্থিত ২। স্তনদ্বয়ে ১০। যৌবনকালে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (১)

পুরুষের মেঢ়ে ১। মুষ্কদ্বয়ে ২। এই তিন খানি মাংসপেশী স্ত্রীলোকের অসম্ভব। সুতরাং এই তিন খানি পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রীলোকের ন্যূন আছে। (২)

৪। মেদের স্বরূপ।

মাংস, স্বীয় অগ্নিদ্বারা পরিপক্ক হইয়া মেদোরূপে পরিণত হয়। ইহা অতিশয় গুরু,স্নিগ্ধ, বলকারক ও অত্যন্ত শরীরবর্দ্ধক।

মেদঃ সকলেরই উদরস্থ সূক্ষ্ম অস্থিমধ্যে অধিক পরিমাণে থাকে। এই নিমিত্তই মেদস্বী ব্যক্তিদিগের অন্য অঙ্গ অপেক্ষায় অধিক পরিমাণে উদর বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। (৩)

৫। অস্থির স্বরূপ ও প্রয়োজন।

মেদঃ, স্বীয় অগ্নিদ্বারা পক্ক ও বায়ুদ্বারা শোষিত হইয়া অস্থিরূপে পরিণত হয়। এই অস্থিই শরীরের সার। যেমন অভ্যন্তর সার দ্বারা বৃক্ষ সমূহ ভূমির উপরে দণ্ডায়মান থাকে, তদ্রূপ অভ্যন্তরস্থ অস্থিরূপ সারদ্বারা দেহ-ধৃত হইয়া থকে। শিরা, ও স্নায়ুনিবদ্ধ মাংস সমূহ অস্থিকে অবলম্বন করিয়া থাকাতেই বিদীর্ণ অথবা পতিত হয় না। (৪)

অস্থির সংখ্যা ও স্থান। (৫)

গণ্ডয়োশ্চতস্রঃ। কর্ণয়োর্দ্বে। চতস্রঃ ললাটে একাশিরসীত্যেবমেতানি পঞ্চপেশীশতানি। (সুশ্রুতঃ)।

(১) স্ত্রীণাস্তু বিংশতিরধিকাঃ। দশ তাসাং স্তনয়োরেকৈকস্মিন্ পঞ্চপঞ্চ যৌবনেতাসাং পরিবৃদ্ধিঃ। অপত্যপথে চতস্রস্তাসাং প্রসৃতে অভ্যন্তরতোদ্বে, মুখাশ্রিতে বাহ্যে চ দ্বে। গর্ভছিদ্র-সংশ্রিতাস্তিস্রঃ, শুক্রার্ত্তবপ্রবেশিন্যস্তিস্রঃ। (সুশ্রুতঃ)

(২) পঞ্চপেশীশতান্যেব স্ত্রীবর্জ্জং বিদ্ধিভূমিপ। অতশ্চ তিস্রোহীয়ন্তে স্ত্রীণাংশেফসিমুষ্কয়োঃ। (ভোজঃ)

(৩) যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পক্বং তন্মেদইতিকথ্যতে। তদতীবগুরুস্নিগ্ধং বলকার্য্যতিবৃংহণং। মেদোহি সর্ব্বভূতানামুদরেঽণ্বস্থিসংস্থিতং। অতএবোদরেবৃদ্ধিঃ প্রায়োমেদস্বিনোভবেৎ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৪) মেদোযৎস্বাগ্নিনাপক্বং বায়ুনাচাতিশোষিতং। তদস্থিসংজ্ঞাং লভতে স-সারঃ সর্ব্ববিগ্রহে। (ভাবপ্রকাশঃ) অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈর্যথাতিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ। অস্থিসারৈস্তথাদেহাধ্রিয়ন্তে দেহিনোধ্রুবং। তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাং আস্থীনিন বিনশ্যন্তি সারা এতানি সর্ব্বথা। মাংসান্যত্রনিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা। অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্য্যন্তে পতন্তি চ। (সুশ্রুতঃ)

(৫) ত্রীণিসষষ্ঠানাস্থি শতানি বেদবাদিনোভাষন্তে। শল্যতন্ত্রেতু ত্রীণ্যেবশতানি তেষাং সবিংশমস্থিশতং শাখাসু। সপ্তদশোত্তরং শতং শ্রোণিপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরঃসু। গ্রীবাংপ্রত্যূর্দ্ধং ত্রিষষ্টিঃ। এবমস্থ্নাং ত্রীণি শতানি পূর্য্যন্তে। একৈকস্যাস্তু পাদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ। তলকূর্চ্চগুল্ফ সংশ্রিতানি দশ। পার্ষ্ণ্যামেকং জঙ্ঘায়াংদ্বে।

শরীর মধ্যে সর্ব্বসমেত অস্থি সংখ্যা ৩০০ তিন শত। তন্মধ্যে শাখাগত (সক্থিও বাহু) ১২০। কোষ্ঠগত (পার্শ্ব, কটী, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, ও উদর) ১১৭। গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগ গত ৬৩।

শাখাগত।

এক এক পাদাঙ্গুলিতে ৩। ৩ তিন তিন হিসাবে সমষ্টি ১৫ পঞ্চদশ খানি অস্থি। পাদতলে ৫ পাঁচ খানি শলাকাস্থি। এবং তদাধারভূত স্থূল অস্থি ১। কূর্চ্চমধ্যে ২। গুল্‌ফ স্থানে ২। পাদপার্ষ্ণিতে ১। জঙ্ঘাতে ২। জানুতে ১। উরুতে ১। সমষ্টি এক সক্থি মধ্যে ৩০ ত্রিশখানি। দ্বিতীয় সক্থিমধ্যে ও ঐরূপ ৩০ ত্রিশখানি অস্থি আছে।

এক এক হস্তাঙ্গুলিতে ৩। ৩ তিন তিন হিসাবে একহস্তে সমষ্টি ১৫ খানি অস্থি। হস্ততলে শলাকাস্থি ৫। তদাধার-ভূত স্থূল অস্থি ১। কূর্চ্চমধ্যে ২। মণিবন্ধে ২। হস্ত পার্ষ্ণিতে ১৷ প্রকোষ্ঠস্থানে ২। কূর্পরে ১। বাহুতে ১। সমষ্টি একবাহু মধ্যে ৩০ ত্রিশ খানি অস্থি। দ্বিতীয় বাহু মধ্যেও ঐরূপ ত্রিশখানি অস্থি আছে।

কোষ্ঠগত।

প্রতি পার্শ্বে ৩৬ খানি হিসাবে পার্শ্বদ্বয়ে ৭২ খানি অস্থি। পায়ুমধ্যে ১। ভগস্থানে ১। নিতম্বদ্বয়ে ২। ত্রিক স্থানে ১। বক্ষস্থলে ৮। পৃষ্ঠে ৩০। উদরস্থ অক্ষকনামক অস্থি ২। সমষ্টি ১১৭ খানি অস্থি।

গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগগত।

গ্রীবাতে ৯ খানি অস্থি, কণ্ঠনালীতে ৪। হনুদ্বয়ে ২। দন্তে ৩২, নাসাতে ৩। তালুতে ১। গণ্ডদ্বয়ে ২ কর্ণদ্বয়ে ২। সংখদ্বয়ে ২। মস্তকে ৬। সমষ্টি ৬৩ খানি অস্থি।

এতন্মধ্যে চক্ষুঃকোটর, কর্ণ, নাসিকা, ও গ্রীবাগত অস্থি সমূহকে তরুণাস্থি বলা যায়। এবং শিরঃ, শংখ, তালু, অংস, জানু, নিতম্ব, ও গণ্ডগত অস্থি সমূহকে কপালাস্থি বলা যায়। এবং দন্তগত অস্থি সমূহকে রুচকাস্থি বলা যায়। হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষগোত অস্থি সমূহকে বলয়াস্থি বলা যায়। হস্তাঙ্গুলিতলে ও পাদাঙ্গুলিতলে, কূর্চ্চে, মণিবন্ধে, বাহুদ্বয়ে, ও জঙ্ঘাদ্বয়ে নলকাস্থি নামে খ্যাত।

৬। মজ্জরে স্বরূপ ও স্থান।

স্বীয় অগ্নিদ্বারা পরিপক্ক অস্থি হইতে স্বেদবৎ ও ঘন যে সারভাগ সমুৎপন্ন হয়,

---

জান্বোরেকং, এক মুরাবিতি। ত্রিংশদেবমেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থি বাহূচ ব্যাখ্যাতৌ।

শ্রোণ্যাং পঞ্চ তেষাং গুদভগনিতম্বেষু চত্বারি। ত্রিকসংশ্রিতমেকং পার্শ্বে ষট্‌ত্রিংশৎ এবমেকস্মিন্ দ্বিতীয়েপ্যেবং। পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ। অষ্টাবুরসি। দ্বে অক্ষকসংজ্ঞে। গ্রীবায়াং নবকং। কণ্ঠনাড্যাং চত্বারি। দ্বে হন্বোঃ। দন্তাদ্বাত্রিংশৎ। নাসায়াং ত্রীণি। একংতালুনি, গণ্ডকর্ণশঙ্খেষ্বেকৈকংষট্। ষট্‌শিরসি। এতানি পঞ্চবিধানি ভবন্তি। তদ্যথা——কপালরুচকতরুণ বলয়নলক-সংজ্ঞানি। তেষাং জানুনিতম্বাংসগণ্ডতালুশঙ্খশিরঃসু কপালানি। দশনাস্তু রুচকানি। ঘ্রাণকর্ণগ্রীবাক্ষিকোষেষু তরুণানি। পাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরঃসু বলয়ানি শেষাণি নলকসংজ্ঞানি। (সুশ্রুতঃ)

তাহাকে মজ্জাবলা যায়। উহা স্থূলাস্থির অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে। (১)

৭। শুক্রের স্বরূপ ও স্থান।

শুক্র সৌম্য (শৈত্যগুণ ভূয়িষ্ঠ) শ্বেত বর্ণ, স্নিগ্ধ, বলকারক ও পুষ্টিকারক, গর্ব্ভোৎপাদক, শরীরের সার, এবং জীবের প্রধান অবলম্বন। যেমন দুগ্ধরাশিতে ঘৃত, এবং ইক্ষুদণ্ডে রস সর্ব্বত্র গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ শুক্রও দেহিগণের সমস্ত শরীরে গূঢ় ভাবে অবস্থিতি করে। (২)

ধাতুমল।

রসাদি মজ্জা পর্য্যন্ত ষট্‌ধাতু হইতে কফ পিত্তাদি বিবিধ মলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা—

রস হইতে কফ, রক্ত হইতে পিত্ত, মাংস হইতে কর্ণ-স্রোতঃ প্রভৃতির মল, মেদ হইতে ঘর্ম্ম, অস্থি হইতে নখ ও লোম, মজ্জা হইতে চর্ম্মের স্নেহ ও নেত্রমল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। (৩)

উপধাতু। (*)

লসিকা, বসা ও স্ত্রীজাতির স্তন্য দুগ্ধকে উপধাতু বলা যায়।

লসিকার স্বরূপ।

পিত্তদ্বারা সন্তপ্ত মাংস হইতে একপ্রকার জল নির্গত হয় তাহাকেই লসিকা বলে। (৪)

বসার স্বরূপ।

শুদ্ধ মাংসের স্নেহ ভাগকে বসা বলা যায়। (৫)

স্তন্যের স্বরূপ।

সম্যক্ পক্ক আহারীয় রসের সারভাগ স্তন্য বাহিনী ধমনী দ্বারা সর্ব্বশরীর হইতে স্তনদ্বয়ে নীত হইয়া স্তন্যদুগ্ধরূপে পরিণত হয়। ইহা মধুর রস ও পোষক। (৬)

কলার স্বরূপ।

ধাত্বাশয় মধ্যে অবস্থিত, শরীরোষ্মদ্বারা পরিপক্ক, ধাতুর একরূপ ক্লেদকে কলা বলা

---

(১) অস্থিযৎস্বাগ্নিনা পক্কং তস্য সারোভবেদ্ঘনঃ। যঃ স্বেদবৎপৃথগ্ভূতঃ সমজ্জেত্যভিধীয়তে। স্থূলাস্থিষু বিশেষণমজ্জাত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(২) শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতং। গর্ব্ভবীজং বপুঃসারঃ জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ। (ভাবপ্রকাশঃ) যথা পয়সি সর্পিস্তুগূঢ়শ্চেক্ষৌ রসোযথা। শরীরেষু তথা শুক্রং নৃণাং বিদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ। (সুশ্রুতঃ)

(৩) কফঃ পিত্তং মলঃ খেষু প্রস্বেদো নখলোমচ। নেত্রবিট্‌ত্বচঃ স্নেহো ধাতূনাং ক্রমশোমলাঃ। (সুশ্রুতঃ)

(৪) পিত্তেনস্বিন্নমাংসাৎস্রবত্যুদকং লসিকেত্যুচ্যতে। (উহ্বনকৃত সুশ্রুতটীকা)

(৫) শুদ্ধমাংসস্য যঃস্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতা॥ (সুশ্রুতঃ)

(৬) রসপ্রসাদোমধুরঃ পক্কাহারনিমিত্তজঃ। কৃৎস্নদেহাৎস্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে। (সুশ্রুতঃ)

---

* ভষক্‌শ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গরের মতে আর্ত্তবশোণিত, ওজঃ, স্বেদ (ঘর্ম্ম) দন্ত ও কেশ সমূহও উপধাতু মধ্যে গণনীয়। তিনি বলেন— রসের উপধাতু স্তন্য, রক্তের উপধাতু আর্ত্তবশোণিত, মাংসের উপধাতু বসা, মেদের উপধাতু ঘর্ম্ম, অস্থির উপধাতু দন্ত, মজ্জার উপধাতু কেশ, এবং শুক্রের উপধাতু ওজঃ।

যায়। ইহা স্নায়ু সমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন এবং শ্লেষ্মাদ্বারা বেষ্টিত হইয়া এক প্রকার পটলের (পড়দা) মধ্যে অবস্থিত থাকে। ইহা সপ্ত সংখ্যক। তন্মধ্যে আদ্যকলা মাংস, দ্বিতীয় কলা রক্ত, তৃতীয় কলা মেদ, চতুর্থকলা শ্লেষ্মা, পঞ্চমকলা মল, ষষ্ঠকলা পিত্ত (অগ্নি) এবং সপ্তমকলা শুক্রধারণ করে। (১)

আশয়-নিরূপণ।

স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় জাতীয় মনুষ্যের সাতটি আশয় (স্থান) নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—১। রক্তাশয়। ২ কফাশয়। ৩ আমাশয়। ৪ পিত্তাশয়।৫ বাতাশয়।৬ মলাশয়।৭ মূত্রাশয়।

তন্মধ্যে রক্তাশয় ও কফাশয় বক্ষঃস্থলে। আমাশয়, নাভির ঊর্দ্ধ ও স্তনের নিম্নবর্ত্তি ব্যাপিত স্থানে। পিত্তাশয় (অগ্ন্যাশয়) নাভির কিঞ্চিদুপরি বাম ভাগে। বাতাশয়, পিত্তাশয়ের সমসূত্র নিম্নভাগে।

মলাশয় (পক্বাশয়) বাতাশয়ের অব্যবহিত নিম্নভাগে। মূত্রাশয় (বস্তিস্থান) নাভির অধোভাগে অবস্থিত আছে। (২)

এতদ্ভিন্ন স্ত্রীজাতির আরও তিনটি আশয় অধিক আছে। যথা—গর্ভাশয় এক। স্তন্যাশয় দুই। (৩)

চর্ম্ম।

যেমন পচ্যমান দুগ্ধ হইতে সন্তানিকা (সর) উদ্ভূত হয়, তদ্রূপ গর্ভাশয়স্থ শুক্র ও শোণিত ক্রমশঃ পচ্যমান হইলে তাহা হইতে সপ্ত ত্বক্ সমুৎপন্ন হয়। যথাক্রম নাম; যথা—১। অবভাষিণী।২ লোহিতা।৩ শ্বেতা, ৪ তাম্রা।৫ বেদিনী। ৬। রোহিণী।৭ মাংসধরা। (৪) (ক্রমশঃ)

শ্রীহ—

(১) ধাত্বাশয়ান্তরে ধাতোঃ ক্লেদস্তবিতিষ্ঠতি। দেহোষ্মণাভিপক্বশ্চ সাকল্লেত্যভিধীয়তে। আদ্যা মাংসধরা প্রোক্তা দ্বিতীয়া রক্তধারিণী। মেদোধরা তৃতীয়াচ চতুর্থী শ্লেষ্মধারিণী পঞ্চমীতুমলং ধত্তে ষষ্ঠী পিত্তধরামতা। রেতোধরা সপ্তমীস্যাদিতি সপ্তকলাস্মৃতা। (ভাবপ্রকাশ) স্নায়ুভিশ্চ প্রতিচ্ছন্নান্ সন্ততাংশ্চ জরায়ুণা। শ্লেষণা বেষ্টিতাংশ্চাপি কলাভাগাংশ্চতান্বিদুঃ ॥ (সুশ্রুতঃ।

(২) উরোরক্তাশয়স্তস্মাদধঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ স্মৃতঃ। আমাশয়স্ততদধস্তল্লিঙ্গিং চন্দ্রকোহৃক দং। নাভিস্তনান্তরং জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধাঃ। আমাশয়াদধঃ পক্বাশয়াদূর্দ্ধন্তু যা কলা গ্রহণীনামকাসৈব কথিতঃ পাচকাশয়ঃ। ঊর্দ্ধমগ্ন্যাশয়োনাভে মধ্যভাগে ব্যবস্থিতঃ। তস্যোপরিতিলং জ্ঞেয়ং তদধঃ পবনাশয়ঃ। পক্বাশয়স্তু তদধঃ সএব তু মলাশয়ঃ। তদধঃ কপিতঃ বস্তিঃ সহি মূত্রাশয়োমতঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩) পুরুষেভ্যোঽধিকাশ্চান্যে নারীণামাশয়াস্ত্রয়ঃ। ধরা গর্ভাশয়ঃ প্রোক্তঃ পিত্তপক্বাশয়ান্তরে। স্তনৌ প্রবৃদ্ধৌ তাবেব বুধৈঃ স্তন্যাশয়ৌ মতৌ। (বাভটঃ)

(৪) তস্যখল্বেবং প্রবৃত্তস্য শুক্রশোণিতস্যাভিপচ্যমানস্য ক্ষীরস্যেব সন্তানিকাঃ সপ্তত্বচোভবন্তি। তাসাংপ্রথমা অবভাষিণী নাম × × দ্বিতীয়া লোহিতা নাম × × তৃতীয়াশ্বেতা × × চতুর্থী তাম্রা × × পঞ্চমী বেদিনী × × ষষ্ঠী রোহিণী × × সপ্তমী মাংসধরা। (সুশ্রুতঃ)

ভারতীয় ইতিহাস

কথায় বলে "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"। এই প্রবাদ-বাক্যের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় আর্য্যগণ সর্ব্বশাস্ত্রের যথোচিত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক ইতিহাসের অভাবে সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; যেমন একমাত্র আলোকের অভাবে সম্মুখে নিপতিত শত শত পদার্থ নয়ন গোচর হয় না, তদ্রূপ একমাত্র ইতিহাসের অভাবে ভারতের প্রাচীনতত্ত্বের যথাযথভাবে উন্মেষ হইতে পারে না। ভারতীয় আর্য্যগণ যে কি কারণে ইতিহাসের প্রতি এতদূর উদাসীন ছিলেন, তাহার বিনিগমনা করা যায় না। অথবা তাঁহারা ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, দুরাত্মা যবনদিগের আক্রমণ কালে তৎসমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, বিক্রমাদিত্যের পুস্তকাগারের অগ্নি এক মাস কাল নির্ব্বাণ হয় নাই। সেই অগ্নিদাহে কত সহস্র সহস্র পুস্তক যে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? আর ইহা প্রবাদ আছে যে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থাবলী বিনষ্ট করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। যবনদিগের ধর্ম্মান্ধতা বা গোঁড়ামি তাহাদিগের নৈতিক ও সামাজিক ভাব সমূহের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল। এই ধর্ম্মান্ধতার ফল অদ্যাপি স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মান্ধতার ফল আর্য্য শাস্ত্রসমূহের অকালে বিনাশ। তৎপরে মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণেও ইংরেজী শিক্ষার গুণে এবং বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাবে অনেকের চরিত্র বিশুদ্ধ ও অনুকরণযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু যখন মুসলমানেরা প্রথম ভারত আক্রমণ করে, তখন তাহাদের দৌরাত্ম্যে ও অত্যাচারে ভারতবাসী হিন্দুরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যবনপ্রতাপের অন্যায় আত্যন্তিক আতিশয্যহেতুক আমাদের স্ত্রীস্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে। মুসলমানদিগের আগমনে ভারতবর্ষের অণুমাত্র উপকার হউক বা না হউক, যথেষ্ট অপকার হইয়াছে। অতএব ইহাদের হইতে আমাদের ইতিহাসসমূহ যে লোপ পাইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। নতুবা যে জাতি অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে ইতিহাস লিখিতে জানিতেন না, একথা যিনিই বলুন না কেন আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। যে জাতির মধ্যে ইতিহাসের লক্ষণ রহিয়াছে, তাঁহারা যে ইতিহাস কি পদার্থ জ্ঞাত ছিলেন না, তাহা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। "ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তঃ" অমরকোষ, এবং "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং উপদেশসমন্বিতং। পূর্ব্ব-

বৃত্তকথাযুক্তং ইতিহাসং প্রচক্ষতে॥" উপপুরাণ সংগ্রহ। ইতিহাস পূর্ব্ববৃত্তান্তের বর্ণনা, ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ থাকিবে। ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত লক্ষণ। কেবল রাজগণের নামাবলী, যুদ্ধ বিগ্রহের উল্লেখ, উপাংশুবধ, প্রকাশ্য হত্যা প্রভৃতিই ইতিহাসের উপাদান নহে। ইহাতে সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতির ছবি অঙ্কিত থাকা আবশ্যক। ইহাতে যাহা দ্বারা পাঠকের উপদেশ লাভ এবং শিক্ষালাভ হয় তাহা নিবদ্ধ করা উচিত। ভারতীয় হিন্দুগণ ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং তদনুসারে কার্য্যও করিয়া গিয়াছিলেন। বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে আমরা ইতিহাস শব্দ দেখিতে পাই এবং ইতিহাস ছিল, এরূপ প্রমাণ পাই। কিন্তু আমাদের দুর্দৈববশতঃ একখানিও ভারতের ইতিহাস অবশিষ্ট নাই। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিকে প্রকৃত ইতিহাস বলা যাইতে পারে না।

এক্ষণে সংস্কৃতাদি ভারতীয় সাহিত্যভাণ্ডার আলোড়ন করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস লেখা যাইতে পারে কি না? ভারতের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক দিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। সার উইলিয়ম জোন্স সাহেবের সময় হইতে এবিষয়ে চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু এতদিনেও কোন সুফল ফলে নাই। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না। তাঁহারা ভারতবর্ষের মহাযুদ্ধ বিগ্রহাদির, রাজগণের রাজত্ব এবং প্রধান ঘটনানিবহের ক্রমিক অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস নিবদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আর তাঁহারা সকল ঘটনার সময় নিরূপণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা পুরাণাদি হইতে রাজবংশ সকলের নৃপতিগণের নামের তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল তালিকার পরস্পর অনৈক্য এবং বৈষম্য দেখিয়া তাঁহারা বিষম বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। রাজগণের নাম ও তালিকা প্রস্তুত হইলেই বা ইতিহাসের কি উপকার হইবে? সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়, মৌর্য্যবংশীয় প্রভৃতি রাজগণের নাম জানিয়া আমাদের কোন লাভ নাই। কেবল নাম ও রাজত্বকাল জানিলে ইতিহাসের কোন উপকার হইল না।

প্রকৃত ইতিহাস জানিতে হইলে জাতীয় উন্নতি এবং ক্রমিক সভ্যতার বৃদ্ধি জানিতে হয়। কোন জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ঐ জাতি প্রথমে কিরূপে সমাজ বন্ধন করিয়াছিল, কিরূপে নিজ অবস্থার উন্নতির সহিত সমাজের সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, কি কি উপায়ে সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল, কিরূপে সমাজের বাল্য, যৌবন এবং প্রৌঢ় অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিল এবং কি প্রকারে মানসিক, নৈতিক, পারমার্থিক ও জাতীয় উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিল। এই সকলই আমরা উহার জাতীয় সাহিত্যে অঙ্কিত দেখিতে পাইব। কোন জাতির ক্রমিক উন্নতি ও বৃদ্ধি উহার জাতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সামাজিক রীতি নীতি ও পদ্ধতি, নৈতিক জীবন, ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মভাব এবং জাতীয় চিন্তা ও সভ্যতার

সম্পূর্ণ বিবরণ জাতীয় সাহিত্য হইতে নিষ্কৃষ্ট করা যাইতে পারে। এই জাতীয় সাহিত্য মধ্যে কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা, কথাগ্রন্থ, দর্শন, বিজ্ঞান, স্মৃতি, গণিত প্রভৃতি সমস্তই নিবেশিত। ভারতীয় সাহিত্য হইতে ভারতের এইরূপ ইতিহাস পরিশ্রম ও প্রযত্ন সহকারে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ভারতের প্রাচীন যে সমুদয় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা আবিষ্কৃত হইতেছে এবং যাহা অচিরাৎ আবিষ্কৃত হইবে, তৎসমুদয় হইতে ভারতের উন্নতি ও সভ্যতার ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারিবে। ভারতের ইতিহাস রচনা করিতে পারেন এরূপ ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে অতি বিরল। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা অশেষ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহাঁরা ভিন্ন আর কাহাকে এতাদৃশ দুরূহ কার্য্য সাধনে সমর্থ দেখিতে পাই না।

ভারতবর্ষে যেসকল দেশ আছে, তন্মধ্যে কাশ্মীর দেশের একখানি এবং গুর্জ্জর দেশের একখানি ইতিহাস আছে। কাশ্মীরের ইতিহাসের নাম রাজতরঙ্গিণী এবং গুর্জ্জরের ইতিহাসের নাম রাসমালা। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং নামে এক খানি ইতিবৃত্ত আছে। ইহা নবদ্বীপ রাজগণের বিবরণ। সম্প্রতি ইহা বাঙ্গালাতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু রাজতরঙ্গিণী বা রাসমালার একখানিও এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। রাজতরঙ্গিণী হইতে নানাবিধ বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রত্যেক সমাজসম্বন্ধীয় বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিপ্লবের, প্রত্যেক ঐতিহাসিক প্রধান ঘটনার ছায়া বা চিহ্ন রাজতরঙ্গিণীর ইতিহাসে লক্ষিত হয়। ইহা হইতে আমরা মহাভারতীয় কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের এবং যুধিষ্ঠিরাদির সময় নিরূপণ করিতে সমর্থ হই। ইহা হইতে আমরা দেখি যে বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে ব্রাহ্মণদিগের সমধিক চেষ্টা হেতু খ্রীষ্টীয় শকের প্রারম্ভেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি কালিদাস ও ভবভূতির সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে। ইহাতে ভারতবর্ষে প্রথম মুসলমান আক্রমণের কথা দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত ইহাতে বিবিধ প্রকার বিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর (২৪৪৮ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দ) হইতে আকবর সাহ কর্ত্তৃক কাশ্মীর জয় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৫৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস লিখিত আছে। ইহা চারিভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ কহ্লণপণ্ডিতকৃত। কহ্লণপণ্ডিত কাশ্মীর দেশীয় মহামাত্য চম্পকপ্রভুর পুত্র এবং ১০৭০ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। এই ভাগে ২৫২৬ পূর্ব্বশকাব্দ হইতে ১০৭০ শকাব্দ পর্য্যন্ত ৩৫৯৬ বৎসরের ইতিহাস নিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় ভাগের নাম রাজাবলি, জোনরাজ রচিত। ইহাতে ১৩৩৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত ইতিবৃত্ত বিবৃত আছে। তৃতীয় ভাগের নাম জোনরাজতরঙ্গিণী, জোনরাজের অন্তেবাসী শ্রীবর পণ্ডিত বিরচিত। ইহাতে ১৩৯৯ শকাব্দ পর্য্যন্ত বিবরণ আছে। চতুর্থভাগের নাম রাজাবলিপিতক, প্রাজ্য-

ভট্টপ্রণীত। ইহাতে কাশ্মীরের ইতিহাস ১৪৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। এই রাজতরঙ্গিণী ফ্রান্সদেশের রাজধানী পারীসনগরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ট্রয়ার সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ট্রয়ার সাহেব কেবল কতকগুলি স্থলে ফরাসী ভাষায় টীকা লিখিয়াছেন, ইহার অনুবাদ করেন নাই। তদবধি কেহই ইহার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। সংপ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত ইহার প্রথম সপ্তম তরঙ্গের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া সাধারণের মহৎ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদের জন্য তিনি ইংরেজিভাষাভিজ্ঞ ভারতের প্রত্নকম্রদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এরূপ গ্রন্থের বঙ্গভাষায় প্রচার একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া আমরা ক্রমশঃ আমাদের পাঠকবর্গকে ইহার অনুবাদ এবং আবশ্যক স্থলগুলির উদ্ধার ও সমালোচনা উপহার দিতে ব্রতী হইলাম। যেসকল স্থল ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত সম্বদ্ধ তাহার সবিশেষ সমালোচনা করিব।

রাজতরঙ্গিণী।

প্রথম তরঙ্গ।

যাঁহার প্রসাদে সকল প্রকার কামনা পূর্ণ হয়, সেই কল্পবৃক্ষ স্বরূপ মহাদেবকে আমি বন্দনা করি। সেই সুকবিকেও বন্দনা করি যিনি স্বগুণ প্রভাবে নিজের এবং অপরের যশঃশরীরের স্থিরতা সম্পাদন করেন। রমণীয় রচনানিপুণ কবি এবং প্রজাপতি ভিন্ন আর কে অতীত কালকে প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শন করিতে পারেন? কবি যদি নিজ প্রতিভাশক্তির দ্বারা সকল বিষয় না দর্শন করেন, তবে তাঁহার দিব্যদৃষ্টির আর কি প্রমাণ আছে? সেই গুণবান্ পুরুষই শ্লাঘনীয়, যাঁহার কোন বিষয়ে অন্ধ অনুরাগ বা দ্বেষ নাই এবং সত্যকথনে যাঁহার বাক্ সর্ব্বদা স্থির। যদ্যপি আমি কথাদৈর্ঘ্যভয়ে এই গ্রন্থ বিচিত্রভাবে প্রপঞ্চিত করি নাই, তথাপি ইহাতে সজ্জনদিগের মনোরঞ্জন অনেক বিষয় আছে। পূর্ব্ব গ্রন্থকারগণ যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি পুনর্ব্বার সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি, অতএব প্রয়োজন শ্রব না করিয়া সজ্জনদিগের আমার প্রতি বিমুখ হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্ব গ্রন্থকারগণ যাহা নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী গ্রন্থকর্ত্তারা তাহাতে অযথাভাবে হস্তক্ষেপ ও তাহার বিকৃতি-সাধন করিয়াছেন। সুতরাং তৎসমুদায় গ্রন্থ হইতে সত্যবিবরণ নিষ্কৃষ্ট করিতে বিশেষ দক্ষতা আবশ্যক। রাজকথা বিষয়ক বহুসংখ্যক গ্রন্থ আলোচনা করিয়া সুব্রতনামক জনৈক লেখক সংক্ষেপে তাহাদের সারসংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাঁর রচনা প্রাঞ্জল এবং মধুর নহে। ইনি লোকের স্মরণার্থ বহুবিধ নষ্ট গ্রন্থের সংক্ষেপ করিয়াছেন। তৎপরে ক্ষেমেন্দ্র নামে আর একজন কবি নৃপাবলী নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সুকবি হইলেও অনবধানতা দোষে ইহাঁর পুস্তকে কোন অংশই নির্দোষ হয় নাই। তদনন্তর নীলমুনিনামা কোন একজন গ্রন্থকার রাজ বিবরণ লিখিয়াছিলেন। আমি এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। আমি সর্ব্বশুদ্ধ একাদশ

খানি রাজকথাশ্রিত্ত গ্রন্থ দেখিয়াছি এবং অনেক সত্যবিবরণ, দানপত্র, প্রতিষ্ঠাপত্র, শাসনপত্র, তাম্রশাসন প্রভৃতি সমালোচনা করিয়া বহুবিধ ভ্রম সংশোধন করিয়াছি। ধর্ম্মভ্রষ্টতা নিবন্ধন ৫২ জন নৃপতির কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তন্মধ্যে নীলমুনি গোনর্দ্দ প্রভৃতি চারিজনের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাব্রতশীল হেলারাজ দ্বাদশ সহস্র গ্রন্থ হইতে যে পার্থিবগণের বৃত্তান্ত পার্থিবাবলি গ্রন্থে সংকলন করিয়াছিলেন, তদনুসারে পদ্মমিহির অশোক-নৃপতির পূর্ব্ববর্ত্তী লবপ্রভৃতি অষ্টনৃপতির নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার শ্রীচ্ছবিল্লাকর নামক অপর এক জন গ্রন্থকার বলেন যে, অশোক হইতে অভিমন্যু পর্য্যন্ত পাঁচজন নৃপতির নামমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় আমি সত্য ইতিহাস লিখিতে বিশেষ যত্ন করিব। যথার্থ কথা দ্বারা রাজগণের গৌরবই হউক অথবা লাঘবই হউক আমি যথার্থ বিবরণ বিবৃত করিব। প্রাচীন নানাপ্রকার রীতি, নীতি, ও পদ্ধতি, নানাবিধ ব্যবহারপ্রণালী ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় আমার এই গ্রন্থ হইতে সকলে জানিতে পারিবেন। এরূপ বিষয় কাহার না তৃপ্তি জনক হইবে? অতএব আমি রাজতরঙ্গিণীতে প্রকৃত ঘটনা, যথার্থ বিবরণ প্রভৃতি বিবৃত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব। সতীসর কল্পের আরম্ভ হইতে ছয় মন্বন্তরকাল পৃথিবী জলপ্লাবিত ছিল। অনন্তর বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের আদিতে মুনিবর কশ্যপ দেবগণের সাহায্যে পৃথিবী জলমধ্য হইতে উদ্ধার ও কাশ্মীর প্রদেশের সৃষ্টি* করিলেন। (১) সর্ব্বনাগাধীশ্বর নীলরাজ ইহা পালন করিয়াছিলেন। গরুড়ের ভয়ে নাগগণ এই প্রদেশের আশ্রয় গ্রহণ এবং নীলকে আপনাদিগের রাজা করেন। ইহাঁর রাজ্যকালে কাশ্মীর অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল এবং নানারত্ন-বিশিষ্ট কুবেরপুরীর ন্যায় শোভা পাইত। তৎপরে বহুকাল কাশ্মীর দেশের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

কাশ্মীরদেশের বিবিধ পাবনক্ষেত্র, দেবনিকেতন প্রভৃতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। প্রথমতঃ; মহাদেবের কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহাঁর দর্শনে সর্ব্বপাপ নাশ ও মুক্তি লাভ হয়। ইহাঁর স্পর্শমাত্র মহাপাপীও উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ; কোন এক জলশূন্য গিরি হইতে সন্ধ্যাকালে জল স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহা পুণ্যশীল ব্যক্তিরাই দেখিতে পান, পাপীরা দেখিতে পায় না। ইহা অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড। তৃতীয়তঃ; ভূগর্ভ হইতে অগ্নি স্বয়ং এক স্থানে উত্থিত হইয়াছেন এবং নিজ শিখাসমূহদ্বারা হোমকারিদিগের আহুতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ; ভেড়গিরির শৃঙ্গে গঙ্গার উৎপত্তি হেতুক অতি পবিত্র এক স্থলে সরোবরমধ্যে হংসরূপিণী সরস্বতীদেবী স্বয়ং দৃষ্ট হয়েন। পঞ্চমতঃ; দেবগণের বাসদ্বারা পবিত্র নন্দিক্ষেত্রে অদ্যাপি দেবগণের অর্পিত পূজার

(১) অতি পূর্ব্বকালে এই স্থানের নাম সতীসর ছিল। পরে কশ্যপ নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই স্থানে বাস করান। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম কাশ্মীর হইয়াছে।

চন্দনবিন্দুসকল স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা সকলে অতি ভক্তি ও আগ্রহের সহিত দর্শন করিয়া থাকেন। ষষ্ঠতঃ; যেখানে সারদাদেবীকে সন্দর্শন করিয়া দর্শকেরা মধুর কবিজনযোগ্য বাক্য লাভ করেন এবং আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন। সপ্তমতঃ; এই দেশে চক্রভৃৎ, বিজয়েশ, আদিকেশব এবং ঈশান দেবের প্রতিষ্ঠা আছে এবং ইহার সর্ব্বত্রই প্রায় দেবনিকেতন বিরাজমান রহিয়াছে। এই প্রদেশবাসিদিগের বহিঃশত্রু হইতে কোন আশঙ্কা নাই। সকলেই কেবল পরলোকের জন্য ভীত, অন্য কোন ভয়হেতু নাই। সকলেই পুণ্যশীল, সদাচারতৎপর এবং পরহিতনিরত। এই দেশে শীতকালে উষ্ণস্নানগৃহ এবং গ্রীষ্মে শীতল নদীতীর প্রজাদিগের অতি সুখসেব্য স্থান। ইহার নদী সমূহে (১) কোন উপদ্রব নাই, কোন ভীষণ জলজন্তুর ভয় নাই। এখানে নিদাঘকালে সূর্য্যদেব তীব্রতাপ প্রদান করেন না, যেহেতু নিজজনক কশ্যপ মুনি ইহার নির্ম্মাতা। উন্নত বিদ্যালয়, মনোহর কুঙ্কুম, তুষারশীতল জল, এবং রমণীয় দ্রাক্ষাফল এস্থানে সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। ত্রৈলোক্যে উত্তরদিক্ সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় ও শ্লাঘ্য, উত্তরদিকে হিমালয়শৈল অতি প্রসিদ্ধ এবং তাহার সন্নিহিত কাশ্মীরমণ্ডল সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান।

কাশ্মীর দেশের প্রথম নৃপতির নাম গোনর্দ (২)। ইনি কলিযুগের সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি ইন্দ্রপ্রস্থাধীশ্বর পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা ছিলেন। কাশ্মীরেন্দ্র গোনর্দের সুশাসনে প্রজাবর্গ নিরতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছিল। পৃথিবী বাসুকির ফণা বিষভয়ে ত্যাগ করিয়া গোনর্দনৃপতির ভুজদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মগধেশ্বর জরাসন্ধ ইহাঁর বন্ধু ছিলেন। তিনি ইহাঁর সাহায্যে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কংসারি কৃষ্ণের রাজধানী মথুরানগরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। গোনর্দনৃপতি কালিন্দীনদীর উপকূলে স্কন্ধাবার নিবেশিত করিয়া নিজ যোধসমূহের যশের সহিত যাদবীস্ত্রীগণের হাস্য মিশ্রিত করিয়াছিলেন। একদা ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সৈন্য রণে পরাজিত ও বিতাড়িত করিলেন। তখন লাঙ্গলধ্বজ বলরাম স্বসৈন্যরক্ষার্থ উদ্যত হইয়া বিপক্ষসেনাকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। জয়শ্রী কাহাকে বরণ কবিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার একপক্ষের জয় এবং পরক্ষণেই অন্যপক্ষের জয় হইতে লাগিল। অবশেষে কাশ্মীররাজ ভূতলশায়ী এবং বলরাম বিজয়ী হইলেন। এইরূপে

(১) কাশ্মীরের মধ্যে বিতস্তাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। ইহাকে কাশ্মীরে বেত ও পঞ্জাবে ঝেলম বলে। গণ্ডকী, সাঁদ্রণ কিশো, ত্রিঙ্গি, আরপতি, রম্ভিয়ারা, রোমশি, দুগ্ধগঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল নানা ঝরণা হইতে উৎপন্ন হইয়া বিতস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। গণ্ডকী নদীতে বহুসংখ্যক শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিন্ধু, হরমুকুটগঙ্গা, অমরাবতী প্রভৃতি আরও নদী আছে।

(২) কেহ কেহ ইহাকে গুনন্দ, কেহবা গোনন্দ বলেন।

সুক্ষত্রিয় গোনর্দরাজ বীরসুলভ গতি প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র দামোদর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কাশ্মীর শাসন করিতে লাগিলেন।

প্রথম গোনর্দনৃপতি হইতে দ্বাপঞ্চাশৎ জন রাজার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে পঞ্চত্রিংশ জনের নামও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দ্বাপঞ্চাশৎ নরপতি ১২৬৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে রাজগণের ইতিহাস আছে। ইহাঁরা ২৩৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি লৌকিক (কাশ্মীর দেশীয়) অব্দের চতুর্বিংশতি এবং শকাব্দের ১০৭০ বৎসর অতীত হইয়াছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল শতবৎসরে এক নক্ষত্র হইতে আর এক নক্ষত্রে গমন করেন, জ্যোতিষ সংহিতাকারেরা এইরূপ গণনাদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন। পাণ্ডব যুধিষ্ঠির যখন রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিলেন, এবং এই ঘটনা শককাল আরম্ভ হইবার ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। (১) কেহ কেহ বলেন যে, ভারত-যুদ্ধ দ্বাপরযুগের অন্তে হইয়াছিল এবং এই মত দ্বারা বিমোহিত হইয়া গোনর্দ প্রভৃতির কালসংখ্যা মিথ্যা বলিয়া নির্দেশ করেন।

(১) কহ্লণ পণ্ডিত যখন বর্ত্তমান ছিলেন, তখন শককালের ১০৭০ এবং কাশ্মীর দেশীয় অব্দের ২৪বৎসর অতীত হইয়াছিল। এক্ষণে শককালের ১৮০১ অব্দ গত হইয়াছে। অতএব কহ্লণ পণ্ডিত (১৮০২—১০৭০) ৭৩২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ (১৮৮০—৭৩২) ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তখন কাশ্মীর দেশীয় কোন শকাব্দের ২৪ বৎসর অতীত হইয়াছিল। কাশ্মীর দেশীয় সাল প্রথম গোনর্দের রাজত্বের ২৮ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম গোনর্দ হইতে ৫২ জন রাজার রাজ্যকাল ১২৬৬ বৎসর এবং তৃতীয় গোনর্দ হইতে কহ্লণ পণ্ডিতের সময় পর্য্যন্ত ২৩৩০ বৎসর। সুতরাং প্রথম গোনর্দের সময় হইতে কহ্লণের সময় পর্য্যন্ত ১২৬৬+২৩৩০=৩৫৯৬ বৎসর। কহ্লণ বর্ত্তমান বৎসরের ৭৩২ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। এক্ষণে কলিকালের ৪৯৮১ বৎসর গত হইয়াছে। কলিযুগ যখন চলিতেছে, তখন এ সাল মিথ্যা হইতে পারে না। চলিত সাল কখন মিথ্যা নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া বৌদ্ধশাক সত্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। অতএব কহ্লণপণ্ডিত কলিযুগের ৪২৪৯ বৎসরে বর্ত্তমান ছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার ৩৫৯৬ বৎসর পূর্ব্বতন। সুতরাং যুধিষ্ঠির কলিযুগের ৪২-৪৯—৩৫৯৬=৬৫৩ বৎসরে বর্ত্তমান ছিলেন এবং উপরেও তাহাই লিখিত আছে। অতএব বর্ত্তমান বৎসর হইতে যুধিষ্ঠির ৪৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। সুতরাং ৪৩২৮—১৮-৮০=২৪৪৮ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আর যুধিষ্ঠিরের জন্ম শককাল আরম্ভ হইবার ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। এক্ষণে ১৮০২ শক। সুতরাং যুধিষ্ঠির ১৮০২+২৫-২৬=৪৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৪৪৮ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার একসহস্র বৎসর কম বলেন।

কিন্তু গোনর্দ প্রভৃতি রাজগণ যত বৎসর রাজ্য করিয়া ছিলেন, তাহার সমষ্টি করিয়া কলিযুগের অতীত কাল হইতে ঐ সমষ্টির বিয়োগ করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গোনর্দ প্রভৃতি ৫২ জন নৃপতির রাজ্য কাল ১২৬৬ বৎসর এবং তৃতীয় গোনর্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত ২৩৩০। এই দুইটি কালসংখ্যার সমষ্টি করিলে ৩৫৯৬ বৎ কেহ বা তদপেক্ষা অধিক কম বলেন। কোন কোন বাঙ্গালিও এই সকল ইউরোপীয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিদিগের মত অভ্রান্ত মনে করিয়া তাহাই স্বীকার করেন। কেহ বা রদেবের জন্ম শককালের ২৫। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল না বুঝিতে পারিয়া, যুধিষ্ঠিরকে বর্ত্তমান সময় হইতে ২৫। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৪৬ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে ফেলেন। তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না যে, কহ্লণপণ্ডিত বর্ত্তমান বৎসরের লোক নহেন, কিন্তু ৭৩২ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এইটুকু সংশোধন করিয়া আর একদল বলেন যে, যুধিষ্ঠির ৭৩২+৬৪৬=১৩৭৮ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সমস্ত বিষম ভ্রমসঙ্কুল মত সমালোচনা করিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব হইয়া পড়ে। তাহা আমরা অন্যত্র সমালোচনা করিব। আমরা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম যে, পণ্ডিতবর সিভিলিয়ান শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত সে দিন কলিকাতা রিভিউ নামক সমালোচক পত্রে কাশ্মীরের ইতিহাস সমালোচনা স্থলে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক রাজার রাজ্যকাল ১৬ বৎসর ধরিয়াছেন। অথচ কহ্লণ পণ্ডিত স্পষ্টাক্ষরে সেই সকল সর হয়। ইহার সহিত ৬৫৩ বৎসর যোগ করিলে ৪২৪৯ বৎসর হয় এবং এক্ষণে কলিযুগেরও ৪২৪৯ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

গোনর্দ প্রভৃতি দ্বাপঞ্চাশৎ জন নৃপতির বিশেষ কোন বৃত্তান্ত দুর্লভ। যাঁহাদের আশ্রয়ে পৃথিবী অকুতোভয়া ছিলেন, যাঁহারা হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া রাজ্যের উপ-রাজগণের রাজ্যকাল পৃথক্ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। রমেশ বাবু কতক স্থলে কহ্লণ পণ্ডিতকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং যেখানে তাঁহার রুচি-হয় নাই, সেখানে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এরূপ ব্যবহার অতীব অন্যায্য। যদি কহ্লণপণ্ডিত একস্থলে অগ্রাহ্য হয়েন, তবে তিনি অন্যস্থলে গ্রাহ্য হইতে পারেন না। যাহা হউক এবিষয়ে আমাদের আর অধিক বক্তব্য নাই; যাঁহার যেরূপ রুচি তিনি সেইরূপ করিবেন। আমরা এস্থলে রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই গুলি অত্যাবশ্যক এবং বিসংবাদিত বিষয়সংক্রান্ত বলিয়া আমরা ইহাদের উদ্ধার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥৫১
লৌকিকেহব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাং-
প্রতম্।
সপ্তত্যাত্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥৫২
প্রায়স্তৃতীয়গোনর্দাৎ আরভ্য শরদাং তদা।
দ্বে সহস্রে গতে ত্রিংশদধিকং চ শতত্রয়ং॥৫৩
বর্ষাণাং দ্বাদশশতী ষষ্টিঃ ষড়্ভিশ্চ সংযুতা।

কারার্থ কতই কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের গৃহে যুবতিগণ অহশ্চন্দ্রিকার ন্যায় বাস করিতেন, তাঁহাদের কোন বৃত্তান্তই আমরা জানিতে পারি না, যেহেতু কোন কবি কোন ইতিহাসে তাঁহাদের চরিত বর্ণনা করেন নাই। তাঁহারা কুকার্য্যে রত ছিলেন, এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন সুতরাং কবিগণ তাঁহাদের যশোবর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। এই জন্য কবিগণ তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত স্মরণ করেন নাই। অতএব তাদৃশ ৩৫ নরপতির কোন বৃত্তান্ত দূরে থাকুক, নামপর্য্যন্ত আমরা জানিতে পারি নাই।

প্রথম গোনর্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দামোদর রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। যদ্যপি তিনি সমৃদ্ধরাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি সুস্থির হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন এবং কি প্রকারে তাঁহার প্রতিশোধ দিবেন তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে তিনি শুনিলেন যে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী (১) গান্ধার দেশে রাজকন্যাদিগের স্বয়ম্বর সভাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। এই সমাচার শ্রবণ ক-

ভূভুজাং কালসংখ্যায়াং তৎ দ্বাপঞ্চাশতো ৫৪

ঋক্ষাৎ ঋক্ষং শতেনাব্দৈঃ যাৎসু চিত্রশিখণ্ডিষু।

উচ্চারে সংহিতাকারৈঃ এবং দত্তোত্র নির্ণয়ঃ ।। ৫৫

আসন্ মথাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।

ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য ।।৫৬

ভারতং দ্বাপরান্তেঽভূৎ বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।

কেচিদেতাং মৃষা তেষাং কালসংখ্যাং প্রচক্রিরে ।। ৪৯

লব্ধাধিপত্যসংখ্যানাং বর্ষান্ সংখ্যায় ভূভুজাং।

ভুক্তাৎ কালাৎ কলেঃ শেষে নাস্ত্যেব তদ্বিবর্জিতাৎ ।। ৫০

আমরা ইতিপূর্ব্বে কলিযুগের বর্ত্তমান সাল নির্দেশ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা নিরূপণ করিবার উপায় বলিতেছি। শকাব্দতে ৩১৭৯ যোগ করিলে কলিযুগাব্দ নিরূপিত হয়। "শাকেষু নবশৈলেন্দুরামযোগে কলেগতাঃ"। এক্ষণে শকাব্দ ১৮০২। ১৮০২ সংখ্যার সহিত ৩১৭৯ সংখ্যা যোগ করিলে ৪৯৮১ হয়। ইহাই কলিযুগের গতাব্দ। অতএব এক্ষণে কলিযুগের ৪৯৮২ অব্দ চলিতেছে।

(১) এবিষয়ে অন্যবিধ বৃত্তান্ত দেখা যায়। তন্মতে ইহাঁর সিংহাসনে আরোহণের অল্পদিনপরে কান্দাহাররাজকন্যার স্বয়ম্বর সমাচার চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয় এই কন্যার পাণিগ্রহণার্থ নানাদেশীয় রাজপুত্রগণ কান্দাহারে আসিতে আরম্ভ করেন। রাজা দামোদর ভাবিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ এসভাতে অবশ্যই উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহাকে তথায় সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত তিনি সসৈন্যে কান্দাহারে গমন করেন। নববিভাকরের যে সংবাদদাতা কাশ্মীরের বিবরণ লিখিতেছেন তিনি ইহা বিবৃত করিয়াছেন।

রিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বসৈন্যসমভিব্যাহারে গান্ধার দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া স্বয়ংবর-সভার নানাপ্রকার বিঘ্ন সাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমরে চক্রাঘাতে নিহত হইলেন। তাঁহার পত্নী যশোবতী অন্তর্বত্নী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত এবং সিংহাসনে আরূঢ় করাইলেন। কিন্তু হিংসাপরবশ সচিবগণ এই কার্য্যের প্রতিবাদ করাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন যে কাশ্মীর-দেশীয় রাজা মহাদেবের অংশ-সম্ভূত এবং কাশ্মীর দেশীয় স্ত্রীগণ পার্ব্বতীর অংশজাত। যে ব্যক্তি কল্যাণ কামনা করেন তিনি কাশ্মীরের রাজাকে অবজ্ঞা করিবেন না, যদিও রাজা দুষ্ট হয়েন। (১) তিনি আর বলিলেন যে, পুরুষ স্ত্রীলোককে গৌরবের চক্ষুতে না দেখিতে পারেন, কিন্তু প্রজারা যশোবতীকে তাহাদের মাতা এবং দেবতা বলিয়া সম্মান করিবে। অনন্তর দশমাস পূর্ণ হইলে রাজ্ঞী দিব্যলক্ষণসম্পন্ন নির্দ্দগ্ধবংশের অঙ্কুর স্বরূপ এক সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। এই নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা যথাবিধি সম্পাদিত হইল। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইনি দ্বিতীয় গোনর্দ্দনামে ইহাঁর পিতামহের নামানুসারে বিখ্যাত হইলেন। ইহাঁর প্রতিপালনের নিমিত্ত দুইজন ধাত্রী নিযুক্ত হইল। ধাত্রী দ্বয়ের মধ্যে একজন ইহাঁকে দুগ্ধপান করাইত এবং অপরজন অন্যসমস্ত কার্য্য করিত। এই বালক ভূপতি যাহার প্রতি ঈষৎ হাস্য করিতেন, ইহাঁর মন্ত্রিগণ তাহাকে ধন দান করিতেন। যখন মন্ত্রিগণ ইহাঁর অর্দ্ধোচ্চারিত কথা বুঝিতে না পারিয়া কোন কার্য্য সম্পাদনে বিরত থাকিতেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিতেন। তাঁহারা এই বালনৃপতিকে সিংহাসনে বসাইতেন, কিন্তু ইহাঁর লম্বমান পাদদ্বয় সিংহাসনের পাদপীঠ স্পর্শ করিত না। তাঁহারা ইহাঁকে সিংহাসনে বসাইয়া চামর ব্যজন করিতেন এবং যখন ইহাঁর কাকপক্ষ চামর বায়ুবশে ইতস্ততঃ চালিত হইত, তৎকালে প্রজাদিগের অভিযোগ শ্রবণ ও বিবাদ মীমাংসা করিতেন। ইহাঁর রাজ্যকালে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ উপস্থিত হয় কিন্তু ইনি শিশু বলিয়া কোন পক্ষই ইহাঁকে সাহায্যার্থ আহ্বান করে নাই। (২) ইহাঁর পর পঞ্চত্রিংশ জন নৃপতির কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়

(১) কাশ্মীরাঃ পার্ব্বতী তত্র রাজা জ্ঞেয়ো হরাংশজঃ।
নাবজ্ঞেয়ঃ স দুষ্টোপি বিদুষা ভূতিমিচ্ছতা ॥৭২

এই পৌরাণিক শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন।

(২) প্রথম গোনর্দের সময়ে কুরুপাণ্ডবেরা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম গোনর্দ এবং দামোদর উভয়ে অকালে সমরশায়ী হয়েন। দ্বিতীয় গোনর্দ দামোদরের পুত্র। ইনি কুরুক্ষেত্রসমরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। মহাভারত হইতে জানা যায় যে যুধিষ্ঠিরের প্রায় নবতিবৎসর বয়ঃক্রমকালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটে। অতএব গোনর্দ, দামোদর, যশোবতী ও গোনর্দ নবতিবৎসর রাজ্য করেন।

না। তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট ছিলেন বলিয়া বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইয়াছেন; কেহই তাঁহাদের কোন বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখে নাই। (মতান্তরে ২৫ জন নৃপতির বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।)

তদনন্তর লব নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি পৃথিবীর ভূষণ এবং জয়লক্ষ্মীর প্রীতিপাত্র ছিলেন। ইহাঁর সেনাকলকল শব্দে প্রজাবর্গ নিদ্রা যাইতে পারিত না, কিন্তু শত্রুরা দীর্ঘনিদ্রায় নিমগ্ন হইত। ইনি (১) লোলোর নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নগরে চৌরাশী লক্ষ প্রস্তর নির্ম্মিত বাটী ছিল। এই মহাভুজ নৃপতি ব্রাহ্মণদিগকে লেদরী নামক স্থানস্থিত লেবার নামক গ্রাম দান করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র কুশ রাজত্ব করেন। ইনি অতি সুন্দর এবং প্রতাপশালী ছিলেন। ইনি কুরুহার নামক গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। ইহাঁর পুত্র খগেন্দ্র ইহাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসন অধিকার করেন। খগেন্দ্র রাজা তাঁহার রিপুনাগকুল নির্ম্মূল করিয়া নিজ শৌর্য্য বীর্য্য প্রখ্যাত করেন। তিনি খাগি (এক্ষণে খান) এবং খুনমুষ (এখন খমু) নামে দুই প্রধান গ্রাম স্থাপিত করেন। তাঁহার পর-লোক গমনানন্তর তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র রাজা হয়েন। ইনি আশ্চর্য্যবিক্রম, অমূল্যস্বভাব এবং শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। ইনি দেবেন্দ্রের তুল্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং দরদ্ দেশের সমীপে সোরকাখ্য (এক্ষণে সুরন্) পত্তন ও তথায় নরেন্দ্র ভবনাভিধ সৌধ নির্ম্মাণ করেন। ইনি নিজ রাজ্যে সৌরস নামক একটি উৎকৃষ্ট বিহার নির্ম্মাণ করিয়া অখণ্ড যশোভাজন হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র নৃপতি নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার লোকান্তে অন্যকুলজাত গোধর নামে জনৈক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কাশ্মীর দেশ পালন করেন। তিনি হস্তিশালা নামক অগ্রহার (গ্রাম) ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া সুকৃতলাভ করেন। ইহাঁর পুত্র সুবর্ণ তৎপরে রাজ্য শাসন করেন। তিনি অর্থিদিগকে যথোচিত সুবর্ণ দান করিতেন এবং করালাখ্য প্রদেশে (আড়ভিন পরগণায়) সুবর্ণমণি (সোনামন) নামে এককুল্যা (খাল) খনন করাইয়া দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। তৎসুনু জনক নিজ প্রজাবর্গকে অপত্যনির্বিশেষে পালন করত স্বীয় জনক নাম সার্থক করিয়াছিলেন। জনক নরপতি বিহার এবং জালোর নামক (এখন জোলুর) গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদাত্মজ শচীনর স্বরাজ্য শচীপতির ন্যায় শাসন করিতে লাগিলেন এবং নিজ ক্ষমাশীলতাগুণে প্রজাদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই ভূপাল ইন্দ্রের সহিত অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং শমাঙ্গ ও সাশনার (২) নামে অগ্রহার দ্বয়ের স্থাপন

(১) কাশ্মীর পদাবলীতে অদ্যাবধি ইহার নাম শ্রবণ করা যায়। ইহাঁর নির্ম্মিত নগরকে এক্ষণে লোলাব বলে। (নং বিং)

(২) এক্ষণে সঙ্গম ও শার নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক নাম গুলি আমরা নববিভাকরের সংবাদদাতার পত্র হইতে গ্রহণ

করিয়াছিলেন। ইনি অপুত্র ছিলেন। ই-করিলাম। ইনি গোনর্দকে গুণন্দ বলিয়াছেন। কোনটী যথার্থ নাম তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। হাঁর পরে শকুনির প্রপৌত্র এবং ইহাঁর প্রপিতৃব্যের বংশধর অশোক নামা সত্যসন্ধ রাজা কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করেন।

(ক্রমশঃ)

মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ

(২১৮ পৃষ্ঠার পর।)

চতুর্থ অধ্যায়।

ওয়ার্দ্দানের সপ্ততি সহস্র সৈন্য মধ্যে অধিকাংশ অশিক্ষিত এবং নূতন সংগৃহীত ছিল; কিন্তু তাহাদের বসন ভূষণে আড়ম্বরের ত্রুটি ছিল না। স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদিখচিত পট্টগৃহ এবং সুসজ্জিত অস্ত্রশস্ত্রে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া বিবাহসজ্জার চাকচিক্য প্রদর্শন করিত, সেনারাজী বলিয়া বোধ হইত না। সম্রাট-প্রেরিত ঈদৃশ সৈন্যগণ জয়োন্মত্ত মুশলমান হস্তে পরাস্ত হইবে আশ্চর্য্য কি?

ওয়ার্দ্দান শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে একদা চতুর্দ্দিকে মেঘমালার ন্যায় ধূলিরাশি উড্ডীন দেখিয়া চমকিত হইলেন। খালেদ চতুর্দ্দিকস্থ মুশলমান সেনানায়কগণকে আপন আপন সৈন্য সহ উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন; কোন অনির্ব্বচনীয় দৈবশক্তি ক্রমেই যেন সেই সমস্ত সৈন্যদল যুগপৎ উপস্থিত হইয়া রণতূর্য্যে বিপক্ষগণকে কম্পিত করিয়া তুলিল।

মুশলমানগণ সম্রাট শিবিরের অবস্থা ও সৈন্যবল দেখিয়া প্রথমে নিতান্ত ভীত হইয়াছিল। কিন্তু খালেদ বলিলেন "বিপক্ষগণের এই শেষ উদ্যম; যদি এই সৈন্য একবার পরাজিত করিতে পারি তবে তাহারা আর বল সংগ্রহ করিতে পারিবে না; বিধর্ম্মীগণের সমগ্র সীরিয়া রাজ্য আমাদের হইবে"। সকলে উৎসাহিত হইল।

সমস্ত রজনী উভয় সৈন্য এক স্থানে অতিবাহন করিলে পর প্রভাতে পরস্পর সম্মুখীন হইল। খালেদ বলিলেন, "কে সৈন্যগণের সংখ্যা নিরূপণ এবং অবস্থান পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিবে?"

তেজস্বী দিরার দণ্ডায়মান হইলেন। খালেদ বলিলেন "যাও; ঈশ্বর তোমার সহায় হউন। কিন্তু অকারণে আক্রমণ অথবা আপন জীবন বিপন্ন করিও না।"

ওয়ার্দ্দান দেখিলেন একজন অশ্বারোহী তাঁহার শিবিরের সম্মুখীন হইয়া সৈন্যগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। তখন তিনি ত্রিশজন অশ্বারোহী তাহাকে নিহত কর-

পার্থে পাঠাইয়া দিলেন। দিরার সে অবস্থা দেখিয়া আপন শিবিরাভিমুখে বেগে অশ্ব চালাইলেন। বিপক্ষগণ অনুসরণ করিল। যখন দেখিলেন তাহারা অনেক দূরে আসিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, তখন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বল্লমদ্বারা একে একে সতরজনকে নিহত করিলে অবশিষ্ট তেরজন ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তিনি নিরাপদে শিবিরে পঁহুছিলেন। খালেদ তাঁহাকে তাঁহার আদেশলঙ্ঘন ও দুঃসাহস জন্য ভৎ‍সনা করিলে দিরার বলিলেন "আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাদে প্রবৃত্ত হই নাই। তাহারা আমাকে আক্রমণ করিল; আমার ভয় হইল আমি তাহাদিগকে পৃষ্ঠ দেখাইলে ঈশ্বর তাহা দেখিবেন। তিনিই আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। যদি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবে এ আশঙ্কা না থাকিত তবে একটি প্রাণীও ফিরিয়া যাইতে পারিত না।"

দিরারের নিকট বিপক্ষের বল অবগত হইয়া খালেদ আপন সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। দক্ষিণপার্শ্বে মিদ্ এবং সোমান্, বাম পার্শ্বে ওয়াকাস্ এবং সার্জ্জাবিল নিয়োজিত হইলেন। মধ্যস্থলে আমরু, আবদুলরহমান দিরার, কেইস্, রফি প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বীরগণ সহ স্বয়ং দণ্ডায়মান হইলেন। পশ্চাদ্ভাগে শিবির সামগ্রী এবং পরিবার রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্বারোহী সহ আবু সোফিয়ান নিযুক্ত রহিলেন।

এইযুদ্ধে কেবল পুরুষগণ অস্ত্রধারণ করিলেন, এমন নহে; কৌলা এবং ওফীরা তাঁহাদিগের সঙ্গিনীগণ সহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। উচ্চ কুলোদ্ভবা এই সমস্ত ললনাগণ একবার কৃতকার্য্য হওয়াতে বিলক্ষণ উৎসাহিতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা বীরবৃন্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। খালেদ তাঁহাদিগের তাদৃশ সাহস দর্শনে পুলকিত হইয়া বলিলেন "এই যুদ্ধে যাঁহাদিগের পতন হইবে, স্বর্গের দ্বার তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে।' তিনি ললনাগণকে দুইদলে বিভক্ত করিয়া এক দলের সেনাপত্যে কৌলাকে এবং অপর দলের সেনাপত্যে ওফীরাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন 'আপনারা মাত্র আত্মরক্ষা করিয়াই বিরত রহিবেন না, আমার সৈন্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। যখন দেখিবেন কোন মুশলমান পলায়ন করিতেছে, তখন সেই হতভাগা বিশ্বাস ঘাতক বিধর্ম্মীকে তৎক্ষণাৎ যমনসদনে প্রেরণ করিবেন; অনন্তর অশ্বারোহণে আপন সৈন্য শ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন পূর্ব্বক বলিতেলাগিলেন, 'আজ তোমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, নতুবা তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধন, সম্পত্তি, সম্মান, এবং ধর্ম্ম সমস্তই বিপন্ন হইবে। একবার পরাজিত হইলে পলায়নেরও স্থান রহিবে না।'

উভয়দলে যুদ্ধনাদ হইল। খৃষ্টিয়ানগণ 'খৃষ্ট এবং তাঁহার ধর্ম্ম' এবং মুশলমানগণ 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লা' (ঈশ্বর একজন, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত) ধ্বনিতে রণভূমি কম্পিত করিয়া তুলিল।'

যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে খৃষ্টিয়ানশিবির হইতে একজন বৃদ্ধ ধার্ম্মিক লোক মুশলমানশিবিরে আগমন পূর্ব্বক খালেদ্‌কে বলিলেন

'আপনি কি সেনাপতি?' খালেদ্ বলিলেন 'ঈশ্বর, কোরাণ, এবং মহম্মদের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিলে আমি এইরূপই বিবেচিত হইব।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'আপনি এবং আপনকার সৈন্যগণ বিনা কারণে এই খৃষ্টিয়ানভূমি আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। নিশ্চয় জয়লাভ হইবে এরূপ মনে করিবেন না। ইতঃপূর্ব্বে যাহারা এই ভূমি আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা জয়লাভের পরিবর্ত্তে সমাধিক্ষেত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আমাদের সৈন্যের দিকে চাহিয়া দেখুন। সংখ্যায় তাহারা অনেক অধিক; হয় ত আপনার সৈন্যগণ অপেক্ষা সুশিক্ষিত। তবে আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? পরিণামে হয়ত পরাজিত হইবেন, এবং নিশ্চয়ই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইবে। প্রস্থান করুন; যে বিপদ অন্যেতর পক্ষে পতিত হইবে তাহা হইতে দূরে থাকুন। যদি তাহাতে সম্মত হন, তবে আপনার প্রত্যেক সৈন্যকে একটি পোষাক, এক শিরস্ত্রাণ এবং এক একটি স্বর্ণমুদ্রা; আপনাকে দশটি রেশমের পোষাক, শত সুবর্ণ; এবং আপনার খলিফাকে শত পরিচ্ছদ এবং সহস্র সুবর্ণ প্রদানে অঙ্গীকার করিতে আমি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি।'

খালেদ ব্যঙ্গের সহিত বলিলেন 'যে শীঘ্র সমস্ত প্রাপ্ত হইবে, আপনি তাহাকে তাহার অংশ মাত্র দিতে চাহিতেছেন। আমার তিনটিমাত্র প্রস্তাব, যেটি ইচ্ছা অবলম্বন করিতে পারেন;—মুশলমানধর্ম্ম অবলম্বন, করদান, নচেৎ তরবারির সম্মুখীন হওয়া।"

এই নীরস উত্তরে বৃদ্ধ দুঃখিতমনে খৃষ্টিয়ান শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

খালেদ এবার বিলক্ষণ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। সৈন্যগণকে হঠাৎ অগ্রসর হইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন, শত্রুগণ সংখ্যায় দ্বিগুণ, ধৈর্য্যের সহিত তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত রাত্রি না হয়, আমরা যুদ্ধদানে বিরত থাকিব। মহম্মদ জয়লাভ পক্ষে প্রদোষসময় সর্ব্বাপেক্ষা শুভক্ষণ বিবেচনায় তখন যুদ্ধ কার্য্য আরম্ভ করিতেন।

বিপক্ষগণ আর্ম্মানীয় তীরন্দাজগণকে পুরোভাগে স্থাপন করিল। তাহাদের তীক্ষ্ণশায়কে অনেক মুশলমান হত ও আহত হইল। তথাপি খালেদ্ আদেশ করিলেন একজনও যেন অগ্রসর না হয়। পরিশেষে পরাক্রান্ত দিরার বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আপন অশ্বারোহীগণকে সবেগে তীরন্দাজগণের দিকে চালিত করিলেন। তাহারা পরাজয়োন্মুখ হইয়াছে এমন সময় তাহাদের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য আসিল। দিরারও নূতন বল লাভ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিশেষে বিজয়লক্ষ্মী মুশলমানদিগের প্রতিই প্রসন্না হইলেন।

যুদ্ধে উভয়পক্ষের সৈন্যগণ মিলিত হইলে দুই পক্ষের ভাগ্য পরীক্ষিত হইবে এমন সময় সম্রাটের শিবির হইতে একজন অশ্বারোহী দ্রুত অশ্বচালন পূর্ব্বক মুশলমানশিবিরে প্রবেশ করিল এবং বলিল, 'নিবৃত্ত হও; আমি দূত, কিছুকালের জন্য সন্ধির প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি।' খালেদ্ অশ্ব

থামাইলেন, বল্লম রাখিয়া দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন 'যে জন্য আসিয়াছ শীঘ্র বল, মিথ্যা বলিও না।'

সে বলিল, 'আমি ধ্রুব সত্যই বলিব। যদিও বলা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়, জানা আপনার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রথমতঃ আমার এবং আমার পরিবারের আশ্রয় প্রদান ও জীবন রক্ষা করিবেন অঙ্গীকার করুন।'

খালেদ অঙ্গীকার করিলেন। দূত বলিল 'আমার নাম ডেবিড্। ওয়ার্দ্দান বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে যুদ্ধ ক্ষান্ত হয়, এবং বীরশোণিত বৃথা ব্যয় না হয়। কল্য প্রত্যুষে আপনি তাঁহার সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিবেন, উভয় সৈন্য সমদূরে অবস্থান করিবে, কিন্তু দৃষ্টিপথে রহিবে। এই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। কিন্তু খালেদ! সাবধান। বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য ঘটিবে। যে স্থানে আলাপ হইবে তাহার অনতিদূরে রজনীতে দশজন অস্ত্রধারী মনোনীত সৈন্য লুক্কায়িত থাকিবে। তাহারা অসতর্ক অবস্থায় আপনাকে হত বা বন্দী করিবে।'

অনন্তর ডেবিড্, যে স্থানে সাক্ষাৎ হইবে সে স্থানের বিষয় ও অন্যান্য অবস্থা বিবৃত করিতে লাগিল। খালেদ বলিলেন, 'ক্ষান্ত হও। ওয়ার্দ্দানকে বলিও আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত আছি।'

জয়লাভ হইবে, এমন সময়ে সৈন্যগণ প্রতি নিবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইয়া চমৎকৃত হইল। আবু ওবিদা ও দিরার খালদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এরূপ আদেশের অর্থ কি?' খালেদ সকল ঘটনা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, 'আমি নিযোজিত স্থানে গমন করিব। আমি একাকীই ষড়যন্ত্রকারী গণের শিরশ্ছেদ করিয়া লইয়া আসিব।' আবু ওবিদা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'অনর্থক বিপন্ন হওয়ার প্রয়োজন কি? আপনি দশজন সঙ্গে লইয়া যাউন, সংখ্যায় সমান হইবে।' দিরার বলিলেন, 'বিশ্বাসঘাতক দিগের দণ্ডবিধান করিতে বিলম্ব কেন? আমাকে দশজন লোক সঙ্গে দিউন্ এখনই তাহাদিগকে প্রতিফল দিয়া আসি।'

দিরার সেনাপতির আদেশ ক্রমে যে স্থানে বিপক্ষ দশজন লুক্কায়িত থাকিবার কথা ছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। সমীপস্থ হইলে সঙ্গীয়গণকে রাখিয়া দিরার এক উলঙ্গ তরবারিহস্তে একাকী সেই স্থানে গমন করিলেন। দেখিলেন দশজন বিপক্ষ গাঢ়নিদ্রিত। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র উপাধান স্বরূপ রহিয়াছে। তখন তিনি সঙ্গীয়গণকে সাবধানে নিকটস্থ হইতে সঙ্কেত করিয়া এক একজনে এক একজনের মস্তকে তরবারির আঘাত করাতে একদা সকল বিপক্ষ শমন সদনে গমন করিল। তাহারা মৃত ব্যক্তি গণের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রজনী প্রভাত হইতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রজনীর তিমিরাবরণ বিদূরিত হইল, সূর্য্যদেব উদয় হইলেন। সেনাপতি দ্বয় মিলিত হইলে সন্ধির প্রস্তাব হইবে উভয় পক্ষ তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ওয়ার্দ্দান একটি শ্বেতবর্ণ অশ্বতর আরোহণ পূর্ব্বক বাহির হইলেন। তাঁহার স্বর্ণ রৌ-

প্যাদির কারুকার্য্য খচিত পরিচ্ছদ এবং শরীরস্থ বহুমূল্য প্রস্তর সকল সূর্য্যরশ্মিতে সুরঞ্জিত করিতে লাগিল। খালেদ পীতবর্ণ পট্টবস্ত্রে এবং সবুজবর্ণ শিরস্ত্রাণে সজ্জিত হইলেন। যে স্থানে সৈন্য দশজন লুক্কায়িত ছিল ওয়ার্দ্দান কৌশল পূর্ব্বক তাহার সমীপস্থ স্থানে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আলাপ করিতে অধিক সময় লাগিল না। উভয়ের মনে আপন লুক্কায়িত অনুচর গণের বিষয় উদয় হওয়াতে উভয়েই অহঙ্কার এবং সাহস সূচক উচ্চৈঃশব্দে অল্প সময়ে সন্ধির প্রস্তাব শেষ করিলেন, একে অপরকে করতলস্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ওয়ার্দ্দান বলিলেন, 'মুশলমানগণ লুণ্ঠনব্যবসায়ী, দরিদ্রব্যক্তি। তাহারা বিপক্ষের বেশে উর্ব্বরা রাজ্য সমূহে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত রাজ্য মরুভূমি করিয়া ফেলে। আমরা ঐশ্বর্য্যশালী, আমরা শান্তির অন্বেষণ করি। তোমাদের অভাব মোচনে এবং অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করিতে কি চাও বল?'

খালেদ বলিলেন, 'হতভাগ্য নাস্তিক! আমরা দরিদ্র নই, তোমাদের নিকট সাহায্যও প্রার্থনা করি না। আমাদের যাহা আবশ্যক ঈশ্বর তাহা দিতেছেন। যাহার সমগ্রই আমাদের, তুমি তাহার এক অংশমাত্র দিতে চাও। পরমেশ্বর তোমাদের এবং তোমাদের স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের যত কিছু আছে তাহার সমস্তই আমাদিগের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছেন। তুমি সন্ধির প্রার্থনা করিতেছ? আমাদের নিয়ম আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হয়ত, স্বীকার কর, ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত, অথবা আমরা যে কর নির্দ্ধারণ করি তাহা দিতে সম্মত হও। অস্বীকার করিতেছ? তবে আমাকে এখানে আহ্বান করিলে কেন? আমাদের নিয়ম কল্যই জানাইয়াছি, এবং তোমার সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছি। তবে কি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলে? তাহাই হউক, অস্ত্রে আমাদের সমস্ত তর্ক মিমাংসা করুক।'

এই বলিয়া খালেদ দণ্ডায়মান হইলেন। ওয়ার্দ্দানও দাঁড়াইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাইবেন ভরসায় অসি নিষ্কোষিত করিলেন না। খালেদ তাঁহার কণ্ঠদেশ দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলে ওয়ার্দ্দান লুক্কায়িত সৈন্যদিগকে তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে আহ্বান করিলেন। লুক্কায়িত ছদ্মবেশী মুশলমানগণ বাহির হইলে ওয়ার্দ্দান তাহাদিগকে আপন সৈন্য জ্ঞানে আশ্বস্ত হইলেন। তাহারা নিকটস্থ হইলে তাঁহার ভ্রম তিরোহিত হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহার পুত্র-হন্তা দিরার, শাণিত তরবারিহস্তে অগ্রসর হইতেছেন। 'দয়া করুন্' 'দয়া করুন্' এই বলিয়া ওয়ার্দ্দান খালেদের নিকট বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং আপনার স্থাপিত জালে লূতার ন্যায় আপনিই বদ্ধ হইলেন দেখিয়া নিতান্ত অপ্রতিভ রহিলেন।

খালেদ বলিলেন, 'বিশ্বাস ঘাতকের প্রতি দয়া নাই। তুমি মুখে সন্ধির প্রস্তাব, হৃদয়ে নর হত্যার ষড়যন্ত্র লইয়া আমার সমীপস্থ হইয়াছ, তোমার পাপের প্রতিফল তোমার মস্তকে পতিত হউক।'

এইকথা বলিবামাত্র দুর্দ্দান্ত দিরারের তরবারির এক আঘাতে ওয়ার্দ্দানের মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিল। শোণিত-সিক্ত মস্তক উন্নত করিয়া দেখাইলে খৃষ্টীয়ান সৈন্যগণ খালেদের মস্তক জ্ঞানে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, ছদ্মবেশী মুসলমানদিগকে আপন সৈন্য মনে করিল। কিন্তু এ ভ্রম অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না। খালেদ বিপক্ষগণের সেই বিশৃঙ্খল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, আক্রমণ জন্য রণবাদ্য বাদন করিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর যথারীতি যুদ্ধের পরিবর্ত্তে ভীষণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। সম্রাটের সৈন্যগণ সিসেরিয়া, ডামাস্কস্, আণ্টিয়ক প্রভৃতি স্থানে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অপরিমিত লুণ্ঠন দ্রব্য মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য প্রস্তর, পট্টবস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র নানাপ্রকার পরিচ্ছদে শিবির পূর্ণ হইল। সেনাপতি খালেদ আদেশ করিলেন ডামাস্কস্ অবরোধ করার পূর্ব্বে এসমস্ত বিভাগ হইবে না।

খলিফার প্রিয়তম পুত্র আবদুল্ রহমান্ বিজয়ের এই শুভসংবাদ লইয়া মদীনায় তাঁহার নিকট গমন করিলেন। শুনিবা মাত্র আবুবেকার ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক ধন্যবাদ দিলেন। অল্প সময়ে এই সংবাদ সমস্ত আরবদেশে ঘোষিত হইল। সকল স্থান, বিশেষতঃ মক্কা হইতে বহু সংখ্যক সৈন্য মদীনায় আসিতে লাগিল। সকলেই এই ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদিতে উৎসুক হইল। কারণ যুদ্ধে জয় এবং অর্থ উভয়ই লাভ হইতেছিল।

উদার চরিত্র আবুবেকার তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ওমার বলিলেন "এখন আমাদের জয়লাভ হইয়াছে দেখিয়া ইহারা আমাদের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন আমরা দুর্ব্বল ও বহুসংখ্যক ছিলাম, ইহারা আমাদের বিনাশসাধনে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। ইহারা ধর্ম্মের জন্য লালায়িত নহে, কিন্তু সীরিয়ার সমৃদ্ধ স্থান সকল লুণ্ঠন করিতে, এবং ডামাস্কসের লুণ্ঠন দ্রব্যের অংশ লইতে লোলুপ হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদিগকে পাঠাইলে, বিবাদও আত্ম কলহ হইবে। সেখানে যাহারা আছে তাহারাই আরব্ধকার্য্য সমাপন করিতে পারিবে। তাহারা শ্রমলাভ করিয়াছে, এক্ষণে তাহার ফললাভ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।"

তাঁহার উপদেশানুসারে আবুবেকার প্রার্থিগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। মক্কাবাসিগণ, বিশেষতঃ কোরিশ জাতীয়গণ এই আদেশ প্রতিবাদ করণার্থ প্রবল একদল প্রতিনিধি পাঠাইল। তাহারা বলিল 'আমরা আমাদের ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিব, তাহাতে অনুমোদিত না হইব কেন? এ কথা সত্য যে অজ্ঞানতমসাবৃত সময়ে মহম্মদের অনুচরের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম; তখন আমাদের ধারণাছিল যে, আমরা তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিতাম। তিনি এক্ষণে আমাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করাতে আমরা সে ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। শোণিত সম্পর্কে আমরা স্বগণ, আমাদের ধর্ম্মও এক বটে। সুতরাং ধর্ম্মযুদ্ধে আমাদের পরস্পরের প্রতি বি

ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগদানে অধিকার আছে। আমরা অগ্রসর হই।”

খলিফার হৃদয় আর্দ্র হইল। তিনি ওমারের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অভিপ্রায় করিলেন যে, কোরিশ জাতীয়গণ যুদ্ধে যোগ দান করিতে পারিবে। তিনি খালেদকে বিজয়লাভ-জন্য অভিনন্দন পূর্ব্বক এই পত্র লিখিলেন যে, একদল সৈন্য আবুসোফিয়ান কর্ত্তৃক নীত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। এই পত্র মহম্মদের মোহরযুক্ত করিয়া আপনার বীরপুত্র আবদুল্ রহমানের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন।

এইজনাদিনের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়িত সৈন্যগণ,সম্রাটের সৈন্যগণের পরাজয় এবং সাহায্য প্রাপ্তির শেষ আশার মূলোচ্ছেদ, এই শোচনীয় সংবাদ ডামাস্কস্ নগরীতে লইয়া গেল। নগরবাসিগণ ভয়ে বিহ্বল হইলেও সেই ভীষণ ঝটিকা নিবারণ জন্য প্রাণপণে প্রস্তুত হইতে লাগিল। পলায়িত সৈন্যগণ সংখ্যায় ন্যূন ছিল না। এইরূপে অনেক সহস্র কার্য্যক্ষম লোক নগরীতে প্রবেশ করাতে অনেক সাহস হইল। তাড়াতাড়ি রক্ষণোপযোগী দুর্গসংস্কার আরম্ভ হইল। বল্লম ও প্রস্তর নিক্ষেপ করণার্থ যন্ত্রসকল প্রাচীরোপরি সন্নিবেশিত হইল। দক্ষ ইহুদিগণ ঐ সমস্ত যন্ত্রপরিচালনে নিয়োজিত রহিল।

নগরবাসিগণ প্রস্তুত হইতেছিল, ইতিমধ্যে দেখিতে পাইল যে দূরবর্ত্তী নিকুঞ্জরাজি হইতে দলে দলে মুসলমান অশ্ব বাহির হইতেছে, পদাতিগণ সুদীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উদ্যানসমূহে প্রবেশ করিতেছে। মুসলমানসৈন্য এইভাবে আসিতে লাগিল। আমরু নয় সহস্র অশ্বারোহী সহ সর্ব্বাগ্রে আগমন করিলেন। কোরিশ জাতীয় দুই সহস্র অশ্বারোহী সহ আবুসোফিয়ান আসিয়া মিলিত হইলেন। তদনন্তর ওমার ইবিন্ রাবিয়া ঐরূপ একদল লইয়া আসিলেন। আবুওবিদা মূলসৈন্যসহকারে তৎপর আগত হইলেন। সর্ব্বশেষে খালেদ্ কৃষ্ণবর্ণ বাজপক্ষিসজ্জিত পতাকাসহ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সকলকে উৎসাহিত করিলেন।

অনন্তর খালেদ্ সেনানায়কদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক যাহার তাহার কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। দক্ষিণ তোরণসমীপে আবুসোফিয়ান, সেণ্ট টমাস্ তোরণে সার্জ্জাবিল, ‘স্বর্গতোরণে’ আমরু, কৈশান তোরণে কৈস্ ইবিন্ হোবীরা নিযুক্ত রহিলেন। আবুওবিদা জাবিয়া তোরণ হইতে কিয়দ্দূর অবস্থান পূর্ব্বক অতি সাবধানে থাকিতে, এবং সর্ব্বদা আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। খালেদ তাঁহার সরল ও সদয় স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন, এই জন্যই সতর্ক করিয়াছিলেন। খালেদ স্বয়ং পতাকাসহ পূর্ব্বতোরণে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দক্ষিণ দিকে সেণ্টমার্কের তোরণ অবশিষ্ট রহিল; সেখানে বিপক্ষ সৈন্য দণ্ডায়মান হইবার সুবিধা ছিল না, এজন্য ঐ তোরণের নাম ‘শান্তিতোরণ’ ছিল। ভীষণ দিরার দুই সহস্র অশ্বারীসহ নগরের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন সৈন্য মধ্যে কোন দল হঠাৎ আক্রান্ত বা বিপন্ন না হইতে পারে, এবং নগরী মধ্যে খাদ্য বস্তু বা নূতন সৈন্যবল প্রবেশ করিতে নাপারে

তজ্জন্য সতর্ক থাকিতে আদিষ্ট হইলেন। খালেদ তাঁহাকে বলিলেন, 'যদি তুমিই আক্রান্ত হও, আমাকে সংবাদ দিও, আমি তোমার সাহায্যার্থ যাইব।' দিরার পূর্ব্ব ভর্ৎসনা স্মরণ পূর্ব্বক বলিলেন, 'আপনি না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি কি যুদ্ধদানে বিরত থাকিব?' খালেদ বলিলেন, 'তাহা নহে, সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিও। নিশ্চয় জানিও আমি তোমাকে ছাড়িয়া রহিব না।' অবশিষ্ট সৈন্য পদব্রজে গমন পূর্ব্বক নগর অবরোধ করিল।

এই সময়ে মুসলমান সৈন্য যেরূপ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইল পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। বারবার যুদ্ধে জয়লাভ করাতে প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধসজ্জা তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল। তথাপি বিলাসীর ন্যায় আহার অথবা বসন ভূষণে আদর না করিয়া, প্রাচীন আরবীয়গণের ন্যায়, মীতব্যয়ে আপন প্রয়োজন সাধন করিত। সেনানায়ক আবুওবিদাও উষ্ট্ররোমনির্ম্মিত বস্ত্রগৃহে বাস এবং আরবীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে লাগিলেন; যুদ্ধে খৃষ্টিয়ান সেনাপতিগণের যে সমস্ত বহুমূল্য পট্টগৃহ ও পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপ্রতি তাঁহার লোভ সঞ্চার হইল না। প্রকৃত যোদ্ধৃবেশ এবং ধর্ম্মাবলম্বী বীরগণ, বিলাস-কর-লালিত জাতি সকলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, সে অপ্রতিহত গতি কে নিবারণ করিবে?

মুসলমানগণের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হইল। প্রাচীরের সন্নিধানে যে সমস্ত যন্ত্র সন্নিবেশিত ছিল, তাহা হইতে প্রস্তর এবং সহস্র সহস্র বল্লম নিক্ষিপ্ত হইয়া মুসলমান সৈন্যের অনেককে হত এবং আহত করিল। দুর্গবাসী একদল সৈন্য একবার বাহির হইয়া আক্রমণ করিতেও সাহসী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অনেকে হত হইল দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য পুনরায় দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। মুসলমানগণ অব্যাহত অবিশ্রান্ত ভাবে আক্রমণ করিয়া রহিল দেখিয়া দুর্গবাসী প্রধান পুরুষগণ সকলে সমবেত হইল। তাহারা "এই সময় আত্মসমর্পণ করিলে অনেক অনুকূল নিয়মে সন্ধি হইতে পারে, অতএব আত্মসমর্পণ কর্ত্তব্য কি না?" এই বিষয় মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

এই সময়ে সম্রাট্ হিরাক্লিয়সের জামাতা টমাস্ নামে একজন সম্ভ্রান্ত গ্রীক্ ডামাস্কস্ নগরীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার অসীম সাহস এবং প্রগাঢ় বুদ্ধির জন্য সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিত, এবং অতিশয় সম্মান করিত। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আক্রমণকারী মুসলমানগণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাহারা অসভ্য, উলঙ্গ এবং সামান্যভাবে সজ্জিত। তাহাদের সৈন্যগণ তাদৃশ শিক্ষিত নহে। তাহারা ধর্ম্মোন্মত্ত; বেগে আক্রমণ পূর্ব্বক সাধারণের মনে ভীতি উৎপাদন করে, মাত্র সেই জন্য কৃতকার্য্য হয়। তোমরা ভীত হইও না, সাহস অবলম্বন কর, আমরা অবশ্য জয়লাভ করিব।" কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার এই সারগর্ভ বক্তৃতা ফলোপধায়িনী হইল না, তখন তিনি স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক পরদিন দুর্গ হইতে বাহির হইবেন, স্বীকার করিলেন। সৈন্যগণ সম্মত হইল।

রজনীতে শত শত আলোক দুর্গমধ্যে প্রজ্বলিত দেখিয়া থালেদ্ বুঝিতে পারিলেন, বিপক্ষগণ একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইতেছে। তিনি আপন সৈন্যগণকে সতর্ক থাকিতে আদেশ দিয়া বলিলেন," কেহ নিদ্রিত থাকিও না, সমাধিস্থলে নিদ্রার জন্য প্রচুর সময় রহিয়াছে; যে বিশ্রামের পর আর পরিশ্রম করিতে হইবে না, পরিণামে সে সুখের বিশ্রাম সকলের জন্যই আছে। এখন কাজের সময় ঘুমাইও না।"

এই শেষ সময়ে খৃষ্টীয়ানগণ ধর্ম্মশীলতা দেখাইল। ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মযাজকগণ সমভিব্যাহারে বহির্গমনদ্বারসমীপে সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নূতন ধর্ম্মপুস্তক স্থাপন পূর্ব্বক 'ক্রস্' উত্তোলন করিলেন। যখন টমাস্ তোরণপথে বহির্গত হন, তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মপুস্তকে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "হে ঈশ্বর! যদি আমাদের ধর্ম্ম সত্য হয়, আমাদিগকে সাহায্য করিও, বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিও না।'

মুসলমানগণ সতর্ক ছিল। বিপক্ষ সৈন্য বাহির হইতেছে দেখিয়া তাহারা বেগে আক্রমণ করিল। কিন্তু প্রাচীরোপরি যেসমস্ত সৈন্য দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা যুগপৎ আক্রমণ করাতে মুসলমানগণ পশ্চাৎপাদ হইতে বাধ্য হইল। টমাস্ সাহস পূর্ব্বক আপন সৈন্যগণকে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর করিলেন। ভীষণ সংগ্রাম হইল। তিনি প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ ছিলেন। বাছিয়া বাছিয়া মুসলমান সেনানীগণের প্রতি শর লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে সমরাঙ্গনশায়ী করিতে লাগিলেন। এবান্ ইবিন্ জেইদ্ নামক একজন মুসলমান সেনানায়কের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। টমাসের বিষাক্ত শায়কে আহত হইয়া শিবিরে নীত হইলে হিমিয়ারবংশসম্ভূতা তাহার নববিবাহিতা রণরঙ্গিণী রূপবতী ললনা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামী সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পঁহুছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাহার স্বামীর জীবন দেহ-বহির্গত হইয়াছিল। তিনি বিলাপ বা এক বিন্দু অশ্রুপাতও করিলেন না; স্বামীর মৃতদেহোপরি মস্তক আনত করিয়া বলিলেন, " প্রিয়তম! আপনিই সুখী। আপনি ঈশ্বরের সমীপস্থ হইলেন। তিনি আমাদের বিয়োগ ঘটাইবার জন্যই আমাদিগকে মিলিত করিয়াছিলেন! কিন্তু আমি এ হত্যার প্রতিশোধ লইব। তদনন্তর স্বর্গে আপনার সহিত মিলিত হইব। আর কেহ আমাকে স্পর্শ করিতেও পারিবে না; আমি ঈশ্বরের নিকট আমাকে উৎসর্গ করিলাম।"

অনন্তর স্বামীর তীর ও ধনু লইয়া তিনি সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি শুনিলেন টমাস্ তাঁহার স্বামিহন্তা, সুতরাং তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। টমাস্ যেখানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে যাইতে যাইতে এবান্পত্নী একটি শায়ক নিক্ষেপ করিলেন। পতাকাধারীর দক্ষিণহস্তে সেই তীর বিদ্ধ হওয়াতে পতাকা ভূতলে পতিত হইল। মুসলমানগণ বেগে উপস্থিত হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত পতাকা উঠাইয়া লইল। একের পর অন্যের হস্তে, এইরূপে পতাকা

সার্জ্জাবিলের হস্তগত হইল। টমাস্ মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় সেই দিকে ধাবমান হইয়া পতাকা উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এবান্-পত্নীর করনিক্ষিপ্ত শায়ক টমাসের চক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অবসন্ন করিল। তাঁহার সৈন্যগণ পতাকা রক্ষার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সাহায্যে ধাবমান হইল। তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিবিরে নীত হইলে সকলে তাহার আহত চক্ষুটি বাঁধিয়া দিল। টমাস্ পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে নাগরিকগণ তাঁহাকে নিবারণ করিল। তিনি নগর-তোরণে অবস্থান এবং যুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ প্রাচীর সমীপস্থ হইতে সমর্থ হইলনা, ইহুদিদিগের যন্ত্রনিক্ষিপ্ত প্রস্তর ও বর্শা ফলকে তাহাদিগকে দূরে রাখিতে লাগিল। রজনী আগত হইলে রণক্লান্ত সৈন্যগণ বিরত হইল। মুসলমানগণ অনাবৃত মৃত্তিকার গায় নিদ্রায় নিদ্রিত রহিল।

টমাস্ দেখিলেন দুর্গস্থ সৈন্যগণ সেদিনের যুদ্ধে বিলক্ষণ উৎসাহিত এবং সাহসী হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সেই সাহস পরিপোষণে যাত্নিক হইলেন। স্থির হইল যে প্রভাতে দুর্গস্থ সৈন্যগণ যুগপৎ সমস্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করিবে। তদনুসারে প্রত্যুষ সময়ে একটি ঘণ্টাধ্বনি হইবা মাত্র খৃষ্টীয়ানসৈন্যগণ আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত ধাতব স্রোতের ন্যায় তোরণ পথ সমূহে বাহির হইয়া পড়িল।

এরূপ গোপনে এই আয়োজন হইয়াছিল যে, অবরোধকারিগণ একবারে চমৎকৃত ও বিহ্বল হইল। মুসলমানগণ তূর্য্যধ্বনিতে জাগরিত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিল, কিন্তু দাঁড়াইতেও অবসর পাইল না, বিপক্ষগণ আক্রমণ পূর্ব্বক হত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধের স্থলে হত্যাকাণ্ড মাত্র চলিল। খালেদ্ সেই সমস্ত মৃত শরীর অবলোকন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্ গদ্ বচনে বলিলেন, "হে অনিদ্র পরমেশ্বর! তোমার অনুগত ভৃত্যদিগকে সাহায্য কর, তাহারা যেন এই নাস্তিকগণের হস্তে নিহত না হয়;" এবং স্বয়ং চারিশত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে যেখানে যখন অধিক সাহায্যের প্রয়োজন সেই খানেই উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

যে তোরণ হইতে টমাস্ বাহির হন, তাহার সন্নিধানে ভীষণ সংগ্রাম হইতেছিল। সার্জ্জাবিল সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অপরিসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সন্নিধানে দণ্ডায়মানা ইবান্পত্নীর শায়ক-বিদ্ধ শত শত বিপক্ষ চিরদিনের জন্য শয়ন করিতে ছিল। যখন তাঁহার একটিমাত্র শায়ক অবশিষ্ট ছিল, তখন একজন সাহসী গ্রীক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তৎক্ষণাৎ তাহার কণ্ঠদেশ সেই শেষ শায়কে বিদ্ধ হইল, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। ললনা নিরস্ত্র অবস্থায় ধৃত ও বন্দী হইলেন।

তখন সার্জ্জাবিলের সহিত টমাসের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সার্জ্জাবিলের তরবারি ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি হত, বা

বন্দী হইবেন, এমন সময়ে খালেদ এবং আবদুল রহমান্ অশ্বারোহিগণ সহ উপস্থিত হওয়াতে টমাস্ দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লই-লেন। সার্জ্জাবিল এবং বিধবা বীরাঙ্গনা উদ্ধার হইলেন।

জেবিয়া তোরণ পথে যাহারা বাহির হইয়াছিল, তাহাদের পরিণাম নিতান্ত শোচনীয়। নিরীহ প্রকৃতি আবুওবিদা নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রিত ছিলেন, তিনি আক্রমণের বিষয় কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। গোলযোগ শ্রবণ মাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রাভাতিক উপাসনা যথানিয়মে নির্ব্বাহ করিলেন। অনন্তর একদা মনোনীত সৈন্য কর্তৃক বিপক্ষগণকে বেষ্টন পূর্ব্বক আর এক দল সৈন্য বিপক্ষ ও নগর প্রাচীর উভয়ের মধ্য স্থলে স্থাপন করিলেন। গ্রীকগণ দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইলেও থার্ম্মপলির যুদ্ধের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। কিন্তু আবুওবিদার আক্রমণকৌশলে সকলেই নিহত হইল, একটি প্রাণীও জীবিত রহিল না।

সেই রজনীতেও দিবসের ন্যায় ভীষণ সংগ্রাম হইল। খৃষ্টীয়ানগণ চারিদিক হইতে পরাজিত হইয়া পুনরায় দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে তোরণ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিল। কিন্তু ইহাদিগের প্রস্তরাঘাতে দূরে রহিল, তখন দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীব্র—

রাজপুতানার ইতিবৃত্ত।

(সপ্তম সংখ্যা, ৩৯৪ পৃষ্ঠার পর।)

১১। প্রতিহার বা পরিহার—ইহারা কখনই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইতে পারে নাই। দিল্লির তুয়ার এবং আজমীরের চোহানদিগের সৈন্য সামন্ত মধ্যেই প্রায় ইহাদিগকে দেখা গিয়াছে। একবার ইহাদিগের রাজা নাহর রাও স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত পৃথিরাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই পরিহার-পুরাবৃত্তের সমুজ্জ্বল অংশ মাত্র। যদিও এ ব্যাপারে নাহরসিংহ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। মন্দওয়ার প্রতিহারদিগের রাজধানী, রাঠোরদিগের আক্রমণ ও উপনিবেশ সংস্থাপনের পূর্ব্বে উহা মাড়োয়ারের প্রধান নগর ছিল। রাঠোর রাজকুমারেরা কান্যকুব্জ হইতে পলায়ন করিয়া মাড়োয়ারে পরিহারদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। রাঠোর-ইতিহাস প্রসিদ্ধ চণ্ড বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পরিহারদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া মন্দওয়ারের সিংহাসন অধিকার

করে। প্রতিহারেরা মিবারেশ্বরদিগের দ্বারা বিলক্ষণ হতবল হইয়াছিল। তাহারা উহাদিগের রাণা উপাধি পর্য্যন্ত আহরণ করে। রাজস্থানের নানা স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; এখন আর ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। ইহারা দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে ইন্দো ও সিন্ধিল সর্ব্বপ্রধান। লুনী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে এই উভয় শাখাই দৃষ্ট হয়।

১২। চাওরা—ইহারা কোন্ মূলবংশ হইতে উৎপন্ন তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। অনেকে বিবেচনা করেন, অতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কতকগুলি সিথিয়া দেশস্থ লোক আসিয়া বাস করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা ভারতীয় জাতি সমূহের সহিত এরূপ মিশ্রিত হইয়া যায়, যে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করা সুকঠিন। চাওরা বংশ শিথীয় হইতে সমুদ্ভূত। পরে ইহাদিগের সহিত সূর্য্যবংশীয়দিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ পর্য্যন্ত হইয়া যাওয়ায় ক্রমে ক্রমে ইহারা ছত্রিশরাজকুল মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রের উপকূলে দেববন্দরনামক রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক ইহারা বহুকাল তৎপ্রদেশে প্রভুত্ব করিয়াছে। শুনাযায় যে জগদ্বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির ইহাদিগেরই প্রতিষ্ঠিত। ইহারা সূর্য্যোপাসক *। একদা সাগরবারি বৃদ্ধি পাইয়া দেববন্দর নগর বিধৌত হইয়া যায় †। বেন নামক চাওরা রাজ ৭৪৬ খৃঃ অব্দে অহ্নলবর পত্তন নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় রাজত্ব করেন। তদ্বংশীয়েরা ১৮৪ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ভোজরাজের জীবনাবসানে এখানে শোলাঙ্কিদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। গজনীপতি মামুদ সৌরাষ্ট্র প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক শোলাঙ্কিরাজকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া চাওরা বংশীয় পূর্ব্বাধিকারীদের মধ্যে দাবীনামক এক ব্যক্তিকে অহ্নলের সিংহাসন অর্পণ করেন। খোমানরসপাঠে অবগতি হয়, মুসলমানদিগের প্রথম আক্রমণ হইতে চিতোর রক্ষার জন্য যে যে দলপতি সসৈন্যে সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চাওরারাজ চতুংশী উপস্থিত ছিলেন।

১৩। তাক্ বা তক্ষক—ইহারাও এখানকার উপনিবেশিত জাতি। ইহারা প্রথ-

* টড সাহেব এই জাতির নাম এইরূপে লিখিয়াছেন,—Chawura বা Chaura. ইহাকে বাঙ্গালা করিতে হইলে না না প্রকার উচ্চারণ হইয়া পড়ে,—চাওরা, চৌবুরা, চাউরা, চওরা, চৌর ইত্যাদি। আমরা এই শেষোক্ত নামে ইহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। ইহারা সৌর অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসক; দাক্ষিণাত্য ও মধ্য প্রদেশের অনেক স্থানে স স্থানে চ উচ্চারণ করিয়া থাকে; সেই কারণে সৌর হইতে চৌর হইয়াছে বলিয়া বিলক্ষণ বিশ্বাস হয়। সৌরাষ্ট্রে ক্রমান্বয়ে দেববন্দর ও অহ্নলবর এই দুইটি নগরও ইহাদের দ্বারা সংস্থাপিত; আমাদের বোধ হয় ইহাদের প্রাদুর্ভাব বশতঃ উক্ত প্রদেশের নামও সৌরাষ্ট্র হইয়াছে।

† এরূপ প্রবাদ যে, যে সকল ব্যবসায়ী ব্যক্তি সৌরাষ্ট্র উপকূলে আগমন করিত, দেববন্দর-পতি তাহাদিগের তরণী লুণ্ঠন করিতেন। সমুদ্র স্বীয়বক্ষে সম্পাদিত পাপের দণ্ড বিধানের জন্য নগর ধ্বংস করে।

মস্তঃ হিমালয় প্রদেশে বাস করে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া ছত্রিশ রাজকুল মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন্ আদি-পুরুষ হইতে এই বংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ভারতবর্ষীয় রাজকুল পরিচয়ে এই মাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শেষ নামক এক ব্যক্তি হিমালয়-প্রদেশ * হইতে আগমন করিয়া অনুসঙ্গ প্রদেশের সিংহাসন অধিকার করেন। সেই শেষ হইতেই মধ্য ভারতবর্ষে তক্ষক † বা নাগবংশের বিস্তার হইয়াছে। এই বংশে সুপ্রতিষ্ঠিত বীর ও নীতিবিশারদ রাজাপালগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাদিগের দ্বারা ভারতে অনেক গণনীয় কার্য্য হইয়া গিয়াছে। অসীরগড়ের তক্ষকপতি পৃথুরাজের একজন প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। তক্ষশিল নগরী ইহাদিগের দ্বারাই সংস্থাপিত এবং তত্রত্য রাজা বীরাগ্রগণ্য সেকেন্দর সাহের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৪। জিঠ—প্রাচীন রাজাবলী মাত্রেই প্রায় ইহারা ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহাদিগকে রাজপুত বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং রাজপুতদিগের সহিত কখন বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হইতেও দেখা যায় নাই। অনেকে বিবেচনা করেন ইহারাও হিমালয়ের উত্তর দেশবিশেষ হইতে এখানে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য উপনিবেশিত জাতির ন্যায় রাজপুতগণের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইতে পারে নাই। ইহাদিগের প্রথম উন্নতির পর ইহারা একেবারে অবনত হইয়া সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল। তৎপরে যখন অম্বরের সিংহাসনে কচ্‌হবংশীয় নৃপতিগণ আসীন হইয়া প্রতাপ বিস্তার দ্বারা আপনাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিতেছিলেন, তৎকালে ইহাদিগের এক জন দলপতি হলবন্ত্রের পরিবর্ত্তে করে অস্ত্র লইয়া জিঠদিগের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ করিয়া যায়। এই জীবের নাম চুড়ামন। ইহারা এই সময়ে দুইটি ক্ষুদ্র মৃণ্ময়দুর্গ সংস্থাপিত করে। ইহাদের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখিয়া এক সময়ে দিল্লীর মোগল সম্রাটকেও

* আবুমাহাত্ম্যে তক্ষকেরা হিমাচল পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

† পরীক্ষিতের তক্ষকদংশনে মৃত্যু এবং জন্মেজয়ের সর্পকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য সর্পযজ্ঞ ভারত প্রসিদ্ধ। উহার অর্থ এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিলে ক্ষতি কি?—তক্ষকেরা সিংহাসন লোলুপ হইয়া কোন কৌশলে পরীক্ষিতের বিনাশ সাধন করে, তাহাতে জন্মেজয় কুপিত হইয়া পিতৃশত্রুদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাদিগের অনেকগুলিকে ধরিয়া আনিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ পূর্ব্বক একেবারে ভস্মীভূত করেন। প্রায় অশীতি বৎসর পূর্ব্বে ঠিক্ এইরূপ একটি ব্যাপার ভরতপুরে সংঘটিত হইয়াছিল। তথাকার রাজা সূর্য্যমল, কতকগুলি পার্ব্বতীয় শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া তাহাদিগকে বন্ধন পূর্ব্বক আনয়ন করত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করেন।

ভীত হইতে হইয়াছিল। দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে জগদ্বিখ্যাত বীরপ্রবর জ্যোতিষরাজ অম্বরেশ্বর সয়াই জয়সিংহ ইহাদিগের মৃণ্ময়দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গরক্ষায় ইহারা অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিল। জয়সিংহ এক বৎসরকাল দুর্গাবরোধ করিয়া শেষে লজ্জায় পলায়ন করিলেন। কিছুকাল পরে চূড়ামনের ভ্রাতৃবিরোধ সময়ে একটি বিশ্বাসঘাতকতা সূত্রে জয়সিংহ দুর্গজয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহাদিগের দুর্গরক্ষার ক্ষমতা ও বলবত্তায় সেনাপতি লেক সাহেব হিম সিম খাইয়াছিলেন। ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ জগদ্বিখ্যাত। এই জাতি পঞ্চনদ প্রদেশে জিঠ, অনুগঙ্গ প্রদেশে জাঠ এবং সৌরাষ্ট্রে জুঠ নামে প্রসিদ্ধ। নামের সৌসাদৃশ্য দর্শনে অনেকে অনুমান করেন, তাতার দেশীয় জিটি জাতি হইতে জাঠদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। এই প্রদেশে উত্তরকালে শিকেরা প্রভুত্ব সংস্থাপন করে। শিকদিগের মস্তকে চক্রধারণের প্রথা প্রচলিত আছে, জিটিদিগেরও স্বদেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, জিটি, জাঠ ও শিক এক বংশসম্ভূত। এই চক্র হইতেই তাহারা চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়।

১৫। হন্ বা হুন্—ইহারা সিথীয় মূল হইতে সমুদ্ভূত। বহুকাল ইহারা সৌরাষ্ট্রে, কাট্টী, বল্ল, ঝালা প্রভৃতির সহিত একত্রে বাস করিয়াছিল। চিতোর রক্ষার সময়ে অঙ্গৎশী নামে হুনরাজ রাজপুত পক্ষে সমবেত ছিলেন। এক্ষণে এই বংশ প্রায় বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬। কাট্টী—রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রের রাজকুল পরিচয়ে ইহাদিগকে ছত্রিশ রাজকুলমধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর উপকূলে অধিকাংশ কাট্টীর বাস, এই জন্যই সৌরাষ্ট্রের কিয়দংশের নাম কাট্টীবার প্রদেশ হইয়াছে। ইহাদিগের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ও শারীরিক গঠনে সিথীয়া নিবাসীদের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য দর্শনে স্থির হইয়াছে, ইহারা সিথীয়কুলসম্ভূত। মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সময়ে পঞ্চনদের সঙ্গমস্থানে ইহাদিগের বাস ছিল; বীরবর প্রথমতঃ ইহাদের বিপক্ষেই যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু ইহাদের হস্তে তিনি প্রায় বিগত-জীবিত হইবার মত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে কাট্টীরা প্রবল প্রতাপে উক্ত প্রদেশ হইতে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনস্থান ভোগ করিয়া আসিতেছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন পৃথ্বিরাজের সহিত কান্যকুব্জাধিপতির ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয়পক্ষেই কাট্টীযোদ্ধা সশস্ত্র উপস্থিত ছিল। ইহারা অসিচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত অভিলাষী। ইহাদের শরীরের গঠন দেখিলেই যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয়।

১৭। বল্ল—রাজকুলপত্রে ইহারা ছত্রিশ রাজকুলভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। রাজপুতকবিরা ইহাদিগকে "তাত্তা মূলতানকা রাও"বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,এই বাক্যে সিন্ধুনদতীরে ইহাদিগের আদিম নিবাস ব-

লিয়া বোধ হয়। ইহারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং কহে রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইতে বল্লবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত চাঁক নগরে ইহাদিগের প্রথম নিবাস, পরে মুগীপত্তন বলিয়া ইহারই নামান্তর হয়। ক্রমে ইহারা সমুদায় সৌরাষ্ট্র দেশ জয় করিয়া দেশের নাম বল্লক্ষেত্র, রাজধানীর নাম বল্লভীপুর এবং আপনাদের নাম বল্লরায় বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

১৮। ঝালা—সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নিকুলের মধ্যে ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায় না, এই জন্য অনুমিত হয় যে, ইহাদিগের আদি পুরুষ উত্তর দেশ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, রাজস্থানের ইতিবৃত্তে ঝালারাজের এক অনুপম কীর্ত্তিবলে রাজপুতগণের মধ্যে ইহারা গণনীয় হইয়াছেন। রাণা প্রতাপসিংহের সহিত আকবরের যে জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধ হয়, তাহাতে ঝালাপতি একবার রাণার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপের নিকট যার পর নাই সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। রাণা ঝালাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন এবং সম্মানের অগ্রণী করিয়া তাঁহাকে আপনার দক্ষিণে আসন প্রদান করতঃ কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এই কীর্ত্তির জন্যই তিনি ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। ইহার পরেও ঝালাদিগের সহিত সূর্য্যবংশীয়দিগের আদান প্রদান দেখা গিয়াছে। ইহাদিগের দ্বারাই সৌরাষ্ট্রের একটি বৃহদংশের নাম ঝালাবর হইয়াছে। পৃথ্বিরাজের যুদ্ধ সময়ে ইহারা উভয় পক্ষেই অস্ত্রধারণ করিয়াছে। ইহাদের অনেক শাখা, তন্মধ্যে মকবাহন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

১৯। জৈৎবা বা কমারী—ইহারা প্রাচীন জাতি। রাজকুল-পত্রে অবগতি হয়, ইহারা রাজপুত এবং ছত্রিশ রাজকুলের অন্তর্ব্বর্ত্তী, সৌরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে ইহাদের বাস; সেই স্থানের নাম জৈতবর, তাহার রাজধানী পর্ব্বন্দর, রাজার উপাধি রাণা। ইহাদিগের প্রাচীন রাজধানী গুমলি, এখানে ১১০ জন রাজা ক্রমান্বয়ে প্রভুত্ব করেন। তুয়ার বংশের সহিত ইহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে ইহাদের কমারী উপাধি ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তরদেশ হইতে আগত কোন জাতি কর্ত্তৃক ইহারা অধিকার চ্যুত হয়, সেই সময়েই ইহারা কমারী উপাধি ত্যাগ করিয়া জৈৎবা উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সৌরাষ্ট্রের এক প্রদেশে বাসস্থান নির্ণয় করে। ইহাদিগের আচার ব্যবহারে সিথীয়দিগের সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে সিথীয় জাতি সমুৎপন্ন মনে করেন। ইহারা আপনাদিগকে বীর হনুমানের বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদিগের পৃষ্ঠাস্থি নিম্নভাগে কথঞ্চিৎ লম্ববান থাকায় ইহারা তাহাকে লাঙ্গুলের অংশ বলে। ইহারা আপনাদিগের রাজাকে “ সৌরাষ্ট্রের লাঙ্গুলধারী রাণা ” বলিয়া থাকে।

২০। গোহিল—ইহারা সূর্য্যবংশীয়, ইহাদিগের প্রথম নিবাস জুনাখীরগড়। এখানে কত দিন ইহাদের বাস তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। খীরো নামা এক

জন ভীল জাতীয় দলপতিকে অধিকার-চ্যুত করিয়া ইহারা ঐ স্থান অধিকার করে; দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে রাঠোরেরা ইহাদিগকে ঐ স্থান হইতে দূর করিয়া দেয়। এক্ষণে ইহারা সৌরাষ্ট্রে প্রবেশ পূর্ব্বক পিরণগড়ে বাসস্থান স্থাপনা করে, কিন্তু অনতিকাল মধ্যে ঐ নগর ধ্বংস হওয়ায় ইহারা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া দুই দিকে গমন করে। প্রথম শাখা বগওয়া নগরে সংস্থাপিত হয়, তাহাদের অধ্যক্ষ নন্দন নগরের রাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। শ্বশুরের রাজ্য পাওয়ায় ইহার দল ক্রমে পুষ্ট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় শাখা শিহোর নগরে বাসস্থান নির্ণয় করিয়া ক্রমে ভাউনগর এবং গোগো এই দুইটি নগর সংস্থাপন করে। সৌরাষ্ট্রের এই প্রদেশের নাম গোহিলবর।

২১। সারশ্ব—ইহারা যে ক্ষত্রিয় জাতি এবং প্রাচীন কালে যে ইহাদিগের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। নামের শেষে অশ্ব শব্দ থাকায় কেহ কেহ ইহাদিগকে হৈহয় বংশীয় বলিয়া অনুমান করেন।

২২। সিলার—ইহাদিগের বিবরণ ও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। এক সময়ে ইহারা সৌরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন রাজপুত বলিয়া গণ্য ছিল। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

২৩। দাবী—ইহারা যদুবংশীয়,ইহারা ও এক সময়ে সৌরাষ্ট্রে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে বিলুপ্ত প্রায়।

২৪। গোড়—রাজস্থানের ইতিবৃত্ত মধ্যে ইহাদের পরিচয় আছে মাত্র, কিন্তু কখনও ইহারা বিশিষ্টরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। টড্ সাহেব কহেন, বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজারা এই বংশীয়, ইহাদের দ্বারা গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগর সংস্থাপিত হয়। ইহারা বহুকাল আজমীরে বাস করিয়াছিল, সেই জন্য ইহারা আজমীরের গোড় বলিয়া বিখ্যাত। পৃথ্বিরাজের সৈন্য সামন্তের মধ্যে ইহাদের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা পঞ্চশাখায় বিভক্ত।

২৫। দোদা বা দর—ইহারা এক সময়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, পৃথ্বিরাজ একবার ইহাদিগকে জয় করিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া মানিয়াছিলেন। ইহাদেব অন্যান্য পরিচয় নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়।

২৬। ঘরবাল——ইহারা জাতিতে রাজপুত ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ। বারাণসী প্রদেশে ইহাদের আদি নিবাস। বুঁদেলা ইহাদিগেরই নামান্তর—বর্ত্তমান নিবাস বুন্দেলখণ্ড ইহাদের দ্বারাই সংস্থাপিত। ইহারা এক সময়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। মধুকর উর্চা নগর সংস্থাপন করে। এই দুর্ব্বৃত্ত,আকবরপুত্র জঘন্য-প্রবৃত্তি সেলিমের প্ররোচনায় জগদ্বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা আবুলফজলের প্রাণ বিনাশ করিয়া আপনার কুলকে কলঙ্কিত করিয়া যায়। আকবরের সময় হইতেই বুঁদেলারা সমধিক খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে। উর্চা ও দতিয়ার অধ্যক্ষেরা অনেক বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। উর্চার ভগবান সাহজেহানের অগ্রণী সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার পুত্র শূপকর্ণ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অরঙ্গজী-

বের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ইহাদিগের বীরত্বের ভূয়োভূয়ঃ বিবরণ ইতিহাসপত্রে প্রকটিত রহিয়াছে।

২৭। বৃগুজর—ইহারা সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লব হইতে সমুদ্ভূত। অম্বরে ইহাদের অনেক অধিকার এবং মাচেরী প্রদেশস্থ রাজোর নামক গিরিদুর্গ ইহাদের রাজধানী ছিল। রাজগড় এবং আলোরা ইহাদের অধিকার ভুক্ত থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। কচ্বহেরা ইহাদিগকে অধিকারচ্যুত করে। তাহার পর ইহারা অনুপসহরে আসিয়া বাস করিয়াছে।

২৮। সেঙ্গর—ইহাদিগের ইতিবৃত্ত নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যমুনাতীরস্থ জগন্মোহনপুর ইহাদের রাজধানী।

২৯। শেকরবাল—ইহাদিগের দুইটি নগর ভিন্ন আর পরিচয়ের কোন বিষয়ই নাই। চর্ম্মণ্বতী নদীতীরস্থ শেকরবর, এক্ষণে উহা সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত; ফতেপুরসেক্রি ইহাদেরই একটি প্রধান নগর।

৩০। বৈসি—ইহারা সূর্য্যবংশের শাখাবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন। গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী বৈসিবর প্রদেশ ইহাদেরই জনস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩১। দাহিয়া—যখন মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন ইহারা সিন্ধু নদীর তীরে বাস করিত, এতদ্ভিন্ন ইহাদের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

৩২। জোহিয়া—ভারতবর্ষের উত্তরভাগে যে সকল জঙ্গলময় ভূমি আছে, তথায় ইহাদের বাস। ইহারা "জঙ্গলদেশপতি" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। হরিয়াণা, ভাটনেয়ার এবং নাগোর এই নগরত্রয় ইহাদের অধিকারভুক্ত।

৩৩। মোহিল—বিকানীর রাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বে ইহারা সেই প্রদেশে বাস করিত। রাঠোরেরা তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। আলেকজাণ্ডারের সময়ে ইহারা মুলতান প্রদেশে বাস করিত।

৩৪। নিকুম্প—কুলপত্রে ইহাদিগের খ্যাতিপ্রতিপত্তি আছে। কিন্তু গ্রাহিলোটদিগের পূর্ব্বে ইহারা মণ্ডলগড়ের অধিপতি ছিল, এতদ্ভিন্ন আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

৩৫। রাজপালী—ইহারাও সম্ভবতঃ শিথীয়মূল হইতে সমুৎপন্ন। সৌরাষ্ট্রে ইহাদের অধিকার থাকার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৬। ডাহিম—চাঁদ কবি ডাহিরের প্রশংসায় স্বীয় পুস্তকের এক অধ্যায় পূর্ণ করিয়াছেন। ইহারা চোহান সম্রাট্ পৃথ্বিরাজের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিল। ইহারা বিয়ানার অধীশ্বর পৃথ্বিরাজ এই বংশে বিবাহ করেন। সম্রাটের শ্যালকত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কায়মস পৃথ্বিরাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, দ্বিতীয় পণ্ডির পঞ্চনদ প্রদেশের সেনানায়ক ছিলেন, তৃতীয় চন্দ্রায় সম্রাটের শেষ যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই যুদ্ধেই পৃথ্বিরাজের পতন এবং সেই সঙ্গেই ডাহিমদিগের প্রতিপত্তি লুপ্ত হয় *।

* ডাহির নামে আর এক জাতির বিবরণ কুমারপালচরিত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। বোগ্দাদের কালিফের প্রতিনিধি কাশিম কর্ত্তৃক ইহার সর্ব্বনাশ হয়। ইনি ডাহিরদেশপতি নামে প্রসিদ্ধ।

রাজপুতানা প্রদেশস্থ আদিম নিবাসীদিগের নাম। যথা;—বগড়ী, মের, কাবা, মিনা, ভিল, সেরিয়া, থোড়ি, খাঙ্গার, গোঁড় ভড়, জুনোয়ার, সারদ।

কৃষকদিগের নাম। যথা,—আভীর বা আহির, গোয়ালা, কুর্ম্মী, গুজ্জর, জাঠ।

অবিভক্ত রাজপুতশাখা। যথা;—জালিয়া, পেশনী, সোহাগচী, চাহির, রাণ, শিমাল, বুটিলা, গোচির, মালন, তহির, হুল, বাচক, বাটর, কেরুচ, ফোটক, বুসা, বীরগোটা।

এতদ্ভিন্ন আর চৌরাশী প্রকার ব্যবসায়ী লোকের বাস আছে।

কোকিল

সে দিন একজন বিদ্বান্, বিচক্ষণ, প্রাচীন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, কোকিলের স্বরে এমন কি আছে যে, তাহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে পারে?" এই প্রসঙ্গে তিনি এক গল্প বলিলেন। এক সময়ে কোন রহস্যপ্রিয় ভদ্রলোক পথ চলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ একটা কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটি কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "ধর হে, আমায় ধর, দেখিতেছ না আমি অচেতন হইয়া পড়ি!" সঙ্গীরা জিজ্ঞাসিল, "কেন, মহাশয়, আপনার সহসা এরূপ হইবার কারণ কি?" ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, "তোমরা শুন নাই, কোকিল ডাকিতেছে?" "শুনিয়াছি তো, কিন্তু কোকিল ডাকিলে এরূপ হইবে কেন?" উত্তর, "শাস্ত্রে বলে যে!" তিনি যখন আমাকে উপরি-উক্ত প্রশ্ন করেন, তখন আমি প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, "কি জানি, মহাশয়, কোকিলের স্বরে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু সময়ে সময়ে সেই কুহু স্বরে চিত্ত বিচলিত হয়, তাহা দেখিয়াছি।" ভাগ্য ভাল, তাই একথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি ঐ গল্প আরম্ভ করিলেন; গল্প শেষ হইলে ভাবিলাম, ভাগ্যে আমি কোন উত্তর দিই নাই, তাহা হইলে এই গল্প আমাকে লক্ষ্য করিয়াই হইত, আর আমার ঘাড়ের উপর দিয়া খুব একটা হাসির গড়্রা চলিয়া যাইত! বায়ুর উনপঞ্চাশ ছিটের মধ্যে কবিত্ব ছিট্ আমার ঘাড়ে একটু আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির হইত!! যে মজ্‌লিশে এই কথা উঠিয়াছিল, সে আমোদের মজ্‌লিস—জলরাশির বিস্তারবৎ। শর, পঙ্ক, তৃণাদি লঘু বস্তু তাহার উপরে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, গাঢ়তা শূন্য হাসির কথা সেখানে খুব আদর পায়, জুৎসই করিয়া ফেলিতে পারিলে খোলা খাপরাও তিড়িং তিড়িং করিয়া নাচিয়া বেড়ায়; কিন্তু প্রস্তর, লৌহাদি গুরুভার দ্রব্য পড়িলেই টুপ্ করিয়া ডুবিয়া যায়—খানিকটা জল ছিট্‌কাইয়া আশ পাশের লোকের গায়ের কাপড় চোপড় ভিজিয়া যায়; চিন্তা-প্রসূত প্রগাঢ় প্রস্তাব সেখানে উত্থাপন করিতে নাই।

আমি তখন কোন উত্তর করিলাম না, কিন্তু কথাটা আমার মনে নিয়তই তোল

পাড় করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, কি, ইনি এত প্রাচীন হইয়াছেন, ইনি রসগ্রাহী ভাবুক বলিয়া পরিচিত, সাহিত্যের যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন, সুকবি বলিয়াও খ্যাতি শুনিয়াছি, ইনি সহসা এমন কথাটা বলিলেন ? " কোকিলের স্বরে এমন কি আছে যে, তাহাতে মন বিচলিত করিতে পারে ?" তবে বুঝি তাঁর হৃদয়-তন্ত্রীর পঞ্চমের তারে মরিচা ধরিয়া আছে। কোকিলের পঞ্চম স্বরে সে তার বাজিয়া উঠে না— সুরে সুরে মিশিয়া যায় না, মিলিয়া যায় না।

কি সে হৃদয়ের পঞ্চম তার ? তাতে হৃদয়ের কোন্ সুর বাজে ? বিরহের সুর, সেই সে পুরাণ কথা ! 'বিরহী বিরহিণী', 'কোকিল পঞ্চম গান', 'উড়ু উড়ু করে প্রাণ', 'সখি প্রাণ যায়, উহু মরি কুহু স্বরে, ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরাণ কথা সত্য বটে, কিন্তু কথাটার মানে আছে। গরিব বেচারা কবিরা এত আহাম্মক ছিল না যে, সুন্দর ময়ূরকে ঠেলিয়া ঐ কুরূপ কৃষ্ণবর্ণ কোকিলটার এত গৌরব বাড়াইয়া গিয়াছে !

বিরহ কি ? মিলনের অভাব। এ জগতে ভাব পদার্থই সুখের, আর অভাবই দুঃখের প্রকৃত মূল। আলোকে সুখ, অন্ধকারে দুঃখ; আহারে স্বচ্ছন্দতা, অনাহারে কষ্ট; স্বচ্ছলতায় আনন্দ, দারিদ্র্যে হাহাকার—যে দিকে দেখ, সেই দিকেই ঐ সত্যের সমর্থন। তাই দেখ, মিলনে সুখ, বিরহে দুঃখ। আত্মায় আত্মায় যে মিলন, সেই মিলনকেই আমরা মিলন বলিব; আত্মা হইতে আত্মার যে দূরতর ব্যবধান, তাহাকেই আমরা বিরহ বলিব। সাধক যখন হৃদয়মন্দিরে সযত্নে আসন পাতিয়া, হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিয়া সকরুণে তাঁর ইষ্টদেবের আবাহন করিতেছেন, ইষ্টদেব তাঁর হৃদয়কুটীর আলোকিত করিতেছেন না, তখন তিনি দারুণ বিরহযাতনা ভুগিতেছেন। দশটার সময় পান চিবাইতে চিবাইতে বাড়ীর বাহির হইয়া, গৃহিণীর চাঁদমুখ পাঁচটা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইব না ভাবিয়া, ত্রিভুবন অন্ধকার দেখা এক জাতীয় বিরহ, আর এ অন্য জাতীয় বিরহ! মানুষই মহান্, মানুষই ক্ষুদ্র! প্রেমাবতার চৈতন্যদেব মধুরাতিমধুর প্রেমের ধর্ম্ম ধরাতলে প্রচার করিলেন; সেই প্রেম আ'জ নেড়ানেড়ীর জঘন্য পিরীতে পর্য্যবসিত। কবি মানুষ ছাড়া নয়। কবির ভিতরে চৈতন্যদেবও আছেন, নেড়ানেড়ীও আছে। যে মহাকবির হৃদয়াকাশ সর্ব্বাগ্রে কোকিলের মর্ম্মভেদী কুহুরবে বিরহের উদাস-সুরে ভরপূর হইয়াছিল, তিনি কি জানিতেন কালে এই কোকিলের স্বরে মাঝি ভা'য়ের মনখানা তার ভালবাসা নটীর জন্যে উড়ুক পুড়ুক ক'রে উঠ্‌বে ! !

একদিন এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে ঠিক্ মধ্যাহ্ন সময়ে একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া অশ্বশ্রম নিবারণ করিতেছিলাম। চরাচর নিস্তব্ধ। সে প্রান্তরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুপ ভিন্ন সর্ব্বসমেত দুই চারিটি বনস্পতি মাত্র নেত্রগোচর হইতেছিল; চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি যতদূর যাইতেছিল, তাহার মধ্যে আর গ্রাম ছিল না—যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকেই দেখি স্নিগ্ধ নীলবর্ণ অম্বর ধরণীবক্ষে ঢলিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া বেদের সেই স্পষ্ট বর্ণনা মনে পড়িল—যেন পরম

পুরুষ কামনা প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। Spirit brooding over matter. তখন বসন্তের উদ্রেক মাত্র। মাঘের শেষাংশ। দূর-বৃক্ষের শাখা হইতে একটি কোকিল কুহুকুহু ঝঙ্কার,দিতে আরম্ভ করিল। সেই মার্জ্জিত বিশুদ্ধ পঞ্চমের তান পবনের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিল। অনন্ত আকাশ সেই মধুর নিনাদে অনুস্যূত হইল। কুহু—কুহু—কুহু—অবিরলমুক্ত কুহুস্বরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া অনন্ত আকাশে অনন্ত পথে প্রধাবিত হইল। যত চলিল, ততই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতর—আরো সূক্ষ্মতর হইতে থাকিল। ক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর। কোথায় গেল? কোথা গিয়া মিশিল? বিশ্বে নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংস কিছুরই তো নাই। ধ্বংস আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। স্থূলের সূক্ষ্মভাবই ধ্বংস। যতক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি, ততক্ষণ সেই সূক্ষ্মতাপ্রাপ্তিকে 'হ্রাস' আখ্যা দিই। ইন্দ্রিয়াতীত হইলে 'ধ্বংস' বলি। নতুবা হ্রাস ও ধ্বংস ভিন্ন নহে। ধ্বংস হ্রাসের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা মাত্র। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম—অনন্ত বিশ্বব্যাপার এই দুইটি মাত্র মূল ক্রিয়ার রূপভেদ মাত্র। আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ—সকল শক্তি এই দুই মাত্র মূল শক্তির রূপান্তর। যেমন ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতা ধ্বংসপদবাচ্য, তেমনি ইন্দ্রিয়োপভোগ্য স্থূলতা প্রাপ্তির নামই উৎপত্তি। তবে সেই তরুশাখাসীন কোকিলের কণ্ঠনিঃসৃত কুহুরব গুলি কি হইল, কোথায় গেল? কেহ জান তো আমায় বুঝাইয়া দেও—আমার গুরু হও। সেই তত্ত্ব বুঝিব বলিয়া সংসারত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। কৈ? বুঝিতে তো পারিলাম না। স্থূলের তত্ত্ব অনেকে বুঝাইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মের তত্ত্ব ক'জন জানে, ও ক'জন বা জানিতে প্রয়াস করে?

কি হয়? কোথায় যায়? পণ্ডিত আজন্মকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানরাশি উপার্জ্জন করিতেছেন; অধম পার্থিবদেহের বিনাশে কি সে জ্ঞান-রাশিও বিনাশ হইবে? জড়দেহ যে যে ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত,তাহারা বিশ্লিষ্ট হইয়া স্ব স্ব মূলভূতে উপগত হউক; কিন্তু জ্ঞান তো জড় নহে—সে চিন্ময়। নিরবচ্ছিন্ন বিনাশ তাহারও তো নাই। তবে সে কিসে আশ্রয় করিয়া থাকে? যে ভাবেই থাকুক, থাকে তাহার সন্দেহ নাই। জ্ঞান থাকে, প্রেম কি থাকে না? কবিরা বলেন, প্রেম স্বর্গধাম হইতে নিস্যন্দিত অমৃতের প্রবাহ। সে প্রবাহ কি অনন্ত-বাহিনী নহে? ওঃ! সব যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে! সে দিন—বর্ষের পর বর্ষ, কত বর্ষ বহিয়া গেল, তবু যেন বোধ হইতেছে সে দিন—সে দিন যার করযুগল ধরিয়া প্রবাস-গমনের বিদায় গ্রহণ করিলাম—তখন কে ভাবিয়াছিল, সেই দেখাই শেষ দেখা!—সে কোমল করপল্লবের আদর-স্পর্শ এ পাপদেহে আর পাইব না! সেই প্রেমভাবে ভরা বিদায়-কালীন হাসি হাসি 'কাঁদ''কাঁদ' মুখখানি এখনও নয়নের সামনে জাগিতেছে—এ জন্মে সে মুখের পবিত্র অমৃতময় হাসি চিন্তানলদগ্ধ এ পাপ প্রাণকে আর শীতল করিবে না!! সেই হৃদয়ভরা প্রেম কোথায় গেল? রূপরাশির সঙ্গে সেও

কি ভস্মসাৎ হইয়াছে ? না,সে চিন্তাতেই হৃদয় শিহরিয়া উঠে! তবে সে প্রেম কোথা ? আবার বলিতে হইল,কি জানি কোথা ! !

অন্ধকার! অন্ধকার!! সকলি অন্ধকার !!! সকলই মায়া-ঘন-আবরণে সম্যক্ সমাচ্ছন্ন! এ জগতে যা চাই তা পাই না, অথচ ছাড়িয়াও যাইতে পারি না। কে যেন ছায়াবাজির পুতুলের ন্যায় পশ্চাতে রজ্জু ধরিয়া আমাদিগকে খেলাইতেছে। কেহ কখন তাহাকে দেখিতে পায় নাই, তাই আর নাম না পাইয়া তার 'অদৃষ্ট' নাম রাখিয়াছে।

কোকিলের স্বর শুনিয়া কেন এইরূপ চিন্তা-প্রবাহ আমার মানসক্ষেত্রে বহিতে লাগিল? আর কাহারও কি এইরূপ হইত? অবস্থা-সাদৃশ্য থাকিলে না হইতই বা কেন? হাজার-করা এক জনেরও চিত্ত যদি ঐ ভাবে আলোড়িত হয়, তাহা হইলেই কোকিলের স্বরকে বিরহভাবের উদ্দীপক বলিব—শতবার বলিব। ভৈষজ্য-তত্বান্বেষী সুবিজ্ঞ ভিষকেরা বলেন, যদি কোন ভেষজদ্রব্য বহুসংখ্যক লোকে যুগপৎ ভক্ষণ করে, আর তন্মধ্যে এক বা দুই জনের শরীরে তজ্জন্য কোন বিশেষ স্বাস্থ্য বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে সেই দ্রব্যের তাদৃশ ব্যাধি জননী শক্তি স্বীকার্য্য। পরন্তু তাদৃশ ব্যাধিজননী ক্রিয়াকে তাঁহারা উহার নৈমিত্তিক ক্রিয়া বলিয়া আখ্যা দেন; আর যেগুলি সকলের বা অধিকাংশের শরীরে প্রকাশ পায়, সেগুলিকে উহার 'নিত্য' ব্যাধি-জননী ক্রিয়া বলেন। বিরহ-ভাব উদ্দীপন কোকিলের স্বরের নিত্য ক্রিয়া না হইতে পারে, কিন্তু উহার নৈমিত্তিক ক্রিয়া-স্থানীয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। রণভেরীর ভৈরব রবে তো ওভাবের আবির্ভাব হয় না! লক্ষৌএর ঠুংরিতে ওভাবের প্রবাহ বহে না।

তবে কিনা, যে নরাধম বনিতাঞ্চল ধারণ ভিন্ন রাত্রিতে ঘরের বাহির হইতে পারে না, তার শোণিত কি রণবাদিত্রের তালে তালে নৃত্য করিয়া উঠিবে? না, পুত্রশোকাতুর দীনমনা জনের লক্ষৌএর ঠুংরি শুনিয়া বেল ফুলের মালা গলায় পড়িতে ইচ্ছা হইবে? যদি প্রাণসর্ব্বস্ব প্রেমের পাত্রকে চিরজীবনের মত হারাইয়া থাক; সুবর্ণকান্তি তাম্র যেমন অম্লস্পর্শে বিবর্ণ ও বিকৃত হয়, তেমনি যে প্রেম জীবন্ত অবস্থায় চিত্তপটের উজ্জ্বল বর্ণ ছিল, কালের বিষহস্ত স্পর্শে যদি স্মৃতিমাত্রাবশিষ্ট সেই প্রেম অহর্নিশ চিত্তপটের জারণ করিতে থাকে, তবে বলিও কোকিলের গগণস্পর্শী মর্ম্মচ্ছেদী কুহুরব হৃদয়-গ্রন্থি সকলকে শিথিল করিয়া দেয় কি না—বিশ্বসংসারকে ফাক ফাক বোধ করাইয়া দেয় কি না। যদি কখনো সংসারের প্রেমের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, নিত্য-প্রেম-নিকেতন পরমাত্মাতে প্রেম সংস্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ধন, মান, সম্পদ, আত্মীয়, স্বজন ত্যাগ করিয়া তবু সেই প্রেমময়ের মুখ দেখিতে না পাইয়া থাক, তখন বলিও কোকিলের কুহুরব হৃদয়ের শিরায় শিরায় প্রবেশ করে কি না, বিরহের ঔদাস্য ভাব অন্তরে জাগায় কি না। (শ্রীভোলানাথ সন্ন্যাসী।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র।

এই পৃথিবীতলে নানা প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়,যে স্থলে নানা প্রকার দ্রব্যের সমবায় আছে, সেই স্থলেই সেই সকল দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার গুণ-সমন্বিত দেখাযায়; সকলের একই প্রকার প্রকৃতি কোন প্রকারে হইতে পারে না। সেই জন্য দেখিতে পাই সমাজে দুই প্রকার লোক বাস করেন—এক দলের লক্ষ্য সুখের দিকে, অপর দলের ধর্ম্মের দিকে—; একদল কেবল সুখান্বেষণেই ব্যস্ত; অপর দল ধর্ম্ম লইয়াই বিব্রত; এক দলের লালসা এই পৃথিবীতেই পর্য্যাপ্ত, অপরদলের আশাপূরণে পৃথিবী অসমর্থ; এক দলের এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি,—ইহাতেই তাঁহারা আপনাপন ভোগ লালসা পরিতৃপ্ত করেন, অপর দলের কার্য্য চিন্তা পৃথিবীর অতীত; পৃথিবী তাঁহাদের লালসা তৃপ্ত করণে সমর্থা নহেন; পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই এক দলের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত, কিন্তু উহা অপরের সুখ নিস্পৃহের কারণ; একজন দেখেন এই পৃথিবী সুখপরিপূর্ণ;—অপরের ইহা দুঃখের জীবন্ত আগার। এই উভয়বিধ কারণ বশতঃই ইহ জগতে একদল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুখান্বেষণে ব্যস্ত;—কোন স্থলে কোন প্রকার দুঃখের হস্তে পতিত হইলে তাহা বিদূরিত করিয়া সুখের জন্যই চেষ্টিত—এই বসুন্ধরা তাঁহাদের সুখময় বিলাসকানন, যদি কিছু দুঃখ থাকে, তাহা অকিঞ্চিৎকর—তাহা সুখোচ্ছ্বাসের নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারে না—এবং সেই সুখ ভোগ করাই তাঁহাদের মতে পরম পুরুষার্থ;—অপর দল দেখেন এই পৃথিবী ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমি,—সকলই দুঃখ-পরিপূর্ণ—যদি কিছু সুখ থাকে, তাহা অকিঞ্চিৎকর—সুতরাং তাঁহাদের অভিপ্রায় অপার দুঃখ পরিবেষ্টিত সুখ সর্ব্বশক্তিমানের অভিপ্রেত নহে;—পরন্তু সমস্ত সুখ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত থাকাই পরম পুরুষার্থ,—ও তাহাই জগদীশ্বরের অভিপ্রায়। কিন্তু এই রমণীয়-সুখসেব্য-দ্রব্য-সমন্বিত, বিলাসের ক্রীড়া কাননে বাস করিলে সুখ দুঃখ যুগপৎ ভোগ করিতেই হইবে, সেই জন্য তাঁহাদের লক্ষ্য পৃথিবীর অতীত। যৎকালে অন্য পক্ষীয়গণের এই সুখনিকেতন—রম্য বিলাসভবন—আমোদপ্রমোদের রঙ্গভূমি; তাঁহাদের অভিলাষ তৃপ্ত করণে এই পৃথিবীই সম্পূর্ণরূপে সমর্থা—সুতরাং ইহাই তাঁহাদের সুখস্থান ও কর্ম্মক্ষেত্র। এই জন্যই একদল বিষয়ী—অপর দল বৈরাগী; এক দল ইহ লোকের কার্য্যেই তৎপর—অপর দল পারলৌকিক চিন্তায় নিমগ্ন; এক দল প্রত্যক্ষবাদী, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যাহা প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব—তাহাই তাঁ-

হাদের আদরের ধন—তাহার অতীত অপ্রত্যক্ষ সকল পদার্থই তাঁহাদের নিকট অলীক ও অসার; অপর দলের নিকট প্রত্যক্ষ জড়জগৎ অসার—অপ্রত্যক্ষ নিত্য পদার্থই তাঁহাদের সারসর্ব্বস্ব; একজন জড়জগতের তত্বনির্ণয়ে সমুৎসুক—অপরজন পরমাত্মার প্রকৃতি নিরূপণে যত্নবান্; এক দল মনেকরেন আমরা বুদ্ধিবলে সমস্তই করিতে পারি—অপর দল আপনাদিগকে সকল কার্য্যকরণেই অক্ষম বিবেচনা করেন। এই জন্যই একদল দেবানুগ্রহের প্রার্থী—অপর দল তাহা হইতে বিরত; এবং প্রধানতঃ এই কারণ বশতঃই একদল বর্ত্তমান সময় ও উপস্থিত ঘটনাবলী হইতে আপন আপন সুখ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধরণীকে আমোদ প্রমোদের স্থল বলিয়া জ্ঞান করেন—যৎকালে অপর দল ভবিষ্যতের মাহাত্ম্য কামনায় মুগ্ধ হইয়া সমুদায় সাংসারিক সম্পদ্‌কেই তাচ্ছিল্য করেন।

এই জন্য ভারতবর্ষীয় দর্শনসকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আস্তিক ও নাস্তিক; যে যে দর্শনে বেদের মত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা আস্তিক, ও যাহাতে তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহাই নাস্তিকপদবাচ্য; আমাদের সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা, বেদ বা উত্তরমীমাংসা প্রথমদলভুক্ত—বৃহস্পতি, চার্ব্বাক দ্বিতীয় দলের নেতা ও চূড়া। এতন্মধ্যে সাংখ্যকার কপিলের মতে যদিও ঈশ্বর অসিদ্ধ তত্রাপি তিনি আস্তিক পদবাচ্য। এই ভারতবর্ষেই যে দর্শনশাস্ত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত তাহা নহে, যে দেশে ইহার আলোচনা হইয়া থাকে, সেই দেশেই এই দুই প্রকার মত নয়নগোচর হয়—সেই দেশই আস্তিকতা ও নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ। ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখি, তাহাও এই দুই শ্রেণীর লোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই।—তাহাতেও এই আস্তিক ও এই নাস্তিক। কতকগুলি পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামান্য তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন,—আবার তদনুরূপ কতিপয় মাননীয় সুধীশ্রেষ্ঠ সেই ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছেন। প্লেটো, সক্রেটিস্‌, গ্যালিলিও, কোপার্ণিকস্‌, কেপ্‌লার, নিউটন, বয়েল, ড্যাল্টন প্রভৃতি মহাজনগণ প্রথমশ্রেণীভুক্ত;—আবার আরিষ্টোটল, এপিকুরিস্‌, লাপ্লাস্‌, লাগ্রেঞ্জ, ইউলার, ক্লেবণ্ট, ড্যালাম্বার্ট, বেকন, বেন্থাম্‌, কোম্‌ত, মিল, প্রভৃতি গণনীয় মহাজনগণ দ্বিতীয় দলের অধিনায়ক। এক্ষণে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, দ্বিতীয় শ্রেণী ততই পরিপুষ্ট হইতেছে—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির অপহ্নব হইতেছে। আমরা তাহা কখনই মঙ্গলের নিদান বলিতে পারি না। সমুদায় জগৎ নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ হয়, তাহা কখনই প্রার্থনীয় নহে।

এইস্থলে এই প্রশ্ন সহসা মনোমধ্যে উদিত হইতে পারে যে, একই বিজ্ঞান বৃক্ষে এপ্রকার বিভিন্ন ফল কিরূপে উৎপন্ন হয়, যে বৃক্ষের শিখর দেশে আরোহণ করিয়া পতঞ্জলি, নিউটন প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঈশ্বরভক্তিরূপসুধা চয়নানন্তর আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন, যাহা গ্রহণ

করিয়া জগন্ময় তাঁহারা তাহার প্রভা বিকীর্ণ করিলেন—আপনারা ঐশ্বরিক শক্তির অসামান্য ক্ষমতা দর্শনে পুলকিত হইলেন; আবার কিরূপে সেই বৃক্ষেই অধিরোহণ করিয়া চার্ব্বাক, এপিকুরস্, কোম্‌ত প্রভৃতি সুধীগণ ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বর-মাহাত্ম্য দর্শন করিতে যাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন;—যে বৃক্ষের প্রতি পত্র, প্রতি শিরা একদল ঈশ্বরময় দেখিয়া প্রীত হইলেন, সেই বৃক্ষেরই সমুদায় পত্র ও শিরা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক অন্যদল শূন্যময় নিরীক্ষণ করিয়া হতাশ হইলেন,—হইয়া জগন্ময় সেই ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়া আপনাপন দলপুষ্ট করিয়া সুখী হইতে লাগিলেন। ইহার কারণ কি? একই বিজ্ঞানবৃক্ষে এই দ্বিবিধ ফল কিরূপে উৎপন্ন হয়? যাহাতেই হউক আমরা এ প্রস্তাবে আর সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি না, কেবল ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতই সবিস্তারে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সুখ ও দুঃখ দ্বন্দ্ব; বিধাতা যেরূপে সুখের সৃষ্টি সাধন করিয়াছেন, সেইরূপে দুঃখেরও জন্ম দিয়াছেন; যে সময়ে সুখ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই দুঃখের উৎপত্তি। ঈশ্বর যাহা কিছু করিয়াছেন তাহাই ভাল ও মন্দে মিশ্রিত; প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করি,—তাহাতেও তাহাই—ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহা প্রকৃতিতেই বর্ত্তমান। প্রকৃতিই বিধাতার সূর্য্যচিত্র (Photograph); আমরা তাহাতেই দেখিতে পাই—নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপের পর সুমন্দ-মৃদু-সঞ্চালিত সুখসেব্য-সায়ংসমীরণ,—প্রাবৃটের ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার নিশায় সুরসুন্দরীর অপরূপ মোহনমূর্ত্তি,—শরতের রমণীয় কৌমুদী নিশায়, দুরাচার কালমেঘ প্রভৃতি যাহাই দেখি তাহাই ভাল ও মন্দে মিশ্রিত—তাহাই সুখ ও দুঃখের নিদান। বিমল সুখ এ জগতে নাই—আবার চিরদুঃখও কখন থাকিতে পারে না; যাহা কিছু দেখ তাহাতে এ উভয়ই আছে। দেখ দেখি সম্মুখে একটি সুন্দর প্রস্ফুটিত মনোজ্ঞকান্তি গোলাব রহিয়াছে—মনে করিতেছ ইহাই সুখের স্থান—এইটি চয়ন করিলেই আমি সুখ পাইব—অগ্রসর হও; যতই তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলে, ততই তোমার মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল—ততই তুমি প্রফুল্লিত হইতে লাগিলে—তখন তুমি এক শোভার জন্য লালায়িত নহ, চক্ষু ও নাসিকা তৃপ্যর্থ তুমি তাহা গ্রহণে উদ্যত হইলে;—আরও নিকটে যাও তোমার চক্ষু ও নাসিকা আরও অধিকতর পরিতৃপ্ত হইবে বটে, কিন্তু গ্রহণ করিও না, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইবে—তাহার চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত কণ্টক আছে, তাহাতে তোমাকে জর্জ্জরিত করিবে—তখন জানিতে পারিবে, কেবল সুখময় কিছুই নাই—সুখের চতুর্দ্দিকে অনন্ত দুঃখ-রাশি অনন্তকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। এই সংসারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে ইহাই সুখের স্থান। যখন বহুদিবস প্রবাসে অবস্থান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবে, তখন ধুলি-ধুসরিত-গাত্র আনন্দময় পুত্রের অর্দ্ধস্ফুট বাক্যশ্রবণে তুমি স্বর্গ হস্তে প্রাপ্ত হইবে—ওদিকে স্নেহময়ী নন্দিনীর অপরূপ-লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া

ক্ষণেকের জন্য অনন্তদুঃখ বিস্মৃত হইবে, স্নেহময়ী জননীর বাৎসল্যভাব তোমার হৃদয় পটে আনন্দলহরী বিস্তার করিতে থাকিবে, প্রাণাধিকা দুঃখসঙ্গিনীর সহাস্য বদন নয়ন গোচর করিয়া তুমি চতুর্দ্দিক সুখময় জ্ঞান করিবে; সে আহ্লাদের তরঙ্গ, সে সুখের লহরী, সে আনন্দের উৎস তোমার হৃদয়ে প্রতিনিয়তই কেলী করিতে থাকিবে; —তখন তুমি আপনা ভুলিয়া যাইবে—আপনা ভুলিয়া সকলই সুখের জ্ঞান করিবে। যখন তুমি সমস্ত দিবস পরিশ্রমানন্তর ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অধীর হইয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন কলত্রগণের আনন্দ বর্দ্ধক সম্বোধন, স্নেহময়ী জননীর স্নেহপূর্ণ সান্ত্বনা বচন, আনন্দময়ী সহোদরার ধীর উপদেশ, হৃদয়েশ্বরীর প্রণয়পরিপূর্ণ ভাষ শ্রবণ করিয়া তুমি সে সকলই ভুলিয়া যাইবে —যেন স্বর্গ হস্তে পাইবে; তখন ইহাই একমাত্র সুখের স্থান বলিয়া তোমার মনে হইবে—ইহা হইতে যে আর কিছু সুখ হইতে পারে, তাহা তোমার স্মরণেও আসিবেনা—তখন মনে হইবে, এই সংসার কি সুখময় স্থান। কিন্তু সেই সংসারেই আবার যখন দেখিবে তোমার পুত্র প্রাঙ্গণ মধ্যে ধূলায় পতিত রহিয়াছে—সেই একদা সুন্দর মুখ ম্লান হইয়াছে—সেই সুধামাখা স্বর আর বহির্গত হইতেছেনা—সেই প্রসারিত নয়ন দুইটি মুদ্রিত—আর চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ —যাহাকে দেখিলেই অঙ্কদেশে উত্তোলন করিয়া মুখ চুম্বন করিতে—এক্ষণে তাহাকে স্পর্শ করিলেও স্নান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়—তখন তোমার মনে কি হইবে? —সকলই দুঃখময়—সেই সুখময় আনন্দ নিকেতন তখন তোমার নিকট দুঃখময় ভয়ঙ্কর শ্মশান ভূমি। তাই বলি কেবল সুখের কেহ নহে—কেবল দুঃখের কেহ নহে—সকলেই সুখ ও দুঃখ উভয়ই আছে, সকলেই সুখ ও দুঃখে জড়িত। দুঃখ কোথায় নাই—ধনীগণের সুন্দর কারুকার্য্য খচিত সুসম্পূর্ণ বিলাস ভবন অনুসন্ধান কর, সেখানে দেখিতে পাইবে; দরিদ্রের পত্র নির্ম্মিত সামান্য কুটীর পর্য্যবেক্ষণ কর,দুঃখ সে স্থানে ও রহিয়াছে; গৃহস্থের আশ্রমে, সন্ন্যাসীর বৃক্ষতলে, পণ্ডিতের মস্তিষ্কে, মূর্খের সঙ্কীর্ণ মনে কোথায় দুঃখ নাই? সকল স্থলই দুঃখে পরিপূর্ণ। কে কোথায় দেখিয়াছেন অমুকের গৃহে অনন্তসুখ বিরাজিত—দুঃখের লেশ মাত্র নাই—চতুর্দ্দিকে সদতই আনন্দের রোল উত্থিত হইতেছে—কিন্তু পরক্ষণেই তিনি দেখিবেন তাহা দুঃখের লীলাভূমি! দুঃখের হস্ত হইতে কেহ কখন পরিত্রাণ পান নাই—কখন পাওয়া সম্ভব ও নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কয়জন সংসার পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছেন? আবার সংসার পরিত্যাগ করিলেই যে সুখ হইবে তাহাই কি সম্ভব? তাহা হইলে সন্ন্যাসীর দুঃখ কি? সেত সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহা নহে; সন্ন্যাসী যদিও সাংসারিক সমুদায় বিষয় হইতে অপসৃত হইয়াছেন, তত্রাপি তিনি রোগাদির হস্ত হইতে মুক্ত নহেন, রোগে তাঁহাকে সময়ে সময়ে জর্জ্জরিত করিতেছে।

অনন্ত সুখময় কিছুই নাই। যদি "সুখ" এইটি কোন জীবের নাম হইত, আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও বলিত আ-

মিও দুঃখের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাইতে পারি নাই। তবে এ উভয়েরই প-রিমাণ আছে; এক্ষণে দেখিতে হইতেছে সুখের পরিমাণ অধিক, কি দুঃখের সংখ্যা অপরিমিত, কি উভয়েরই সমান। আমাদের মতে এ দুইয়েরই পরিমাণ সমান। কেননা যদি দুঃখের সংখ্যা অধিকতর হইত, তাহা হইলে অনেক পণ্ডিত আত্মহত্যা ক-রিয়া সেই অনন্ত দুঃখের হস্ত হইতে পরি-ত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কেহ কখন কি এই জন্য আত্মহত্যা করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন? তবে দুঃখের সংখ্যা অধিক বলি কিরূপে? যদি কেহ বলেন, দুঃখ অপেক্ষা সুখের সংখ্যা অধিক, তাহা বরং সময়ে সময়ে স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু দুঃখের সংখ্যা কোন ক্রমেই অধিকতর নহে।

এই সংসারে বাস করিতে হইলে যুগপৎ সুখদুঃখ ভোগ করিতেই হইবে—কেহই তাহাদের হস্ত হইতে কোন ক্রমেই পরিত্রাণ পাইবেন না;—কোন লোক কেবল এক-মাত্র সুখ বা একমাত্র দুঃখ পান নাই, পাওয়া সম্ভবও নহে; আবার তাও বলি যদি এসং-সারে দুঃখ বলিয়া কোন শব্দ না থাকিত, তাহা হইলে সুখ কি আমরা বুঝিতে কোন ক্রমেই সক্ষম হইতাম না; দুঃখ আছে ব-লিয়াই আমরা সুখের আস্বাদ পাইতেছি—দুঃখ আছে বলিয়াই আমরা সুখের অন্বেষী ও তাহার মর্ম্মজ্ঞ; দুঃখ না থাকিলে সুখ থা-কিত না; কিন্তু আমাদের দেশের দর্শনকার-গণ প্রায় সকলেই দুঃখের বিদ্বেষ্টা,—দুঃখ এই কথাটি তাঁহাদের সহ্য হইত না। তাঁহারা দেখিলেন ইহ জগতে সুখ নাই—আবার ইহাতেই যে সমুদয় দুঃখের অবসান হইবে তাহাও নহে; হয়তঃ পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। মনুষ্য ইহ জগতে শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিলে অনন্ত স্বর্গবাসে অধিকারী হইবেন সত্য বটে, কিন্তু কয়জন সেই শুভকর্ম্ম সম্পা-দন করিতে সমর্থ? এমন লোক কখন জন্ম গ্রহণ করেন নাই—করিবেন কিনা স-ন্দেহ,—বোধ হয় নয়; কেননা জগদীশ্ব-রের সৃষ্টিই এই প্রকার; তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ কিছুই নাই—সম্পূর্ণ রূপে নির্গুণ কিছুই নাই,—সকলই এ উভয় সংশ্লিষ্ট। আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমেই বলিয়াছি—ঈশ্বর যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহাই সুখদুঃখে মিশ্রিত,—ভাল মন্দে গ্র-থিত; মানবগণও ঈশ্বর সৃজিত, সুতরাং সেই মনুষ্যও সুখ দুঃখে, ভাল মন্দে, শুভাশুভে মিশ্রিত; সেই শুভাশুভ মিশ্রিত মনুষ্য যে জ্ঞানদ্বারা পরিচালিত তাহাও শু-ভাশুভে জড়িত; সুতরাং তিনি যে সকল কার্য্য করিবেন বা করেন তাহাও শুভ ও অশুভ; কাজেই তিনি আজীবন কেবল শু-ভকার্য্য সম্পাদনে অক্ষম; এবং সেই জন্যই তাঁহাকে কর্ম্মানুসারে পুনরায় ইহ জগতে আসিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে; যাহাতে সেই অনন্ত দুঃখের একবারে নি-বৃত্তি হয়, দার্শনিকগণের তাহাই ইচ্ছা, তাহাই যত্ন ও তাহাই চেষ্টা। অবশেষে তাঁহারা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই-লেন ও শেষে তত্ত্বজ্ঞানই তাহার একমাত্র উপায় স্থিরীকৃত হইল; এক্ষণে দেখা যাউক

তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে; জ্ঞান ও বুদ্ধির আধার আত্মা এবং জড় জগৎ, এতদুভয়ের পৃথকত্ব জ্ঞান জন্মিলে তাহাই তত্ত্বজ্ঞান-পদবাচ্য। প্রকৃতিপুরুষ ও অপরাপর তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে বিবেক জ্ঞান উপস্থিত হয় এবং এই বিবেক জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়।

এই তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসারের সহিত আর কোন সম্পর্কই থাকে না। সংসারী ব্যক্তি, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত ইত্যাদি যথাবিধি পালন করিয়া, অবশেষে মুক্তি প্রাপণাশায় সমুদায় বিষয়-সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া উদাসীন ব্রত অবলম্বন করিলেন, এই স্থল হইতেই তাঁহাদের সংসারের প্রতি স্নেহ, মমতা, সমুদায় বিচ্যুত হইতে আরম্ভ হইল—এক্ষণ হইতে তাঁহারা কেবল সকল প্রকার দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সচেষ্টিত রহিলেন। এই মুক্তিপ্রাপ্ত্যর্থ তাঁহারা নানা প্রকার ক্লেশকর কঠিন কার্য্যসকল সমাধা করিতে লাগিলেন—ঊর্দ্ধদেশে পাদদ্বয় রক্ষা করিয়া নিম্নে জলন্ত হোমাগ্নির কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে নিম্নমুখে মস্তক রাখিয়া তপস্যা করা কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়;—আবার জলন্ত-অগ্নি-কণ-বর্ষী নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে চতুর্দ্দিকে অগ্নি রক্ষা করিয়া মধ্যস্থল হইতে একপদে দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তপস্যা করা কেমন কষ্টসাধ্য তাহা পাঠকগণ দেখুন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ সেই মুক্তি প্রাপ্তি জন্য এরূপ তীব্রতর কঠিন নিয়ম সকল পালন করিতেন। আবার এই সকল ক্লেশকর বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া চার্ব্বাক প্রভৃতি ঋষিগণ দয়ার্দ্র হইলেন—তাঁহারা জনসমাজে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, সকল পদার্থেই সুখ ও দুঃখ উভয়ই আছে, সুখ পাইতে হইলেই দুঃখভোগও করিতে হইবে, দুঃখের নিমিত্ত সুখ বিসর্জ্জন করা কাপুরুষের কার্য্য—মূর্খের কার্য্য;—যখন উভয়ই আছে, তখন দুঃখ হইতে সুখকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহা ভোগ কর। তাঁহারা বলেন;—

সুখমেব পুরুষার্থঃ। নচাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যম্ অবর্জ্জনীয়তয়া প্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাৎ। তদ্যথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকণ্টকান্ মৎস্যানুপাদত্তে স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। যথা বা ধান্যার্থী সপলালানি ধান্যান্যাহরতি স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। তস্মাদ্দুঃখ ভয়ান্নানুকূলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুমুচিতম্।—যদি কশ্চিৎ ভীরুর্দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ স তর্হি পশুবন্মূর্খোভবেৎ। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহান্তর্গতচার্ব্বাকদর্শনং)

অর্থাৎ সুখই পুরুষার্থ। কিন্তু ইহা দুঃখ হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ ইহার সহিত দুঃখ সংযুক্ত আছে—তবে দুঃখ হইতে সুখকে পৃথক্ করিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। যথা—মৎস্য ভক্ষার্থী শল্ক ও কণ্টক সহিত মৎস্য গ্রহণ করিয়া যাহা গ্রহণীয় তাহাই গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পরিত্যাগ করেন, আবার সেইরূপ ধান্যার্থী তুষ সহিত ধান্য গ্রহণ করিয়া যাহা গ্রহণীয় তাহাই গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পরিত্যাগ করেন। সেই হেতু দুঃখভয় বশতঃ

অনুকূল সুখ পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ এমন থাকেন যে, তিনি এই জন্য সুখ পরিত্যাগ করেন, তিনি পশুবৎ মূর্খ। তবেই ইহাদের মতে দুঃখ আছে বলিয়া সুখ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে—কণ্টক আছে বলিয়া কি মৎস্য ভক্ষণ করিব না—বা ধান্য হইতে তুষকে পৃথক্ করিতে হয় বলিয়াই কি তণ্ডুল ভক্ষণে অপ্রবৃত্ত হইব? বায়ুতে ধূলা আছে বলিয়া কি গ্রীষ্মকালের সায়ংসমীরণ সেবনে বিরত হইব? না জল পঙ্কিল হইবার ভয়ে কৃষ্ট ভূমিতে বীজ বপন করিব না? তাহা কখনই হইতে পারে না, সুখের সহিত দুঃখ অনন্ত কাল হইতে মিশ্রিত আছে; সুখ পাইতে চেষ্টা করিলেই দুঃখও পাইতে হইবে। যখন তাহা হইল, তখন দুঃখের জন্য সুখকে পরিত্যাগ করা মূর্খের কার্য্য বই আর কি বলা যাইতে পারে? ইহাই চার্ব্বাক মতাবলম্বিগণের অভিপ্রায়। চার্ব্বাকবাদিগণের পথপ্রদর্শক' চূড়ামণি বৃহস্পতি। যদিও বৃহস্পতি প্রণীত কোন গ্রন্থই দর্শন করিতে পাওয়া যায় না, তত্রাপি মাধবাচার্য্য তাঁহার প্রণীত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক পুস্তকে বৃহস্পতি বচন বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিলাম।—

'ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মাপারলৌকীকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতুনির্ম্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্নহিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহজন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্নদীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎসুখং জীবেদৃণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরংলোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চজীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে কচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃশ্রুতম্॥
অশ্বস্যাত্রহি * * পত্নীগ্রাহ্যপ্রকীর্ত্তিতম্॥
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতম্॥'

অর্থাৎ স্বর্গ, অপবর্গ বা পরলোকগামী আত্মা নাই। বর্ণাশ্রমাদির কোন ক্রিয়াও ফলদায়িনী হয় না; অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, ত্রিদণ্ড, ও ভস্মলেপন বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিগণেরই ধাতু-নির্ম্মিত জীবিকা; যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন স্বপিতাকে বলি প্রদান করে না? যে প্রাণিগণ মরিয়াছে শ্রাদ্ধে যদি তাহাদিগেরও তৃপ্তি জন্মে, তবে পর্য্যটক বৃন্দের পাথেয় লইবার প্রয়োজন কি? যদি স্বর্গস্থিত লোক ভূতলস্থদানে পরিতৃপ্ত হন, তবে হর্ম্ম্যোপরিস্থিত ব্যক্তিগণেরতৃপ্ত্যর্থ নীচে কেন অন্ন না দেওয়া হয়? যতকাল জীবিত থাক, সুখে থাক, ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করিবে; কেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে তাহার আর পুনরাগমন কোথায়? যদি আত্মা এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া পরলোকে গমন করে, তবে বন্ধুস্নেহে আকুল হইয়া কেন

ফিরিয়া না আইসে? সুতরাং মৃতব্যক্তিগণের প্রেতকার্য্য বিহিত করা ব্রাহ্মণগণেরই জীবনোপায় আর কিছুই নহে; তিন বেদের কর্ত্তা ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর। জর্ফরী, তুর্ফরী ইত্যাদি পণ্ডিতগণের বচন সকলই প্রকৃত। লিখিত আছে যে অশ্বমেধে রাজপত্নী অশ্ব ধরিবেন, ভণ্ডগণ এবংবিধ কত কি ধরিবার কথা লিখিয়াছেন। তদ্রূপ মাংসাদি আমিষভক্ষণও নিশাচর-নির্দ্দিষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ লোকের মধ্যে এক দলের মত উপরে অভিব্যক্ত হইল। ইহাঁদের মতে এই জগৎই সুখের স্থান—যে রূপেই হউক এই স্থানে সুখভোগ কর—দুঃখ সম্মুখে পতিত হইলে তাহাকে বিদূরিত করিয়া সুখের অন্বেষী হও; ইহাই তাঁহাদের যুক্তি, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। এক্ষণে সংসার ও দুঃখ সম্বন্ধে অপর দল কি বলেন তাহাই আলোচনা করা যাউক। প্রথমে সাংখ্যদর্শনই আমাদের আলোচ্য। সাংখ্যকার কপিল দেব ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই—এই জন্য তাঁহার দর্শনকে নিরীশ্বর দর্শন বলা যাইতে পারে; এইরূপে বৌদ্ধদর্শন ও নিরীশ্বর দর্শন মধ্যে গণ্য। দুঃখ সম্বন্ধে কপিলের মত,—সাংখ্যদর্শনের প্রথম সূত্র হইতেই তিনি দুঃখ সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম সূত্র যথা;—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।

অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। দুঃখ ত্রিবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক; আপনাকে অধিকার করিয়া যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাই আধ্যাত্মিক; অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দৈবকারণ বশতঃ যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা আধিদৈবিক; এবং ব্যাঘ্র, চৌরাদি হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ বলিয়া অভিহিত। আবার আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার যথা, শারীরিক ও মানসিক; রোগাদি হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাই শারীরিক এবং মনোবিকার জনিত যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই মানসিক দুঃখপদ বাচ্য। যথা;—

'তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ। শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণাং বৈষম্যনিমিত্তং, মানসং কামক্রোধলোভমোহভয়ের্ষ্যাবিষাদবিষয়বিশেষাদর্শননিবন্ধনম্। সর্ব্বং চৈতদান্তরোপায়সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকং। বাহ্যোপায়সাধ্যঞ্চ দুঃখং দ্বেধা আধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চ। তত্রাধিভৌতিকং মানুষপশুপক্ষিসরীসৃপস্থাবরনিমিত্তম্, আধিদৈবিকং যক্ষরাক্ষসবিনায়কগ্রহাবেশনিবন্ধনম্। (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)।'

মনুষ্য চেষ্টা করিয়া ঐ ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক; আধ্যাত্মিক দুঃখাদি উপস্থিত হইলে চিকিৎসাদি দ্বারা, সতর্কতা, শীতবস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা আধিদৈবিক দুঃখ এবং শান্তি প্রহরী রক্ষা দ্বারা তৃতীয় দুঃখের নিবারণ হয় বটে, কিন্তু উহা চিরকালের জন্য নহে। যেমন প্রতিদিন আহার করা যাইতেছে, প্রতিদিন ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু পরদিন ক্ষুধার পুনরুদ্রেক হইতেছে, এক দিন আহার করিলেই চিরকালের জন্য ক্ষুধাশান্তি হয় না; সেইরূপ সময়ে সময়ে কোন উপায় দ্বারা যে দুঃখের শান্তি করা যায়, তাহা ক্ষণিক

মাত্র, অর্থাদি দ্বারা সকল প্রকার দুঃখেরও শান্তি হয় না। কপিলদেবের মতে মোক্ষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি বলিয়াছেন ;—

'উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ।৫'

পুণ্য কর্ম্মাদি দ্বারা যে স্বর্গাদি লাভ হয় তাহা অপেক্ষা মোক্ষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, দর্শনকারগণের মতে মোক্ষই বা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। মহর্ষি গৌতমও স্বপ্রণীত দর্শনে বলিয়াছেন ;—

'তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ ।। ২১ '

অর্থাৎ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম অপবর্গ। পুরুষার্থ চারিটি ;- ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ; তন্মধ্যে মোক্ষই প্রধান বা পরম পুরুষার্থ। পক্ষান্তরে চার্ব্বাকশিষ্যগণ সুখকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়াছেন, এবং এই জন্যই সংসারে একদল বিষয়ী ও অপরদল বৈরাগী; একদল সুখান্বেষী, অপরদল সুখবিদ্বেষী ; একদল সকলকার্য্যক্ষম, অপরদল পরমুখাপেক্ষী।

এক্ষণে ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র সকলের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদর্শিত হইতেছে। কপিল দেবের মতে প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী ; পুরুষ উদাসীন ও প্রকৃতি-কার্য্যের সাক্ষীমাত্র ; পুরুষ মহদাদিক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে ; বুদ্ধির সুখ দুঃখাদির ভোগ হয়, পুরুষে সেই ভোগের আরোপ হয় ; প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞানের নাম সংসার ও ভেদজ্ঞানের নাম মুক্তি। ইনি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব স্বীকার করেন। ইনি ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই ; এই জন্য তাঁহার দর্শন নিরীশ্বরদর্শন বলিয়া অভিহিত। পতঞ্জল মহর্ষি কপিলের মতের সহিত প্রায় এক মত অবলম্বন করিয়াছেন, কেবল চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উপর তিনি আরও একটি তত্ত্ব স্বীকার করেন—তাহা ঈশ্বর।—পাতঞ্জলদর্শন যোগপ্রধান, এই জন্য ইহাকে যোগদর্শনও বলা গিয়া থাকে। এবং পণ্ডিতগণ কপিলের মতের সহিত পতঞ্জলের একতা আছে বলিয়া এই দুই দর্শনকে এক নামে অভিহিত করিয়া পাতঞ্জলদর্শনকে সাংখ্যের পরিশিষ্ট (Supplement) বলেন। মীমাংসাদর্শনও দুই ভাগে বিভক্ত ; পূর্ব্ব ও উত্তর। উত্তরমীমাংসার অপর নাম বেদান্তদর্শন ও ইহা মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত, এবং অপরটি মীমাংসাদর্শন বলিয়াই অভিহিত—জৈমিনী প্রণীত এবং ইহাই প্রকৃত মীমাংসা শাস্ত্র। কেন না শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ উপস্থিত হইলে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই তাহার মীমাংসা করা হয় ; ইহা কেবল যাগযজ্ঞের বিচারেই পরিপূর্ণ। মীমাংসকেরা মন্ত্রকেই দেবতা বলেন ; মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতা স্বীকার করেন না। বেদান্তমতে পরমাত্মা চৈতন্য স্বরূপ—যদ্রূপ দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ মায়ায় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই প্রতিবিম্বিত পরমাত্মার নাম জীবাত্মা ; এবং সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদজ্ঞানের নাম সংসার, আর অভেদজ্ঞানের নাম মুক্তি। যৎকালে জীবের 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হয়, তখনই তিনি মুক্ত হন। সমুদায় জগৎই ব্রহ্ম, তদতিরিক্ত কিছুই নাই ; ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য পদার্থ জীবাত্মা প্রভৃতি সমুদায়ই অনিত্য। পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা যুগ্ম অর্থাৎ পণ্ডিতগণ এই

দুই খানিকে একই গ্রন্থ বা একখানি অন্যের পরিশিষ্টভাগ (Supplement) বলিয়া থাকেন। অবশেষে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন —এই দুই খানিও যুগ্ম বা একখানি অপরের উপসংহারভাগ; ন্যায়দর্শন মহর্ষি গৌতম প্রণীত এবং বৈশেষিকদর্শন মহর্ষি কণাদ প্রণীত। এই উভয় দর্শনের মতেই পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই নিত্য; পরমাত্মা এক, কিন্তু জীবাত্মা অনেক। জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে গৌতম বলিয়াছেন, পরমাণুবাদ লইয়াই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। যদিও ইনি ঈশ্বরের সত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তত্রাপি সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়াও যেন পরমাণুরই প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনি পরমাণুকে নিত্য পদার্থ বলিয়াছেন; যথা ‘অকারণবন্নিত্যং’। সুতরাং ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিয়াও তিনি এই স্থলে তাহা হইতে পৃথক্ হইতেছেন; এবং সেই জন্যই সৃষ্টিপ্রকরণে বলিয়াছেন “ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ॥” এখানে ঈশ্বর একক কারণ নহেন, কেন না পুরুষকর্ম্মাভাবে ফল নিষ্পত্তি হয় না। ইহা কেবল পুনর্জ্জন্মবাদবশতঃ অসামঞ্জস্য হইয়াছে; কেন না এস্থলে তিনি ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করিয়া অদৃষ্টের ফলাফলকেই তাঁহার সহকারী করিলেন। গৌতম আত্মার নিত্যত্ব স্থাপন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই; মোক্ষ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, তদীয় ষোড়শ পদার্থজ্ঞানে মুক্তি হয়; তিনি জন্ম ও প্রবৃত্তিকে মুক্তিবাধক দোষে দূষিত করিয়াছেন। যথা—

“দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরোপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।” অর্থাৎ দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের বর্জ্জনকেই অপবর্গ বলে। বাৎস্যায়ন এই সূত্রের অর্থস্থলে প্রথমতঃ মিথ্যাজ্ঞানের কতকগুলি দোষাদোষ বিজ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন “শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সাকার প্রাদুর্ভাবকে জন্ম বলে, জন্ম হইলেই দুঃখ হয়—তাহাতে অনিষ্ট, বেদনাবোধ, পীড়া অনুভূত হয়; এই সকল মিথ্যাজ্ঞানাদি দুঃখ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নপ্রবর্ত্তমান ধর্ম্মকে সংসার বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের নাশে দোষরাশি নষ্ট হয় —দোষের নাশে প্রবৃত্তি নষ্ট হয়—প্রবৃত্তির নাশে জন্ম নষ্ট হয়—জন্মের নাশে দুঃখ নষ্ট হয়—দুঃখের নাশে আত্যন্তিক অপবর্গ ও তাহাই পরম পুরুষার্থ।

অবশেষে বৈশেষিক দর্শন—এই দর্শনের বৈশেষিক নাম হইবার কারণ এই যে, ইহাতে অন্যান্য দর্শনের অনভিমত বিশেষ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ আছে, সেই জন্য উক্ত দর্শন বৈশেষিক দর্শন নামে আখ্যাত। গৌতম যে পরমাণুবাদ সঙ্কেতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কণাদ তাহা বাহুল্য রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কণাদের মতে, তিনি যে বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব সূচনা করিয়াছেন তাহাও নিত্য; কেন না আকাশ প্রভৃতি যাবতীয় নিত্য পদার্থেই সেই পদার্থটি বিদ্যমান আছে। যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে পরমাণু সকলের পরস্পর ভিন্ন রূপতার নিশ্চয় করা যাইত না। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় ইহার মতেও অত্যন্ত দুঃখ

নিবৃত্তির নাম মুক্তি। মহর্ষি কণাদ যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তত্রাপি সৃষ্টি কল্পে তাঁহার কোন ক্ষমতাই দেখান নাই,—তিনি অদৃষ্টকেই সকল কার্য্যের মূল বলিয়াছেন। যথা;—

অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্‌পতনম-
ণূনাং মনসশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতং॥

অর্থাৎ সৃষ্টি কল্পে অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তির্য্যক্ পতন এবং পরমাণু ও মনের আদ্য ক্রিয়া অদৃষ্টের দ্বারা সংসাধিত হয়। মহর্ষির মতে পরমাণুর আদ্য ক্রিয়া অদৃষ্ট বশতঃ হয়, আর সেই আদ্য কর্ম্মের অভিঘাতে পরমাণুর সংযোগারম্ভ হয়, সুতরাং তাহাই জগতের নিমিত্ত কারণ। তাহা হইলেই তিনি সৃষ্টি কল্পে ঈশ্বর স্বীকার করিলেন কই? তবে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, "সমুদায় নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অদৃষ্টই আদিম—ইহা ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী নহে—প্রত্যুত তাঁহার যন্ত্র মাত্র—তিনিই যন্ত্রী হইয়া চালাইতেছেন।"

এক্ষণে প্রায় সমুদায় দর্শনেরই মূল আলোচনা করা হইল। ইহাতেই পাঠক গণ বুঝিতে পারিবেন, যদিও একজন দর্শনকার অপরের মুখাপেক্ষী হন নাই ও পরস্পর বিভিন্ন মত প্রদান করিয়াছেন, তথাপি সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন 'দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ।' এক্ষণে এই সকল দর্শনের বৃত্তান্ত ও তাহাদের মতে ঈশ্বর কিরূপ তাহাই লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

সাংখ্যদর্শন। ইহা মহর্ষি কপিলপ্রণীত; ইহাতে প্রকৃতমহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা আছে বলিয়া ইহাকে সাংখ্যদর্শন বলে। যথা;

'সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিংচ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানিচ চতুর্ব্বিংশৎ তেনসাংখ্যাঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥'

কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন যে অতি প্রাচীন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু কত দিনের তাহা নির্ণয় করিবার সুন্দর উপায় নাই। গৌড়পাদ প্রণীত সাংখ্যভাষ্যে কপিল সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; কিন্তু পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ইত্যাদি সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে কপিলের নাম দেখা যায় না। তবে সনক, সনন্দ, সনাতন, আসুরি, কপিল, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ, ইহাঁরাই উক্ত সপ্তর্ষিমণ্ডলের অভিধেয়। কেহ কেহ কপিলকে বিষ্ণুর অবতার, কেহ বা অগ্নির অবতার বলিয়াছেন। অগ্নির বর্ণ কপিল বলিয়াই হয়ত তদনুচরগণ তাঁহাকে অগ্নির অবতার বলিয়া থাকেন। যতগুলি দর্শন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে কপিল-প্রণীত দর্শনই সর্ব্বপ্রাচীন, কিন্তু আমরা এক্ষণে যে সাংখ্যদর্শন দেখিতে পাই, তাহা মহর্ষি কপিল-প্রণীত নহে,—কেননা এই সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশসূত্রে আমরা দেখিতে পাইঃ—

'ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ॥ ২৫'

অর্থাৎ আমরা বৈশেষিকবাদিগণের ন্যায় নিয়ত ষট্‌পদার্থবাদী নহি। তাহা হইলেই যখন মূল সাংখ্য গ্রন্থে বৈশেষিকগণের উল্লেখ আছে, তখন বৈশেষিকগণ সাংখ্য অপেক্ষা প্রাচীন একথা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাহা নহে,—মহর্ষি কপিল প্রণীত গ্রন্থই সর্ব্বপ্রাচীন। এরূপ হইবার কারণ ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহা কপিলদেব প্রণীত মূলগ্রন্থ নহে, তবে তাঁহার প-

রবর্ত্তী সময়ে তদনুচরগণ তদুপদিষ্ট বাক্য-গুলি যখন গ্রন্থরূপে নিবদ্ধ করেন, তখন অন্যান্য দর্শনেরও সৃষ্টি সাধন হইয়াছে;— অধুনা যে সাংখ্যদর্শন পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কপিল প্রণীত নহে, তাঁহার কোন অনুচর-রচিত। তবে কপিল প্রণীত গ্রন্থ কি? এ-কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা বলি সাংখ্যদর্শনের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য নামক টীকাগ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সমীচীন। তিনি বলেন তত্বসার নামক গ্রন্থই সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ, এবং আমরা বলি তাহাই মহর্ষি কপিল প্রণীত।

সাংখ্যদর্শন ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত।—প্রথম তিন অধ্যায়ে সাংখ্য শাস্ত্রের স্থূলমর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে; চতুর্থ অধ্যায়ে কতকগুলি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়া বিবেকজ্ঞান সাধনের উপায় কল্পিত হইয়াছে; পঞ্চম অধ্যায়ে বিরুদ্ধ মতাবলম্বিগণের মত খণ্ডিত হইয়াছে; ষষ্ঠ অধ্যায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের নির্ণীত শাস্ত্রার্থ একত্রে সঙ্কলিত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই, এইজন্য ইহাকে নিরীশ্বর দর্শন বলে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা মহর্ষি কপিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, কেবল তিনি বিচারমুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই। পতঞ্জলি-শিষ্যেরা বলেন, পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্য দর্শনের পরিশিষ্ট স্বরূপ, কেন না মহর্ষি পতঞ্জলি কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কপিল প্রণীত দর্শনের অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছেন।

পাতঞ্জল দর্শন। মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত দর্শনও সাধারণতঃ সাংখ্যদর্শন বলিয়া অভিহিত, মহর্ষি কপিলের সহিত ইনি প্রায় একমত, কেবল অধিকের মধ্যে ইনি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, এই জন্য ইহাঁর দর্শনকে সেশ্বর দর্শন বলাযায়। এই দর্শন চারিভাগে বিভক্ত,—এই চারিটির এক একটির নাম পাদ; প্রথম পাদে যোগানুশাসন বা সমাধি পাদ, ইহাতে ধ্যানের বিষয় নির্ণীত হইয়াছে; দ্বিতীয় পাদে তপঃস্বাধ্যায় ঈশ্বরপ্রণিধান যমনিয়মাদির বিষয়, ইহাতে সমাধিলাভের উপায় নির্ণীত হইয়াছে; তৃতীয়পাদে ধ্যান,ধারণা,সমাধি ইত্যাদির বিষয়, ইহাতে কি প্রকারে বিভূতি বা অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারাযায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে; চতুর্থপাদে জন্মৌষধি তপঃ-সমাধিজাত সিদ্ধির বিষয়, ইহাতে কৈবল্য বা ঈশ্বরভাবনার বিষয় লিখিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের অনেকগুলি টীকা আছে। তন্মধ্যে পাতঞ্জলভাষ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, এবং বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত আর একখানি টীকা গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। বিজ্ঞানভিক্ষু মুল পাতঞ্জলদর্শনের যোগবার্ত্তিক নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই দর্শন ব্যতীত মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত আর দুই খানি গ্রন্থ আছে;—একখানির নাম মহাভাষ্য বা পাণিনীয় দর্শন; ইহাতে পাণিনিকৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় বিচার লিখিত আছে; অপর তিনি একখানি বৈদ্যশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যথা আমরা পাণিনীয় দর্শনে পতঞ্জলির কোন শিষ্যকৃত মঙ্গলাচরণে দেখিতে পাই;—

'যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং,
মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরো তং প্রবরং মুনীনাম্,
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি ॥' ১

অর্থাৎ যিনি যোগশাস্ত্র রচনা করিয়া লোকের চিত্তমল, পদশাস্ত্র রচনা করিয়া বাঙ্মল এবং যিনি বৈদ্যশাস্ত্র রচনা করিয়া শারীর মল নষ্ট করিয়াছেন, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলিকে নতশরীরে করযোড়ে প্রণাম করি। কৈয়টপুত্র কৈয়টোপাধ্যায় এই মহাভাষ্যের উপর টীকা করিয়াছেন।

মহর্ষি বেদব্যাস নিম্নলিখিত শ্লোকে পাতঞ্জল দর্শনের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। যথা;—

'যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায়।
প্রক্ষীণক্লেশরাশির্ব্বিষমবিষধরোঽনেকবক্ত্রঃসুভোগী ॥
সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতির্ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যম্।
দেবোঽহীশঃ সবোঽব্যাৎসিতবিমল তনুর্যোগদোযোগযুক্তঃ ॥ ১ ॥'

অর্থাৎ যিনি অনুগ্রহ বিধানার্থ আপনার আদ্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতেছেন, যাঁহার অনুগ্রহে সমুদায় ক্লেশ রাশি বিনষ্ট হইতেছে, যিনি বিষম বিষের ধারণকর্ত্তা, বহুবক্ত্র, সুভোগশালী, সকল জ্ঞানের জন্মদাতা, ভুজঙ্গ সকল চির পরিবৃত হইয়া যাঁহার প্রীতি সাধন করিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত, যিনি শ্বেত ও বিমল শরীর বিশিষ্ট এবং যোগযুক্ত, সেই অহীশ্বর অনন্ত দেব (পতঞ্জলি ঋষি) তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

ইহাতে বেদব্যাস তাঁহাকে অনন্তদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পৌরাণিক মতে, যে অনন্তদেব এই সসাগরা ধরিত্রী স্বীয় ফণমণ্ডলোপরি ধারণ করিয়া আছেন, মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার অবতার। তিনি ফণীর অবতার ছিলেন বলিয়াই তাঁহার 'মহাভাষ্যের' অপর নাম 'ফণিভাষ্য'। মহর্ষি পতঞ্জলি সামান্য দিনের লোক নহেন—তাঁহার সময় নির্ণয় সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহা এ স্থানে উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; সময়ান্তরে সে বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এক্ষণে সাংখ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। সাংখ্য প্রবচনের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত টীকার নাম 'সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য'; পাতাঞ্জল দর্শনেরও অপর নাম 'সাংখ্যপ্রবচন'। 'সাংখ্য তত্ত্বসার' নামে আর একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাও বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত। 'সাংখ্যকারিকা' নামে অপর একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বর কৃষ্ণ বিরচিত। ইহাতে ৭২টি আর্য্যাতে সমুদায় সাংখ্য দর্শনের সারমর্ম্ম সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই কারিকার চারিখানি টীকা গ্রন্থ আছে। যথা;—'সাংখ্য ভাষ্য' ইহা গৌড়পাদ প্রণীত —ইনিই যাবতীয় উপনিষদের টীকাকার; দ্বিতীয় 'সাংখ্যচন্দ্রিকা,' ইহা নারায়ণতীর্থ-বিরচিত; তৃতীয় টীকার নাম 'সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী,' ইহা বাচস্পতিমিশ্র প্রণীত; এবং চতুর্থ টীকা গ্রন্থের নাম 'সাংখ্যকৌমুদী' ইহা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। এই চারি খানি টীকার মধ্যে মৈথিলবাচস্পতি মিশ্রের

কৃত 'সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী' সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক্ষণে কেহ মূল গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক জ্ঞান করেন না। তৎপরিবর্ত্তে ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত 'সাংখ্যকারিকা' ও তাহার টীকা গুলিই সর্ব্বত্র আদৃত ও পঠিত হইয়া থাকে; এবং তাহা হইলেই সমুদায় 'সাংখ্য দর্শন' পাঠ করা হইল, এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। এবং বাস্তবিকই এই কারিকা ও ত গুলি পাঠ করিলে, আর মূল গ্রন্থ পাঠ করিবার আবশ্যক করে না। সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে এই গ্রন্থগুলিই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ।)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। 'অক্ষয় উপাখ্যান। শ্রীকরুণাকান্ত গুপ্ত প্রণীত।'—গ্রন্থকার 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' দেখিয়া 'অবাক্' হইয়া, 'বঙ্গের বর্ত্তমান সাময়িক (সামাজিক?)' অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই অক্ষয় উপাখ্যান প্রচারিত করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন—'যে সমস্ত গুণে গ্রন্থকর্ত্তাগণের গ্রন্থাবলী জনসমাজে সমাদৃত হয় তাহার কোন গুণই ইহাতে লক্ষিত হইবে না'। কিন্তু শুদ্ধ তাহাই নয়। যে সমস্ত দোষে গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থাবলী জনসমাজের আমোদ বর্দ্ধন না করিয়া সামাজিকদিগের ক্রোধ,উপহাস ও চক্ষুঃশূলতা প্রভৃতির ভাজন হয়,ইহাতে সেইগুলি বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইবেক। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে দুই চারিটি প্রদর্শিত হইল। অক্ষয় উপাখ্যান দোষের অক্ষয় ভাণ্ডার। সুতরাং ইহার দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য আমাদিগকে অধিক শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না।

এই গ্রন্থের অনেক কথা অদ্ভুত, কোন কোনটি অপূর্ব্ব প্রলাপ বলিয়াও গণ্য হইতে পারে। যথা;—

১ নং—"পিতার কেবল উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, কারণ যেমন মণিকুণ্ডলধারী মনুষ্যগণের একাকী ভ্রমণ ভয়সঙ্কুল বটে, তদ্রূপ ধনীসন্তানগণেরও প্রথম পাদবিক্ষেপনাবধি বিশেষ আশঙ্কার কারণ বটে।"

২ নং—"ইহা কি কষ্টের বিষয়, এই জগতে কিছুই (কিছুরই?) সামঞ্জস্য নাই, সাধু ব্যক্তি যে কর্ম্মে লিপ্ত হয় অসজ্জনেরা তাহাতে অপরিতুষ্ট থাকে।"

যে দিন সাধু অসাধু একই কর্ম্মে লিপ্ত হইবে, লেখকের মতে, সেই দিন, সকল বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য সংঘটিত হইবে।

৩ নং—"পুরুষের পৌরুষত্ব ভিন্ন পুরুষকার ভিন্ন আর কিছুই নাই।"

এইরূপ পত্রে পত্রে অসঙ্গত প্রলাপের বহুবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থটি ব্যাকরণদোষে পরিপূরিত। যথা—

১ নং—"এমন সময়ে প্রণয়ী যুগলের মনে একটী কালকবলিত জীবের জীবমান ক্রীড়া স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল; সেইটী তাহাদিগের প্রাণসম প্রিয়পুত্র

'জীবমান ক্রীড়া' কাহাকে বলে? 'প্রণয়ী যুগলের মনে, স্মৃতিপথে, আরূঢ় হইল' ইহা কিরূপ রচনা? 'সেইটি শ্রীশ' কোন্‌টি? জীবমান ক্রীড়া? না আরূঢ় হওয়া?

২নং—"সেই জনক জননীর লালন পালন জনিত প্রত্যুপকার না করিয়া"

'লালন-পালন-জনিত প্রত্যুপকার' কি? লালন পালন স্বরূপ যে উপকার, তাহার প্রত্যুপকার সম্ভব। কিন্তু জনক জননী যে লালন পালন করেন, তাহা হইতে কিরূপ প্রত্যুপকার জন্মে তাহা আমরা জানি না।

৩নং—"অপিচ রাজার অনুষ্ঠিত অধর্ম্মাচরণ রাজ্য নিরয়গামীর কারণ বটে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

নিরয়গমনের কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু নিরয়গামীর আবার কারণ কি?

গ্রন্থে বর্ণাশুদ্ধি অসংখ্য; যথা—'সশ্রীল' 'ন্যাস্ত' 'গুণীগণ' 'শতাব্দি' 'আশিবীষ' 'হীতগর্ভ'—এই গ্রন্থের যেখানে 'ন্যাস্ত' সেখানেই আকার;—যেখানে 'হীতগর্ভ' সেখানেই দীর্ঘ ঈকার! ইত্যাদি।

গ্রন্থে ভাবের সমাবেশও বিচিত্র—রাণী, কাদম্বরীর রাণীর ন্যায়, স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নদর্শনেই গর্ভসঞ্চার হইল। (এইটি আবার বর্ত্তমান সামাজিক চিত্র!) পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিদেশ ভ্রমণে নিযুক্ত হইলেন। মিসর দেশ ও ইংলণ্ড দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইংলণ্ডে গিয়া, পুত্র দেখিলেন যে 'Vernacular Press Act' সম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা হইতেছে। পরে রাজপুত্র স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

গ্রন্থকর্ত্তার নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে, তিনি যেন আর বিনাদোষে বঙ্গসাহিত্যকে এরূপ যন্ত্রণা প্রদান না করেন।

২। 'কুটীর কুসুম (উপন্যাস) শ্রীউমেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত।'—এই উপন্যাসটি মন্দ হয় নাই। ইহার গল্পটি কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিতে পারে। যদিও ইহার রচনা অতি কদর্য্য (কেন কদর্য্য তাহা পরে বলিতেছি) এবং যদিও ইহাতে ভাবের (Ideas) সংখ্যা অতি অল্প, তথাপি ইহার কিয়দংশ পাঠ করিয়া আমরা শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

লেখকের গল্পরচনা করিবার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু তিনি চরিত্রবিন্যাসের কিছুই ধার ধারেন না। তাঁহার নায়ক বা নায়িকা কি চরিত্রের লোক তাহা বোধ হয় তিনিই বুঝিয়া দেখেন নাই। সমালোচক ত দূরের কথা।

পুস্তকখানির আর একটি প্রধান দোষ এই যে, ইহা অনুকরণে ও বর্ণাপহরণে পরিপূর্ণ। বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশনন্দিনী হইতে লেখক দুই হস্তে ভাব, ভাষা প্রভৃতি চুরি করিয়াছেন। আমরা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

'দেখিতে দেখিতে দণ্ডেক (দণ্ডেক?) পরে ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি নামিল। দুই ভাইয়ে ঘোর মাতামাতী আরম্ভ হইল। দাদা ঝড়ির মনে স্বগরিপানা' (বিষবৃক্ষ ৫ পৃষ্ঠা।)

"আহা—কি সুকণ্ঠে গায়, আর সহ্য হইল না। কাজি সাহেব অবগুণ্ঠন মোচনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। অবগুণ্ঠনবতীও অমনি বিষমছুরিকা বক্ষে বিদ্ধ

করিয়া দিলেন। পিশাচী, সয়তানী, ব-লিয়া কাজি সাহেব ভূশায়ী হইলেন।'

(দুর্গেশনন্দিনী—যেখানে বিমলা কতলু খাঁকে হত্যা করিতেছে।)

ভাষার অনুকরণ করিতে গিয়া লেখক কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, পাঠক নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

"এখনও পাক নামিল না। কেন নামিতেছে না? আজ কি উনুন জ্বলে না? জ্বলিবে না কেন? তবে কি কাঠগুলো ভিজান (ভিজা?) একে চৈত্র মাস, তাহাতে এক পক্ষ মধ্যে মেঘের ডাক নাই। (লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বরাত্রে ভারি বৃষ্টি হইয়াছিল, তখনই ঝড় ও বৃষ্টি দুই ভাইয়ে মাতামাতি হইয়াছিল)। তবু কি কাঠ ভিজা? যদি অন্য কোন রকমে ভিজে থাকে? কিসে ভিজিবে? নয়নের জলে? তাহাও নয়। তবে জ্বলিতেছে না কেন?"

ইত্যাদি

ঠান্ দিদি গল্প করিতেন,—

লটে গাছটা মোড়াল কেন? কেন রে লটে মোড়াস কেন? গোরুটা খায় কেন? কেন রে গোরু খাস কেন? রাখালে চরায় না কেন? ইত্যাদি

এস্থলে আমরা লেখককে একটি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। উইলিয়ম্ দি কঙ্কারারের একটি ধনুক ছিল। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তাহাতে জ্যাসংযোগ করিতে পারিত না। ভাষাপ্রবর্ত্তক প্রধান লেখকদিগের ভাষাও কতক পরিমাণে সেইরূপ। তাঁহাদিগের করধৃত ধনুকে জ্যাসংযোজন যার তার কর্ম্ম নয়। লেখক যে স্থলে নিজের ভাষায় লিখিয়াছেন, সে স্থলে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"ভগ্নী, আমার মানস যে আর একবার সে দেবতাকে দেখিব। হতভাগিনীকে ভালবাসিয়া যে তাঁহার পথে পথে বেড়াইতে হইল, তাঁহার অকলঙ্ক কুলে (যে?) কলঙ্কের রেখা পড়িল, সেই জন্য পায় ধরিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিব। আমার সদয় দেবতা আমায় ক্ষমা করিবেন।" ইত্যাদি

লেখক যদি বরাবর এই ভাষায় পুস্তক খানি লিখিতেন, তাহা হইলে ইহা আরও মনোহর হইত। তাঁহার গল্প রচনায় দক্ষতা আছে। এবং তাঁহার রচনাও স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট। আমরা আশা করি তিনি কাহারও অনুকরণ করিতে না গিয়া বারান্তরে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া পুস্তক লিখিবেন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, তাহা হইলে তাঁহার পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র নাই হউক, অন্ততঃ উপাদেয় পুষ্প বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে।

আমরা আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। লেখকের নীতি (Moral tone) নির্দ্দোষ। এখন কার এই এক রোগ দাঁড়াইয়াছে যে, অনেকেই পাপকে মনোহর চিত্রে চিত্রিত করে। আমাদের গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। তিনি পাপী কাজিকে বীভৎস আকারে চিত্রিত করিয়াছেন। অথচ ইহাতে গল্পের মনোহারিত্ব কিছু মাত্র নষ্ট হয় নাই। শ্রীনী—

দিগন্তমিলন।

পূর্ব্ব আর পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণ স্থূল দৃষ্টিতে বড় দূর। দিঙ্মণ্ডলের এক প্রান্তে পূর্ব্ব, আর এক প্রান্তে পশ্চিম; এক প্রান্তে উত্তর, আর এক প্রান্তে দক্ষিণ; এবং মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। কিন্তু বুদ্ধি যে থানে দিগন্ত কল্পনা করে, গোলকের সেই কল্পিত প্রান্তরেখায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরস্পরকে প্রণয়ে চুম্বন করে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ একবৎ প্রতীয়মান হয়।

নীতিজগতেও এইরূপ দিগন্তমিলনের বহু উদাহরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান আর অজ্ঞান নৈতিক দিঘ্মণ্ডলের দুই প্রান্তে অবস্থিত। জ্ঞানের নাম আলোক, অজ্ঞানের নাম অন্ধকার। জ্ঞানে মনুষ্যের পুনর্জন্ম, অজ্ঞানে জন্মান্ধতা। এই উভয়ে এত প্রভেদ যে যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে জ্ঞানালোক-বঞ্চিত দুর্ভাগ্য মনুষ্য হইতে পৃথগ্জাতীয় জীব বলিয়া অবধারণ করিলেও তাহা অতিবাদ হয় না। এক জন জগতের আদিতত্ত্ব কিংবা বর্ত্তমান শক্তিপ্রবাহের কারণ-চিন্তায় ধ্যানমগ্ন, আর এক জন আপনার তন্মুহূর্ত্তের প্রয়োজনবিষয়েও চিন্তাশূন্য। একজনের দৃষ্টি কালের দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া ধরিত্রীর স্তরে স্তরে কিংবা নভোমণ্ডলের নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাস পাঠ করিতেছে, আর এক জনের জড়-বুদ্ধি সামান্য একটি কথার আদ্যোপান্ত আলোচনাতেও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এক জন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে জ্ঞান-লভ্য দেব-সম্পদের নিকট অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তত্ত্বসমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে, আর এক জন অতি অকর্ম্মণ্য একটি ক্রীড়া কৌতুককেও সংসারের সমস্ত কার্য্য ও সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা হইতে অধিকতর মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া সেই ক্রীড়ামোদে ক্ষিপ্তের ন্যায় খল খল হাসিতেছে। কিন্তু এই উভয়ের জীবন-বর্থ্মে এত দূরতা সত্বেও আধুনিক বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান আর অজ্ঞান এক। যিনি জ্ঞান-শৈলের ঊর্দ্ধতম শিখরে আরূঢ়, তাঁহার ও শেষ কথা এই যে, তিনি কিছু জানেন না; এবং যে হিতাহিতবোধ-শূন্য জঘন্য মনুষ্য-পশু, তাহারও শেষ কথা এই যে, সে কিছু বুঝে না। জ্ঞানের প্রান্ত-রেখায় উভয়েই এই অংশে সমান। সেই বৈদিক সময়ের আচার্য্যগণ অবধি গ্রীসের সক্রেটিস, জর্ম্মনির স্পিনোজা, ফ্রান্সের সেণ্ট সাইমন ও কোম্‌ট, আমেরিকার ইমারসন এবং ইংলণ্ডের কার্লাইল, স্পেন্সর ও টিণ্ডাল প্রভৃতি মনুষ্যসমাজের অগ্রগণ্য মনস্বীরা এই বলিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিলাপ করিয়া গেলেন যে, তাঁহারা কিছুই জানিতে পাইলেন না; এবং যে সকল হতমূর্খের জীবন কপিনৃত্যেই পর্য্যবসিত হইল,—যাহাদিগের নিকট জগ-

তের উৎপত্তি-স্থিতি এবং ক্রীড়নকের লীলা-গতি উভয়ই সমান,—মনুষ্য-হৃদয়ের গভীর-তম দুঃখ ও গূঢ়তম বেদনাও যাহাদিগের নিকট বিকট হাস্য ও ব্যঙ্গ পরিহাসের কথা, তাহারাও ইহাই বুঝাইয়া গেল যে, তাহারা কিছু বুঝিতে পাইল না।

এইরূপ তপোরত যোগী এবং তৃষ্ণাদগ্ধ ভোগী;—অথবা নীতিধর্ম্মের নূতন প্রবর্ত্তক ও সমাজ সংস্কারক বীর,এবং নীতি ও সামা-জিক শান্তির চিরপরিপন্থী পাষণ্ড অসুর। একদিকে দেখিতে গেলে এ উভয়ে কিছুই সাম্য নাই। জলে ও স্থলে এবং শৈত্যে ও উত্তাপে যত না পার্থক্য, ইহাদিগের পা-র্থক্য তাহা অপেক্ষাও বিস্ময়াবহ। কোথায় তপস্যার অমৃতময়ী পবিত্রতা, আর কোথায় পৈশাচিক প্রবৃত্তির পাপময়ী প্রমত্ততা! কোথায় শান্তির নির্ম্মল সুধা, আর কোথায় অশান্তির জ্বালাময় বিষ! কোথায় বিশ্বজনীন মানবজাতির মঙ্গলকামনায় অশ্রুবিসর্জ্জন, আর কোথায়, অমঙ্গলের অবতারের ন্যায় মানব-সমাজের মর্ম্মকৃন্তন ও অস্থিচর্ব্বন! এক জন দেবতার মত বাহু তুলিয়া স্নেহের পূর্ণো-চ্ছাসে মনুষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে;—এবং যে অপকার করে তাহারও উপকার করিয়া,যে ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে কর্কশ কথা কহে, তাহাকেও প্রীতিমধুর প্রিয় কথায় কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ দেখাইতেছে। আর এক জন অপদে-বতার মত দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া আশীর্ব্বা-দের বিনিময়ে অভিসম্পাত করিতেছে, এবং অমঙ্গল তুমিই আমার মঙ্গল হও * এই রূপ আসুর দর্পে ভ্রুকুটি ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া আপনাকে আপনি ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে। এক জন মহত্ত্বের পূজাপ্রচার ও মনু-ষ্যনিষ্ঠ প্রকৃত মহিমার গৌরব-বিস্তারের জন্য আপনার বক্ষস্থলের রক্ত ঢালিয়া দিতেছে, আর এক জন মহত্ত্বের মস্তকে পদাঘাত ক-রিবার বিকৃত লালসায় আপনার হৃৎপিণ্ড হইতে সমস্ত সুকুমার বৃত্তির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছে। এক জন দয়ার নির্ম্মলস্পর্শে দ্রব হইয়া,—আপনার প্রাণকে দয়ার শতমুখী ধারায় সংসারে বি-লাইয়া দিয়া, শতসহস্র প্রাণ শীতল করি-তেছে;—যেখানে রোগ সেখানে ঔষধ, যে-খানে শোক সেখানে সান্ত্বনা, এবং যে-খানে বিপত্তি সেখানে সাক্ষাৎ সাহসের ন্যায় অভ্যুত হইতেছে;—অথবা জগতের দুঃখভার ও দুরিতভার দূর করিবার জন্য একে এক সহস্র হইয়া সহস্রাধিক হৃদয়কে এক সূত্রে গাঁথিয়া লইতেছে, এবং সেই অ-সাধ্য সাধনের অপরিহার্য্য প্রয়াসে, হয় জ্ব-লন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, না হয় ক্রুশদণ্ডে বিলম্বিত হইয়া ধূলিমুগ্ধ মনুষ্যকে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ও মূর্ত্তিমতী মানুষী শক্তি প্রদর্শন করিতেছে। আর এক জন কিরূপে কাহার অন্তরে নিষ্ঠুর আঘাত করিবে,নিভৃতে বসিয়া তাহা ভাবিতেছে,—যে রুগ্ন তাহার রোগে জ্বালা বাড়াইতেছে, যে শোকাকুল তাহার শোকে অরুন্তুদ বেদনা জন্মাইতেছে, যে বিপন্ন তাহার বিপদের উপর অচিন্তিত-পূর্ব্ব ক্লেশের ভার বসাইয়া দিতেছে, এবং প্রকৃতির ঔদ্ধত্য বশতঃ দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন জ্ঞানে আপনার বিড়ম্বিত

* "Evil, be thou my good."

আত্মাকেই সমাজের একমাত্র পূজ্য পদার্থ অবধারণ করিয়া আপনার সেই ক্ষুদ্রতা ও ক্ষুৎপিপাসার নিকট ধর্ম্ম, নীতি, ইহকাল. পরকাল, এবং সকল কালের মূলসাধন সামাজিক জীবনকে বলি দিতে যত্ন পাইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই উভয়ের মধ্যে এইরূপ ভয়ানক বৈলক্ষণ্যসত্বেও নীতিমণ্ডলের প্রান্ত সীমায় এই উভয় শ্রেণিস্থ মনুষ্য প্রকৃতির অনেক লক্ষণে এক।

তপস্যার প্রধান লক্ষণ আত্মবিস্মৃতি। যিনি তপোরত, তিনি স্বভাবতঃই আত্মবিস্মৃত। তিনি থাকিয়াও নাই। তাঁহার দৃষ্টি শ্রুতি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সমস্তই সেই তপস্যায়। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য,—আপনাতে আপনি নিমগ্ন। এই জগতে যদি কেহ প্রমত্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই প্রমত্ততা তাঁহার। মদিরায় আর মত্ততা কি? মনুষ্যের ধমনী উহার প্রভাবে মুহূর্ত্ত মাত্র নৃত্য করে, মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হয়, মুহূর্ত্তের জন্য প্রকৃতির প্রশান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিত হইয়া উঠে। যিনি কোন না কোনরূপ তপস্যাতে ডুবিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সকল সময়েই সমান মত্ততা। যাহারা পাপের পঙ্কিল প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিয়া উহার শেষ সীমায় পৌছিতে চাহে, তাহাদিগের মানসিক অবস্থাও কি কোন কোন অংশে এইরূপ নহে? তাহারাও আত্মবিস্মৃত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও অহোরাত্র সমান মত্ত। জননী যখন পাপ-পিপাসার পরিতৃপ্তির জন্য সন্তানের কণ্ঠচ্ছেদ করে,—পুত্র পিতৃহত্যায় লিপ্ত হয়, পিতা নবপ্রসূত পুত্রের মুখে গরল তুলিয়া দেয়, পতিপত্নী একে অন্যের শোণিতে বিষাক্ত বিদ্বেষ-বুদ্ধির তর্পণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করিতে পায়, ভ্রাতা ভ্রাতার স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া পৃথিবীর মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপ-মোহে একদিকে বাহির হইয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাকে আত্মবিস্মৃত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও প্রমত্ত না বলিয়া আর কি বলিব? বস্তুতঃ ভাবের অলৌকিক মহত্বে যেমন মোহ আছে, পাপের পরাকাষ্ঠাতেও তেমনই এক মোহ আছে। যোগী মুগ্ধ, তাপস মুগ্ধ, আর যে পাপের মোহময় প্রলোভনের নিকট আপনার প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বল, সংসার, সম্মান, ও শান্তিসুখ বিক্রয় করিয়াছে, সেও তেমনই মায়ামুগ্ধ। নহিলে, সে রূপ-মুগ্ধ পতঙ্গের মত অনলে পড়িয়া পুড়িয়া মরিতে সম্মত হইবে কেন?

অপিচ, যাঁহারা নীতি ও সত্যের বলে বলীয়ান্ ও ন্যায়বান্,—যাঁহারা শুদ্ধতর নীতি ও উচ্চতর সত্যের পবিত্র জ্যোতিতে অনির্ব্বচনীয় সামর্থ্যলাভ করিয়া পল কি লূথরের মত সামাজিক সংস্থানের পরিশোধনে কিংবা নীতির নূতন ভিত্তি স্থাপনে দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষণ কি?—না, তাঁহারা নির্ভীক, নিশ্চল, দৃক্‌পাতশূন্য এবং লজ্জা ও স্তুতিনিন্দার অগম্য। লোকে ভাল বলুক, কি মন্দ বলুক, অযুতমুখে যশঃকীর্ত্তন করুক, কিংবা অযুতকণ্ঠে অপবাদ করিতে রহুক, তাহাতে তাঁহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। মহাত্মা লূথর যত নিন্দা সহিয়াছেন,—তিনি তাঁহার মস্তকে যত কলঙ্কের ভার বহিয়াছেন, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশ নিন্দা এবং একাংশ কলঙ্কেই এখনকার অনেক

সুক্ষ্মচর্ম্মা সাধু আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু সেই নিন্দা ও সেই কলঙ্ক পর্ব্বত-প্রান্তবর্ত্তিনী স্রোতস্বিনীর আবিল তরঙ্গের ন্যায় তাঁহার পাদমাত্র স্পর্শ করিয়াই প্রতিহত হইয়া যাইত, কখনও তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইত না। লজ্জা ও কলঙ্কের পর ভয়? ভয় ঈদৃশ পুরুষের নাম স্মরণেও ভীত হয়। যিনি ধর্ম্ম কি নীতির কোন নূতন আলোক বিকীরণের অভিলাষে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যের প্রতিকূলে পর্ব্বতের মত অটলভাবে উত্থিত হন,—যিনি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই যাতনা, লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা ও বিঘ্নবিপত্তি লইয়া ক্রীড়া করেন,—সুখে যাঁহার সুখবোধ নাই এবং দুঃখও যাঁহার পক্ষে দুঃখজনক নহে,—মৃত্যু যাঁহার মুক্তির পথ এবং মৃত্যুর করাল গ্রাস যাঁহার স্বর্গসম্পদের প্রথম সোপান, তাঁহার আবার এ সংসারে ভয়ের কথা কি? যদি তাদৃশ হৃদয়েই ভয়ের প্রবেশ কি সঞ্চার-সম্ভাবনা থাকিবে, তবে সত্যের অবলম্ব-স্থল কোথায়? যদি তাদৃশ ব্যক্তিরাই ক্ষীণজীবী মনুষ্যের ভয়ে ভীত হইবেন, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, অগ্নিতে পোড়াইয়া, অশ্রুজলে ধুইয়া, সময়ে সময়ে নূতন করিয়া তুলিবে কে? কিন্তু হায়! যে সকল দুর্ম্মদ পুরুষ পাপের বলে বলীয়ান্, তাহারাও বহুল পরিমাণে এইরূপ লজ্জাশূন্য, ভয়শূন্য, স্তুতিনিন্দার অস্পৃশ্য ও অভিমানে অটল। তাহারা প্রথমতঃ কিছুদিন লজ্জা ও ভয়ে সংকুচিত রহে,—লজ্জা তাহাদিগের দৃষ্টিকে জড় সড় করে, ভয় তাহাদিগের চিত্তবৃত্তিকে শাসনে রাখিতে চাহে। কিন্তু যখন লজ্জা ও ভয় ধীরে ধীরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপসৃত হয়,—যখন তাহাদিগের কলুষকঠিন প্রাণ পাপের প্রবৃদ্ধ পরাক্রমে ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হইয়া নীতি ও সমাজ উভয়েরই সীমা লঙ্ঘন করে, তখন তাহারাও সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যশাসনের দুরধিগম্য হইয়া উঠে। তখন লোকের ভালকথা ও মন্দ কথা দুইই তাহাদিগের নিকট এক। তখন প্রশংসার তরলমধু এবং নিন্দার কোমল আঘাত দুইই তাহাদিগের নিকট সমান। তখন সম্মুখস্থ বিপত্তি তাহাদিগের বিলাসভূমি এবং আত্মাবমাননাই তাহাদিগের মান। তখন অভিধান তাহাদিগের জন্য পরিবর্ত্তিত হয়; আভিধানিক শব্দ সকল চিরপ্রচলিত পুরাতন অর্থ পরিত্যাগ করিয়া নূতন অর্থ দ্যোতন করে; দর্শন একে আর বলেন,—একে আর এক পথ দেখান; বিজ্ঞান বারবনিতার নিকৃষ্টবৃত্তিতে নিয়োজিত হন, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় অপকার্য্য-সাধনে নিরত রহেন, এবং প্রকৃতি আপনিও এক অপ্রাকৃত দৃশ্য অবলম্বন করিয়া অন্তর ও বাহির, ভূত ও ভবিষ্যৎ, এবং পশ্চাৎ ও সম্মুখ, ঢাকিয়া রাখেন। তুমি কাহাকে উপদেশ দিবে? কাহার নিকট সুনীতি ও কুনীতি এবং উন্নতি ও অবনতির কথা বলিবে? যেখানে অভিমানের বিকার ও বিকৃত আসক্তি, প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়া মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত পবিত্র ভাবকে গ্রাস করিয়া ফেলে,—মনুষ্যত্বের প্রতি মনুষ্যকে বিরক্ত, বীতস্পৃহ ও ঘৃণান্বিত করিয়া তুলে, সেখানে কোন্ তত্ত্বের কি উপদেশ কার্য্যকর

ও ফলপ্রদ হইবে? যেখানে দর্পেরই একাধিপত্য ও দয়া পদাঘাতে ধূলিলুণ্ঠিত,—যেখানে ধর্ম্ম অলীক পদার্থ, ধর্ম্মের বন্ধন লুপ্তাতন্তু,—যেখানে সর্ব্বগ্রাসিনী পাপ-ক্ষুধাই সমস্ত হৃদয় মনের একমাত্র অধীশ্বরী,সেখানে কোন্ আলোক সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে ভেদ করিতে পারিবে?

তবে কি জ্ঞান আর অজ্ঞান, যোগমত্তা ও ভোগমত্ততা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, স্বাস্থ্যের সামর্থ্য ও রোগের বিকার সত্য সত্যই সমান বস্তু? সক্রেটিশ কিছু জানিতে পারেন নাই বলিয়া সংসার কি জ্ঞানের অন্বেষণে নিবৃত্ত হইবে? আর প্রবৃত্তির প্রমাদ ও পাপের মোহেও সেই এক প্রকার দৃক্পাতশূন্য নির্ভীকতা ও বায়রণারাধ্য বিকট পুরুষকার জন্মে বলিয়া মনুষ্য কি এইরূপ পৌরুষের প্রলোভনে পাষণ্ড কি অসুর হইতে যাইবে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর চেষ্টা অনাবশ্যক। মনুষ্যহৃদয়ের অন্তঃপ্রবাহ ইহার প্রতিরোধি; সমাজের শক্তিপ্রবাহও স্বভাবতঃই ইহার বিরোধি। তথাপি যদি বুদ্ধির ভ্রম মনুষ্যকে এমন সিদ্ধান্তেই লইয়া আইসে, তাহা হইলে মানবসমাজ বিধ্বস্ত হইবে,—সমাজের গ্রন্থন সূত্র সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইবে,—উচ্ছৃঙ্খলা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া অন্ধকারের আবর্ত্তচক্রের মধ্যে উন্মাদের মত ঘূর্ণ নৃত্যে নৃত্য করিবে;—এবং সংসার এক ত্রিলোকভয়ঙ্কর হাহাকার রবে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। আমরা নিজ নিজ ঘটিকাযন্ত্রকে বিকল ও বিকৃত করিয়া রাখিলে, তাহাতেও কিছুকাল সময়ের এক প্রকার গতিবোধ হইতে পারে; কিন্তু সেই অসাময়িক সময়ের সহিত বিশ্বব্যাপি সময়ের কোনরূপ মেল থাকিবে না। আমরা আপনা হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনার চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক এই জগৎকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন মনে করিতে পারি। কিন্তু জগতের চন্দ্র সূর্য্য সে জন্য নিভিয়া যাইবে না, জগদ্‌যন্ত্রের অবিরাম-প্রবাহিত নিয়মগতিও সে জন্য মুহূর্ত্তের তরে নিরুদ্ধ রহিবে না। আমরা অজ্ঞান ও অবিদ্যার আশ্রয় লইয়া বুদ্ধিবৃত্তির বিলোপ এবং প্রকৃতির বিকার সাধনে যত্ন পাইতে পারি; কিন্তু ঐরূপ বিকৃতিই মনুষ্যের প্রকৃত মৃত্যু। আমরা অনীতির আশ্রয় লইয়া অন্যদীয় সুখশান্তি ও স্বত্বাধিকার এবং ন্যায় ও পবিত্রতাকেও ক্ষণকালের জন্য পাদতলে দলন করিতে পারি। কিন্তু যখন আমরা স্বয়ং অন্যকর্ত্তৃক ঐরূপ অন্যায়ভাবে বিদলিত হই, যখন অন্যে আসিয়া আমাদিগের ন্যায্য স্বত্ব ও ন্যায্য অধিকারের উপর আসুরিক বলে আক্রমণ করে, তখন হা ধর্ম্ম এই বিশ্বাসই আমাদিগের হৃদয়ের বিলাপ। জ্বলনোন্মুখ প্রদীপ ও নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা উভয়ই একবার প্রখর দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু একটির দীপ্তি তিমির নাশ করে, আর একটি নিমেষ পরেই নিভিয়া যায়। ঊষা ও প্রদোষে আকৃতির কিয়ৎপরিমিত সাদৃশ্য থাকিলেও ঊষার পর প্রফুল্ল জ্যোতি, প্রদোষের পর অন্ধকার।

আয়ুর্ব্বেদ।

(৩৮৪ পৃষ্ঠার পর।)

আহার গতি—নির্ণয়।

আহার-বস্তু, হৃদয়স্থ প্রাণ নামক বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ আমাশয়ে নীত হয়। এবং উহা ষট্‌রস-যুক্ত হইলেও আমাশয়স্থ হইয়া তত্রস্থ কফ সংযোগে প্রথমতঃ কেবল মধুর ভাব ও জঠরানলতেজঃসংযোগে ফেণভাব লাভ করে। অনন্তর আমাশয়স্থ ক্লেদন নামক কফদ্বারা ক্লেদযুক্ত ও কাঠিন্য-যুক্ত হইয়া মৃদুত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সমান বায়ু দ্বারা সন্ধুক্ষিত অধঃস্থ পাচকাগ্নির উষ্মদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া সেই ঈষৎ স্খলিত আহারীয় বস্তু অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং নাভিমণ্ডলস্থ সমান বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তি গ্রহণী নাম্নী কলাতে (অগ্ন্যাশয়ে) নীত হয়। এবং তত্রস্থ অগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া উষ্ণ ও কটুরস হইয়া থাকে।

এই প্রকারে পরিপক্ক ভুক্ত বস্তুর মিষ্ট ও লবণ ভাগ মধুর রস এবং অম্লভাগ অম্লরস, এবং কটু, তিক্ত, ও কষায় ভাগ কটুরস হইয়া থাকে। (১)

অনন্তর এইরূপে পরিপাচিত ভুক্ত বস্তু তিনভাগে বিভক্ত হয়। (২) যথা—১ সারভাগ, ২ দ্রবভাগ। ৩ মলভাগ। তন্মধ্যে সারভাগ রসরূপে পরিণত হইয়া সমান-বায়ু কর্ত্তৃক রসবাহিনী ধমনী দ্বারা প্রথমতঃ হৃদয়ে সঞ্চালিত হয়। তৎপরে সর্ব্বশরীরসঞ্চারী

---

(১) যাত্যামাশয় মন্নাহারং পূর্ব্বংপ্রাণানিলেরিতঃ। মাধুর্য্যং ফেণভাবঞ্চ ষড্রসোপি লভেতসঃ। ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নং সংহতং চ ভিনত্ত্যতঃ। সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন পচত্যামাশয়স্থিতং। ঔদর্য্যোগ্নির্যথাবাহ্যঃ স্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলং। অথপাচকপিত্তেন বিদগ্ধং চাম্লতাং ব্রজেৎ। ততঃ সএবাহারো নাভিমণ্ডলাধিষ্ঠানেন সমাননাম্না বায়ুনা প্রেরিতঃ গ্রহণীমভিনীয়তে। তত্রগ্রহণ্যামামপকাশয়মধ্যবর্ত্তিপাচকাখ্যপিত্তাধিষ্ঠানেনাগ্নিনাহারঃ পচ্যতে সকটুশ্চ ভবতি।

মিষ্টঃপটুশ্চ মধুরমম্লোহম্লং পচ্যতে রসঃ কটুতিক্তকষায়াণাং বিপাকো জায়তে কটুঃ।

(ভাব প্রকাশোদ্ধৃত)

(২) আহারস্ত রসঃ সারঃ সারহীনো-মলদ্রবঃ। শিরাভিস্তজ্জলং নীতং বস্তিং মূত্রত্বমাপ্নুয়াৎ। শেষং কিট্টঞ্চ যত্তস্য তৎপুরীষং নিগদ্যতে। সমানবায়ুনা নীতং তত্তিষ্ঠতি মলাশয়ে। মূত্রকোপস্থ মার্গেণ পুরীষং গুদমার্গতঃ। অপান বায়ুনা ক্ষিপ্তং বহির্যাতি শরীরতঃ। রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমানমরুতেরিতঃ। সতুব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিবর্দ্ধয়েৎ। (ভাবপ্রকাশেঃ)

ব্যানবায়ু দ্বারা সর্ব্বশরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত ধাতুকে সংবর্দ্ধিত করে।

দ্রবভাগ, সমানবায়ু দ্বারা চালিত হইয়া প্রথমতঃ বস্তিদেশে (মূত্রাশয়ে) নীত হয়। ইহাই মূত্ররূপে পরিণত হইয়া মূত্রপথে নিস্সৃত হয়

অবশিষ্ট স্থূল মলভাগ, পক্কাশয়স্থ অপান বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মলাশয়ে নীত হয়। ইহাই পুরীষরূপে পরিণত হইয়া পায়ুমার্গে নির্গত হইয়া থাকে।

সপ্তধাতুর বিশেষ বিবরণ।

সেই ভুক্ত বস্তুর সারভাগ রস হইতেই অন্যান্য সমস্ত ধাতু সমুৎপন্ন হয়। (১) আহার-রস, শরীরারম্ভক সপ্তধাতুগত সপ্ত অগ্নি-দ্বারা সপ্তবার পরিপক্ক হইয়া থাকে। এবং প্রতি বারেই তিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা—১ স্থূলভাগ, ২ সূক্ষ্মভাগ, ৩ মলভাগ।

সূক্ষ্মভাগ, শরীরারম্ভক স্বীয় ধাতুকে বর্দ্ধন ও পোষণ করে। স্থূলভাগ শরীরারম্ভক দ্বিতীয় ধাতুগত হয়। মলভাগ মলরূপে পরিণত হয়। (২)

রসধাতু।

আহার-রস, শরীরারম্ভক রসধাতুস্থ অগ্নি-দ্বারা পচ্যমান হইয়া সার্দ্ধদণ্ডাধিক পঞ্চ অহোরাত্র কালে তিন ভাগে বিভক্ত হয়, যথা সূক্ষ্মাংশ, স্থূলাংশ, ও মলাংশ। তন্মধ্যে মলাংশ, কফরূপে পরিণত হইয়া প্রাণবায়ু দ্বারা আমাশয়স্থ ক্লেদন নামক কফের সহিত মিলিত হয়। সূক্ষ্মাংশ শরীরারম্ভক রসের পুষ্টি সাধন করে। এবং স্নেহন, পোষণ, ও জঠরানলকৃত সন্তাপ নিবারণাদি কার্য্যদ্বারা সমস্তদেহকে উপকৃত করে। স্থূলাংশ, প্রাণবায়ু-দ্বারা ধমনীমার্গে চালিত হইয়া শরীরারম্ভক রক্ত স্থান যকৃৎ ও প্লীহাতে গমন করে। এবং তত্রস্থ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া যায়। (৩)

(১) রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে। মেদসোঽস্থি ততোমজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ। (সুশ্রুতঃ)

(২) স্থূলঃ সূক্ষ্মস্তন্মলশ্চ তত্র তত্র ত্রিধা রসঃ। স্বংস্থূলোংশঃ পরং সূক্ষ্মস্তন্মলো যাতি তন্মলং। (চরকঃ)

(৪) ধাতৌ রসাদৌ মজ্জান্তে প্রত্যেকং ক্রমতোরস। অহোরাত্রাৎ স্বয়ং পঞ্চ সার্দ্ধং দণ্ডঞ্চ তিষ্ঠতি। (ভোজঃ) সখলুরসঃ ত্রীণি-ত্রীণি কলাসহস্রাণি পঞ্চদশ কলা একৈকস্মিন্ ধাতাবুপতিষ্ঠতে। ততো যথা পচ্যমানাদিক্ষুরসান্মলো নির্গচ্ছতি তথাপচ্যমানাদাহার রসান্মলো নির্গচ্ছতি সকফঃ।) (সুশ্রুত) সকফঃ প্রাণানিলেরিতঃ ধমনী মার্গেণ শরীরারম্ভকং ক্লেদনাখ্যং কফংগত্বা পুষ্ণাতি ততঃ সারভূতস্যাহার রসস্য দ্বৌভাগৌভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ ততঃ সূক্ষ্মোভাগঃ শরীরারম্ভকং রসং পোষয়তি। সকল শরীরাধিষ্ঠানেন ব্যান বায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরণ পোষণ স্নেহন জঠরানলোষ্মকৃত সন্তাপ নিবারণাদিভির্গুণৈঃসকল শরীরং পুষ্ণাতি ততঃ স্থূলোভাগঃ প্রাণবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকস্য রক্তস্য স্থানং যকৃৎ প্লীহরূপং গত্বা তেন সহ মিলিতো ভবতি। ততঃ প্রাক্তনস্য রক্তস্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবৎ প্রাক্তন রক্ত ধাতাবেব তিষ্ঠতি ইত্যাদি। (ভাব প্রকাশঃ)

রক্তধাতু।

রক্ত সঙ্গত রস, পূর্ব্বতন রক্তস্থ অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইয়া সার্দ্ধদণ্ডাধিক পঞ্চ অহোরাত্র কালে তিনভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে মলভাগ, পিত্তরূপে পরিণত হয়। এবং সমান বায়ু দ্বারা ধমনী মার্গে চালিত হইয়া শরীরারম্ভক পাচকাখ্য পিত্তের সহিত সংযুক্ত হয়। সূক্ষ্মভাগ, রঞ্জক নামক পিত্তদ্বারা রক্তীকৃত হইয়া থাকে। এবং ব্যান বায়ু দ্বারা ধমনী মার্গে চালিত হইয়া সর্ব্ব শরীরস্থ রক্তের পুষ্টি সাধন করে। স্থূলভাগ, ধমনী ও শিরা পথে চালিত হইয়া শরীরারম্ভক মাংসধাতুগত হয়।

মাংস ধাতু।

মাংসগত রস, পূর্ব্বতন মাংসস্থ অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইয়া সার্দ্ধদণ্ডাধিক পঞ্চ অহোরাত্র কালে তিনভাগে বিভক্তহয়। তন্মধ্যে মলভাগ, ব্যান বায়ুদ্বারা কর্ণস্রোতে নীত হইয়া কর্ণমল রূপে পরিণত হয়। সূক্ষ্মভাগ, মাংসের পুষ্টি সাধন করে স্থূল ভাগ, ব্যানবায়ুদ্বারা ধমনী মার্গে চালিত হইয়া শরীরারম্ভক মেদঃ স্থানগত হয়।

মেদঃ ধাতু।

মেদোগত রস, মেদঃস্থ অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইয়া সার্দ্ধদণ্ডাধিক পঞ্চ অহোরাত্র কালে তিনভাগে বিভক্ত হয়। মলভাগ, স্বেদরূপে পরিণত হইয়া স্রোতঃ মধ্যে অবস্থিতি করে। *। উহা স্বভাবতঃ শীতল, কিন্তু যখন শরীরোষ্মদ্বারা পরিতপ্ত হয়, তখন ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক শিরাপথে চালিত হইয়া লোম-কূপদ্বারা বহির্গত হয়। সূক্ষ্মভাগ উদরে থাকিয়া পূর্ব্বস্থিত মেদের পুষ্টিসাধন করে। স্থূলভাগ ব্যান বায়ুদ্বারা ধমনী ও শিরাপথে চালিত হইয়া শরীরারম্ভক অস্থি মধ্যে গমন করে।

* কেহ কেহ জিহ্বা, দন্ত, কক্ষা মেঢ্রাদিগত মলকেও মেদঃ ধাতুর মল বলিয়া থাকেন।

অস্থিধাতু।

অস্থিগত রস, অস্থিস্থিত অগ্নিধারা পুনঃ পচ্যমান হইয়া সার্দ্ধদণ্ডাধিক পঞ্চ অহোরাত্রকালে তিনভাগে বিভক্ত হয়। মলভাগ, ব্যান বায়ুদ্বারা শিরাপথে চালিত হইয়া নখ, স্তন, ও লোমরূপে পরিণত হয়। সূক্ষ্মভাগ, অস্থির পুষ্টি সাধন করে। স্থূলভাগ, ব্যানবায়ুদ্বারা স্রোতঃপথে চালিত হইয়া মজ্জস্থান স্থূলাস্থি মধ্যে নীত হয়।

মজ্জধাতু।

মজ্জগত রস, তত্রস্থ অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। মলভাগ ব্যানবায়ুদ্বারা শিরাপথে চালিত হইয়া নেত্র-বিট্ (চক্ষুর ময়লা) ও চর্ম্ম স্নেহরূপে পরিণত হয়। সূক্ষ্মভাগ, মজ্জার পুষ্টিসাধন করে। স্থূলভাগ, ব্যানবায়ুদ্বারা ধমনী ও শিরাপথে চালিত হইয়া শুক্রস্থান সমস্ত শরীরে নীত হয়। এবং শরীরারম্ভক-শুক্রের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

শুক্রধাতু।

যেমন বিশুদ্ধ সুবর্ণকে সহস্রবার অগ্নি সন্তপ্ত করিলেও তাহা হইতে কোনরূপ মল নির্গত হয় না, তদ্রূপ শুক্রগত রস ধাতু পু-

র্ব্বতন শুক্রস্থ অগ্নিদ্বারা পুনঃ পুনঃ পচ্যমান হইলেও তাহা হইতে কোন প্রকার মল নির্গত হয় না।

উহা কেবল দুইভাগে বিভক্ত হয়। যথা—সূক্ষ্মভাগ ও স্থূলভাগ। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম ভাগকে ওজঃ ধাতু বলাযায়। ওজঃ ধাতু, স্নিগ্ধ, শীতল, স্থির, শ্বেতবর্ণ, সৌম্য, বল ও পুষ্টিকারক। ইহাদ্বারাই উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, শরীরলাবণ্য ও সৌকুমার্য্য প্রভৃতি সম্পাদিত হয়। এবং কোন কারণে ইহার বিনাশ হইলে জীবনেরও বিনাশ হয়। স্থূলভাগ পুরুষের শুক্ররূপে পরিণত হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকের উক্ত স্থূলাংশই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ আর্ত্তবশোণিত ও একভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয়। যেমন পুরুষের আশয় অপেক্ষায় স্ত্রীলোকের তিনটী আশয় অধিক, তদ্রূপ পুরুষের সপ্তধাতু অপেক্ষায় স্ত্রীলোকের একটী ধাতুও অধিক আছে। ইহাকে আর্ত্তবশোণিত বলাযায়। (১)

এইরূপে প্রতিপন্ন হইল যে এক মাত্র রসধাতুই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নবদশাধিক মাসৈককালে পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তবশোণিত ও শুক্ররূপে পরিণত হয়। (২)

যেমন পুষ্প মুকুলস্থ গন্ধ বিদ্যমান থাকিতেও মুকুলিত অবস্থায় উহার উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ শুক্র, আর্ত্তবশোণিত, স্তন, স্তন্য, রোমাবলী ও শ্মশ্রূপ্রভৃতি বাল্যাবস্থায় অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও উপলব্ধ হয় না। কালক্রমে উহার অভিব্যক্তি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (৩)। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিমোহন দাস গুপ্তঃ।

---

(১) স্বাগ্নিভিঃ পচ্যমানেষু মলঃষট্‌সু রসাদিষু। ষট্‌সুধাতুষুজায়ন্তে মলানি মুনয়োজগুঃ। যথা সহস্রধাধ্যাতে নমলং কিলকাঞ্চনে। তথা রসে মুহুঃপক্কে নমলং শুক্রতাংগতে। ততঃ সারভূতস্যরসস্য দ্বৌভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃসূক্ষ্মশ্চ তত্র সূক্ষ্মঃ স্নেহভাগঃ ওজঃ। (ভাবপ্রকাশঃ) ওজঃলক্ষণং যথা—ওজঃ সর্ব্বশরীরস্থং স্নিগ্ধং শীতং স্থিরং সিতং সোমাত্মকং শরীরস্য বলপুষ্টিকরং মতং। (সুশ্রুতঃ)—যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিং স্তিষ্ঠতি জীবনং। নিষ্পদ্যন্তে যতোভাবাবিবিধাঃ দেহসংশ্রয়াঃ। উৎসাহ প্রতিভা ধৈর্য্য লাবণ্য সুকুমারতাঃ। (বাভটঃ) ততঃ স্থূলভাগোরসঃ মাসেন পুংসাং শুক্রং স্ত্রীণাস্ত্বার্ত্তবং শুক্রঞ্চ ভবতি। (ভাবপ্রকাশঃ)

(২) এবংরসএব কেদারকুল্যান্যায়েন সর্ব্বান্ ধাতূন্ পূরয়ন্ মাসেন নবদশোত্তরেণ শুক্র মার্ত্তবং ভবতীতি সিদ্ধান্তঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩) বালানাং শুক্র মস্ত্যেব কিন্তু সৌক্ষ্ম্যান্নদৃশ্যতে। পুষ্পাণাং মুকুলেগন্ধো যথা সন্নপি নাপ্যতে। তেষাংতদেবতারুণ্যে পুষ্টত্বাদ্ব্যক্তিমেতিহি। কুসুমানাং প্রফুল্লানাং গন্ধঃ প্রাদুর্ভবেদ্যথা। রোম রাজ্যাদয়ঃ পুংসাং নারীণামপি যৌবনে। জায়ন্তেঽত্রচ যোভেদঃ জ্ঞেয়োব্যাখ্যানতঃ সচ। (ভাবপ্রকাশ।)

গ্রীক এবং হিন্দু

চতুর্থ প্রস্তাব।

পুনশ্চ সাহিত্য মধ্যে একবার ইতিহাস বিভাগে দৃষ্টিপাত কর। উপপাদ্য এবং আনুষ্ঠানিক চিত্তক্রিয়ার সুন্দর দৃষ্টান্ত-প্রভেদ দেখিতে পাইবে। এতদুভয়ের কোন্ জাতির নিকট মানবের, কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, সাংসারিক মূল্য কত, তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে। হিন্দু সন্তান জানিতেন যে ব্যক্তিগতই হউক, আর জাতিগতই হউক, মানবের যে সাংসারিক জীবন, তাহা যখন এত ক্ষণস্থায়ী, তখন আবার তাহার মূল্যই বা কি ;—তাহার হিসাব রাখা রাখিই বা কি। কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছি, কর্ম্ম করিতেছি, ইহা বিদেশ ও বাসাবাড়ি ; কর্ম্ম শেষ হইলেই যখন বাড়ি যাইতে হইবে, তখন বাসাবাড়িকে বালাখানা, এবং বিদেশীকে বিনা কারণে প্রাণের কুটুম্ব, কে করিয়া থাকে ?—সেই কেবল করিতে পারে, যাহার টাকা রাখিবার আর যায়গা নাই, যে কেবল লোকের কথায় মজিয়া বেড়ায়। বিশেষ, বিদেশে মান কেনার অপেক্ষা দেশে মান কেনা শ্রেয় ; সুতরাং দেশে যাইয়া যাহাতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, এজন্য যতদিন বিদেশে থাকিতে হইবে, এদিক্ ওদিক না ভুলিয়া, কোনরূপে শরীর ধারণ করিয়া, সেইরূপ উপার্জ্জন করাই শ্রেয়। হিন্দু সন্তান বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে প্রবাসী হইলেও প্রবাসস্থান সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ ভাবিয়া থাকে, এবং কোন রকমে ছেঁড়া কাঁথা জড়াইয়া কাল কাটাইয়া দেয়। হিন্দু সন্তানের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুসারে সংসার-হ্রদে না মাতিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করাই যুক্তিসিদ্ধ। যে জাতি মানবীয় ইহজীবনের মূল্য এরূপ ভাবে অবধারণা করিয়া থাকে ; চিন্তাপ্রসূত বিষয়ই যাহার নিকট পরম আদরের বস্তু, সে জাতির মধ্যে জাতীয় ইতিহাস বা ব্যক্তিবিশেষের জীবন চরিত থাকিবার বড় একটা সম্ভব নহে। অন্যান্য জাতির কথা কি বলিব, নরমাংসভোজী মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরাও এজগতে আপনাদের প্রাচীন পুরাবৃত্ত প্রদান করিয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দু সন্তান এত সুসভ্য ও বিদ্যাশীল হইয়াও তাহা পারিয়া উঠেন নাই। হিন্দু পণ্ডিতেরা কি ইতিহাস লিখিতে বসিলে লিখিতে পারিতেন না, তাহা নহে ;—কিন্তু ইতিহাস বলিয়া যে একটা বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে, ইহাই কখনও তাঁহাদের কল্পনায় আইসে নাই। আসিবার কথাও নহে। ইহাঁরা যেরূপ ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিছু চাই ?—ঐ লও আপাততঃ ঐ অষ্টাদশ পুরাণের গাদা !

একক্ষণে গ্রীক জাতির প্রতি নিরীক্ষণ কর। ঠিক উহার বিপরীত। গ্রীকেরা যেন মানবীয় আত্মিক পরিবারবিচ্যুত ভেকধারী সাংসারিক ষণ্ডা। যেখানে থাকি সেই বাড়ি। পিছুটানের মমতা কাটান হইয়াছে, কাহার জন্য সঞ্চয় করিব! যাহা পাই, যতদূর সাধ্য খাইয়া পরিয়া আমোদ করিয়া লই, পরে আমার তা কে খাইবে? কসে দম্, বাবা, বুক পুরিয়া দুনিয়ার মজা লুটিব, কি জানি কবে ফুরায়! এরূপ ষণ্ডার যেমন দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, অথচ দেশের কথা এক একবার মনে হইলেই হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, অথচ সে উদ্বেলন ও তদুৎপন্ন কার্য্যফল ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না; —পরলোক ও পারলৌকিক সুখের সঙ্গে গ্রীকদিগেরও সেই সম্বন্ধ। ইহারা প্রকৃত পক্ষে সংসারী এবং সংসার সামাজিক। উহাতে পূর্ণভাবে মগ্ন। তাহা না হইলে দেশ-হিতার্থে কক্রুস আপন সন্তানকে বলি দিতে পারিত না; স্পর্টান-জননী প্রকৃতিদত্ত পুত্র-স্নেহ পরিত্যাগে রণে পৃষ্ঠ দেওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, এরূপ উপদেশ দিতে পারিত না; * সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশে আত্ম বিষয়ের অতিরিক্তাংশ স্বচ্ছন্দে সমাজের হস্তে অর্পণ, অথবা আত্ম-বিষয় একেবারে ত্যাগ করিতে পারিত না। এই কারণেই ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এতদূর চতুর ও সূক্ষ্মদর্শী, যে থিওক্রাস্তুতও স্বীয় বিদেশ-জাত-জনিত অজ্ঞতা সামান্য একটা মেছুনীর নিকট হইতেও বহুযত্নে গোপন করিতে পারেন নাই। * এই কারণেই অরিষ্টকারিস, ব্যঙ্গ ও রহস্যলেখক হইয়া এতদূর সমাজের পরিচালক পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে তাহা পারশ্য রাজের কাণে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এই হেতুতেই হেক্তর-জননী হেক্তরকে হঠাৎ রণ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

হেক্তর! কেমনে, বৎস! কোন্ গূঢ় হেতু,
মম পুত্র এবে এথা—ত্যজি রণস্থল,—
ঘেরিছে সসৈন্যে গ্রীস্ পুরদ্বারচরে? †

পুনশ্চ যে পারিসকে হেলেন জগতের লোভনীয় পুরুষ জ্ঞানে, স্বামী সন্তান ঐশ্বর্য্য এবং রাজভোগ পরিত্যাগ এবং তুচ্ছ করিয়া তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই পারিসকেই সেই হেলেন তাহার ভীরুতা দৃষ্টে, রতি দেবীর নিকট ভর্ৎসনা বাক্যে এরূপ আত্ম মনঃকষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছিল।

ভীরু সে বর্ব্বর! ঘৃণিতারে, ঘৃণি আমি
তার আলিঙ্গন। নহে যদি, কে বহিবে

* এইটি যে, ইহা খাস্ বাঙ্গালীর কথা,—ঘাখেগো বাঙ্গালীর কথা। ইতি বাঞ্ছারাম ১২৮৭।—আমিও বলি এইটি যে, ইহা নিতান্ত সাহেবের সাহেবানি অনুকারী দগ্ধ কদলি, ফলাহারী হনুমানের কথা! এসংসারে কি আত্মস্বার্থ এবং সামাজিক স্বার্থ এতদুভয়ের সামাঞ্জস্য হইতে পারে না?

প্রবন্ধ লেখক।

* Quint I. VIII c 5.

† "O Hector! say, what great occasion calls
My son from fight, when Greece surrounds our walls?
—Pope's Homer's Illiad V1318-19.

শিরে,—কে বহিবে শিরে চির অখ্যাতির
ডালি ; কে সহিবে পুনঃ, ফ্রাইজিয়াব্যাপি
রমণী মণ্ডলে যবে দিবে টিটকারী ?
দহিতেছে দেহ যবে, দহে চিত্ত তাপে,
সময় কি, হ্যালা ! সেই প্রেম আলাপনে।*

যেখানে লোক চরিত্র এরূপ, যে জাতি এতদূর সাংসারিক যে যুদ্ধে স্ত্রীলোকেরও তেজ এত প্রখরা ; সে জাতি যে সাংসারিক মর্ম্ম পূর্ণভাবে বুঝিবে এবং তাহাই তাহাদের জীবনের প্রধান ক্রিয়া-পদস্থ ভাবিয়া, তাহার অনুসরণ ও তদ্বর্ণনা রক্ষা করিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যেমন উপপাদ্য বিষয় সমূহ অনুসরণ করিতে হইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপপাদিক জ্ঞান সংগ্রহ আবশ্যক,তেমনি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার অনুসরণ করিতে গেলে, পূর্ব্বং অনুষ্ঠানের অবগতি ভিন্ন, সুশৃঙ্খলে বা পূর্ণাবয়বে সম্পন্ন হয় না। অতএব ইতিহাস বিদ্যার চর্চ্চা গ্রীকদিগের মধ্যে যদৃচ্ছা উৎপন্ন হয়নাই। তথায় উহা উৎপন্ন না হইলে, চলে না ; এই জন্যই হইয়াছিল। ভারতীয় জীবন ক্রিয়ায় তদ্রূপ আবশ্যকতার প্রয়োজন অভাব। আদিমকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারতে যবনাধিকার পর্য্যন্ত ভারতীয়েরা যেমন একাদিক্রমে ধারাবাহিকরূপে ও জগতে বহুকাল ব্যাপিয়া স্বাধীনত্ব ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তেমন আর কোন জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ধারাবাহিক রূপে সজ্জিত ঘটনাবলীর সত্য ইতিহাসের একটুও টুকরা পাওয়া যায় না বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গ্রীকদিগের ইতিহাসের বাজারের প্রতি একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি,—কেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ আকার ! ফলতঃ গ্রীকেরা মানবীয় ইহজীবনের এরূপ স্থির মর্ম্মজ্ঞ ও তাহাতে মমতাশীল যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহারা প্রস্তর-ফলকের সাহায্যেই তাহার স্মৃতি-রক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। * ও তাহাতে যত্নশীল হইয়াছিল। কোন প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে এরূপ অনুষ্ঠানের কথা বা উল্লেখ আছে কি না তাহা শুনিতে পাই না। বোধ হয় নাই।

যেসকল শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান আনুষ্ঠানিক বা যাহার আশুফল পার্থিব সুখ ও স্বচ্ছন্দতা লাভ, এরূপ শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য, খণ্ড-ভাবে ভারতে কখ ও কখনও উদ্ভাবিত, এবং আবশ্যকতা অনুসারে

* I scorn the coward, and detest his bed :
Else should I merit everlasting shame,
And keen reproach from every Phrygian dame :
Ill suits it now the joys of love to know
Too deep my anguish, and too wild my woe.
–Pope's Homer's Illiad III 508–512.

* The stone shall tell your vanquished heroes' name,
And distant ages learn the victors' fame.
Pope's Homer's Illiad VIII 103–104.

নিয়োজিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের পৃথকভাবে শ্রেণি-নির্ব্বাচন, ধারাবাহিকরূপে সংযোজন, ও তাহার উৎকর্ষ সাধন, কোথাও দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই এক স্থানে বলা গিয়াছে যে, অন্যান্য বিষয়ানুসন্ধান উপলক্ষ্যে ভারতে ভূবিদ্যা, ভূতত্ব বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পাশবতত্ব, ইত্যাদি, অধুনা যাহারা উচ্চ-বিজ্ঞান শব্দে খ্যাত, তাহাদের বহুল, এমনকি গুঢ়তম সত্য পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত, ও কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল; কিন্তু কোথাও তাহাদের কেহ ধারাবাহিক রূপে শ্রেণিবদ্ধ এবং বিভিন্ন শাস্ত্র-পদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এতদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞানের যে অবশ্যম্ভাবী ফল, তল্লাভে ভারতীয়েরা হয়ত অনেক সময়ে গ্রীকদিগের অপেক্ষা জিঁতিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, তত্তৎ বিষয়ে গ্রীকদিগকে অতিক্রম করিয়া ভারতীয়দিগকে জয় দিতে পারাযায় না। কারণ ভারতীয়েরা যাহা লাভ করিতেন, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায়। ভারতীয়েরা এই সকল বিষয়ে কি কারণ ধরিলে কোন ফল লাভ করিব এবং সেই ফল আমাদের কার্য্যে কতদূর আসিতে পারিবে, তৎপক্ষে এবং কেবল তাহারই নিমিত্ত, কখনও চেষ্টা বা চিন্তা করিতেন না। তাঁহাদের যাহা প্রিয় অনুসন্ধান ও প্রিয় আলোচনা, তাহারই উপলক্ষ্যে যদি কোন তত্ব অভাবনীয় ভাবে উদয় হইল, ভালই; কিন্তু তাহাকে যে আবার ভিত্তি স্বরূপ করিয়া তদবলম্বনে নূতন তত্ত্বের আশায় হস্ত-প্রসারণ করিব, সে অভ্যাস বড় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ইহারা যাহা কিছু এতদ্রূপ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিলেন এবং সে জ্ঞান যতই উচ্চ হউক তাহা দৈব-প্রেরিতবৎ এবং তাহা বিস্তারশূন্য যোগরুঢ়ি জ্ঞান। বলা বাহুল্য যে দৈবের উপর যে যে বিষয়ের জন্য যাহাকে নির্ভর করিতে হয়, সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের অপেক্ষা দুঃখী ও অসাব্যস্ত জীব আর পৃথিবীতে নাই। গ্রীকজীবনে এরূপ নহে, কর্ম্মসূত্রবশে কথিত বিষয় সমূহে যখন যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্ত তাহার শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিয়া তত্তৎ শ্রেণিভুক্ত করিয়াছে; এবং তাহাকে আবার অবলম্বন করিয়া নূতনতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এবম্প্রকারে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ব্বাচন সহ উদ্ভাবিত তত্ব সকল শ্রেণিবদ্ধরূপে পরিণত হওয়াতে তাহা পৃথক শাস্ত্ররূপে গণিত ও অধীত এবং কার্য্য কালে তাহা অনুসৃত হওয়ায়, তত্তৎ বিষয়িনী যে কোন তত্ত্বের ফল তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক, জ্ঞানপূর্ব্বক, এবং আত্মগণনার অভিমতরূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দুদিগের ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব্ব নহে। সুতরাং ইহাদের দ্বারা উদ্ভাবিত ও শ্রেণিবদ্ধ তত্ব সমূহ অপেক্ষাকৃত সামান্য হইলেও তাহা সাব্যস্ত, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া তৎতৎ বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পারাযায়, তাহার উপর তৎতৎ শাস্ত্রের অপার উন্নতি-বীজ রোপণ করিতে পারাযায়। হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত তত্ব সকল পরিত্যক্তভাবে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত থাকায় ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ-রজ্জুর স্থাপনাভাবে তাহাদের অবলম্বনে তৎতৎ বিষয়ের অগ্র

পশ্চাৎ অবলোকন, বা তাহার উপর কোন প্রকার উন্নতি-বীজ বপন করিতে পারাযায় না। এমতস্থলে হিন্দুদিগের মধ্যে সেই সকল শাস্ত্রীয় তত্ব থাকা বা নাথাকা উভয়ই সমান, এবং সাংসারিক বোধে ধরিতে গেলে,একেবারেই ছিলনা বলিলে হয়। তাঁহাদের বোধ অনুরূপ যতদূর হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাই সাধন করিয়া গিয়াছেন। এসকল বিষয়ের ক্ষণিক ভিন্ন ধারাবাহিকরূপে, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কখনই কিছু আবশ্যক হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে জ্যোতিষাদির ন্যায় এসকল শাস্ত্রেরও উদ্ভাবন নিয়ম বন্ধন এবং তাহাদের উন্নতি সাধন সুসম্পন্ন হইত। যে জাতির জগতের প্রতি বৈরাগ্য এত যে, পার্থিব জীবনের অনিত্যতা ও তৎপ্রতি তুচ্ছতা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লোমশ মুনির উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে এসকল শাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষসাধন হয় নাই কেন, তাহা বলিবার আবশ্যকতা রাখে না। পুরাণে এই লোমশ মুনির ইতিহাস বিষয়ে এরূপ কথিত আছে, যে ইহার সর্ব্বাঙ্গ মেষবৎ লোমে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ লোম প্রতি ইন্দ্রপাতে এক একটি করিয়া খসিয়া যাইত। এই হিসাবে একটি একটি করিয়া খসিতে খসিতে সমস্ত অঙ্গ যেদিন একেবারে নির্লোম হইবে সেই দিন তাঁহার মৃত্যু দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে। এ হিসাবে তাঁহার আয়ু ব্রহ্মার অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়ে। তথাপি এই ঋষি, কেন যে আপনার আশ্রমকুটীরের উপরিভাগে জল বায়ু নিবারক আচ্ছাদন দিবেন এবং এই অল্পকয়দিনের জন্য তাঁহার আবশ্যকতাই বা কি, তাহা নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ফলতঃ ভারতীয়দিগের ভুবিদ্যার ধারাবাহিক জ্ঞান, স্বর্ণচূড় সুমেরু, কণকপদ্ম শোভিত মানঃ সরোবর, লবণ ইক্ষু, সুরা, সর্পি প্রভৃতি সমুদ্র; ত্রিকোণময়ী পৃথিবী, ইত্যাদিতে আসিয়া সমাবেশ হইয়াছে। ভূতত্ব বিদ্যায় জ্ঞান—বাসুকীর মস্তকে পৃথিবীর অবস্থিতি, এবং তাহার মাথাঝাড়াইতেই ভূকম্পন উপস্থিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি, কোন গাছ ব্রাহ্মণ, কোন গাছ চণ্ডাল, কোন গাছ পুরুষ, কোন গাছ স্ত্রী, এবম্ভুত বিভাগ বোধ। পাশব তত্ব বিদ্যা—আত্মার কর্ম্মসূত্রবশে ইতর হইতে ইতরতর অবস্থা প্রাপ্তার্থে চৌরাশী লক্ষ যোনির সৃষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু এক কথা। হিন্দুরা চিরকাল আত্মদেশ মধ্যে আবদ্ধ প্রায়, কখন অপরাপর দেশীয় জাতির সহিত সংস্রবে আইসেন নাই বলিলেই হয়; কিন্তু গ্রীকেরা অপরিমিত ভাবে অপরাপর দেশীয় দিগের সংস্রবে আসিয়াছিল। সুতরাং ইহারা পাঁচ দেশীয় একই বিষয়ে পাঁচ দেশীয় পাঁচরূপ বুদ্ধির সঙ্কলনে, ও তাহার সহিত নিজ বুদ্ধির সামঞ্জস্য সাধনে, বিষয় বিশেষ লইয়া যে ভারতকে একেবারে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? কারণ একে সেই সেই বিষয় হয়ত হিন্দুদিগের প্রকৃতি-যুজ্য নহে, তাহাতে আবার বাহ্য সাহায্য কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আবার যে যে বিষয় গ্রীক এবং হিন্দু উভয়েরই প্রকৃতি অনুমোদিত, এবং যাহা

উভয়কেই বিনা সাহায্যে অনুসরণ করিতে হইয়াছে; তথায় একবার সেই অনুসৃত বিষয়ের মধ্যে বিচার করিয়া দেখ, কে কতদূর দৌড় দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে কে উচ্চতর তাহা স্পষ্টত জানিতে পারিবে। আমার বোধ হয় দৌড় উভয়েরই সমান, তবে যদি কিছু কোন বিষয়ে ন্যূনতর দৃষ্ট হয়, তাহাতে ভারতকেই উর্দ্ধে ভিন্ন নিম্নে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে সে দৃষ্টি বৃথা দৃষ্টি, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে দৌড় কাহারও কমবেশি নহে।

কৃষি বাণিজ্য, সমুদ্রযাত্রা, শিল্প প্রভৃতি বিদ্যারও ভারতে আবশ্যক অনুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও ধর্ম্মজ্ঞান সহ সংস্রব-বহুলতা না থাকায় এবং উপপাদ্য জ্ঞানের সহ ইহা বহুলাংশে প্রকৃতি-বিভিন্নতা-যুক্ত হওয়ায়, এই এই বিষয়ে যতদূর উন্নতি সাময়িক জ্ঞানানুসারে হইতে পারে তাহা হয় নাই। অতি দূরতর কালেও, কৃষি, সমুদ্রযাত্রা বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীক ভূমে যেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, ও লোকের শিক্ষার্থে তাহা যেরূপেও যত যত্ন ও সাবধানতার সহিত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হেসিয়দের গ্রন্থ হইতে পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করাগেল। পাঠক! আত্মদেশ সম্বন্ধে তুমি সেই সেই বিষয়ের যতদূর জান, তাহার সহিত মিলাইয়া, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ স্থির করিয়া লও। গ্রীকেরা বাস্তবিক যে কিরূপ আনুষ্ঠানিক জাতি তাহাও এই উদ্ধৃত অংশ পাঠে একরূপ অনুভব করিতে পারিবে। এবং আমিও, উহা নিতান্ত দীর্ঘ হইলেও সমগ্র উদ্ধৃত করিলাম, কারণ একটি বিষয় বিশেষ রূপে, হৃদ্বোধ হইয়া আসিলে, আর পাঁচটিতে কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাইলেই, আপনা হইতে হৃদ্বোধ হইয়া আইসে।

রাজনীতি ভারতীয়দিগের অতি অপূর্ব্ব, ধর্ম্মভাব ও মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণ; গ্রীক রাজনীতি তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু শাসন তন্ত্র ও বীরকীর্ত্তিতে গ্রীকদিগের প্রভার নিকট ভারতের প্রভা একেবারে মলিন হইয়া যায়।

প্রথমতঃ। ইতিহাস বা পুরাণাদি বিলোড়ন দ্বারা দেখা যায় যে, ভারতীয়েরা আত্মদেশ বহির্ভাগে পরধন-লোলুপ হইয়া, কখনও অনধিকার প্রবেশে উদ্যত হয়েন নাই। এবং তদ্বিষয়িণী দুরাকাঙ্ক্ষাও বোধ হয় তাঁহাদের মনোমধ্যে কখন স্থান পায় নাই। ইহারা আপনাদের স্বদেশকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেকে আপনাপন অধিকার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, সময়ে সময়ে ভারতের মধ্যে কোন কোন রাজা, কখনও কখনও প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, পার্শ্বস্থ বিভিন্নাধিকার সকল আত্ম বশে আনিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এতদ্রূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যাহা হউক এইরূপ কোন ঘটনা ঘটিলেই, এবং দাসদিগকে কখন কখন দমন করিতে হইলেই, সেই সময়ে যে কিছু অস্ত্রচালনা হইত। সে সকল কিছু গণনায় সামান্য নহে, তবে যে স্থলে যে ভাবে ও যাহার তুলনায় তাহাদের অবতারণা করা যাইতেছে, তাহাতে সামান্যই বলিতে হইবে। সে যাহা হউক,

দেশাধিপতিগণ সকলেই একধর্ম্ম, এবং এক জাতিত্ব নিবন্ধন, স্বভাবের মাধুর্য্য বশে, পরস্পর সুখ সংমিলনে বসতি বাস করিতেন। বিশেষতঃ দেশ যেরূপ প্রাকৃতিক দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত এবং সুরক্ষিত—উত্তরে অভেদ্য হিমাদ্রি, পশ্চিমে পরিখারূপে শত শাখাময় সিন্ধু, পূর্ব্বে অগম্য বনভূমি, দক্ষিণে তরঙ্গসঙ্কুল দুর্দ্দমনীয় সমুদ্র ;—তাহাতে আবার সেই দূরতর কালে, তৎকালীন অসভ্যতা এবং বর্ব্বরতাজনিত পশুবৎ পার্শ্বস্থ জাতি সকল হইতেও স্বদেশের স্বাধিনতা লোপ, বা কোন বিপৎপাতের সম্ভাবনা না থাকায়, বহিঃশত্রুর প্রভাব ও তন্নিমিত্ত অস্ত্রধারণের পাঠ একেবারে ছিল না। এই সকল কারণ-বশতঃ ভারতবর্ষীয়েরা কখন যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিলেন না, এবং বোধ হয় এই কারণেই তাহাদের বীরকীর্ত্তি বিপুল হইলেও অন্যান্য পুরাতন জাতির সমকক্ষতায় আসিতে পারে নাই। ভারতীয় বীর-

সম্বন্ধে আমার প্রণীত, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত গ্রন্থে 'সাময়িক ব্যাপার' নামক প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ। যে জাতি এক পা হাঁটে, আর একবার আকাশ পানে তাকাইয়া থাকে; যে জাতি জাগতিক ব্যাপার দেখিয়া আপনাতে আপনি নাই, এবং তাহার সূত্র অনবগতে সতত চিন্তা-আকুল ; তাহার পক্ষে কোনরূপ উদর পোষণ ও কলেবর ধারণ হইলেই সাংসারিক ব্যাপার যথেষ্ট সাধিত হইল। সুতরাং ইহারা কেন রাজনীতির ধার ধারিবে ? তুমি রাজা হইতে চাও, হও ; আমি তাহাতে সম্মত আছি, কিন্তু দেখিও, আমি যাহা চাই, তাহার হানি করিও না, তাহা হইলে আর কোন গোল হইল না, নতুবা গোলমাল বাধিতে পারে। এরূপ গোলমাল পরিহার করা সহজ। সুতরাং হিন্দু রাজারা আবহমান কাল যথেচ্ছাচার এবং একাধিপত্য নিরুদ্বেগে করিয়া আসিয়াছেন। গ্রীকদিগের ঘরে তাহার বিপরীত। যখন যেমন লোকের মনের ভাব, শাসনতন্ত্রও তখন তেমনি প্রচলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এরূপ বুঝিও না যে, রাজনীতির ভাল মন্দ বিষয়ে কিছু বলিলাম। উহা কাহারও ভাল কাহারও মন্দ হইতে পারে,—তাহা মানবীয় জ্ঞানোন্নতি ও দূরদর্শনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এখানে কেবল শাসন প্রণালীর কথা বলা গেল। বলা বাহুল্য যে, গ্রীকদিগের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট।

হিন্দুদিগের এই সহায়শূন্য ও আস্থাশূন্য ভাব এবং পরলোকে দৃষ্টি-বদ্ধ ভাব ও নশ্বরবাদ, যাহা আবহমানকাল চলিয়া আসিয়া, সাংসারিক ব্যাপারে তাহাদিগকে জুজুর ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এক সময়ে একবার ভঙ্গ হয়। ঐ সময় বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবকাল। এই সময়েই ভারতবর্ষ জাতীয় পুরাবৃত্তমধ্যে যে কিছু সাংসারিক ব্যাপারে গৌরবলাভ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মদ্বারা লোকের মনে নূতন প্রকারের তেজ নিক্ষিপ্ত হয়। এবং প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মপ্রভাবে লোকের মন যে পারলৌকিক, মায়াবাদ ও তথাবিধ তত্ত্বে মোহাভিভূত হইয়া জড়ভরতপ্রায় হইয়াছিল, এই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে তাহার বহুলাংশ অপনীত, এবং

পার্থিব বিষয়ে সেই পরিমাণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এইসময়ের রাজা অশোক,—সমগ্র পরিজ্ঞাত ভারতের অধীশ্বর। লোক সকল সাংসারিক আত্মোৎকর্ষ অবধারণ ও তাহা রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। • এবং বিদেশ বাণিজ্যের অভ্যুদয় হওয়ায়, ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের বহুলতা বশতঃ, স্থলপথ ও জলপথে, বহুস্থানে যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে তৎকারণ বশতঃ, সুধু সমুদ্র যাত্রা ও বিদেশ ভ্রমণেই মানবীয় শক্তির পর্য্যন্ত হয় নাই, ইহার ফল স্বরূপ ভূগোল এবং রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানেরও সমালোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে কৃষি বাণিজ্য উভয়বিধ উপায় দ্বারা বহুধন সঞ্চয় হয়, এবং শিল্পবিদ্যার ও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। প্রাচীন রাজনৈতিক সমাজে ভারতের যে কিছু গণনা তাহা প্রায় এই সময়ের প্রভাবে হয়। বৌদ্ধ প্রচারকগণ না গিয়াছিল, এমন স্থান প্রায় বিরল। লৌকিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ধরিলে, ভারতের এই সময়ের মূর্ত্তি অতি মনোহর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে এ মূর্ত্তি ক্ষণস্থায়ী,—ফলতঃ ইহার প্রকৃতিও বহুক্ষণস্থায়ী হইবার নহে। যাহা হউক, ভারতের পূর্ব্বাপর ধরিতে গেলে, এ দীর্ঘসময়ের মধ্যে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কাল পলকবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

এক্ষণে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে লৌকিক, সাংসারিক বা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে হিন্দুরা গণনার উপযুক্ত কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। জীবন যাত্রা যাহাতে আপাততঃ সুখে অতিবাহিত হয়, তৎপক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে তুলনীয়ের অভাবে তাহা অতুলনীয় হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ জাতির স্বভাব হইতে যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সেই নৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজি পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন উন্নতির মোহিনী শক্তি বহু বিপ্লব গতেও অস্তিত্ব শূন্য না হইয়া, বরং পূর্ণভাবে দর্শকের চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতেছে। উপপাদ্য এবং নৈতিক বিষয়ে এরূপ শ্রেষ্ঠ জাতি আর নাই। কাল আবর্ত্তনে সেসকল বিষয় যদিও বহুতর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার জীবনী ও মাধুর্য্য শক্তি এখনও অপরিসীম। যে বল অন্যত্র দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করণার্থে ব্যয়িত হইত, সে বল, এখানে অপরের বিপদোদ্ধারে নিযুক্ত। যে অর্থ অন্যত্র খেয়াল পরিপূরণার্থে ও বিলাস বিস্তারার্থে নিয়োজিত হইত, এখানে তাহা দরিদ্রের দারিদ্র্য নিবারণ এবং বিধবার চক্ষুজল মোচনের নিমিত্ত পর্য্যবসিত হইত। যে বুদ্ধি অন্যত্র দুরাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ, এবং বিলাস বিস্তারের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত, এখানে তাহা ধর্ম্ম মনস্তত্ব প্রভৃতি তত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত। ইহাদের জাতীয় জীবন আমূলত নৈতিক। ইহা কেবল পৃথিবীর প্রথম অবস্থাতেই শোভা পাইয়াছিল,—যে সময়ে লোক সরল, লোক সাধু, এবং লোক সত্যরত, যে সময়ে লোকের ভিতর বাহিরে প্রভেদপরিবর্দ্ধক কাপট্য ছিল না। আবার যখন এই পৃথিবী ইহার দুরাকাঙ্ক্ষা,

দ্বেষ, হিংসা, প্রভৃতি পাপরাশি বিনিবারিত হইয়া, নৈতিক ও আর্য্য আকৃতি ধারণ করিবে, তখনই আবার সেই ভারত গৌরবের উচ্চ গগণে শোভা পাইতে থাকিবে, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে নহে। লৌকিক বিষয়ে চিত্ত নিয়োগকারী ও তদ্বিষয়ে উন্নতিশীল এবং আনুষ্ঠানিক চিত্ত ক্রিয়া যুক্ত জাতির যখনই এমন জাতির পার্শ্বে উদ্ভব হইবে, তখনই ইহাদের লৌকিক গরিমা ও প্রভুত্ব নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যাইবে, হয়ত প্রায়—লোপও হইতে পারে। ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। এই জন্যই গ্রীকদিগের সভ্যতা পরে উদিত হইলেও, লৌকিক দর্শনে বলিতে হইবে যে তাহা ভারতীয় সভ্যতার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই জন্য গ্রীস মৃত হইয়াও আবার এতশীঘ্র পুনর্জীবিত হইয়াছে। এই জন্যই অধুনাতন কালে ভারত সন্তান সার্দ্ধ সপ্তশত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিয়া আসিতেছে।

যেমন এক একটি নদীর অববাহিকা মধ্যে একটি করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ঐ মূল প্রবাহ প্রথমে মূল উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া তথা হইতে জল সংগ্রহ পূর্ব্বক যেমন গন্তব্য পথে গমন করে, এবং গমন করিতে করিতে যেমন শাখানদী সমূহের দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হয়, শাখা নদীরাও আবার তদ্রূপ; ইহারাও আবার তদনুরূপ নিয়মে পারিপার্শ্বিক নদীর দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক নদী আবার খাল বা নালার দ্বারা; নালা আবার ঘাট মাটের জলের দ্বারা; ঘাট মাঠের জল আবার মেঘের দ্বারা; মেঘ আবার—ইত্যাদি। ইত্যাদি, ইত্যাদি, এইরূপে, যতই নগণ্য হউক, যেখানকার যাহা, সমস্ত জল আসিয়া যখন মূল প্রবাহে নিপতিত হয়, তখন উহা শাখা প্রশাখার নামবিলোপী পুষ্ট কলেবর, গণনীয় ভাবে, পথমধ্যে বালুকা-লুপ্ত হইবার ভয় শূন্য হইয়া, যথাস্থানে গমন করিতে থাকে। পাঠক! বাঁশবাগানে বাঁশপাতা বহিয়া ঝির-ঝির করিয়া জল চলিয়া যাইতেছে, তাহা অনেকবার দেখিয়াছ; কিন্তু ইহা কি কখনও তোমার মনোমধ্যে চটক লাগিয়াছিল যে, এই জলই শেষে যাইয়া গঙ্গা বা তোমার পদ্মার কলেবর পুষ্টতা সাধন করিবে, এবং এই জলই শেষে আসিয়া তোমার দেশ ভাঙ্গিয়া ঘর ভাসাইয়া লইয়া যাইবে? বোধ করি পদ্মা বা গঙ্গার বিষম কলেবর, এবং ইহার এই ক্ষুদ্রপ্রাণ, এতদুভয়ের বৈষম্য তুলনে, সে ভাব মনে কখনও উদয় হইলেও তাহাকে দাঁড়াইতে দেও নাই। কিন্তু তুমি দাঁড়াইতে দেও বা না দেও, কার্য্য যাহা হইবার তাহা হইতেছে; এবং ঐ যে সামান্য জলের ধারাটি, উহাই আখেরে পারিপার্শ্বিক নদী, শাখানদী বা যে কোন সূত্রে যাইয়া, তোমার পদ্মা বা গঙ্গার পুষ্টতা সাধন করিবে। এখন দেখ, তোমার বৃহৎ গঙ্গা কোথাকার ও কত দূরের সামান্য সামান্য কারণ হইতে বৃহৎ হইয়া আসিতেছে। মানবের বা মানবীয় জাতীয় জীবনপ্রবাহও তদ্রূপ। কি মানবীয়, কি মানবের জাতীয় জীবন, কায়িক, বাচনিক, মানসিক, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অজ্ঞাতপূর্ব্ব, বা যে কোন প্রকারে, নিরন্তর

কর্ম্মরত; তাহাতে তিলার্দ্ধের জন্য বিরাম নাই। অতএব মানবীয় বা মানবের জাতীয় জীবনকে একরূপ কর্ম্মসমষ্টি বলিলে হয়। কর্ম্মক্ষেত্র রূপ অববাহিকা মধ্যে প্রাকৃতিক জীবন ক্রিয়া মূল প্রবাহ। বৃত্তি প্রবৃত্তি ও দর্শন এবং দেশ কাল ইত্যাদি ক্রিয়া সমূহ শাখা প্রশাখা। শাখা প্রশাখার জন্য আবার কোন্ বাঁশপাতা ঝরিয়া জল আসিতেছে, তাহা যাহার চক্ষু আছে দেখিয়া লও। আমরা এতদুভয় জাতীয় জীবনের সেই মূল প্রবাহমাত্র ধরিয়া, যথা কথঞ্চিৎ পরিদর্শন করিয়া আসিলাম। এবং কোন্ উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া কোন্ দেশ দিয়া বহিয়া আসিতে আসিতে কোথাকার স্থানের গুণে কিরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, কেবল তাহাই কিয়ৎপরিমাণে দেখিয়া লইলাম। কিন্তু আবার তাহার কোন্ শাখা প্রশাখা এবং তাহাদের মূল স্রোতঃ, কিরূপে স্বয়ং পুষ্ট হইয়া আসিয়া, এবং কিরূপে গন্তব্য পথের গুণে গুণবিশিষ্ট হইয়া, মূল প্রবাহের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ও তাহাদের প্রাপ্ত গুণ সমষ্টিদ্বারা তাহাকে তৎ তৎ গুণময়ী করিয়া তাহাতে আসিয়া মিশিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলি নাই। কেবল দুই একটী শাখা প্রশাখার উপর অমনস্ক দৃষ্টিপাত করিয়া তাহারা কিরূপ গুণে গুণ বিশিষ্ট এবং মূল প্রবাহের স্বভাব সহ তাহাদের মিলনে সামঞ্জস্য সাধন হইয়া, মূল প্রবাহের সহ কেমন একধর্ম্মী হইয়াছে এবং কেমন বা আপন গুণ মিলনে মূল প্রবাহকে অংশত রূপান্তর করিয়াছে, তাহাই যথাযথ পর্য্যালোচনা করা গিয়াছে। যিনি শাখা প্রশাখা এবং তাহাদের আবার পরিপোষকদেরও আমূলত দৃশ্য দেখিতে চাহেন, আত্মস্বত্ব সম্ভূত দৃশ্যে দেখিয়া লইবেন। যে নিয়মে মূল প্রবাহ অবলোকিত হইতে পারে, শাখা প্রশাখাও সেই নিয়মে অবলোকিত হয়, কেবল সূক্ষ্মতর ভেদ মাত্র।

এজগতে গ্রীক এবং হিন্দুদিগের বিভিন্ন জাতীয় জীবন-প্রবাহ, এক উৎস হইতে বিনির্গত দুই বিভিন্ন পথগামী দুইটি ধারা স্রোতঃনদীর ন্যায়। যখন উৎস হইতে বাহির হইতেছে তখন উহাদের জল একই রূপ, কিছু মাত্র প্রভেদ থাকিবার সম্ভবও নাই,—ছিলওনা। পরে যখন ইহারা উৎপত্তি স্থান অতিক্রম করিয়া, আপনাপন নির্দ্দিষ্ট পথ বাহিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাইতে লাগিল, তখনই ইহারা স্ব স্ব গম্য পথের দেশকাল স্বভাবে সংলগ্নে আসিবায় তাহাদের গুণযোগে তৎ তৎ গুণ--রূপান্তরিত প্রাপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। যতই পথ অতিক্রম করিয়া দূরপথে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই তাহাদের গুণান্তর প্রাপ্তি ক্রমে এত বৃদ্ধি হইয়া আসিল যে, তখন স্থূলদৃষ্টে দেখিলে ও এতদুভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে, ইহাদিগকে আর সমজাতীয় নদী বলিয়া বোধ হয় না। সম্পূর্ণই পৃথক প্রকৃতির বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, তথাপি তদ্রূপ হইলেও, যাহার চক্ষু আছে যাহার অনুসন্ধান আছে, সে স্বচ্ছন্দে দেখিয়া লইবে যে, উহা আপাততঃ যতই বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া বোধ হউক না কেন; উহাদের ফলতঃ অন্তরে অন্তরে

একই উৎসের জল প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। এবং গুণের যদি ধ্বংস না থাকে, তাহা হইলে মূল-উৎসের জলের যে গুণ, যতই প্রস্থান ভাবে হউক না কেন, এখনও উহাদের তাহার সমান অস্তিত্বই আছে। পুনশ্চ এখন যত গুণান্তর,রূপান্তর বিশিষ্ট দেখিতেছ, আবার যতই বিভিন্ন পথ বাহিয়া হউক,যখন মহাসমুদ্রে যাইয়া উভয়ে পড়িবে তখন উভয়েই উভয়ের গুণ উভয়ে মিলাইয়া এক গুণ বিশিষ্ট হইয়া মহাসমুদ্র জলে মিশিবে। একজল হইয়া যাইবে। বিশ্বনিয়ন্তা! তোমার উদ্দেশে কোটি কোটি নমস্কার!

গ্রীক এবং হিন্দু এ উভয় জাতিই, পৃথিবীর প্রথমকালে মনুষ্যবর্গকে শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ। উভয়ই নিয়ন্তার নিকট হইতে শিক্ষকতা পদ প্রাপ্ত হইয়া উদিত হইয়াছিল। সুতরাং উভয় জাতিই পূজ্য। হিন্দুরা পারলৌকিক, আধ্যাত্ম, এবং উপপাদ্য তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত। ঐরূপ গ্রীকেরা আবার ইহলৌকিক, আধিভৌতিক, এবং আনুষ্ঠানিক তত্ব সমূহ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভার প্রাপ্ত। অতএব সাংসারিক বোধে ধরিতে গেলে; এ পৃথিবীতে প্রাচীন হিন্দুরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং গ্রীকেরা ক্ষত্রিয়। এ উভয় প্রাচীন জাতিই এক্ষণে পৃথিবী হইতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের বংশধরেরা আছে বটে, কিন্তু তাহারা আচার ভ্রষ্ট, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট, যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং থাকিতেও নাই। ওদিকে আগে যাহারা শিষ্য পদবীতে ছিল, এখন তাহারা আবার জ্যোতিষ্মাণ হইয়াছে, তাহারা নিজ তেজে তাহাদের প্রাচীন আচার্য্য বর্গেরও তেজ একান্ত মলিন করিয়া ফেলিয়াছে; এমনকি লোপ পর্য্যন্ত করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে। কেবল রক্ষা এই যে অনন্ত পুস্তকে যখন তাহাদের সেই কর্ম্ম সমূহ জমা করা আছে, তখন মনুষ্য নয়ন তাহা লোপ করিলেও, অনন্তগর্ভ হইতে তাহাকে লোপ করিবার আশঙ্কা নাই। সে যাহা হউক বর্ত্তমান একজন দক্ষ ভূতত্ববিদ্যাবিৎ ও প্রাচীন পিথাগোরাসে যে সম্বন্ধ, বর্ত্তমান প্রতিভা যুক্ত নব অভ্যুদয় শালী জাতি সমূহের সহ প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দুদিগেরও সেই সম্বন্ধ জানিতে হইবে। বর্ত্তমান পৃথিবী আনুষ্ঠানিক ও বৈজ্ঞানিক, সেই জন্যই গ্রীক বিদ্যা এখনকার মানব জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান আছে এবং সেই জন্যই এখন উহার এত আদর। কিন্তু যেমন চৈতন্য ব্যতীত শরীরী জীবের অবস্থান অসম্ভব, সেইরূপ মনস্তত্ব, নীতিজ্ঞান ও উপপাদ্য শাস্ত্র ব্যতীতও পৃথিবী তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব এমন একদিন এই পৃথিবীতে অবশ্যই আসিবে, অথবা সে দিন হয়ত প্রভাতও হইয়াছে, যে দিন এই ভারতবিদ্যা আবার নূতন শ্রী ধারণ করিয়া জগতে অভূতপূর্ব্ব নূতন শোভা বিস্তার করিতে থাকিবে। আবার ভারত গৌরবের উচ্চ গগণে উঠিবে। ইহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি।

ইতি চতুর্থ প্রস্তাব। সমাপ্ত।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজপুতানার ইতিহাস।

মিবার-বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

মিবারের অধিপতিগণ রাণা নামে বিখ্যাত। ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে ইহাঁরাই সকলের শ্রেষ্ঠ। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লব হইতে রাণা বংশ সমুদ্ভূত, এই কারণে রাজপুত মাত্রেই ইহাঁদিগকে আপনাদের প্রধান ও 'হিন্দুসূর্য্য' বলিয়া সম্মান করেন। সমস্ত রাজপুত রাজকুলের মধ্যে কতকগুলি একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত, কতকগুলি অধিকারচ্যুত, এবং কতকগুলি স্বল্পাধিকার হইয়াছেন, কিন্তু মিবারপতি রাণাগণ বিগত অষ্টশত বর্ষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ অধিকারে সমান তেজে আপনাদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কত কত ঘোরতর বিপদ ইহাঁদিগের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তথাপি ইহাঁরা হতবল ও সম্ভ্রমচ্যুত হয়েন নাই। মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ প্রবেশের পূর্ব্বে রাণাদিগের যে পরিমাণ অধিকার ছিল, এখন পর্য্যন্ত প্রায় তাহাই আছে। আর কোন রাজপুত কুলপতির সেরূপ নাই। এই সকল কারণেই রাণারা রাজপুতগণের মধ্যে এতদূর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।

রাণাদিগের প্রাচীন বিবরণ নিতান্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা পুরুরাজকে রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরুরাজের রাণী উপাধি ছিল, ইহাতেই উপরিউক্ত ভ্রমের সম্ভাবনা। ফলতঃ মিবাররাজদিগের রাণা উপাধি অধিক দিনের নহে। ইহাঁরা প্রাচীন কালে 'রাবল্' নামে পরিচিত ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহাঁরা রাণা উপাধিধারী পরিহারবংশীয় মণ্ডোরপতিকে যুদ্ধে হত করিয়া তাঁহার সিংহাসন ও উপাধি হরণ করেন।

রামচন্দ্র হইতে ষট্‌পঞ্চাশৎ পুরুষ সুমিত্র খৃষ্টাব্দের পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং ইনি বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী। অম্বরেশ্বর সুপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষরাজ জয়সিংহ যে রাজপুতকুলবিবরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি ঐ সুমিত্রকে রাণাবংশের সংস্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উদয়পুরের রাজপুস্তকালয়ে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল রাজপুতকুলবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে কণকসেন এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে।*

* মহাত্মা লেপ্টনেন্ট কর্ণেল টড যত গুলি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'খোমান রাস' নামক গ্রন্থে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যদিও গ্রন্থখানি

এরূপ প্রথিত আছে যে, রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লব কর্তৃক লবকোট নগর সংস্থাপিত হয়। ঐ নগরই এক্ষণে লাহোর নামে পরিচিত। লববংশীয়েরা বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বাস করেন, পরে ১৪৫ খৃঃ অব্দে কণকসেন সৌরাষ্ট্র * প্রদেশে গমন পূর্ব্বক জনস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁরা কোন্ পথ দিয়া লবকোট হইতে সৌরাষ্ট্রে গমন করেন তাহার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। পথিমধ্যে কণকসেন একজন প্রমররাজকে অধিকারচ্যুত করিয়া বীরনগর নামে এক নগর সংস্থাপন করেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কণকসেন হইতে চতুর্থ পুরুষ বিজয়সেন কর্তৃক বিজয়নগর সংস্থাপিত হয়। ইহারই ধ্বংসা-

---

আকবরের সময়ে লিখিত, তথাপি ইহাতে অনেক প্রাচীন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীর মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য, ত্রয়োদশে আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ, এবং ষোড়শে প্রতাপসিংহের অক্ষয় কীর্তিসকল এই গ্রন্থে অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মান কবীশ্বর প্রণীত 'রাজবিলাস' ও সদাশিব ভট্ট প্রণীত 'রাজরত্নাকর' এই উভয় গ্রন্থেও ঐ সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় অরঙ্গজেবের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজসিংহের সময়ে লিখিত। সুতরাং এই দুই গ্রন্থে 'খোমানরাস' অপেক্ষা আধুনিক বিবরণ কিছু অধিক আছে। রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের সময়ে রচিত 'জয়বিলাস' গ্রন্থেও উপরি উক্ত বিবরণ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। টড সাহেবের অনুসন্ধিৎসাকে আমরা বার বার প্রশংসা করি। একজন রাজকুলকবির বিধবা পত্নীর নিকট হইতেও তিনি বংশাবলীর অনেক পরিচয় লাভ করেন। একজন জৈনগুরুর নিকটে এ বিষয়ের অনেক সন্ধান পাইয়াছিলেন। যখন রাণারা সৌরাষ্ট্রে বাস করিতেন, তখন ঐ পুরোহিতের পূর্ব্বপুরুষও সেই সঙ্গে ছিলেন। রাণাদের সঙ্গে ঐ জৈনপুরোহিতবংশও মিবারে আগমন করে। তাঁহাদের সংসারেও ঐ রাজকুলবিবরণ ছিল। এইরূপে মহাত্মা টড অনেক স্থান হইতে এবং মুসলমান সম্রাটদিগের স্ব স্ব লেখনীনিঃসৃত বিবরণ হইতে দুর্জ্ঞেয় বিষয়সকল সংগ্রহ করিয়া রাজস্থানের বিস্তৃত ইতিহাস প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থ যে একবারে ভ্রমশূন্য তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি যে ভিত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তদুপরি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশুদ্ধ সৌধ নির্ম্মাণ করিতে কেহই চেষ্টা করিলেন না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর নাই। রাজপুতানার করদ ও মিত্র রাজগণের সভায় যে সকল সুদক্ষ ইংরাজকর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

*সৌরদিগের অর্থাৎ সূর্য্য সন্তানগণের রাষ্ট্র অর্থাৎ রাজ্য বলিয়া ঐ প্রদেশের নাম সৌরাষ্ট্র হইয়াছে। সূর্য্যের উপাসক দিগকেও সৌর বলিয়া থাকে। কিন্তু এখানে সূর্য্য বংশীয়দিগকেই সৌর বলা প্রশস্ত। এরূপও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে ইহাঁরা সূর্য্যকে আদি পুরুষ ও কুলদেবতা বলিয়া পূজা করিতেন।

বংশেষোপরি এক্ষণে ঘোল্কা নগর অবস্থিত রহিয়াছে। বিদর্ভ নগরও বিজয় সেন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত, এক্ষণে উহা সিহোর নামে বিখ্যাত। ইহারা সৌরাষ্ট্র প্রদেশে বল্লভীপুর নামক নগরী সংস্থাপিত করেন, তাহাই ক্রমে ইহাঁদিগের প্রধান রাজধানী হইয়া উঠে। ভাটনগরের উত্তর পশ্চিম কোণে ৫ ক্রোশ অন্তরে বল্ভী নামে যে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেই স্থানেই উক্ত রাজধানী সংস্থাপিত ছিল বলিয়া অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তার মত যে, পূর্ব্বকালে রাণাদিগের জাতীয় নাম বল্ল ছিল, তদনুসারে তাঁহাদিগের রাজধানী বল্লভীপুর বলিয়া অভিহিত হয়। অধ্যক্ষেরা বল্লরায়, বল্লনাথ নামে অনেক দিন পর্য্যন্ত পরিচিত ছিলেন। কিছু কাল পরে ইহারা গুহলোট বা গ্রাহিলোট নামে পরিচয় লাভ করেন। যখন রাণারা সৌরাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া অহর* নগরে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বাস করেন, তখন তাঁহারা অহর্য্য উপাধী লাভ করেন। তাহার পর এই বংশ শিশোদ† নগরে কিছুকাল বাস করায় শিশোদী নাম প্রাপ্ত হয়। অদ্যাপি উহাদের ঐ নাম প্রচলিত আছে।

কণকসেন সৌরাষ্ট্র প্রদেশে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বংশ পরম্পরায় প্রায় ৩৮০ বৎসর তথায় বাস করিলে পর কোন অসভ্যজাতি * আসিয়া সৌরাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করে। সে সময়ে সৌরাষ্ট্র সিংহাসনে শিলাদিত্য অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসভ্যদিগের হস্তেই তিনি নিধন প্রাপ্ত হন, বল্লভীপুর ভস্মীভূত হয়, জনপদবাসী রাজপুতেরা পলায়ন করিয়া মরুদেশ † মধ্যে বল্লী, সান্দেরি, ও নাডোল ‡ নগর

* এখন যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত উদয়পুর নগরী বর্ত্তমান আছে, তাহারই উপত্যকা বিশেষে অহর নগর সংস্থাপিত ছিল।

† যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, কোন রাজপুত রাজা বহু পরিশ্রমে একটী শশ বধ করিয়া, তাহাই স্মরণীয় করিবার জন্য সেই স্থানে এক নগর সংস্থাপন করিয়া তাহাকে শিশোদ নামে পরিচিত করেন। বোধ হয় তখন উহার নাম শশদ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে শিশোদ হইয়াছে।

* খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধু নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে পার্থিয়ানদিগের আধিপত্য বিস্তারিত হইয়াছিল। সামিনগর তাহাদের রাজধানী। অতি পূর্ব্বকালে যদুবংশীয়েরা এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ পার্থিয়ানেরা সৌরাষ্ট্রদেশ আক্রমণ করিয়া রাজপুতদিগকে পরাজিত করে, আসিয়া খণ্ডস্থ যেসকল জাতি ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, সিন্ধু নদের তীর ভূমিই তাহাদিগের প্রশস্ত পথ। অনেক স্থানে তাহার নিদর্শনও অদ্যাপি দেদীপ্য রহিয়াছে। আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন তাঁহারাও ঐ পথ দিয়া আসিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

† মরুদেশ অর্থাৎ মাড়োয়ার।

‡ এখন পর্য্যন্ত ঐ নগর ত্রয় বর্ত্তমান আছে, অধিবাসীগণ জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। জৈন গ্রন্থ পাঠে অবগতি হয় যে, যখন

সংস্থাপন পূর্ব্বক বাস করে। রাজপরিবার-গণের মধ্যে কেবল রাণী পুষ্পবতী রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। জৈনদিগের গ্রন্থানুসারে এই ঘটনা ৫২৪ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হয়।

শিলাদিত্যের সহিত অসভ্য যবনদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে একটী অতি চমৎকারজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। বল্লভীপুরে সূর্য্য-কুণ্ড নামে একটী জলাশয় ছিল; অরাতি-দমনের জন্য সমরে গমন সময়ে শিলাদিত্য সেই জলাশয়ের তীরবর্ত্তী হইয়া আহ্বান করিবামাত্র সপ্তশির বিশিষ্ট এক তুরঙ্গম জল মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শিলাদিত্যের নিকট আগমন করিত। রাজা তদুপরি আরোহণ করিয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতেন। ঐ অশ্ব সূর্য্যদেবের রথ টানিত বলিয়া প্রথিত ছিল, সুতরাং এপ্রকার দৈবশক্তি সম্পন্ন অশ্ব যাহার বশীভূত, এমন মানব ভূমণ্ডলে কে আছে যে তাহাকে পরাভূত করে। শিলাদিত্য এই সপ্তাশ্ব সাহায্যে সকল শত্রুকেই দমন করিতেন। কিন্তু এ-বার তাঁহার সে কৌশল বিফল হইয়া গেল। দুষ্ট শত্রুগণ এই বিষয় জানিতে পারিয়া কুণ্ডের জল অপবিত্র করিবার জন্য তাহাতে গোমাংস নিক্ষেপ করিল। কুহক অসভ্যেরা বল্লভীপুর ধ্বংস করে, তখন উক্ত নগরেও জৈন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। জৈনেরা এক সময়ে ভারতবর্ষের অধিকাংশে আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচারিত করে। অদ্যাপিও অনেক স্থানে উক্ত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে।

ভাঙ্গিয়া গেল, শিলাদিত্য বার বার চীৎকার করিয়াও সপ্তাশ্বের সাহায্য পাইলেন না, শত্রু হস্তে পতিত হইলেন। রাজ্য ছারখার হইয়া গেল। *

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিলাদিত্যের মৃত্যুর পর পুষ্পবতী ভিন্ন অন্যান্য মহিষীগণ অগ্নি প্রবেশ করিলেন। রাণী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর প্রমর বংশীয় রাজার কন্যা। এই বিষম বিপৎপাতের সময়ে তিনি পিত্রালয়ে থাকিয়া তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্যভবানীর অর্চনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অন্তঃসত্বা ছিলেন; দেবীর নিকট

* এরূপ অলৌকিক ব্যাপার আমরা অনেক প্রাচীন বিবরণ মধ্যে দেখিতে পাই। কলিকাতার ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে পাণ্ডুয়া নামে একটী স্থান আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এই স্থানের উপর দিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। ইহাকেই সচরাচর পেঁড়ো বলিয়া থাকে, এবং ইহা মুসলমানদিগের একটী তীর্থস্থান। অতি প্রাচীনকালে ইহার নাম প্রদ্যুম্ন নগর এবং এখানে একজন হিন্দু রাজার বাস-স্থান ছিল। এখন এখানে পীরপুকুর নামে যে জলাশয় আছে, তখন তাহার জলের এমন এক অসাধারণ গুণ ছিল, যে তাহা স্পর্শ করিলে মৃত ব্যক্তিও সঞ্জীবতা লাভ করিত। সুতরাং শত্রুপক্ষীয়েরা তথাকার সৈন্য ক্ষয় করিতে পারিত না। মুসলমানেরা গোমাংস নিক্ষেপ দ্বারা ঐ জলের মৃত সঞ্জীবনী ক্ষমতা দূর করিয়া দিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করে।

পুত্র কামনাই তাঁহার অর্চ্চনার কারণ। পূজা সমাপন করিয়া স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পুষ্পবতী এই হৃদয়বিদারক সমাচার প্রাপ্ত হইলেন। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল, সন্নিহিত মাল্য পর্ব্বতের গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। তথাকার দেবমন্দিরস্থ দেবল ব্রাহ্মণের কমলাবতী নামে এক কন্যা ছিল, পুষ্পবতী তাহারই উপর নব প্রসূত পুত্রের লালন পালনের ভার অর্পণ করিলেন, কিন্তু আপনার পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহাকে এই মাত্র কহিলেন, 'এই শিশুকে ব্রাহ্মণ সন্তানের উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করাইবে, এবং বিবাহ যোগ্য বয়সে রাজপুত কন্যার সহিত বিবাহ দিবে।' পুষ্পবতী এই কথা বলিয়াই তথা হইতে প্রস্থান করিয়া মৃত পতির সহচারিত্ব উদ্দেশে চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। কমলাবতীর একটী শিশু পুত্র ছিল, তিনি সেই সঙ্গে লব্ধ শিশুকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত গুহায় জন্ম বলিয়া গুহ নাম রাখিলেন। সূর্য্যরশ্মি লুক্কায়িত থাকিবার পদার্থ নহে। গুহ ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে রাজপুত বালকদিগের সহিত মিলিত হইয়া বন্য পশুপক্ষ্যাদি হনন প্রভৃতি বিবিধ দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে নিতান্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিলেন। সন্নিহিত ইডুর নগরের অসভ্য ভীল যুবকদিগের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল। এই সময়ে মণ্ডলিক নামক জনৈক ভীল ইডুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বনপুত্রগণের সহিত তিনি সর্ব্বদাই বন প্রদেশে গমন পূর্ব্বক বিবিধ দুঃসাহসিক ব্যাপার সম্পাদন করিতে। ভীলযুবকেরা তাঁহার উপর প্রীত হইয়া ইডুর ও সন্নিহিত বন ও পর্ব্বত তাঁহাকে সমর্পণ করে। আবুল ফজল্ এবিষয়ের যে একটী মনোহর উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই স্থলে বিবৃত করা যাইতেছে।—"ভীলযুবকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে একজনকে রাজা মনোনীত করিবে স্থির করিল, গুহ মনোনীত হইলেন, তৎক্ষণাৎ জনৈক ভীলযুবক আপনার অঙ্গুলি ছেদন করিয়া সেই রক্তে গুহের ললাটে রাজটীকা প্রদান করিল। কৌতুকচ্ছলে যাহা হইল, পরিণামে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল।" পরিশেষে তিনি মণ্ডলিকের প্রাণবধ করিয়া ইডুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গুহের নাম হইতেই তদ্বংশীয়েরা গুহলোট নামে পরিচিত হইয়াছে

গুহ হইতে আটপুরুষ পর্য্যন্ত ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বিবরণ নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন। ভীলেরা বিজাতীয়ের অধীনত্ব একান্ত অসহ্য বোধ করিয়া অষ্টম রাজা নাগাদিত্যের জীবন সংহার করিল। যে রমণী গুহকের লালন পালন করিয়া গুহলোট বংশের জীবন দান করিয়াছিলেন, সেই কমলাবতীর বংশীয়গণ দ্বারা পুনরায় ঐ বিখ্যাত বংশ রক্ষিত হইল।

* কেহ কেহ কহেন, শিলাদিত্যের পুত্রের প্রকৃত নাম গ্রহাদিত্য। গুহায় জন্ম বলিয়া গুহ কেবল উপনাম মাত্র। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে গুহলোটদিগকে গ্রাহিলোট বলা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে

গুহ কমলাবতীর পুত্রকে কুলপুরোহিত করেন। যখন নাগাদিত্য ভীল হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তখন তাঁহার পুত্রের বয়ঃক্রম তিন বৎসর। ঐ পুত্রের নাম বাপ্পা। পুরোহিত বাপ্পাকে লইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ভাণ্ডেরপতি একজন যদুবংশীয় ভীলের শরণাপন্ন হইলেন। তৎপরে সমধিক নিরাপদ লাভের জন্য বাপ্পা স্থানান্তরে নীত হইলেন। ঐ স্থানে ত্রিকূট পর্ব্বতের পাদদেশে বহু ব্রাহ্মণ সমন্বিত নগেন্দ্র নগর অবস্থিত ছিল। এই স্থানেই বাপ্পার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। *

বাপ্পার বাল্যজীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নগেন্দ্র নগর নিবাসী ব্রাহ্মণগণের গোচারণের নিমিত্ত বাপ্পা সর্ব্বদাই বনে বনে ভ্রমণ করিতেন। একদা তথাকার সোলাঙ্কি রাজার দুহিতা কতকগুলি গ্রাম্য বালিকার সমভিব্যাহারে বন বিহারে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় ঝুল খেলিবার উদ্যোগ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে রজ্জু নাই। এতদবসরে বাপ্পা তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজপুত বালিকাগণ তাঁহাকে তাঁহাদের ক্রীড়ায় মিলিত হইতে আহ্বান করিলেন। বাপ্পা কহিলেন, যদি তোমরা আমাকে বিবাহ কর, তবে আমি তোমাদের খেলার জন্য রজ্জু প্রস্তুত করিয়া দি। তাহারা সম্মত হইলে খেলা আরম্ভ হইল, এক আম্রবৃক্ষতলে তাঁহাদের তামসিক বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। এই ঘটনাই বাপ্পার তথা হইতে পলায়নের কারণ হইল, কিন্তু এই বালিকাগুলির ভার তাঁহার স্কন্ধে পড়িল। সোলাঙ্কিরাজ স্বীয় দুহিতার বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুলাচার্য্য পাত্রীর লক্ষণ পরীক্ষা করিবার সময় কহিলেন, 'ইহার বিবাহ হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। বাপ্পার অনুচরেরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিল, সুতরাং তাহাদের দ্বারা এবিষয় প্রকাশিত হইল না বটে, কিন্তু যে ব্যাপারে বহু সংখ্যক বালিকা ব্যাপৃত আছে, তাহা বহুকাল প্রচ্ছন্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এবিষয়ে বাপ্পা সম্পূর্ণ দোষী, সোলাঙ্কিরাজ ইহা জানিতে পারিলেন। বাপ্পা বিপদ সম্ভাবনা করিয়া নিকটস্থ পর্ব্বত কন্দরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুইজন মাত্র বিশ্বাসী অনুচর তাঁহার সঙ্গে ছিল। উভয়েই ভীলজাতীয়। একজন বর্ত্তমান উদয়পুর উপাত্যকাস্থিত উদ্‌রি নিবাসী, আর একজন পশ্চিম বন প্রদেশস্থিত ওগুনা পানোরা * নিবাসী। প্রথমের নাম

† উদয়পুরের ৫ ক্রোশ উত্তরে যে নগ্‌দা নামে এক নগর আছে, তাহাই পূর্ব্বে নগেন্দ্র নামে বিখ্যাত ছিল। টড্‌সাহেব এখানে কতকগুলি অতি প্রাচীন খোদিত লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানি প্রায় ৯০০ নয়শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়। এই সকল লিপি পাঠে তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, এই বংশের নাম গোলিহ। বোধ হয় তাহাই ক্রমে ক্রমে গুহলোট বা গোহিলোট হইয়া পড়িয়াছে।

* ওগুনা পানোরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন জনপদ ছিল। ভিন্ন

বাপ্পা দ্বিতীয়ের নাম দেবা। অদ্যাপিও ঐ দুইজনের বংশীয়েরা রাণাদিগের রাজটীকা প্রদান করিয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠের রক্ত দানে উক্ত কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ওগুনার অধ্যক্ষ রাণার হস্ত ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করায় এবং উদ্‌রিভীল তণ্ডুল কণা প্রভৃতি দ্বারা টীকাদান কার্য্যের উপসংহার করে।

পৃথিবীতে যত অলোকসাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্ম বা বাল্যসময়ের প্রায়ই কোন না কোন অলৌকিক বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। বাপ্পা সম্বন্ধেও সে বিষয়ের অভাব ছিল না। অদ্যাপিও মিবারে তিনি চিরজীব বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকেন। বাপ্পা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিবরণটী অতীব চমৎকার জনক। নগেন্দ্র নগরের বন্য প্রদেশে যখন তিনি ব্রাহ্মণগণের গোচারণ ব্রতে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়।

ঐপ্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটী বেত্র-কুঞ্জে মহর্ষি হারীত তপস্যা করিতেন। একটী দুগ্ধবতী গাভী অলক্ষিত ভাবে ঐ কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া অবিরত দুগ্ধধারা বর্ষণ করিত। সন্ধ্যা সময়ে গবীগণ গৃহে উপস্থিত হইলে যখন গো দোহন আরম্ভ হইত, তখন গোপেরা পূর্ব্বোক্ত গাভীতে কিছুমাত্র দুগ্ধ প্রাপ্ত হইত না। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা সন্দেহ করিলেন, বাপ্পা বন মধ্যে গোদোহন করিয়া সেই দুগ্ধ পান করে। নির্দ্দোষ বাপ্পা দেখিলেন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকেই অপরাধী করিয়াছেন, অথচ তিনি এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিলেন না। মনে মনে দোষ ক্ষালনের জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বাপ্পা এক দিন অনন্যচিত্তে উক্ত গাভীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেখিলেন যে, সে বেত্রকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করত অনবরত দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতেছে। বাপ্পা এতদ্ব্যাপার সন্দর্শনে নিতান্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া বেত্র কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করত দেখিলেন, এক মহর্ষি তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারই সেবার জন্য গাভী দুগ্ধ প্রদান করিতেছে। বাপ্পার প্রমুখাৎ এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা স্বচক্ষে দর্শন করতঃ চমৎকৃত হইলেন, এবং বাপ্পাকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

বাপ্পা মহর্ষি হারীতের নিকট উপস্থিত হইয়া বিবিধ অনুনয় বিনয় দ্বারা আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন, মহর্ষিও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করত নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি হারীত বাপ্পাকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে এক লিঙ্গের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত করিলেন। বাপ্পা প্রত্যহ হারীতের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন, মহর্ষির পদ ধৌত করিয়া দেন, দুগ্ধ আহরণ করিয়া আনেন, দেবার্চ্চনের উপযোগী নানাবিধ পুষ্প সংগ্রহ করেন এবং তাঁহার নি-

রাজ্যের সহিত ইহার কোন সংস্রব ছিল না। একজন সোলাঙ্কি রাজপুত বংশীয় ভীল এখানকার রাজা। এক হাজার কুটীর মাত্র বসতি; প্রয়োজন হইলে পাঁচ সহস্র ধনুর্দ্ধারী সজ্জিত হইতে পারিত।

কট বিবিধ নীতি শিক্ষা করেন। দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা এক লিঙ্গের উপাসনায় বাপ্পা কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই জানিতে পারিলেন, এক লিঙ্গের প্রতি একাগ্রচিত্ততা তাঁহার পক্ষে কোন অংশেই নিষ্ফল হয় নাই। শঙ্কর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। শঙ্করমহিষী পার্ব্বতী মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূতা হইয়া বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত বিবিধ স্বর্গীয় অস্ত্রশস্ত্রে বাপ্পার শরীর স্বহস্তে সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। দুর্ভেদ্য দৈবকবচে তাঁহার শরীর মণ্ডিত হইল। হারীত দেখিলেন, বাপ্পার প্রতি হরপার্ব্বতী প্রসন্ন হইয়াছেন, শিষ্য দৈব বলে বলীয়ান হইল, এক্ষণে সে স্বীয় ভাগ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া ভবিষ্যতে উন্নতির পথ দেখিয়া লইতে পারিবে। অতএব এখন আমি দেব লোকে গমন করিতে পারি। এইবিবেচনা করিয়া হারীত নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করত বাপ্পাকে কহিলেন, আগামী কল্য আমি দেব লোকে প্রস্থান করিব, অতএব অতি প্রত্যূষে তুমি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বাপ্পার সে দিন প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হইল না, আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল; আসিয়াই দেখিলেন গুরু অনেক দূর উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, অপ্সরেরা তাঁহার রথ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। হারীত দেখিলেন, নিম্নে তাঁহার শিষ্য উপস্থিত, তখন স্নেহের বশীভূত হইয়া রথ স্থির করিলেন এবং বাপ্পাকে কহিলেন, আসিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। বাপ্পার দেহ বিংশতিহস্ত প্রমাণ দীর্ঘ হইল, কিন্তু তথাপি তিনি রথ স্পর্শ করিতে পারিলেন না। হারীত তাহাকে মুখ ব্যাদন করিতে কহিলেন, বাপ্পা নিদেশানুরূপ কার্য্য করিলে গুরু তাহার মুখ মধ্যে থুৎ প্রদান করিলেন। শিষ্য তাহা মুখে ধারণ কি গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ হইয়া ফেলিয়া দেওয়ায় তাহা তাহার পায় পড়িল। এই অপরাধে তিনি চিরজীবিত্ব লাভ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ভবানীর কৃপায় ও গুরুবলে দুর্ভেদ্য কলেবর ধারণ করিলেন। পার্থিব কোন অস্ত্রে তাহার শরীর ভেদ করিতে পারিবে না। এই সময়ে তিনি লোক পরম্পরায় জানিতে পারিলেন, চিতোরের মোরিবংশীয় রাজা তাহার মাতুল সম্পর্কীয়, এখন আর তাহার গোপ শিশুর ব্যবসা ভাল লাগিল না, কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে নিজ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বহির্গত হইলেন। পথি মধ্যে পর্ব্বত কন্দর বিশেষে সুপ্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত নামা তপস্বী গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎ পাইয়া সেবাদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। গোরক্ষনাথ তাঁহার প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া তাহাকে এক দ্বিমুখ খড়্গ প্রদান করত তদ্ব্যবহারের মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। যথাযথ মন্ত্রপূত করিয়া সেই খড়্গের আঘাত করিলে দুর্ভেদ্য পর্ব্বতও দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। * বাপ্পা এই প্রকার অমোঘ

* মিবারের রাণা ও অন্যান্য সামন্তগণ অদ্যাপি প্রতিবর্ষে একখানি দ্বিমুখ খড়্গের পূজা করিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন, উহাই গোরক্ষনাথ প্রদত্ত খড়্গ। উহারদ্বারা আঘাত করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—"পরমেশ্বর এক লিঙ্গ, দেবী ভবানী, মহর্ষি হারীত, গুরু গোরক্ষ-

অস্ত্রের সাহায্যে চিতোর সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।

বাপ্পা চিতোর নগরে উপনীত হইয়া মোরিরাজের † নিকট পরিচিত হইলেন। মৌর্য্যরাজ বাপ্পার পরিচয়ে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সামন্ত মধ্যে পরিগণিত করতঃ পরিপালনোপযোগী ভূসম্পত্তি দান করিলেন। মোরিরাজ সে সময়ে অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তৎসাময়িক খোদিত লিপি সমূহে তাঁহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার সিংহাসনের চারিদিগে বহু সম্মানশালী সামন্ত সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। মোরীরাজ ক্রমে ক্রমে এরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার সামন্তগণ আপনাদের প্রতি হতাদর দেখিয়া নিতান্ত অপমান বোধ করত সকলেই রাজপক্ষ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়ে একজন প্রবল শত্রু চিতোরের বিপক্ষে আগমন করিতে লাগিল। সামন্তগণ সময় বুঝিয়া আপনাদের অধিকার পরিত্যাগ করত রাজাকে কহিলেন, আমরা যুদ্ধ করিব না, আপনার প্রিয়পাত্র বাপ্পা গিয়া শত্রু নিবারণ করুন। বাপ্পা রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিপক্ষগণকে দমন করিতে চলিলেন। সামন্তগণ যদিও অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন, তথাপি লজ্জার জন্য বাপ্পার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বাপ্পা শত্রু দমন করিলেন, কিন্তু চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া সৌরাষ্ট্র প্রদেশে গমনপূর্ব্বক পৈত্রিক নগর গাজুনিতে উপনীত হইয়া তত্রত্য অসভ্যদিগকে দূর করিয়া দিলেন এবং সৌরবংশীয় এক ব্যক্তিকে তত্রত্য সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া চিতোরে আগমন করিলেন। এরূপ শুনা যায় যে তিনি শত্রুকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সামন্তগণ চিতোরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া নগর পরিত্যাগ করিলেন। রাজার অনুনয় বিনয়ে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না। রাজা গুরু ও আত্মীয়ের দ্বারা অনুরোধ করিলেন, তাঁহারা তাহাতে এই মাত্র কহিলেন ‘আমরা রাজার লুণ খাইয়াছি, এক বৎসর মাত্র তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিব না।’ বাপ্পার বলবিক্রম ও গুণপরম্পরার বশীভূত হইয়া সামন্তগণ তাঁহাকেই রাজা করিবার মনস্থ করিলেন। রাজমুকুটলোভে গুহলোট সমস্ত উপকার ভুলিলেন, কৃতজ্ঞতা তাঁহার হৃদয় হইতে একবারে পলায়ন করিল। তিনি সামন্তগণে পরিবৃত হইয়া চিতোরের সিংহাসন অধিকার করিলেন। সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তিনি এক কালে ‘হিন্দুসূর্য্য’ ও ‘রাজগুরু’ উপাধি লাভ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

নাথ ও তক্ষক স্মরণ করিয়া আমি আঘাত করি।”

† মোরি, মৌর্য্য বা মোরেয় বংশ প্রমর কুল সমুৎপন্ন। সেই সময়ে চিতোর মোরি বংশীয় মহারাজ চক্রবর্ত্তী মালবেশ্বরের অধীনস্থ ছিল। চিতোর নগর তখন রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না; কিন্তু অদ্যাপি তথায় তাঁহাদিগের কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংসাবস্থায় অবস্থিত রহিয়া পূর্ব্বস্বামীদিগের অতুল কীর্ত্তি, অসীম প্রতিভা এবং প্রবল প্রতাপের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বাপ্পার অনেক পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগের প্রাচীন অধিষ্ঠান-ভূমি সৌরাষ্ট্র প্রদেশে গমন করিয়া তথায় আপনাদিগের বংশ বিস্তার পূর্ব্বক সুখসৌভাগ্যে আকবরের রাজত্ব সময় পর্য্যন্ত আপনাদের বল বীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বাপ্পার পাঁচ পুত্র মাড়োয়ারে গমন পূর্ব্বক তদ্বংশীয় প্রাচীন গোহিলদিগকে দূরীভূত করে। গোহিলেরা তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আরবদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইয়া যায়।

বাপ্পার বাল্য জীবনে যেরূপ অলৌকিক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, ইঁহার মৃত্যু সময়ের ঘটনা বিশেষ আরও চমৎকার জনক। বাপ্পা অধিক বয়সে স্বদেশ ও সন্তান সন্ততি পরিত্যাগ পূর্ব্বক খোরাসানের পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়া তত্রত্য অনেক জনপদ অধিকার করেন। তৎপ্রদেশে তিনি অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। একশত বৎসর বয়ঃক্রম সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেলবর প্রদেশের রাজারনিকট যে একখানি ' প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ ' নামক গ্রন্থ আছে, তাহাতে নিম্নমত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।—বাপ্পা তপস্বী হইয়া মেরুর পাদদেশে বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই তিনি জীবিতাবস্থায় ভূগর্ভে নিহিত হন *। তিনি ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাক, ইরাণ, তুরাণ ও কাস্করি স্থান প্রভৃতি বিবিধ জনপদ ক্রমান্বয়ে নিজ করতলস্থ করিয়া তত্রত্য রাজগণের কন্যাদিগকে বিবাহ করেন,তাহাতে তাঁহার একশত ত্রিশটী পুত্র হয়, তাহারা নোসেরিয়া পাঠান নামে পরিচিত। এই সকল পুত্র স্ব স্ব মাতৃনামে এক একটী জাতির সংস্থাপন করে। তাঁহার অষ্টনবতি সংখ্যক হিন্দু সন্তান ' অগ্নি উপাসী সূর্য্যবংশী ' বলিয়া বিখ্যাত। বাপ্পার প্রজা ও আত্মীয়গণ তাঁহার মৃত দেহ লইয়া ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করে, হিন্দুরা দাহন কবিতে এবং মুসলমানেরা ভূগর্ভে নিহিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। পরিশেষে শবাচ্ছাদনী বস্ত্র খুলিয়া দেখে যে, তন্মধ্যে শব নাই, কেবল কতকগুলি প্রস্ফুটিত মনোহর পদ্ম পুষ্প রহিয়াছে। পারশ্য রাজ নোসিবিয়ানের মৃত্যু সম্বন্ধেও এরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। †

ক্রমশঃ।—

* বাপ্পার মৃত্যু সম্বন্ধে পরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে।

† ভারতবর্ষে কতিপয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকের মৃত্যু সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ

(৪০৬ পৃষ্ঠার পর।)

পঞ্চম অধ্যায়

কোন নগর অবরুদ্ধ হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যদি অবরুদ্ধ সৈন্যগণ বাহির হইতে না পারে, অথবা বাহির হইয়াও বিপক্ষের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ না হয়, তবে তাহারা আর নগর রক্ষা করিতে পারে না। যে দেশের ইতিবৃত্তই পাঠ কর দেখিতে পাইবে, দীর্ঘদিনের অবরোধ কোনটিই নিস্ফল হয় নাই। অবরুদ্ধ গণ যদি প্রথমোদ্যমে কিছু করিতে না পারে তাহাদের সকল সাহস, সকল উৎসাহ হ্রাস হয়। ডামাস্কস্‌বাসীদিগেরও তাহাই হইল। ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানগণ অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত নগর অবরোধ করিয়া রহিল। নগরবাসীগণ আর বাহির হইয়া আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না, তাহারা বিপক্ষহস্তে দুর্গসমর্পণের প্রস্তাব করিতে লাগিল। টমাস্ তাহাদিগকে বার বার বলিতে লাগিলেন 'যে পর্য্যন্ত আমি সম্রাটের নিকট লিখিয়া দুর্গ রক্ষার্থ সাহায্য প্রাপ্ত না হই, সে পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা কর'। তাহারা ভয়ে এতই বিহ্বল হইয়াছিল যে, সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। তাহারা কিছু কালের জন্য যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়া লোক পাঠাইল; কিন্তু ভীম যোদ্ধা খালেদ সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অবরুদ্ধ গণের জীবন বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোন প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন না; তরবারির সাহায্যে নগর জয় করিয়া আপন আরব সৈন্য কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠনে তিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন।

এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় নগরবাসীগণ আবু ওবীদার সমীপে উপস্থিত হইল। তাহারা জানিত আবু ওবীদা সদয় ও নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহারা প্রথমতঃ আরবী ভাষাভিজ্ঞ একজন দূত তাঁহার নিকট পাঠাইল। তিনি আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন এই কথা অবগত হইয়া একদা রজনী যোগে প্রধান প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও নগর বাসী, একুনে একশত লোক জেবিয়া তোরণ পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আবু ওবীদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। তাহারা দেখিতে পাইল, যে সৈন্যগণ সম্রাটসিংহাসন পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিতেছিল। তাহাদের একজন অধিনায়ক সামান্য ভ্রমণকারীর ন্যায় কেশনির্ম্মিত বস্ত্র গৃহে অবস্থান করিতেছেন! তিনি তাহাদের প্রস্তাবে অনুগ্রহ ও দয়া প্রকাশ করিলেন। কারণ ধর্ম্মবিস্তার এবং কর গ্রহণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, অধিকার বিস্তার বা লুণ্ঠনের জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না। শীঘ্রই সন্ধি পত্র

লিখিত হইল। আবু ওবীদা সম্মত হইলেন, নগর তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইবা মাত্র যুদ্ধ বিরত হইবে। নগরবাসীগণ মধ্যে যাহারা আপন আপন সম্পত্তি যে পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, লইয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছুক, তাহারা অনায়াসে যাইতে পারিবে। কিন্তু যাহারা করদ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে তাহারা আপন আপন সম্পত্তি লইয়া থাকিতে পারিবে, তাহাদের ধর্ম্মোপাসনার জন্য সাতটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া যাইবে। আবু ওবীদা এই সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিলেন না, কারণ তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন না; কিন্তু দূতগণকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, মুসলমান গণ এই সন্ধিপত্র পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে।

নগর সমর্পণের সমস্ত আয়োজন এবং অবরুদ্ধ গণ কোনরূপ প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা না করে তজ্জন্য নগরবাসীগণ মধ্যে সম্ভ্রান্ত কএকজন, মুসলমানশিবিরে প্রতিভূ স্বরূপ রক্ষিত হইলে, আবু ওবীদার সৈন্যসমীপস্থ তোরণ উদ্ঘাটিত হইল, তিনি একশত সৈন্য সহ আপন অধিকার স্থাপনার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন।

জেবিয়া তোরণে যখন এইরূপ ঘটনার অভিনয় হইতেছিল, পূর্ব্ব তোরণে তখন এক বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা হইল। খালেদের ভ্রাতা আম্রু নগর প্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত এক বিষাক্ত সায়কে নিহত হওয়াতে খালেদ একান্ত ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন ক্রোধে অধীর ছিলেন, তখন জোসিয়াস নামক একজন বিধর্ম্মী আপনার এবং আপন স্বগণবান্ধবের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় অভয় প্রাপ্ত হইলে তোরণ মুসলমান হস্তে সম্প্রদানে অঙ্গীকার করিল। এই বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে একশত আরব সৈন্য দুর্গ প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দ্রুতপদে পূর্ব্ব তোরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া তোরণ ভগ্ন ও উদ্ঘাটন পূর্ব্বক আল্লাহো আকবর নাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

উদ্ঘাটিত তোরণপথে খালেদ তাঁহার সৈন্যগণ সহ অগ্নিময় স্রোতের ন্যায় নগরে প্রবেশ করিলেন। তূর্য্যধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব, ক্ষুরশব্দ সৈন্যের কোলাহলে গগণ বিদীর্ণ করিল। সহস্র সহস্র লোক সেই ভীষণ সৈন্যগণহস্তে নিহত হইতে লাগিল। শোণিতস্রোতে বর্ত্মসমূহ কর্দ্দমিত করিল। দয়া অনুগ্রহ প্রভৃতি শব্দ করুণস্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল; খালেদ কঠোরস্বরে বলিলেন, 'নাস্তিকের জন্য দয়া নাই' এইরূপ হত্যাকাণ্ড সাধন করিতে করিতে তিনি 'কুমারীমেরীর' উপাসনা মন্দির সমীপস্থ অঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, আবুওবীদা ও তাঁহার সঙ্গীয়গণ অসিকোষ বদ্ধ করিয়া নগরস্থ প্রধান প্রধান অধিবাসীগণ সহ গম্ভীর পবিত্রভাবে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ললনা এবং বালক বালিকাগণ, ও ধর্ম্মযাজক সমূহ আসিতেছে! দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন।

আবু ওবীদা দেখিলেন, আশ্চর্য্য ও ক্রোধচিহ্ন খালেদের মুখমণ্ডলে দেদীপ্যমান। তিনি মিষ্টবাক্যে তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি

বলিলেন 'ঈশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোনরূপ শোণিত-পাত ব্যতিরেকে শান্তভাবে এই নগর আমার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছেন। শোণিতপাতের আবশ্যক নাই, যুদ্ধে বিরত হউন।'

খালেদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'তাহা কখনই হইবে না। আমি তরবারির সাহায্যে জয় করিলাম আমার নিকট অনুগ্রহ নাই।'

আবুওবীদা বলিলেন, 'আমি নাগরিকগণকে স্বহস্ত লিখিত সন্ধি পত্র প্রদান করিয়াছি।,

খালেদ বলিলেন, 'আমাকে না বলিয়া এরূপ সন্ধি করার আপনার কি অধিকার ছিল? আমি কি প্রধান সেনাপতি নই? হাঁ ঈশ্বর আমাকে ঐ পদ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যেক নাগরিককে তরবারির আঘাতে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া তাহার পরিচয় দিব।'

আবুওবীদা দেখিলেন, সৈনিক বিভাগের নিয়মানুসারে তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যের ক্রটি করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি খালেদকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। বলিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ভালই ছিল। এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রধান সেনাপতি অনুমোদন করিবেন। তিনি খালেদের নিকট ইহাও প্রার্থনা করিলেন যে যখন সমস্ত উপস্থিত মুসলমানগণের সম্মতি লইয়া ঈশ্বর এবং মহম্মদের নামে সন্ধি করিয়াছেন তাহা পালিত হউক।

মুসলমান সৈনিকগণ মধ্যে অনেকে আবুওবীদার প্রস্তাব অনুমোদন করিল এবং খালেদকে সম্মত করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু সৈন্যগণ এই বিলম্ব দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিল এবং হত্যা ও লুণ্ঠনকার্য্য পুনরায় চলিতে লাগিল।

আবুওবীদা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন 'হা ঈশ্বর! আমার কথা গুলিন যেন কিছুই নয় এইরূপ বিবেচিত হইল; আমার সন্ধিপত্র পদমর্দ্দিত হইতে লাগিল।' অনন্তর তিনি আক্রমণকারী মুসলমান সৈন্যমধ্যে বেগে অশ্বচালনা করিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মহম্মদের দোহাই দিয়া বলিলেন, যে পর্য্যন্ত খালেদের সহিত তাঁহার তর্ক শেষ না হয়, সেপর্য্যন্ত যুদ্ধে বিরত থাক, মহম্মদের নামে কার্য্য সিদ্ধি হইল। সৈন্যগণ শোণিতপাতে বিরত রহিল, সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় অধীনস্থ কার্য্যকারকগণ সহ খৃষ্টীয়ানদিগের উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর খালেদ আপনার অদম্য বাসনার দমন করিয়া আবুওবীদার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন। এখনও অনেক নগরী অধিকার করিতে হইবে। প্রধান সেনাপতির কর্ত্তব্য যে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণের কৃত কার্য্য মান্য করেন তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত না হইলেও অন্যথা না করেন; নচেৎ মুসলমানের কথায় অতঃপর আর কেহ বিশ্বাস করিবে না; অন্যান্য নগরী ডামাস্কাসের অবস্থা দেখিয়া সতর্ক হইবে এবং অনুকূল নিয়মে সন্ধি না করিয়া শেষ সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে, আর

দয়া দান করা হইবে একথায় কেহ নির্ভর করিবে না। এইরূপ নানা বাক্যে খালেদের আয়সাধিক কঠিন হৃদয় হইতে আবুওবীদা সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি লইলেন, কিন্তু স্থির হইল যে সকল বিষয় খলিফার নিকট লিখিত হইবে। প্রত্যেক নিয়ম পাঠ করিবার সময় তিনি বৈরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি অনায়াসে টমাস এবং হার্ব্বিস নামক সেনাপতিদ্বয়কে হত্যা করিতেন, কিন্তু আবুওবীদা বলিলেন সন্ধিপত্রে তাঁহাদের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করা না হয়।

অনন্তর ঘোষণা করা হইল যে অধিবাসীগণ মধ্যে যাহারা খলিফার করদ হইবে তাহারা আপন ধর্ম্মানুসরণ করিতে এবং অবশিষ্ট লোক নগর হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। অধিকাংশ লোক থাকাই স্থির করিল, কিন্তু কেহ কেহ তাহাদের সেনাপতি টমাসের সহিত আণ্টিয়ক্ নগরীতে যাওয়া মনস্থ করিল। টমাস প্রার্থনা করিলেন যে মুসলমান অধিকার দিয়া গমনে তাঁহার কোন অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে একখানি পত্র দেওয়া হয়। অনেক চেষ্টার পর খালেদ তিন দিন সময় দিয়া বলিলেন যদি তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ খাদ্য ব্যতীত আর কিছু সঙ্গে না লন তবে, ঐ সময় মধ্যে তাঁহারা অনায়াসে যাইতে পারিবেন।

আবুওবীদা আপত্তি করিয়া বলিলেন, তাঁহারা সঙ্গে আপন সম্পত্তি ও অন্যান্য বস্তু লইয়া যাইতে পারিবেন এরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। খালেদ বলিলেন 'তবে তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র যাইতে হইবে।' পুনরায় আবুওবীদা আপত্তি করাতে খালেদ বলিলেন দস্যু এবং বন্যজন্তুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে যে অস্ত্রের আবশ্যক তদ্ভিন্ন অন্য অস্ত্র সঙ্গে লইতে পরিবেন না; যাহার বল্লম আছে সে তরবারি, যাহার ধনু আছে সে বল্লম, লইতে পারিবে না।

টমাস এবং হার্ব্বিস্ এই নির্ব্বাসিতগণের নেতা। তাঁহারা নগর হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূরে বস্ত্রগৃহ স্থাপন করিলেন। অনুচরগণ ও অন্যান্য লোক সেখানে আপনার যাহা কিছু মূল্যবান অথচ সহজে বহন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্যান্য বস্তুর মধ্যে সম্রাট হিরাক্লিয়সের একটি বস্ত্র-ভাণ্ডার ছিল; তাহাতে তিনশত ভার রেশমী স্বর্ণ-কারুকার্য্য খচিত পরিচ্ছদ ছিল।

সমস্তে একত্র হইলে দুঃখার্ত্তগণ যাত্রা করিল। যাঁহারা অভিমান, স্বদেশানুরাগ, বা ধর্ম্মের জন্য দারিদ্র ও নির্ব্বাসন ক্লেশ স্বীকার করিলেন তাঁহারাই নগরীর সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত লোক ছিলেন।—যাঁহারা বিলাসের সুকোমল অঙ্কে এতকাল প্রতিপালিত হইতেছিলেন তাঁহাদের এই শোচনীয় অবস্থা! ইহাঁদিগের মধ্যে সম্রাটতনয়া টমাসের সহধর্ম্মিণী আপন পরিচারিকাগণ সহ গমন করিতেছিলেন। আবালবৃদ্ধ বনিতা,ধনী নির্দ্ধন সকলে এইরূপে মরুভূমি ও পার্ব্বত্য পথে গমন করিতে লাগিল; পথে অসভ্যদস্যুর অভাব ছিল না। কি দুঃখের দৃশ্য! মধ্যে মধ্যে তাহারা আপন আপন সুরম্য প্রাসাদরাজী, ফলপুষ্প শো-

ভিত উদ্যান নিচয়; কলনাদিনী কার্পার নদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখে অশ্রুবর্ষণ এবং বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল।

এইরূপে ডামাস্কসের অবরোধ শেষ হইল। অবরোদ্ধাগণের ধৈর্য্য, কৌশল, বল বিক্রম, অবরুদ্ধগণের সহিষ্ণুতা সাহস ও সংগ্রাম কৌশল প্রভৃতি দৃষ্টে শ্রীরামের লঙ্কাবরোধ অথবা গ্রীকগণের ট্রয় নগরীর অবরোধের কথা স্মরণ হয়। এই আক্রমণে যদিও চৌদ্দমাস মাত্র সময় লাগিয়াছিল, উল্লিখিত দীর্ঘকাল স্থায়ী অবরোধ দ্বয়ের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই অবরোধ মুসলমানদিগের ইতিহাসে একটি অমূল্য রত্ন। ইহার ফল অতি মহৎ এবং মুসলমানগণের পক্ষে যার পর নাই উপকার জনক ছিল।

কথিত আছে দিরার যখন দেখিলেন নগর হইতে নির্ব্বাসিতগণ ধন পরিপূর্ণ হইয়া নিরাপদে চলিয়া যাইতেছে, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া দন্তে আপন অধর পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সমগ্র সম্পত্তি কষ্টে মুসলমানেরা লাভ করিয়াছিল; বিধর্ম্মীগণ তাহা ভোগ করিবে এটি তিনি সহ্য করিতে ক্লেশ বোধ করিলেন। তাঁহার তরবারি নাস্তিকগণের শোণিত পান করিতে পারিল না, তাহারা অক্ষত শরীরে যাইতে লাগিল এই দিরারের প্রধান আক্ষেপের কারণ, খালেদও ক্রুদ্ধ হইতেন কিন্তু তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যেরূপে হউক ঐ সমস্ত দ্রব্য হস্তগত করিবেন। সুতরাং তিনি সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে এবং অশ্বসকলের শ্রান্তি দূর করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, নির্ব্বাসিত গণের অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অনুগ্রহের তিনদিন অতীত হইলে তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক সমস্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

নাগরিকগণের জন্য কি পরিমাণ শস্যের প্রয়োজন তদ্বিষয়ে তর্কবিতর্ক উত্থাপন করাতে আবু ওবীদা তাঁহার একদিন নষ্ট করিলেন। তখন অনুসরণবৃথা বিবেচনা করিয়া খালেদ তাহা পরিত্যাগ করিবেন এমন সময় একজন পথ প্রদর্শক উপস্থিত হইয়া বলিল সে সমস্তপথ জ্ঞাত আছে, অতি সহজ পথে অল্পসময়ে বিপক্ষগণের সমীপস্থ করিতে পারিবে। এই পথপ্রদর্শকের বিবরণ অবশ্য জ্ঞাতব্য।

উল্লিখিত হইয়াছে যে, দিরার দুই সহস্র সৈন্য লইয়া নগরীর চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিয়োজিত ছিলেন। একদা রজনীতে তিনি ঐরূপ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন কৈসান তোরণপথে একজন অশ্বারোহী চুপে চুপে বাহির হইতেছে। অন্ধকারে লুকায়িত হইয়া অশ্বারোহী সমীপস্থ হয় কি না দেখিতে লাগিলেন। যখন সে নিকটস্থ হইল তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্দী করিলেন। এই ব্যক্তির পরিচ্ছদ অতি মূল্যবান ছিল, বয়স অধিক নহে; ইহার জন্মস্থান সীরিয়া, দেখিয়া তাহাকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বিবেচনা হইল। এই ব্যক্তি বন্দী হইবা মাত্র আর এক জন অশ্বারোহী সেই পথে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে জোনাস বলিয়া বন্দীকে ডাকিতে লাগিল। মুসলমানগণ

জোনাসকে বলিল তাহাকে আসিতে বল। সে গ্রীক ভাষায় কি বলিল। বলিবামাত্র নবাগত অশ্বারোহী নগরাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল। আরবীয়গণ গ্রীকভাষা জানিত না। ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক করিল দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল। জোনাসকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিত, কিন্তু দ্বিতীয় বিবেচনার পর তাহাকে খালেদের নিকট লইয়া গেল।

জোনাস বলিল সে ডামাস্কস্‌বাসী এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইউডোসিয়া নাম্নী একটি রূপবতী ললনার সহিত তাহার বিবাহের কথা বার্ত্তা হয়। কিন্তু ঐ বালিকার পিতা মাতা বিবাহে অসম্মত হওয়াতে, এবং নানা রূপ ছলচাতুর্য্য অবলম্বন করাতে তাহারা পরামর্শ করিয়াছিল যে, গোপনে ডামাস্কস্‌ হইতে পলায়ন করিবে। ইউডোসিয়া পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছিল এবং তাহার দুইটি ভৃত্য সঙ্গে ছিল। প্রহরীগণকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া জোনাস্‌ বাহির হইয়াছিল; ইউডোসিয়া ও তাহার অনুচরদ্বয় পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। বালিকা যখন তাহাকে আহ্বান করে, তখন গ্রীক ভাষায় এই প্রত্যুত্তর দিয়াছিল যে ‘ পক্ষী ধৃত হইয়াছে।’ এই কথা শুনিয়া সে সতর্ক ও নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল।

প্রণয়ের কুসুমকোমল আলাপে আর্দ্র হয়, খালেদের এরূপ হৃদয় ছিল না। তিনি বলিলেন ‘ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর। নগরী যখন আমাদের হস্তগত হইবে তোমার প্রণয়িনী তোমাকে প্রদান করিব। যদি অস্বীকার কর, তোমার মস্তক গ্রহণ করিব।’

যুবক ইতস্ততঃ ও করিল না। তৎক্ষণাৎ খালেদের নিকট মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণপণে ডামাস্কস্‌ অধিকারার্থ মুসলমান পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কারণ সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল যে ডামাস্কসের পতন ব্যতীত তাহার আশা আর সফল হইবে না।

যখন ডামাস্কস্‌ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল, জোনাস্‌ নগরীতে প্রবেশ করিয়া ইউডোসিয়ার প্রণয়ের আরও এক পরিচয় প্রাপ্ত হইল। ইউডোসিয়া বিবেচনা করিয়াছিল জোনাস্‌ শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছে। সুতরাং সে এক ধর্ম্মাশ্রমে গমন পূর্ব্বক চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। আস্ফালিত হৃদয়াবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ পূর্ব্বক সে আশ্রমের নিকটস্থ হইল। কিন্তু যখন ইউডোসিয়া জানিতে পারিল যে জোনাস্‌ বিপক্ষাশ্রিত ও বিধর্ম্মী হইয়াছে তখন সেই তেজস্বিনী ললনা ক্রোধে এবং ঘৃণায় অধীরা হইয়া আশ্রম কুটীরে প্রতিগমন করিল এবং বলিয়া দিল আর কখনও তাহার মুখাবলোকন করিবে না। যে সমস্ত সম্ভ্রান্তাকুলকামিনী টমাস্‌ ও হার্ব্বিসের সঙ্গে গমন করেন সে তাহার মধ্যে একজন ছিল। তাহার প্রণয়প্রার্থী তাহার বিরহে উন্মত্ত হইয়া খালেদকে তাহার অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি বলিলেন, আবুওবিদার সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে তাহারা সকলেই নিরাপদে প্রস্থান করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এখন ইউডোসিয়ার গতিরোধের উপায় নাই।

জোনাস যখন দেখিল খালেদ নির্ব্বা-

সিতগণের অনুসরণ করা মনস্থ করিয়াছেন, কিন্তু সময় চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া হতোৎসাহ হইতেছেন, তখন সে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া এরূপ একটী সহজ পথে তাঁহাকে সসৈন্য লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইল যে অতি অল্পসময়ে বিপক্ষগণকে দেখিতে পান, তাহার প্রস্তাব গৃহীত হইল। নির্ব্বাসিত গণের প্রস্থানের চারিদিন পরে খালেদ চারিসহস্র মনোনীত অশ্বারোহী সহ অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণ জোনাসের উপদেশে আরবীয় খৃষ্টিয়ানগণের পরিচ্ছদ ধারণ করিল। কিছুকাল অশ্ব উষ্ট্র মনুষ্যের পদচিহ্ন, গমন সুগম করণার্থ নিক্ষিপ্ত বস্ত্র সমূহ দৃষ্টে তাহারা অনুসরণ করিল। পরিশেষে লিবেন পর্ব্বত পার্শ্বে সে সমস্ত চিহ্ন বিলোপ দেখিয়া মুসলমানগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জোনাস বলিলেন 'সাহস অবলম্বন কর। তাহারা এক্ষণে পর্ব্বতে রুদ্ধ-পথ হইবে, আর তাহাদের রক্ষা নাই।'

তাহারা এই দুর্গম পথে গমন করিতে লাগিল। উপাসনার নির্দ্ধারিত সময় ব্যতীত আর থামিত না। তাহারা এক্ষণে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে বাধ্য হইল। শীতকালে স্রোতে প্রস্তর-বর্ত্ম নিতান্ত বন্ধুর করিয়াছিল, গমন বড় সহজ রহিল না। অশ্বের পদস্পর্শে প্রস্তরে অগ্নি উঠিতে লাগিল। অনেক অশ্ব পদভগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। আরোহীগণ অবরোহণ পূর্ব্বক অশ্ব সকল হটাইয়া লইয়া চলিল। তাহাদের বস্ত্র ছিন্নভিন্ন, পাদুকা খণ্ডখণ্ড হইয়া গেল। সৈন্যগণ আক্ষেপ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা কখনও গমনে আর এত কষ্ট পায় নাই। তাহারা বিশ্রাম করিতে এবং অশ্ব সকলের শ্রান্তি দূর পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষম করিতে বারবার বলিতে লাগিল। যে খালেদের নাস্তিকের প্রতি বিদ্বেষ প্রণয়ীর প্রণয়ানল অপেক্ষা অল্প উত্তেজিত হইয়াছিল না, তিনিও অবসাদ বোধ করিলেন, এবং জোনাস সকল কষ্টের মূল বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

জোনাস্ তখনও উৎসাহিত করিতে লাগিল। সে নূতন পদচিহ্ন সকল দেখাইয়া বলিল বিপক্ষগণ অল্প সময় পূর্ব্বে ঐ পথে গিয়াছে। কএক ঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনরায় অনুসরণ আরম্ভ হইল। তাহারা জাবালা ও লেওডিসিয়ার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। নগরে প্রবেশ করিলে তাহাদের ছদ্মবেশ লুক্কায়িত থাকিবেনা এই ভয়ে প্রবেশ করিল না। একজন গ্রাম্য কৃষাণের মুখে তাহারা শুনিতে পাইল যে নির্ব্বাসিত জনগণ আণ্টিয়কে প্রবেশ করিলে নগরবাসীগণ ভীত হইবে ভয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়স তাহাদিগকে সমুদ্রতীর দিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। এইরূপ সংবাদ কতদূর বিরক্তি-জনক তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে এক্ষণে অনেক সুবিধা হইল। খালেদ আরও একটি ভয়ানক সংবাদ শ্রুত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইবার জন্য পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছে; মাত্র একটি পর্ব্বতে সেই সৈন্য হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছে।

তিনি এই ভয় করিতে লাগিলেন যে, তাহারা তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতিরোধ জন্মাইতে, অথবা তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে ডামাস্কস নগরীতে প্রবেশ করিতে পারে। এক অশুভ স্বপ্নে আরও ব্যস্তহইলেন; কিন্তু আবদুল রহমান ঐ স্বপ্ন অনুকূলে ব্যাখ্যা করাতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সেই দিন রাত্রিতে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইল। আকাশ হইতে ভীমবেগে বারিবর্ষণ হওয়াতে মনুষ্য অশ্বাদি সমস্ত পথশ্রমে এবং বৃষ্টিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি অগ্রসর হইল। পলায়িত ব্যক্তিগণ অধিক দূরে থাকার সম্ভাবনা ছিল না; শত্রুগণ নিকটস্থ। সুতরাং তাহারা শিকার করস্থ করিয়া যত শীঘ্র পলায়ন করিতে পারে তাহাতেই মঙ্গল। রজনী প্রভাত হইল ঝটিকার অবসান হওয়াতে সূর্য্য পরিষ্কার আকাশে উদয় হইল। তাহারা বন্ধুর দুর্গম গিরিবর্ত্মে গমন করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে এমন সময়ে পুরোগ সৈন্য সমূহ উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। সৈন্যগণ অতি অল্প সময় মধ্যে কর্দ্দম প্রস্তরাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্যামল শস্য এবং নানাবর্ণ পুষ্প শোভিত তটিনীবিধৌত উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

সেই নদীতীরে পলায়িতগণ বিশ্রাম করিতেছিল, কেহ আহার করিতেছিল, কেহ নিদ্রিত ছিল। গত রজনীতে বৃষ্টিসিক্ত পরিচ্ছদনিচয় শুষ্ক করণার্থ রৌদ্রে বিস্তার করা হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ক্ষেত্র সুশোভিত দেখা যাইতেছিল। সৈন্যগণ পথশ্রমের অবসানে, খালেদ তাঁহার ঈপ্সিত বস্তুনিচয় দৃষ্টে এবং শান্তিবিহীন প্রণয়ী প্রণয়িণীর দর্শন লালসায় উল্লাসিত।

খালেদ বিপক্ষগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক আপন সৈন্যগণকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। এক দলের সেনাপত্যে আবদুল রহমান, দ্বিতীয়ের রফীইবিনওমারা তৃতীয়ের দিরার এবং চতুর্থের অধ্যক্ষ স্বয়ং রহিলেন। তিনি আদেশ করিলেন যে ক্রমে একএক দল করিয়া উপস্থিত হইতে হইবে, যেন বিপক্ষগণ সৈন্যবল নির্ণয় করিতে নাপারে; আর বিজয় সাধনের পূর্ব্বে যেন কেহই লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত না হয়।

অনন্তর উপাসনা সমাপন পূর্ব্বক ঈশ্বর এবং মহম্মদের নামে আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। খৃষ্টিয়ানগণ পর্ব্বত হইতে একদল সৈন্য আগ্নেয় গিরিনিঃসৃত স্রোতের ন্যায় বেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইতে দেখিয়া শান্তি নিদ্রা হইতে জাগরূক হইল। প্রথমতঃ গ্রীক সজ্জা দৃষ্টে প্রতারিত হইলেও শীঘ্র সে ভ্রম দূর হইল। তাহাদিগের সংখ্যা সামান্য দেখিল সুতরাং ভীত হইল না। টমাস্ পাঁচসহস্র সৈন্য প্রস্তুত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তাহাদের সঙ্গে যে সামান্য অস্ত্র শস্ত্রছিল, তদ্ভিন্ন আর অধিক পাইবার সুযোগ ছিল না। ক্রমে এক, আর এক দল সৈন্য পর্ব্বত হইতে বাহির হওয়াতে ভীষণ যুদ্ধ হইল। টমাস এবং খালেদ হাতে হাতে যুদ্ধ করিলেন; খৃষ্টিয়ান সেনাপতি ভূশায়ী হইলেন। আবদুলরহমান সেনাপতির মস্তক চ্ছেদন করিয়া খৃষ্টিয়ানগণের যে 'ক্রস্' চিহ্নযুক্ত পতাকা ডামাস্কসে ছিন্নভিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন,

তাহাতে বিদ্ধ ও উত্তোলন করিয়া খৃষ্টিয়ান গণকে দেখাইলেন। বলিলেন তোমাদের সেনাপতির পরিণাম দেখ।

রফী ইবিন ওমীরা ললনাগণকে বন্দী করিতে আপন দলবল সহ মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও আত্মরক্ষায় প্রাণপণ করিতে লাগিল, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে দূরে রাখিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অতুলনা ললনা মণিমুক্তা হীরকাদিখচিত পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া তাঁহার অনুপময় সৌন্দর্য্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। ইনিই সম্রাটের তনয়া, মৃত টমাসের পত্নী। রফী তাঁহাকে বন্দী করিতে প্রয়াস পাইলে তিনি একখণ্ড প্রস্তর উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার অশ্বের মস্তকে অতিবেগে নিক্ষেপ করাতে রফীর অশ্ব পতিত ও মৃত হইল। আরবীয় তাঁহাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তিনি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। সুতরাং তিনি ঐ ললনাকে বন্দী করিয়া কএকজন বিশ্বাসী অনুচরের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই হত্যাকাণ্ড ও গোলযোগের সময় জোনাস্ তাঁহার আপন প্রণয়িনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে সে তাহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল, এক্ষণে সে বিশ্বাসঘাতক এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল দেখিয়া তাহার নাম মাত্র শ্রবণেও কম্পিত হইতে লাগিল। সে কত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কতমতে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। সে বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল যে কনষ্টাণ্টিনোপলে পঁহুছিয়া কোন আশ্রমে তাহার চিরজীবন কুমারী অবস্থায় অতিবাহন করিবে। প্রার্থনা বিফল দেখিয়া জোনাস্ তাহাকে আক্রমণ করিল এবং অনেক চেষ্টায় বন্দী করিল। ললনা আর প্রতিরোধ জন্মাইল না। বন্দী থাকিয়াও কোনরূপ উৎকণ্ঠা দেখাইল না, স্থির ভাবে ঘাসের উপর বসিয়া রহিল। প্রণয়ী তাহার প্রণয়িনী সদয় হইয়াছে বিবেচনায় উল্লাসিত হইল। কিন্তু সুযোগ অনুসন্ধান পূর্ব্বক একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া আপন বক্ষস্থলে প্রবিষ্ট করিল এবং তৎক্ষণাৎ মৃতা ও জোনাসের পদতলে পতিতা হইল।

যখন এই শোচনীয় দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল, সাধারণ যুদ্ধ বা হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। খালেদ হার্ব্বিসের অনুসন্ধানে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন। কিন্তু ঐ সেনাপতি সেই উচ্ছৃঙ্খল যুদ্ধের সময় চুপে চুপে পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহার মস্তকে এমনই সজোরে আঘাত করিলেন যে শিরস্ত্রাণ না থাকিলে মস্তক দ্বিখণ্ড হইত। হার্ব্বিসের তরবারি তাহার হস্ত হইতে পতিত হইল। তিনি তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই খালেদের অনুচরগণ তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। হতভাগা খ্রীষ্টিয়ানগণের উদ্যমশেষ হইল। একজন ব্যতীত অন্য সকলেই হত বা বন্দী হইল। ঐ ব্যক্তি এই শোচনীয় সংবাদ প্রদান করিতে কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রেরিত হইয়া সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিল।

জোনাস্ আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সঙ্গীয় মুসলমানগণ

তাহার নূতন গৃহীত ধর্ম্মের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল, 'অদৃষ্টের পুস্তকে একথা লিখিত ছিল যে, তুমি ঐ ললনাকে কখনও পাইবে না। শান্ত হও, অবশ্যই ঈশ্বরের ভাণ্ডারে তোমার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক সুখ রহিয়াছে।' ফলতঃ তাহাই হইল। রফী ইবিন্ ওমীরা তাহার আর্ত্তস্বরে আর্দ্র হইয়া সুন্দরীর শিরোভূষণ-স্বরূপা বন্দী সম্রাটতনয়াকে জোনাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। খালেদ তাহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন সম্রাট অর্থ দ্বারা তাঁহার কারামোচন না করিলে সম্রাটতনয়া জোনাসেরই রহিবে।

এক্ষণে আর বিলম্ব করার সময় নয়। এই দুঃসাহসিক অনুসরণে তাহারা শত্রুরাজ্যের ১৫০ মাইল অতিক্রম করিয়াছে, পলায়ন সময়ে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করার বিচিত্র ছিল না। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিতে অশ্বতর সকল পূর্ণ করিয়া এবং বন্দীগণকে সঙ্গে লইয়া মুসলমানগণ দ্রুতগতিতে ডামাস্কসাভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে তাহারা একদিন ধূলিরাশি উড্ডীন দেখিয়া ভীত এবং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কিন্তু পরিশেষে প্রকাশ পাইল যে তাহারা শত্রুবেশে আগমন করে নাই; সম্রাট আপন কন্যা পুনরুদ্ধার প্রার্থনায় দূত প্রেরণ করিয়াছেন। এক জন বৃদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষ সম্রাটতনয়ার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার সঙ্গীয় বহুসংখ্যক অনুচর শান্তভাবে রহিল। তেজস্বী মুসলমান সেনানায়ক অর্থ না লইয়া তাহার কারামোচন করিলেন। এবং বলিলেন 'এই ললনাকে লইয়া যাও। কিন্তু তোমার প্রভুকে বলিও আমার ইচ্ছা যে ইহার পরিবর্ত্তে তাহাকেই গ্রহণ করি। তাঁহা হইতে সমস্ত স্থান অধিকার না করা পর্য্যন্ত আমার এই যুদ্ধের শেষ হইবে না।'

জোনাসের এই ক্ষতিপূরণ জন্য তাহাকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হইল; উদ্দেশ্য এই যে ঐ অর্থ দ্বারা বন্দীগণ মধ্য হইতে একটি ভার্য্যা ক্রয় করিয়া লইবে। কিন্তু সে আর পার্থিব প্রণয়পিপাসু রহিল না। প্রকৃত গোঁড়া মুসলমানের ন্যায় পরকালে কজ্জলনয়না অপ্সরা লাভ কামনা করিতে লাগিল। তদবধি সে এই নূতন ধর্ম্মে এবং নূতন সঙ্গীয়গণসহবাসে এত প্রীত ও অনুরক্ত হইল যে, পিতৃপৈতামহিক ধর্ম্মের, বা বাল্যসহচরগণের প্রতি কখনই তাহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। সে দীর্ঘকাল অতি বিশ্বাসীর ন্যায় মুসলমানদিগের কার্য্য করিয়া পরিশেষে যার্ম্মুকের প্রসিদ্ধ সম্মুখযুদ্ধে হত, সুতরাং মহম্মদের অঙ্গীকৃত স্বর্গের দ্বার তাহার নিকট উন্মুক্ত হয়।

খৃষ্টিয়ান ইতিবৃত্তলেখকগণ জোনাসের মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লিখিত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুসলমান পুরাবিদ্ আল্ওয়েকৃজী নামক বগ্দাদের সুপ্রসিদ্ধ কাজী আরও কিছু সংযোগ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, রফীইবিন্ ওমীরা জোনাসকে তাহার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখিয়াছেন। জোনাস বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া স্বর্ণপাদুকাসহ এক পুষ্পশোভিত নিকুঞ্জবনে ভ্রমণ করিতেছিল। সেই জাগ্রতস্বপ্নাবস্থায় জোনাস রফীকে বলিল ঈশ্বর তাহার কৃত-

কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্প্রতি কজ্জলনয়না স্বর্গীয়া অপ্সরা প্রদান করিয়াছেন; তাহাদের প্রত্যেকেই এত সুন্দরী যে, চন্দ্র সূর্য্য তাহাদের সৌন্দর্য্যপ্রভার নিকট হতশ্রী ও মলিন দেখায়। রফী এই বিবরণ খালেদকে বলিলেন; খালেদ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন, এবং বলিলেন 'যে ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মের জন্য বীরবৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারে, সেই প্রকৃত সুখী, জোনাস্ তাহারই একজন'।

খালেদ নির্ব্বিঘ্নে আপন দলবল সহ ডামাস্কসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তন্নগরস্থ আপন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক উল্লাসে গৃহীত হইলেন। তাঁহার জন্য সকলে ভীত হইয়াছিল।

খালেদ এক্ষণে লুণ্ঠন দ্রব্যসমূহ বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈনিক ও সৈন্যগণকে চারিভাগ বিতরণ করিয়া পঞ্চম ভাগ সাধারণ ধনাগারে খলিফার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি একসুদীর্ঘ পত্রে ডামাস্কস্ অবরোধ ও অধিকার বিবরণ, আবুওবীদার সহিত নাগরিক গণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে বিবাদ, এবং পরিশেষে নির্ব্বাসিতগণকে অনুসরণ পূর্ব্বক সর্ব্বস্বপুনরুদ্ধার করা প্রভৃতি সবিস্তার লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস রহিল যে খলিফা এবং অন্যান্য প্রকৃত মুসলমানগণ আবুওবীদার শান্ত প্রকৃতি রাজনীতি অপেক্ষা তাঁহার তরবারিনীতিই প্রকৃষ্ট বলিয়া অনুমোদন করিবেন।

নিয়তির গতি অপরিবর্ত্তনীয়। মুসলমানদিগের এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ বিবরণ খলিফা জ্ঞাত হইতে পারিলেন না! যে দিন ডামাস্কস্ হস্তগত হয়, খলিফা আবুবেকার সেই দিনই মদীনায় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন!

আরবীয় ঐতিহাসিকগণ তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ লিখিয়াছেন। আবুলফেজা বলেন একজন ইহুদি অন্নের সহিত বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু খলিফার কন্যা আয়েষা বলেন, একদিন অত্যন্ত অধিক শীত ছিল, সেই দিন স্নান করাতে তাঁহার জর হয়; ঐ জরই মৃত্যুর কারণ। এই বিবরণ অধিক সম্ভবপর বোধ হয়। আসন্ন সময়ে তিনি আদেশ করিলেন যে তাহার বন্ধু ওমার তাঁহার অভাবে খলিফা হইবেন। (ক্রমশঃ)

সমালোচন।

'শাক্যসিংহ। শ্রীতারকেশ্বর চৌধুরী প্রণীত মূল্য আট আনা।'—বঙ্গভাষা নাটকে নভেলে উপপ্লুত হইয়াছে। এ সময়ে দুএকখানি ঐতিহাসিক, অথবা ধর্ম্মবিষয়ক, অথবা নীতিবিষয়ক পুস্তক দেখিলে আমাদের হৃদয়ে প্রীতি ও আশার সঞ্চার হয়। শাক্যসিংহ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে ঐ রূপ প্রীতি ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কতক দূর পড়িয়াই দেখিলাম যে ইহা একখানি ছদ্মবেশী নভেল বা ঐতি-

হাসিক উপন্যাস। শাক্যসিংহের জীবনের কয়েকটি ঘটনা, লেখক Max Muller's chips from a German workshop হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন। বোধহয়, দু একটী ঘটনা ললিত বিস্তার হইতেও সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই সামান্য ভিত্তির উপর লেখক স্বকীয় কল্পনা-বলে এক প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য উত্তোলন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হর্ম্ম্যটি তাঁহার কুরুচির পরিচায়ক। বুদ্ধের ধর্ম্ম, বুদ্ধের নীতি, বুদ্ধের জিতেন্দ্রিয়তা ভারতবর্ষের বড় গৌরবের, বড় আদরের বস্তু। শুদ্ধ ভারতবর্ষে কেন, সমস্ত Indo-European জাতি বুদ্ধের এই সমস্ত কীর্ত্তিকলাপ লইয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। যদি বুদ্ধের জীবনীর কোন অংশ অন্যের সম্মুখে বিন্যস্ত হইবার যোগ্য হয়, তবে তাহা তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার। দান, তীর্থদর্শন, যাগ, যজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতিতে মুক্তি হইবে না। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্ প্রভৃতি অধ্যয়নে মুক্তি হইবে না। যদি মুক্তি চাও তবে ইন্দ্রিয় সংযম কর। সংসারের মায়া মোহ বর্জ্জন কর। ন্যায় পথে চল। সকল প্রাণীতে প্রীতি কর। দ্বেষ হিংসা বর্জ্জন কর। বুদ্ধের এই সমস্ত উপদেশ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর অংশ। কিন্তু কি কি কথায় শাক্যসিংহ-লেখক তাঁহার পুস্তক পরিপুরিত করিয়াছেন? শাক্যসিংহের বাড়ীর উদ্যানে চিরবসন্ত বিরাজ করিত। সুতরাং সেখানে 'ইন্দ্রিয় ব্যাকুল, বুদ্ধি বিপথগামী, ও অঙ্গ অবশ হইয়া উঠিত। একে দুর্ব্বার মদনানল জ্বালা, তাহার উপরে কোকিল ঝঙ্কার' ইত্যাদি। শাক্যসিংহ জন্মিলে পর, রাজবাড়ীতে কি কি রকম আমোদ প্রমোদ হইয়াছিল, বারবনিতারা কেমন করিয়া তথায় নাচিয়াছিল, তাহার বর্ণনায় পাঁচপাতা গেল। শাক্যসিংহের মাতার মৃত্যু হইল। শাক্যসিংহের পিতা তখন কয়বার হা প্রেয়সী যো প্রেয়সী, কোথায় প্রেয়সী বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পাঁচ পাতা গেল। শাক্যসিংহ বনে গেলেন। তখন তাঁহার প্রিয়পত্নী গোপা কয়বার হা প্রাণনাথ, যো প্রাণনাথ বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পাঁচপাতা গেল। শাক্যসিংহ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী নিজ পরিচারিকাগণের সহিত কিরূপ রসাভাষ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় আরও পাঁচপাতা গেল। এইরূপে আট আনার পুস্তক খানি ছাই মাটীতে পূরিয়া গেল। বুদ্ধের ধর্ম্ম কি ছিল, শাক্যসিংহ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, শাক্যসিংহের উপদেশই বা কিরূপ ছিল তাহা আর বলা হইল না। জলৌকা শরীরের দূষিত রক্তটী চুষিয়া খাইয়া নিজ উদর পরিপূর্ণ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। অথবা ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নির্ব্বোধ। কি মিথ্যা কতকগুলা ঢেঁকির কচ্‌কচি করে। বুদ্ধের ধর্ম্ম লইয়া আমার কি হইবে? বাঙ্গালি বুদ্ধিমান্, রসগ্রাহী, রসিক-চুড়ামণি। কেমন শাক্যসিংহের জীবন চরিতটি দুই চারিটি রসের কথায় সারিয়া দিয়াছে। মোক্ষমূলরের পিতামহও এরূপ করিতে পারিতেন না। ফলতঃ আমরা শাক্যসিংহ প-

ড়িয়া আপনাপনি বলিয়া ফেলিয়াছিলাম।—

'অস্থানে পততা মতীব মহতা মেতাদৃশীঃ স্যাৎ গতিঃ'

অস্থানে পড়িলে মহৎবস্তুকেও এই দশা প্রাপ্ত হইতে হয়।

কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের (শাক্যসিংহ-লেখক) সঙ্গে আমাদের বিবাদ ফুরায় নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার কয়েক স্থল আমরা বুঝিতে পারি নাই। চৌধুরী মহাশয়কে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতে হইবে।

১নং

Max Muller বলেন

"Buddha was born at Kapailvastu, the capital of a kingdom of the same name situated at the *foot* of the mountains of Nepal, north of the present Oude."

চৌধুরী মহাশয় তর্জ্জমা করিলেন

'পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান অযোধ্যার উত্তরভাগে নেপালপর্ব্বতের শিখরদেশে কপিলবস্তু নামে একটী রাজ্য ছিল।'

'Foot' মানে যে শিখরদেশ, ইহা চৌধুরী মহাশয় কোন্ অভিধান হইতে শিখিয়াছেন?

২ নং

Max Muller বলেন

"HiouenThsang saw the same monument at the edge of a large forest, on his road to Kusinagara, a city now in ruins, and situated about fifty miles E. S. E. from Gorakpore."

চৌধুরী মহাশয় তর্জ্জমা করিয়াছেন

'বর্ত্তমান গোরকপুরের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব ঘোর অরণ্যাবৃত হায়নোৎসাঙ্গে সে কীর্ত্তিস্তম্ভ এখনও দেদীপ্যমান আছে। তাহার শিল্প কারুকার্য্য অতি মনোহর...। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে সে নগর এক্ষণে একরূপ লয় প্রাপ্ত হইয়াছে'।

চৌধুরী মহাশয় যে কল্পনার তরঙ্গ লীলা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দোষ দিই না। কিন্তু হায়নোৎসাঙ্গ (Hiouen-Thsang) যে একটী স্থানের নাম ইহা তাঁহাকে কে শিখাইল? আমরা জানিতাম যে, হায়নোৎসাঙ্গ (Hiouen Thsang) একজন বিখ্যাত চীন দেশীয় পর্য্যটক। আর Max Muller ও বলিয়াছেন Hiouen Thsang saw.

৩নং

Max Muller বলেন

"At that moment we may truly say that the fate of millions of millions of human beings trembled in the balance" P. 215 chips Vol I.

চৌধুরী মহাশয় তর্জ্জমা করিয়াছেন

'যে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ লোক বিভীষিকা ভূত হইয়া কম্পিতকলেবর হইয়া

৬১ পৃষ্ঠা। শাক্যসিংহ

"Fate trembled in the balance" ইহার তর্জ্জমা হইল 'বিভীষিকাভূত হইয়া কম্পিত কলেবর হইয়া উঠিল'।

আমরা Rowe সাহেবকে অনুরোধ করি,

তিনি এই Baboo Translation টি অথবা Chowdhuri Translation টি তাঁহার Immortal Hints এর অন্তর্ভূত করিয়া লন

৪নং

Max Muller বলেন

"He had attained the good age of threescore and ten"

চৌধুরী মহাশয় তর্জ্জমা করিলেন

'তাঁহার বয়স দশাধিক ত্রয়োবিংশ বৎসর' 'দশাধিক ত্রয়োবিংশ' অর্থাৎ তেত্রিশ। Threescore and ten মানে তিনকুড়ি এবং দশ অর্থাৎ সত্তর। তেত্রিশ আর সত্তর প্রায় কাছাকাছি বটে। ইচ্ছা ছিল আর খানিক ক্ষণ চৌঃ মহাশয়ের সহিত এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ করি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সময় নাই। বোধ হয় বান্ধবে স্থানও কুলাইয়া উঠিবে না।

এতক্ষণ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সামান্য বিবাদ করিতেছিলাম। এক্ষণে তাঁহাকে একটি গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

বুদ্ধ যখন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে এইরূপে বর্ণিত করিয়াছেন।

সখিদের সঙ্গে নানারূপ প্রেমালাপ করিয়া বুদ্ধ অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছেন। পরে 'বুদ্ধ সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলে গোপা মুখ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া বসন মধ্য হইতে কুমারের প্রতি একবার কটাক্ষ পাত করিয়াই অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। * * * * * * * *

কুমার গোপার করে কর সমর্পণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার হস্তে এক বিন্দু নেত্রজল পতিত হইল। * * * * অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; নানারূপ সুখালাপে নিশি যাপন করিয়া বুদ্ধ বহির্ব্বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।' আমরা পুস্তকের এই অংশটুকু পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। জটাবল্কলধারী, জিতেন্দ্রিয়, সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসশ্রেষ্ঠ, ভিক্ষাজীবী বুদ্ধ বাসরঘরের বরের ন্যায় স্ত্রীর সঙ্গে পরম সুখে নিশি যাপন করিলেন! এ কি কথা! বুদ্ধের ধর্ম্মে স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিতে নাই। বুদ্ধ নিজেই ঐ নিয়মের মস্তকে পদাঘাত করিলেন! চৌধুরী মহাশয়ের রুচিকে সহস্র ধন্যবাদ। তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকেও সহস্র ধনবাদ!

বুদ্ধ বাড়ী প্রত্যাগমন করিলে কি কি ঘটনা হইয়াছিল, মোক্ষমূলর তাহা বিস্তারিত লেখেন নাই। মোক্ষমূলর বলেন—

'প্রায় বার বৎসর পরে বুদ্ধ পুনরায় কপিলবস্তুতে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে তিনি নানা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করেন। এবং ঐ সময়েই শাক্যবংশীয় সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য হন।'

ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহাতে চৌধুরী মহাশয়ের কল্পনাবিলাস সমর্থিত হইতে পারে।

বুদ্ধ বাটি প্রত্যাগমন করিলে কি কি ঘটনা হয়, Buddhism নামক পুস্তকে তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। তাহার

কিয়দংশ আমরা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

'যখন বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তি পত্তন করিতেছিলেন, এবং যখন বহুসংখ্যক লোক তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল, তখন তাঁহার পিতা শুদ্ধদান তাঁহার নিকট একটি দূত প্রেরণ করেন। দূত বুদ্ধের নিকট গিয়া বলে যে, তাঁহার পিতার মৃত্যুকাল অতি সন্নিহিত, এ সময়ে বুদ্ধের উচিত যে তিনি কপিল বস্তুতে গিয়া একবার তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তদনুসারে বুদ্ধ কপিলবস্তু যাত্রা করেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম অনুসারে গ্রামের অভ্যন্তরে নিবাস নিষিদ্ধ। সুতরাং বুদ্ধ গ্রাম-সন্নিহিত একটী উদ্যানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ঐ খানে তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরদিন বুদ্ধ শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পিতা ঐ সংবাদ শ্রবণে পীড়িত হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন, "কেন বাপু আমাদিগকে কলঙ্কে ডুবাইতেছ? কেন তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ? তুমি কি মনে কর যে আমি তোমার শিষ্যবর্গের আহার যোগাইতে সমর্থ নই।"

বুদ্ধ—'মহারাজ, আমাদের বংশের রীতিই এই।'

মহারাজ—'আমরা জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমাদের কেহ কোন পুরুষে ভিক্ষা করে নাই।'

বুদ্ধ—'আপনি এবং আপনার পরিবারস্থ সকলে ক্ষত্রিয় বংশ-সম্ভূত; কিন্তু আমি বুদ্ধ (Prophets) বংশ-জাত। বুদ্ধেরা সকলেই ভিক্ষাজীবী ছিলেন।' এই বলিয়া বুদ্ধ নিজ পিতার নিকটে নিজ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন। বুদ্ধের পিতা কোন উত্তর না দিয়া বুদ্ধের হস্ত হইতে কমণ্ডলু গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজগৃহ অভিমুখে লইয়া গেলেন। পরিবারস্থ সকলে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিল। কিন্তু যশোধারা (গোপা) আসিল না। গোপা বলিল 'যদি আমার কিছু গুণ থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজেই এখানে আসিবেন। আমি এখান হইতেই তাঁহার অভিনন্দন করিব।' যখন বুদ্ধ দেখিলেন যে গোপা আইসে নাই, তখন তিনি দুইজন শিষ্য সমভিব্যাহারে গোপার নিকটে গেলেন। যদিও রমণীর অঙ্গস্পর্শ তাঁহার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ, তথাপি তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন 'যদি গোপা আসিয়া আমার আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে তাহাকে নিষেধ করিও না।' যখন গেরুয়াবসন-পরিহিত, মুণ্ডিতকেশ, মুণ্ডিতশ্মশ্রু, সন্ন্যাসবেশধারী বুদ্ধ গোপার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন তখন গোপা আর থাকিতে পারিলনা। সে ভূপৃষ্ঠে অবলম্বিত হইয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বুদ্ধের পিতা গোপার ঐ বৌদ্ধধর্ম্ম-নিষিদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া বুদ্ধকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন 'গোপা তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। তুমি এখান হইতে গেলে পর, গোপা সকল আমোদ প্রমোদে জলাঞ্জলি দেয়। গোপা একবেলা আহার করিত এবং শয্যায় শয়ন না করিয়া মাটীতে চাটাই পাতিয়া শুইয়া থাকিত' এস্থলে

বুদ্ধ কি করিলেন বা কি ভাবিলেন কোনও পুস্তকে তাহা বর্ণিত নাই। যাতক নামক এক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে তিনি এই স্থলে গোপা পূর্ব্বজন্মে কিরূপ ধর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন তদ্বিষয়ক একটী উপন্যাস বলেন। বুদ্ধ তাঁহার স্ত্রীর নিকট নিজ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য হইলেন।'

এই গল্পটি কিরূপ মধুর এবং সন্ন্যাসব্রতধারী বুদ্ধের জীবনের সহিত ইহার কিরূপ সামঞ্জস্য। চৌধুরী মহাশয় এক্ষণে বুঝিবেন যে Fact is more beautiful than fiction.

আমরা নিম্নে বুদ্ধের ধর্ম্ম ও উপদেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করিব।

আমরা সকলেই কথামালায় পড়িয়াছি, যে এক জ্যোতির্ব্বেত্তা বাড়ীর সম্মুখে কোথায় কি আছে জানিতেন না; কিন্তু তিনি আকাশের কোথায় কি আছে ইহা জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত থাকিতেন। এই জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতের দশা কি হইয়াছিল, আমরা তাহাও জানি। ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতদের দশাও অনেকটা এইরূপ ছিল। কোথা হইতে জগতের উৎপত্তি,কে জগতের স্রষ্টা, জগতের স্রষ্টা আছে কি না, এই ত্রিভুবন কি কি উপাদানে নির্ম্মিত, প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই সকল 'উচ্চ অঙ্গের' তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। নিজের চরিত্র কিসে ভাল হইতে পারে, কিসে এই দুঃখের জগতে সুখ আসিতে পারে, কিসে এই জগতে হিংসা ও পাপের পরিবর্ত্তে অহিংসা ও পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এ সব প্রশ্ন তাঁহাদের মনে স্থল পাইত না। স্থল পাইলেও তাঁহারা দুই এক কথায় এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেন। বেদ পাঠ কর, ব্রাহ্মণকে ধন দান কর, ঈশ্বরের নাম জপ কর, যাগ যজ্ঞ কর, তাহা হইলেই ইহকালে সুখ ও পরকালে মুক্তি লাভ করিবে। সাধারণ লোকে তাহাই করিত। ব্রাহ্মণকে দান, যাগ, যজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতিতে তাহারা সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিত। কিন্তু তাহাতে লাভ হইল কি? জগতে সেই মিথ্যা কথা, সেই প্রতারণা, সেই অনিষ্ট চিন্তা সেই পাপাচরণ, সেই সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রহিল। সেই দুঃখ, সেই মনস্তাপ, সেই শোক,সেই বিষাদ,সেই সকলই মানবকে পীড়িত করিতে লাগিল। বুদ্ধ এই সমস্ত দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি যদি কোন কাজের হইত, তাহা হইলে তাহাদের ফল কিছু না কিছু টের পাওয়া যাইত। কিন্তু জগতের ত কিছুই পরিবর্ত্ত হয় নাই। অতএব তাহাদের অন্য প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়। বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মে এই প্রণালীটি বিবৃত করিলেন। সেই প্রণালীর কিয়দংশ আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বুদ্ধ বলিলেন

১। দেখ এই জগৎ দুঃখময়। তুমি যে অবস্থাতেই থাক, দুঃখের হাত এড়াইতে পার না। দেখ তোমার জন্ম, যৌবন, বার্দ্ধক্য সকলই দুঃখময়। প্রণয়ে বিচ্ছেদ দুঃখময়; আর বিচ্ছেদ কাহার না হয়? ঘৃণা, দ্বেষ দুঃখময়। সংসারে কে ঘৃণা দ্বে-

ষের হস্ত এড়াইয়াছে ? দুষ্প্রাপ্য বস্তুতে আশা দুঃখময়। কিন্তু কে না দুষ্প্রাপ্য বস্তুতে আশা করে ? এইরূপে তোমার সকল অবস্থাই দুঃখময় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

২। মায়াতেই দুঃখের উৎপত্তি।* (According to Max Muller মায়া is affections. According to Davids মায়া is Lust of Life. সুতরাং মায়ার পরিবর্ত্তে জীবনানুরাগ বা শুদ্ধ অনুরাগ ব্যবহার করিলেও চলে। সংস্কৃতে ইহার নাম তৃষ্ণা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মায়া কথা বলিলে আমরা ইহা সহজে বুঝিতে পারি)।

৩। সুতরাং মায়ার বিনাশেই দুঃখের বিনাশ

৪। মায়ার বিনাশ করিতে হইলে একটি পথ ধরিয়া চলিতে হয়। ঐ পথের আটটি অঙ্গ। এই কয়টি অঙ্গ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ক। সত্য বিষয়ে বিশ্বাস করিবে (অসত্য বিষয়ে বিশ্বাস করিবে না।)

খ। ন্যায়সঙ্গত ভাবনাকে মনে স্থান দিবে (অন্যায় ভাবনাকে মনে স্থান দিবেনা)

গ। সত্য কথা বলিবে।

ঘ। ন্যায্য কর্ম্ম করিবে। (অন্যায় কর্ম্ম করিবে না।)

চ। ন্যায়পথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবে।

ছ। ন্যায়সঙ্গত চেষ্টা করিবে। (অর্থাৎ "যেন তেন প্রকারেণ উদরং পরিপূরয়েৎ" করিবে না।

জ। স্মরণশক্তি ঠিক রাখিবে। (অর্থাৎ যাহাতে ভূতপূর্ব্ব বিষয়গুলি ঠিক ঠিক মনে রাখিতে পার সেই চেষ্টা করিবে।)

ঝ। চিন্তা ঠিক রাখিবে (অর্থাৎ এলো মেলো চিন্তা করিবে না) চিন্তাটি ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ী হওয়া চাই।

এই চারিটি সত্য বৌদ্ধধর্ম্মের মূল। ইহা হইতে নানা শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে। আমরা তন্মধ্যে দুই একটি প্রধান প্রধান বিষয় দেখাইয়া এই সমালোচনা শেষ করিব।

খ্রীষ্টের ন্যায় বুদ্ধেরও দশটি আদেশ আছে যথা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য)

১। হত্যা করিবে না।

২। চুরি করিবে না।

৩। পরদার করিবে না।

৪। মিথ্যা কথা বলিবে না।

৫। মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

৬। অখাদ্য খাইবে না।

৭। নৃত্য, গীত, অভিনয় প্রভৃতিতে যোগ দিবে না।

৮। পুষ্পমাল্য, গন্ধদ্রব্য, অলঙ্কার বা বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিবে না।

৯। উচ্চ বা বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিবে না।

১০। স্বর্ণ বা রৌপ্য কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিবে না।

মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে বুদ্ধ নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন।

১ (বৌদ্ধ সাধারণ ব্যক্তির জন্য)

* অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে মায়া না থাকিলে আমরা দুঃখ অনুভব করিতে পারিতাম না।

পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ক—পুত্রদিগকে পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিবে।

খ—ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে।

গ—সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিবে।

ঘ—তাহাদিগকে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত করিবে।

চ—তাহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিবে না।

পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ক—পিতার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিবে।

খ—বাড়ীর করণীয় কার্য্য করিবে।

গ—পিতার বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

ঘ—যাহাতে পিতার উপযুক্ত পুত্র হইতে পার, সেই চেষ্টা করিবে।

চ—পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্মরণার্থক ক্রিয়াকলাপ ভক্তির সহিত করিবে।

পতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১। স্ত্রীর সম্মান করিবে।

২। স্ত্রীর প্রতি সানুকূল ব্যবহার করিবে।

৩। স্ত্রীর অবিশ্বাসী হইবে না।

৪। যাহাতে স্ত্রী অন্যের নিকট সম্মানিত হয় সেই চেষ্টা করিবে।

৫। স্ত্রীকে উপযুক্ত বসন ভূষণে সজ্জিত করিবে।

পত্নীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১। গৃহকর্ম্ম সুন্দররূপে চালাইবে।

২। কুটুম্ব স্বজনের যথোচিত সৎকার করিবে।

৩। সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

৪। অল্প খরচে সংসার চালাইবে।

৫। যাহা কিছু করিবে তাহাতেই দক্ষতা ও পরিশ্রমের লক্ষণ দেখাইবে।

এইরূপে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্ত্তব্য কি, ভৃত্যের কর্ত্তব্য কি, প্রভুর কর্ত্তব্য কি, শিক্ষক ও ছাত্রের কর্ত্তব্য কি, গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি, সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কি, বুদ্ধের উপদেশে তাহা সমস্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

আমাদের বিবেচনায় বুদ্ধের এই উপদেশগুলি, Fleming's Moral Philosophy তে লিখিত উপদেশমালা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ এবং এ দেশের পক্ষে উপযোগী।

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা গেল যে বৌদ্ধ ধর্ম্মানুসারে চরিত্র উন্নতি নিজের উপর নির্ভর করে। ইহাতে জগদীশ্বরের দোহাই দিয়া হাত পা ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না। ইহাতে যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যানে কোন ফল হইবে না। নিজের পরিশ্রমে নিজের কষ্টে ইন্দ্রিয় সংযম কর। সৎকার্য্য কর তাহাতেই মুক্তি হইবে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই অংশের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। নিজের উন্নতি নিজ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। হিন্দুই হও, আর ব্রাহ্মই হও, নিজে না ইন্দ্রিয় সংযম করিলে ইন্দ্রিয় সংযম শিখিতে পারিবে না। ধর্ম্মালোচনা করিতে চাও, কেহ তোমাকে নিষেধ করিবে না। কিন্তু আপনা ভুলিও না। জানিও

'God helps him who helps himself.'

শ্রীনীঃ—

জীবনের ভার।

"I slept, and dreamt that life was Beauty;
I woke, and found that life was Duty."

এই দুর্ল্লভ মানবজীবন অনেকের পক্ষেই এক দুর্ব্বহ ভার। শোক নাই, দুঃখ নাই, ভোগ্যবস্তুর অভাব নাই, অন্য কোনরূপ অভাবেরও তাড়না নাই;—তথাপি হৃদয় স্ফূর্ত্তিহীন, চক্ষু নিস্তেজ, মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন। দিন যায় রাত্রি আইসে, রাত্রি যায় দিন আইসে, আবার রাত্রি, আবার দিন;—আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো; সূর্য্য উঠিতেছে ও অস্ত যাইতেছে, আবার উঠিতেছে ও আবার অস্ত যাইতেছে;—এক দুই তিন করিয়া ঘটিকাযন্ত্রের অশ্রান্তগতি লৌহ-হস্ত ঘুরিয়া আসিতেছে ও ঘুরিয়া যাইতেছে; কিন্তু সময় কিছুতেই ফুরাইতেছে না, জীবনের অসহ্য ভার কিছুতেই কমিতেছে না, আত্মা কিছুতেই উৎসাহিত হইতেছে না। সুখের সহস্র সামগ্রী উষার প্রসন্ন জ্যোতিতে চারিদিকে হাসিতেছে, প্রীতি ও মমতা প্রভাত-সমীর-সঞ্চালিত তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রমোদ-লহরীতে খেলা করিতেছে, সৃষ্টির আনন্দপ্রবাহ হৃদয়ের চতুস্পার্শ্বে অযুতধারায় বহিয়া যাইতেছে,—কিন্তু মন কিছুতেই উঠিতেছে না। আঁধার রাত্রির বিজলির মত অধরে কখনও হাসি ফুটিতেছে, অথচ সে হাসির কোন অর্থ নাই;—দৃষ্টি শূন্যগর্ভ, চিত্ত চির-নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াও অধীর। সংগীত, সাহিত্য, সুহৃজ্জনের সংসর্গ, কাব্যকথা, প্রেমালাপ, ক্রীড়ার আমোদ, চিত্রের তুলিকা, পর্য্যায়ক্রমে আদৃত, পরীক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইতেছে। অন্তর কিছুতেই নিবিষ্ট হয় না। ইহা কি?

জীবনের এ অবস্থা যে অস্বাভাবিক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কারণ যাহা স্বাভাবিক, তাহা স্বাস্থ্যকর, এবং যেখানে স্বাস্থ্য, সেখানেই প্রীতির পবিত্র উচ্ছ্বাস ও প্রফুল্লতা। যদি এ অবস্থা স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে হৃদয় ইহাতে এরূপ জ্বালাদগ্ধ রহিবে কেন? যাঁহার হৃদয় স্বভাবানুজাত স্বাস্থ্যসুখের প্রাণ-প্রদ স্পর্শে শীতল রহে, এ সংসার তাঁহার কাম্যকানন অথবা কার্য্যভবন। পর্ব্বত অবধি পুষ্পস্তবক পর্য্যন্ত এ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুতেই তাঁহার প্রীতি আছে। বিদ্যুতের বিনোদ-নৃত্য, বজ্রের ভীম গর্জ্জন, বৃষ্টি বাত, শীত গ্রীষ্ম, ফুল, ফল, লতা, পাতা, বিহঙ্গের বন্যগীত, বনচরের উদ্ভ্রান্ত প্রেম ইহার কিছুই তাঁহার নিকট সুখ-শূন্য নহে; এবং মনুষ্যের সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ্, শস্যের হ্রাস বৃদ্ধি, শিল্পের বিকাশ, বিজ্ঞানের প্রচার, বাণিজ্য ও রাজকার্য্য, সমাজের উন্নতি ও অধোগতি, নীতির নূতন সংস্করণ এবং জাতিবিশেষের উত্থান ও পতন ইহার কিছুই তাঁহার নিকট নিঃসম্পর্ক বিষয় নহে। তিনি আপনাতে অনুরক্ত, অতএবই সংসারে লিপ্ত ও সংসারে আসক্ত। তাঁহার কর্ত্তব্যের আর

অবধি নাই। কিন্তু আমরা মনুষ্যমনের যে অবস্থাকে আঁকিয়া তুলিতে যত্নবান্ হইয়াছি, মনুষ্য যখন সেই অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সে আপনাতেই আপনি বিরক্ত,অন্য কিছুতে তাহার অনুরাগ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তখন সৃষ্টি থাকুক, কি সৃষ্টি বিলুপ্ত হউক, তোমার সমাজ ও সামাজিক বন্ধন সুরক্ষিত রহুক কি উচ্ছিন্ন যাউক, উভয়ই তাহার নিকট সমান কথা। তখন সে যৌবনে জরাজীর্ণ; বাহিরের বসন্তসমীর তাহাকে কিরূপে দোলায়িত রাখিবে? তখন সে আপনার অন্ধকারে আপনি আচ্ছন্ন; জগতের কোন্ আলো তাহার চক্ষু আকর্ষণ করিবে? সুতরাং এ বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিতে পারে না যে, এই অবসাদ, এই অনুৎসাহ, এই গ্লানি ও এই ভার এক ভয়ানক রোগ। কিন্তু হায়! এই রোগের আদিমূল কোথায়? যদি ইহা রোগ বলিয়াই অবধারিত হইল, তবে কি ইহার প্রতিবিধান নাই?—মনুষ্য শরীরসম্পর্কে অতিসামান্য রোগের প্রশমনের জন্যও প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে,—অথচ যে রোগে তাহার জীবনের সকল আশাই উন্মূলিত হয়,—জীবনের পারিজাত কানন ইহলোকেই দগ্ধ মরুর মূর্ত্তিধারণ করে, তৎপ্রতি কি কেহই ফিরিয়া চাহিবে না?

আমরা মানবপ্রকৃতির গতি ও পরিবর্ত্তরীতি যেরূপ পাঠ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই বিশ্বাস যে,উল্লিখিত মানসিক ব্যাধি দুইটি মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত, এবং সেই দুইপাপ,—জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ ও আলস্য।

ক্ষিত্যপ্তেজ ও মরুৎ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ এবং চক্ষু কর্ণ ও হস্ত পাদ প্রভৃতি শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেমন এক একটি নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন আছে, প্রতিমনুষ্যনিহিত জীবনী শক্তিরও সেইরূপ একটি স্থির-নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। মনুষ্য ধনী হউক কি নির্ধন হউক, সে সিংহাসনের প্রান্তভাগে কিংবা প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে জন্মগ্রহণ করুক, অথবা আপনার ললাটপট্টে দুঃখ ও দুর্গতির সর্ব্ব প্রকার লাঞ্ছনা ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসুক, তাহার জন্ম ও জীবন শিশুর লোষ্ট্রক্ষেপের ন্যায় নিরর্থক নহে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, গ্যালিলিয়ো এবং রাম,যুধিষ্ঠির ও ম্যাজিনি প্রভৃতির জীবন যেমন সাধারণ ও বিশেষভাবে বিধিনির্দ্দিষ্ট; যাহাদিগকে কেহ চিনে না, জানে না, মনুষ্য বলিয়া গণনায় আনে না, —মনুষ্যজ্ঞানে নিকটে আসিতে দেয় না, সেই অপরিচিত-নামা অলক্ষিত ব্যক্তিদিগের জীবনের লক্ষ্যও সাধারণ ও বিশেষভাবে সেইরূপ বিধিনির্দ্দিষ্ট। যে সংসারে "অতি ক্ষুদ্র একটি বারিবিন্দুর উদয় ও বিলয়ও অনন্তবিস্তারিত নিয়মশৃঙ্খলা দ্বারা অনুশাসিত,—অতিক্ষুদ্র একটি অঙ্গারকণাও অপচয়ে যাইতে পারে না অথবা নিয়তির শাসন লঙ্ঘন পূর্ব্বক নড়িতে চড়িতে সমর্থ হয় না, সেই সংসারে মনুষ্যের ন্যায় উন্নতজীব যে, কোন রূপ প্রয়োজনের অনুসরণ বিনা শুধু লীলা করিতে আসিবে এবং কিছুদিনের তরে লীলা করিয়াই তিরোহিত হইতে অধিকার পাইবে, এইরূপ কল্পনা করাও বুদ্ধির বিড়ম্বনা। বস্তুতঃ মনুষ্যমাত্রেরই জীবনের এক একটি লক্ষ্য আছে, এবং স্বভাব ও শক্তির অপূর্ব্ব

স্ফুরণ ও চরিত্রের অনন্যসাধারণ গঠনে যাহার যে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট কি নিরূপিত হয়, মানব-জীবনের সাধারণ নিয়মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে সেই লক্ষ্যসাধনই তদীয় জীবনের অদ্বিতীয় অথবা প্রধান কার্য্য। ইহাতেই তাহার সুখ, এবং ইহাতেই তাহার সার্থকতা। এই লক্ষ্য স্থির থাকিলেই তাহার জীবনের কেন্দ্র স্থির। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকের বুদ্ধিতে ইহা স্ফুরিত হয় না,—অনেকের ইহা মনে থাকে না, এবং যাহাদিগের মনে থাকে, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকেরই সেই লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি রহে না। তাহারা ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, শক্তির দুর্ব্বলতায় হউক, কিংবা বিশেষ কোন প্ররোচনার প্রাবল্যে হউক,জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জীবন-তরীর হালি ছাড়িয়া দেয়, এবং অবস্থার নিপীড়নে কিংবা সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে যেখানে গিয়া ঠেকে, সেখানে বসিয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় বৃদ্ধের মত বিলাপ ও পরিতাপে দিনপাত করিতে রহে। তখন তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত জীবনের দুর্ব্বহ ভারে,—স্বপ্নে ও জাগরণে সকল সময়েই সেই অসহ্য ভার। এইরূপ জীবন উদ্যাপন করা যে যার পর নাই ক্লেশকর,—জীবন এইরূপে দুর্ভর হইয়া উঠিলে কুসুমশয্যাও যে কণ্টকাকীর্ণ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান অনাবশ্যক।

জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ যেমন পাপ, আলস্যও তেমনই এক গুরুতর পাপ এবং উভয়েরই আরম্ভ ও অবসান সমানরূপে ভয়ঙ্কর। আলস্য উপেক্ষা কি পরিহাসের কথা নহে। চিন্তাশূন্য মত্ত মূর্খেরা আলস্যকে দুঃখের বিরাম বলিয়া মনে করিতে পারে; খট্টারূঢ় যুবজনেরা আলস্যে আমোদের ক্ষণিক আভা দেখিয়া ভ্রমে পড়িতে পারে, এবং ভ্রমর-প্রকৃতি কবিসম্প্রদায়ও আলস্যকে হৃদয়ের বিলাস বলিয়া কল্পনার বিলোল চিত্রে চিত্র করিতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞানের নিষ্ঠুর চক্ষে আলস্য অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণাজনক কলঙ্ক ও লজ্জাজনক দুষ্কৃতি আর নাই। আলস্যের নাম অকার্য্য। উহা মানব-জীবনরূপ কল্পতরুর কোটরস্থ বহ্নি। এক বার যদি উহা অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সমস্ত বৃক্ষটিকে ভস্মরাশি না করিয়া আর উহা বাহির হয় না। উহা হৃদয়-কুসুমের কীট। উহার বিষ-দন্ত আশার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিয়া ফেলায়। উহা শক্তিরূপ সুবর্ণের শ্যামিকা। আগুণে না পোড়াইলে,সে দুরপনেয় মলিনতা আর কিছুতেই প্রক্ষালিত হয় না। উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের ভার,—অরোগে রোগ, অশোকে শোক,অদুঃখে দুঃখ, অতাপে তাপ। যাহার বুদ্ধির জ্যোতি দেশব্যাপী অন্ধকারকে ভেদ করিয়া সত্যের গৌরব বিস্তার করিবে বলিয়া আশা ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে চাটুবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কোন এক ধনিসন্তানের চিত্তবিনোদনে রত! যে সমুচ্ছ্রিত বট-বৃক্ষের ন্যায় বহু সহস্র প্রাণীর আশ্রয়স্থল হইবে আশা ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে মুষ্টিমিত ভিক্ষান্নের জন্য লালায়িত। যাহার উদয়োন্মুখী প্রতিভা দর্শনে বহুলোকের প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়া নাচিয়া ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে পণ্যাঙ্গনার উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত। যাহার

নবোদ্গত কল্পনার কমনীয় কান্তি দেখিয়া অনেকেই বাহু তুলিয়া অভিবাদন করিয়াছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে উদরের জ্বালায় কারারুদ্ধ। যাহার হৃদয়নিহিত তেজস্বিতা,—যাহার আকাঙ্ক্ষা, আস্পর্দ্ধা, অভিমান ও অধ্যবসায় সমীপস্থ সকলের মনেই বিস্ময় জন্মাইয়াছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে অঞ্চলবদ্ধ নর্ম্মসচিব। যে এক সময়ে পুরুষের মধ্যে পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র পূজা পাইয়াছিল, —যাহার দৃষ্টি দামিনীর দুঃসহ দীপ্তির ন্যায় সহস্র দৃষ্টি শাসন করিত, যাহার জিহ্বা সহস্রাধিক হৃদয়কে নিত্য নূতন তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রাখিত, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে সকলের কাছেই উপেক্ষিত ও অবহেলিত, সর্ব্বত্রই পাদদলিত। আলস্যের প্রথম ছায়াপাতেই জীবনের সকল উদ্যম এইরূপে বিনষ্ট হয় এবং জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে ; ইহার পরিণাম যে কি হইতে পারে, তাহা কয়জনে ভাবিয়া দেখে ?

মনুষ্যের হৃদয় যে সমস্ত কার্য্যকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করে, মনুষ্য সেই সমস্ত কার্য্যে আপনা হইতে আপনি প্রথমতঃ আসক্ত হয় না। পাপের দুর্গন্ধময় বিকটচ্ছবি তাহার চিত্তে কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা জন্মায়, এবং সে উহা হইতে ভয়ে ভয়ে দূরে রহিতে চাহে,—দূরে রহিতে পারিলেই ভালবাসে। কিন্তু আলস্য যখন হৃদয়কে অসার করিয়া তুলে—যখন আলস্যের প্রভাবে হৃদয়ের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য বিনাশ পায়, স্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণা বিকৃত হইয়া যায় ;—যখন অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই সেই কেমন এক শূন্য শূন্য ও পুরাতন শূন্যতায় পরিপূর্ণ জ্ঞান হইতে থাকে,—তখন পাপজন্য পরিবর্ত্তনের নূতনতাও নিতান্ত প্রীতিকর হইয়া উঠে; এবং যাহাদিগের অধঃপাত অন্য কোন প্রকারে আশঙ্কিত হয় নাই,আলস্যের শূন্যহৃদয়তাই তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন অধঃপাত সাধন করে। কিছুই ভাল লাগে না, অতএব কিছু একটা হইলেই যেন বাঁচি, এই এক চিন্তাই তখন হৃদয়ের একমাত্র চিন্তা, এবং বোধ হয় এই চিন্তাই অনেক দুঃখদগ্ধ ও ভারাক্রান্ত জীবনের আদি কাহিনী ও শেষ ইতিহাস।

আর এক প্রকারে দেখিতে গেলে, আলস্য ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহরূপে প্রতিভাত হয়। আমরা দেখাইয়াছি যে,আলস্য আর অকর্ম্মণ্য জীবন এক কথা। কিন্তু যাহাকে অকর্ম্মণ্য জীবন বল,তাহারই অপর অর্থ আত্মদ্রোহ, সমাজদ্রোহ ও বিশ্বদ্রোহ। অতএব যে অলস, সে এই ত্রিবিধ অপরাধেই সর্ব্বপ্রকারে দণ্ডার্হ ও নিগ্রহ-ভাজন।

প্রথমতঃ আত্মদ্রোহ। প্রকৃতি তোমাকে চক্ষু দিয়াছেন, তুমি সেই চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অন্ধ হইয়া রহিলে। প্রকৃতি তোমাকে শ্রুতি দিয়াছেন,তুমি শ্রুতি সত্ত্বেও বধির হইয়া রহিতে যত্ন পাইলে। ইহা আত্মদ্রোহ। কেন না ইহাতে তোমার আত্মার ক্ষতি। আর, প্রকৃতি তোমাকে বুদ্ধি ও মনস্বিতা দিয়াছেন, বুদ্ধি ও মনস্বিতার সমুচিত বিকাশেই তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কিন্তু তুমি আলস্য বশতঃ সেই বিকাশের পথে ইচ্ছা সহকারে কাঁটা দিলে, অথবা আপনার উৎকর্ষ সাধনে আলস্যের হেলায়

খেলায় উপেক্ষা করিয়া ক্রমে একটি পশু হইলে। ইহাও আত্মদ্রোহ। কেন না ইহাতেও তোমার আত্মার অতীব শোচনীয় ক্ষতি। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আলস্যে ও আত্মদ্রোহে কার্য্যতঃ কিছুই প্রভেদ নাই। কারণ, আলস্য বুদ্ধি ও হৃদয় প্রভৃতি সমস্ত মনোবৃত্তিকেই অপ্রাকৃত করিয়া রাখে এবং আত্মহত্যারূপ আসুর কার্য্যে একদিনে যাহা সম্পাদিত হয়, আলস্যও একটুকু একটুকু করিয়া ধীরে ধীরে ঠিক্ তাহাই সম্পাদন করে। কিন্তু মনুষ্যের কি ভ্রম! যে কোন অসহ্য মনস্তাপে কিংবা অসহ্য শোকে একদিনে আত্মহত্যা করে, তাহাকে সকলেই বিশেষ রূপে শাসন করিতে চাহে; অথচ, যে বিনা শোকে ও বিনা মনস্তাপে ক্রমে ক্রমে আত্মহত্যা করিতে রহে, তাহাকে কোনরূপ শাসনের অধীনতায় আনিতে কেহই সেরূপ যত্নবান্ নহে। এই উভয়ের মধ্যে অধিকতর নিন্দা কার?

দ্বিতীয়তঃ সমাজ-দ্রোহ। আলস্যের ফল যদি শুধু আত্মদ্রোহেই পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে যতই কেন দুর্ব্বল হউক না, বলিবার একটা কথা ছিল। বলিতাম, আমার গলায় আমি সাধ করিয়া ছুরি দিব, তোমার তাহাতে সুখ দুঃখ কি? আমার চক্ষু আমি আপনি উৎপাটন করিয়া ফেলিব, আমার কর্ণ আমি দগ্ধ শলাকাদ্বারা বেধ করিয়া বধির হইয়া থাকিব, আমার ভূমি আমি অমনি পতিত রাখিয়া আপনার চিত্ত পরিতৃপ্ত করিব, তোমার তাহাতে আসে যায় কি? এবং তুমি কেন সেই জন্য বৃথা অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে অথবা আমাকে বৃথা নিগ্রহ করিতে সম্মুখীন হইয়া তোমার ও আমার উভয়েরই বিরক্তি জন্মাইবে? কিন্তু সামাজিক ধর্ম্ম আলস্যের এই গর্ব্বিত উক্তিতে মুহূর্ত্তের তরেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ন্যায়ের অটল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, এবং যে অলস, সে যে আত্মদ্রোহিতাতেই সমাজদ্রোহী এই সত্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করে।

দেখ, আলস্যে কত প্রকারে সমাজদ্রোহ। সমাজ-যন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গই অন্য অঙ্গ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট রহে, এবং যে অঙ্গ যে পরিমাণে অন্যদীয় বল শোষণ করিয়া লয়, সেই অঙ্গ সেই পরিমাণে প্রতিদানে আপনার প্রাণ-বল প্রদান করিয়া সামাজিক শক্তির সাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু যে অলস, তাহার শোষণ আছে, প্রতিদানে পর-পোষণ নাই। সে নেয় অথচ কিছুই দেয় না। সে আদান প্রদান রূপ সমাজনীতির প্রত্যক্ষ পরিপন্থী, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব সর্ব্বথা সমাজ-যন্ত্রের ঘোরতর অনিষ্টকর। সমাজের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা সাধারণের শ্রম-লব্ধ। সেই শ্রম শারীরিক হউক, কিংবা মানসিক হউক, কিন্তু কোনরূপ সম্পত্তিরই বিনা শ্রমে উৎপত্তি নাই। যে অলস, সে এই শ্রমের অংশ বহন করে না; কিন্তু শ্রম-লভ্য বস্তুর ভাগ হরণ করিয়া সমাজের আংশিক দরিদ্রতার কারণ হয়। অপিচ, সমাজের যাহা কিছু বল, তাহা সাধারণের একতার ফল। কেহ বুদ্ধিবলে, কেহ বা হৃদয়-বলে, সমাজের পুষ্টিসাধন করে; এবং কেহ নীতিবলে, কেহ বা শারীর-বলে, সমাজের সামর্থ্য বর্দ্ধন করিতে

প্রয়াস পাইয়া আপনার জন্মঋণ পরিশোধে যত্নবান্ রহে। এইরূপ তিল তিল করিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকলের বল সঞ্চয়েই সমাজের সাধারণ-বল। কিন্তু যে অলস, সে সমাজের বল বৃদ্ধি করিবে দূরে থাকুক, ব্যাধিজীর্ণ মাংসপিণ্ডের মত সে সমাজের কণ্ঠে বিলম্বিত রহে এবং তাহার ভারবহনরূপ অনাবশ্যক কার্য্যেই সমাজ অকারণে অংশতঃ ক্ষীণবল হইতে থাকে। ইহাতে জ্যামিতির সিদ্ধান্তের ন্যায় অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, যে অলস, সে সামাজিকতার সূক্ষ্মবিচারে তস্করের তুল্যস্থানীয়। তস্কর যেমন দণ্ডার্হ, অলসও লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তেমনই দণ্ডার্হ। নীতির নির্ম্মল দৃষ্টিতে এ উভয়ে কোন অংশেই কোন পার্থক্য নাই।

তুমি কে যে তুমি আলস্যের পর্য্যঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বৃথা হাস্য পরিহাসে সময় পাত করিবে; আর আমি চৈত্রের রৌদ্র ও শ্রাবণের বৃষ্টি মাথায় বহিয়া তোমার জন্য ভোগ্য বস্তু আহরণ করিব? তুমি কে যে তুমি বিলাসের পুষ্পিত আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়া বিরহ বিলাপে বসিয়া থাকিবে; আর আমি গলদঘর্ম্ম-কলেবরে তোমার জন্য পরিশ্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইব। হউক তোমার নাম হস্ত, আর আমার নাম পদ, অথবা তোমার নাম কেশ,আর আমার নাম নখ। কিন্তু তুমি আর আমি উভয়ই যখন সমাজের অঙ্গ,তখন তুমি যদি হস্ত কিংবা কেশের কার্য্য না করিলে, আমি কেন তোমার সম্পর্কে পদ কিংবা নখরের কার্য্য সাধনে রত রহিব? আমি দিবসের একার্দ্ধ মাত্র পরিশ্রম করিয়াই জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারি। কিন্তু আমাকে যে সেই স্থলে সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিতে হয়, এবং তাহাতেও আমার উপযুক্ত সংস্থান কি সংকুলন হয় না, তাহার কারণ তোমার ঐ আলস্য। আমি ও আমার সমান-ধর্ম্মা ব্যক্তিরা ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে ভাবে আমাদিগের কঠোর কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি,তাহাতে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জাতীয় দুর্গতির অভাবনীয় ক্লেশে ক্লিষ্ট হওয়া আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত নহে। কিন্তু তথাপি যে আমরা সময়ে সময়ে সেই ক্লেশের কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দেশত্যাগে বাধ্য হইতেছি, তাহার কারণ তোমার ঐ আলস্য। আমি ও আমার সমশ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিয়াছি, এবং সেই শিক্ষা ও দীক্ষার মাহাত্ম্যে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা ও রুচি যেরূপ প্রসারিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, তাহাতে স্বাধীনতার অমল স্বর্গেই আমরা সর্ব্বতোভাবে অধিকারী। কিন্তু আমরা তথাপি যে, অধীনতার পঙ্কিল নিরয়ে কীটের মত পড়িয়া রহিয়াছি, তাহার কারণ তোমার ঐ আলস্য। অতএব তোমার ঐ আলস্যকে ধিক্, এবং যাহারা তোমার ঐ আলস্যের অনুকরণ কি অনুবর্ত্তন করিয়া, দুঃখের উপর দুঃখ দিতেছে—সামাজিক দুঃখের ভার বাড়াইতেছে,—সামাজিক সুখের বিঘ্ন ঘটাইতেছে, তাহাদিগকেও ধিক্।

তৃতীয়তঃ বিশ্বদ্রোহ। আলস্যের সহিত সমাজ-দ্রোহের কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে,তা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, আলস্যের সহিত বিশ্বদ্রোহিতার কিরূপ সম্পর্ক আছে, তাহা তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

এই বিশ্বের নিয়ম্ কার্য্যতৎপরতা,—এই বিশ্বের নিয়ম শ্রম। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যে কিছু পদার্থ আছে, প্রত্যেকেই কোন না কোন কার্য্য করিতেছে,—প্রত্যেকেই শ্রম-নিরত। প্রকাণ্ড সূর্য্য কিংবা প্রকীর্ণ পরমাণু;—অনন্ত নক্ষত্ররাজি অথবা অনন্তখদ্যোতমালা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, অগ্নি, বায়ু, ইহার কাহারও বিরাম নাই, কাহারও বিশ্রাম নাই। অদ্রির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ কর, অথবা অন্ধকারাবৃত গিরিগুহা কি সাগর-গর্ভে প্রবেশ কর, দেখিবে কার্য্যের গতি সকল স্থলেই সমানরূপে অব্যাহত। বিশ্বের অনন্ত সূর্য্যমণ্ডল যেমন গ্রহ উপগ্রহ লইয়া অহোরাত্র নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, সূর্য্যরশ্মি-বিলসিত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ধূলিকণাও আপনার কার্য্যে তেমনই অহোরাত্র নিযুক্ত রহিয়াছে। জল চলিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, বিদ্যুতের অন্তঃস্রোত যাতায়াত করিতেছে;—পরমাণু সকল যোগে ও বিয়োগে, সৃষ্টি ভাঙিতেছে ও গড়িতেছে, এবং রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিবিধভাবে অনন্ত খেলা খেলিতেছে,—বিশ্বজনীন প্রাণ-প্রবাহ ধ্বংস প্রাদুর্ভাবের বিবিধ লীলায় অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও ক্ষণকালের তরে যন্ত্রের বিরতি নাই। আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত, বিবর্ত্তের পর বিবর্ত্ত,—অঙ্কুরের পর পল্লবোদ্গম,পল্লবোদ্গমের পর ফুল,ফুলের পর ফল, এবং পরিণতির পর পরিণতি ও প্রক্রিয়ার পর প্রক্রিয়া;—নিমেষের জন্যও জগদ্‌যন্ত্রের সেই ক্রিয়াশীলতার নিবৃত্তি কি নিরোধ নাই। প্রকৃতির এই অশ্রান্ত কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে মনুষ্যের আলস্যজনিত অকার্য্য কিরূপ নিসর্গনিষিদ্ধ, নিয়ম-বিরুদ্ধ, অপ্রাকৃত ভাব, তাহা চিন্তা করিতেও এইক্ষণ শরীর কণ্টকিত হয়। ইহার পরও কি জিজ্ঞাসা করিবে যে, অলসের জীবন কেন এইরূপ দুর্ব্বহ ভার?

জীবনের ঐ ভার প্রকৃতির অঙ্কুশ-তাড়না; আসন্ন বিপত্তির পূর্ব্বলক্ষণ অথবা আরব্ধ ব্যাধির পূর্ব্বযাতনা। উহার অর্থ—শঙ্কিত হও,—সাবধান হও,—ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মনুষ্য যখন জীবনের ভারে ঐরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃতি তাহাকে অস্ফুটস্বরে উপদেশ দেন যে,কার্য্য কর এবং জীবনের কার্য্যে তৎপর হও; নহিলে জীবনে সজীবতা নাই। মনুষ্য যখন হৃদয়ের স্বাস্থ্য ও আত্মার স্ফূর্ত্তিতে বঞ্চিত হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, তখন প্রকৃতি তাহাকে যন্ত্রণার অব্যক্তশাসনে প্রকারান্তরে বুঝাইতে থাকেন যে, কার্য্য কর এবং জীবনের কার্য্যে তৎপর হও; নহিলে জীবনে শান্তি নাই। মনুষ্য যখন আপনাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দিয়া একবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে,—স্রোতের জলে তৃণের মত ভাসিয়া যায়, উত্থানের চেষ্টাও পরিত্যাগ করে, তখন প্রকৃতি তাহার পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুতাপের অরুন্তুদ বেদনায় এইরূপ আদেশ করেন যে,—সময় থাকিতে উত্থিত হও,—সময় থাকিতে স্বশক্তির আশ্রয় লও,—বিধাতার এই কর্ম্মভূমিতে অকর্ম্মণ্যের স্থান নাই।

রাজপুতানার ইতিহাস

মিবার-বিবরণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

বল্লভীপুর ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে রাণাদিগের উপরিতন পুরুষদিগের বিবরণ সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় না। তাঁহারা যে জগদ্বিখ্যাত সূর্য্যবংশীয় এবং রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লব হইতে সমুৎপন্ন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই বটে, কিন্তু বংশপরম্পরাক্রমে তাঁহাদের ধমনীতে যে মিশ্রশোণিত প্রবাহিত হয় নাই, এ কথা কে অভ্রান্তরূপে বলিতে পারে? মহাত্মা টড আপনার অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ "রাজস্থানের ইতিবৃত্ত" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অনেক বিশ্বস্ত লেখকের অভিপ্রায় সঙ্কলন পূর্ব্বক রাণাদিগের বংশ মিশ্রশোণিতের প্রবাহ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। টড সাহেবের গ্রন্থ ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য এমন নহে, কিন্তু অদ্যাপি রাজস্থান সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় মিতবাদী নিরপেক্ষ গ্রন্থকার নিতান্ত দুর্ল্লভ; এই জন্যই আমরা তাঁহার সংগৃহীত অভিপ্রায়নিচয় সঙ্কলন পূর্ব্বক আমাদের কৌতূহলোদ্দীপ্ত পাঠকবর্গের কৌতুক নিবারণ করিতে বর্ত্তমান অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছি। আমরা এ মতের পোষক কি না, তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু যাহাতে কিছুমাত্র আর্য্যশোণিতের সংস্রব আছে, তাহাই আমাদের পক্ষে আদরণীয়।

রাণাবংশে যবনশোণিতের সংস্রব বিষয়ের বিবরণ করিবার পূর্ব্বে শিলাদিত্য সম্বন্ধে যে এক অলৌকিক উপাখ্যান মাগধী ভাষায় "উপদেশ প্রসাদ" গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।—

"গুজ্জরদেশে চতুরশীতি নগর মধ্যে কৈরা নগরে দেবাদিত্য নামে এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সৌভাগ্য নামে তাঁহার এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। গুরুর নিকট সৌভাগ্য সূর্য্যদেবের আবাহনমন্ত্র শিক্ষা করিয়া এক দিন নির্জ্জনে ঐ মন্ত্র পাঠ করায় সূর্য্যদেব আবির্ভূত হইয়া সেই কুমারী কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহাতে সৌভাগ্যের গর্ভ সঞ্চার হইল। কুমারী কন্যার গর্ভাবস্থা দর্শনে দেবাদিত্য যার পর নাই শোকাকুলিত হইলেন বটে, কিন্তু যোগবলে তপন-দেবের আবির্ভাব অবগত হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তথাপি প্রতিবেশবাসিগণের নিন্দা ও লোকলজ্জা ভয়ে একজন সহচরী সঙ্গে সৌভাগ্যকে বল্লভীপুরে প্রেরণ করিলেন। গর্ভিণী কালক্রমে যমজসন্তান প্রসব করিল, তন্মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা। বয়োবৃদ্ধি সহকারে পুত্র বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। জন্মের স্থিরতা নাই বলিয়া তিনি তথায় "গৈবি" নামে অভিহিত হইলেন। এক দিন তিনি

অন্যান্য বালকগণের সহিত খেলা করিতে করিতে তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে তাহাদিগের পরিহাসে নিতান্ত বিকলহৃদয় হইয়া মাতৃসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তারস্বরে কহিলেন, "আমার জন্ম সম্বন্ধে যাহা গুহ্য আছে, এবং আমার পিতা কে,এ সমুদায় প্রকাশ না করিলে আমি মাতৃহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেও কুণ্ঠিত হইব না।" এবংবিধ সময়ে সূর্য্যদেব আবির্ভূত হইয়া বালকের হস্তে এক শিলাখণ্ড সমর্পণ করিলেন, এবং কহিয়া দিলেন, এই শিলাস্পর্শে তোমার সঙ্গিবর্গ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তোমার বশীভূত হইবে। বল্লভীপুরের বল্লররাজ গৈবিকে নানাবিধ বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন, বালক শিলা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমেই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া সেই শিলাদ্বারা তাঁহার বধসাধন পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করত শিলা ও আদিত্য সংশ্রবাপন্ন শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করিল। বালকের ভগিনী ভড়োচ রাজের সহিত বিবাহিতা হইল।"*

* তাতার বংশীয় জংঘীজখাঁর পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে এইরূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সূর্য্যদেবের ঔরসে এলানকুয়া নাম্নী কুমারীর গর্ভে নুরাউন (Children of light) জন্মগ্রহণ করেন। ইহারই ক্রমনিম্ন নবম পুরুষ জংঘীজ খাঁ। তদীয় চরিতাখ্যায়ক পেটিস ডিলা ক্রো এবং সারাসীন জাতির ইতিবৃত্তলেখক মারিণী সাহেব, উভয়েই বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জংঘীজ খাঁ শেষ সাসানীয় রাজ ইয়েজ্‌ডিগার্ডের বংশসম্ভূত। জংঘীজ পৌত্তলিক ছিলেন, এবং মুসলমানের নামে ঘৃণা করিতেন। বর্ত্তমান অধ্যায়ে ইয়েজ্‌ডিগার্ডের বংশ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা অনুধাবন পূর্ব্বক পাঠ করিলে রাণাবংশে যাবনিক সংস্রবের আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

আকবরের প্রধান অমাত্য আবুল্‌ ফজল্‌ কহেন, "রাণারা নোশিরোয়ানের বংশসম্ভূত। তাহারা প্রথমে বিরারে আগমন পূর্ব্বক পর্ণালা প্রদেশের অধিনায়ক হয়। শত্রুকর্ত্তৃক উক্ত স্থান অধিকৃত হইলে একটি স্ত্রীলোক শিশুপুত্র ক্রোড়ে করিয়া মিবারে পলায়ন করত মণ্ডলিক ভীলের আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ শিশু ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত উপকারকের জীবন সংহার করত রাজ্যাধিকার করে। ঐ শিশুরই নাম বাপ্পা।"

পারস্যমূল হইতে রাণাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রায় "মাসার উল ওমরা" গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই সারভাগ লইয়া "বিসাট অল জানম" † নামে আর একখানি গ্রন্থ ১৮২৩ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হয়। লেখক আপনাকে "লছমী নারায়ণ সুফেক অরঙ্গবাদী" ‡ বলিয়া পরিচয় দেন। লেখক মহারাষ্ট্ররাজ্য

আরঙ্গজীব একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন; একজন তাঁহার প্রিয় অনুচর তাঁহাকে কহেন, আপনি দেবাংশ সম্ভূত, কারণ এরূপ কিংবদন্তী আছে, তৈমুরবংশীয়দিগের আদি জননী সূর্য্যদেবের ঔরসে গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। আরঙ্গজীব এতদ্বাক্যে যার পর নাই ক্রোধপরবশ হইয়া এরূপ একটি দুর্বাক্য ব্যবহার করেন যে, তাহা আমাদিগের পাঠক পাঠিকাবর্গের পক্ষে নিতান্ত অপাঠ্য বলিয়া আমরা অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

† Display of the foe.
‡ The Rhymer of Arungabad.

সংস্থাপক শিবজীর বিবরণ লিখিবার সময় প্রথমোক্ত গ্রন্থ হইতে রাণাবংশের বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার সার বিবরণ লিখিত হইতেছে।—

“ হিন্দুরাজগণের মধ্যে উদয়পুরের রাজারা সর্ব্বপ্রধান। অন্যান্য হিন্দুরাজগণ সিংহাসনে আরোহণ সময়ে উদয়পুরের রাজাদের নিকট রাজটীকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই রাজটীকা নরশোণিত দ্বারা প্রদত্ত হইয়া থাকে। উদয়পুরেশ্বরদিগের উপাধি রাণা, ইহাঁরা নোশিরোয়ানের * বংশসম্ভূত। ইনি ভারতবর্ষের অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন। নোশিরোয়ান অনেক বিবাহ করেন, তন্মধ্যে রুমের রাজকন্যার † গর্ভজাত পুত্র নোশিজাদ্ পিতার জীবিতাবস্থায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। ইনি বহু অনুচর সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ‡ তথায় বহুসৈন্য সংগ্রহ করিয়া পিতার বিরুদ্ধে পারস্যদেশে যুদ্ধযাত্রা করেন। নোশিরোয়ান নিজ সেনাপতি রণকুশল রম্‌বার্জিনকে নোশিজাদের গতিরোধ করিতে প্রেরণ করিলে উভয় সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, এবং তাহাতেই নোশিজাদ লোকলীলা সংবরণ করেন। কিন্তু তদ্বংশীয়েরা ভারতবর্ষেই ছিলেন, এবং তাঁহাদের সন্তান পরম্পরাক্রমে রাণাবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। চীনদেশীয় খাখানের ¶ দুহিতার গর্ভে নোশিরোয়ানের এক পুত্র হয়, তাহার নাম হর্মজ্। ইনিই নোশিরোয়ানের উত্তরাধিকারী হইয়া পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অগ্নিউপাসকদিগের § মৃত দেহের সৎকার কি

* Noshirwan-i-Adi l(i. c. the Just)

† Kesar of Room—Maurice, Emperor of Byzantium. সংস্কৃত কেশরী শব্দ হইতে সম্ভবতঃ Kesar শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ইহারই অপভ্রংশ Cyar রুস রাজ্যের সম্রাটের উপাধি Sar.

‡ অনেকানেক লেখকের বাক্যানুসারে এরূপ অনুমিত হয় যে, পারসীকেরা বারবার এই ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ৬৩১ খৃঃ অব্দে যখন আবুবিকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে তাহাদের প্রথম আগমন। ৬৫১ খৃঃঅব্দে ইয়েজ্‌দিগার্ডের পতন সময়ে দ্বিতীয় আগমন। ৭৪৯ খৃঃঅব্দে যখন আর্ব্বাসের বংশধরগণ প্রবল হইয়াছিল তখন তৃতীয় আগমন। গ্রন্থে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নোশিরোয়ানের এক পুত্র অষ্টাদশ সহস্র অনুচর সমভিব্যাহারে সৌরাষ্ট্রে উপনীত হইলে তথাকার নরপতি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আবুলফজলের বাক্যে ইহা আরও সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি কহেন, জোরস্তারের মতাবলম্বিগণ পারস্য হইতে পলায়ন করিয়া সৌরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফেরেস্তা হইতে অবগতি হয় যে, কান্যকুব্জাধিপতি রামদেব রাঠোর পারস্যরাজ ফেরোজসাসান কর্তৃক বিজিত হইয়া করদরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। প্রতাপ বলপূর্ব্বক রামদেবের সিংহাসন হরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যথা সময়ে কর প্রেরণে অসমর্থ হওয়ায় নোশিরোয়ান তৎপ্রতিকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। আগমন সময়ে কাবুল ও পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন।

¶ চীনাধিকৃত তাতারের রাজগণ খাখান নামে অভিহিত হইতেন।

§ পারসীকেরা পূর্ব্বে অগ্নির উপাসক ছিল, পরে মুসলমান সংস্রবে সেই ধর্ম্মাবলম্বী

সমাধির নিয়ম নাই, তাহারা মৃতদেহ অনাবৃত প্রদেশে নিক্ষেপ করে। এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, আজি পর্য্যন্ত নোশিরোয়ানের দেহ অবিকৃত রহিয়াছে। "নোশিরোয়ানের পুত্র হর্ম্জ, তাঁহার পুত্র খসরু পরবেজ, তৎপুত্র সারিয়ার তাঁহার পুত্র ইয়েজদ্।"

"ইয়েজদ্ আজিমের শেষ রাজা। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি মুসলমানদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। খলিফা রাজত্বের পঞ্চদশবর্ষে ফিরোকপুত্র বীর্য্যবান্ রস্তম ঘোরতর সংগ্রামে সৈদ্উল খাস কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। উক্ত সৈদ, ওমারের সেনাপতি ছিলেন। এই যুদ্ধে পারস্য দেশীয় সাসান বংশের অভ্যুদয় এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এমন কি, হিজ্রা অব্দের একত্রিংশ বর্ষে যখন মুসলমানেরা পারসীক রাজ্য অধিকার করে, তখন উক্ত রাজবংশের অংশ মাত্রও বিদ্যমান ছিল না। এই চতুরহ্ন-স্থায়ী সংগ্রামে স্বয়ং সৈদের আদেশানুসারে ইলকুম্নার পুত্র হিল্লাল কর্ত্তৃক রস্তম ফিরোকজাদের জীবনাবশেষ হয়। ফরদুসি কহেন, স্বয়ং সৈদই রস্তমের জীবন হরণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে উভয় দলেই প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র লোকের লোকলীলার অবসান হয়। হিজ্রা অব্দের সপ্তদশবর্ষে আবু মুসা, ইয়েজ্দিগার্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র হর্ম্মজের প্রতি আক্রমণ করিয়া ইমান হোসেন সমীপে ইয়েজ্দিগার্ডের এক কন্যা সমভিব্যাহারে হর্ম্জকে প্রেরণ করেন। অপর কন্যাকে আবুবেকারের নিকট পাঠাইলেন।"

লেখক কহেন, "এই পর্য্যন্ত আমি অগ্নি-উপাসকদিগের ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলন করিলাম; যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদিগের গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখুন। জোরস্তারের * পথাবলম্বিগণ এতদ্বিষয় সমুদায়ে জ্ঞানাপন্ন, প্রাচীন বিবরণ ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাহারা দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বতন বিষয়গুলি তাহাদের গ্রন্থমধ্যে সযত্নে প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণ করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল প্রামাণ্য গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে যে, ইয়েজ্দিগার্ডের দুর্ভাগ্য সমুপস্থিত হইবার সময়ে তদীয় পরিবারবর্গ দিক্দিগন্তরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা সেহরবানু, ইমাম হোসেনের সহিত বিবাহিতা হয়; যখন ইমাম হোসেন ধর্ম্মযুদ্ধে পতিত হন, স্বর্গীয় দূত আসিয়া সেহরবানুকে স্বর্গে লইয়া যায়। আরবদেশীয় জনৈক লুণ্ঠনকারীর হস্তে ইয়েজ্দিগার্ডের তৃতীয়া কন্যা বানু পতিতা হয়। আরবদস্যু তাহাকে ত্রিংশক্রোশ দূরবর্ত্তী চিচিকের বন্য প্রদেশে লইয়া যায়। তথায় বানু উদ্ধার কামনায় জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করায় ক্ষণকাল মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। অদ্যাপি ঐ স্থানকে পারসীকেরা পবিত্র বলিয়া সম্মাননা করে †। তদ্দেশপ্রচলিত আছে। যে সকল পারসীকেরা মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছে, তাহারা অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

* প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্মোপদেশক জোরস্তার।

† The secret abode of perfect purity.

চলিত বাহমান মাসের ষড়বিংশ দিবসে পা-রসীকেরা তথায় গমন করিয়া এক মাস কাল কুটীরবাস প্রভৃতি কঠোরব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া থাকে। তথায় এ-কটি পবিত্র প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে, অপ-বিত্র ব্যক্তি স্পর্শ করিলে তাহার জল আর নিঃসৃত হয় না বলিয়া প্রবাদ আছে।”

“ইয়েজ্‌দিগার্ডের প্রথমা কন্যা মহাবান্থু সম্বন্ধে পারসীকেরা কোন সন্ধানই বলিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুদিগের গ্রন্থে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহাবান্থু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই বংশধরগণ শিশোদীয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ রাণারা নোশিরোয়ানের পুত্র নোশিজাদ অথবা ইয়েজ্‌দিগার্ডের কন্যা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।”

রাণাদিগের শরীরে পারসীক শোণি-তের সংস্রব থাকা সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, সে গুলি নিতান্ত হীনপ্রাণ প্রমাণ নহে। নোশিজাদ ৫৩১ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন; বল্লভীপুর ৫২৪ খৃঃ অব্দে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; এই উভয় ঘট-নার সময় সামীপ্যে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আরও প্রমাণিত হইতেছে। মহাত্মা* নোশিরোয়া-নের পৌত্র খস্রু পরবেজ্; ফরহুসি বলেন খস্রুও “মহাত্মা নোশিরোয়ান” এই উ-পাধি ধারণ করেন। বৈজন্টিয়মের যবন † সম্রাট্ মরিসের কন্যা মেরিয়ানার সহিত খ-স্রু পরবেজের বিবাহ হয়। শিরো নামে তাঁহাদের এক পুত্র হয়, ঐ দুর্ব্বৃত্ত পিতার প্রাণবধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করে। সিরো খৃষ্টানদিগের শত্রু ও মিত্রও ছিলেন। শিরোর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়েজ্‌-দিগার্ড সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বি-সাট অল জানম গ্রন্থের বিবরণ বিশ্বাস ক-রিতে হইলে নোশিজাদ হইতে অথবা ইয়ে-জ্‌দিগার্ডের কন্যা মহাবান্থু হইতে রাণাবংশ সমুদ্ভূত হওয়ার বিষয় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট মরিসের কন্যা মেরিয়ানা হইতে রাণারা সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে যাঁহারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন এবং যাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে প্রতাপে প্রতিদ্বন্দ্বী-বিরহিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন, তাঁহা-দের ধমনীতে যে শোণিত প্রবাহিত হই-তেছে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যাঁহারা হিন্দুসূর্য্য বলিয়া রাজকুলচূড়ামণি ছিলেন, তাঁহাদের শরীরে সেই শোণিত বহমান ছিল, এবং অদ্যাপিও তাঁহারা শরীরে সেই শোণিত ধারণ করিয়া মস্তকে সেই ভ্রাতৃগ-ণের পাদুকা বহন করিতেছেন, এই সকল বিষয় পাঠ করিলে কেহবা চমৎকার-সম্বলিত আনন্দরসে নিমগ্ন হইবেন এবং কেহ বা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া লেখককে যার পর নাই অর্ব্বাচীন মনে করিয়া উপহাস করিবেন। আর্য্যমহাবৃক্ষের শাখা প্রশাখা পৃথিবীর তাবৎ ভূখণ্ডের উপরি বিস্তারিত হইয়াছে যে যে স্থানে প্রভুশক্তি বিরাজিত, সেই খা-নেই প্রায় আর্য্যশোণিতের সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়।

* Noshirwan the Great.

† Maurice, the Greek emperor of Byzantum.

চতুর্থ অধ্যায়।

চিতোরজয়ের অনধিককাল পরে বাপ্পা সৌরাষ্ট্র প্রদেশে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য বন্দরদ্বীপের * অধিপতি ইশপগুলের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। সহধর্ম্মিণী সহ প্রত্যাগমন সময়ে তত্রত্য গৃহদেবতা বাণমাতার মূর্ত্তি লইয়া আসেন। এই দেবী অদ্যাপি এক লিঙ্গের সহিত সমভাবে গেহলোটদিগের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। যে মন্দিরে বাপ্পা এই দ্বৈপদেবীকে স্থাপনা করেন, তাহা অদ্যাপি চিতোরশিখরে অন্যান্য কীর্ত্তির সহিত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। উক্ত রাজকুমারীর গর্ভে অপরাজিত জন্ম লাভ করেন। দ্বারকার নিকটবর্ত্তী কালিবা প্রদেশের প্রমররাজদুহিতা কাবার গর্ভে অশিল নামে যে পুত্র হয়, সেইটিই বাপ্পার জ্যেষ্ঠপুত্র ও যথার্থ সিংহাসনাধিকারী। কিন্তু অপরাজিত চিতোরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তৎকাল প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনিই রাজ্যাধিকার লাভ করেন। অশিল † সৌরাষ্ট্র প্রদেশে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তথায় যে বংশবিস্তার করেন, তাহারা অশিলা গেহলোট নামে প্রসিদ্ধ। কালক্রমে ইহাদিগের জনসংখ্যা এতাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, আকবরের সময়ে ইহারা রণস্থলে পঞ্চাশৎ সহস্র অস্ত্রধারী স্বজাতি একত্রিত হইতে পারিত বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন।

ইতিবৃত্ত মধ্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত এমন কোন কার্য্যই অপরাজিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার দুই পুত্র, কালভোজ ‡ ও নন্দকুমার। কালভোজ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপাঙ্কিত তাম্রলিপি পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে নগেন্দ্র পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নন্দকুমার দক্ষিণাপথে গমন পূর্ব্বক ভীমসেনকে হত্যা করিয়া দেবগড়ে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন।

কালভোজের পর তদীয় পুত্র বিখ্যাতনামা খোমান মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ৮১২ হইতে ৮৩৬ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিবিধ কার্য্য কলাপ দ্বারা আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। 'খোমান রস' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইহাঁরই সময়ে প্রচারিত হয়;

---

* কোন কোন লেখকের মতানুসারে ইশপগুল চৌল প্রদেশের রাজা বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ অহুল পত্তনের সংস্থাপয়িতা বেনরাজ সৌরের পিতা হইবেন। কুমারপাল চরিত পাঠে অবগতি হয়, ইহাঁরই পূর্ব্ব পুরুষেরা বন্দর দ্বীপের অধিকারী ছিলেন। এই দ্বীপ ফরাশী সেনাপতি আলবুকার্কের পর হইতে পর্টুগীজ দিগের অধিকৃত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম দেও।

† অশিল কর্ত্তৃক অশিলগড় সংস্থাপিত হয়। অশিলের পুত্র বিজয়পাল সংগ্রাম দাবীর অধিকার হইতে কাম্বে অপহরণ করিবার চেষ্টা করাতে হত হন।

‡ ইহাঁর অপর নাম কর্ণ। ইনিই বোরেলা হ্রদ খাদিত এবং হারীতের তপোবনের উপরি একলিঙ্গের এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত করেন। একলিঙ্গের বর্ত্তমান পুরোহিত হারীত হইতে ষট্‌ষষ্ঠি পুরুষ, কিন্তু মিবারেশ্বরেরা বাপ্পা হইতে দ্বিসপ্ততি পুরুষ হইয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থের সুবর্ণবর্ণশোভিনী পত্রিকাবলী তদীয় কীর্ত্তিকুশতার বিবরণ সমুহে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার একজন উত্তম কবি ছিলেন ; তিনি কবিতাগুলি সমধিক রঞ্জিত করায় গ্রন্থখানি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও ইতিবৃত্ত বিষয়ে অনেক স্থলে ন্যূনকল্প হওয়ায় স্থানে স্থানে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন বটে, তথাপি তাহার মধ্য হইতে সারভাগ গ্রহণ করিলে ইতিবৃত্ত ঘটিত বিবিধ মূলতত্ব সংগৃহীত হইতে পারে। খোমান রস রচয়িতা লেখেন, এই সময়ে মামুদ চিতোর আক্রমণ করেন, খোমান যার পর নাই বলবত্তার সহিত যুদ্ধ করায় মামুদ জয়াশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলে খোমান কর্তৃক বন্দীকৃত হন। মুসলমানদিগের ইতিবৃত্ত পাঠে অবগতি হয় যে, মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৯৯৭ হইতে ১০২৭ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এই দুর্বৃত্তের দুরাচারিতায় ভারতের যে অবনতি হইয়াছিল, বহু আয়াসেও তাহার আর উন্নতি হইল না। খোমান ৮১২ খৃঃঅব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গণনায় ইহার ১৮৫ বৎসর পরে মামুদের প্রাদুর্ভাব ইতিবৃত্তে গ্রথিত হইয়াছে। উভয়ের আবির্ভাব সময়ের নিতান্ত অসঙ্গতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, 'খোমান রস' বর্ণিত মামুদ গজনীপতি দুর্ব্বৃত্ত মামুদ না হইয়া অপর কেহ হইতে পারেন। উহা লিপিকরপ্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা এই ভ্রম নিরাকরণ জন্য বোগ্দাদের খলিফা ও গজনীপতিদিগের সহিত গেহলোটরাজদিগের সময় মিলাইয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ওমার খলিফার সময়ে মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রথম আয়োজন হয়। গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশের বাণিজ্য আয়ত্ত করিবার জন্য টাইগ্রিস নদীমুখে ওমার একটি পোতাধিষ্ঠান ও ব্যবসায়োপযোগি সুন্দর নগর সংস্থাপন করেন। সিন্ধুদেশ অধিকারের জন্য তিনি বিপুল সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, আবুল আশ তাঁহার অধিনায়ক হইয়া যান। অরোর নগরে এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে আবুল আশ নিহত হন। ওমারের উত্তরাধিকারী ওসমান খলিফা ভারতবর্ষ প্রবেশের নিরাপদ পথ ও গিরি শঙ্কটাদির প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভের জন্য জনৈক দূত প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ভারত আক্রমণে সেনা সহ সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার এই বাসনা মনেই বিলীন হইয়া গেল। আলি খলিফার সেনাপতিগণ সিন্ধু প্রদেশে জয়লাভ করেন, কিন্তু আলির মৃত্যুর পরেই তাঁহারা উক্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যান। যখন আবদুল মালেক খলিফা ও ইয়েজিদ্ খোরাসানের শাসনকর্ত্তা, তখনও বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে একাদশ খলিফা ওয়ালিদ হইতে ভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। ওয়ালিদ্ ৭০৫ হইতে ৭১৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোগ্দাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই রাজত্ব সময়ে ৭১৩ খৃঃ অব্দে বাপ্পা জন্ম গ্রহণ করেন। ওয়ালিদ্ প্রায় এই সময়েই সিন্ধুনদী হইতে

গঙ্গা তট পর্য্যন্ত বিস্তারিত প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া তত্রত্য রাজগণকে কর-প্রদ রূপে পরিণত করেন। ৭১৮ হইতে ৭২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খলিফা দ্বিতীয় ওমার বোগ্দাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহাঁর সময়ে সিন্ধু প্রদেশ বিজিত হয়, এবং মহম্মদ নামক জনৈক সেনাপতি কর্তৃক চিতোরের মোরিরাজ আক্রান্ত হন। এই সময়ে মুসলমানেরা এককালে আসিয়া ও ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করে। গঙ্গা ও ইব্রো এই উভয় নদীর তটেই তাহাদিগের জয়পতাকা উড্ডীন হয়, এবং ওদিকে আণ্ডালুস প্রদেশের গথবংশীয় রাজা রোডরিক, এদিকে সিন্ধুরাজ দেশপতি উপাধি বিশিষ্ট ডাহির, উভয়েই মুসলমান হস্তে নিহত হন, আর এই রণস্রোতে উভয় রাজবংশই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ৭১৮ খৃঃ অব্দে সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিম অনেক বার যুদ্ধের পর সিন্ধুরাজ ডাহিরকে হস্তগত করিয়া তাঁহার জীবন হরণ করেন। খলিফার নিকট যে যে লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে ডাহিরের অপরূপ রূপলাবণ্যবতী দুইটি কন্যাও ছিল। মহম্মদ বিন কাশিম এরূপ ভাবিয়াছিলেন যে, এই সর্ব্বললামভূত কন্যারত্ন দুইটি প্রাপ্ত হইয়া খলিফা যার পর নাই প্রীত হইবেন। কিন্তু পরিশেষে বিপরীত ঘটিল, এই কন্যাদ্বয়ই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। * কান্যকুব্জাধিপতি হরচন্দ্রের বিপক্ষে কাশিম যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে দূত আসিয়া তাঁহাকে বোগ্দাদে লইয়া যায়। কোন কোন লেখক কহেন, তিনি যথার্থ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। সিন্ধু প্রদেশ অনেক দিন পর্য্যন্ত খলিফাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। ইহার পর হইতে আল মানসুর খলিফার রাজত্ব-প্রারম্ভের কাল পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্বন্ধীয় কোন বিবরণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পঞ্চদশ খলিফা হোসাম ৭২৩ হইতে ৭৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তদীয় অনুচরেরা ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ফরাসী দেশে আপনাদিগের জয়পতাকা উড়াইবার চেষ্টা করে। সেনাপতি আবদুল রহমান প্রায় কার্য্য সিদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু জয়লক্ষ্মী বিপক্ষ পক্ষের অঙ্কশায়িনী হওয়ায়, তুর নগরের যুদ্ধে চার্লস মার্টেল কর্তৃক পরাজিত হইয়া তদ্দেশলাভের আশা এককালে বিসর্জ্জন দেন। একবিংশ খলিফা আল মানসুর ৭৫৪ হইতে ৭৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁরই সময়ে ৭৬৪ অব্দে বাপ্পা চিতোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক

* রাজকুমারীদ্বয় পিতৃবধ জনিত প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া খলিফা সমীপে সকরুণ বচনে নিবেদন করিল যে, মহম্মদ বিন কাশিম তাহাদের ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছে। খলিফা এতচ্ছ্রবণে যার পর নাই কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কাশিমকে চর্ম্মপেটিকায় বদ্ধ করিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করিলেন। টাট্টা নগরে যখন এই আদেশ উপস্থিত হইল, তখন কাশিম কান্যকুব্জরাজ হরচন্দ্রের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। খলিফার আদেশমত কাশিম আনীত হইলে রাজকন্যারা তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইল। খলিফার আদেশে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হয়।

ইরাণ প্রদেশে প্রস্থান করেন। মুসলমানদিগের দ্বারা সিন্ধুপ্রদেশ বিজিত হইয়া রাজধানী অরোর নগরের নাম মানুস্থুরা হয়। চতুর্ব্বিংশ খলিফা জগদ্বিখ্যাত হারুণ উল রসিদ ৭৮৬ হইতে ৮০৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোগ্দাদের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইনি আপনার বিস্তীর্ণরাজ্য পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া যান। দ্বিতীয় পুত্র আল মামুনের অংশে খোরাসান, জাবুলিস্থান, কাবুলিস্থান, সিন্ধু ও হিন্দুস্থানের বিজিত ভূভাগ পতিত হয়। ৮১৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই গুলি শাসন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করতঃ আপনি খলিফা হয়েন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে খোমান ৮১২ খৃঃ অব্দে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব ভোগ করেন। আলমামুন ৮১৩ হইতে ৮৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোগ্দাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব ইহা একপ্রকার স্থিরতররূপে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে "খোমান রস' গ্রন্থকার চিতোর আক্রমণকারীকে খোরাসানপতি মামুদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা লিপিকর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহা মামুদ না হইয়া মামুন হইবে।

খোমান হইতে ক্রমনিম্ন ষষ্ঠ পুরুষ শক্তিকুমার যে সময়ে চিতোর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে গজনী রাজ্য সংস্থাপিত হয়। শক্তি কুমার হইতে চতুর্থ পুরুষ যশবর্দ্ধের সময়ে সবকৃতগীর পুত্র মামুদ প্রাদুর্ভূত হইয়া উপর্য্যুপরি দ্বাদশবার ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা সম্পাদন করে। মুসলমানদিগের ইতিবৃত্তে যে কয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণের উল্লেখ আছে, তাহাই যে যথার্থ একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না। যে গুলিতে তাহারা কৃতকার্য্য ও সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছিল, সেই গুলিই কেবল ইতিহাস মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। যে গুলিতে তাহারা অপমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে গুলির প্রায় উল্লেখই নাই। এতদ্ভিন্ন খলিফাদিগের অজ্ঞাতসারে প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ সময়ে সময়ে অর্থলোলুপ হইয়া ভারতীয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য সমূহ আক্রমণ করত ধনরাশি লুণ্ঠন করিয়া লইত তাহারও অধিকাংশ মুসলমান ইতিবৃত্তে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এই সকল দস্যুগণ কখন জল-পথে কখন বা সিন্ধু প্রদেশ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিত। ইহারা হিন্দুদিগের দ্বারা সাধারণতঃ ম্লেচ্ছ এবং কখন কখন দানব ও ঐন্দ্রজালিক * বলিয়া অভিহিত

* ইহারা যে ঐন্দ্রজালিক, সে সম্বন্ধে হিন্দুদিগের প্রবল বিশ্বাস ছিল। এতদ্বিষয়ক একটী গল্প পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি। "রোসন্ আলি (১) নামক জনৈক দরবেশ বিটলি গড়ে (২) উপনীত হইয়া রাজভোগের জন্য প্রস্তুত এক পাত্র দুগ্ধে অঙ্গুলি নিমজ্জন করিবা মাত্র তাহার অঙ্গুলি গুলি কাটিয়া গেল। ঐ অঙ্গুলি গুলি মক্কায় গিয়া পতিত হইলে তথাকার সকলে দরবেশের অঙ্গুলি বলিয়া জানিতে পারিল। তৎক্ষণাৎ অশ্ব ব্যবসায়ী বেশে একদল সৈন্য সজ্জীভূত হইয়া আগমন পূর্ব্বক অজমীর আক্রমণ করত রাজার প্রাণ হরণ করে।" চোহান ইতিবৃত্তে এরূপ বর্ণিত আছে যে এই সময়ে অজয় পাল অজমীরের রাজা ছি-

(১) The light of Ali.
(২) আজমীর দুর্গের প্রাচীন নাম।

হইত। ৬৯৪ হইতে ৭২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজপুত দিগের ইতিবৃত্তে কেবল ম্লেচ্ছদিগের আক্রমণই দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদ নামক জনৈক দৈত্যের আক্রমণে যদুভট্টি পঞ্জাবের অন্তর্গত নিজ রাজধানী শালপুর পরিত্যাগ করিয়া শতদ্রুনদী পারে মরু প্রদেশে পলায়ন করেন। সেই সময়েই অজমীরের চোহানরাজ মাণিক রায় মুসলমান দস্যু কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বিগত-জীবিত হন। প্রায় এই সময়েই পঞ্জাব প্রদেশীয় সিন্ধুসাগর সঙ্গমের দোয়াবের অধিপতি খিচিরাজ এবং গোলকুণ্ডা প্রদেশের হরবংশীয় দিগের পূর্ব্ব পুরুষ অধিকারচ্যুত হন। এবারে গজনিবন্দ * হইতে আগত গিরারাম নামক জনৈক দস্যু খলিফার জনৈক শাসন কর্ত্তা ইয়েজিদ্ কর্ত্তৃক পত্তন রাজ্যের সংস্থাপয়িতার পূর্ব্ব--পুরুষ অধিকারচ্যুত হন। খোমানের সময়ে চিতোর রক্ষার্থ যে সকল হিন্দু রাজা সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিবরণ-পাঠে অবগতি হয় যে, উজ্জয়িনীর ন্যায় চিতোরও পর্য্যায়ক্রমে প্রমর রাজদিগের একটি রাজধানী ছিল, এবং প্রমরেরা সে সময়ে হিন্দুরাজ সমাজে সমধিক মাননীয় ছিলেন। †

লেন। শক্রগণ জলপথে আগমন করিতেছে শ্রবণ করিয়া অজপাল কচ্ছ উপকূলে অঞ্জর নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক তথায় জলপথের প্রহরী (১) হইয়া রহিলেন। শত্রুগণের অবতরণ সময়ে তাহাদের গতিরোধ করিতে গিয়া হত হন। এই ব্যাপারের স্মরণার্থে তথায় প্রস্তর নির্ম্মিত অশ্ব পৃষ্ঠে অজয়পালের প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইয়া রক্ষিত হয়। তথায় প্রতি বৎসর একটি মেলা হইয়া থাকে।

* হিমালয় ও গাঙ্গ্য প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

(১) Samoodra ca Chouki.

† মোরি বা মৌরেয় রাজেরা প্রমর বংশের শাখামাত্র। চাঁদ কবির বাক্যানুসারে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, রামপ্রমর এক সময়ে রাজকুলচূড়ামণি ছিলেন। ইহাঁর রাজ্য বিভক্ত হইয়া অনেকগুলি রাজকুল সংস্থাপিত হয়। তাহারা সকলেই মূলপ্রমর রাজের বশ্যতা স্বীকার করে। গ্রীকজাতীয় সেলিউকসের সহিত বিবাহ ও মিত্রতা সূত্রে চন্দ্রগুপ্ত আবদ্ধ হওয়ার পর মৌরেয় বংশের কোন ন্যূনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্রগুপ্ত বেতন দিয়া অনেকগুলি গ্রীককে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গ্রীকশিল্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বারোলীর ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরনিচয়ে গ্রীকমুকুট খোদিত আছে। অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরস্থ কামকুম্ভের গঠনপ্রণালী গ্রীকদিগের অনুকরণ বলিয়া অনুমিত হয়।

রাজগৃহের রাজা শ্রেণিক হইতে নন্দবংশ এবং তাহা হইতে মৌরেয়বংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে। 'কল্পদ্রুম কালকা' নামক এক খানি প্রাচীন জৈনগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, বিক্রমাদিত্যের ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রেণিক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই শ্রেণিক হইতে চন্দ্রগুপ্ত ত্রয়োদশ পুরুষ। শ্রেণিকের পুত্র কোনিক, তৎপুত্র উদসেন, তৎপুত্র ক্রমান্বয়ে নয়জন নন্দ, তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত। ইনি এক মৌর্য্যা নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। যদি শ্রেণিক হইতে শেষ চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেকের রাজত্বকাল গড়ে ২২ বৎসর করিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ২৮৬ বৎসর হয়; ৪৭৭—২৮৬ =১৯১+৫৬=২৪৭। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে খৃষ্টীয় ২৪৭ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত বর্ত্তমান ছিলেন। বেয়ার সাহেবের মতে খৃষ্টীয় ২৬০ অব্দে সেলিউকস ও চন্দ্রগুপ্তের সন্ধি

চিতোরের মোরিরাজের বিপক্ষে মুসলমানেরা যে যুদ্ধযাত্রা করে, গেহলোট যুবক বাপ্পার বাহুবলে তাহা নিবারিত হয়। গজ্‌লিবঁদের দস্যু মথুরার মধ্যদিয়া রাজপুতানায় প্রবেশ করিয়া বাপ্পার বলবিক্রম অসহনীয় বোধ করত সৌরাষ্ট্র এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যদিয়া পলায়ন করে। বাপ্পা তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া নিজ পূর্ব্ব পুরুষদিগের রাজধানী গজনী * নগরে উপনীত হইলেন, এবং দেখিলেন জনৈক ম্লেচ্ছ অসুর তথায় প্রভুত্ব করিতেছে। উহার নাম সেলিম। বাপ্পা তাহাকে তথা হইতে দূর করিয়া আপনার একজন নিকট কুটুম্বকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে যে বাপ্পা ঐ সেলিমের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং এ অনুমান নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ নহে যে বাপ্পা এই সংস্রবে স্বগণ-সন্নিধানে অত্যন্ত হেয় হওয়ায় স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইরাণ প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

চিতোর রক্ষার্থ যে সকল হিন্দুরাজগণ খোমানের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া খোমান রসে বর্ণিত আছে, আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি।—

"গাজুনি হইতে গেহলোট; অশির হইতে তক্ষক; নাতোণ হইতে চোহান; রোহিগড় হইতে চালুক্য; সেতুবন্ধ হইতে জির্ব্বরা; মণ্ডোর হইতে খৈরবী; মাঙ্গরোল হইতে মাকোয়াহানা; জৈতগড় হইতে জোরিয়া; তারাগড় হইতে রেয়র; নরবার হইতে কচ্‌বহ; সাঞ্চোর হইতে কালুম; জোয়ানগড় হইতে দশানো; অজমীর হইতে গর; লৌহদ্বারগড় হইতে চন্দানো; কাসুন্দী হইতে ডর; দিল্লি হইতে তুয়ার; পত্তন হইতে সৌর; ঝালোর হইতে শোনিগরূরা; সিরোহী হইতে দেওরা; গাগ্রোন হইতে খিচি; জুনাগড় হইতে যহু; পাত্রী হইতে ঝালা; কান্যকুব্জ হইতে রাঠোর; ছোটেলা হইতে বল্ল; পুরণগড় হইতে গোহিল; জশলগড় হইতে ভট্টি; লাহোর হইতে বুসা; রোণজা হইতে শঙ্কল; খরলিগড় হইতে সেহৎ; মণ্ডলগড় হইতে নাকুম্প; রাজোর হইতে বৃগুজর; কর্ণগড় হইতে চুণ্ডল; শিখর হইতে শিখরবল;

সংস্থাপিত হয়। ইহা দেখিয়া উক্ত জৈন গ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইতেছে। চন্দ্রগুপ্তের পরলোক প্রাপ্তির পর অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। জৈনধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে অশোক অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারই সময়ে ও তাঁহারই যত্নে উক্ত ধর্ম্ম পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখণ্ডে প্রবেশাধিকার লাভ করে। জৈন ইতিবৃত্তে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার পুত্র কুনল, ও পৌত্র সম্প্রীতি। ইনিও নিজ পিতামহের ন্যায় জৈন ধর্ম্মের অনেক উন্নতি করিয়া যান। ইহার সময় হইতে একটি শকাব্দা চলিয়া অসিয়াছে। অজমীর, আবু, কমলমীর ও গীর্ণার প্রভৃতি স্থানে সম্প্রীতি-প্রতিষ্ঠিত মহাবীরের মন্দির বর্ত্তমান আছে। ইনিই শ্রেণিক বংশের শেষ রাজা।

* গায়নী, গাজনী, বা গাজুনী, এ তিনটিই কাম্বে নগরের প্রাচীন নাম। বর্ত্তমান নগরের ১॥০ দেড় ক্রোশ দূরে উহার ধ্বংসাবশেষ পতিত আছে। আবুল ফজল কহেন গুজরাটের একটি প্রাচীন দুর্গের নাম গজ নগর।

পল্লী হইতে বীরগোটা; খন্তরগড় হইতে জারজা; জীর্গা হইতে থরবর; এবং কাশ্মীর হইতে পরিহার।" এক্ষণে ক্রমান্বয়ে এই গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে;—

গাজুনি হইতে গেহলোটেরা সসৈন্যে আগমন করিলেন। এস্থলে গেহলোটদিগের স্বতন্ত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির চেষ্টা পাইবার প্রয়োজন নাই। মিবারবিবরণের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহাদিগের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইতেছে। তক্ষকেরা যে অশির হইতে আগমন করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে ব্রিটীশ রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছে। নাডোল হইতে সমাগত চোহান ভারতীয় ইতিবৃত্তে বিলক্ষণরূপে প্রসিদ্ধ। শোণিগরুরা ওসিরোহীর দেওরাদিগের আদিপুরুষ বলিয়া ইহাঁদিগের অতিশয় সম্মান। ইহাঁরা অজমীরের রাজবংশের প্রধান শাখা। সেতুবন্ধের জীর্খরা এবং রোহিগড় সম্বন্ধে আমরা কোন প্রামাণ্য বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই। খৈরবীরা মণ্ডোর হইতে আসিয়াছিলেন, ইহাঁরা প্রমরদিগের শাখা মাত্র। কাম্বুন্দী হইতে ডর, ইহা গ্রন্থকারের ভ্রম, দাম্বুন্দী হইতে ডর হওয়া উচিত। দাম্বুন্দী গঙ্গাতটে সংস্থিত। ইহাতে যে দিল্লির তুয়ারদিগর উল্লেখ রহিয়াছে তাহা কবির সম্পূর্ণ ভ্রম। অনঙ্গপাল তুয়ার ৪২৯ সম্বতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার পর ১৯ জন রাজত্ব করিলে চোহানেরা দিল্লির সিংহাসন অধিকার করে। যদি প্রত্যেকের রাজত্ব কাল একবিংশ বৎসর বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও খোমানের সময় পর্য্যন্ত তুয়ারদিগের বর্ত্তমানতা দৃষ্ট হয় না। অহুল পত্তনের সৌররাজ খোমানের সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন। ৯৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পত্তন, সৌরদিগের অধিকৃত থাকে, পরে সোলাঙ্কী রাজের হস্তগত হয়। তাহারই পঞ্চাশৎবর্ষ পরে দ্বিতীয় সোলাঙ্কী রাজ চাওণ্ডের সময়ে দুর্ব্বৃত্ত মামুদ আসিয়া পত্তন আক্রমণ করে। ঝালোর হইতে সমাগত শোনিগরুরা চোহান কুলের একটি বিখ্যাত শাখা, কিন্তু ঝালোর দুর্গ কত দিন তাহাদের অধিকারে ছিল তাহা অভ্রান্তরূপে নিরাকরণ করা যায় না। সিরোহীর দেওরা, গাগ্রৌনের খিচি এবং যশলগড়ের ভট্টি, ইহাঁরা এই সমর ব্যাপারে সমাগত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু লিপিকর দেওরা, খিচি ও ভট্টির স্থান সমাবেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সিরোহী ও গাগ্রৌণ সে সময়ে প্রমরদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল, এবং জশলগড় তাহার প্রায় ৩০০ বৎসর পরে সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদিগের প্রকৃত রাজধানীর নাম অবগত না থাকায় এই ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে। সিরোহী, গাগ্রৌণ ও যশলগড়ের পরিবর্ত্তে ছোটন, সিন্ধুসাগর ও তানোট হইবে। জুনাগড়ের যদুবংশ কৃষ্ণ হইতে সমুৎপন্ন। ইহারা বহুকাল উক্ত প্রদেশের অধিকারী ছিল। সৌরাষ্ট্র আপনার পূর্ব্বস্বামীর সহায়তার জন্য ঝালা, বল্ল ও গোহিলদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল। লাহোরের বুসা জাতি সম্বন্ধে আমরা কোন সন্ধানই প্রাপ্ত হই না। সবক্তগী ও মামুদের আক্রমণ সময়ে লাহোরে জয়পাল ও অনঙ্গপাল বর্ত্তমান ছি-

লেন। মুসলমানদিগের দ্বারা লাহোর উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইলে কতকগুলি পলাতক ব্যক্তি আসিয়া রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। অনেকে অনুমান করেন, ইহারাই বুসা বংশীয়। ফেরেস্তা লাহোর-পতিদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রোণজা হইতে সমাগত শঙ্কল জাতি প্রমর বংশের শাখা বিশেষ; হরবা শঙ্কল মাড়োয়ার মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। রোণজা মাড়োয়ারের অন্তর্গত। খরলিগড় হইতে সমাগত সেহতেরা এক্ষণে নিতান্ত অপরিচিত হইলেও ভট্টিদিগের ইতিহাসে তাহাদের বিশেষরূপে উল্লেখ আছে। সিন্ধুনদের উত্তরে ইহাদের বাস। ভট্টিদিগের সহিত ইহাদের বৈবাহিক ব্যাপার সম্পাদিত হইত, এ কারণ ইহারা রাজপুত বলিয়া স্থিরতররূপে সিদ্ধান্ত হইতেছে। চুগুলদিগের করণগড় এক্ষণে বুন্দেলখণ্ড নামে অভিহিত। কাশ্মীর হইতে সমাগত পরিহারেরা এক সময়ে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহারাই মণ্ডোর হইতে প্রমরদিগকে দূরীভূত করে।

খোমান একজন রণকুশল বীরপুরুষ ছিলেন; তাহাতে আবার এইরূপে বিবৃদ্ধশক্তি হইয়া অসাধারণ বলবত্তার সহিত আক্রমণকারী মুসলমানদিগকে চতুর্ব্বিংশতি বার মহাযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহার প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রেণী ভঙ্গ করত পলায়ন করে। গেহলোট বংশে খোমানের নাম যেন জপমালা স্বরূপ হইয়াছিল। বিপদাপন্ন হইলে লোকে যেমন পরমেশ্বরের নাম লইয়া থাকে, সেইরূপ উদয়পুরে কেহ ওছট খাইলে কি হাঁচিলে কহিয়া থাকে "খোমান তোমার সহায় হউন।" খোমান জীবিতাবস্থায় ব্রাহ্মণবর্গের পরামর্শানুসারে কনিষ্ঠপুত্র যোগরাজকে সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু আবার কি ভাবিয়া রাজপদ পুনঃ গ্রহণ করত উপদেশকবর্গের বধ সাধন করেন। এমন কি তিনি আপনার রাজ্য প্রায় ব্রাহ্মণ-শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। খোমান স্বীয় অন্যতর পুত্র মঙ্গল কর্ত্তৃক নিহত হন; কিন্তু অধ্যক্ষ ও প্রধান পারিষদেরা পিতৃহন্তাকে দূর করিয়া দিলে মঙ্গল উত্তর প্রদেশে গমন পূর্ব্বক তথায় মাঙ্গলি গেহলোট জাতির স্থাপনা করেন।

ভর্ত্তৃভট্ট মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার এবং তদীয় উত্তরাধিকারীর রাজত্ব সময়ে মাইহি হইতে আবু পর্য্যন্ত বিস্তারিত বন্য প্রদেশস্থ যাবতীয় বন্য জাতি বিজিত ও স্বাধিকার মধ্যে নীত হইয়াছিল। এই সময়ে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তন্মধ্যে ধোরংগড় এবং উজরগড় অদ্যাপি আংশিক রূপে বর্ত্তমান আছে, ভর্ত্তৃভট্ট তদীয় পুত্রগণের মধ্যে ত্রয়োদশ জনকে মালব ও গুজ্জর প্রদেশের অন্তর্গত ত্রয়োদশ স্বাধীন জনপদে অধিষ্ঠিত করেন।* তাহাদের সন্তানেরা (ভট্টেরা) গেহলোট নামে পরিচিত।

পাঠকবর্গের রুচিকর হইবে না বলিয়া

* জনপদ গুলির নাম;—কুলনগর, চম্পানীর, চোরেতা, ভোজপুর, লুনারা, নিমখোর, সদারু, গোধগড়, সাঁদপুর, আয়েত্পুর, গঙ্গাভব। আর দুইটির নামোল্লেখ নাই।

অতঃপর আমরা পঞ্চদশ জন মিরার পতির বিবরণ পরিত্যাগ করিলাম। তাঁহারা কেহই ইতিবৃত্তে স্থান পাইবার উপযুক্ত কার্য্য করেন নাই। তবে আমরা এরূপ অনেক প্রমাণ পাইয়াছি যে, অজমীরের চোহান ও চিতোরের গেহলোট ইঁহারা পরস্পর কখন শত্রু কখন বা মিত্রভাবে এতাবৎ কাল অতিবাহন করিয়াছেন। কোয়ারি নামক স্থানে এক ঘোরতর সংগ্রামে দুর্ল্লভ চোহান বর্শি রাওল কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। চোহানদিগের ইতিবৃত্তে এরূপ লিখিত আছে যে, "চোহান রাজেরা এক্ষণে চিতোর-পতির সহিত যুদ্ধ করিবার উপযোগী বলবিক্রম লাভ করিয়াছেন।" আবার কিছু দিন পরেই দুর্ল্লভের পুত্র বিশালদেব রাওল তেজ সিংহের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানদিগের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন।

গ্রীক এবং হিন্দু

উপসংহার। *

হিন্দুও এখন সে হিন্দু নাই; গ্রীকও এখন আর সে গ্রীক নাই। যে ভারত বিধাতার পুণ্যভূমি, জগতের গৌরব, আর্য্যের মাতৃ দেবতা, ভবরঙ্গ-ভূমে নৈতিক মনুষ্যত্বের যে একমাত্র রঙ্গগৃহ, আজি তাহা নির্ব্বাণ দীপ, আজি তাহা কুটিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আর ইহার অদৃষ্ট-আকাশে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অঙ্গিরা আদি উজ্জ্বল তারকারূপে আলোক দান করেন না; সপ্ত-ঋষি অস্তমিত; বুদ্ধদেবও আর পাতকীর পাতকে অশ্রুজল বর্ষণ করিতে আইসেন না। শঙ্করের বেদগান নীরব, উজ্জয়িনীর কলকণ্ঠ নিস্তব্ধ। সকলেই একে একে, ধীরে ধীরে, নষ্ট স্বপ্নবৎ, তিমিরজালে মিশিয়া ভূত-সাগর-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ভারত এখন কঙ্কাল-দৃশ্য, প্রেতনিবাস, চিতাভস্ম-বিলুপ্ত শ্মশান ভূমি, নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ; কেবল নষ্ট-সুপ্তির উন্মত্ত অস্ফুট আরাব মাত্র শ্রুতিবিষয়ীভূত হইতেছে। সে দিন নাই, সে ভারত নাই, বেদমহাভারতগীত ভারতে ভারত-সন্তানেরা এখন পশ্চিম সাগর-পারনিবাসী

* এই প্রবন্ধের 'ধর্ম্মবোধ' এবং 'তত্ত্বজ্ঞান' বিষয়ক আর দুইটি প্রস্তাব এখনও প্রকাশ-যোগ্য করিয়া তুলিতে না পারায় বান্ধবের পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিলাম না। অতএব একবারে উপসংহার ভাগ তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলাম।—লেখক।

রামবল! আমিও বাঁচিলাম। পাঠকবর্গ, আপনাদের কি সৌভাগ্য! এ দুইটি প্রস্তাব হইতে ত রক্ষা পাওয়া নহে, দুইটি বিষম যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়া! আমি বলি, উপসংহারটিরও ঐ দশা হইলে ভাল হইত। আমোদ কর, আহ্লাদ কর, তা ন্যু হয়ে কেবল ভন্ ভন্, এত বকুনি ভাল লাগিবে কেন? এত লেড়ার তুক, এ গৌরাঙ্গের হাটেই মানায় ভাল; আমাদিগের এ চারি পোয়া সভ্যমণ্ডলীতে নহে ইতি।
—বাঙ্গারাম।

বিধর্ম্মী ধর্ম্মযাজকের হস্তে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণে উদ্যত! আর গ্রীক? সে থার্ম্মাপিলি, সে আরাধন-ক্ষেত্র, সে হোমার, সে কদ্রুস, সে পেরিক্লিস, সে লিওনিদা, সে আরিষ্টটল, তাহারা কোথায়? বিধর্ম্মীর পদদলিত, বর্ব্বরের পদাশ্রিত;—যাহাকে বর্ব্বরভ্রমে স্পর্শ করিত না, গ্রীক এখন তাহারই পদলেহন করিতেছে! সূর্য্য, তুমিও তাহাই আছ, তোমার আবর্ত্তনও তাহাই রহিয়াছে, কিন্তু সে দিন, সে সকল মহার্হ রত্ন, কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছ! কালগর্ভে?—তুমিও কি তথায় যাইবে না?

এ পৃথিবীর, এ বিশ্বের, এইই গতি,— এক যায়,আর উঠে; আর পড়ে, আর হয়। এ জগতে কোন বস্তু স্থায়ী নহে। সকলই শক্তিস্রোতে অনন্ত হইতে অনন্ত মুখে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে,ধ্বংস কাহারই হইতেছে না; অথচ আত্ম-সহায় আত্মসর্ব্বস্ব হইয়াও কেহ চলিতে পারিতেছে না। মূলে বিধর্ম্মী পদার্থের যে সামঞ্জস্য কিংবা সংযোগ সৃষ্টিসঞ্চারের কারণ, সৃষ্টির সম্মুখ গতিতেও আজি পর্য্যন্ত সেই একই কারণ অভিনীত হইয়া আসিতেছে; এবং এইরূপ অভিনয়ই অনন্ত কাল পর্য্যন্ত হইয়া যাইতে থাকিবে। পদার্থ-নিকরের গুরু হইতে গুরুতর মিশ্রণ, গুরুতর হইতে গুরুতম মিশ্রণ, এবং তাহাদের সামঞ্জস্যসংযোগ-বশে মূল হইতে পদার্থান্তর রচন; পুনশ্চ পদার্থান্তর হইতে গুরুতর, এবং গুরুতর হইতে গুরুতম পদার্থান্তরের ক্রমোত্তর সম্ভাবনে এই সৃষ্টির অগ্রসারিত্ব, সৃষ্ট পদার্থের ক্রমোত্তর অভিনব ভাব, বিপুলতা, এবং উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আসিতেছে, এবং এইরূপ যাইতেও থাকিবে। মিশ্রণ এবং সামঞ্জস্য সংযোগে যোজনীয় পদার্থনিচয়ের মধ্যে, পরস্পর গুণ-বিনিময়, এবং সামঞ্জস্য-সাধক ত্যাগস্বীকার উদ্দেশে গুণবিকার, অর্থাৎ আত্মসহায় ও আত্মসর্ব্বস্ব ভাবের বিকারের সমুপস্থিতি, আবশ্যক। পার্থিব পদার্থ বিশেষের রাসায়নিক সংমিশ্রণ; এবং সংমিশ্রণ কালিক ভাবান্তর ভাব বারেক ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে মনুষ্য-রসায়নবিদের কারখানায় বারেক যাইয়া দেখিও যে, বস্তুনিচয়ের সংযোগে বস্ত্বন্তর উৎপাদনে, পূর্ব্ব বস্তুনিচয়ের কিরূপ গুণবিনিময় ও গুণবিকারের সমুপস্থিতি হয়। এ বিশ্বরাজ্যেও নিরন্তর বস্তুনিচয় হইতে বস্ত্বন্তর, বস্ত্বন্তর নিচয় হইতে অপর বস্ত্বন্তর, অবিকল সেই নিয়মে, সেইরূপ গুণবিনিময় ও গুণবিকারে, সেইরূপ ভাবে সাধিত হইয়া আসিতেছে। আমরা মনুষ্য-বুদ্ধিতে, স্বেচ্ছাতীত কি আত্মিক কি ভৌতিক, উভয় ব্যাপারেই, এই গুণবিকারকেই সাধারণতঃ 'অসৎ' বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য যে, স্বেচ্ছাসম্ভূত অসৎ, পৃথক মূল হেতু, মনুষ্য পক্ষে পৃথক্। হিন্দু এবং গ্রীকের এখন সেই গুণবিকার-প্রাপ্ত অবস্থা। গ্রীকদিগের অবস্থা, গুণবিকারের পূর্ণতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্ত্তী; অর্থাৎ যথায় গুণবিকার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, বস্ত্বন্তর-নির্ম্মাণ ক্রিয়া আরম্ভ হয়। আর হিন্দু দিগের অবস্থা এখনও গুণবিকারের পূর্ণতা প্রাপ্তির অভিমুখে।

যখন দেখিতেছি যে এই সৃষ্টি, এই সৃষ্টি-স্থিত বস্তুনিকর, ক্রমাগতই অগ্রসর হইতেছে, পশ্চাৎ হটিতেছে না; সকলেই সম্মুখ গতিতে ছুটিতেছে, নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ-মুখে যাইতেছে; তখন অবশ্যই একদিন এখন আশা করিতে পারি যে, এই জাতি-দ্বয়েরও যখন গুণবিকার ও গুণবিনিময় বিলুপ্ত হইয়া উদ্দেশ্য-ভূত ইহাদের অবস্থান্তর নির্ম্মাণ প্রাপ্ত হইবে, তখন অবশ্যই সেই অবস্থান্তর উৎকৃষ্ট, উন্নত, পূর্ব্ব হইতে লোভনীয় এবং সুন্দর হইবে; এবং তাহাতে সন্দেহ অতি অল্প। কিন্তু গ্রীকভাগ্য এখন সমগ্র ইউরোপীয় স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে; সুতরাং ক্ষেত্রবহুলতায়, তাহার ভাবী মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ মোহকরী হইলেও, নগণ্য মধ্যে নিক্ষেপিত হইবার কথা। ভারতের ক্ষেত্র ভূমি পরিসর-প্রাপ্ত হইতে পায় নাই, পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে, অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে গুণবিনিময়ের পূরা বাজার বসিয়াছে। যদি এই সময়ে আমরা সেই বিনিময় কার্য্য যথাযোগ্য পরিমাণে সংসাধন, এবং তাহার সুব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলেই নিশ্চয় জানিও এই জগত ক্ষেত্রে ভারতের জন্য গৌরবের এক অনাগত অভূত-পূর্ব্ব মহাদিন আগত প্রায়।

ভারত সন্তান এই সময়ে কএকটি কথা আছে। যাহা হইবার, তাহা কর্ম্মসূত্রবশে প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় আপনা হইতেই হইতেছে এবং হইবে বলিয়া স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিও না। অদৃষ্টবাদিত্বে ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; তাহার এই বিষময় ফল দেখিয়াও, আর কেন তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাও। তুমি যদিও জড়-প্রকৃতি সম্ভূত বটে, কিন্তু তুমি নিজে জড় নহ। স্বেচ্ছা শক্তি, কর্ম্মশক্তি, উভয় শক্তিতে তুমি শক্তিমান্; সুতরাং তুমিও স্বয়ং প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্রের উপর আর এক কর্ম্মসূত্র বলিয়া আপনাকে জানিও। প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র এবং তুমি কর্ম্মসূত্র, উভয়েরই কর্ম্মগতি যদিও একই মুখে, তথাপি তাহা স্বস্ব কর্ম্মক্ষেত্র-মধ্যে কার্য্য-স্বাধীনতাশূন্য নহে। যে অদৃষ্ট-ভয়ে তুমি নিরন্তর ভীত হইয়া থাক, তুমি জানিও তুমি নিজেই অনেক সময়ে সেই অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা। দৃষ্টি প্রসারিত কর, দেখিতে পাইবে, তুমি একাধারেই প্রকৃতির স্বয়ং অপৃথক অংশ, অথচ তুমি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহার সহায়তাকারী সহায়। যে কর্ম্মজন্য প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, এবং কার্য্য সহায়তা গ্রহণ করিতেছে, এবং সেই কর্ম্ম আবার যাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিতে প্রধাবিত হইয়াছে, নিশ্চয় জানিও তোমার এ সহায়কারিত্বে নিয়োগও তাঁহারই। তাঁহারই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে তোমাকে স্বেচ্ছাশক্তি এবং কর্ম্মশক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। তুমি কেবল যন্ত্র মাত্র নহ, যন্ত্র পরিচালকও তুমি। অতএব এই কর্ম্মক্ষেত্র মধ্যে তুমিও কর্ম্মকারক; স্রোতে গা ঢালিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য সংসার ক্ষেত্রে আইস নাই। আলস্য পরিত্যাগ কর। কুতর্কে আত্ম ধ্বংস করিও না। কর্ম্মরত হও; তুমিও সুধন্য হও; উঠ উঠ তোমার জন্ম ভূমিকেও সুধন্য এবং সুপবিত্র কর।

বাপু বাঞ্ছারাম, তুমি তর্কে ন্যায়পঞ্চা-

নন! তুমি বলিবে কর্ম্মই বা কি, কর্ম্মক্ষেত্রই বা কি, তাহার জন্য এত আড়ম্বর, এত মাথা ব্যথা কেন? কর্ম্মক্ষেত্র যাহা তাহা চাকুরিক্ষেত্রে, কর্ম্ম যাহা তাহা উদর-পূর্ত্তিতে, এবং পরম পুরুষার্থ সুখ-শয়নে। ইহা ভিন্ন আবার কি কর্ম্ম আছে। যদি কিছু থাকে, এই কর্ম্মসাধন করিতে তাহার আপনা হইতে আসিয়া পড়ে পড়ুক! পৃথক চেষ্টা অনাবশ্যক। বাপু, আমার তর্কশক্তি নাই, কিন্তু বারেক মানস-নেত্র প্রসারিত করিয়া দেখিয়াছ কি?

এই পরিদৃশ্যমান, অথচ ধারণার অতীত, অনন্ত গগণসমুদ্রে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কপুঞ্জ নিরন্তর ভাসমান হইয়া ফিরিতেছে, এবং আমরা এই কণিকাবৎ যে ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর অবস্থান করিয়া মোহ প্রমাদে বিশ্বের ঈশ্বরত্বে হস্ত প্রসারণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই পৃথিবীতে আবার কীটাণু, অণু হইতে পরমাণু, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, যে সকল জীবন বা জড় পরমাণু লক্ষিত বা লক্ষ্যাতীত ভাবে অবস্থান করিতেছে; সেই সমগ্র দৃশ্য, সে দৃশ্য যদি কাহারও অনুভব করিবার শক্তি থাকে, দেখিতে পাইবে যে তাহা কি মহান, কি অচিন্তনীয়! উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতম, বৃহৎ হইতে বৃহত্তম; অথবা নিম্ন হইতে নিম্নতম, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, যে দিকে দেখিতে চাও, সকল দিকই অনন্ত প্রসারিণী হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কর, কোন দিকেই কোন বস্তুর অন্ত পাইবার সাধ্য নাই। মনুষ্য-জীবনেও যাহা কৃত, কথিত, কল্পিত, আমাদেরই দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, অথচ আমরাই তাহার অন্ত পাইয়া উঠি না; আমরা আপনাদের অন্তই আপনারা পাইনা। এই নিবিড় অনন্ত পরিবেষ্টিত ও তাহাতেই বর্দ্ধিত ও জীবিত হইয়াও, যাহারা আপনাকে অন্তানুবর্ত্তীরূপে কল্পনা করিয়া, আত্মাতিবাহিত করিয়া থাকে, তাহারা কি ভ্রান্ত!

বাঞ্ছারাম, বিশ্বাস করিবে কি, এই অনন্তদেশ লইয়া তোমার কর্ম্মক্ষেত্র ব্যাপ্ত। এই নিবিড় অনন্ত সাগর-দেশে বৃহৎ এবং দূরতম জ্যোতিষ্ক হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত, জীবিত অজীবিত, যে যাবতীয় পদার্থ নিকর, অনন্ত কাল বাহিয়া, কখনও ডুবিয়া কখনও ভাসিয়া, ভাসমান হইয়া চলিয়াছে; তাহাদিগের আভ্যন্তরীণ পরিচালক মহাশক্তি-রূপী যে ঐশ্বরিক নিয়ম, তাহা সর্ব্বত্র এক; পরিচালনীয় উপকরণ-পদার্থ ভেদে, তদ্বৎ বাহ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ-হেতু, লোক-নয়নে বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ফলতঃ একই নিয়ম সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থকে পরিচালনা করিয়া, একই উদ্দেশ্যমুখে, যথা গতিতে নিয়ন্তার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। ঐ যে আকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক পিণ্ড ঘুরিতেছে, এবং তাহাদের অভ্যন্তরে আবার যে সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কার্য্য হইতেছে, তাহাও যে নিয়ম বশে এবং বিশ্বনিয়ন্তার যে অভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে; আমি যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতলে সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যে সমস্ত কার্য্যরাশির সমুৎপাদন করিতেছি, বা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, তাহাও সেই এ-

কই নিয়মের পরিপোষণার্থে, সেই একই নিয়মে, এবং নিয়ন্তার সেই একই অভিপ্রায়ের সুসিদ্ধির জন্য ইহা জানিও। পর্ব্বত ভাঙ্গিতেছে, সাগর উথলিতেছে, মেদিনী কাঁপিতেছে, পিপীলিকা ঘুরিতেছে, কীটাণু খেলা করিতেছে, এবং তুমি যে ঐ মাথামুণ্ড তর্ক করিতে বসিয়াছ, তাহাও সেই একই অভিপ্রায়ের সুসিদ্ধির জন্য। সকলেই আত্ম-উপযোগিতা ও শক্তি-অনুসারে সেই মহান্ উদ্দেশ্যভূত কার্য্যের অংশরাশি সমুৎপাদন করিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই সকল কি দূরান্তবাহী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে; যেন কেহ কাহারই সহিত কোন সংস্রবযুক্ত নহে, সকলই সম্বন্ধ-শূন্য পৃথক্ পৃথক্, দূরতম দেশ ও কাল-ব্যাপী, কে বলিবে যে ইহাদের একতা-মুখে গতি, এবং কখনও ইহারা একতায় আসিবে কি না। ইহা বুদ্ধির অতীত, দর্শনের অতীত, এবং ধারণারও অতীত। কিন্তু ইহারা আসিবে। অদৃষ্ট চক্র সকল সময়েই এইরূপ দূর-অন্তবাহী হইয়া আবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সময় পূর্ণ হইলে, আয়োজন পূর্ণ হইলে, ঘনীভূত হইয়া যথাকালে যথাকার্য্যের সমুৎপাদনে দৃষ্টিপথে সমাগত হয়। আজিকে যাহা হইতেছে, যুগ যুগান্ত হইতে তাহার আয়োজন এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইয়া আসিয়াছে; এবং যুগ যুগান্ত বাদে যাহা হইবে, আজিকে তাহার আয়োজন হইতেছে; এখন যাহার সহিত কোন সম্বন্ধই দেখিতেছ না, বা একেবারেই লক্ষ্যাতীত রহিয়াছে, কালে তাহাই আবার একতায় আসিবে, সংমিলিত হইবে, এবং সেই সংমিলিত মূর্ত্তি আবার কর্ম্মপথে নব সংমিলনে নবকার্য্য সম্পাদনার্থ কারণ-রূপে কর্ম্মক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ করিবে। এই রূপে ক্রম-আয়োজন, ক্রম-পূর্ণতা, অবিশ্রান্ত একই উদ্দেশ্য-পথে গতি; এবং এই জন্যই দূর হউক অদূর হউক, লক্ষিত হউক বা অলক্ষিত হউক, পরস্পরের মধ্যে একতার সম্বন্ধ বিদ্যমান, অচ্ছেদ্য এবং অবশ্যম্ভাবী। ঐ যে ব্যক্তি বজ্রপতনে আহত হইল, মনে করিওনা যে হঠাৎ বা দৈবাৎ ঐ ঘটনার উপস্থিতি হইয়াছে; বহুকাল হইতে বহুযুগান্ত বাহিয়া উহার জন্য হন্তা এবং হত উভয় দিকেই আয়োজন হইয়া আসিতেছিল, আজিকে তাহার পূর্ণতা প্রাপ্তি হওয়াতে ঐ একতা বা ঐ ঘটনার উপস্থিতি হইয়াছে। হঠাৎ বা দৈবাতের নাম মাত্রও উহাতে নাই।

অতএব বাঞ্ছারাম, ঐ যে আকাশ-ক্ষেত্রে নীহারিকা-পুঞ্জ, অথবা সংসার-ক্ষেত্রে অলক্ষিত বা পরিত্যক্ত পদার্থ নিকর, যাহা দেখিয়া ভাবিতেছ যে তোমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই; তাহাদের সঙ্গে কোন কালে সংস্রবে আসিবারও সম্ভাবনা নাই; তাহা তোমার ভ্রম। উহাদের সঙ্গে তোমাদের সকল সম্বন্ধই আছে, এবং এক সময়ে অবশ্যই একতায় এবং ঘনিষ্ঠতায় আসিবে। সকলেই তোমরা এক ক্রিয়াবাটির কর্ম্মকারক, এখন বিভিন্ন সহরে বিভিন্ন বাজারে বাজার করিয়া ফিরিতেছ মাত্র। যখন বাজার পূর্ণ হইবে তখন ক্রিয়া বাড়ি না যাইয়া কোন্ গোভাগাড়ে উপস্থিত হইবে? এখন তোমার বাজার সে জানিতেছে না, তাহার বাজার তুমি

জানিতেছ না, কিন্তু সকল বাজার যখন আসিয়া একত্র মিলিবে, তখন যদি উপযুক্ত হও দেখিতে পাইবে কাহার বাজার কি জন্য, এবং সেই বাজার সমষ্টি কি পূর্ণ, কি অপূর্ব্ব! এই বিশ্বদেশে তোমরা জড় অজড় সকলেই সেই একই কর্ম্মকর্ত্তার একই কর্ম্মকারক, এবং একই কর্ম্মের অংশ ও পর্য্যায়াদি সমুৎপাদনের নিমিত্ত এই বৈচিত্রময়ী সৃষ্টিতে তোমাদের উৎপত্তি। তোমরা সকলেই এক পরিবারস্থ, কার্য্য-বশে বিভিন্ন দেশে বাস করিতেছ এই মাত্র বিভিন্নতা।

এখন দেখ মানবীয় কর্ম্মক্ষেত্র কি অনন্ত, প্রবাহী, কিরূপ দিগন্ত-প্রসারী; এবং বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতমের মধ্যেও কি সম্বন্ধ, নৈকট্য; এবং আমরা যে বৃহত্তমের নিকট ক্ষুদ্রতমকে বসাইতে বা সংস্রবে আনিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকি, তাহাই বা কি ভ্রম প্রমাদের কার্য্য। যে আবর্ত্তনে সামান্য কীটাণুটি এই মুহূর্ত্তে পৃথিবীতলে শক্তিসঞ্চালিত হইয়া গমন করিতেছে,জানিও, বৈজ্ঞানিক বিবিধ প্রকরণ অধ্যয়নেও জানিতে পারিবে, সেই আবর্ত্তনই আবার ঐ দূর-আকাশস্থ নীহারিকা, এবং তাহার পরেও যদি কিছু থাকে, তাহাকে পর্য্যন্ত শক্তিবিকম্পিত করিতেছে। কি অনন্ত,কি অপরিসীম, কি অচিন্তনীয় কর্ম্মক্ষেত্র। এই অচিন্তনীয় কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মাংশ সম্পাদনার্থে তোমার উপস্থিতি। অনন্ত আয়োজন ফলে তোমার উৎপত্তি; এবং অনন্ত উৎপত্তি তোমার আয়োজন ফলের উপর নির্ভর করিতেছে। এই গুরুভার যাহার উপরে ন্যস্ত, তাহার আত্ম-জীবনের উপর ক্ষণেক অনুধ্যান করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া লওয়া উচিত। এরূপ অপরিমিত নির্ভর যাহার উপরে, সে যদি মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মহানি পূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লয়, তাহার পুরস্কার বা তিরস্কারের জন্য ঈশ্বর যে কি রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। মিথ্যার অর্থ শূন্যতা,—অসৎ বা পাপ। প্রাকৃতিক অসৎ যাহা, তাহা হইতে এ অসৎ স্বতন্ত্র, যেহেতু ইহা স্বেচ্ছাশক্তি-সম্ভূত, সুতরাং স্বেচ্ছাবানও ইহার নিমিত্ত দায়ী। এই শূন্যতা বা অসৎকে আশ্রয় করিলে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই পরিমাণে কর্ম্ম পণ্ড হইয়া থাকে মাত্র;—"নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ।"

কিন্তু বাঞ্ছারাম, তাই বলিয়া মনে ভাবিও না, এবং কীট কীটাণু ঢিল পাটিকেল দর্শাইয়া বলিও না যে,আমি মিথ্যার আশ্রয় লইলেও, নিঃসন্দেহ তাহাদের অপেক্ষা আমার দ্বারা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অনেক কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, সুতরাং আমার জীবনও যে একবারে বৃথা, তাহা কেমন করিয়া বলিব; অতএব কেন আমাকে স্বচ্ছন্দ আহার বিহার হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা পাইতেছ। ঈশ্বর করুন সে চেষ্টা কেহ না পায়, তুমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার কর, কিছুমাত্র আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার পরিমাণ করিও, অবসরকাল অপব্যয় করিও না। এ কর্ম্মক্ষেত্রে কে কত কর্ম্মরাশি সমুৎপাদন করিল, তাহা লইয়া কর্ম্মের পরিমাণ নহে; কে কর্ম্মার্থে কতখানি প্রাপ্ত শক্তির সদ্ব্যয় করিল তাহা লইয়া পরিমাণ।

তাহার পর, বঙ্গ সন্তান সামঞ্জস্য-সমুৎপন্ন মধ্যম গতি কাহাকে বলে, তাহা বড় বুঝেন না। হয় হুজুকে হাটের লেড়া, নতুবা চেষ্টা-শূন্য চালকুমড়া, বাদসাই আলিসে। কর্ম্ম-বুদ্ধির উৎপত্তি হইল যদি, কর্ম্ম কৃত হউক না হউক, চিৎকারে দেশ তোল পাড়; কর্ম্ম বুদ্ধির ন্যূনতা হইল যদি, তবে একবারে অস্তিত্ব-শূন্য জীবনীর চিহ্নমাত্র চিহ্ন পাইবার যো নাই। ধর্ম্মবুদ্ধি হইল যদি, তবে একবারে সন্ন্যাসী, বৈরাগ্যের আধার; না হইল যদি, তবে কাঠনাস্তিক। সকল অবস্থাতেই অদৃষ্টবাদিত্বের উপরেই নির্ভরটা কিছু অধিক। বাঞ্ছারাম, তোমার এ অদৃষ্টবাদিত্ব কোথা হইতে উঠিয়াছে বলিতে পার? আমি যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে নিঃসন্দেহই প্রাকৃতশক্তি এবং স্বেচ্ছাশক্তি এতদুভয়ের সন্ধিস্থল দেখিয়া এই অদৃষ্টবাদিত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সন্ধিস্থল মাত্রেই, সাধারণতঃ সংমিলিত বস্তুদ্বয়কে পৃথক করিয়া বাছিয়া লওয়া দুষ্কর; দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ সন্ধির অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে, পূর্ব্ব বা উত্তর বস্তুর প্রাবল্য হেতু, তাহাতে তৎ তৎ বস্তু-প্রকৃতির আরোপ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু বাপু, তোমার চক্ষু কেবল সন্ধিস্থল দেখিবার জন্য নহে; যদি তাহাকে অতিক্রম করিয়া উভয় সামান্ত-ভাগাভিমুখে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে প্রাকৃতিক শক্তি পৃথক এবং স্বেচ্ছাশক্তি পৃথক। যে অংশ একমাত্র প্রকৃতির ক্রিয়া, তাহাতে তুমি অবশ্যই স্বেচ্ছাশূন্য সুতরাং নির্দ্দোষ। কিন্তু তোমার জবাবদিহী সেই খানে, যথায় ক্রিয়া তোমার মনীষা এবং স্বেচ্ছাশক্তি-সম্ভূত। মানবীয় স্বেচ্ছাশক্তি-সম্ভূত কার্য্য আবার যখন প্রকৃতির অনুসারী এবং প্রকৃতির সহায়-বর্দ্ধক হয় তখনই সেই কার্য্যের সার্থকতা, তখনই সেই কার্য্য অভিপ্রেত হইয়া থাকে, এবং তাহাতে মঙ্গলের সমুৎপাদন হয়। তদ্বিপরীতে তদ্বিপরীত ফল। নিয়ন্তার কর্ম্ম-হানি, নিজের কর্ম্মহানি, উভয়হানি একত্র সমবেত হইয়া কর্ম্মকারককে ব্যাকুলিত এবং ধ্বংসপথে অগ্রসর করাইয়া থাকে। প্রথমোক্ত যে কার্য্য এবং তদর্থে অনুষ্ঠান তাহাই এ জগতে মানবের আত্ম সম্বন্ধে সৎ, তদ্বিপরীতে অসৎ। এখন দেখ, তুমি স্বাধীন হইয়াও তোমার স্বাধীনত্ব কোথায়, তুমি পরাধীন! আবার তুমি পরাধীন হইয়াও স্বাধীন। তোমার কামনা মহান্, কামনার নিকট পরাধীন হইয়াও স্বাধীন, কোন দার্শনিক একথা শুনিলে হয়ত হাঁসিয়া আকুলিত হইবে। কিন্তু হয় হউক, তথাপি উহা তাহাই।

বাপু বাঞ্ছারাম, কি আশ্চর্য্য! প্রতিক্ষণে, তিলে, তিলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, মনুষ্য কার্য্য করিতেছে; অথচ দেখিতে গেলে তাহার একটাও নূতন নহে। নূতনত্ব সত্ত্বেও অনুকরণ মাত্র। যেহেতু আমরা যাহা কিছু করিয়া থাকি, অগ্রে তাহার আভাস বাহ্যজগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া লই, তাহারই অনুমোদন-সাপেক্ষ হই, নতুবা তাহা সুসম্পন্ন হইবার নহে। তুমি বলিবে যে আমি যে এই সুন্দর বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি, ইহা কি নূতন নহে?—তোমার জাগতিক মূর্ত্তির কোন্ মূর্ত্তি এরূপ

আছে যে আমার এই বাড়ী তাহার প্রতিরূপ স্বরূপ হইতে পারে, এবং যাহা দেখিয়া আমি এই বাড়ি নির্ম্মাণের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছি? বাঞ্ছারাম, তুমি যে কথা গুলি বলিতেছ, তাহা সত্য বটে; বিশেষতঃ তুমি যেরূপ মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, যত বাটপাড়ি করিয়া এই বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহাতে কোন বিরূপ কথা বলিতে যাওয়াও নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য। সে যাহা হউক, তুমি যে কথা গুলি বলিতেছ তাহা সত্য বটে; কিন্তু আবার সত্যও নহে, একটু ভাবিয়া দেখ। ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার পাকাবাড়ির বুদ্ধি কি দেখিয়া হইয়াছিল, —কাঁচাবাড়ী! আবার কাঁচাবাড়ী?—টাটীর ঘর দেখিয়া। টাটীর ঘর?—লতা পাতার ঘর দেখিয়া। লতা পাতার ঘর?—সংগৃহীত তাল পাতার নির্ম্মিত আবরণ দেখিয়া। সেই আবরণ আবার কি দেখিয়া?—বলিব?—বিশ্বাস করিবে?—গাছতলা বা বৃক্ষকোটর দেখিয়া। গাছতলা বা বৃক্ষকোটর কাহার?—উহা তোমারও নহে, আমারও নহে; তুমি আমি বহির্ভূত পরিচালিকা মহাশক্তির কার্য্যবশে উৎপন্ন। এখন দেখ তোমার পাকাবাড়ির মূল কোথায়? তুমি বাড়ির যে আকার প্রকার দিয়াছ তাহা নূতন, কিন্তু তাহার যে আভাস গ্রহণ করিয়াছ তাহা গাছতলা বা বৃক্ষকোটর হইতে; সুতরাং এখানে অনুকরণ বা অনুসরণ; এবং অভিপ্রায়ও আত্মভূত হইলেও প্রকৃতি-অনুমোদিত। একটি তোমার স্বাধীনতার পরিচয়, অপরটি তোমার পরাধীনতার পরিচয়। একটি তোমার স্বেচ্ছাশক্তি এবং মনীষাশক্তির সম্পত্তি; অপরটি খাস প্রকৃতির সম্পত্তি। এই রূপই আমাদের সকল বিষয়ে এবং সকল বস্তু সম্বন্ধে। এবং এই রূপেই ঐশ্বরিক মহান্ কামনার নিকট, মানবীয় কামনা পরাধীন হইয়াও স্বাধীন। যথায়ই এই পরাধীনতার বিপর্য্যয়, তথায়ই অসতের সঞ্চার;—কর্ম্ম-পণ্ডতার উপস্থিতি।

তোমার আরও এক অতি প্রিয়তম এবং চিরপোষিত কুতর্ক আছে। তুমি বলিবে, এরূপ না করিয়া এরূপ করিলেইত ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য অনায়াসে সুসিদ্ধ করিতে পারিতেন; এবং তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান, তখন তাঁহার তাহা করিবারও কোন বাধা-ছিল না; বাড়ার ভাগ আমাদিগের এই ক্লেশময় সংসারে হাবু ডুবু খাওয়া হইতে অব্যাহতি হইতে পারিত। প্রথমে জিজ্ঞাসা করি, কে বলিল হাবু ডুবু খাইতে তোমার সৃষ্টি? যদি খাও, তবে সে আপন দোষে। কোথায় দেখিয়াছ নিষ্কর্ম্মা, আলস্যপরায়ণের নিমিত্ত সুখরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে? তাহার পর বলি, ঈশ্বর অনায়াসে সেই রূপ সৃষ্ট করিতে পারিতেন, তাহা সত্য; এবং পারেনও তিনি সকলই, তাহাও সত্য; তবে করেন নাই কি জন্য? —করিতেছেন না কি জন্য?—তাঁহার ইচ্ছা। এরূপ এরূপ করিলে ভাল হইত, ইহা তোমার যুক্তি এবং ইচ্ছা; সেরূপ সেরূপ করিলে যাহা হয়, হইতেছে, এবং হইবে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। অতএব প্রভেদ কেবল ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যে। বলিতে পার এমন কোন লেখা পড়া আছে কি না যে তোমার যুক্তি এবং

ইচ্ছা অনুসারে, ঐশ্বরিক যুক্তি এবং ইচ্ছা শাসিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে? মূর্খ! যদি না থাকে, তবে ক্ষান্ত হও, তোমার তর্কদর্শন দূরে ফেলিয়া দেও। লম্ফযোগে উর্দ্ধগমন শক্তি আছে বলিয়াই, চন্দ্রলোকে যাইতে সমর্থ নহি; আত্মকর্ম্ম বুঝিতে যে যুক্তিশক্তি পাইয়াছি, তদ্দারা ঐশ্বরিক কর্ম্মও যে বুঝিতে সমর্থ হইব, তাহা সম্ভব হইতে পারে কিরূপে? অতএব উদ্দেশ্য লইয়া বাকবিতণ্ডায় রত হইও না। তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মকারক মজুর, মজুরের সঙ্গে কর্ম্মউদ্দেশ্যের সম্বন্ধ থাকিয়া থাকে কবে? যদি অনাহারে ধ্বংস পাইতে না চাহ, যদি বেতন বা খোরাকীর প্রত্যাশা রাখ, তবে কার্য্যরত হও; তোমারও উদর পূর্ত্তি হইবে, কার্য্যস্বামীরও কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এবং প্রতিবেশীবর্গও তোমার জ্বালাতন হইতে রক্ষা পাইবে। পরন্তু খুব ভাল কার্য্য করিতে পার, কার্য্য-স্বামীর প্রিয় হইতে পার, তাহা হইলে একদিন আশা করিতে পার বটে যে, কার্য্য-স্বামী কখনও আদর করিয়া তাঁহার মন্ত্রণা মধ্যে কখনও কখনও তোমাকে লইলেও লইতে পারেন।

আর এক কথা। সংস্কৃত কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যত প্রকারের কর্ম্মভোগ আছে, তাহার মধ্যে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য ক্লেশকর কর্ম্মভোগ আর নাই। অবুঝের জ্ঞান এবং দর্শন সমস্তই লাক্ষণিক, মূলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই; এবং কুতর্কের অস্ত্রশস্ত্র যাহা তাহাও হাতের উপর অনুসন্ধান করিতে বড় একটা হয় না। চুরি করিও না;—অবুঝ বলিল উহা পাপ নহে, যেহেতু অভাব হইতে চুরি, সমাজ কেন তাহার সে অভাব দূর করে নাই? উচ্চ নিসর্গতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া সাধারণতত্ত্বে তুমি উত্তর দেও—'যে লোকধর্ম্ম আপত্তিহীন ভাবে সর্ব্বসাধারণত গৃহীত হইতে পারে, যাহা ব্যক্তিবিশেষের উপকারক হইলেও, সাধারণতঃ অপকারক তাহা পাপ।' অবুঝ হাঁসিয়া উড়াইল, উহা কেবল কথার রাশি মাত্র। যে নিরক্ষর ব্যক্তি অক্ষরকে ক্ষুদ্রাবয়ব কয়লার আঁচড় মাত্র বলিয়া দেখিয়া থাকে, তাহাকে কালিদাসের লেখনীনিসৃত লিখন সমূহের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। এ বিশ্বসংসার ক্রীড়ার বস্তু নহে; মূর্ত্তিমান অচিন্তনীয় ঈশ্বর-প্রতিরূপ। তর্ক করিও না, সেই দর্শনীয় তাহারই উপযুক্ত মানসিক ভাবান্তরে দর্শন ও অনুধ্যান করিতে চেষ্টা কর, তাহাতেই কেবল জ্ঞানপথে সফলতার সম্ভব, নতুবা নহে। ভাগ্যলক্ষ্মী আপনা হইতে স্বয়ম্বরা কোথাও হন না; তাহা হইলে ভাবনা ছিল কি? এ সংসারে বিনা প্রায়শ্চিত্তে কোন বস্তুই লাভের সম্ভাবনা নাই।

বাপু বাঞ্ছারাম, এক্ষণে তোমার সঙ্গে বক্কেশ্বরী ক্ষণেকের জন্য ক্ষান্ত হউক, আমি মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করি।

আমরা ভারত সন্তান, গ্রীকভাগ্য পর্য্যবেক্ষণে আমাদিগের আর তত আবশ্যকতা দেখিতেছি না। ভারতভাগ্য সমালোচন এবং পর্য্যবেক্ষণই আমাদিগের আপাততঃ উদ্দেশ্য, এবং লোকতঃ ধর্ম্মতঃ, উভয়তঃ কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহারই যথা কথঞ্চিৎ

অনুসরণ করা যাউক। তাহাতে ফল আছে।

আমরা যথাযথ সমালোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, ইহ সংসারে গ্রীক্ এবং হিন্দু, স্ব-স্ব সীমান্ত মধ্যে তজ্জাতীয় বিবিধ কারণ সমূহ সমবায়ে, কিরূপ বিভিন্ন স্বভাবে গঠিত, বর্দ্ধিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুজাতি পারলৌকিক গুণ-প্রধান হইয়া নৈতিক মনুষ্যত্বে, সুতরাং প্রকৃতির কোমলতাতেও, শ্রেষ্ঠতা এবং পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; সেইরূপ গ্রীকেরা ঠিক তাহার বিপরীতদিকে লৌকিক গুণ-প্রধান হইয়া, বীরমনুষ্যত্বে, সুতরাং প্রকৃতির কাঠিন্যেও, শ্রেষ্ঠতা এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু স্বভাব পারলৌকিক গুণ-প্রধান, গ্রীক স্বভাব লৌকিক গুণ-প্রধান। হিন্দু ব্রাহ্মণ, গ্রীক ক্ষত্রিয়। কাল বিপ্লব, রাষ্ট্র বিপ্লব, অবস্থা বিপ্লবেও, তাহাদিগের এই স্ব-স্ব স্বভাবের অপলোপ হয় নাই; এবং নিস্তেজও একেবারে হইয়া যাইতে পায় নাই। ইহারা এতৎবিষয়ে এতদূরই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল যে, এখনও পতিত হইয়াও জগতকে স্বভাসে প্রতিভাসিত করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। গ্রীক ভূপতিত হইয়াও সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিক খণ্ডকে জ্ঞান বিজ্ঞানাদির সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে, এবং দিতেছে; এবং সাময়িক প্রভুরা গ্রীককে পদদলিত করিলেও, গ্রীকের শিক্ষা পদার্থকে মস্তকে স্থাপিয়া বেড়াইয়াছে। আর ভারত ঘৃণিত, নিন্দিত, উৎপীড়িত, সপ্তশতবর্ষ পরপদে দলিত হইলেও, তথাপি ভারত আজি পর্য্যন্ত জগতের এক তৃতীয়াংশ মানববর্গকে ধর্ম্মশিক্ষায় দীক্ষিত করিতেছে। ভারতের গৃহলক্ষ্মীগণ একাদশী করিতেছে বটে; কিন্তু স্বার্থত্যাগী পরহিতকারী ভারতের বহিঃশিষ্য গণের আজিপর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় ধর্ম্মাপেক্ষায় সুখসাধ্য ধর্ম্মালোচনায় জীবনাতিবাহিত হইতেছে। সেই গ্রীক এই হিন্দু যাহা এত দিন স্বতন্ত্রভাবে সংস্রব শূন্য হইয়া পরিবর্দ্ধিত বা পতিত হইয়া আসিতেছিল; বিশ্বনিয়ন্তার এবং স্রষ্টার অপরিজ্ঞেয় অভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে, আজিকে পাশ্চাত্য দ্বার দিয়া পরস্পর গুণ বিনিময় ইত্যাদি হেতু, সংমিলিত হইতে আসিয়াছে। একা আইসে নাই, সমগ্র ইউরোপ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব সমুদ্র দূরত্বহীন হইয়াছে; সেখানকার সেখান, এবং এখানকার এখান এক হইয়াছে;—এইরূপই হইয়া থাকে।

কিন্তু পরস্পরের মধ্যে এই অদ্ভুত, অভূতপূর্ব্ব গুণ-বিনিময়ে, গুণগ্রহণে, এবং গুণত্যাগে, তাহাদের মধ্যে স্বভাবেরও কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে? অথবা আর সকলের কথায় এখন কাজ কি, ভারতের কথাই হউক।—তবে কি এখন এই বিনিময় প্রভৃতিতে ভারতের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইবে? তাহা কিরূপে সম্ভবে? উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে ভারত পতিত, পদদলিত, বলতাড়িত হইয়াও আত্ম স্বভাব পরিত্যাগ করে নাই। যদি তখন না করিয়া থাকে, তবে এখনও করিবে না। সংসারে যাহা কিছু লোভনীয়, তাহা যখন একে একে সকলই গিয়াছিল; দুর্দ্দশার ঘোর তরঙ্গ যখন চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিয়াছে;

তখনও, যে ভারত সে সকলেও দৃক্‌পাত-শূন্য হইয়া, মৃত্যুতেও জীবিতবৎ কেবল স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্ম এবং নৈতিক আলোচনা লইয়া ফিরিয়াছে, এবং তাহাতেই জীবনকে পুষ্টি দান করিয়াছে; এবং যাহার প্রভাবে ঘোর মুসলমান-উৎপীড়নের মধ্যেও, চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্মশিক্ষকের উদ্ভব, এবং যাহার প্রভাবে বর্ত্তমান সময়েও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লবের তুফান চলিয়াছে; যে জাতির গৃহনীতি, সমাজনীতি, জীবননীতি, ধর্ম্মনীতি, আর যে কিছু নীতি সকলই লোকনয়নকে তুচ্ছ করিয়া, যথাস্বভাব দেশকাল পাত্রানুরূপ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে; তুমি কি মনে কর, আজিকে উহাদের পাশ্চাত্য সংস্রবে সেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, না পরিবর্ত্তিত হইতে পারে! রক্ত পরিবর্ত্তন করিতে পার, তবে পরিবর্ত্তন কথঞ্চিৎ সম্ভবিতে পারে, নতুবা নহে।

স্বভাব অপরিবর্ত্তনীয়, অথচ এই নিশানিশি হইতে চলিয়াছে; অতএব তখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি,—আমরা কি ইংলণ্ডগামী নবীন যুবকদিগের ন্যায় হিন্দু ঘুচিয়া সাহেব হইব, এবং গৃহলক্ষ্মীদিগকে সাহেবানী সাজাইব; অথবা আমরা যেমন খানসামা সাজিয়াছি, গৃহলক্ষ্মীদিগকে আয়া সাজাইব; না কালের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, পূর্ব্বতন হিন্দুভাবে হিন্দু থাকিতে চেষ্টা করিব? এতদুভয়ের একটিও যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রকৃতিসিদ্ধ নহে। প্রথমতঃ হিন্দুসন্তান সাহেব এবং গৃহলক্ষ্মী সাহেবানী, উভয়ই প্রকৃতির গর্ভস্রাব; ভবরঙ্গভূমে অন্তঃসারশূন্য সং বিশেষ, এবং সংসারকর্ম্মক্ষেত্রে অকার্য্যকর পদার্থ। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বতন হিন্দুভাবে থাকিতে যাওয়া, কালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; এবং সে অসম সংগ্রামে কেহ কখনও জয়লাভ করিতে পারে নাই; বিশেষতঃ প্রাকৃতিক কর্ম্মকটাহে অভাবনীয় পাচনক্রিয়ার বিষয়ীভূত যে, তাহাকে স্বভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব। তবে কর্ত্তব্য কি?

পাঠক, তোমার চিরশ্রুত নৈয়ায়িকের উপন্যাস স্মরণ আছে কি? নৈয়ায়িকের প্রত্যহ লেবু চুরি যাইত, নৈয়ায়িক চোর পাক্‌ড়াইবেন। অতএব ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত হইল যে চোর পালাইবার মাত্র তিন দিক, তাহার একদিকে তিনি দাঁড়াইবেন, সুতরাং সে দিক বন্ধ; অপরদিকে ভ্রাতৃবধূ, অস্পর্শনীয়া, সুতরাং সে দিকও বন্ধ; তৃতীয়দিকে আঁস্তাকুড় অশুচির আকর, সুতরাং সেদিকের ত কথাই নাই; এইরূপে তিনদিকই আবদ্ধ; এখন চোর যাইবে কোথায়! চোর আঁস্তাকুড় ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। পালাইয়া যাউক কিন্তু নৈয়ায়িকের ন্যায়ের দোষ কি? তাহার জ্ঞানদর্শনে ন্যায় ঠিকই হইয়াছিল, এবং চোরও অনুরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে ধরা পড়িতে পারিত। কিন্তু চোর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিল না, এবং এ সংসারে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই বাস করে না। এখানে দোষ ন্যায়ের নহে, দোষ নৈয়ায়িকের বহুদর্শিতার অভাব-ভাবের। নৈয়ায়িকের জানা উচিত ছিল যে চোরও অধ্যাপক নহে, এবং পরস্ত্রী ভ্রাতৃবধূ, এবং আঁস্তাকুড়ও মানে না; ইহা জানিয়া তাহার উপরে যদি ন্যায় খা-

টাইতে পারিতেন, তাহা হইলেই অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। আর এক উপায়ে চোরধৃতির সম্ভাবনা ছিল,—আঁস্তাকুড় ভাঙ্গিয়া চোরের সঙ্গে দোড়; কিন্তু তাহাতে ফল যত হউক না হউক, চোরের সঙ্গে সম অপবিত্রতা, এবং অনভ্যস্ত দৌড়ে শারীরিক ক্লেশাদির প্রাপ্তি ঘটিত বটে। ভারতসন্তান তুমিও আপনাকে এই নৈয়ায়িকের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া জানিও। তোমাকে বলি, অপবিত্রতা এবং অনভ্যস্ত দোড়জন্য ক্লেশাদি প্রাপ্তি,যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে; তুমি যে পবিত্র আর্য্যহিন্দু সেই হিন্দুই থাকিবে,কিন্তু করিবে কি?—তোমার হিন্দুয়ানীকে সঙ্কীর্ণ দর্শন এবং সঙ্কীর্ণকর্ম্মভূমি হইতে উঠাইয়া, বৃহদ্দর্শনভিত্তির উপরে এবং বিশ্বকর্ম্মভূমিতে স্থাপন করিবে। এই বিজাতীয় মিশামিশিতে তদুদ্দেশে উপকরণ সংগ্রহ,এবং তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করাই এই জাতীয় কার্য্যে তোমার কর্ত্তব্য; এবং তদর্থেই বিশ্বনিয়ন্তার নিদেশ অনুসারে তাহারা তোমার দ্বারে উপস্থিত। কর্ম্মবান জীব,কর্ম্মরত হও, আলস্যে বসিয়া থাকিও না, তোমার মঙ্গল হইবে।

এ কর্ম্ম অতি দুরূহ, অথচ এ কর্ম্ম অতি সহজ। বাপু, এ কর্ম্ম তোমার মিল সাংখ্যাদি ন্যায়দর্শনের কথা কাটাকাটি করিলে স্বপ্নেও মনে করিও না যে, তাহা সম্পন্ন হইবে। ন্যায়দর্শন ইহার সংস্রবেও আসিতে পারে না। ইহার নিমিত্ত পার্শ্বগত ও পূর্ব্বগত ভিত্তির উপর,ভক্তিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তার সহিত জ্ঞানদর্শনের একমাত্র আবশ্যক। ইহাতে সমগ্র আত্মস্বভাবের পরিস্ফূর্ত্তি এবং সঞ্চালনের আবশ্যক। যাহার আত্মস্বভাব প্রকৃতিস্থ, তাহার পক্ষে বিভিন্নপ্রকৃতিচেষ্টাসম্ভব সকল কার্য্যের ন্যায়, একার্য্যও নিতান্ত সহজ। কিন্তু যাহার আত্মস্বভাব বিকৃত, তাহার পক্ষে আবার এ কার্য্য তেমনই দুরূহ। এ কার্য্য, বা যে কোন প্রকৃত কার্য্য, সভা করিয়া, সমাজ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কেহ সাধন করিতে পারে না। মিথ্যা বলিও না, একথা সৃষ্টির দিন হইতে সকল নীতিবেত্তাই, শিক্ষা দিয়া আসিতেছে; উহার বাক্যার্থ বুঝিতেও কিছুমাত্র ক্লেশ নাহি; কিন্তু উহা অনুভব করিতে, স্বভাব হইতে পরিহারিত হইতে, প্রকৃতির উন্নতি ব্যতীত কখনও সম্ভব হয় না। প্রতিজ্ঞা করিয়া কেহ কখনও মিথ্যা বলা হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। স্বভাবে অনুরূপ হওন ব্যতীত, প্রতিজ্ঞায় কখনও কোন প্রকৃত কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। কোন প্রকৃত কর্ম্মই এপর্য্যন্ত রাজসিক বা তামসিক চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় নাই। তজ্জন্য সাত্বিক চেষ্টার আবশ্যক। সাত্বিক চেষ্টা বাচাল নহে, সাত্বিক চেষ্টা নির্ব্বাক। রাজসিক এবং তামসিক চেষ্টার ইচ্ছা রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া; সাত্বিক চেষ্টার ইচ্ছা ফলের কামনা পরিত্যাগ করিয়া,যথাবুদ্ধি এবং যথাশক্তি প্রকৃতিকে অনুসরণ করা। সাত্বিক চেষ্টার নিমিত্ত সাত্বিক প্রকৃতির আবশ্যক। ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঘুনন্দন গোস্বামী

বিগত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বান্ধবে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় কবিবর রঘুনন্দন গোস্বামীর জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি; ইহাঁর জীবনী প্রকাশ করিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল এবং তাহা সংগ্রহও করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে রাজকৃষ্ণ বাবু তাহা করিয়াছেন দেখিয়া অনাবশ্যক বোধে তাহাতে নিরস্ত হইলাম; তবে আমার জীবনী সংগ্রহের মধ্যে যে স্থলে কৃত্তিবাস ও রঘুনন্দনের অনুবাদের সহিত মূল বাল্মীকীয় রামায়ণের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছিলাম অদ্য তাহাই বান্ধবের পাঠকবর্গের নিকট উপহার দিতেছি; এইস্থানে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে রঘুনন্দন যে রামায়ণ দৃষ্টে রামরসায়ন অনুবাদ করেন তাহার মূল বঙ্গীয় রামায়ণ। রামায়ণ চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় যথা বঙ্গীয়, বোম্বাই বা পাশ্চাত্য, কাশী,এবং দক্ষিণাত্য; তন্মধ্যে বঙ্গীয় রামায়ণই রঘুনন্দনের আদর্শস্থানীয় ছিল। সুতরাং আমরাও বঙ্গীয় রামায়ণ হইতে শ্লোক-নিচয় উদ্ধৃত করিয়া কৃত্তিবাস ও রঘুনন্দন সেই সেই স্থলের কিরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন করিব। পাশ্চাত্য রামায়ণ হইতে বঙ্গীয় রামায়ণের অনেক স্থলে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং উহা হইতে রাম রসায়নেরও অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; আবার রঘুনন্দন সময়ে সময়ে ভগবান বাল্মীকিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া যেন তাঁহারই অভিমতি অনুসারে বেদব্যাস ও তুলসীদাস হইতে কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থ আরও বিভাসিত করিয়া গিয়াছেন; ইনি বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং আমরা দেখিতে পাই তিনি যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন সেই স্থলেই অন্যান্য অনেক মহর্ষির নিকট হইতেও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান বর্দ্ধমানের সন্নিকট মাড়গ্রাম। ধন্য বর্দ্ধমান! তুমি পূর্ব্বকালে অনেক রত্ন প্রসব করিয়াছ,—অনেক প্রাতঃস্মরণীয় কবি একদা তোমার সুন্দর অঙ্কে শোভা পাইয়াছে, তুমি স্বীয় বক্ষস্থল হইতে তাহাদিগকে পরিপালন করিয়াছ অদ্য তোমার সেই সময়ের পূর্ণ অঙ্ক শূন্য; তাহাদিগকে পরিপোষণ করিয়া সতত আহ্লাদে উৎফুল্ল থাকিতে, অদ্য কতকগুলিকে বক্ষে ধারণ করিয়া দুঃখে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যে বক্ষে মুকুন্দরাম, ঘনরাম, রূপরাম, কাশীরাম, রঘুনন্দন, ভারতচন্দ্র, কমলাকান্ত, নরচন্দ্র, প্রতিপালিত হইয়াছে, আজি সেই বক্ষ শূন্য; ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কবিত্ব বিষয়ে বর্দ্ধমানের মান রক্ষা

করিতে পারে এমন কবি বর্দ্ধমানে কই? বর্দ্ধমানের কবি অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা একটিকে নির্ব্বাপিত দীপের অগ্নি-মুখী বর্ত্তিকা বলিয়া দেখিতে পাই; পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন ইনি কে? আমরা তদ্দণ্ডে উত্তর দিব, ভুবন মোহিনী প্রতিভার নবীন বাবু; আর নাই। যে বর্দ্ধমান বীণা-পাণির সুরম্য বিলাস-কানন ছিল আজি সেই বর্দ্ধমান মহা শ্মশান ক্ষেত্র, ইহা অপেক্ষা বর্দ্ধমান-বাসির অপমানের কথা আর কি হইতে পারে?

পাঠক! আমরা বাল্যকাল হইতে এক খানি রামায়ণই দেখিয়া আসিতেছি;—সেই খানার আদর করিয়া থাকি। কিন্তু বঙ্গভাষায় যে আর একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই; কৃত্তিবাসের রামায়ণ বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে আদৃত ও পঠিত হইয়া থাকে—কিন্তু অদ্য শীর্ষ-দেশে যে মহাত্মার নাম প্রদান করিয়াছি তাঁহার প্রণীত রাম-রসায়ন গ্রন্থ বোধ হয় এপর্য্যন্ত অনেকেরই নিকট অশ্রুত; ইহা অতিশয় লজ্জার বিষয়; এই রামরসায়ন গ্রন্থখানি রামায়ণ অপেক্ষা কখনই নিম্নস্থানীয় নহে। ইহার আকার কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; রাম রসায়নের কাণ্ডগুলি কতিপয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত; সেই সকল পরিচ্ছেদের উপর এক একটি সহজ সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। রঘুনন্দন গোস্বামী বাল্মীকি রামায়ণ বিশেষরূপে পাঠ করিয়া স্বীয় রাম রসায়ন লিখিতে প্রবৃত্ত হন—কেননা দেখিতে পাই মূল রামায়ণের সহিত ইহার অনেকাংশে মিল আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের অধিকাংশ কবির স্বকপোল-কল্পিত; রাম রসায়নও সম্পূর্ণ রূপে এই দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিলেও তাহার এই দোষ পরিহার্য্য; কবি যে স্থানে দেখিয়াছেন এই স্থলে মূলের সহিত ঠিক রাখিতে গেলে লোকের চিত্তরঞ্জক হইবে না তিনি সেই সকল স্থল কোথাও একবারে পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী হৃদয়ের মত করিয়াছেন, আবার কোন স্থলে বেদব্যাস প্রণীত অধ্যাত্ম রামায়ণ, তুলসীদাস-কৃত হিন্দী রামায়ণ বা কোন সংহিতা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্বকপোল-কল্পিত কথঞ্চিৎ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন; তত্রাপি সমুদায় ধরিয়া বলিতে হইলে রামরসায়ন মূল সংস্কৃত রামায়ণের অনুযায়ী; ইহার রচনাও বেশ প্রাঞ্জল এবং ছন্দঃপতন বর্জ্জিত; আমরা মূল রামায়ণ হইতে যে কোন স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহার কৃত্তিবাস ও রঘুনন্দন-কৃত অনুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন রামরসায়ন প্রণেতা কি প্রকার কবি ছিলেন এবং তাঁহার রামরসায়ন কিরূপ গ্রন্থ।

স শ্রুত্বা সমনুপ্রাপ্তং রামং দশরথোনৃপঃ।
তূর্ণং প্রবেশয়ামাস বিবিক্তঃ প্রিয়মুত্তমম্॥
প্রবিশন্নেবচ শ্রীমান্রাঘবো ভবনং পিতুঃ।
দদর্শ পিতরং দূরাৎ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ॥
প্রণমন্তং সমুত্থাপ্য পরিষ্বজ্য ভূমিপঃ।
প্রদিশ্য চাস্মৈ রুচিরমাসনং পুনরব্রবীৎ॥
রামবৃদ্ধোস্মি দীর্ঘায়ুর্ভুক্তা ভোগায়থেপ্সিতাঃ।
মন্ত্রবিদ্ভিঃ ক্রতুবরৈস্তথেষ্টং ভূরি দক্ষিণৈঃ॥
জাতমিষ্টং ত্বপত্যং মে ত্বমপ্যনুপমাস্ত্রবিৎ।

দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ ময়াপুরুষসত্তম॥
অনুভূতান্যপি তথা ধীর রাজ্য সুখানিচ।
দেবর্ষি পিতৃ বিপ্রাণা মনৃণোঽস্মি তথাত্মনঃ॥
নকিঞ্চিন্নাম কর্ত্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনাৎ।
অতস্ত্বাং যদহং ব্রূয়াত্বমেতৎ কর্ত্তুমর্হসি॥
অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপং।
অতস্ত্বাং যৌবরাজ্যেঽহং অভিষেক্ষ্যামি পুত্রক॥
রাত্র্যন্তেচতথা রাম স্বপ্নান্ পশ্যামি দারুনান্।
সনির্ঘাতা মহোল্কাশ্চ পতিতাহি মহাস্বনাঃ॥
উপসৃষ্টঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণৈর্গ্রহৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্য্যাঙ্গারকরাহুভিঃ॥
প্রায়শোহ্যনিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা বা মৃত্যুমাপ্নোতি রাষ্ট্রঞ্চাপদমৃচ্ছতি॥
তদ্যাবদেব চেতোমে নবিমুহ্যতি রাঘব।
তাবদেবভিষিক্ষ্যেত্বাং চলাহি প্রাণিনাংগতিঃ
অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগতঃ পুষ্যাৎপূর্ব্বং পুনর্ব্বসুং
শ্বঃপুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ॥
তত্রত্বমভিষেচ্যশ্চ মনস্ত্বরয়তীব মাম্।
শ্বস্ত্বাহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ॥
তস্মাত্ত্বয়াদ্য ব্রতিনানিশেয়ং নিয়তাত্মনা।
সহবধ্বোপবস্তব্যা দর্ভ সংস্তর শায়িনা॥

বঙ্গীয় রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড (হস্ত লিখিত পুঁথি।)

রঘুনন্দন গোস্বামী এই স্থলের কিরূপ অনুবাদ করিয়াছেন আমরা তাহাই এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি;—

দশরথ আনন্দিত দেখিয়া নন্দনে।
নিজপ্রতিবিম্ব যেন দেখিয়া দর্পণে॥
শ্রীরামে কহিতে নৃপ কৈল আরম্ভন।
শুন শুন বাপ কিছু আমার বচন॥
রাজ্য ভোগ কৈনু আমি অনেক দিবস।
উপস্থিত হলো এবে বার্দ্ধক্য বয়স॥
নানাযজ্ঞে দেব ঋণে পাইলাম ত্রাণ।
ঋষি ঋণে মুক্ত হৈনু করি বেদগান॥
এক মাত্র অবশিষ্ট পিতৃঋণ ছিল।
তোমা ধন হোতে তাও বিমুক্ত হইল॥
অতএব তোরে রাজ্যে অভিষেক করি।
সেবিব শ্রীনারায়ণে যাইয়া বদরী॥
পরমায়ু হোলো নয় সহস্র বৎসর।
প্রায় জরাজীর্ণ হৈল এই কলেবর॥
জনম নক্ষত্রে মোর তিন গ্রহ ক্রূর।
ভোগ করিতেছে রাহুকুজ আর শূর॥
দৈবজ্ঞেতে কহে হ'লে এসব লক্ষণ।
কভু নাহি রহে দেহে প্রাণীর জীবন॥
বিশেষতঃ রাত্রিশেষে নানা দুঃস্বপন।
দেখি বোধ হইতেছে নিকট মরণ॥
কভু স্বপ্ন দেখি যেন মস্তক উপর।
বংশ গুল্ম লতা বৃক্ষ হলো বহুতর॥
প্রেত কাক কুক্কুরাদি করে আচরণ।
ক্রোধে পিতৃলোক কভু করেন ভর্ৎসন
ভস্ম পঙ্ক কূপ আর জল পঙ্ক ময়।
এসকল মাঝে কভু পরবেশ হয়॥
নদীর তরঙ্গে কভু ভাসি ভাসি যাই।
তৈল ঘৃত মাখি কভু কভু তাহা খাই॥
চণ্ডালাদি লোকে কভু করয়ে রন্ধন।
বমন করিয়ে কভু লভি যে কাঞ্চন॥
দেখি চন্দ্র সূর্য্য তারা দন্তের পতন।
প্রদীপ নির্ব্বাণ কভু গিরি বিদারণ॥
রক্তপুষ্পমালা পরি হ'য়ে বিবসন।
উল্কাপাত ভূমিকম্প হয় ঘনে ঘন॥
এইরূপ বহুবিধ দেখি কুস্বপন।
হেন মনে লয় মম নিকট মরণ॥
এসকল উপদ্রব দেখিয়া শঙ্কিত।

তোরে রাজ্যে অভিষেক করিব ত্বরিত ॥

অতঃপর রামচন্দ্রকে দশরথের রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, আমরা এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া কৃত্তিবাস এই স্থলে কিরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন করিতেছি ;—

কতদূর হৈতে রথ করান বিশ্রাম।
পিতার চরণে প'ড়ে করেন প্রণাম ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা শ্রীরামেরে।
সিংহাসনে বসিলেন হরিষ অন্তরে ॥
পিতা পুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে।
পাত্র মিত্র বেষ্টিত সুবেশ নৃপবরে ॥
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেই মত শোভিত হইল রঘুবর।

আর নাই,—ইহাতেই শেষ হইল ; তৎপরে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে ; পাঠক ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন রঘুনন্দন কি প্রকার কবি ছিলেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ মূল বাল্মীকি হইতে অনেক প্রভেদ। রঘুনন্দনও স্থানে স্থানে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি কোন কোন স্থল ইচ্ছা পূর্ব্বক আবার কোন স্থল বা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছেন এমন স্থান আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম ; রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাকে রাজ-সভায় আনয়নার্থ সুমন্ত্রকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন ; শ্রীরামচন্দ্র সভা কুট্টিমে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে আদি কবি তাঁহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে ;—

তদাসনবরংপ্রাপ্য ব্যদীপয়ত রাঘবঃ।
স্বয়ৈব প্রভয়া মেরুমুদয়ে বিমলো রবিঃ ॥
তেন বিভ্রাজতা তত্র সাসভাতিব্যরাজত।
বিমলগ্রহনক্ষত্রা শারদী দ্যৌরিবেন্দুনা ॥
তংস পশ্যন্নরপতি স্তুতোষ প্রিয়মাত্মজং।
অলঙ্কৃতমিবাত্মানং আদর্শতলমাস্থিতং ॥
ইত্যাদি।

ইহার বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ ;—

রাম পিতৃনির্দ্দিষ্ট উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুমেরুর মস্তকস্থিত সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন গ্রহ নক্ষত্র সঙ্কুল শারদীয় অম্বর শশাঙ্কবিম্বে অলঙ্কৃত হয়, রামচন্দ্র সভাসীন হইলে, বশিষ্ঠাদি বিরাজিত রাজ সভাও তখন তদ্রূপ অসামান্য শোভায় বিভূষিত হইয়া উঠিল। লোকে সুপরিষ্কৃত বেশ বিন্যাস করিয়া আদর্শ-তলে প্রতিফলিত আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে যেমন পরিতোষ লাভ করে, প্রাণাধিক রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া মহীপাল দশরথও সেইরূপ অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা। শ্রীগঙ্গা
গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যকৃত অনুবাদ।

রঘুনন্দন এই স্থলের অনুবাদ অন্যরূপ করিয়াছেন ; এবং আমাদের বিবেচনায় তিনি এই স্থলের ঠিক মূলানুযায়ী অনুবাদ না করিয়া এইরূপ করাতে তাঁহার রচনা আরও মিষ্ট হইয়াছে ; তিনি লিখিয়াছেন ;—

সেই রাম মেঘ রাজ, সভা আকাশের মাঝ,
সুমন্ত্র সমীর সঙ্গ বলে।
উদয় করিল আসি, ভূষণের প্রভা রাশি,
সৌদামিনী করে ঝল মলে ॥

তাহে মুক্তামালা ততি, সুললিত বক পাঁতি,
　　মৃদুবাক্য মধুর গর্জ্জন।
সেই মেঘ আগে দেখি, সব লোক নেত্র শিখী,
　　আনন্দেতে করয়ে নর্ত্তন॥
সুখ জল বরিষণে,　　হৃদয়সরসী গণে,
　　সেই জলধর ভাসাইল।
পরিমাণ না পাইয়া,　　সেই জল উথলিয়া
　　ঘর্ম্মছলে বাহিরে আইল॥
সিক্ত হলো তনুশাখী,　　পুলক অঙ্কুর দেখি,
　　পরাণ চাতক উলসিত।
মনমীন সেই জলে, ভাসিয়া ভাসিয়া বুলে,
　　সব তাপ হলো পরাজিত॥
সেই মেঘে বড় এক,　　অদ্ভুত পর তেক
　　দেখি পূর্ণশশী শ্রীলক্ষণ।
শ্রী রঘুনন্দন কয়,　　ইহাতো বিচিত্র নয়,
　　সে জলদ আশ্চর্য্য ভবন॥

কৃত্তিবাস এই স্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই;—

পিতা পুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে।
পাত্র মিত্র বেষ্টিত সুবেশ নৃপবরে॥
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেই মত শোভিত হইল রঘুবর॥

উপরিধৃত অংশ দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে রঘুনন্দনের উদ্ভাবনী শক্তি বিলক্ষণ ছিল; তিনি যে স্থানে দেখিয়াছেন সংস্কৃতের অনুযায়ী করিতে গেলে সুমধুর হইবে না তিনি সেই স্থলেই তাহার অল্প মাত্র ভাব গ্রহণ করিয়া স্বকপোলকল্পিত রচনার সমাবেশ করিয়াছেন। তাহা আমাদের মতে আরও মধুর, আরও মনোহর।

রঘুনন্দনের সংস্কৃতে যে বিশেষ অধিকার ছিল তাহা তাঁহার রামরসায়ন পাঠ করিলেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়; রামরসায়ন পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায় যে, তিনি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কারণ দেখিতে পাই তিনি যে স্থলে সুবিধা পাইয়াছেন সেই স্থলেই অন্যান্য গ্রন্থের নীতি ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া আপনার গ্রন্থকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আমরা একটি স্থল পাঠকগণের নিকট ধরিতেছি, তাহা হইতেই তাঁহারা আমাদের কথার যাথার্থ্য অবগত হইতে পারিবেন। রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার কথা বলিবার নিমিত্ত তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করা হইলে দশরথ তাঁহাকে যে সকল নীতি শিক্ষা দেন তাহা মূল রামায়ণ হইতে বিভিন্ন ও পরিবর্দ্ধিত বটে কিন্তু সেইটি মানবধর্ম্মশাস্ত্রের রাজধর্ম্ম বিষয়ক সমুদয় সপ্তম অধ্যায়ের স্থূল মর্ম্ম; ইহা প্রমাণের নিমিত্ত আমরা রঘুনন্দন হইতে সেই স্থানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

যদ্যপিহ হও তুমি স্বভাবে বিনীত।
তথাপি পিতারে শিক্ষা করাতে উচিত॥
নানা মত নীতিশাস্ত্র করি বিবেচন
সাবধানে সদা কর প্রজার পালন॥
মন্ত্রীজনে অনুরাগ না করিবে হীন।
অমাত্য করিবে শুদ্ধ সুবুদ্ধি কুলীন॥
দুষ্ট মন্ত্রী হতে উপস্থিত হয় ত্রাস।
বুদ্ধিহীন মন্ত্রী হলে হয় সর্ব্বনাশ॥
কদর্য্য মন্ত্রীর সঙ্গে হয় নানা দোষ।
উত্তম অমাত্য হলে সকলের তোষ॥
মন্ত্রী বুদ্ধিভেদ করে শত্রু পক্ষ জনে।
সে বিষয়ে সদা রবে সাবধান মনে॥

শত্রু মিত্র উদাসীন চরিত্র জানিবে।
যথা কালে সন্ধি আর বিগ্রহ করিবে॥
স্ববল লাঘবে সন্ধি করিতে উচিত।
শত্রু বল-হানি-কালে যুদ্ধ প্রশংসিত॥
অধিক নিদ্রার বশ কভু না হইবে।
শেষ রাত্রি জাগি কার্য্য ভাবনা করিবে॥
একা নাহি কদাচিৎ করিবে মন্ত্রণা।
নিশ্চয় না হয় তাহা কেবল ভাবনা।
বহুজন মন্ত্রণা কালেতে ভাল নয়।
সে মন্ত্রণা কোন মতে গুপ্ত নাহি রয়॥
সিদ্ধ না হইলে কর্ম্ম স্পষ্ট না করিবে।
লক্ষ মূর্খ দিয়া এক পণ্ডিত কিনিবে॥
ইত্যাদি।

রামরসায়ন অযোধ্যাকাণ্ড॥

কৃত্তিবাস অতি সংক্ষেপে এই নীতি বিবৃত করিয়াছেন—কিন্তু তাহা কতকাংশে মূলের অনুযায়ী; মূল রামায়ণে বাল্মীকি অতি সংক্ষেপে এই স্থানে নীতি নিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূল রামায়ণে যাহা আছে রঘুনন্দন যে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে। তাহও অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন; তবে অপর স্থল হইতে গৃহীত অংশই এস্থলে অধিক। উপরি ধৃত অংশ দর্শন করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে রঘুনন্দন সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি মূল রামায়ণ বিশেষ করিয়া পাঠ করিলেও সমুদায় রামায়ণটি অনুবাদ করেন নাই; ইহার করুণ রসাত্মক শেষাংশটি বাদ দিয়াছেন; রামচন্দ্রের রাজ্যলাভ বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; তাহার কারণ এই, তিনি শোকময় ভাবে গ্রন্থ সমাপ্তি হয় এরূপ ভাল বাসিতেন না; সেইজন্য সীতা দেবীর পাতালে প্রবেশ ইত্যাদি কাহিনী তাঁহার গ্রন্থে বিবৃত হয় নাই। স্বীয় রুচির বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি যে কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলেন তাহা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, অতএব এজন্য আমরা তাহাকে দোষী করিতে পারি না। যাহাই হউক সমুদায় ধরিয়া বলিতে গেলে আমরা কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণ অপেক্ষা শ্রীমদ্রামরসায়ন উৎকৃষ্ট বলিতে বাধ্য হইব। মূল বাল্মীকি হইতে অনেক বিভিন্ন, এমন কি স্থলবিশেষে আমরা আদি কবিকে ভুলিয়া যাই, এবং যেন কোন নূতন মহাকাব্য পড়িতেছি বলিয়া জ্ঞান জন্মে। তিনি স্থানে স্থানে অনেক নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যথা—মহীরাবণ বধ, অকালে দুর্গোৎসব, লবকুশের যুদ্ধ ইত্যাদি। ইনি রামায়ণের যেরূপ বিপর্য্যয় করিয়াছেন তাহাতে যদি সুকবি না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার নাম বোধ হয় এত দিন জগতীতল হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কেবল সুকবিত্বের গুণেই তিনি মহান আসন অধিকার করিয়া আছেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ মূলানুযায়ী না হইলেও তাঁহার মস্তক হইতে মুকুট নড়াইবার কাহারও সাধ্য নাই। যে মুকুট তিনি বহু দিন হইতে শিরোপরি ধারণ করিয়াছেন—সে মুকুট আর কেহই পাইতে পারেন না। তাঁহার রামায়ণ সংস্কৃতানুযায়ী না হইলেও তাহা যে বঙ্গীয় সমাজে অনেক উপকার সাধন করিয়াছে তাহাতে আর অণুমাত্র

সন্দেহ নাই; বঙ্গদেশ যে সময়ে অজ্ঞান-তামসে সমাচ্ছন্ন ছিল, যে সময়ে বিদ্যার বিমল জ্যোতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হয় নাই, যে সময়ে রামায়ণের বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণগণের হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল, যখন উহার ঘটনাচয় দুই চারিটি পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহই বিদিত ছিলেন না, সেই ঘোরতমসাচ্ছন্ন সময়ে কৃত্তিবাস স্বীয় রামায়ণ রচনা করিয়া বঙ্গীয় সমাজে আলোক প্রবেশ করাইয়াছেন; তিনি যদি সেই সময়ে উহা রচনা না করিতেন তাহা হইলে বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে আজিও রামায়ণের নাম পর্য্যন্ত শ্রুত থাকিতেন কি না সন্দেহ; রামচন্দ্রের অকৃত্রিম পিতৃভক্তি, —লক্ষ্মণের অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহ, সীতার অদ্ভুত সতীত্ব, ইন্দ্রজিতের অপ্রতিহত বীরত্ব, এ সকল আমাদের জ্ঞানপথে আসিত কি না কে বলিতে পারে? কৃত্তিবাস যে বঙ্গসমাজে যুগপ্রলয় সংসাধিত করিয়াছেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; তাঁহার কৃত গ্রন্থ গুণগরিমায় রঘুনন্দনকৃত গ্রন্থ হইতে নিম্নপদস্থ হইলেও প্রথম রামায়ণ রচনায় প্রাধান্য তাঁহার কিছুতেই বিলুপ্ত হইতেছে না; এ বিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে; কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস সমাজের যে উপকার করিয়াছেন তাহা সমাজ কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না; এবং সেই জন্যই তাঁহারা চিরদিন সমভাবে সকলেরই আদর ভক্তি ও পূজার পাত্র হইয়া থাকিবেন; তাঁহাদের শিরঃশোভিত রমণীয় মুকুটের একটি সামান্য কণিকামাত্রও নিপতিত হইবে না, প্রত্যুত যতই জ্ঞানালোক প্রসারিত হইবে ততই তাঁহাদের প্রতি লোকের ভক্তির উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হইবে; শ্রীমদ্রামরসায়ন আধুনিক বলিয়া ততদূর ভক্তির পাত্র নহে, তা বলিয়া ইহা সামান্য আদরের সমাগ্রীও নহে; ইহার সুন্দর অনুবাদ ও প্রাঞ্জল রচনা চিরকালই লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবে। রঘুনন্দন এই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধকালে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" লিখিয়াছেন যে রঘুনন্দন গোস্বামী স্বর্গীয় মহাত্মা রাম কমল সেনের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। সেন মহাশয় অনেকেরই পরিচিত এবং প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; তাহা হইলে রঘুনন্দন সেই সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা নিশ্চয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি রঘুনন্দন বর্দ্ধমানবাসী ছিলেন; ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান বাসীগণের কলিকাতা যাওয়া কিরূপ কষ্টকর ছিল তাহা যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই জানেন এবং সেই দুর্গম পথ একজন বিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবার পক্ষে সম্পূর্ণ রূপেই অগম্য ছিল। বিশেষতঃ রঘুনন্দন যখন বর্দ্ধমান হইতে যাইয়া কলিকাতায় প্রতিপত্তি লাভ করেন তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ৪০ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। তাহা হইলেই তিনি ন্যূনাধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে অথবা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন এরূপ অনুমান সর্ব্বথা অযৌ-

ঠিক না হইতে পারে ; এখন দেখা গেল রঘুনন্দন বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম সময়ের লোক ও তাঁহার রামরসায়ন একখানি আধুনিক গ্রন্থ।

শ্রীমদ্রামরসায়ন আধুনিক গ্রন্থ হইলেও তাহা সামান্য মান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে ; বাস্তবিক ভাষান্তর হইতে অনুবাদ করার যে ক্ষমতা তাহা রঘুনন্দনের বিলক্ষণ ছিল ৮ তিনি সে জন্য বিশেষ সম্মান পাইবার উপযুক্ত। রামরসায়নের আর একটি গুণ এই যে, ইহাতে সংস্কৃতের অনুযায়ী সর্গ বিভাগাদি আছে। কৃত্তিবাস বা তুলসীদাসকৃত অনুবাদে তাহা নাই ; রঘুনন্দনের পরিচ্ছেদবিভাগ ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী না হইলেও যখন কৃত্তিবাস প্রভৃতি আদৌ সে ভাবে পরিচ্ছেদ বিভাগ করেন নাই তখন রঘুনন্দন সে বিধায় মান পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই ; রামরসায়ন নিম্ন লিখিত মত পরিচ্ছেদে বিভক্ত যথা মূল বঙ্গীয় রামায়ণ আদিকাণ্ডে ৮১টি অধ্যায় আছে, ইহাতে তৎস্থলে ১২, এইরূপে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০, অরণ্যকাণ্ডে ৮, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ১০, সুন্দরাকাণ্ডে ১২, যুদ্ধকাণ্ডে ৩৬ এবং উত্তরাকাণ্ডে ১৮টি অধ্যায় আছে। শ্রীমদ্রামরসায়নের আর একটি গুণ এই, ইহা প্রায়শঃ ছন্দ-পতন বর্জ্জিত এবং রচনা বেশ প্রীতিপ্রদ ও প্রাঞ্জল ; তবে যে মধ্যে মধ্যে দুই একটি অপ্রাঞ্জল লেখা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা অতি সামান্য ; এমন কি তাহা গণনার মধ্যেই আইসে না ; ইহাতে গ্রাম্যতা দোষের সংস্পর্শ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রঘুনন্দনের পিতার নাম কিশোরীমোহন গোস্বামী এবং মাতার নাম উমাদেবী। ইনি আপনার বংশের একটি রীতিমত তালিকা দিয়াছেন অনাবশ্যক বোধে তাহা উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

প্রকৃতিবিজ্ঞান।

এবৎসর কলিকাতায় শীতের আতিশয্য বিশেষ অনুভূত হয় নাই। পৌষ মাসের শেষ না হইতেই আম্র তরু মুকুলিত ও নিম্বু কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বসন্তের অগ্রদূত কোকিলকুল দক্ষিণানিল ভ্রমে উত্তর মারুতে সুস্বর লহরী বিস্তার করিয়া ছিল। গত বৎসর এরূপ হয় নাই ; তৎপূর্ব্ব বৎসর এরূপ ছিল না। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কেনই বা এক বৎসর অধিক শীত, কেনইবা অন্য বৎসর অল্প শীত, কেনইবা এক বৎসর অধিক বর্ষা, কেনইবা অন্য বৎসর অল্প বর্ষা। কি কারণেই বা এক বৎসর কোন স্থান বিশেষ শস্য-পূর্ণ, এবং অপর বৎসর দুর্ভিক্ষে

পীড়িত। সৃষ্টি কি কার্য্যকারণসম্বন্ধবিচ্ছিন্ন? যে জন প্রতিপদ তিথি হইতে চন্দ্রের দিন দিন বৃদ্ধি না দেখিয়াছেন, তিনি কিরূপে উহার ষোড়শকলা পূর্ণ পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন? জগৎ অসম্পূর্ণ নহে, আমাদিগের বিজ্ঞতাই অসম্পূর্ণ।

পৃথিবী সতত পরিবর্ত্তনশীল—প্রতিক্ষণ উন্নতির পথে ধাবমান; সুতরাং সর্ব্বত্র একরূপ ফল সততই দৃষ্ট হয় না। অদ্য নভোমণ্ডল নিবিড়মেঘাচ্ছন্ন—বিদ্যুত আলোকে মুহুর্মুহুঃ আলোকিত; বায়ু উত্তর-পূর্ব্ব, শীতল; বৃষ্টিধারা মুষলধারে পতিত। দুই দিন পরে আকাশ নির্ম্মল; সূর্য্য প্রখর; বায়ু দক্ষিণবাহী; মহীতল অভিতপ্ত। তাপ ও শৈত্য—অন্ধকার ও আলোক—মৃদু বায়ু ও ঝটিকা—মেঘ ও নির্ম্মলতা—অনাবৃষ্টি ও মহাপ্লাবন—তাড়িতের আধিক্য ও অল্পতা—শিশির হিম, তুষার ও কুজ্‌ঝটিকা—ঋতুপর্য্যায় ভ্রমণ—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য—উন্নতি। পরিবর্ত্তনে ক্ষয়—পরিবর্ত্তনই পূরণ—পবিবর্ত্তনে সমতার রক্ষা,—জীবগণের জীবন রক্ষা ও তাহাদিগের মঙ্গল সাধন—পরিবর্ত্তনই জগতের উন্নতি। সংসার সতত পরিবর্ত্তনশীল হইলেও নির্দ্দিষ্ট অক্ষয় নিয়মাবলীর নিতান্ত পরতন্ত্র,—দৃষ্টি মাত্রই উপলব্ধি হইবার নহে, অথচ বিশ্বাসে পরিতুষ্ট হইবার নহে; কিন্তু বিশ্বস্ত হৃদয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত দর্শন ও চিন্তা করিলে সমস্ত পরিবর্ত্তনই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, এবং মঙ্গল ইচ্ছার পরিচায়ক। জননীর কদাচিৎ সরোষ মুখমণ্ডল, তাঁহার পরুষ বাক্য বা নির্দ্দয় প্রহার,—বালক তাঁহার স্নেহময় হৃদয়ের মঙ্গল বাসনা তৎকালে উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হউক, বৎসরান্তরে, সময়ান্তরে তাহা অবিদিত থাকিবার নহে।

পৃথিবীস্থ জীবমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যই জগৎ রাজ্যের সম্পত্তি, শোভা ও সুনিয়ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম। অতীত বিষয় সকল বর্ত্তমানে নিয়োজিত করা,—বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করা,—অসীমের সীমা নির্দ্দেশ করা ও অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎগোচর করা মনুষ্যেরই একমাত্র ক্ষমতা। তাঁহার এই অদ্ভুত ক্ষমতা স্মৃতি, বিবেক ও কল্পনার ফল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কতিপয় শিকারীরা ডাক্তর পিনোলের নিকট একটি জন্তু লইয়া আসিয়াছিল। উহার বাক্‌শক্তি ছিল না। লোকে উহাকে 'অভিরণের ক্ষুদ্র অসভ্য' বলিয়া ডাকিত। এই জন্তুটি কি মনুষ্য বা কোন ইতর জীব? পণ্ডিত ডাক্তর ইটার্ড সাহেব উহার সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। তিনি কহেন উহা মূক ও বধির লোকদিগের উদ্যানে কখন কখন নামিয়া ঝরণার এক পার্শ্বে বসিয়া দুলিতে আরম্ভ করিত; কিয়ৎক্ষণ পরে উহার অঙ্গ সঞ্চালনা রহিত ও মুখমণ্ডল অতীব দুঃখিত ভাব অবলম্বন করিত। এইরূপ অবস্থায় উহা কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া সময়ে সময়ে শুষ্কতৃণ বা পত্র জলরাশিতে প্রক্ষেপ করিত। রাত্রিকালে সুধাংশুর রজত কিরণ উহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, উহা বাতায়নের উপর আসিয়া নিস্তব্ধে,

কৌতূহল নেত্রে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে চন্দ্রমা ও সম্মুখস্থ উদ্যানের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। এই 'ক্ষুদ্র অসভ্য' অবশ্যই মানুষ; কেননা বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্য মনুষ্য হৃদয় ভিন্ন কি অপর কোন জীবের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারে? মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জীবে এরূপ কৌতূহল ও চিন্তার কার্য্য লক্ষিত হইতে পারে?

মনুষ্য পশুবৎ অবস্থায় চিরদিন থাকিবার নহে। তাঁহার মানসিক ক্ষমতা সকল এরূপ পরিস্ফুট যে পৃথিবীতে তিনি অতি অল্প কালও অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিতে পারেন না সুতরাং তিনি যে ক্রমশঃ উন্নতি সোপানে উঠিবেন ও জ্ঞানালোকে আপন চিত্ত আলোকিত করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? বরং এইরূপ করাই তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। পরন্তু জগতের নিয়মাবলীর সহিত তাঁহার সুখ দুঃখের নিত্য সম্বন্ধ থাকাতে, উহাদিগের ক্রমশঃ উপলব্ধি ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি। প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়মাবলীর পরিচায়ক, শত শাখাভূত হইলেও উপস্থিত সময়ে ইউরোপ খণ্ডে Meteorology শব্দে যে দর্শনশাস্ত্র বুঝায় উক্ত পদ আমরা উহাতেই প্রয়োগ করিতেছি; তাহার কারণ এই যে ইহা কেবল বায়ু বা উল্কা, তাপ বা তাড়িত, উদ্ভিদ্ বা রসায়ন, জ্যোতিষ বা ভূবিদ্যা প্রভৃতি এক একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র নহে। ইহা উক্ত শাস্ত্র সকলের বিষয়ীভূত নিয়মাবলী লইয়া একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শারীরতত্ত্ব।

ঋতুবিবরণ।

নারীজাতির শরীর-প্রবাহী যে শোণিত যথা নিয়মে মাসৈক কালান্তরে এক একবার প্রবিস্রুত হয় তাহারই নাম 'আর্ত্তব'। ঐ আর্ত্তব শোণিত বায়ু দ্বারা ধমনীপথে চালিত হইয়া যথাকালে যোনিমুখে নির্গত হইলেই উহাকে 'রজোদর্শন' বা 'ঋতু' বলা যায়। (১)।

বর্দ্ধিত-শরীরা ও বর্দ্ধিতধাতু (রসরক্তাদি) রমণীগণের দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইতে আর্ত্তব প্রবৃত্তি আরব্ধ হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে শরীর জরাজীর্ণ হইলে (*) উহা (আর্ত্ত-

(১) মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবং। ঈষৎকৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চবায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ। (সুশ্রুতঃ)

* ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে দ্বাদশবর্ষ আর্ত্তব প্রবৃত্তির সম্ভাবিত কাল মাত্র। বস্তুতঃ শরীর ও রসরক্তাদি ধাতুর বৃদ্ধিই আর্ত্তব প্রবৃত্তির কারণ, যখন উহার বৃদ্ধি হইবে তখনই আর্ত্তব দর্শন হইবে। সুতরাং কোন কোন অবলার একাদশবর্ষ বয়সে কাহারও বা ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশবর্ষ

বপ্রবৃত্তি) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১)।

আর্ত্তব-স্রাবদিন হইতে ষোড়শরাত্রি পর্য্যন্ত কালকেই ঋতুকাল বলা যায়। তন্মধ্যে প্রথম তিন দিবস অতিবেগে শোণিত প্রবাহিত হয়, তৎপরে কাহারো অল্প অল্প দৃষ্ট হইয়া থাকে, কাহারো বা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্তই গর্ভগ্রহণের যোগ্যকাল। (২)

যেমন দিবা অবসান হইলে পদ্মিনী সংকুচিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঋতুর ষোড়শ রাত্রি অতীত হইলেই গর্ভাশয়ের দ্বার সংকুচিত হইয়া যায়। সুতরাং তৎপরে পরবর্ত্তি ঋতুকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না।(৩)

গর্ভাবস্থায় আর্ত্তব দর্শন না হওয়ার কারণ এই যে আর্ত্তব-স্রাবিণী নাড়ীর পথ গর্ভ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং আর্ত্তব নির্গত হইতে পারে না। ঐ সংরুদ্ধ আর্ত্তবের কিয়দংশ সঞ্চিত হইয়া অমরা (ফুল) রূপে পরিণত হয়। এই অমরার সহিতই গর্ভস্থ শিশুর নাভিনাড়ী সংলগ্ন থাকে। অবশিষ্ট অংশ স্তন্যবাহিনী নাড়ী দ্বারা স্তনদ্বয়ে নীত হয়। এই কারণেই গর্ভিণীর স্তনযুগল, অপেক্ষাকৃত পীন ও উন্নত হইয়া থাকে। (৪)

ঋতুমতীর লক্ষণ।

ঋতুমতী হইলে মুখ কিঞ্চিৎ পীন ও প্রসন্ন হয়, এবং দন্ত ও মুখবিবর ক্লেদযুক্ত হয়, বাক্য অপেক্ষাকৃত সুশ্রাব্য হয়। এবং কুক্ষি, চক্ষুঃ ও কেশ শ্লথ হইয়া পড়ে, ভুজ দ্বয়, স্তনযুগল, কটীদেশ, নাভি, উরু, জঘন ও নিতম্ব স্থান ঈষৎকম্পান্বিত হয়। এবং পুরুষ সংসর্গে অত্যন্ত অভিলাষ জন্মে, এবং চিত্ত হৃষ্ট ও ঔৎসুক্য পরায়ণ হইয়া থাকে। (৫)

ঋতুমতীর পরিত্যাজ্য।

ঋতুমতী হইলে প্রথম তিন দিবস, দিবা নিদ্রা, নেত্রে অঞ্জন ব্যবহার, স্নান, অশ্রুপাত, অনুলেপন (গাত্রে গন্ধদ্রব্য লেপন) তৈলাদি মর্দ্দন, নখচ্ছেদন, প্রধাবন (বেগেগমন), অতিশয় হাস্য, অধিকবাক্য কথন, উচ্চ শব্দ শ্রবণ, অবলেখন (চিরুণী প্রভৃতি দ্বারা চুল আচঁড়ান্), অধিক বায়ু সেবন,

বয়সে কিংবা তদধিক কালেও রজোদর্শন হইয়া থাকে। এইরূপ পঞ্চাশৎবর্ষও আর্ত্তব ক্ষয়ের সম্ভাবিত কাল, বস্তুতঃ শরীর যখন জরাজীর্ণ হইবে তখনই আর্ত্তব ক্ষয় হইবে। সুতরাং পঞ্চাশৎবর্ষের পূর্ব্বেও শরীর জরাজীর্ণ হইলে আর্ত্তব ক্ষয় হইতে পারে। এবং পঞ্চাশৎবর্ষের পরেও শরীর সবল থাকিলে আর্ত্তব প্রবৃত্তি থাকিতে পারে।

(১) তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমান মসৃক্পুনঃ। জরাপক্ক শরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং। (সুশ্রুতঃ)

(২) আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শরাত্রয়ঃ। গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩) নিয়তং দিবসেঽতীতে সংকুচত্যম্বুজং যথা। ঋতৌব্যতীতেনার্য্যাস্তথযোনিঃ সংব্রিয়তে তথা। (সুশ্রুত)

(৪) গৃহীতগর্ভাণা মার্ত্তববহানাং স্রোতসাং বর্ত্মান্যবরুধ্যন্তে গর্ভেণ, তস্মাৎ গৃহীতগর্ভাণা মার্ত্তবং নদৃশ্যতে। ততস্তদধঃ প্রতিহত মূর্দ্ধমাগতং অপরঞ্চোপচীয়মান মমরেত্যভিধীয়তে। শেষঞ্চোর্দ্ধতর মাগতং পয়োধরাবভিপ্রতিপদ্যতে। তস্মাৎগর্ভিণ্যঃ পীনোন্নতপয়োধরা ভবন্তি। (সুশ্রুতঃ)

(৫) পীনপ্রসন্নবদনাং প্রক্লিন্নাত্মমুখদ্বিজাং। নরকামাং প্রিয়কথাং স্রস্তকুক্ষ্যাক্ষিমূর্দ্ধজাং। স্ফুরদ্ভুজকুচশ্রোণিনাভ্যূরুজঘনস্ফিচং। হর্ষৌৎসুক্যপরাঞ্চাপি বিদ্যাদৃতুমতীমিতি॥ (সুশ্রুতঃ)

অধিক পরিশ্রম প্রভৃতি কার্য্য সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা বিধেয়। কারণ ঐ সমস্ত আচরণ দ্বারা আর্ত্তব-শোণিত দূষিত হইয়া নানাবিধ অনিষ্ট করিতে পারে। (১) বিশেষতঃ ঋতুকালে উপবাস, ভয়, রুক্ষসেবন, মল মূত্রাদির বেগধারণ, স্তম্ভন ও বমন প্রভৃতি অহিত আচরণ পরিত্যাগ করা বিধেয়; কারণ উহা দ্বারা রক্ত গুল্মাদি নানাবিধ রোগোৎপত্তি হইতে পারে। (২)

এবং ঋতুমতীর প্রথম তিন রাত্রি স্বামী সহবাস পরিবর্জ্জনীয়। কারণ প্রথম তিন দিবস অতিবেগে শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাতে সংসর্গ করিলে বীজ অন্তঃ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যেমন নদী-স্রোতের প্রতিকূলে কোন দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে উহা অভিমুখে গমন করিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বেগপ্রবাহিত শোণিত পথে ক্ষরিতশুক্র অন্তঃ প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। (৩)

যদিও কোন কারণে বীজ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে পারে তথাপি পুরুষ সংসর্গ অবিধেয়। কারণ প্রথম দিবসে সংসর্গ করিলে পুরুষের আয়ুঃক্ষয় এবং তাহাতে গর্ভসঞ্চার হইলে তদ্গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই গতাসু হয়। দ্বিতীয় দিবসেও তদ্রূপ ফল অথবা সূতিকাগৃহেই সন্তান বিনষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসেও তদ্রূপফল অথবা অসম্পূর্ণাঙ্গ বা অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। (৪)

অতএব চতুর্থাদি দিবসে (*) শুদ্ধস্নাতা রমণীর স্বামী সহবাস বিধেয়। তাহাতে গর্ভসঞ্চার হইলে তদ্গর্ভস্থ সন্তান সম্পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে। (৫)

চতুর্থ রাত্রি হইতে ঋতুর ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ক্রমশঃ যত পরে (†) গর্ভাধান হয়, তদ্গর্ভ-জাত সন্তান ততই অধিক বীর্য্যশালী ও বলবান্ হয়। (৬)

---

(১) ঋতৌ প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণীদিবাস্বপ্নাঞ্জনাশ্রুপাতস্নানানুলেপনাভ্যঙ্গনখচ্ছেদনপ্রধাবনহসনকথনাতিশব্দশ্রবণ অবলেখনানিলায়াসান্ পরিহরেদিত্যাদি। (সুশ্রুতঃ)

(২) ঋতাবনাহারতয়াভয়েন বিরুক্ষকৈর্বেগবিধারণৈশ্চ সংস্তম্ভনোল্লেখন যোনিদোষৈর্গুল্মঃস্ত্রিয়া রক্তভবোভ্যুপৈতি॥ (চরকঃ)

(৩) নচপ্রবর্ত্তমানে রক্তে বীজং প্রবিষ্টং গুণকরং ভবতি। যথা নদ্যাং প্রতিস্রোতঃ প্লাবিদ্রব্যং প্রক্ষিপ্তং প্রতিনিবর্ত্ততে নোর্দ্ধং গচ্ছতি। তদ্বদেব দ্রষ্টব্যং তস্মান্নিয়মবতীং ত্রিরাত্রং পরিহরেৎ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৪) তত্রপ্রথমদিবসে ঋতুমত্যাং মৈথুনগমনমনায়ুষ্যং পুংসাং ভবতি যশ্চ তত্রাধীয়তে গর্ভঃ স প্রসবমানোবিমুচ্যতে। দ্বিতীয়েপ্যেবং সূতিকাগৃহেবা। তৃতীয়েপ্যেবমসম্পূর্ণাঙ্গোঽল্পায়ুর্ব্বাভবতি। (সুশ্রুতঃ)

* চতুর্থাদি দিবসেও আর্ত্তবানুবৃত্তি থাকিতে সংসর্গ করিলে পূর্ব্বোক্তরূপ অনিষ্ট হইতে পারে। অতএব আর্ত্তবশেষ নিবৃত্তি হইলেই গর্ভাধান বিধেয়।

(৫) চতুর্থেতুসম্পূর্ণাঙ্গোদীর্ঘায়ুশ্চ ভবতি॥ ঐ

† সুশ্রুতাচার্য্য ইহাও লিখিয়াছেন যে যুগ্মদিবসে অর্থাৎ ঋতুর চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ রাত্রিতে সংসর্গ করিলে পুত্র সন্তান হইবার সম্ভাবনা। এবং অযুগ্মদিবসে কন্যাসন্তান হওয়ার সম্ভাবনা। যুগ্ম ও অযুগ্ম দিবসের সন্ধিসময়ে সংসর্গ করিলে নপুংসক সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা।

(৬) এষূত্তরোত্তরং বিদ্যাদায়ুরারোগ্যমেবচ। প্রজাসৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যং বলঞ্চ দিবসেষুবৈ॥ ঐ

ঋতুকালে বিপরীত ভাবে পুরুষ সংসর্গ করা নিতান্ত অনুচিত। কারণ তাহাতে গর্ভসঞ্চার হইলে যদি পুংজাতীয় সন্তান জন্মে, তবে তাহার আকার ও ক্রিয়া প্রবৃত্তি অধিকাংশই স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া থাকে। এবং স্ত্রীজাতীয় সন্তান হইলে তাহার কার্য্য প্রবৃত্তি অধিকাংশই পুরুষের ন্যায় হইয়া থাকে। (১)

স্ত্রীপুরুষের সংসর্গযোগ্য কাল ও অবস্থা বিভাগ

পুরুষের পঞ্চবিংশতিবর্ষ এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শ বর্ষ অবধি বয়সই সংযোগের উপযুক্ত কাল। ইহার ন্যূন-বয়স্ক পুরুষ কিংবা স্ত্রীর সংযোগে গর্ভাধান হইলে তৎসন্তান গর্ভাশয়েই বিপন্ন হয়। অথবা ভূমিষ্ঠ হইয়াও অধিক কাল জীবিত থাকে না। জীবিত থাকিলেও নিতান্ত দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। আর অত্যন্ত বৃদ্ধা কিংবা কোন রোগ-পীড়িতা স্ত্রী কিংবা এবম্বিধ পুরুষ-সংযোগে গর্ভাধান হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। (২)

গর্ভবিবরণ।

যেমন ঋতু, ক্ষেত্র, জল ও বীজের উপযুক্ত সংযোগে অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্ত্রীলোকের ঋতুকাল, গর্ভাশয়, রসধাতু এবং বীজ (পুরুষেরশুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব শোণিত) ইহাদিগের উপযুক্ত সংযোগেই গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে। (৩)

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে সাধারণতঃ শুক্র ও আর্ত্তব শোণিতের উপযুক্ত সংযোগেই গর্ভোৎপত্তি হইবে বটে, কিন্তু ঐ শুক্র ও শোণিত বিশুদ্ধ থাকিলে বিশুদ্ধ গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা, অর্থাৎ তদ্গর্ভজাত সন্তান সম্পূর্ণাঙ্গ ও নীরোগ হইবে। আর বাতাদি দোষ দ্বারা শুক্র ও শোণিত দূষিত হইলে তজ্জাত সন্তান দূষিত অর্থাৎ হীনাঙ্গ বা বিকৃতাঙ্গ বা কোন রোগযুক্ত হইতে পারে। উদাহরণ যথা—কুষ্ঠাদি রোগ-গ্রস্ত পিতা মাতা দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তানকে প্রায়ই তত্তৎ রোগযুক্ত হইতে দেখা যায়। এবং উক্ত প্রকার দূষিত শুক্র ও শোণিতই জন্মান্ধ, বধির, ও পঙ্গু প্রভৃতি সন্তান উৎপত্তির অন্যতর কারণ। দ্বিতীয়তঃ শুক্র ও শোণিত অত্যন্ত দূষিত হইলে একবারে অবীজও হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ শুক্র ও শোণিতের গর্ভোৎপাদিনী শক্তি থাকে না।

বিশুদ্ধ শুক্রের লক্ষণ।

যে শুক্র, স্নিগ্ধ, ঘন, পিচ্ছিল, মধুররস, অবিদাহী (অর্থাৎ নিঃসরণ কালে দাহশূন্য)

(১) যোভার্য্যায়া মৃতৌ মোহাদঙ্গনেব প্রবর্ত্ততে। ততঃস্ত্রীচেষ্টিতাকারো জায়তে যণ্ডসজ্ঞিতঃ। ঋতৌপুরুষবদ্বাপি প্রবর্ত্তেতাঙ্গনা যদি। তত্রকন্যা যদি ভবেৎ সাভবেন্নরচেষ্টিতা ॥ (সুশ্রুতঃ

(২) ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিঃ। যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতোবা ন চিরংজীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ ॥ তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং নকারয়েৎ। অতিবৃদ্ধায়াং দীর্ঘরোগিণ্যামন্যেনবা বিকারেণোপসৃষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কুর্ব্বীত। পুরুষস্যাপ্যেবং বিধস্যতএবদোষাঃ সম্ভবন্তি ॥ ঐ

(৩) ধ্রুবং চতুর্ণাংসান্নিধ্যাদ্গর্ভঃস্যাদ্বিধিপূর্ব্বকঃ। ঋতুক্ষেত্রাম্বুবীজানাং সামগ্র্যাদঙ্কুরো যথা ॥ (সুশ্রুতঃ)

এবং যাহার বর্ণ স্ফটিক সদৃশ, তাহাই বিশুদ্ধ। (১)

বিশুদ্ধ আৰ্ত্তব শোণিতের লক্ষণ।

যে আৰ্ত্তব শোণিত, নিষ্পিচ্ছিল, দাহশূন্য ও পঞ্চরাত্রানুবন্ধী, এবং যাহা অনতিবহুল ও অনত্যল্পরূপে মাসৈক কালান্তরে এক একবার পরিশ্রুত হয় এবং যাহার বর্ণ গুঞ্জাফল ও অলক্তক সদৃশ তাহাই বিশুদ্ধ। (২)

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের অন্যথা ভাবাক্রান্ত শুক্র ও আৰ্ত্তব শোণিতকেই অবিশুদ্ধ বা দূষিত বলা যায়।

শুক্র, সোমগুণ বিশিষ্ট, (জলীয়) আৰ্ত্তব শোণিত আগ্নেয়, অন্যান্যভূত (পৃথিবী, আকাশ, বায়ু) ও পরস্পর সাহায্যে ও পরস্পর সংযোগে সূক্ষ্মরূপে তাহাতে (শুক্রও শোণিতে) অবস্থিতি করে। (৩)

যেমন ঘৃতপিণ্ড অগ্নি সংযোগে দ্রবীভূত হইয়া গতিশীল হয়, তদ্রূপ স্ত্রীলোকের শরীরপ্রবাহি আৰ্ত্তব শোণিতও পুরুষ সংসর্গ মাত্রে বিসর্পিত হইয়া গর্ভাশয়ে সমাগত-হয়। (৪)

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে পুরুষ সংসর্গে স্ত্রীলোকেরও শুক্র ক্ষরিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই শুক্রের গর্ভোৎপাদনে কোন উপযোগিতা নাই বলিয়া এস্থলে তাহা বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইল না। (৫) বস্তুতঃ পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীজাতির আৰ্ত্তবশোণিতই গর্ভবীজ। স্ত্রীশুক্রের গর্ভোৎপাদিনী শক্তি নাই। কিন্তু ঐ শুক্র দ্বারা স্ত্রীজাতির বল, বর্ণ, ও পুষ্টি প্রভৃতি সংসাধিত হইয়া থাকে। (৬)

স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ কালে বায়ু দ্বারা শরীর হইতে এক প্রকার তেজঃ (উষ্মা) উদ্ভূত হয়। ঐ তেজঃ ও বায়ুর সংযোগে পুরুষের শুক্র ক্ষরিত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে, এবং উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গর্ভাশয়াগত আৰ্ত্তব শোণিতের সহিত বিশিষ্টরূপে সংযুক্ত হইলে গর্ভরূপে পরিণত হইয়া থাকে। (৭)

পূর্ব্বোক্ত রূপে শুক্র ও আৰ্ত্তবের সম্মিলন হইলে অনির্ব্বচনীয় কারণে চেতনাবান্

(১) স্নিগ্ধঘনংপিচ্ছিলঞ্চমধুরঞ্চাবিদাহিচ। রেতঃ শুদ্ধং বিজানীয়াৎ শুদ্ধস্ফটিক সন্নিভং॥ (চরকঃ)

(২) মাসান্নিষ্পিচ্ছদাহার্ত্তি পঞ্চরাত্রানুবন্ধি চ। নৈবাতিবহুলাত্যল্পমার্ত্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ। গুঞ্জাফলসবর্ণঞ্চ যদ্বালক্তক সন্নিভং। ইন্দ্রগোপক সংকাশমার্ত্তবংশুদ্ধমাদিশেৎ॥ (চরকঃ)

(৩) সৌম্যংশুক্রমার্ত্তবমাগ্নেয়মিতরেষামপ্যত্রভূতানাং সান্নিধ্যমস্ত্যণুনা বিশেষেণ পরস্পরোপকারাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ চ॥ (সুশ্রুতঃ)

(৪) ঘৃতপিণ্ডোযথৈবাগ্নিমাশ্রিতঃ প্রবিলীয়তে। বিসর্পত্যার্ত্তবং নার্য্যাস্তথা পুংসাং সমাগমে। (সুশ্রুতঃ)

(৫) যোষিতোঽপি স্রবন্ত্যেব শুক্রং পুংসাং সমাগমে॥ তদ্‌গর্ভস্য কিঞ্চিত্তু করোতীতি ন চিন্ত্যতে॥ (বাভটঃ)

(৬) স্ত্রীণাং গর্ভোপযোগিত্বাদার্ত্তবং সর্ব্বসম্মতং। তাসামপি বলংবর্ণং পুষ্টিংশুক্রং করোতিহি॥ (ভাবপ্রকাশঃ)

(৭) তত্রস্ত্রীপুংসয়োঃ সংযোগে তেজঃ শরীরাদ্বায়ুরুদীরয়তি। ততঃ তেজোঽনিলসন্নিপাতাচ্ছুক্রং চ্যুতং যোনিমভিপ্রতিপদ্যতে। সংসৃজ্যতেচার্ত্তবেন। ততোঽগ্নীষোমসংযোগাৎ সংসৃজ্যমানোগর্ভো গর্ভাশয়মনুপ্রতিপদ্যতে॥ (সুশ্রুতঃ)

ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) উহাতে প্রবিষ্ট হন। (১)

যেমন কাচখণ্ড (সূর্য্যকান্তমণি) ও সূর্য্য তেজঃ উপযুক্ত রূপে সম্মিলিত হইলে তাহা হইতে অগ্নি উদ্‌গত হইয়া নিম্নস্থ কাষ্ঠাদি বস্তুতে অলক্ষিত ভাবে প্রবিষ্ট হয়। তদ্রূপ জীবাত্মাও সংযুক্তশুক্রশোণিতে অলক্ষিত ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। (২)

গর্ভাশয়স্থ শুক্র ও শোণিত চৈতন্যময় আত্মার সহিত সংমিলিত হইলেই তাহাকে গর্ভ বলা যায়। (৩)

ক্ষিতি ; আকাশ, অগ্নি (পাচক, ভ্রাজক, আলোচক, রঞ্জক, সাধক) সোম, (জলাত্মক শ্লেষ্ম, শুক্র ও রস প্রভৃতি), বায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) মনোরূপে পরিণত সত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণত্রয়, পঞ্চেন্দ্রিয় (শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন, ও ঘ্রাণশক্তি) ও জীবাত্মা, এই সমস্তই গর্ভের প্রাণ। (৪)

গর্ভের পাঞ্চভৌতিক ক্রিয়া।

সেই চৈতনাবস্থিত পঞ্চভূতাত্মক গর্ভকে, বায়ু, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিভাগ দ্বারা বিভক্ত করে। তেজঃ, পরিপাকক্রিয়া দ্বারা এক রূপ হইতে রূপান্তরিত করে। জল, স্বীয় গুণে ক্লেদযুক্ত করে। পৃথিবী, স্বীয় গুণে কঠিন করে। এবং আকাশ অবকাশ দানে দিন দিন বর্দ্ধিত করে। (৫)

এইরূপে বিবর্দ্ধিত গর্ভ যখন হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত হয়, তখন তাহাকে বলাযায়। (৬)

গর্ভিণীর লক্ষণ।

সদ্যঃগৃহীত-গর্ভা রমণীর অকারণে শ্রমবোধ, গ্লানি, পিপাসা, উরুদ্বয়ের অবসাদ, শুক্র শোণিতের অবরোধ, এবং যোনিদেশ ঈষৎ কম্পিত হয়। (৭) তৎপরে ক্রমশঃ শরীরের কৃশতা, উদরের গুরুত্ব, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, জৃম্ভা (হাই) প্রসেক (মুখে জল উঠা) অঙ্গাবসাদ, রোম সমূহের প্রকাশ, অম্ল দ্রব্যে অভিলাষ, স্তনদ্বয় পীনও স্তন্যযুক্ত হয়। এবং স্তনমুখের কৃষ্ণবর্ণতা, পদশোথ, আহারীয় দ্রব্যের অম্লপাক, এবং নানা বস্তুভোগে অভিলাষ জন্মে। (৮)

---

(১) ক্ষেত্রজ্ঞাঃ ** চেতনাবন্তঃ শাশ্বতাঃ লোহিতরেতসোঃ সন্নিপা তেষভিব্যজ্যন্তে। (সুশ্রুতঃ)

(২) তেজোযথার্করশ্মীনাং স্ফটিকেন তিরস্কৃতং। নেন্ধনংদৃশ্যতে গচ্ছৎ সত্বো গর্ভাশয়ংতথা। (বাভটঃ)

(৩) গর্ভাশয়াগতংশুক্র মার্ত্তবং জীবসংজ্ঞকঃ প্রকৃতিঃ সবিকারাচ তৎসর্ব্বং গর্ভসংজ্ঞকং। (ভাবপ্রকাশ)

(৪) অগ্নিঃসোমো বায়ুঃ সত্বংরজস্তমঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভূতাত্মেতিপ্রাণাঃ। (সুশ্রুতঃ)

(৫) তঞ্চচেতনাবস্থিতং বায়ুর্ব্বিভজতি তেজএনং পচতি। আপঃ ক্লেদয়ন্তিপৃথিবী সংহন্ত্যাকাশং বিবর্দ্ধয়তি। (সুশ্রুতঃ)

(৬) কালেনবর্দ্ধিতোগর্ভো যদাঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ। ভবেত্তদাসমুনিভিঃ শরীরীতি নিগদ্যতে (ভাবপ্রকাশঃ)

(৭) সদ্যোগৃহীতগর্ভায়া লিঙ্গানি, শ্রমোগ্লানিঃ পিপাসা সক্‌থিসদনং শুক্রশোণিতয়োরববন্ধঃ স্ফুরণঞ্চযোনেঃ। (সুশ্রুতঃ)

(৮) ক্ষামতাগরিমাকুক্ষের্মূর্চ্ছাছর্দ্দিররোচকঃ। জৃম্ভাপ্রসেকসদনং রোমরাজ্যাঃ প্রকাশনং। অম্লেষ্টতা স্তনৌপীনৌ সস্তন্যৌকৃষ্ণচুচুকৌ। পাদশোথো বিদাহোঽন্নে শ্রদ্ধাশ্চ বিবিধাত্মকাঃ (বাভটঃ)

গর্ভিণীচর্য্যা।

গর্ভাবস্থায় অতিশয় পুরুষ-সংসর্গ, অধিক পরিশ্রম, উপবাস, অতিশয় তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, শোক, ভয়, যানাদি আরোহণ, উচ্চ নীচ স্থানে উপবেশন, গুরুতর ভারবহন, ক্রোধ, অধিক পথগমন, উত্তান শয়ন (চিত হইয়া শয়ন করা), মল মূত্রাদির উপস্থিত বেগধারণ, অষ্টম মাসের পূর্ব্বে ঔষধাদি দ্বারা বমন, বিরেচন, কি রক্তমোক্ষন কিংবা স্নেহাদি ক্রিয়া সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। (১)

গর্ভিণীর অধিকাংশমধুরদ্রব্য, এবং স্নিগ্ধ, হৃদ্য, দ্রব, লঘুপাক, সুসংস্কৃত, ও অগ্নিদীপ্তিকর দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য। এবং দুর্গন্ধ বস্তুর আঘ্রাণ, নয়নের অপ্রিয় বস্তু দর্শন, কর্ণের অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ, শুষ্ক, পর্য্যুসিত, বা দুর্গন্ধ অন্ন ভোজন, অত্যুচ্চ স্বরে বাক্য কথন, গাত্রে অধিক তৈল মর্দ্দন, বা গাত্র মার্জ্জন, কঠিন আসনে উপবেশন, অত্যুচ্চ স্থানে শয়ন বা উপবেশন, প্রভৃতি কার্য্য নিতান্ত অকর্ত্তব্য। (২) কারণ ঐ সমস্ত অহিত আহার ও আচরণ করিলে গর্ভস্রাব, অথবা কুক্ষি মধ্যেই গর্ভ শুষ্ক বা মৃত হইতে পারে। (৩)

বিকৃতাঙ্গের বিবরণ।

ঋতুকালে যেরূপ অহিত ব্যবহার করিলে গর্ভের যেযেরূপ বিকৃতি হইতে পারে তাহা ঋতু বিবরণে কথিত হইয়াছে। এবং অম্লপক্ক বয়সে গর্ভাধান হইলে যেরূপ বিকৃতি হইতে পারে তাহা সংসর্গকালনির্ণয় স্থলে লিখিত হইয়াছে। এবং গর্ভাবস্থায় যেরূপ অহিত ব্যবহার করিলে গর্ভের যেযেরূপ বিকৃতি হইতে পারে তাহা গর্ভিণীচর্য্যা প্রকরণে কথিত হইয়াছে। অবশিষ্ট কতিপয় বিকৃতি বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

গর্ভিণীর যে যে দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে তাহা প্রাপ্ত না হইলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুনী(বিকৃত হস্ত), মূক (বোবা), মিন্মিন (সানুনাসিক ভাষী), খঞ্জ (খোড়া), জড়, বামন, বিকৃতচক্ষু (ট্যারা), অথবা অন্ধ হইতে পারে। কারণ মাতার অভিলাষেই গর্ভস্থ সন্তানের অভিলাষ প্রকাশপায়, তাহা পূর্ণ না হইলে অসম্পূর্ণতা হেতু সন্তান বিকৃতাঙ্গ হইতে পারে। (৪)

---

(১) তদাপ্রভৃত্যেব ব্যবায়ং ব্যায়ামমপতর্পণ মতিকর্ষণং দিবাস্বপ্নং রাত্রিজাগরণং শোকং যানাবরোহণং ভয়মুৎকুটকাসনং চৈকান্ততঃ স্নেহাদি ক্রিয়াং শোণিত-মোক্ষণঞ্চাকালে বেগবিধারণঞ্চ নসেবেত। (সুশ্রুতঃ)

(২) ভোজ্যন্তু মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধংহৃদ্যং দ্রবং লঘু। সংস্কৃতং দীপনীয়ন্তু নিত্যমেবোপযোজয়েৎ। ** নজিঘ্রেদপিদুর্গন্ধং নপশ্যেৎ নয়নাপ্রিয়ং। বচাংসিনাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়ানিচ। নান্নং পর্য্যুষিতংশুষ্কং ভুঞ্জীত কুথিতং নচ। নোচ্চৈরুক্ত্যাৎ নতৎ কুর্য্যাৎ যেন গর্ভোবিনশ্যতি। তৈলাভ্যঙ্গো দ্বর্ত্তনঞ্চ নাত্যর্থং কারয়েদপি। নামৃদ্বাস্তরণং কুর্য্যাৎ নাত্যুচ্চং শয়নাসনং। এতাংস্তুনিয়মান্ সর্ব্বান্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গুর্ব্বিণী। (ভাবপ্রকাশঃ)

(৩) এভির্গর্ভশ্চ্যবেতামঃ কুক্ষৌশুষ্যেন্ম্রিয়েতবা (বাভটঃ

(৪) দৌহৃদ বিমাননাৎ কুব্জং কুনিং খঞ্জং জড়ংবামনং বিকৃতাক্ষ মনক্ষং বা নারী সুতং জনয়তি। (সুশ্রুতঃ) (ক্রমশঃ।)

শিক্ষা *।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যের জন্মদিন অবধি শিক্ষার আরম্ভ। বুদ্ধিনাশ বা মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষার শেষ। সদ্য-প্রসূত শিশুর জননীর স্তনদুগ্ধ পান উহার প্রথম শিক্ষা। উহার দেহের পুষ্টির সহিত দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ও স্পর্শশক্তি সকল যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে, উহাও সেই পরিমাণে জগতের পরিদৃশ্যমান পদার্থ সকলের পরিচিত হইতে থাকে। এই কালে ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র মনেরও ক্রিয়া সকল দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে যদি কোন দৃষ্টিরমণীয় সামগ্রী থাকে, এবং তাহা পাওয়া যদি শিশুর ক্ষমতাধীন হয়, তাহা হইলে আগ্রহ সহকারে উহা আপনি লইতে চেষ্টা করে, ক্ষমতার অতীত হইলে অস্ফুট স্বরে অপরকে উহা আনিতে কহে; পাইলে আনন্দে হাস্য করে, না পাইলে দুঃখে রোদন করে। শিশু কোন দিন কোন স্থলে যদি কোন প্রীতিজনক বস্তু পাইয়া বিশেষ সুখী হয়, তৎপরে অপর দিন সেই স্থানের নিকট আসিলে তাহা পাইবার প্রত্যাশা করে এবং তথায় না দেখিতে পাইলে তাহা অনুসন্ধান করে। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সকলে শিশুর মনে ইচ্ছা, চিন্তা, বিবেচনা ও স্মৃতিশক্তিসমূহের ক্রিয়া লক্ষিত হয়।

শৈশবে কৌতূহল ও স্মৃতিশক্তির আধিক্য বিশেষ লক্ষিত হয়। পৃথিবীতে নবাগত শিশু যে কোন পদার্থ দেখে তাহারই নাম জানিতে ইচ্ছা করে। কোন পদার্থের নাম একবার শুনিলে পুনঃ পুনঃ তাহা উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করে, এবং ভুলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করে 'ও কি'? কৌতূহল পরিতৃপ্তির নাম শিক্ষা; এবং বারম্বার উচ্চারণের দ্বারা কোন সংজ্ঞা স্মৃতিবদ্ধ করিবার নাম অভ্যাস। এই দুই প্রণালীতে শিশু ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।

* বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যার্থী বালকগণের উন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যত্নবান হইলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য সর্ব্বদা অভ্যাস মাত্রই দেখাযায়। অধীত শাস্ত্র সকলের সংস্কার হওয়া অতি অল্প জনেরই ঘটিয়া থাকে; তাহার কারণ এই যে শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে না হইলে কাহারও কোন বিষয়ে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই; বরং বালকগণের বিকাশোন্মুখী মানসিক শক্তি সকলের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। অভ্যাস ও সংস্কার এই দুইটি শব্দ কোনক্রমে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির অভাবে উহারা পরস্পর ঐরূপ হইয়াছে। বস্তুতঃ কোন বিষয়ে সংস্কার যতদূর পরিস্ফুট হইবে, অভ্যাস তদনুরূপ স্থায়ী হইবে। যাহাতে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার ক্রমশঃ হ্রাস হয়, সেই অভিপ্রায়ে এই কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখিত হইল।

উচ্চারণ শক্তি পরিস্ফুট হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুগণ যেরূপ পদ্ধতিতে ক্রমে ক্রমে মাতৃভাষা শিক্ষা করে, তাহাতে উহাদিগের বিচারশক্তির ক্রিয়া বিশেষ লক্ষিত হয়। ক্রিয়া পদ সকলের কালের তারতম্য ভেদ করা কেবল অভ্যাসের কার্য্য নহে। যথা, কোন খাদ্যসামগ্রী দেখিলে শিশুরা কহে 'খাব', খাওয়া শেষ হইলে বলে 'খেয়েছি'; খাওয়া হইতেছে এই সময়ে কহে 'খাচ্চি'। শিশুরা যদিও অভ্যাস দ্বারা এই ক্রিয়া পদ সকল উচ্চারণ করে, তথাচ উহাদিগের কাল ভেদ তাহাদের হৃদয়ঙ্গম না হইলে উহাদিগের যথার্থ প্রয়োগ কখনই ঘটে না। বিশেষণপদ সকলের ব্যবহারেও এইরূপ মানসিক ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; যথা রাঙ্গা, কাল, শাদা প্রভৃতি বর্ণসকলের সংস্কার শিশুমনে যদি পরিষ্কাররূপ প্রতিবিম্বিত না থাকে, তাহা হইলে বস্তুতঃ রাঙ্গা বর্ণকে "রাঙ্গা" এই বিশেষণপদ উহারা প্রয়োগ করিতে পারিত না।

ভাষার উদ্দেশ্য মনের সুখ দুঃখ ভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা। ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা বাচনিক ও লিখিত। লিখিত ভাষার মুখ্য উদ্দেশ্য দূরস্থ কোন ব্যক্তির নিকট আত্মভাব প্রকাশ করা। শিশুরা প্রথমতঃ বাচনিক ভাষা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলে, পিতা মাতা লিখিত ভাষা অভ্যাস করিতে শিক্ষা দেন।

প্রকৃত জ্ঞানলাভের নাম শিক্ষা। লিখিত ভাষা অভ্যাসে নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয় বলিয়া উহাকে শিক্ষা কহা যায়। যে ব্যক্তি উত্তমরূপ পড়িতে ও লিখিতে সক্ষম হয় আমরা তাঁহাকে সুশিক্ষিত বলি। যে জন পড়িতে ও লিখিতে না জানে আমরা তাহাকে অশিক্ষিত বলি। কিন্তু বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে জগতে অশিক্ষিত ব্যক্তি কেহই নাই। পড়িতে বা লিখিতে পারিলে যে শিক্ষিত হয় এমন নহে। মনুষ্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রতিনিয়তই শিক্ষিত হইতেছে। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে; এই বিষয় যে ব্যক্তি পুস্তকে পাঠ করে নাই, সে একবার মাত্র জ্বলন্ত অগ্নি স্পর্শ করিলেই জানিতে পারে উহার দাহিকা শক্তি আছে কি না। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আমরা সম্যক্‌রূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি, তাহা হইলে পাঠের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সংক্ষেপে দিতেছি।

সুখ দুই প্রকার, দৈহিক ও মানসিক। এই দুই সুখের আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়তই মনুষ্যহৃদয়ে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষা, ক্ষুৎপিপাসানিবারণ ও দেহের মঙ্গলকর বা সুখকর সামগ্রী সমস্ত আহরণ ও সেবনের আকাঙ্ক্ষায় আমরা সততই যত্নবান আছি; এবং যে পরিমাণে উক্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় আমরা সেই পরিমাণে সুখী হই বটে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। একটি আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ আর একটি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই আকাঙ্ক্ষাই আমাদিগের উন্নতির ও সভ্যতার পথ। মানসিক সুখাকাঙ্ক্ষা দৈহিক সুখাকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ। জগতে আসিয়া দৃশ্যমান পদার্থ সকলের রূপ গুণ ও উহাদিগের উৎপত্তির কারণ প্রভৃতি বিষয় পরিজ্ঞাত

হইতে কাহার না ইচ্ছা জন্মে। এই ইচ্ছার নাম কৌতূহল। কৌতূহল আমাদিগের শিক্ষার আদি কারণ ও জ্ঞানের প্রবেশিক দ্বার স্বরূপ। কৌতূহলের সীমা নাই। লোকে প্রথমতঃ যে স্থানে বাস করে, তত্রস্থ পদার্থসকলের বিশেষরূপ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে। উক্ত ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইতে না হইতেই যে দেশে বসতি করে, সেই দেশের সমস্ত বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়। ক্রমে ভিন্ন দেশের বিষয়, ক্রমে সমস্ত পৃথিবীর, তৎপরে অন্তরীক্ষে সূর্য্য চন্দ্র তারকা প্রভৃতির জ্ঞান উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা জন্মে। এই ইচ্ছা যতই পরিতৃপ্ত হয়, মন সেই মত বিকশিত, প্রশান্ত ও সুখী হয়। নূতন জ্ঞান শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া নূতন সুখের প্রস্রবণ উদ্ভাবিত করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যের নির্ব্বাচন। অর্থ লাভ বা যশোলাভ প্রভৃতি সর্ব্বদা শিক্ষার উদ্দেশ্য হইলেও উহা অন্যতর উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত। এস্থলে সত্য কি? ইহা জিজ্ঞাসা হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে উহার অভাব প্রতিপাদন ও চিরপ্রচলিত সংস্কারের সহায়তা আবশ্যক। যথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন 'শীতল' এই বিশেষণ পদের অর্থ কি? তাহা হইলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যাহার তাপ নাই তাহাই শীতল, তথাচ শৈত্য গুণ বুঝিবার পূর্ব্বে আমাদিগের চিত্তে উহার সংস্কার থাকা আবশ্যক। সেই মত আমরা যদি কহি যাহা মিথ্যা নহে তাহাই সত্য, তাহা হইলে মিথ্যা কি ইহার সংস্কার আমাদিগের মনে না থাকিলে আমরা সত্যের উপলব্ধি করিতে পারি না, তথাচ সহজে বুঝিবার জন্য এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে ভাগিরথীর জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে, যদি কেহ আমাকে কহে "তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা নদী নহে, তাহা মরুভূমি, এবং যে জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে, কহিতেছ উহা বালুকারাশি বায়ুভরে সঞ্চালিত হইতেছে। এরূপ কথা শুনিলে আমি অবশ্য হাস্য করিয়া কহি "তুমি যাহা কহিলে তাহা মিথ্যা", কেননা যে যে গুণ বিশিষ্ট পদার্থকে আমরা জল বলি, আমি তাহাই দেখিতেছি, এবং যে যে গুণ বিশিষ্ট পদার্থকে আমরা বালুকা কহি আমি তাহা দেখিতেছি না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে সত্য নির্ব্বাচন করা যেরূপ সহজ, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে ওরূপ সহজ নহে। এই জন্যই শিক্ষার আবশ্যক। জগতে সমস্ত পদার্থই কি চেতন কি অচেতন সকলেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে গ্রথিত, যথা সমুদ্র বা হ্রদ হইতে অধিকাংশ বাষ্পের উৎপত্তি হয়। এই বাষ্প সমূহ বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া বিমানে উত্থিত হয় ও মেঘাকারে অবস্থিতি করে, ক্রমশঃ তাপের হ্রাসহেতু বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয়। যদি কেহ কহেন পৃথিবীর ন্যায় বিমানে জলাশয় সকল অলক্ষ্য ভাবে আছে এবং দেবগণ ইচ্ছা করিলে বারিবর্ষণ করেন, সেই বারিকে

আমরা বৃষ্টি কহি। যে ব্যক্তি বৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে, তাহার নিকটে দুইটি মতই গ্রাহ্য হইতে পারে; কেননা বিমানে জলাশয়ের অবস্থিতি ও দেবগণ কর্ত্তৃক উহার বর্ষণ তাহার নিকটে যেরূপ আশ্চর্য্য, অলক্ষ্য সমুদ্র হইতে বাষ্পরাশির উৎপত্তি, উহাদিগের বিমানে মেঘরূপে অবস্থিতি, উপরস্থিত তাপের হ্রাস হেতু বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হওয়া তুল্য আশ্চর্য্যের বিষয়। এস্থলে যদি কেহ যন্ত্রদ্বারা বাষ্প প্রস্তুত করিয়া বৃষ্টির সাক্ষাৎ কারণ দর্শাইতে পারেন, তাহা হইলে অপর মতের অসারত্বা প্রমাণ ও সত্যের নির্ব্বাচন হয়।

যে যে প্রণালীতে সর্ব্বদা সত্যের নির্ব্বাচন হয় তাহা অনুমান, বিচার ও পরীক্ষা। যে যে বিষয়ে পরীক্ষোপযোগী নহে, সেই বিষয়ে সত্যের নির্ব্বাচন অনুমান ও যুক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যথা রাম একদিন প্রভাতে উঠিয়া আপন দ্বারের তালকা ভগ্ন ও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে তাঁহার পাঠ্য পুস্তকের অধিকাংশ নাই। তিনি দুঃখে আর্ত্তনাদ করিয়া কহিলেন ‘হায়! আমার উত্তমোত্তম পুস্তক সকল অপহৃত হইয়াছে।’ এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ‘অপহৃত হইয়াছে’ এই পদটি তিনি কেন প্রয়োগ করিলেন? এমত হইতে পারে যে তাহার কোন আত্মীয় বা বন্ধু পড়িবার জন্য পুস্তক সকল লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে; যেহেতু প্রথমতঃ যে ব্যক্তি সৎ অভিপ্রায়ে কোন বস্তু লইতে ইচ্ছা করেন, তিনি একবার মাত্র চাহিলে পুস্তক সকল পাইতে পারেন, তিনি অদৃশ্য ভাবে আসিয়া গৃহের তালকা ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়া কেন লইবেন? অতএব পুস্তক সকল লওন সম্বন্ধে এস্থলে দুইটি অভিপ্রায় স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। তিনি অনুমান ও যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার পুস্তক সকল অপহৃত হইয়াছে।

কোন বিষয় সিদ্ধান্ত বা কোন বিষয় সম্পর্কীয় সত্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে আমরা প্রথমতঃ উক্ত চিন্তা করিয়া থাকি। চিন্তাকালীন তৎসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞান আমাদিগের বিশেষ সহায়তা করে। আমাদিগের পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞান যদি ভ্রমময় হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সিদ্ধান্ত সেইরূপ হইবে। যথা রাম কহিলেন;—

যাহার প্রাণ আছে তাহার সুখ দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আছে। বৃক্ষগণের প্রাণ আছে সুতরাং বৃক্ষগণের সুখ দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আছে। এস্থলে রামের বিজ্ঞতা অল্প, তাঁহার অনুমান ভ্রমাত্মক সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তও সেইরূপ।

পরীক্ষিতব্য বিষয় পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও উহাতে অনুমান ও চিন্তার আবশ্যক। আমাদিগের পৌরাণিক মতে যৎকালীন চন্দ্রমা রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত হয়েন তখনই চন্দ্রগ্রহণ হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম, কেন না বৈজ্ঞানিকেরা কহেন, যৎকালীন সমসূত্রের একদিকে চন্দ্র ও অপর দিকে সূর্য্য ও মধ্যস্থলে পৃথিবী অবস্থিতি করে, তৎকালে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

যে পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রহণের প্রকৃত কারণ প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তিনি সূর্য্য

ও চন্দ্র কিরূপ গতিতে ভ্রমণ করিতেছে এবং এইরূপ গতিতে ভ্রমণ করিয়া পরস্পর কিরূপ সংযম হইলে গ্রহণের উৎপত্তি হইবে এ সমস্ত বিষয় পূর্ব্বে অনুমান ও চিন্তা করিয়া পরিশেষে উহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)
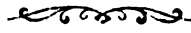
কানন-কুসুম

এক প্রকার নবেল আছে, যাহা কৌচের উপর শুইয়া, তাকিয়া হেলান দিয়া, গুড়্গুড়ির নল টানিতে টানিতে পড়িতে হয়। ইহার জন্য যত্ন পরিশ্রম কিছুরই দরকার হয় না। নদীর স্রোতের ন্যায় ইহাতে গা ভাসাইয়া চলিলেই হয়। ইহাতে ভাষার কাঠিন্য নাই, ভাবের কাঠিন্য নাই, চরিত্র-সমাবেশের কাঠিন্য নাই, সকলই স্বচ্ছ, সকলই তরল, সুতরাং সকলই "চলতি পঙ্কবৎ"। যাঁহারা অলস, বিশ্রাম-লোলুপ, অথবা "অবলা জাতি," তাঁহারা তাস, পাশা, দশ পঁচিশ না খেলিয়া এইরূপ নবেল পাঠ করিয়া থাকেন। যদি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের এরূপ কেহ থাকেন, তাঁহারা কানন-কুসুম পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন না। লেখকের ভাবে কাঠিন্য, ভাষায় কাঠিন্য,* চরিত্র-সমাবেশে কাঠিন্য, এজন্য তাঁহার রচনা সহজে গলাধঃকরণ হয় না। সুতরাং যাঁহারা সময়কে বধ করিবার জন্য নবেল পড়েন, তাঁহারা কানন-কুসুমে উপাদেয় খাদ্য পাইবেন না। কিন্তু এরূপ খাদ্যের অভাব নাই। যোগেশ বাবুকে সংবাদ দিলে স্বল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে রাশি রাশি এরূপ খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ সাবধান! সস্তা দর বলিয়া এরূপ খাদ্যে পেট বোঝাই করিবেন না। উদরী হইবার সম্ভাবনা। আমরা শুনিয়াছি অনেকে এইরূপ রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে কালের করালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে যেরূপ নবেলের কথা বলিলাম, সকল নবেল সেরূপ নয়। অনেকগুলি নবেল, কোমর বাঁধিয়া, আদা জল খাইয়া, এক্জামিনের পড়ার মত তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে হয়। নতুবা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। জর্জ্জ ইলিয়টের রোমোলা ও Goethe'র Wilhelm Meister এই শ্রেণীভুক্ত। কেহ হয় ত বলিবেন এরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া নবেল পড়ার প্রয়োজন কি? একটু প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনটি দুএক কথায় বুঝান যায় না। এজন্য

* দুর্ভাগ্য বশতঃ লেখকের ভাষাটি প্রাঞ্জল নয়। কেহ মনে করিবেন না যে, ভাষার কাঠিন্যকে আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

আমরা স্বতন্ত্র প্যারায় তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রাণিবিজ্ঞানই বলুন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যাই বলুন, বা অন্য কোন বিজ্ঞান বলুন, সকল শাস্ত্রেই প্রথমে কতকগুলি ঘটনা সংগৃহীত করিতে হয়। প্রাণিবিজ্ঞানের লেখক প্রথমে নানা দেশ হইতে প্রাণী সংগৃহীত করেন। এইরূপ উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে লেখক নানা দেশ হইতে বৃক্ষ লতা সংগৃহীত করেন। অন্য অন্য শাস্ত্রেও ঐরূপ।

ঘটনাগুলি একরূপ সংগৃহীত হইলে, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়। তখন সমস্ত প্রাণী, সমস্ত ধাতু, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়। এবং এইরূপ জাতিবিভাগ অবধারিত হইলে ঐ ঘটনাগুলির মধ্যে পরস্পর কার্য্য-কারণ-ভাব সংবদ্ধ হইতে থাকে। তখন প্রাণিবিদ্যায় কিরূপে বা কি কারণে ব্যাঘ্র নৃশংস হইল, সিংহ উদার হইল, হস্তী প্রকাণ্ডাকার হইল, মনুষ্য বুদ্ধিমান হইল, এই সকল কূটপ্রশ্ন বিচারিত হয়। এইরূপে উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে কেন গোলাপপুষ্পের পাপড়ী ঐরূপ হইল, কেন পদ্মের আকার ঐরূপ হইল, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত হয়। এই অবস্থাকে বিজ্ঞানের চরম অবস্থা বলা যায়। বিজ্ঞানের প্রথম অবস্থা ঘটনা-পর্য্যবেক্ষণ, দ্বিতীয় অবস্থা জাতি-বিভাগ, তৃতীয় বা শেষ অবস্থা কার্য্য-কারণ-ভাবের আবিষ্কার।

সমাজ-তত্ব (Sociology) সকল বিদ্যার সার বিদ্যা, সকল শাস্ত্রের সার শাস্ত্র। প্রাণি কি, উদ্ভিদ্ কি, ধাতু কি, প্রভৃতি প্রশ্ন অতীব প্রয়োজনীয় কিন্তু মনুষ্য কি, মনুষ্যের মন কি উপাদানে নির্ম্মিত ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে ঘটনা কোথায় পাওয়া যাইবে? আমরা প্রত্যহ কত মনুষ্যের সহিত কার্য্য করিতেছি। কিন্তু মনুষ্য-মনের গতি নির্ণয় করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। মনুষ্য যে সকল দুর্ভেদ্য আবরণে নিজের মনকে লুকায়িত রাখে তাহা ভেদ করা অতীব কঠিন। যাঁহারা প্রকৃত নভেল লেখক, নাটক-লেখক বা কবি, তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেন। তাঁহারা স্বকীয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে মানব-মনের গতি-বিধি দেখিতে পান। এবং স্বকীয় প্রতিভাবলে সেই গতি বিধি গুলি আমাদের নিকট চিত্রিত করেন। বলা বাহুল্য যে মানব-মনের গতি বিধি অবধারণ করাই সমাজ তত্বের প্রথম সোপান। এই গতি বিধি গুলিই সমাজ-তত্বের ঘটনা স্থনীয়। অগ্রে এই গুলি অবধারিত হইলে পরে তাহাদের জাতিবিভাগ হইবে। এবং জাতিবিভাগের পর ইহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ ভাব নির্ণীত হইবে। নবেল লেখক সমাজ-তত্বের সোপান স্বরূপ এই অন্তর্জগতের ঘটনাবলি বর্ণিত করেন বলিয়া তাঁহার পুস্তক যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত পাঠ করা প্রয়োজনীয়।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা পূর্ব্বোক্ত মতটি বিশদ করিব। ঈর্ষ্যা আমাদের হিতসাধক কিনা, ঈর্ষার কারণ কি, ঈর্ষা দমিত হয় কিনা, ঈর্ষ্যা দমিত হইবার উপায় কি প্রভৃতি প্রশ্ন অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ সকল প্রশ্ন উত্তর করিবার পূর্ব্বে ঈর্ষ্যার কার্য্য প্রণালী কি, ঈর্ষ্যা কি ভাবে, কাহার

মনে, কোথায় সমুদিত হয়, এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত। কারণ ঘটনার কার্য্য প্রণালী না জানিলে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। নবেল লেখক (নাটককার ও কবির ন্যায়) অন্তর্জগতের এই ঘটনাবলি বিবরিত করেন *। সুতরাং তাঁহার পুস্তক (অর্থাৎ যে পুস্তকে এরূপ অন্তর্জগতীয় ঘটনার চিত্র আছে) বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা প্রয়োজনীয়।

যে সকল নবেল-লেখক এই প্রয়োজনের (অন্তর্জগতের কার্য্যাবলীর পর্য্যবেক্ষণ। আমরা ইহাকে সাধারণতঃ চরিত্র-বিন্যাস বলিতে পারি) প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা প্রায়ই ভাষার চাকচিক্য, গল্পের মনোহারিত্ব, বর্ণনার লোমহর্ষকত্ব প্রভৃতি সামান্য বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহারাই জগতের পূজ্য। তাঁহাদিগকে সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতার একবার উপলব্ধি হইলে, তাঁহাদের যশঃ চিরকালের জন্য অক্ষুণ্ণ থাকে। একটি শুশুনি শাকের লতা আজি জলে ছাড়িয়া দাও, কাল তাহার পত্র পল্লব বাহির হইয়া পুষ্করিণীর অর্দ্ধেক স্থল ব্যাপিত করিবে। কিছু কাল পরেই তাহা বিশুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গোরুর খাদ্য রূপে পরিণত হইবে। অন্যদিকে একটি বটবৃক্ষ রোপণ করিতে অনেক সময়, অনেক পরিশ্রম লাগে। কিন্তু একবার তাহা বর্দ্ধিত হইলে, যুগযুগান্ত ধরিয়া শ্রান্ত পথিক তাহার তলে বিশ্রাম লাভ করে। বুলইয়ার্ লিটন্ ভাষার চাক্চিক্য, গল্পের মনোহারিত্ব প্রভৃতিতে প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার সময়ে তিনি প্রভূত যশস্বীও হইয়াছিলেন, কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। আর সেক্ষপীয়র গল্পের অসম্পূর্ণতা, ভাষার কাঠিন্য সত্ত্বেও জগতের পূজ্যতম হইয়া অসংখ্য মানব-বৃন্দের উপাস্য হইয়া রহিয়াছেন।

* সেক্ষপীয়র Othello র দ্বারা ঈর্ষার কার্য্য প্রণালী আমাদের সম্মুখে বিন্যস্ত করিয়াছেন। ঈর্ষ্যার কারণ কি, অথবা ঈর্ষ্যা কিরূপে দমিত হয় এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেন নাই তিনি কেবল ঘটনা সংগ্রাহক।

আমরা কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। "কানন-কুসুমের" সমালোচনায় এত কথা বলিলাম কেন? কানন-কুসুমে চরিত্র-বিন্যাসের চেষ্টা আছে বলিয়া। কানন-কুসুমে কতকগুলি দোষ আছে। কিন্তু তথাপি ইহা আদৃত হইবার যোগ্য। চরিত্র-বিন্যাসই নবেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। এবং যাহাতে চরিত্র-বিন্যাসের চেষ্টা আছে তাহার অন্য অন্য অনেক দোষ মার্জ্জনীয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কানন-কুসুমে চরিত্র-বিন্যাসের চেষ্টা আছে। নিম্নে এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছি।

গ্রন্থের প্রথম চরিত্র অভিরাম। অভিরাম দরিদ্র, কিন্তু অভিরাম বুদ্ধিমান্, উদ্যমশীল এবং উচ্চাভিলাষী (Ambitious)। এগুলি গুণের কথা কিন্তু এক দোষে অভিরামের সমস্ত গুণ দোষে পরিণত হয়। অভিরামের মতে ন্যায় অন্যায় নাই। যেরূপে পার, বড় হও, সম্পদ লাভ কর। ন্যায়ান্যায় বিবেচনা মূর্খের কায। বুদ্ধি-

মান অভিরাম সেরূপ বিবেচনায় নিজ মস্তিষ্ককে কষ্ট দিতে চায় না। অভিরাম এক কথা জানে "কার্য্যের সাধন"। অভিরাম দরিদ্র, অভিরাম মণিকারের বাড়ী চাকরী করে। কিন্তু অভিরামের মত লোক কয় দিন এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? অভিরাম রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চায়। মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতনে সে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। আবার সুপথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করিতে হইলে অনেক সময় লাগে। অভিরাম এত দেরীও সহ্য করিতে পারে না। যদি সুপথে থাকিয়া শীঘ্র শীঘ্র ধন উপার্জ্জন না হইল, তবে কুপথে থাকিয়া হউক। এই বলিয়া অভিরাম কলিকাতায় জুয়োচোরের সঙ্গে যোগ দিল। জুয়োচুরি লুকাইয়া রাখা বড় কঠিন। তুমি যতই বুদ্ধিমান হও না, সমাজ তোমা অপেক্ষা সহস্র গুণে বুদ্ধিমান। সুতরাং অভিরামের জুয়োচুরি ধরা পড়িল। অভিরাম আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইল।

কিন্তু এখনও সেই অভিরাম। অভিরামের উদ্যমশীলতা, অভিরামের উচ্চাভিলাষ এখনও পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এক জন বৃদ্ধের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অভিরাম আণ্ডামান হইতে পলায়ন করিল।

অভিরাম দেশে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আজিও সে পূর্ব্বের মত ন্যায়ান্যায় বিচারহীন। অভিরাম দেশে আসিয়া বড় হইবার পন্থা খুঁজিতে লাগিল। এরূপ লোকের সুবিধার অভাব হয় না। ইংরেজীতে বলে **"Where there is a will, there is a way."** ইচ্ছা বা অধ্যবসায় থাকিলে উপায় আপনা হইতে আসিয়া জুটে। অভিরাম এক সহপাঠী রাজপুত্রের সহিত মিশিল। এই রাজপুত্র আট বৎসর হইল রাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছেন। আবার যে মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্যের ভার ছিল, অভিরাম শুনিল, সেই মন্ত্রী পরলোকে গমন করিয়াছে। অভিরাম ভাবিল—এই রাজপুত্রকে যমালয়ে পাঠাইয়া ইহার রাজ্যে আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া প্রচারিত করিলে কেমন হয়। ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমি সব জানি। অথবা কৌশল করিয়া জানিব। যদি কেহ সন্দেহ করে, আমার বুদ্ধির জোরে তাহাকে নিরস্ত করিব। সে ভাবিল—

"বুদ্ধিবল সম বল নাহি ভূমণ্ডলে।
জয়লাভ করে লোকে সদা বুদ্ধিবলে॥
সুকৌশলে সুসজ্জিত হইয়াছি এবে।
কেহ মোরে প্রতারক জানিতে নারিবে॥

যে ভাবনা সেই কাজ। অভিরাম রাজপুত্রকে ভুলাইয়া বনপ্রদেশে লইয়া চলিল। এবং রাজপুত্রের মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহাকে নদীজলে নিক্ষেপ করিল। এবং পূর্ব্বকল্পনানুসারে আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া পঞ্চতিতে (রাজপুত্রের রাজ্যে) উপস্থাপিত করিল।

কিন্তু এখন হইতে অভিরামের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া গেল। অভিরাম এক ভীষণ পাপকর্ম্ম সাধন করিয়াছে। এরূপ পাপের নিত্যানুবর্ত্তী ফল অভিরামকে আসিয়া ঘেরিল। অভিরাম এখন সন্দিগ্ধচিত্ত, ভীরু, উদ্যম-বিহীন ও অসার কাপুরুষ। পাপসাধনের পূর্ব্বে অভিরাম এইরূপে কথা কহিয়াছিল—

"সকল সময়ে সদুপদেশ ভাল শুনায় না। যদি পঞ্চতীর অধিপতির ন্যায় সুখ-শয্যায় কাল হরণ এবং ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার সুযোগ থাকিত; তাহা হইলে, আমি অতি প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারিতাম; সকলকে বলিতে পারিতাম—

"এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান।
সকল প্রকার সুখ করিতেছে দান॥"

তাহা হইলে আর কখনই বলিতাম না যে,—

যাতনায় ব্যাকুলিত না পারি রহিতে।
ক্ষিতিত্যাগ অনুক্ষণ উপজিছে চিতে।

তাহা হইলে আমি ঐশ্বর্য্য-শৈলের উচ্চ শিখরে উপবেশন করিয়া দীন দরিদ্র প্রতিবেশীদিগকে গম্ভীর স্বরে নানা প্রকার উৎসাহের কথা অক্লেশে বলিতে পারিতাম।

পাপসাধনের কিছুকাল পরেও অভিরামের পূর্ব্বস্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু কতকাল মানুষ প্রাকৃতিক (Natural) নিয়মের বিরুদ্ধে চলিতে পারে। অভিরাম শীঘ্রই ভীরু কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। যে অভিরাম পূর্ব্বে দুস্তর সমুদ্রকে ভয় করে নাই, এখন সেই অভিরাম সামান্য কারণে ভীত ও শঙ্কিত হয়।

"পঞ্চতীরাজ অভিরাম তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার কিসের ভয়? অন্নবস্ত্রহীন, ক্ষীণকলেবর সেই বৃদ্ধ, তাঁহার কি করিতে পারে? পঞ্চতীরাজ তাহাও জানিতেন, তথাচ চকিত হইলেন। সকলের মন কিছু সমান নহে; অনেকে সামান্য কারণেও শঙ্কিত হইয়া থাকেন; পঞ্চতীরাজও সেইরূপ লোকের একজন। তিরস্কার কিংবা প্রহার করিয়া সেই বৃদ্ধকে দূর করিয়া দিলে সহজেই সকল গোল চুকিয়া যাইত; কিন্তু পঞ্চতীরাজ তাহা করিলেন না; করিতেও পারিলেন না; অবশেষে পলায়নই স্থির করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইলেন; দৌড়াইয়া বৃদ্ধের দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন।"

পূর্ব্বে অভিরাম হয় ত এক চপেটাঘাতে বৃদ্ধকে নিকাশ করিতেন। কিন্তু পাপ তাঁহার হৃদয়ে ভয় ও সন্দেহ রোপিত করিয়াছে। এখন তিরস্কার বা প্রহার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

ইহার পর; অভিরামের জীবনে কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হয় নাই। হওয়া উচিতও নয়। পাপ-বিষে তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত। এখন

"তিনি অদৃষ্টের দাস, অদৃষ্ট তাহাকে যে পথে লইয়া চলিল, তিনি সেই পথেই চলিলেন।

"তাহার ধারণাশক্তির হ্রাস হইল; ভাববৃন্দের শৃঙ্খলতা দূর হইল।"

কিয়ৎকাল এইরূপে দিন অতিবাহিত করিয়া অভিরাম এক রেলওয়ের চাকায় নিষ্পেষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যে উচ্চাভিলাষের সঙ্গে ন্যায়পরতা মিশ্রিত না থাকে, তাহার দশা এইরূপই হইয়া থাকে। সহস্র বুদ্ধি, সহস্র কর্ম্মক্ষমতা তাঁহার দুর্ভাগ্যের অপনয়ন করিতে পারে না। ইয়ুরোপ-বিজেতা নেপোলিয়ন, এই দোষে সেণ্টহেলেনায় বন্দীভাবে প্রাণত্যাগ করেন।

অভিরামের প্রণয়ও অভিরামের চরিত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী। অভিরাম বিবাহ করিল—নিজ পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য। অভিরাম মুগ্ধ হইল—স্ত্রীর রূপে।

আমাদিগের সমালোচনা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখন দুই চারি কথায় আর দুই চারি জনের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিব।

বীরেন্দ্র উদার, পরোপকারী, আবেগ-বিহ্বল (Impulsive,) এবং আত্মবিস্মৃত। বীরেন্দ্র সকলের উপকার করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু নিজের কাজের বেলায় বীরেন্দ্র নির্ব্বোধ ও আত্ম বিস্মৃত। পৃথিবীতে এরূপ লোকের অভাব নাই। গোল্‌ডস্মিথ্ নিজের পাথেয় অন্যকে দিয়া, নিজে পথে পথে বাঁশী বাজাইয়া ও ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতেন। যাঁহাদের এরূপ স্বভাব তাঁহারা সহজেই প্রতারিত হন, এবং অনেক সময়ে তাঁহারা আপনাদের বিপদ আপনারা টানিয়া আনেন। বীরেন্দ্রও এইরূপ অনেক বার প্রতারিত হইয়াছিলেন। অনেক বার নূতন নূতন বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদারতা তাঁহাকে অবশেষে সকল সুখের অধিকারী করিল।

সভ্য সমাজে দুষ্ট লোকের কিরূপ প্রকৃতি অভিরাম তাহা এক প্রকার দেখাইয়াছেন। অসভ্য সমাজের দুষ্ট লোকের কিরূপ প্রকৃতি জিম্মা তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। অভিরামের মত তাহার উচ্চাভিলাষ নাই। আবার সে অভিরামের অপেক্ষা সহস্রগুণে নৃশংস ও পামর।

প্রভাবতী হিন্দু-বালিকা। চরিত্রের আঁট সাঁট নাই। যাহা কিছু ভাল প্রভাবতীর চিত্ত আপনা হইতে সেই দিকে আকর্ষিত হয়। প্রভাবতী সমাজ জানে না, ন্যায়ান্যায় জানে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে না। তাহার হিন্দুরমণীর হৃদয় আপনা হইতে ভালর দিকে প্রধাবিত হয়। তবে যে সে বীরেন্দ্রকে দেখিয়া ছট্‌ফট্ করিয়াছিল, গবাক্ষের উপর বসিয়া, পুষ্করিণী বা নদীর দিকে তাকাইয়া প্রণয় সম্বন্ধে লম্বা লম্বা ভাবনা ভাবিয়াছিল, সেটুকু ইংরেজদিগের হইতে প্রাপ্ত। প্রভাবতীর গায়ে এই ইংরেজী গন্ধটুকু না থাকিলে আমরা তাহাকে আরও ভাল বাসিতাম।

বিলাসবতী অভিরামের প্রতিকৃতি। বিলাসবতী অভিরামের মত বড় হইতে চায়। আবার সে অভিরামের মত Jesuit. তাহার মতে উদ্দেশ্যের সাধুতাতেই উপায়ের সাধুতা (End sanctifies the means)। যে কোন উপায়ে হউক বড় হইতে পারিলেই হইল। ন্যায়ান্যায় বিচার মূর্খের কাজ। বলা বাহুল্য যে, পরিণামে বিলাসবতী দুঃখ ও হতাশসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

পাঠক এক্ষণে বুঝিবেন, কি জন্য আমরা বলিয়াছিলাম যে, "কানন-কুসুমে" চরিত্র-বিন্যাসের চেষ্টা আছে। বোধ হয়, এক্ষণে আমরা বলিতে পারি যে, লেখক চরিত্র-বিন্যাসে অনেক দূর কৃত কার্য্যও হইয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া কানন-কুসুমকে একেবারে দোষহীন বলিতেছি না। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি দোষের কথা বলিতেছি।

১। গল্পটি অনেক স্থলে অসংলগ্ন। মণিকারের বাড়ীতে চাকুরি করিতে করিতে অভিরাম জুয়োচুরি করিয়াছিল কি না, তাহা কোথাও বলা হয় নাই। অভিরাম কখন কাশী যায়, কখন পঞ্চবটীতে ফিরিয়া আসে তাহা ঠিক্ করা যায় না। অভিরাম

Hamlet এর Ghost এর মত Hic & Ubique (here & every where)। এইরূপে আরও অনেক অসংলগ্নতার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

২। লেখক বুঝেন না, যে রসের স্বাদ অল্প কথায় (Brevity is the soul of wit.) তিনি যখন সন্ধ্যা বা প্রভাতবর্ণনা করেন, তখন পাঁচ পাতায় তাহা ফুরায় না। লেখক যখন কোন সময়ে কোন এক বিষয়ের বিচার আরম্ভ করেন, দুই তিন পাতায় তাহার শেষ হয় না। এইরূপ অতি-বিস্তৃত বর্ণনা অনেক সময়ে বিরক্তিকর হইয়া উঠে।

৩। তাঁহার ভাষায় ওজস্বিতা নাই। সকলই ভাসা ভাসা বলিয়া বোধ হয়। কোন কথাই একেবারে মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় না।

এইরূপ আরও দুই একটি দোষ উল্লিখিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চরিত্র-বিন্যাসের গুণে এ সকল সামান্য দোষ দোষ বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয় না। তদ্ভিন্ন এই দোষগুলি সহজেই সারিয়া যাইতে পারে।

এই সকল কারণে আমরা কানন-কুসুমকে একখানি উপাদেয় উপন্যাস বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। আমরা ইহার আর একটি গুণের কথা বলিয়া এই সমালোচনা শেষ করিব।

বিক্রমোর্ব্বশীতে রাজা যখন উর্ব্বশীর শোকে উন্মত্ত হন, তখন কবি কতকগুলি প্রাকৃত শ্লোকে তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। কবি যেন পাঠককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। ঐ দেখ

"গহনং গইন্দনাহো পিঅবিরহুম্মাঅ পত্রলিয় বিয়ারো।
বিসই তরু-কুসুমকিসলয় ভূসিঅ-নিঅদেহ পব্ভারো॥

"ঐ দেখ গজেন্দ্র-নাথ নিজ প্রকাণ্ড দেহ তরু-কুসুম কিসলয়ে ভূষিত করিয়া, প্রিয়াবিরহ-জনিত উন্মাদের চিহ্ন প্রকটিত করিতে করিতে গহনে প্রবেশ করিতেছে।"

ইহার ভাবটি চিত্রকরের আলেখ্যে প্রকটিত হইবার যোগ্য। এক প্রকাণ্ড উন্মত্ত হস্তী নিজদেহ লতা পাতায় বিভূষিত করিয়া হেলিতে দুলিতে, কখন বা দ্রুতপদে, কখন বা মন্থর গতিতে, কখন বা বিশ্ব-সংহারক বেশ ধরিয়া বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিতে, ভাঙ্গিতে, আবার কখন বা প্রিয়া বিরহিত শোকার্ত্ত আতুরের ন্যায় মন্দগতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিতেছে। ভাবটি যেমন, ভাষাটিও তেম্নি। কবি যদি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে এই ভাবটি রচনা করিতেন, তাহা হইলে ইহা এত মধুর হইত না। বিক্রমোর্ব্বশীর অন্য সকল কথা ভুলিয়া যাইতে পার। কিন্তু যদি এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি একবার শুনিয়া থাক, তাহা হইলে ইহাদের মধুর তান চিরকাল তোমার কর্ণে বাজিতে থাকিবে।

কবি আবার গাহিতেছেন।

" মম্মঅ রণিঅ মনোহরত্র
কুসুমিঅ তরুবর পল্লবিত্র
দইআ—চিরহন্মাই অআে
কাননে ভমই গইন্দ আে "

" ঐ দেখ কাননে কি মনোহর মর্ম্মর ধ্বনি শুনা যাইতেছে। ঐ দেখ কাননে

তরুবর কুসুমিত ও পল্লবিত হইতেছে। ঐ দেখ দয়িতা বিরহোন্মত্ত গজেন্দ্র (কানন-সৌন্দর্য্যে আরও উন্মাদিত হইয়া) কেমন কাননে ভ্রমণ করিতেছে।"

আবার যখন রাজা উর্ব্বশীর সহিত মিলিত হইলেন তখন কবি গাহিলেন,—

"পাবিঅ সহঅরি সঙ্গ অো
পুলঅ পসাহিঅ অঙ্গ অো
সেচ্ছা গত বিমান অো
বিহরই হংস জুআন অো"

"প্রাপ্ত সহচরী সঙ্গক, পুলক প্রসাধিতাঙ্গক, স্বেচ্ছা প্রাপ্ত বিমানক হংস যুবক বিচরণ করিতেছে।"

বঙ্কিম বাবুও মৃণালিনীতে এই সব সুরে গাহিয়াছেন। তাঁহার গানও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। তাঁহার মৃণালিনী গাহিতেছিল—

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন
চরণে বেড়িয়া তার করিলে বন্ধন;
বলে রাজহংস কোথা করিবে গমন
হৃদয়-কমলে মোর তোমার আসন
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়-কমলে
কাঁপিল কণ্টকসহ মৃণালিনী জলে
হেনকালে কাল মেঘ উদিল আকাশে
উড়িল মরালরাজ মানস-বিলাসে
ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগ ভরে
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে॥"

আবার—

"মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যামবিলাসিনী রে
কহলো নাগরি গেহ পরিহরি কাহে বিবাসিনী রে।" ইত্যাদি।

আর আমাদের কানন কুসুম-লেখকও কোন কোন স্থলে কতকটা এই সুরে গাহিয়াছেন। যথা,—

"প্রতিহিংসা মেঘমালা হৃদাকাশ ঘেরিল।
কৃতজ্ঞতা বিদ্যুল্লতা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল॥
উদিল প্রণয়-রবি পরিপূর্ণ কিরণে।
বাধিল তুমুল গোল এ তিনের মিলনে॥
ভেব না পথিক বর, দেখ মন সরসে।
হাসিছে প্রফুল্লমুখী কমলিনী হরষে॥"

"রমণী-জীবন প্রণয়-প্রবণ,
পুরুষ-জীবন তেমন নয়;
রমণী নিয়ত প্রণয়ে মগন,
বিষয়ে নিরত পুরুষ রয়।"

"প্রকৃতিস্বরূপা বিশ্ববিমোহিনী,
মায়াবলে কভু কালভুজঙ্গিনী।
কখন কমলা শান্তিনিকেতন,
জগতে অদ্ভুত রমণীরতন॥"

এই সকল সুরের তান আমাদের কর্ণে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাজিবে।

কার্লাইল্।

১২৮৬।

বাপু বাঙ্গারাম, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি যে বিলাতে যদি স্কচ্ জাতি না থাকিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই দোকানদার ইংরাজজাতি টাকার গাদায় চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইত। এজাতির টাকাই সর্ব্বস্ব, ইহ জীবনের একমাত্র দেবতা। টাকায় মান, টাকায় পূজা, ভালবাসা, টাকায় গৃহ-ধর্ম্ম, টাকাতেই সব। এজাতির লেখক যাঁহারা, কিসে টাকা রোজগারের সদুপায় হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিতেছেন। জ্ঞানতত্ত্ববিদ্ যাঁহারা, কিসে স্বচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি হইতে পারে, তাহারই পথ খোলাসা করিতেছেন। দার্শনিকের চূড়া মিলের শেষ-দর্শন 'ইউটিলিটি' স্বচ্ছন্দে উদর পূর্ত্তির ব্যবস্থা ;—সকলের সমভাবে উদরপূর্ত্তিই ইহজীবনের পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ যে জাতি ঐহিক সম্পত্তিতে এত মুগ্ধ, তাহারা টাকার গাদায় চাপা পড়িয়া মরিবার কিছুই অসম্ভব নাই। কেবল স্কচ্ জাতিরাই ইহাদিগের মাথা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। স্কচ্জাতি অপেক্ষাকৃত নির্ধন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইহারা ইহা বুঝে যে মনুষ্য কেবল উদরসার নহে ; উদরকে অতিক্রম করিয়া আরও কিছু আছে যে যাহার সন্তোষ সাধন করা কর্ত্তব্য, এবং সেই সাধন অর্থে হয় না। ইংরাজ জাতির জীবন যেমন আধিভৌতিক-গুণপ্রধান, স্কচ্জাতির জীবন তেমনই আধ্যাত্মিক গুণ প্রধান। বিধাতার ঘটনাক্রমে এই দুই বিভিন্ন মানস-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জাতির সুসংমিলনে বৃটীশ-রাজ্য। এবং এই জন্যই বৃটীশরাজ্যের এত সৌন্দর্য্য। ইংরাজ জাতির আধ্যাত্মিক শিক্ষক যতগুলি, তাহা প্রায়ই স্কচ্। শিক্ষকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যিনি গূঢ়-জ্ঞানী এবং পূজনীয়, তিনিই উপরে নামাঙ্কিত।

টমাস্ কার্লাইল খৃষ্টীয় ১৭৯৫ শকে স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতি ডম্ফ্রিশায়রে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা মাতা ধনবান্ ছিলেন না, সুতরাং অসচ্ছল অবস্থায় বিদ্যাগারে প্রবিষ্ট হইতে হইয়াছিল, পরিশেষে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্তি করেন। প্রথমে, যাহাতে ইনি ধর্ম্ম-যাচক-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, তাঁহার অভিভাবকদিগের ঐরূপ কল্পনা ছিল। কিন্তু এরূপ গূঢ় চিন্তাশীল চিত্ত যে সহসা ধর্ম্মযাচক বৃত্তিতে যথাচালিত ভাবে নিরত হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং তিনি স্বয়ং সে কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, অনন্যোপায়ে প্রথমে গৃহ-শিক্ষকতা কার্য্য অবলম্বন করেন, এবং চার্লস্ বুলারের শিক্ষকতায় ব্রতী হয়েন। এই চার্লস্ বুলার কাল ক্রমে বৃটনরাজ্যের

রাজনীতিজ্ঞতায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বুলারের শিক্ষকতা কালে, কার্লাইল যে কিছু অবসর পাইতেন, সেই অবসর সময়ে জার্ম্মান্ হইতে অনুবাদ, ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তৎপরে তিনি পূর্ণভাবেই কেবল একমাত্র লেখকতা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সাময়িক বহুতর পত্রিকায় যে সকল সমালোচক প্রবন্ধাদি লিখেন, তাহা অত্যন্ত সারবান্, চিন্তাপূর্ণ, ও জ্ঞান-সম্পন্ন; এবং তদ্দ্বারাই গুণিসাধারণের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি প্রথম আকর্ষিত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইনি ইহাঁর অত্যদ্ভুত রিসার্টস নামক সুমহান্ গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব, ক্রমওয়েলের জীবনী, মহানুভব ফ্রেডরিকের জীবনী, ইত্যাদি বহুতর মহান্ গ্রন্থ সমূহ রচনা করিয়া স্বীয় জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল, এবং মানবসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এখনও ইনি জীবিত,—অশীতিপরবৃদ্ধ। যে কার্য্যের জন্য এই ভূমণ্ডলে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা তাহা সর্ব্বস্বচ্ছন্দভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশ্বপিতার ইনি যথার্থ সুসন্তান।

ইহাঁর রচিত গ্রন্থকলাপ পাঠে, পাঠকের মনে রচকের চিত্ত-গঠন সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা হয়, ইহাঁর সাংসারিক জীবনও অবিকল তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র। আমেরিক দেশীয় বিখ্যাতনামা জ্ঞানতত্ত্ববিদ্ ইমারসন, কার্লাইলের রচনাবলী পাঠে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ করিবার নিমিত্ত, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ইংলণ্ডে সমাগত হয়েন। তৎকালে তিনি কার্লাইলের সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে এরূপ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।—

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলে পরিপূর্ণ জনশূন্য শৈলমাঝে আমি সেই গৃহখানি দেখিতে পাইলাম। তথায় বিজনপ্রিয় সেই মহাপণ্ডিত নিভৃতে তাঁহার প্রকাণ্ড হৃদয় পরিপোষণ করিতেছিলেন। কার্লাইল যুবাকাল হইতেই মনুষ্যপদবীর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া আসিতেছিলেন; তদীয় পাঠকবর্গ হইতে তাঁহার লুকাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি সম্পূর্ণ অভাবশূন্য, এবং সংসারের সুখ সম্পদের এতদূর অধিকারী যে, সেই বিজনশৈলপ্রদেশে অপরিচিত এবং নির্ব্বাসিত ভাবে রহিয়াও, লণ্ডনের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং অভিলষণীয়,তাহাই তিনি স্বাধীনভাবে এবং আপনার আদেশক্রমে ভোগ করিতে পাইতেছেন। তিনি দেখিতে দীর্ঘায়তন এবং কৃশাঙ্গ, এবং তাঁহার ললাট বিশেষ উন্নত। তিনি আত্মসংযম করিতে জানেন এবং তাঁহার কথোপকথনের অসাধারণ শক্তি তিনি যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন। তাঁহার ভাষায় যেন স্পষ্টরুচির সহিত তিনি উত্তরদেশীয় অর্থাৎ স্কটলণ্ডীয় টান দেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় অতি মনোরম গল্পবিন্যাস থাকে, এবং তিনি যাহা কিছু দেখেন, তাহার উপরই যেন একরূপ সরস রঙ্গ ভাসিয়া বেড়ায়। তিনি কথা কহিবার সময় যেন আমোদে আমোদে তাঁহার সুপরিচিত বস্তুগুলির বা-

ড়াইয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ; সুতরাং যে কেহ সামান্য আলাপমাত্রেই তাঁহার 'লার' এবং 'লিয়োনার' দিগকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে পারে ; এবং তাঁহার যে সকল সৃষ্টি ভবিষ্যতে পুরাণরূপে প্রথিত হইবে, আজি তাহা চিনিতে পারিয়া মনে এক প্রকার আনন্দ জন্মে। তিনি নিজে সঙ্গিবিরহিত ছিলেন, সঙ্গযোগ্য পদার্থও অতি বিরল ছিল। ডানস্কেয়ারের পাদরি ভিন্ন ষোল মাইলের মধ্যেও আর কথাটি কহিবার লোক ছিল না ; সুতরাং একমাত্র গ্রন্থই তাঁহার কথিতব্য বিষয় ছিল।

" তাঁহার আলাপের বিশেষ বিষয়ীভূত পদার্থগুলিকে তিনি স্বকৃতনামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যথা—ব্লেকউডের মেগেজিনের নাম 'বালির মেগেজিন' ; 'ফ্রেজারের' সম্ভবতঃ অধিকতর স্থায়ী মেগেজিনের নাম 'কর্দ্দমের মেগেজিন'। নিকটস্থ একটি ছোট রাস্তা কোন এক বিফল উদ্যমের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান আছে,তাহার নাম'হারা ছয়পেন্সের কবরখানা।' যখন কোন মহাত্মার মাত্রাতিরেক প্রশংসাতে তাহার বিরক্তি জন্মে, তখন তিনি বলেন যে, তাঁহার শুকরের বাচ্চাটির ঢের গুণ আছে। তিনি এই ক্ষুদ্র জন্তুটিকে, বাড়ীর একটা ঘেরা স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে অনেক সময় এবং কৌশল খরচ করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাচ্চা বিচারশক্তির বিশেষ প্রয়োগ দ্বারা ঠিক করিয়াছিল, কি প্রকার একখানা তক্তা ফেলিয়া দিয়া পথ করা যায় ; এবং এই উপায় দ্বারা সে তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম বিফল করিয়া দিল। তথাপি তিনি মনুষ্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করণক্ষম ক্ষুদ্রজীব বলিয়া মনে করেন। তিনি 'নিরো'র মৃত্যুকে অনেক ইতিহাস হইতে অধিক ভাল বাসেন। যদি তাঁহার নিকট কেহ কোন একটি সত্য আবিষ্কার করিয়া দেয়,তবে তিনি তাঁহাকে পূজা করেন।

"আমরা গ্রন্থাদি সম্পর্কে গল্প করিয়াছিলাম। তিনি প্লেটো পড়েন না ; সক্রেটিসের উপর তিনি তাঁহার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। এবং আমি জেদ্ করিলে, তিনি মিরাবোকে দেবতার আসনে উঠাইলেন। তাঁহার নামানুসারে গিবন পুরাতন এবং নূতন এই দুই কালের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড সেতু।

"তাঁহার পাঠ নানাবিষয়ক ছিল। রবিন্‌সন ক্রুসোর পরে ট্রিষ্টাম সেণ্ডি তাহার নিতান্ত প্রিয় বস্তুর মধ্যে অন্যতম ছিল। রবার্টসনের 'আমেরিকা' ছোট কাল হইতেই তাঁহার বিশেষ আদরের পাত্র ছিল। ক্রুসোর "ক্রটি স্বীকার" পড়িয়া তিনি এই বুঝিয়াছিলেন, যে তিনি একেবারে মূর্খ নহেন। * * * *

"আমরা সেই খানে বসিয়া আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলাম। আমাদিগের এই বিষয় নিয়া কথোপকথনে কার্লাইলের স্বয়ং কোন দোষ ছিল না, কারণ ক্ষিপ্রগতি জীবের ন্যায় তিনি স্বভাবতঃই কঠিন বস্তুতে আহত হইতে ভাল বাসেন না, এবং যেখানে দাঁড়াইলে যুক্তির কোন সোপান অবলম্বন করা যায় না,এমন স্থানে তিনি দাঁড়াইতে চাহেন না। তিনি অতীব সৎ এবং সত্যবাদী। কি সূক্ষ্মসূত্রে ভূত এবং ভবিষ্যৎকে একত্র আবদ্ধ করে

তাহা তিনি বুঝেন। প্রত্যেক ঘটনারই ভবিষ্যতের সঙ্গে কিরূপ সংস্রব আছে তাহা তিনি বেশ দেখিতে পান। খ্রীষ্ট বৃক্ষকাণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; এই ঘটনাতে আজি ঐ স্থানে ডানস্কেয়ার গিরিজা নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহাতেই তুমি আর আমি আজি একত্রিত হইয়াছি।—সময়ের বর্ত্তমানতা, আপেক্ষিক মাত্র।"

কে না বলিবে যে মুর্ত্তিমান তুফেল্স্ ড্রকের চিত্র।

কার্লাইলের পুস্তক সমূহ, বিশেষতঃ সার্টর রিসার্টস উৎপত্তি মাত্রেই পাঠকমণ্ডলীতে সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আদৃত হইতেছে। ইহাদিগের যথোচিত সম্পূর্ণ সমাদর প্রাপ্ত হইতে এখনও বহু দিবস গত হইবে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের ভৌতিক ও নাস্তিকতা কুহক ভেদ করিয়া কিরূপে উর্দ্ধে উত্থান করিতে হয়; মনুষ্য-জীবনের মহত্ব কতদূর ও তাঁহার উদ্দেশ্য কি; সত্যের নিত্যভাব ও অসত্যের নশ্বরতা; এবং তাহাদের ফল কিরূপ অখণ্ডিত ও অব্যর্থভাবে আমাদিগের জীবনের সর্ব্ব কার্য্যেই অবশ্য ফলিত হইয়া থাকে; এবং কিরূপেই বা চিত্তের বৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া এই জগৎক্ষেত্রে স্রষ্টার নিয়োজিত কর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক জীবনের যাথার্থ্য সম্পাদন করিতে হয়, ইহা যাহার জানিতে ও শিখিতে বাসনা হইবে আমি তাঁহাকে কার্লাইলের গ্রন্থ সমূহ, বিশেষতঃ সার্টর রিসার্টস, চিন্তার সহিত মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বারম্বার পাঠ করিতে উপদেশ দিই। এ পৃথিবীর কোন বস্তুই নির্দ্দোষ নহে, সুতরাং কার্লাইলের বচন সমূহও যে দোষশূন্য নহে, তাহা বলা বাহুল্য। তবে কার্লাইলের লেখার যে দোষ, এবং যে কিছু অতি মানুষিক শিক্ষা আছে, তাহার পরিহার উপায় কার্লাইলের পাঠকেরা কার্লাইলের লেখা হইতেই শিক্ষা করিতে পারিবেন; সুতরাং তজ্জন্য অপর-কৃত সাবধানতার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই।

এক সময়ে আমার এরূপ বাসনা হইয়াছিল যে, সার্টর রিসার্টসের বঙ্গ অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপহার দিই। কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে অপাঠ্য কাব্য-নাটক-প্লাবিত বঙ্গে সে কল্পনা বৃথা। তবে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে পারিলে একরূপ হইতে পারে, কিন্তু আমার তত রঙ্গ লাগে নাই, এবং ততদূর দেশহিতৈষী আজিও হইতে পারি নাই। যাহা হউক, বাঞ্ছারাম, ঐ সার্টর রিসার্টস হইতে, অদ্য এস্থলে কিঞ্চিৎ অবিকল অনুবাদ করিয়া তোমাকে উপহার দিব। ভাল লাগিবে কি?

সার্টর রিসার্টস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নবম অধ্যায়।—স্বস্তিনিত্যম্।

বিস্ময়-আপ্লুত চিত্তে ত্যুফেল্স্ ড্রক (Tuefels dröch) কহিতেছেন,—গহন কান্তারে প্রলোভন-প্রতারণা বিস্তর, কথা কি যথার্থ! আমরা এই সংসারক্ষেত্রে সকলেই কি সেই প্রলোভন প্রতারণা যোগে পরিক্ষীত হইব না? মনে করিও না যে, সেই বৃদ্ধ আদম্

যে বংশানুক্রমে তোমাতে বর্ত্তমান, এবং যাহার রক্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে তোমার ধমনীতে বহিতেছে, সহজে তাহাকে স্বীয় হইতে বিদূরিত বা অধিকার-চ্যুত করিতে সমর্থ হইবে। আমাদিগের এই জীবন প্রয়োজন-জালে বেষ্টিত; অথচ এই জীবনের অর্থ ধরিতে গেলে, উহা স্বায়ত্তবশ্যতা এবং স্বেচ্ছাশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং আমরা এই সংসারে সতত সংগ্রাম রত, বিশেষতঃ জীবনের প্রথম যাত্রায় এই সংগ্রাম কুটতর আকার ধারণ করিয়া থাকে। 'সুকাজে কার্য্যনিরত হও', এই যে ঈশ্বরকৃত আজ্ঞা, যাহা আমাদিগের এই হৃদয়পট্টে অপৌরুষেয় উপাংশুময় প্রমিথীয় অক্ষরে গুহ্যতম ভাবে লিখিত রহিয়াছে; যতক্ষণ আমরা তাহার রহস্য ভেদ এবং তদনুগমনে অগ্রসর না হইব, এবং যে পর্য্যন্ত আমাদিগের কার্য্যযোগে তাহা পরিদৃশ্যমানভাবে স্বায়ত্তবশ্যতা ঘোষক স্বয়ম্ভুবাক্যরূপে কার্য্যে পরিণত না হইবে, তাবৎকাল তাহার হস্তে রাত্রি দিবা ক্ষণমাত্রের জন্যও শান্তির প্রত্যাশা নাই। পুনশ্চ অন্যদিকে আবার 'খাও এবং উদর পূর্ত্তি কর' এই পার্থিব আজ্ঞা, শিরায়, শিরায়, ধমনীতে, ধমনীতে পর্য্যন্ত ঘোষিত হইয়া, মোহময় আকর্ষণীশক্তি বিস্তার করিয়া যখন আত্মঘোষণ করিতেছে; তখন যে এ জীবন-কার্য্যে সুনীতির জয় সাধনের পূর্ব্বাহ্ণে, বিপ্লব, কলহ, সংগ্রাম, এ সকল কাহার সাধ্য এড়াইতে সমর্থ হয়?

"আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, যখন এই ঈশ্বরকৃত আজ্ঞা মনুষ্য শিশুর হৃদয়ে দৈবোদিতভাবে প্রথম প্রচারিত হয়; এবং যখন সেই পার্থিব অনুজ্ঞার নিকট, হয় জিত নতুবা নির্জ্জিত হইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তখন যে তাঁহাকে আত্মিকভাবে ঘোর নিদারুণ কান্তারে নীত হইয়া প্রলোভক মহামোহকে পরাস্ত, বিদূরিত, এবং তুচ্ছে নিক্ষেপণ পর্য্যন্ত, তাহার সহ সম্মুখীন হইয়া ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক আর কিছুই হইতে পারে না। উহাকে যেরূপ নামে ইচ্ছা নামিত করিতে চাও কর। এই ঘোরকান্তার, তাহা তোমার উপলবালুকাপূর্ণ প্রাকৃতিক মরুস্থলই হউক, অথবা নীচতা এবং আত্মম্ভরিত্বের প্রতিরূপ জনপূর্ণ নৈতিক মরুকেই তৎপদস্থ কর; তথায় সয়তান সাক্ষাৎদৃশ্যমানই হউক বা অদৃশ্য রহুক; তৎসহ এরূপ প্রলোভন-সংগ্রামে আমাদিগের সকলকেই একে একে যথা নির্দ্দিষ্ট রূপে নিয়োজিত হইতে হইবে যদি না হই, তাহা আমাদিগের দারুণ দুর্ভাগ্য বলিয়া জানিও! যাহার হৃদয়ে সেই ঐশ্বরিক লিপি স্বচ্ছন্দে সৌরকর রূপে, সর্ব্বান্ধকারহন্তা ভাবে আজি পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হয় নাই; সে এখনও অস্থির ক্ষীণালোকের মধ্যে সন্দেহদোদুল্যমান হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া ফিরিতেছে। অথবা যে একান্ত পার্থিব ব্যাপাররূপী তমসাচ্ছন্ন হইয়া, যদুবিষ্য ভাবে দুঃখাভিঘাতে লীন হইয়া যাইতেছে, তাহার তুল্য দুর্ভাগ্যবান আর কে হইতে পারে; মনুষ্যসমূহে সে অসম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ মনুষ্য পদে বাচ্য। নাস্তিকযুগবাহিনী এই বিস্তারময়ী পৃথিবীই-

আমাদিগের পক্ষে এখন সেই কান্তার-ভূমি ; এতকাল ধরিয়া আমরা যে অনাহারে এবং অনুতাপে বর্ষানুক্রম অতিক্রম করিতেছি, ইহাই আমাদিগের চত্বারিংশৎ দিবস। কিন্তু এ সকলেরও সীমা আছে, ইহারাও সময়ে তিরোহিত হইয়া থাকে। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে আমিও, জয় না হউক, অন্ততঃ আমি যে সংগ্রাম-লিপ্ত তদুদ্বোধন এবং যাবৎ এ জীবন বা মনীষা শক্তি তিষ্ঠিবে, তাবৎ তাহাতে দৃঢ়-সঙ্কল্প স্থাপন, এতদুভয় হইতে বঞ্চিত হই নাই। ইহাও এখন বুঝিতে পারিতেছি যে আমি আপাততঃ যদিও এই কর্কশ শঙ্ক, বিকটদৃশ্য, প্রেত-নিবাসিত মোহ-কান্তার মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনি এ শক্তিও আমাকে প্রদত্ত হইতে ত্রুটি হয় নাই যে, যাহার সঞ্চালনে এই ক্লিষ্ট-তম হইতে ক্লিষ্ট,এবং শ্রান্ত ভ্রমণাবর্ত্তনান্তর ; সেই পর্ব্বত, যাহা শৃঙ্গসীমান্তশূন্য, বা যাহার সীমা কেবল উচ্চরাজ্যেই সংলগ্ন হইয়াছে, তাহার সেই উচ্চতর সৌরকর-বিহসিত শোভনতম সানুদেশে পথ নিরূপণ এবং তদারোহণে সমর্থ হইতে পারি।'

তিনি আর এক স্থানে আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ শ্লেষাত্মক বাক্যে এরূপ লিখিতেছেন। বলা বাহুল্য যে শ্লেষাত্মক বাক্যই এ লেখকের একরূপ দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ।—'তোমার এই সমকালীয় মানবমণ্ডলীর মধ্যে যে সকল অহংপূর্ণ মানব দেখিয়া আসিতেছ, ভাবিয়া দেখ তোমারও এই জীবন কি এক সময়ে তদনুরূপ ছিল না? উহা কি? হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য যৌবন-সুলভ নবানুরাগের অযথা বিস্তার মাত্র ;—সারপূর্ণ পতিত ক্ষেত্র যদৃচ্ছা উদ্ভিজ্জ পূর্ণ হইবার ন্যায় ; ওষধিও যত, ঘাসও তত। জানিও এই যদৃচ্ছা সংঘটিত উদ্ভিজ্জ ঘটা, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক শ্রদ্ধাশূন্যতা রূপী অনাবৃষ্টি তেজে দগ্ধ এবং নষ্ট হইয়া,কায়িক এবং মানসিক, উভয়ত নৈরাশ্য রূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই নৈরাশ্য বারংবার সংঘটিত হইলে,তাহা হইতে সন্দেহের উৎপত্তি ; ক্রমে সন্দেহ আসিয়া নাস্তিকতায় দৃঢ়ীকৃত হয়। কিন্তু যদি আমি কখন আবার এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার বীজ বপন করিতে পারি, তখন দেখিতে পাইবে আমার এই ক্ষেত্র কেমন হরিত শোভাপূর্ণ, আমার রোপিত বৃক্ষ কেমন ছায়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে, এবং কেমন তাহার ছায়ায় বসিয়া সন্দেহরূপী সকল তাপদহনকেই উপহাস করিতে সমর্থ হই। এখানে আমি ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিই যে, এ পথে আমি একা নহি, দৃষ্টান্ত শূন্য নহি, আমার পূর্ব্বেও অনেকে এই পথ বাহন করিয়া গিয়াছে।'

এখন দেখা যাইতেছে যে তুফেল্‌সড্রকের চিত্তেও, এক সময়ে এইরূপ শুভ চিত্তবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাঁকেও, ইহাঁর উপদেষ্টৃত্ব এবং প্রচারণ কার্য্যে (ইহার কর্ত্তব্য ও কৃতকার্য্যকে এই রূপেই অভিহিত করা যায়) প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, বোধশূন্য ভাবে ছায়ানুসরণ, এবং তদাকৃষ্ট ভাবে তদভিগমনরূপী, গহনকান্তারে প্রলোভন প্রতারণা রূপ পরীক্ষা যোগে পরীক্ষিত এবং বিশুদ্ধ হইতে হইয়াছিল ; প্রলোভন প্রতারণা এক্ষণে পরিক্রান্ত, সয়তানও বিধ্বস্ত, নির্জ্জিত এবং বিদূরিত হইয়াছে। ভাল!

সেই পারিস নগরীর রাজ পথে, যে সময়ে সয়তান তাহার কর্ণে কর্ণে কহিয়াছিল যে, ' আমার উপাসনা কর বাঁচিবে, নতুবা এই সংসার-ক্ষেত্রে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব', এবং যখন তিনি তাহার উত্তরে 'দূর হ সয়তান' বলিয়া সগর্ব্বে তাহাকে তাড়না করিয়াছিলেন ; তবে কি সেই সময় হইতেই, তাঁহার এই যুদ্ধভাগ্য প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল ? অদ্ভুত তুফেল্সড্রক, তোমার এই অদ্ভুত কাহিনী যদি একটু শাদা কথায় বলিয়া যাইতে ! কিন্তু সে আশা বৃথা ! এই পর্ব্বত-প্রমাণ দপ্তর রাশির মধ্যে তজ্জন্য যতই চেষ্টা কর, সমস্তই বিফল। যেখানে খুজিবে হয় ইঙ্গিত, নয় খেয়াল, নতুবা শ্লেষ, ইহাতেই সকল কাগজ পূর্ণ ;—কোথাও ছায়া প্রতিরূপ, কোথাও খেয়াল বিকম্পন, কোথাও বা ব্যঙ্গোক্তি পূর্ণ উপদেষ্টৃজনোচিত বচন-প্রবাহ ; কিন্তু যে ধারাবাহিক যুক্তি গ্রথিত কোন বিষয়ের প্রতিরূপ তাহা কোথাও পাইবার যো নাহি। এতৎপক্ষে তিনি এক স্থানে শ্লেষ সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ' মনুষ্য-আত্মার মধ্যে যে সকল বিষয় যাতায়াত করিয়া থাকে, তাহা কেমন করিয়া, কোন্ রঙের দ্বারা চিত্রিত করিয়া তোমার স্থূলেন্দ্রিয় চক্ষু সমক্ষে ধরিব ; অথবা তোমার এই উদরবৃত্ত সময়ে এমন কোন্ শব্দ প্রচলিত আছে যে তদ্দারাই দূরতম কথাতীত বিষয়কেও কথনায়ত্তে আনিতে পারা যায়।' ভাল ! তাহাই হউক, আমরাও ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করি, সময় যেন উদরবৃত্ত হইল হউক, কিন্তু বাপু তোমার কি মাথা ব্যথা পড়িয়াছিল যে, তুমি কথায় কথায় কতক পেটে, কতক মুখে, এরূপে অনাহত অন্ধকারে ফেলিয়া, সেই সময়কে হাবু ডুবু খাওয়াইতে অগ্রসর হও ? ফলতঃ আমাদের এই অধ্যাপক শুদ্ধ অপরিজ্ঞেয় গূঢ় গুহ্য লইয়া থাকেন না, খেয়ালগিরিতেও অদ্বিতীয়। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ এখানে এমন অপরিজ্ঞেয় কূট আবরণে আত্ম আবরিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, দেখিতে দেখিতে চখে ধাঁ ধাঁ জন্মিয়া যায়। যাহা হউক অতঃপর ইহার উত্তরোত্তর বিষয়ের আভাস গুলি, এখানে অবিকল উঠান যাইতেছে, পাঠকবর্গ যাহার যেমন দৌড় আপন আপন অর্থ আপনি করিয়া লইবেন।

তিনি কহিতেছেন " যে মরু-তপ্ত দুর্দ্দান্ত হার্ম্মাদন বায়ুপ্রবাহ আমাতে এতদিন প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিল, এবং প্রবল স্বন্ স্বন্ শব্দও বিলীন হইয়া আসিতেছে। শব্দবধির আত্মা এতক্ষণে তাঁহার শ্রুতিশক্তি সঞ্চালনে সামর্থ্য লাভ করিলেন। আমিও এক্ষণে আমার যদৃচ্ছা ভ্রান্ত ভ্রমণ হইতে বিরত হইয়া উপবেশনান্তর,চিন্তা চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; যেহেতু আমার বোধ হইতেছিল যেন অদৃষ্ট প্রতীক্ষার কাল এতদিনে শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমার চিত্ত যেন কাহাকে আত্মদান করিব, কাহাকে আত্মদান করিব বলিয়া ব্যাকুল হইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন পূর্ব্ব সহচরদিগকে সঙ্গ বিচ্যুত করিয়া দিই,এবং বলি তুমি প্রতারক মিথ্যা আশা, তুমি দূর হও ; আর আমি কখনও তোমাকে অনুসরণ করিব না,ভাবিও না যে,

আর আমি কখনও তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিব। তুমিও বিকট কঙ্কাল মূর্ত্তি ভয়, তোমাকেও বলিতেছি, তোমাকেও আমি আর গণনায় আনিব না, তোমারও সমস্ত কেবল ছায়া এবং মিথ্যা সার মাত্র। আমি আর তোমাদিগের কুহকে ভুলিব না, আমি এইখানে বিশ্রাম অবলম্বন করিব। আমি পথ-শ্রান্ত, জীবন-শ্রান্ত, যদি কেবল মরিবার জন্যই হয়, তথাপিও আমি এইখানে বিশ্রাম করিব; যেহেতু জীবন বা মৃত্যু আমারপক্ষে এখন উভয়ই সমান, উভয়ই আমার নিকট সমান তুচ্ছ। পুনশ্চ কহিতেছেন, যখন আমি এই স্থানে আমার অনাস্থাবৃত্ত মধ্যে কেন্দ্রশায়ী হইয়া সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলাম, এবং যে সুষুপ্তি নিঃসন্দেহই ঊর্দ্ধদেশিক নিয়োজন বলিয়া এখন প্রতীত হইতেছে, সেই সময়েই ঐ নিদ্রাযোগে ভীষণতর স্বপ্ন সমূহ ক্রমে ক্রমে আমার মন হইতে অপসারিত হইয়া আসিল; জাগ্রত হইলাম, দেখিলাম নূতন স্বর্গ, নূতন পৃথিবী আমার সমক্ষে মনোহর শোভায় শোভমান। নীতিমার্গ বহনে সর্ব্বপ্রথম কার্য্য আত্মত্যাগ অতি সহজেই সুসম্পন্ন হইয়া আসিল। আমার মানস চক্ষু উন্মোচিত এবং মানস হস্ত শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া কর্ম্মক্ষমতার সামর্থ্য লাভ করিল।

এই যে নিম্নে যে অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, এবং যথায় তিনি উপত্যকাভূমে তাঁহার ভ্রমণ-দণ্ড পরিত্যক্ত ভাবে ফেলিয়া ক্লেশাপহারক নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন; এবং যে নিদ্রাজনিত বিশ্রাম হইতে সুফলও ফলিবার এক্ষণে উপক্রম দেখা যাইতেছে; আমরা যদি তদ্দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার বাসগ্রাম নিরূপক বলিয়া অনুমান করিয়া লই, তাহা হইলে কি নিতান্ত অসঙ্গত হয়? এবিষয়ে আমরা কিছুই সাব্যস্ত হইয়া বলিতে পারিতেছি না, যেহেতু বর্ণনা গুলি এরূপ কূট প্রাগলভ্য ও বিদ্রূপপূর্ণ যে তাহা হইতে কিছুই নিঃসন্দিগ্ধভাবে স্থির করিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, তুফেল্‌সদ্রুকেতে কিন্তু একরূপ অদ্ভুত দ্বৈতভাবের আশ্রয় দেখিতে পাওয়া যায়;—যখন দেখিবে বাহির বাড়ীতে মধুর সেতার সঙ্গীতে মৃদু মৃদু নৃত্যামোদ চলিতেছে; তখনই আবার ভিতর বাড়ীতে চাহিয়া দেখ, দুঃখের গুণ গুণ শব্দ এবং কান্নাহাটের তুফান। এই স্থানে আমরা সমগ্র অংশই উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই আকাশরূপী চন্দ্রাতপতলে চিন্তা চঞ্চল এবং ভাবপূর্ণহৃদয়ে বসিয়া থাকিতে কি সুন্দর!—স্থানটি উচ্চ উপত্যকা ভূমি; পর্ব্বতরাজি সম্মুখে, ঊর্দ্ধে এবং পার্শ্বে সুনীল গগণ গৃহ-আচ্ছাদন ও গৃহ-আবৃতি রূপে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; দিগ্‌বাহি বায়ু চতুষ্টয় চতুর্দ্দিকে প্রাবরণরূপে ঝুলিতেছে, আলম্বন-দণ্ড অবলম্বনে তাহাদের আকুঞ্চন ও বিক্ষেপ ক্রিয়া প্রত্যক্ষবৎ। এদিকে আবার গিরিদুর্গ বেষ্টিত অধিত্যকা ভূমে যে সুরম্য অট্টালিকা সকল রহিয়াছে, যথায় হরিত কপিশ পুষ্পবাটিকা এবং শ্বেতা কোমলাঙ্গী ললনা সকল পর্য্যায়ক্রমে শোভা পাইতেছে, তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখ। অথবা তথা হইতে আরও সুন্দর ঐ তৃণাচ্ছাদিত কুটীর মণ্ডপে যথায় গৃহজননী সন্তানবেষ্টিত হইয়া আ-

হার আয়োজন করিতে রত, তথায় নেত্রপাত করিয়া লও। সকলেই যেন জড় সড় পর্ব্বে পর্ব্বে গুটিত হইয়া বহির্দৌরাত্ম্য নিরাশক অধিতাকা কুট্টিমে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি জানিও উহারা জীবন্ত; উহাদিগের প্রতি আমার এই দর্শন সঞ্চালনও যেমন সন্দেহ রহিত, উহাদিগের জীবন্ত ভাবেও তদ্রূপ। অথবা যথায় আমার এই পর্ব্বতবাস বেষ্টন করিয়া শারি শারি নয়টি গ্রাম ক্রমান্বয়ে ব্যাপৃত হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টি কর, অন্ততঃ মনে মনে কল্পনা যোগেও দেখ। ইহারা পরিচ্ছিন্ন দিন পাইলেই স্ব স্ব গির্জ্জাচূড় হইতে ধাতুজিহ্ব ঘণ্টধ্বনিতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ : এবং কি পরিচ্ছিন্ন কি অপরিচ্ছিন্ন প্রায় সকল দিনেই উৎক্ষিপ্ত স্তম্ভাকার ধূমরাশির দ্বারা আত্ম অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আমিও ইচ্ছা করিলে ঐ ধূমরূপী রন্ধনঘড়ি হইতে দিবামান গণনা করিয়া লইতে পারি। উহা রন্ধনের ধূম। স্নেহশালিনী গৃহপত্নীগণ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, এবং সন্ধ্যায় স্বামীসন্তানাদির জন্য আহারীয় প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সুনীল ধূমরাশি শারি শারি পর্য্যায়ক্রমে অথবা হয়ত একত্রেই একেবারে নয়খানি গ্রাম হইতে উত্থিত হইয়া সাধ্যানুসারে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ওগো আজি আমাদিগের এখানে এই এই দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। ফলতঃ দৃশ্যটি কি নেহাত মন্দ! ঐ দেখ তোমার সমস্ত গ্রাম উহাদিগের যাবতীয় বিষয় লইয়া; এবং প্রেমের মাথা মাখি, পরকুচ্ছের হেটাহেটি, বিবাদ বিসংবাদ, কলহ কট্‌কটি, বিলাস, কৌতুক, সকলেরই তুফান হৃদয়ে ধরিয়া, শেষে আসিয়া কেমন সামান্য পটমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে; চাই কি তোমার টুপি উলটিয়া একেবারেই সকলকে সহজে ঢাকিয়া ফেলিতে পার। এত কাল ধরিয়া এই পৃথিবীতলে আমার অবিশ্রান্ত গতি যোগে যদিও আমি সাংসারিক বিষয়ের কেবল অংশাণু অংশ মাত্র খণ্ডে খণ্ডে লইয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এস্থান আবার একথা সমগ্র দর্শনস্পৃষ্ট সার্ব্বভৌমিক উপপাদ্য নির্ব্বাচন ও তাহা হইতে যথাসম্ভব ফলাকর্ষণের পক্ষে তেমনি উপযুক্ত বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

আমি আরও এখানে বসিয়া কতবার দেখিয়াছি, ঘোর প্রবল বাত্যা করাল কায় রোষ-বিস্ফারিতশরীরে ঐ দূর প্রান্তর মথিত করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। সম্মুখে বহিঃশির নিবিড় নীল পর্ব্বতলগ্ন প্রস্তরখণ্ড বাষ্পভারভূত ঘূর্ণাবায়ু তাহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কখন আবর্ত্তন, কখন সংলগ্ন, কখন বা উন্মাদিনীর কেশজালের ন্যায় তাহাতে বিনত হইয়া পড়িতেছে। কতক্ষণে আবার চাহিয়া দেখ কে কোথায় পলাইল, তোমার নিবিড় নীল প্রস্তরখণ্ড নিবিড় শ্বেত হইয়া স্মিতমুখে সূর্য্যকরে দণ্ডায়মান, যেহেতু তোমার ঐ ঘূর্ণাবায়ু এতক্ষণ তুহিনকণা বহন করিতেছিল। মাতঃ প্রকৃতি, এই বিপুল জগৎ ক্ষেত্রে তোমার জাগতিক কর্ম্মকুটীরে, না জানি সেই সুবিশাল কর্ম্মকটাহে কি অদ্ভুত কি অভাবনীয় ভাবেই এই অপার ভূতরাশির পরিপাচন, সঙ্কোচন, বা তাহার বিস্তার

সাধন করিয়া থাক। অথবা প্রকৃতিকে যে ডাকিতেছি সেই প্রকৃতিই বা কে? হায়, আমি ভ্রান্ত! ভূতেশ, ঈশ্বর, প্রকৃতিকে না ডাকিয়া তোমাকে না ডাকি কেন? প্রকৃতি কে? —তুমি না এই ভূতেশের বহির্বসন মাত্র? হরি, হরি! তবে কি সত্য সত্যই এ তিনি সেইই, যিনি তোমারই হাত দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন; যিনি স্নেহরূপে তুমি আমি উভয়েতেই বাস এবং উভয়কেই স্নেহাভিভূত করিতেছেন? ("How thou fermentest and elaboratest, in thy great fermenting vat and laboratory of an atomsphere, of a world, O Nature!—Or what is nature? Ha! Why do I not name thee God? Art not thou the "Living Garment of God"? O Heavens, it is it, in very deed, He, then that ever speaks through thee; that lives and loves in thee, that lives and loves in me?")

"সেই যথার্থ সত্য, এবং সকল সত্যের যাহা আদি, তাহার এই পূর্ব্বসঙ্কেতই বল, বা জ্যোতির্বিকাশের পূর্ব্বভাসই বল, গূঢ়তম অপরিজ্ঞেয় ভাবে আসিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিল। ভগ্নপোত শীতনিপীড়িত নবজেম্লাবাসীর নিকট বসন্তোদয় যেমন মধুর; ঘোর অজ্ঞাত লোকারণ্যে পথবিভ্রম রোরুদ্যমান শিশুর নিকট মাতৃকণ্ঠস্বর যেরূপ শান্তিসঞ্চালক; সেইরূপ ধীর মধুরতম স্বরলহরীপূর্ণ দেবসঙ্গীতবৎ এই সুসন্দেশ আমার চিরতাপসন্তপ্তহৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বিশ্ব তবে সত্য সত্যই মৃত, ভৌতিক বা কেবল ভূতের বাসা নহে! ইহা দেবমূর্ত্তি দেববৎ, ইঁহা আমার পিতৃসম্পত্তি!

"এতক্ষণে আমার সহচর মানববর্গকেও বিভিন্ন চক্ষে, অপার প্রেম, অপার করুণ দর্শনে দর্শন করিতে সামর্থ্য লাভ করিতেছি। হায়, ভ্রান্ত ভ্রামক, আত্মসর্ব্বস্ব, নিরাশ্রয় মানব! তুমিও কি আমার ন্যায় পরীক্ষিত, পেষিত, বেত্রবিকম্পিত হও নাই? ভ্রাতঃ তুমি রাজমুকুটেই তোমার শিরোবেষ্টন করিয়া থাক, বা ভিক্ষার ঝুলিই তোমার অঙ্গভূষণ হউক, তুমিও কি সেইরূপ ভারভূত, সেইরূপ তাপসন্তপ্ত নহ, এবং তোমারও শান্তিশয়নের জন্য শেষ কি এই পৃথিবীতল নিরূপিত হয় নাই? হায় ভ্রাতঃ, ভাই রে, কেন আমি তোমাকে আমার এই হৃদয়ে চাপিয়া তোমার চক্ষুজল মুছাইতে পারিতেছি না। ঐ যে অপার বহুল স্বরসংশ্লিষ্ট মনুষ্য কলরব, যাহা আমার নির্জ্জন দেশ ভেদ করিয়াও মানস-শ্রুতি কুহরে আসিয়া পশিতেছে; এখন দেখিতেছি, সত্য সত্যই তাহা যদৃচ্ছা সংঘটিত বাতুল কোলাহল নহে, উহা কারুণ্য পূর্ণ;—বাগ্‌বিরহিতের তাপসন্তপ্ত শ্বাস বিমিশ্রিত গদ্গদকণ্ঠোদ্ভব স্বরের ন্যায়, যাহা ঊর্দ্ধদেশ সমক্ষে ভক্ত্যনুসূচনরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই সামান্য-সুখ ভরসা ক্ষীণা অবনী, এখন হইতে আমার প্রয়াশী স্নেহশালিনী জননী, কুটিল-হৃদয়া বিমাতা নহেন। মানব, উন্মাদবৎ আকাঙ্ক্ষা-ক্ষিপ্ত এবং নীচ প্রবৃত্তিশীল হইলেও, তথাপি এখন হইতে সে আমার নিকটে প্রিয়তর; তাহার সহস্র পাপ তাপ সত্বেও

তাহাকে আমি এই প্রথম ভ্রাতৃনামে সম্বোধন করিলাম। এইরূপে নাজানি কতই অদ্ভুত, দূরগম্য দুরারোহ পথ বাহনে পরিচালিত হইয়া, অবশেষে এই দীনতা মন্দিরের (Santuary of sorrow) অলিন্দবক্ষে আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইলাম। অবিলম্বেই ইহার দ্বার উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা। এবং তখন এই দৈন্যতার দিব্য গভীরতা কত (Devine depth of sorrow) তাহাও সম্মুখে প্রকাশমান দেখিতে পাইব।

আমাদিগের অধ্যাপক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে গীট তিনি এত দিন ছাড়াইতে না পারিয়া, তাহাতে বাধিয়া হতাহত হইতেছিলেন, এই খানেই তাহার উপর তাঁহার প্রথম নেত্রপাত হয়, এবং নেত্রপাত হওয়াও যেমনি, ইনিও অমনি তাহা ছেদন করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। তিনি লিখিতেছেন,—" আমরা এখন যাহাকে 'অশুভের কারণ ও মূল ' বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি, তাহাই বা তদ্রূপ কোন না কোন বিষয় ইহা লইয়া জগৎ স্থষ্টির দিন হইতে প্রতিমানবের মনেই, কতই কূটতর তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। যে কোন মানবচিত্ত, যন্ত্রবিষাভাবে দুঃখানুবিদ্ধ অবস্থা হইতে যদি শক্তিসঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, তাহার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য স্বরূপ এই বিষয়কেই সর্ব্বাগ্রে নিবৃত্তি করিতে হইবে। আমাদিগের সময়ে অনেকেই এই বিষম কচ্‌কচিকে সহজে সহজে কোন প্রকারে থাবাথুবিতে চাপা দিয়া আপনাকে আপনি সন্তুষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকে, আবার কেহ না কেহ আছে, যাহাদিগের পক্ষে এ বিষয়ের কোন না কোন স্থির মীমাংসা একেবারেই অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। প্রতি যুগে যুগেই তদুপযোগী তদ্রূপ মীমাংসা যুগভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে, আবার যেমন সেই যুগ বিগত হয়, তেমনি তাহার মীমাংসাও সেই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত ও অকার্য্যকর হইয়া আইসে। কারণ, মনুষ্য-প্রকৃতির স্বভাবই এই যে,যুগভেদে ইহাদের কথা পর্য্যন্তও ভেদ হইয়া থাকে, ইচ্ছা করিলেও তাহার বিরতি করিবার সাধ্য নাই। তোমার এ যুগের ব্যাখ্যান পুস্তকে,ভাগ্যক্রমে আমার আজি পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত ঘটিয়া উঠে নাই, সুতরাং কাজে কাজেই এ বিষয়ের অন্ততঃ আমার নিজের ব্যবহারের জন্যও আমি এরূপ মীমাংসা করিয়া লইতেছি। আমি যতদূর নিরূপণ করিয়া জানিয়াছি, মনুষ্যের যে দুঃখ, তাহা মনুষ্যের মহত্ত্ব হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে, কারণ মনুষ্য আত্মিকভাবে অনন্ত, এবং ইহা সে যতই শঠতা কৌশল বিস্তার করুক, কখনই অন্ত বস্তুদ্বারা চাপা রাখিতে পারিবে না। আচ্ছা ভাল, তোমার এই ইউরোপ খণ্ডে, যত যত রাজস্ব সচিব, যত যত শিল্পকুশল, এবং যত যত উৎকৃষ্ট পাচক দল আছে, বলিতে পার ইহারা সকলে একত্র মিল ও সমবেত হইয়া ঐ জুতাঝাড়া চামার বেটাকে সুখী করিবার ভার লইতে পারে কি না? তাহারা হঠাৎ পারিবে বটে, কিন্তু এক আধ ঘণ্টা কালের অতীত আর পারিবে না; কারণ ঐ যে চামারটাকে দেখিতেছ এবং যাহাকে দেখিয়া হেয় ভাবিতেছ, উহাও কেবল

তোমার উদর-সার নহে, উহারও একটি আত্মা আছে। যদি তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিও উহার স্থায়ী আনন্দ এবং সুখসিক্ততার জন্য কেবল এই মাত্র চাহে,এবং তাহার কমও চাহে না বা অধিকও চাহে না, যে ঈশ্বরের এই অনন্ত রাজ্য আমি সমগ্রই ভোগ করিব, সেই ভোগে পুনঃ অপার তৃপ্তিবান্ হইবে এবং বাসনার উৎপত্তি মাত্রেই তখনি তাহা পূরণ হইবে। হখিমিরের সুরাসমুদ্র (Oceans of Hochheimer) বা তচ্ছোবক অক্সাক্সের কণ্ঠনালী, তাহাদের কথা কি কহিতেছ অনন্ত আত্মার আত্মবান্ তোমার ঐ জুতা ঝাড়ার নিকট তুচ্ছানুতুচ্ছমাত্র। তুমি আসমুদ্র পূরণ করিয়া সুরা ঢালিয়া দেও, অমনি দেখিবে সে ঠোঁট উলটাইয়া বলিতে থাকিবে, মদটা যদি আর একটু ভাল পাকের হইত! ভাল, উহাকে একবার বিশ্বরাজ্যের অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং তদুপযুক্ত শক্তিও দান করিয়া দেখ দেখি, অমনি দেখিবে পরক্ষণেই সে অপরার্দ্ধ লোলুপ হইয়া তদধিপতির সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া বসিয়া আছে; শুধু তাহা নহে, মাঝে মাঝে আবার এক এক বার গলা ছাড়িয়া মনের দুঃখে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেছে, আমার যেমন, মানুষের মধ্যে এমন লক্ষ্মীছাড়া হতভাগ্য 'কপাল আর কাহারও নাই।—সূর্য্যদেবে কলঙ্কদাগ কখন ছাড়া! অথবা পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, উহা আত্মছায়া মাত্র,আপন ছায়ায় আপনি ভুলিয়া তাহার সহিত কেবল কোন্দল করিয়া থাকি।

"ফলতঃ আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা প্রায় এইরূপ। আমরা আপন আপন ওজন এবং আকাঙ্ক্ষা অনুসারে গণিয়া গাঁথিয়া শেষে একটা স্থির করিয়া মনে মনে ভাবি যে এই পর্য্যন্ত হইলেই, আমার এ সংসারযাত্রা, ভালও নহে মন্দও নহে; অথচ যথাস্বচ্ছন্দভাবে কাটাইয়া যাইতে পারি; এবং সেই হইতে মনে মনে ইহাও ধারণা হয় যে ঐ পর্য্যন্ত প্রাপ্যই আমার উপযুক্ত, সুতরাং উহাই আমার অবশ্য প্রাপ্তব্য। উহা আমার আধিক্য অনাধিক্য-শূন্য ন্যায্য পাওনা মাত্র, সংসারযাত্রার উপযুক্ত বেতন, সুতরাং আমার হক্, তজ্জন্য বিবাদ বা ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। যদি ইহার উপরে কিছু বেশি হয়, তাহা হইলেই বটে সুখ। আর যদি কম হয় তাহা হইলেই দুঃখের সঞ্চার বলিতে হইবে। এখন একবার ভাবিয়া দেখ, এই রূপে আমরা আপন আপন সারত্ব এবং মূল্য কেমন আপনাপনি করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি; এবং আমাদিগের এই নির্দ্ধারণকার্য্যে আত্মগরিমা ও আত্মশ্লাঘার ঘটা বিস্তারই বা কি দুরন্ত। অতঃপর যদি তুলাদণ্ড কোন দিকে ঝুঁকিতে দেখিয়া কোন মূর্খ চীৎকার করিয়া উঠে, দেখেছ, দেখেছ, কি অন্যায় শোধ, ভদ্রলোকের উপর এমন দাগাবাজি এমন অভদ্র ব্যবহার কি আর কেহ কখন দেখিয়াছ? তাহাতে কি আর তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে? মূর্খ! আমি তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, তুমি যে সেই সেই বিষয় তোমার অবশ্য ভাবিয়া চীৎকার করিতেছিলে, তাহা কেবল তোমার আত্মগরিমার ফল মাত্র। তাহার সাক্ষ্য

মনে কর যেন তোমার ফাঁসি হইবে (তোমার ভাগ্যেও আমি বোধ করি বস্তুতঃ তাহাই ঝুলিতেছে), এমন স্থলে গুলির ঘায়ে প্রাণত্যাগ কি তোমার পক্ষে সুখের বলিয়া বিবেচনা করিবে না? আবার মনে কর যেন ফাঁসে ঝুলিবে, কিন্তু ছোবড়ার কাছিতে, এখন মনে করিবে দড়িটে যদি শোণের হইত!

"আমি পূর্ব্বেই যাহা বলিয়া আসিয়াছি, এখন দেখ তাহা কতদূর সত্য;—জীবনাংশরূপী এই ভগ্নাংশ অঙ্কে হর (Denominator) কমাইলে যেমন সহজেই তাহার মূল্যাধিক্য সাধন করিতে পারা যায়, লব (Numerator) বৃদ্ধি দ্বারা সেরূপ হয় না। অথবা আমার বীজগণিত-জ্ঞানে যদি না ভ্রান্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে পূর্ণসংখ্যাকে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে, ক্ষয় রহিত পূর্ণই থাকিয়া যায়। তুমিও একবার তোমার দাওয়া দাবিকে শূন্যে নামাইয়া দেখ দেখি, তুমিও দেখিবে সমস্ত পৃথিবী তোমার পদতলে আনত হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের সমকালিক বিজ্ঞসমূহ যথার্থই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ধরিতে গেলে, কেবল ত্যাগস্বীকারের পর হইতেই জীবনকার্য্যের যাথার্থ্য আরম্ভ হয়।

"আমিও এখন একবার আপনাপনি আত্মপ্রশ্ন করিয়া ভাবিলাম যে, আমিও যে এতকাল ধরিয়া কেবল খুটিনুটি, উঠপড়া, দুঃখের কান্না, এই সকলে আত্মদগ্ধ করিয়া আসিলাম; ভাল, তাহারই বা কারণ কি, কাহার জন্য করিলাম? সহজ কথায় উহার এইই উত্তর যে, তুমি কখনও সুখানুভব করিতে পাও নাই। কারণ কি? না ভদ্রসন্তান তুমি তোমার 'তুমি' মহাশয়ের সম্ভ্রম রক্ষা যথেষ্ট রূপ হয় নাই, আহারের কষ্ট, বিছানার কষ্ট, কেহই তাহার উপর যতদূর যত্ন দেখান উচিত, তাহার কিছুই দেখায় নাই। মরি! মরি! কিন্তু তোমার যত কিছু আইন চক্র সকলই একে একে খুলিয়া বল দেখি যে কোথাও তাহাতে এমন কোন ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে কি না, যে, তাহার শাসনে তোমাকে সুখী হইতেই হইবে, সুখী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই? সুখ ত সুখ! তফাতে থাকুক; ইহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে, কিছু পূর্ব্বে তোমার 'তুমি' হওয়াই কোথায় ছিল,—তোমার 'তুমি' হওয়ার উপর তোমার দাবী দাওয়া সত্ব কিছু ছিল কি না। তেমনি বিবেচনা কর যেন তুমি কখন সুখ ভোগ করিতে জন্মাও নাই, অদৃষ্ট যেন তোমার ভাগ্যে কেবল দুঃখভোগই লিখিয়াছেন, তাহা হইলেই বা তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি! আহার লালসায় গগণসাগর সন্তরণ করিয়া যে সকল গৃধ্রকুল উড্ডীয়মান হইতেছে, উহাদিগের হইতে তবে কি তোমার কিছুই ইতর বিশেষ নাই; তুমিও কি উহাদিগের মত মৃতমাংসের অপ্রতুল দেখিলেই নৈরাশ্যে তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকিবে? বাপু, ক্ষান্ত হও, তোমার বায়রণ ঢাক, গেটে খোল।"

আর এক স্থানে লিখিতেছেন,—"বটে বটে, এতক্ষণে আমি ইহার আভাস পাইতেছি! ভ্রাতঃ এই মনুষ্য-হৃদয় কেবল তোমার সুখ-বাসনার আধার নহে, তথায় উহা

হইতে আরও উচ্চতর বস্তু অবস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য সুখ-সাপেক্ষতা ভাব পরিত্যাগ করিলেও, সে তৎপরিবর্ত্তে স্বচ্ছন্দে কৃতকৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতে পারে। একাল ধরিয়া এত এত অসংখ্য ঋষি এবং উৎসর্গিত মহাপুরুষবর্গ, কবি এবং উপদেষ্টৃগণ, যে সকল বাক্য ঘোষণা, এবং তজ্জন্য নানা লাঞ্ছনা সহিয়া গিয়াছেন, তাহা কি?—এই উচ্চতর বস্তুর প্রচারণা মাত্র। মনুষ্যে যে ঈশ্বর-প্রতিরূপ নিবাস করিয়া থাকেন, এবং সেই ঈশ্বর-প্রতিরূপের উপবেই যে আমাদিগের স্বেচ্ছা এবং শক্তিসমূহ নির্ভর করিয়া থাকে, জীবন মরণে তাঁহারা ইহারই প্রতি সাক্ষ্য দান করিয়া, সেই উচ্চতর বস্তুর প্রচারণা করিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতঃ, তুমিও সেই ঈশ্বর-অনুজ্ঞাত অপৌরুষেয় তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সাদর-নির্ব্বাচিত হইয়াছ। যতক্ষণ তুমি অনুতপ্ত এবং শিক্ষানিরত না হইবে, নিশ্চয় জানিও, সেই দিব্য পুরুষ কারুণ্যপূর্ণ খেদানুসূচন হইতে কখনই বিরত হইবেন না। ইহারই জন্য আবার বলিতেছি,তোমার ভাগ্য সমক্ষে ধন্যবাদপরায়ণ হও; যাহা পাইয়াছ তাহাই সানন্দমনে গ্রহণ কর, উহা তোমার কার্য্যে আসিবে; এবং স্বার্থকে আত্ম হইতে বিদূরিত করিয়া ফেল। রোগ স্থায়ী এবং পুরাতন হইলে, যেমন শুভোৎপাদিনী অরযন্ত্রণাযোগে তাহাকে বিদূরিত করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়; তুমিও, চেষ্টা দুরন্ত হইলেও, বহুকালসঞ্চিত মলরাশি হইতে সেইরূপ আত্মধৌত করিয়া লও। তাহা হইলে এ দুরন্ত কাল-তরঙ্গে তুমিও গ্রাসিত হইবে না; তদুপরি ভাসিতে ভাসিতে স্বচ্ছন্দে সেই শোভনতম অনন্তহৃদয়ে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে। আমোদপ্রিয় হইও না, ঈশ্বরপ্রিয় হও। 'স্বস্তি নিত্যম্' যাহাকে বলে, উহাতেই তাহার অস্তিত্ব,এবং উহাই সকল অমীমাংসার মীমাংসাস্থল। ইহারই আশ্রয়ে যে কেহ সঞ্চরণ করিবে এবং কর্ম্মনিরত হইবে,জানিও তাহারই পক্ষে মঙ্গল।"

পুনশ্চ, "তোমার প্রাচীন গ্রীকপণ্ডিত জিনো যেরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই পৃথ্বীসংসারকে তাহার দুঃখানিষ্ট সহ পদদলিত করা অতি সহজ কার্য্য। ভ্রাতঃ, তুমি ইহা অপেক্ষাও আরও গুরুতর কার্য্য সাধনে পটু; এই পৃথ্বীসংসার যাহা নিত্য তোমার অনিষ্ট সাধন করিতেছে,এবং নিত্য তোমার অনিষ্ট সাধন করিতেছে বলিয়াই, তুমি তাহারও উপর প্রেমপূর্ণ হৃদয় ধারণে সমর্থ। ইহার শিক্ষকতা গ্রীকপণ্ডিত জিনোর কর্ম্ম নহে, জিনো অপেক্ষা উচ্চতর ব্যক্তির আবশ্যক। তোমার ভাগ্যে সেই উচ্চতর ব্যক্তিও প্রেরিত হইয়াছিল। অষ্টদশাধিক শতাব্দী গতপ্রায়, দীনতার যে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথায় দীনতার সেই অর্চ্চনা-অনুষ্ঠান কি বিস্মৃত হইয়াছ? সত্য বটে ঐ দেবমন্দির এখন ভগ্নপ্রায়, জঙ্গলপূর্ণ, কীটপতঙ্গাদি নানাবিধ হিংস্র এবং কদর্য্যজীবের বাসস্থান; কিন্তু তথাপি বিমুখ হইও না, অগ্রসর হও,দেখিবে বহুল ভগ্নাবশেষ মধ্যেও উহার নগণ্যতম গুহাস্থলে দেবস্থান এখনও তেমনি জাজ্বল্যমান;—এবং সম্মুখে চিরপ্রদীপ্ত পবিত্র দীপও এখনও তেমনিই প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে।"

উপরে যে সকল অদ্ভুত উক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করা গেল, আমরা এমন আস্পর্দ্ধা করি না যে উহার উপরে কোন মতামত প্রকাশ করিব; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি উহার পর পর উক্তিগুলি, যে তাহা নিতান্ত সুচাকের নহে। প্রথমতঃ তাহার ভাবার্থ সর্ব্বসঙ্গত বা বিবাদশূন্য নহে, বরং অধিক পরিমাণেই বিবাদপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ তাহা সাধারণ ধারণার অতীত; এবং স্থানে স্থানে এমন কূটপূর্ণ যে, স্বয়ং বক্তাকেই তন্মধ্যে হাবুডুবু খাইতে দেখা যায়। ধর্ম্মবোধ, নরচিত্তযোগে অপৌরুষেয় বচন প্রচারের নিমিত্ত ভাব, ভবিষ্যদ্বচন, আমাদিগের সাময়িক সত্য প্রচারক অথবা অসত্য নিয়ামক উপদেষ্টৃগণ, ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর মতামত বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা গুলি ফলতঃ অধিকাংশই ধড়স্কন্ধ রহিত, কিন্তু প্রতিভাশালিত্বেরও অপ্রতুল নাই। যাহা হউক তথা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই অদ্ভুত বর্ণনীয় বিষয়ের উপসংহার করা যাউক।

অধ্যাপকটি শ্লেষাত্মক স্বরে কহিতেছেন, "পূজাপাদ বল্টেয়ার মহাশয়, আপনি একটু থামুন, আপনার ঐ সুস্বর কণ্ঠ একটু নিবৃত্ত করুন দেখি; যে কার্য্যের জন্য এসংসারে আপনার আগমন, তাহা হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অষ্টম শতাব্দীতে যেরূপ ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেরূপ নাই, এই সামান্য কথা, না হয় গুরুতরই হউক, ইহা ত যথেষ্টই প্রমাণ করা হইয়াছে, তবে আর কেন? হায়, হায়, এত কাল জীবন ভরিয়া এই ছত্রিশ খণ্ড পুস্তক, আরও কত কত খণ্ড, কত কত সংখ্যা, কত কাগজ লিখিয়া আসিলে, তাহা কি শেষে আমাদিগকে কেবল এই একটু সামান্য কথা বুঝাইবার জন্য! ভাল, তাহাই বুঝিলাম, কিন্তু তাহার পর? তাহার পর তোমার সেই নিন্দিত ধর্ম্ম-ভাবকে যাহাতে নূতন বসন, নূতন ভূষণদানে, আমাদিগের উপযোগী নূতন মূর্ত্তি করিয়া লইতে পারি, এবং যাহাতে তদ্দ্বারা আমাদিগের ধ্বংস-প্রায় আত্মাকে শীতল এবং পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হই, সে বিষয়ে সহায় এবং পথ প্রদর্শক হইতে পারিবে কি? পারিবে না,—সে পক্ষে তোমার শক্তি নাই, শক্তি শূন্য! তবে কেবল ভাঙ্গিতে আসিয়াছ, গড়াইতে আইস নাই? তবে আর কেন, আস্তে আস্তে আমাদের সেলাম লইয়া আপনার পথ দেখিলেই ত ভাল হয়!'

"সে যাহা হউক যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মভাব বা ধর্ম্মতত্ত্ব দেখা যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে আমার সহিত কি সম্বন্ধ? অথবা আমার হৃদয়ে যে ঈশ্বর উপস্থিত রহিয়াছেন, এবং যাঁহাকে অন্তরাত্মার সহিত আমি অনুভব করিতেছি, তাহা কি বল্টেয়ারের সাধ্য আছে যে নয় বলিতে পারে, বা নয় করিতে পারে? যে দৈন্য-অর্চ্চনা অনুষ্ঠানের কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহার উৎপত্তি এবং বংশ নির্দ্দেশ যেরূপে ইচ্ছা করিতে চাও কর, কিন্তু তাহা যে এই এখানেই উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল,তৎপক্ষে কি আর কোন রূপ দ্বিরুক্তি আছে? তোমার অন্তরাত্মায় বারেক অনুভব করিয়া দেখ দেখি, দেখিয়া বল যে উহা ঐশ্বরিক সম্পত্তি কি না? ভাতঃ, এ-

রূপ অনুভাবকতাকেই শ্রদ্ধা কহে, আর যে সমস্ত তাহা মতি মাত্র। কেবল মতির খাতিরে যে পরকে এবং আপনাপনিও তিতবিরক্ত হইতে চাহে হউক, তাহাতে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই।”

পুনশ্চ আর একস্থানে বলিতেছেন,—“তোমাদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, ‘পূর্ণ-সিদ্ধ-শক্তি’, (Plenary inspiration) বা তথাবিধ বিষয় লইয়া আপনাপনির মধ্যে বিবাদ কন্দল করিও না; বরং সেই সিদ্ধ শক্তির কণিকা মাত্র যাহাতে আপন আপন জন্য কোন মতে পাইতে পার, তৎপক্ষে যত্নবান্ হও। এ জগতে কেবল এক খানি মাত্র বাইবেলের বিষয় আমি জানি যে,যাহাতে এই পূর্ণ-সিদ্ধ-শক্তি বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ নিরসিত হইয়াছে, অথবা যাহা সর্ব্ব সন্দেহের অতীত; এবং যাহাতে ঈশ্বরকৃত লিপি আত্মনয়নে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। আর আর যাবতীয় বাইবেল, এই মহান্ বাইবেল গ্রন্থের এক একটি পল্লব স্বরূপ। নিদর্শক উদাহরণ স্বরূপ, নির্ব্বোধবোধ-সুগম চিত্রমূর্ত্তি, বা রূপকল্পনা মাত্র, এখানে উল্লিখিত করিলাম।”

এতক্ষণে পাঠকবর্গ বোধ করি নিতান্তই শ্রান্ত এবং বিরক্ত হইয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহাদিগকে কিছু শান্তি দিবার জন্যও বটে,এবং আমাদিগেরও এই অধ্যায়টি শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিবার বাসনায়, নিম্নস্থ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই অংশ তত দুরূহ নহে,কিছু কিছু ভাবগ্রহ হইবার সম্ভব।

“আমি বিশেষরূপে দেখিয়াছি, আমাদিগের এই জীবনের কাল-শক্তি সহ উভয়তঃ আত্ম-বিধ্বংসিভাবে যে চিরন্তন সংগ্রাম প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে; তদ্ভিন্ন আর আর বিষয়ের সহিত যে কিছু সংগ্রাম সূত্র, তাহা বস্তুতঃ সংগ্রামসূত্র কি না তৎপক্ষে সন্দেহস্থল। ভ্রাতঃ, এই সংসারক্ষেত্রে যদি কাহারও সহিত তোমার কোন বিষয়ের ভাবান্তর উপস্থিত হয়, আমার পরামর্শ শুন, সেই ভাবান্তরের কারণ কি অগ্রে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপন মনে বিবেচনা করিয়া দেখিও। যদি উহার মূল পর্য্যন্ত কোন মতে নামিয়া দেখিতে পার দেখিতে পাইবে, উহা সামান্যতঃ এই ভিন্ন আর আর কিছুই নহে;—‘এই সংসারে সুখ যে পরিমাণে তোমার ভোগ্য বলিয়া নিয়োজিত হইয়াছে, তুমি তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া আমার অংশে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপণ করিতে আসিয়াছ; কিন্তু আমি তাহা করিতে দিব না, আমি দিব্য করিয়া কহিতেছি ইহাতে প্রাণ থাকুক বা যাউক, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিব।’ হায়, হায়! যে সুখের লালসে এই সমস্ত জগৎ উৎক্ষিপ্ত প্রায়, এবং সমস্ত জগৎই যাহার অংশ পাইবার লালসে লোলুপ হইয়া ফিরিতেছে, সে সুখ ফলতঃ দেখিতে গেলে কি নগণ্য;—কাড়াকাড়িতে শাঁসের বিধ্বংসে ছোবড়া চুষিবার ব্যাপার মাত্র। যাহাতে একজনেরও তৃষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই, সমগ্র জগৎ তাহারই পিছু ধস্তাধস্তি করিতে করিতে ছুটিতেছে। ভাল! এমন এমন স্থলে আমরা কি স্বচ্ছন্দে এমন উত্তর করিতে পারি না,—‘পামর দুরাকাঙ্ক্ষি, তোমার ক্ষুধার্ত্তগৃধ্রবৎ আস্ফালন

হইতে ক্ষান্ত হও, আমার ভাগে যে নগণ্য অংশ পড়িয়াছে, এবং যাহা আমার বলিয়া গণিতাম, তাহা লইয়াই যদি তুমি সন্তুষ্ট হও, এই লও, অম্লান মুখে দিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক; বিধাতা যদি আরও কিঞ্চিৎ আমাকে দিতেন, তাহাও আমি স্বচ্ছন্দে তোমাকে অর্পণ করিতে পারিতাম।' যদি ফিষ্টে প্রণীত Wissenschaftsblire পুস্তক কিয়দংশে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম মূলক বলিয়া গৃহীত হয়; তাহা হইলে আমরাও যাহা বলিয়া আসিলাম, নিঃসন্দেহই উহা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে অমূলক। আমরা এখানে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহাই মনুষ্যের পূর্ণ কর্ত্তব্য নহে; কেবল কর্ত্তব্য-অর্দ্ধ মাত্র, এবং সেই অর্দ্ধও আবার কর্ম্মঠ অর্দ্ধ নহে, নিষ্কর্ম্মা অর্দ্ধ। সে যাহা হউক, আমরা বলিতে যেমন পটু, কার্য্যেও যদি সেই পরিমাণে পটু হইতে পারিতাম!

"কিন্তু মনুষ্যের বোধ এবং বিশ্বাসভাব যতই উৎকৃষ্ট গুণময় এবং দৃঢ় হউক না কেন, যতক্ষণ তাহা কার্য্য এবং আচরণে আসিয়া পরিণত না হইবে, ততক্ষণ তাহা বৃথা। অথবা তাহা কেন, সেরূপ পরিণতি না হওয়া পর্য্যন্ত, বিশ্বাসকে 'বিশ্বাস ভাবই' বলা যায় না। বিশেষতঃ আমাদিগের অনুধ্যান ক্রিয়া স্বভাবতঃ অসীম, অপার, আকারশূন্য, অসাব্যস্ত হইতেও অসাব্যস্ত; যতক্ষণ উহা সন্দেহশূন্য এবং বহুদর্শনজাত বৈধতা ভাবে অনুভূত না হইতে থাকিবে, ততক্ষণ উহার আবর্ত্তনদণ্ড প্রাপ্ত এবং তদবলম্বনে অনুবন্ধ রূপে পরিণত হইবার সামর্থ্য হয় না। জনৈক বিজ্ঞ যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন যে 'সন্দেহ যে প্রকারেরই হউক না কেন, উহা কেবল একমাত্র কার্য্য যোগেই বিদূরিত হইতে পারে।' অতএব আরও বলিতেছি যে, যে কেহ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ইতিকর্ত্তব্যতার ঘোর অন্ধকারে বা মিথ্যালোকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাগ্রহে দিবালোকের প্রার্থনায় চীৎকার করিয়া ফিরিতেছে; সে যেন আমার এই উপদেশটি গ্রহণ করে, আমি ইহা স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া দিতেছি;—'যাহা যাহা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, এবং তাহার মধ্যে যাহা সর্ব্বাগ্রে হস্ত সান্নিধ্যে পাইবে, তাহাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে রত হও; এবং তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার তৎপরবর্ত্তী দ্বিতীয় কর্ত্তব্য আপনা হইতেই হাতের উপরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।'

"সে যাহা হউক আমরা বোধ হয় এখন বলিতে পারি যে, যে আদর্শ-ভবন-নিহিত (Ideal world) তোমার অভীষ্ট লাভের আকাঙ্ক্ষায় এতদিন কায়মনে অদৃষ্ট সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলে, এবং যাহার শ্রমে এখন শ্রান্ত হইয়া আসিতেছ, যখন সেই আদর্শ-ভবন (Ideal world) তোমার সমক্ষে আবিষ্কৃত এবং প্রকাশমান ভাবে আত্ম ভাণ্ডার খুলিতে আরম্ভ করিবে; এবং উইলেম মিষ্টরের লোথারিওর (Lothario) ন্যায় তুমিও যখন বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে বলিতে পারিবে যে 'আমেরিকা হয় এখানে, নতুবা আমেরিকা কোথাও নাই', তখনই জানিও যে, তোমার আত্মিক ভাব প্রকৃতিস্থ হইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিষয়ের যে এই বস্তুতঃ

ভাব (Actual) যাহা তোমার সমক্ষে এখন হেয়, ঘৃণিত, দুর্দ্দশাপন্ন, সামান্য এবং কত কি, এবং যাহার উপর তুমি এখন অথবা এই মুহূর্ত্তে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছ, জানিও তোমার যে আদর্শ (Ideal) এবং যাহা লাভের আশায় এত ক্লেশ পাইতেছিলে; তাহা উহাতেই নিহিত রহিয়াছে। উহা হইতে তাহা বাছিয়া লও, বাছিয়া লইয়া তাহার সত্যতায় বিশ্বাসপূর্ব্বক, জীবনকে তদবলম্বিত কর, এবং তদ্দ্বারা মুক্ত ও প্রকৃতিস্থ হইতে থাক। নির্ব্বোধ! তুমি যে আদর্শ আদর্শ (Ideal) করিয়া ফিরিতেছ, তাহা কোথায়?—তাহা তোমাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহার আবার প্রতিবাধক যাহা তাহাও তোমাতে; তোমার কার্য্য, তুমি কি প্রকারের হইবে, কি স্বভাবে দাঁড়াইবে, তাহাই কেবল উহা হইতে আকর্ষণ এবং সংব্যস্ত করিয়া লওয়া মাত্র। তুমি এরূপ হইবে, কি ওরূপ হইবে, কি কিরূপ হইবে, তাহাতে কি আইসে যায়? কেবল এই পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট যে, তুমি যেরূপেরই হও না কেন, সেইরূপ যেন কবি বা শূর-জনোচিত হয়। হায়! হায়! বিষয়ের বস্তুতঃ ভাবনিগড়েই যাহারা আবদ্ধ রহিয়াছে; এবং নিরাশায় যাহারা নিয়তই দেবস্থানে হস্ত পদ সঞ্চালন এবং খেয়াল পূরণোচিত নূতন সংসারভূমি প্রাপ্তিলালসে দিন যামিনী গত করিতেছে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য, কি ভ্রান্ত। তাহাদের আত্মহিতার্থে এই কথাটি যেন ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। 'তুমি যে বস্তুর অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছ, তাহা তোমাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, হয় সেখানে আছে নতুবা কোথাও নাই; তাহা বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করিতে কেবল এক তোমার দর্শনশক্তির অপেক্ষা মাত্র!'

"কিন্তু এক কথা, জগৎসৃষ্টির ন্যায় মনুষ্য আত্মাসম্বন্ধেও, সকল কার্য্যের প্রারম্ভ স্বরূপ সেই একমাত্র আলোক পদার্থের আবশ্যক। যতক্ষণ এই চক্ষে অন্ধকার বিদূরিত হইয়া দিব্যদর্শনের উপস্থিতি না হইবে, তাবৎকাল তাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিরুদ্ধ বলিয়া জানিও। যে দিব্যক্ষণে, সৃষ্টিকালীন প্রলয়াবর্ত্তে ভাসমানের ন্যায় দুর্ব্বিপাক-বাত্যাবিতাড়িত আত্মায় 'আলো হউক,' সহসা এই বাক্য দেববাক্যের ন্যায় ধ্বনিত হয়, সেইক্ষণ কি মধুর। যে সকল মহান্ ব্যক্তিরা একবার ইহার মধুরতা অনুভব করিয়াছেন; অথবা যে সামান্য প্রাণীরা ইহা সামান্য ভাবে সামান্য আকারেই অনুভব করিয়া থাকুক; সেই হইতে তাহাদিগের নিকট ইহা কি অভূতপূর্ব্ব সাক্ষাৎ ঐশ্বরিক প্রচারণারূপে নিরন্তর অনুভূত হইয়া থাকে! মনুষ্যচিত্তের অসাব্যস্ত ভাব হইতে এই সাব্যস্তভাবে উপস্থিত হওন দ্বিতীয় সৃষ্টিরচনার ন্যায়। প্রলয়চ্ছন্ন গহন-গভীর-উৎপাত ক্রমে বিদূরিত, পরস্পর বিরোধী যদৃচ্ছাক্ষিপ্ত পরমাণু সকল ক্রমসংযোজনে ভিন্ন ভিন্ন স্থূল আকারে পরিণত হইয়া আসিতে থাকে; ভিত্তিস্বরূপ তলদেশ অতর্কিতভাবে প্রস্তরময়ী দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়; শেষে নিত্যপ্রতিরূপ জ্যোতিষ্কখচিত গগণমণ্ডল ঊর্দ্ধে প্রকাশমান হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই বিস্তার করিয়া থাকে। যথায়

অগ্রে নিয়ত প্রলয় উৎপাত বিচরণ করিয়া ফিরিত, এখন তথায় সান্দ্রর্ব্বরনবশোভা-ময়ী স্বর্গপ্রতিরূপা বসুন্ধরা মূর্ত্তি বিরাজ করিয়া থাকে।

"আমিও এখন স্বচ্ছন্দে আপনাপনি আশ্বস্ত মনে বলিতে পারি,—তুমিও আর সেই প্রলয়-উৎপাতের ন্যায় অঘোর তরঙ্গ রূপে ঘূর্ণিত হইও না। সর্ব্বশোভা-সমাবিষ্ট বসুন্ধরা মূর্ত্তি, অথবা তাহার পূর্ণরূপ হইতে না পার, অন্ততঃ প্রতিরূপ হইতেও যত্নবান্ হও। সখে! আর বৃথা কালক্ষেপ ভাল নহে। কর্ম্মরত হও; আবার বলিতেছি কর্ম্মরত হও; আত্মধ্বংস করিও না। তোমার শক্তি যদি পরিমাণে কেবল অণুমাত্রই হয়, তোমার দেবতার দোহাই! সেই অণুমাত্র শক্তি তাহার অনুরূপ অণুমাত্র কার্য্যেই নিয়োজিত করিয়া আত্মসফলতা কর, অপব্যয় করিও না, তোমার মঙ্গল হইবে। সখে, উঠ উঠ, হতাশকে বলি দেও, ভাবিও না, যাহাই সম্মুখে কার্য্য বলিয়া পাইবে, তাহাতেই রত হও, তাহাই সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সম্পাদন কর। দিন থাকিতে থাকিতে করিয়া লও, নিশা আগত প্রায়; নিশাগমে কর্ম্ম সুযোগ সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে।"

সময়ান্তরে কার্লাইলের মতামত ও গ্রন্থাবলির আলোচনার বাসনা রহিল। *

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবাহ।

(প্রলাপ)

আমার এ পোড়া হৃদয় বুঝুক আর না বুঝুক, এবং যার যা বলিবার হয় বলুক, আমি বিবাহ করিব না। আমার আত্মাভিমানিনী, আত্মাভিসারিণী, উন্মাদিনী বুদ্ধি আমাকে আমার আত্মার বাহিরে অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহের বন্ধনে বদ্ধ হইতে দিবে না। বিবাহ করিব কেন?—সুখের জন্যে?—আমার সুখ এইক্ষণ আমার আপনার অধিকারে আছে, তাই ভাল, আমি সুখের লালসায় পরের হাতে প্রাণ তুলিয়া দিতে সম্মত হইব না। কবিকল্পিত বিদ্যাধরী কিংবা বনদেবী যেমন মায়াতরুর মূলে বসিয়া, আপনার আদরে আপনি গলিয়া—আপনার ভাবে আপনি ঢলিয়া, ঢল ঢল চিত্তে বলিয়াছে,—

'আমি ত প্রাণ দেব না, প্রাণ নেব না,
আপন প্রাণে ভাল বাসি,'

আমার ঐ অভিমান-বিলাসিনী নিত্য-

---

* এই প্রবন্ধটি মহাত্মা কার্লাইলের মৃত্যুর কএক মাস পূর্ব্বে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। কার্লাইলের সম্পর্কে আমাদিগের যাহা বলিবার আছে, তাহা পরে বলিব। সং

বিসংবাদিনী, বিভ্রান্ত বুদ্ধিও আপনার অনুরাগে আপনি উদ্বেল হইয়া মান-ভরে এইরূপ বলিতেছে,—

আমি ত প্রাণ দেব না, প্রাণ নেব না,
আপন প্রাণে ভাল বাসি,
আমি আপন দুঃখে আপনি কাঁদি,
আপন সুখে আপনি হাসি ॥

আমার এই প্রাণ আজও যেমন আমার রহিয়াছে, উহা চিরদিনই তেমনি আমার রহুক। আমি উহা কাহারও কাছে বাঁধাও দিব না, বিক্রয়ও করিব না ; যেমন আছে তেমনি থাকুক। বাঁধা দিতে আমার বড়ই আপত্তি। বাঁধা দিলে কি বাঁধা পড়িলে, এবং কলঙ্কের কালা খাতায় খাতকের ফর্দ্দে নাম লিখাইলে, বন্ধকের বস্তু ফিরিয়া আবার পাও কি না পাও, আজীবন সুদের দায়ে ঠেকিলে। এ সংসারে অনেকেই বিক্রয়ের নামে ভয় পাইয়া, আপনার প্রাণটি কাহারও না কাহারও কাছে দুচারি দিন, কি দুচারি বছরের তরে বাঁধা দিয়াছে, এবং পরিশেষে সোহাগের সুদ যোগাইতেই একবারে দেউলিয়া বনিয়া, মনের আগুণে পুড়িয়া মরিয়াছে। এমন বেহিসাবি বন্দোবস্ত, এমন ক্ষতিকর ব্যাপারেও কি বুদ্ধিমান্ লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে ?

কিন্তু, বাঁধা দেওয়া যদি দোষের কথা, বিক্রয়ও ত নিতান্ত গুণের কথা নহে। পৃথিবীর বণিক্‌সম্প্রদায় সোণা, রূপা, তামা, কাঁসা, মণি মুক্তা প্রবাল অথবা বনের কাঠ, খনির অঙ্গার এবং সূঁই সূতা ও লতা পাতা লইয়া যেমন দোকান খুলিয়া বসে, কিংবা মাথায় পসরা লইয়া ফিরিওয়ালার মত বাণিজ্যে বাহির হয়, আমিও কি আমার এই সাধের প্রাণটি লইয়া সেইরূপ বেচা কেনার এক দোকান খুলিয়া বসিব, অথবা প্রাণের পসরা মাথায় বহিয়া, দেশে দেশে, নগরে নগরে, এবং গ্রামে গ্রামে ও গৃহে গৃহে ফিরি করিতে যাইব ? প্রাণ লইয়া বাণিজ্য! এই স্বার্থচিন্তাময় মনুষ্যজগতে ইহার ক্রেতা কৈ ? কয় জনে ইহার গৌরব বুঝে ? কয় জনে ইহার মূল্য জানে ? আর, বুঝিলে এবং জানিলেও উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়, এই পৃথিবীতে তেমন উচ্চপ্রকৃতির মান্য গণ্য মহাজনই বা কজন আছে ?

ধূলির মনুষ্য ধূলিরই মূল্য বুঝে এবং দোকানদারিতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে, প্রাণের মূল্য বুঝে না এবং যে রীতিমত দোকানদারি করিতে না জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে না। মনুষ্যের নিকট একটি স্বর্ণাঙ্গুরি কিংবা একখানি স্বর্ণবলয় যেমন মূল্যবান্, একটা বাল্মীকি কি ভবভূতির প্রাণ তাহার অর্দ্ধমূল্যের সমান কি না, সন্দেহ। যাহারা প্রাণের বাণিজ্যে অগ্রসর, তাহারাও বাহিরের আবরণ এবং আনুষঙ্গিক লাভালাভের যেমন অনুসন্ধান করে, বাণিজ্যের প্রকৃত বস্তুটি যথার্থমূল্যবিশিষ্ট কি না, তাহা তেমন করিয়া দেখিয়া লয় না। তুমি একটি সরল, সুমধুর ও সুস্বাদু প্রাণ লইয়া এই ভবের বিপণিতে ঘুরিয়া বেড়াও ; কিন্তু উহার বহিরাবরণটি যদি গিল্টি করা ও চক্‌চ'কে না হয়, কেহই তোমার প্রতি ফিরিয়া চাহিবে না। তুমি মহত্ব ও মনস্বিতার প্রস্রবণ স্বরূপ আর একটি স্বভাব-সুন্দর প্রেম-পূর্ণ প্রাণ লইয়া ফিরি করিয়া দেখ। কিন্তু তুমি যদি

উহা লইয়া জাত দোকানদারের মত গলাবাজি করিতে না পার এবং ব্যবসায়ীদিগের নীচবৃত্তি ও নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে লাভের কথাটা ভাল করিয়া শুনাইতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে কেহই তোমার মধুর কথায় মন দিবে না। ইহা নূতন নহে। পৃথিবীর বাণিজ্য বরাবরই এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এখানে গুণাগুণের বিচারের আশা বৃথা। কত মনোহর-চরিত্র তেজঃপুঞ্জ পুরুষ লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হইয়া অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাহাদিগের দুঃখ ও লজ্জা, যেন মুক্তার হারে পরিণত হইয়া, মর্কটের গলায় শোভা পাইতেছে। কত কোকিল কাক-কোলাহলে পরাভব পাইয়া বনের প্রান্তে বসিয়া বিলাপ করিতেছে। কত ভৃঙ্গ ভেকের বিকট-ধ্বনিতে হারি মানিয়া চিত্তের পরিতাপে গুণ গুণ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; এবং কত প্রকারের কত গুণবান্ প্রার্থী মণিমণ্ডিত গর্দ্দভের নিকট বাণিজ্যের সেই বিচিত্র যাচাইতে পরাজিত হইয়া আপনার ক্ষোভে আপনি জ্বলিতেছে। আমি এই নিমিত্তই আমার বুদ্ধির সাহায্যে মনে মনে প্রায় অটল সংকল্প করিয়াছি যে,না হয় সুখ না ই হইল, আমি প্রাণ লইয়া বাণিজ্য করিব না। অনেকেই লাভের তরে ব্যাপার করিতে যাইয়া মূল-ধনে বঞ্চিত হয়। আমি দুঃখে থাকি তাহাই আমার সুখ। কিন্তু তথাপি এমন বিড়ম্বনার বাণিজ্যে বিড়ম্বিত এবং লাভের মধ্যে আমার মূলধনে বঞ্চিত হইয়া মূর্খনাম কিনাইব না।

আর বাণিজ্যের ফল ?—যাহারা জিনিশের গৌরব বুঝে, তাহারাও কি উপযুক্ত মূল্য দেয়? যদি ক্ষণকালের তরেও কল্পনার দিব্য কর্ণ পাইতে পার, তাহা হইলে ঐ শুন ক্রেতারা কি বলে। কেহ বলিতেছে,—ওহে ও প্রাণের বণিক্! এসো এসো, আমি তোমায় ফোটা ফোটা করিয়া একটু একটু ফুলের মধু খাওয়াইব, আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দেও। কেহ বলিতেছে,—আমি তোমায় একটুকু আদরের আতর এবং একছড়া অশ্রুমালা উপহার দিব, আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দেও। তৃতীয় এক জনে বলিতেছে,—ওহে আমার নিকট আদরও নাই, অশ্রুও নাই, আমি তোমায় ভ্রান্তির দর্পণে এক খানি অপূর্ব্ব ছবি দেখাইব, আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দেও। চতুর্থ এক জনে বলিতেছে,—আমি তোমায় ছবি দেখাইতে না পারিলেও ত্রিতন্ত্রীর মৃদু গুঞ্জনের ন্যায় মাঝে মাঝে মিষ্ট কথার মধুর কূজনে পরিতৃপ্ত রাখিব, আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দেও। পঞ্চম এক জন ইহার কিছুই না বলিয়া দর্প-স্ফুরিত-কণ্ঠে দর্প সহকারে বলিতেছে যে,—আমি তোমায় আমার পদ সেবা করিতে অধিকার দিব, আর যদি তুমি সৌখীন বণিক্ হও ও তোমার সখ্ থাকে, তাহা হইলে কখনও কখনও তোমাকে বিনা মেঘে ঝটিকার ভীষণ-শোভা ও বিনোদ-নৃত্য এবং মদিরার সরস-বিলসিত সজীব মূর্ত্তি দর্শন করাইব, আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দেও। কিন্তু হায়! কেহই এমন কথা বলে না যে, আমি তোমায় প্রাণের মূল্যে প্রাণ দান করিয়া,—তোমার প্রাণে আমার প্রাণ বিনিময় করিয়া,—প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া ফেলিব,—তোমাতে আমি ডু-

বিয়া থাকিব, এবং আমাতে তোমাকে ডুবাইয়া রাখিব, আমাকে তুমি তোমার ঐ প্রাণটি দিয়া কিনিয়া নেও। যে বাণিজ্যে কাচের মূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় হয়, যদি সেই বাণিজ্যই প্রবঞ্চনা বলিয়া তিরস্কৃত হইতে পারে, তাহা হইলে যে বাণিজ্যে মধু ও মদিরা এবং আদর ও আতরের মূল্যে মনুষ্যের অনন্তবিলাসী অবিনাশী প্রাণ বিক্রীত হয়, তাহাকে প্রবঞ্চনার পর প্রবঞ্চনা, প্রতারণার পর প্রতারণা এবং ছলনার পর ছলনা বলিয়া ঘৃণা করিব না কেন ?

ইহার পর স্বাধীনতা। বণিগ্‌বৃত্তির ক্রয় বিক্রয়ের কথায় স্বাধীনতাকে কি একবারে হিসাবেই আনা হইবে না ? উহার কি কিছুই মূল্য নাই ? যে স্বাধীনতাকে কবিতা স্বর্গ-সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে,—দেবতারা স্বর্গ হইতেও গরীয়সী জ্ঞানে পূজা করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার কি কিছুই গৌরব নাই ? মানিলাম তুমি মহাজনের ধর্ম্ম জান এবং মাহাজনি ধর্ম্মের মাহাত্ম্য রক্ষার নিমিত্ত প্রাণের বদলে প্রাণ বিলাইতেও প্রস্তুত আছ। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি আমি যেমন তেমন একটা প্রাণের বিনিময়ে আমার প্রাণ-গত-স্বাধীনতা রূপ অমূল্য সম্পদ জন্মজন্মান্তরের তরে তোমার নিকট বিক্রয় করিব ? আমি আজ আমার আছি,—সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে ও কড়ায় ক্রান্তিতে আমার। আমাকে কেহ ঠোঁটে করিয়াও উড়িয়া বেড়ায় না, এবং গলায় শিকৃলি বান্ধিয়া কিংবা নাসারন্ধ্রে সূতা গাঁথিয়াও টানিয়া লইয়া যায় না। আমি আজ কাহারও অধীন নহি। কেহই আমাকে দাস বলিয়া পদনখে স্পর্শ করিতে পারে না, অথবা ওঠ বলিয়া উঠায় না এবং ব'সো বলিয়া বসাইয়া রাখিতে সাহস পায় না। আরব্য উপন্যাসের গিরিপ্রস্থবাসী বৃদ্ধ যেমন হতভাগ্য সিন্ধুবাদের স্কন্ধে সওয়ার হইয়াছিল, আমার স্কন্ধে কেহই তেমন সওয়ার হইতে পারে না, এবং মিসররাজ্যের এক মায়াবিনী যেমন রোমের এক অদীনসত্ব বীরপুরুষকে বড়শীতে গাঁথিয়া দিগ্‌দিগন্তরে ঘুরাইয়াছিল, কেহই আমাকে সেইরূপ গাঁথিয়া সেই ভাবে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইতে সমর্থ হয় না। আমার এমন যে স্বাধীনতা,—এমন যে সাম্রাজ্যদুর্ল্লভ সৌভাগ্য, ইহা কি আমি একটা কথার ছাঁদ কি চাহনির ফাঁদে পড়িয়া,—ক্ষতিলাভ গণিয়া না দেখিয়া,—অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র না ভাবিয়া, অকারণে ডালি দিতে যাইব ? তুমি আত্মদানে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিনিয়া লইতে সম্মত হইয়াছ বলিয়াই কি আমি, 'রাজি রগ্‌তে, বহাল তবিয়তে', তোমার চক্ষে দেখিব, তোমার কর্ণে শুনিব, এবং কাব্যের নব রস ও কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি কাব্যাতিরিক্ত ভোগ্যের ছয় রস তোমার জিহ্বায় চাখিতে আরম্ভ করিব ? ইহারই নাম কি সুখের সার এবং সংসার-সমুদ্রের সারভূত সুধা ?

আজি আমার চিত্তের গতি অক্ষুণ্ণ ও অসীম,—সৃষ্টির অপরিসীম রাজ্যে এমন কোন স্থান নাই, এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার অনধিগম্য। আমি কখনও সূর্য্যলোকে,—কখনও চন্দ্রলোকে,—কখনও সমুদ্রে কখনও প-

র্ব্বতে ;—কখনও বিহঙ্গের পক্ষে ঐ সুনীল নভস্তলে,—কখনও শফরীর মত সরোবরের শীতল জলে। আমার প্রাণ কোথাও পিঞ্জররুদ্ধ নহে,—কিছুতেই আমাকে বাঁধিয়া রাখে না এবং কিছুতেই আমার কল্পনার বিচিত্রবিলাসে বাধা দিয়া উহাকে এক স্থানে কি একই ভাবে আবদ্ধ করে না। দেখ, আজি আমি বসন্তের সমীর। বসন্তের সমীর যেমন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়,—কুসুমের প্রস্ফুটিত মাধুরী লইয়া ধীরে ধীরে খেলা করে, আমিও সেইরূপ আমার উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ ও উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার মৃদু সমীরে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হই এবং এই বিশ্বরূপ কুসুমকাননের প্রস্ফুটিত শোভা লইয়া ধীরে ধীরে খেলা করি। আবার দেখ, আজি আমি বৈশাখের ঝড়। কৈ, কোথায় সেই শান্তি? কোথায় সেই মৃদুল-তরঙ্গ? আমি এইক্ষণ নিবিড়-কৃষ্ণ নীরদ-মালায় অঙ্গ ঢাকিয়া,—দামিনীর জলন্ত রূপে অঙ্গ আবরিয়া,—কণ্ঠে দামিনীর জলন্ত হার পরিয়া, গৃহ উপগৃহ, বন উপবন, লতাবিতান ও লতাবন্ধনে বদ্ধ উদ্ধত পাদপ লইয়া ভীম-গর্জ্জনে ব্যায়াম ও মল্লক্রীড়া করিতেছি, এবং সম্মুখে যাহা কিছু পড়িতেছে, তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কিংবা উড়াইয়া নিয়া বিষাদের উন্মাদ-হাস্যে হাসিতেছি। এই আমি গঙ্গার জল,—কল কল নাদে বহিয়া যাইতেছি,—জানি না কোথায় যাই ; এই আমি নিস্তব্ধ যামিনীর নিদ্রালস জ্যোৎস্না,—নদীর জলে, ফুলের গায়ে কিংবা বৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রাবেশে ঢলিয়া পড়ি,—জানি না কবে জাগিব? আমার এই স্বাতন্ত্র্য সুখ, এই অনির্ব্বচনীয় একতা কি একটা অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয় প্রাণের লোভে বিসর্জ্জন করিব?

আমার এই একতাই আমার কুঞ্জকানন,—এই একতাই আমার পুষ্পিত প্রমোদ-বন। আমি এখানে বিশ্ববিস্মৃত হইয়া একাকী বিরাম করি, এবং বিশ্বের সকল প্রকার বাদ-বিসংবাদ চিত্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া একাকী আপনাতে ডুবিয়া থাকি। এখানে বিষয়ের কর্ক্কশ কণ্ঠধ্বনি ও ঈর্ষ্যার তুষানল প্রবেশপথ পায় না, এবং আশা ও নৈরাশ্যের বিষাদ-দোলাও এখানে দোলায়িত হয় না। এখানে আমি আপনাতেই আপনি নিত্যপ্রীত, আপনাতেই আপনি নিত্যস্থিত ;—মান নাই, বিরহ নাই, প্রণয়ের কৃত্রিম কি অকৃত্রিম কলহ নাই ; সকল সময়ে এবং সকল ভাবেই একাকী আমি এক। ভোগ-রত মনুষ্য আমার এই অপার্থিব ও অমানুষ আনন্দের পরিচয় পায় না বলিয়াই কি আমি, এত চিন্তার পর, আমার এই নির্ম্মুক্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়া, বংশীমুগ্ধ বন-কুরঙ্গের মত বাগুরাবদ্ধ হইব?

তবে এক কণ্টক হৃদয়। হৃদয়ের মত কুবুদ্ধির অধ্যাপক, কুমতির অগ্রনায়ক, কুচক্রী ও কূটভাষী আর নাই। আমি পূর্ব্বেই আভাসে ইহা জানাইয়াছি যে, ঐ হৃদয়ই আমার সকল আকাঙ্ক্ষার আদি কারণ, সকল আশার অন্তরায়। আমি হৃদয়ের জ্বালায়ই সতত অধীর থাকি, কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। মনে আমার কত বিষয়েই কত সংকল্প ছিল, হৃদয়ের উত্তাপে ও উত্তেজনায় তাহা পুষ্পপত্রলগ্ন তুষার-কণার মত দ্রব হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। এইক্ষণ

তাহার চিহ্নও আর নাই। মনে কত বিষয়েই কত কঠোর কামনা ছিল, হৃদয়ের আতটবাহি তরঙ্গাঘাতে তাহা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। এইক্ষণ স্মৃতিপটেও তাহার পূর্ব্বতন রেখাপাত দৃষ্ট হয় না। হৃদয়ের কিসে উন্মূলন হইতে পারে, মনুষ্য কি কোথাও সেই দুরধিগম্য বিদ্যার মূলতত্ত্ব শিখিতে পাইবে না? হৃৎপিণ্ডটাকে কেমন করিয়া নখে ছিঁড়িয়া পৃথিবীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, এই চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া যায়। পৃথিবীর কোন ক্যাণ্ট, কোন কোম্‌টই কি তাহার উপায় দেখাইবে না? আমার চক্ষু আমার নহে, সে হৃদয়ের আজ্ঞাবহ। আমি যাহা দেখিতে নিষেধ করি, সে হৃদয়ের অস্ফুট আদেশে তাহাই দেখিবার জন্য আকুল হইবে। আমার কর্ণ আমার নহে, সে হৃদয়ের দাস। হৃদয় যাহা শুনিতে বলে, আমার সহস্র শাসন-সত্ত্বেও, তাহাই সে তৃষ্ণা পূরিয়া শুনিবে, এবং হৃদয় যাহা শুনিতে বারণ করে, আমি শত বলিলেও তৎসম্পর্কে সে বধির রহিবে। অধিক আর কি বলিব, আমি যে প্রাণটি লইয়া এত গৌরব করি,—যাহা এত যত্নে, এত সাবধানে অন্তরের অন্তরমধ্যে লুকাইয়া রাখিতে চাহি, তাহাও ফলতঃ ঐ হৃদয়ের। যেখানে হৃদয়, সেই খানেই আমার প্রাণ;—বৃক্ষ আর ছায়া, মুহূর্ত্তেরও ছাড়াছাড়ি নাই। হৃদয়, স্বভাবতঃ অতি দুর্ব্বল হইলেও এই বলেই বলীয়ান্ হইয়া, আমার অভিমানকে উপহাস করে, অভিমান-বর্দ্ধিত বুদ্ধিকে বালকের ক্রীড়াকন্দুক বলিয়া অবলীলাক্রমে ধিক্কার দেয়, বিবেককে বাতাহত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চল করিয়া তুলে, কল্পনাকে প্রীতির পবিত্র পদ্মাসনে টানিয়া লইয়া যায় এবং আমি যখনই একটু নিভৃতে বসিয়া চিন্তার গাম্ভীর্য্যে অটল হইতে চেষ্টা করি, তখনই 'মনুষ্য তোমায় চিনি' এই বলিয়া, মৃদু হাসি হাসিয়া, আমার ভ্রুকুটিভঙ্গির ভীষণতাতেও পরমুখপ্রেক্ষিতা ও পরাধীনতার ছায়া ফলায়। আমি এই জন্যেই এক এক বার ভাবি যে, যদি অভীষ্ট সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে যেরূপে কেন হউক না, আমার পাষাণ-কঠিনা বুদ্ধির সহিত সর্ব্বাগ্রে ঐ হৃদয়েরই একটা বিবাহ ঘটাইব; এবং যদি তাহাও একান্ত অশক্য হইয়া উঠে,—যদি হৃদয় আর বুদ্ধি বর কন্যার বেশ ধারণ করিয়া একে অন্যকে বিবাহ করিতে কোন মতেই সম্মত না হয়, তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া, পরখ করিয়া, যে আমায় প্রসন্ননয়নে সম্ভাষণ করে, তাহাকেই নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ বলিয়া প্রীত ও প্রসন্নমনে এই হৃদয়টা একবারে চিরজীবনের তরে দিয়া ফেলিব। উন্মূলন করিতে নাই বা পারিলাম, দান করিতে আর ঠেকায় কে? এবং হৃদয়টা যদি একবার দিয়া ফেলিতে পারিলাম, তাহা হইলে আমার বুদ্ধি ও অভিমান এবং চিত্তনিহিত সংকল্পেরই আর বিঘ্ন থাকে কোথায়? তখন একবারের স্থলে অনন্তবার গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারিব যে, আমি আর বিবাহ করিব না। দেখ, একমাত্র হৃদয়ই আমার শত্রু হইয়াও আমাকে বিবাহের বন্ধনে বান্ধিতে চাহিয়াছিল; আমি সেই হৃদয়কেও এইক্ষণ বিনা মূল্যে বিলাইয়া দিয়া আমার মনো-

রাজ্যে নিষ্কণ্টক, নিরুপদ্রব ও শত্রুশূন্য হইয়াছি। আমি এইক্ষণ আর ভয় করিব কার? এবং আমাকে আর উৎপীড়নই বা করিবে কে? আমার ভয় এবং উৎপীড়ন, জ্বালা ও যন্ত্রণা, সমস্তই এইক্ষণ পরের ঘরে। হৃদয়ের সহিত যদি হৃদয়ের বিবাদ বাধে,ত সেখানে বাধিবে। আমার তাহাতে কি? আমি ইহাতে বরং সুখী হইব, এবং যে জ্বালায় আমি জ্বালাতন রহিতাম, অন্যে তাহার দ্বিগুণ জ্বালায় দগ্ধ হইয়া দুটি হৃদয়ই পুনরায় তাহার প্রাণ, মন ও সর্ব্বস্ব দক্ষিণার সহিত ফেরত দেওয়ার অভিলাষে কাতর-স্বরে যাচ্ঞা করিতেছে, ইহা দেখিয়া আনন্দে ভাসিব।

শারীরক্রিয়াতত্ত্ব। ১

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।*

প্রথম প্রস্তাব।

অতি অল্পমাত্র লোকে স্বীয় দেহের গঠনপ্রণালী, এবং উহার অবান্তর অংশগুলির ক্রিয়াপ্রণালীর বিষয় অবগত আছেন। প্রাণ-সংরক্ষণ কি কি ব্যাপার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং কি কি নিয়ম দ্বারা ভৌতিক জীবন নিয়মিত হইতেছে তদ্বিষয়ে অল্পই লোকে খবর রাখেন। শারীরক্রিয়াতত্ত্ব সাধারণ শিক্ষার, কিম্বা বৈশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষার অঙ্গ নহে। কিন্তু এবংবিধ স্বদেহানভিজ্ঞতার প্রবলতা বহুবিধ দুঃখ, ক্লেশ, রোগ ও মৃত্যুর হেতুভূত। সকলেরই কিয়ৎপরিমাণে এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা উচিত, অথচ অনেকে মনে করিতে পারেন এ বয়সে শারীরবিদ্যার বহি পড়িয়া আর শারীর-ক্রিয়া-তত্ত্ব শিখা পোষায় না। অনেকের সে ইচ্ছা থাকিলেও সামর্থ্য বা অবকাশ না থাকিতে পারে। আমরা বান্ধবের পত্রে অল্প অল্প করিয়া উক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করি। আমরা কিছু শারীর-ক্রিয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক গ্রন্থ লিখিব না, তথাপি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা যে সমুদায় তত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ প্রকটিত করিব। সুবুদ্ধি পাঠকগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি থাকিবে, এবং প্রসঙ্গক্রমে দৈহিক বিধানের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কি কি বিপদুপস্থিতির সম্ভাবনা, তাহা হইতে এড়াইবার উপায়, এবং উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার-বিধি, এসকল সম্বন্ধেও দু একটা কাজের কথা উল্লেখ করা যাইবে।

পূর্ণাবয়ব মনুষ্যের জীবন্ত দেহ একটি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ কল বিশেষ। ইহা তদ্বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদনের পক্ষে বিচিত্র

রূপে উপযোগী। এই কলের চলদবস্থা এবং স্বীয় ক্রিয়াবলীর নিষ্পাদনই দেহের জীবন। এই জীবন কি প্রকারে সংরক্ষিত হয়, তাহা প্রদর্শন করাই শারীর-ক্রিয়া-তত্ত্ব বিদ্যার উদ্দেশ্য। মনুষ্যের হাতের গড়নের ন্যায় এই সুন্দর অথচ জটিল কলটিও কতকগুলি সুজ্ঞাত রাসায়নিক ও গতিবিষয়ক নিয়মের বশবর্ত্তী; এবং সে গুলির প্রত্যবায় হইলে যন্ত্রব্যাপার বিশৃঙ্খল হয়, ক্রিয়াসমূহ অসম্পন্ন থাকে এবং যন্ত্রের কর্ত্তব্য অকৃত বা অসম্যক্ কৃত অবস্থায় থাকে; যাতনা, বলহানি, ব্যাধি, এবং পরিণামে মৃত্যু তাহার অনুগামী হয়। এই সকল বিপৎপাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মানবজীবনের নিয়মাবলীর বিষয়ে পরিচিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এবং তাহা হইতে হইলে মানবশরীরের গঠন ও ক্রিয়া-প্রণালী জানা চাই। পূর্ণাবয়ব নরের আকৃতি আমাদের সকলেরই সুপরিজ্ঞাত; কিন্তু তিনি কি কি উপাদানে নির্ম্মিত, তাঁহার শরীরের ভিন্নভিন্ন অংশ কি প্রকারে সংহত,কি প্রণালীতে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া গুলি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাদের সংরক্ষণের জন্য কিসের কিসের আবশ্যকতা, এ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই আছে।

হয়তো অনেকে মনে করেন তাঁহারা যে পরিমাণ শারীরিক কিংবা মানসিককার্য্য করেন, শরীরটা সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কার্য্য নির্ব্বাহেই পটু, কিন্তু ইহা অনায়াসেই তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারা যায় যে,উহা আপনার বাহিরে যে কার্য্য করে, তাহা ছাড়া আপনাকে সজীব, গতিশীল, এবং উক্ত বাহ্যকর্ম্মক্ষম রাখিবার জন্য নিজের অভ্যন্তরে অনেক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কার্য্যের জন্য, গঠনের বিলক্ষণ দৃঢ়তা, শক্তি ও ক্রিয়ার বহুব্যাপকতা, প্রক্রিয়া বাহুল্য, এবং সমস্তের সংরক্ষণোপযোগী সামগ্রীর আয়োজন, এই সকল গুলিই অত্যাবশ্যক। সজীব, সকর্ম্মক মনুষ্য নিয়তই গতিশীল—তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও দেহকরণ* সমস্তই গতিশীল —এবং এতাবতা গতি-জননী শক্তি, উত্তাপবিকাশ, ও বস্তুক্ষয় সমগ্রই তাহাতে চলিতেছে, এবং এই সমগ্রেরই জন্য উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন। একজন মনুষ্যের প্রতিদিনের বাহ্যিক কার্য্য—অর্থাৎ একজন সবল, সুস্থকায়, পরিশ্রমী ব্যক্তি চব্বিশ ঘণ্টা পরিমিত দিনমানের মধ্যে যে পরিমাণ বাহ্যিক বাধা অতিক্রম করিতে পারে তাহা—প্রায় ন্যূনাধিক ৭,১৫,০০০ ফুট পৌণ্ড গণনা করা হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে তৎকর্ত্তৃক ৭,১৫,০০০ পৌণ্ড ভার এক ফুট উচ্চে উত্তোলিত হইতে পারে। আভ্যন্তরিক কার্য্যও সেই পরিমাণেই অনুমিত হইয়া থাকে; শোণিতের চঙ্ক্রমণ (Circulation) বা চক্রভ্রমণ রূপ গতিকার্য্য সংরক্ষণের জন্য ৫০০৫০০ ফুট পৌণ্ড পরিমিত বলের প্রয়োজন, শ্বাসক্রিয়া-সাধক দেহ-চালনারূপ গতিকার্য্য নির্ব্বাহার্থে ৭৮,৬৫০ ফুট পৌণ্ড, এবং

* Organs অর্থাৎ দেহস্থিত যে সকল যন্ত্রদ্বারা বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, যথা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি, এবং ফুসফুস, যকৃৎ,প্লীহা প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহ।

শরীরের অপর নানাবিধ আভ্যন্তরিক ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরূপ গতিকার্য্যার্থ ১,৩৫,৮৫০ ফুট-পৌণ্ড। মতান্তরে কার্য্য-পরিমাণকে ইহা অপেক্ষা কম বলিয়াছেন। হক্‌স্লীর মতে ১৫৪ পৌণ্ড ওজনের পূর্ণবয়স্ক মানব ৪৫০ ফুট-টনের * সমপরিমাণ কার্য্য করিতে সক্ষম।

কোদালি পাড়িতে, হাতুড়ি পিটিতে, দাঁড় টানিতে, বেড়াইতে, দৌড়াইতে কিংবা লাফাইতে যে ভৌতিক বলের প্রয়োজন হয়, সজীব দেহাভ্যন্তরেই তাহার বিকাশ হইয়া থাকে, এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তিতেই তাহার ব্যয় হয়। অপিচ তথাবিধ বলবিকাশের উপায় বিধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরন্তু ভৌতিক বলের ন্যায় উত্তাপও দেহাভ্যন্তরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুস্থ মানব শরীরের অভ্যন্তর ভাগ সমভাবে ফাহ্রেণহীটের তাপমানের ৯৮° অংশ উত্তাপ রক্ষা করিয়া থাকে। ভিতরে যে সমস্ত রাসায়নিক পরিবর্ত্তন চলিতেছে তজ্জন্য, এবং শরীরের স্বচ্ছন্দতার জন্যও, এই উত্তাপ আবশ্যক। ইহা আবার বাহির হইতে নিয়তই বিকীর্ণ হইতেছে। শরীরের সর্ব্বত্র উত্তাপ রক্ষার্থ, এবং অতিরিক্ত বিকিরণ নিবারণার্থ আমরা যে বস্ত্রাদি পরিধান করি, ইহাতেই সে গুলিকে গরম করিয়া রাখে। এই হেতুকই একঘরে অনেক লোক জমা হইলে তত্রত্য উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, এবং যে বরফ মাটিতে পড়িয়া থাকিলে জমাট অবস্থাতেই থাকিত, † হাতে তুলিলে তাহা গলিয়া যাইতে থাকে। আর উত্তাপ যে কেবল ত্বক্ হইতেই বিকিরণ দ্বারা নিঃসৃত হইয়া থাকে তাহা নহে, উহা নিশ্বাসের সঙ্গেও নির্গত হয়। শরীরের ভিতরকার উষ্ণতা বাহিরের উষ্ণতার অপেক্ষা বেশি; তাহা অনায়াসেই একটি সূক্ষ্ম তাপমান ‡ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে; এবং বালকেরাও তাহা জানে—তাহারা বড় শীতের দিনে ঠাণ্ডা হাতগুলি হাঁই দিয়া গরম করিতে চেষ্টা করে। এবংপ্রকারে বিকীর্ণ ও নিশ্বসিত উত্তাপ দেহমধ্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দ্বারা বিকাশিত হইয়া থাকে, এবং উহার উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক উপায় বিধান করিতে হয়। অপিচ এই একমাত্র শক্তিই বিকাশিত হয় এমন নহে, এতদ্ব্যতীত আরও স্নায়বা শক্তি, চৌম্বক শক্তি, মানসিক শক্তি এ সকলও আছে। যখন কোন ব্যক্তি অত্যন্ত যাতনা সহিতে থাকে, তজ্জন্য শরীর ও অঙ্গাদির অল্প মাত্রই সঞ্চালন থাকিতে পারে, কিন্তু অনেকে ভুগিয়া বেশ জানেন যে যাতনা বিলক্ষণ বলহারক—তাহার কারণ, কষ্ট সহিতে গিয়া স্নায়বা শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে সকল বিদ্যা-ব্যবসায়ীরা মস্তি-

* ২২৪০ পৌণ্ডে এক টন হয়। ১পৌণ্ড প্রায় আধ সেরের সমান।

† যাঁহারা শীতপ্রধান দেশে, অথবা উচ্চ পর্ব্বতে শীতকালে থাকিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, একবার বরফ পড়িয়া এমন কি কখন কখন ৫। ৭ দিন জমাট অবস্থাতেই থাকে।

‡ এইরূপ তাপমান ডাক্তরেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাকে Clinical thermometer বলেন।

ক্ষের দ্বারা অধিক কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনেক সময়ে স্নায়ব্য শক্তিকে এত অধিক পরিমাণে ব্যয় করিয়া ফেলেন যে,একটু দীর্ঘভ্রমণে উহার পুনঃসঞ্চয় হইতে পারিলেও, সে দিকে তাঁহাদের ইচ্ছা বা সামর্থ্য থাকেই না। লেখক যখন কাগজের উপর তাঁহার চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন, তখন কলম চালানে যে গতিক্রিয়া, তদ্ব্যতীত ভাবকল্পনা, এবং শব্দাবলীদ্বারা তৎপ্রকটনরূপ মানসিক ক্রিয়াও হইতে থাকে। লিপিকার্য্য যেমন গতিশক্তির ফল, ইহাও তেমনি মানসিক শক্তির ফল। এই প্রকার সকল সূক্ষ্ম শক্তিই দেহাভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়, এবং তাহাদের ব্যয়-হেতুক ন্যূনতার পূরণ করা আবশ্যক।

অপিচ এই সকল শক্তির উৎপাদনে এবং জীবনের সংরক্ষণে অব্যবহৃত ও অকর্ম্মণ্য কতকগুলি পদার্থ আসিয়া জুটে, তাহাদিগকে নিয়তই নিষ্কাশিত করিতে হয়। এই আবর্জ্জনাগুলির স্থান পূরণ ও তন্নিবন্ধন হানির সংস্করণ করা আবশ্যক। ইহারা শরীর হইতে আঙ্গারিকাম্ল গ্যাস, জল, মৌত্রিকা, * এবং গাঢ় মলরূপে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। প্রথমোক্তটি যে নিয়তই শরীর হইতে বহির্গত হইতেছে তাহা একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে। পরিষ্কার, স্বচ্ছ, চূর্ণ-জল † আঙ্গারিকাম্ল গ্যাসের সত্তার রাসায়নিক নির্ণায়ক ‡। সাধারণ বায়ুকে উহার ভিতর দিয়া চালাইলে উহা স্বচ্ছই থাকিবে; সামান্য পিচকারীর দ্বারা তাহা দেখা যাইতে পারে। ফুস্‌ফুস হইতে নিশ্বসিত শ্বাস-বায়ু চালাইলে উহা দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ ও আবিল হইয়া যায়; একটি নলের ভিতর দিয়া ফুৎকার দিলেই তাহা দেখা যাইবে। এরূপ হইবার কারণ, নিশ্বাস বায়ু স্থিত আঙ্গারিকাম্ল জলস্থিত চূর্ণের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। অপিচ নিশ্বাসের সঙ্গে যেমন আঙ্গারিকাম্ল নির্গত হয়,তেমনি জলও নির্গত হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ শীতকালে মুখ হইতে কুয়াসার ন্যায় বাষ্প বহির্গত হয়; বহুযাত্রিপূর্ণ রেলগাড়ির সার্সিগুলি বন্ধ থাকিলে গ্লাসের উপর স্বেদ দেখা দেয়; মুখের সাম্নে আরসি ধরিলে তাহা বাষ্পাবিল হয়। জল এইরূপে কেবল ফুস্‌ফুস্ হইতেই নিঃসৃত হয় তাহা নহে, উহা ত্বক্ হইতেও উদ্‌গত হইয়া থাকে। অজ্ঞাতসারে এক প্রকার ধর্ম্মোদয় নিয়তই হইতেছে; একখণ্ড, উত্তম্ পালিশ করা শীতল কাচ বা ইস্পাতের কোন দ্রব্য হাতে ধরিলেই তাহা সুগোচর হইবে, দেখিবে তৎক্ষণাৎ তাহার উপর স্বেদ

* Urea, ইহা রাসায়নিক ব্যাসক্রিয়া দ্বারা মূত্র হইতে পাওয়া যায়। ইহা মূত্রের একটি প্রধান নির্ম্মাণোপাদান; ১০০০ ভাগ সুস্থ ব্যক্তির মূত্রে কিঞ্চিদধিক ১১।. ভাগ মৌত্রিকা থাকে।

† অসিক্ত চূর্ণ একটা বোতলের মধ্যে পূরিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিয়া রাখিলে কিয়ৎকাল পরে থিতাইয়া যে পরিষ্কার জল হয়। Lime water.

‡ যে দ্রব্যের সাহায্যে রাসায়নিক পরীক্ষা বিধির দ্বারা কোন মিশ্রদ্রব্যস্থিত জ্ঞাতব্য বিশেষ দ্রব্যের সত্তা নির্ণয় করা যায়, সেই দ্রব্যকে শেষোক্ত দ্রব্যের রাসায়নিক নির্ণায়ক কহে। ইংরাজীতে ইহার নাম Chemical test.

জমিয়া যাইবে ত্বক্ হইতে কিয়ৎপরিমাণে লাবণ দ্রব্যও নিঃসারিত হইয়া থাকে, তাহাতেই ঘর্ম্মের একপ্রকার ক্ষারবৎ আস্বাদন ও বিশিষ্ট প্রকার গন্ধ অনুভূত হয়। মূত্র ও পুরীষাকারেও লাবণ দ্রব্য, স্থূল, এবং গাঢ় দ্রব্য পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে নিয়তই ক্ষয় চলিতেছে। সুতরাং সেইরূপ নিয়তই ক্ষতি-পূরণ আবশ্যক। এই ক্ষয় শ্রমের সমানুপাতে হইয়া থাকে। সোমবারের শ্রমে যে ক্ষয় হয়, রবিবারের বিশ্রামে তাহা অপেক্ষা কম হয়; অতএব আহার যোগানের আবশ্যকতাও কম থাকে। যদি ভোজনের পর কাহাকেও ওজন করা যায়, আর তাহার পরে সে ছয় ঘণ্টাকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অথবা নিদ্রা যায় এবং তৎপশ্চাৎ আবার তাহাকে ওজন করা যায়, তাহা হইলে ইতিমধ্যে তাহার ওজন কমিয়া গিয়াছে দেখা যাইবে। আবার যদি ঐরূপ ভোজনের পর সে ব্যক্তি ছয় ঘণ্টা ভ্রমণ করে বা কোন কর্ম্ম করে, তবে অন্তরাবর্ত্তী সময়ের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ওজন কমিয়া গিয়াছে দৃষ্ট হইবে। এতাবতা শ্রমের সমানুপাতেই ক্ষয় হইয়া থাকে (ক্রমশঃ) শ্রীঃ-

দেবতার বাহন

হিন্দুশাস্ত্রে সকল দেবতারই একটি বাহন আছে। অন্ততঃ কোন প্রধান ও প্রসিদ্ধ দেবতাই বাহন-শূন্য নহেন। কিন্তু যিনি দেবতাদিগের বাহন কল্পনা করিয়াছেন, সেই দেব-কবির কল্পনা সকল সময়ে আমাদিগের মানব-বুদ্ধির অধিগম্য হয় না।

ব্রহ্মার বাহন হংস। এ বেশ কথা। ব্রহ্মা মানস-সরোবরে ভাসিয়া ভাসিয়া চারি মুখে চারি বেদ গাইয়াছেন এবং তাঁহার বাহন-রূপী রাজহংসও কল কল মধুর-নাদে সেই বেদ-ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া চারিদিগ্ নিনাদিত করিয়াছে। বিষ্ণুর বাহন গরুড়। ইঁহাও সর্ব্বথা উপযুক্ত। বিষ্ণু যেমন দেবতার মধ্যে, গরুড় তেমন বিহঙ্গের মধ্যে। উভয়ই তেজস্বী, দুষ্টনাশক, শিষ্টপালক এবং লোকসর্প ও সর্পলোকের স্বভাব-শত্রু। বিষ্ণুর জন্য গরুড় না হইলে ত্রিভুবন রক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। বম্ ভোলানাথ মহাদেবের জন্য বৃষভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাহনের কল্পনাই অসম্ভব। মহাদেব যেমন আশুতোষ, অক্রোধ অথবা ক্ষণ-ক্রোধী এবং অল্পে তুষ্ট, তাঁহার বাহনটিও তথৈবচ। নারদের বাহন ঢেঁকি;—না হইলেই হয় না। যখন প্রৌঢ়-কল্পা পুর-কামিনীরা, রুদ্রতালে নাচিয়া নাচিয়া এবং পঞ্চমের উপর নবমে উঠিয়া, হিন্দোল রাগের আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হন, অথবা পানের কথা কি চুণের কথায় কর্ণার্জ্জুনের পালা গাইয়া লন, তখন ঢেঁকির সেই ঢকঢকি ভিন্ন তাল থাকে আর কিসে? পবনের বাহন মৃগ, এবং মৃগের আর এক নাম বাত-প্রমী। যাঁহারা কালিদাসের চক্ষু লইয়া ব্যাধ-ভীত কুরঙ্গের গতি দেখিয়াছেন,—এই আছে, এই নাই,—এই এখানে,—এই দূরতর দূরে,—বন-মৃগের

সেই মায়াগতি যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা উহাকে পবনের বাহন বলিয়াই স্বীকার করিবেন। যমের বাহন মহিষ। মহিষের ক্রুদ্ধমূর্ত্তি যমের অন্যতম প্রতিমূর্ত্তি। যে কদাচিৎ কখনও উচ্ছৃঙ্খল মহিষের গল-ঘন্টা-নিঃসৃত ঘনরব শুনিয়াছে, সে মৃত্যুর স্পর্শসুখে শীতল হইয়া না থাকিলেও মৃত্যুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছে। কুবেরের বাহন পুষ্পরথ। ইহা ভাব-সঙ্গত। কারণ, যেখানে কুবেরের ধন, সেই খানেই স্তুতির পুষ্প-বৃষ্টি। সেখানে অন্ধের নাম পদ্মলোচন, কুষ্মাণ্ডের নাম কীর্ত্তিকল্পতরু, ধৃষ্টতার নাম সাহস, যণ্ডতার নাম সখ্, দুর্নীতির নাম সুনীতি, দুর্মুখের নাম দয়াল রাম এবং রাত্রির নাম দিন। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত এবং শক্তির বাহন সিংহ। উভয়ত্রই চিত্র-নৈপুণ্য পরিস্ফুট। কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর;—রূপে গুণে দুইই দুইয়ের অনুরূপ। ময়ূর যখন উহার মোহন-পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আনন্দে ও অভিমানে স্ফীত হয়, তখন উহার পৃষ্ঠে কার্ত্তিক বিনা আর কে বসিতে পারে? আর কার্ত্তিক যখন সৌন্দর্য্যের ছায়ায় সজীব শক্তি ধারণ করিয়া রূপে ও তেজে সমুজ্জ্বল হন, তখন ময়ূর বিনা আর কে তাঁহাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিতে সাহস পায়? গণেশের বাহন ইঁদুর। ইহা আপাততঃ অতি বিসদৃশ হইলেও ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। গণেশ গণ-পতি * এবং গণ-পতি বলিয়া সিদ্ধিদাতা, সুতরাং ইঁদুর তাঁহার যোগ্য সহচর। কোথায় কোন্ গণপতি ইঁদুরের দাঁত বিনা স্বকার্য্য সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন? কোথায় কোন্ গণপতি ইঁদুরের দাঁতে পথ না খুলিয়া গন্তব্য স্থলে প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছেন? এই জন্যই আগে ইঁদুর, তার পর সিদ্ধিদাতা। এই জন্যই যাহারা মনুষ্যের মধ্যে মূষিক-জাতীয়,—আকৃতি প্রকৃতি ও সর্ব্বাংশে মূষিক,—যাহাদিগকে দেখিলেই চক্ষু বিরক্ত হয়, যাহাদিগের ঘ্রাণমাত্রেই শরীর ও মন ঘৃণায় শিহরিয়া উঠে, তাহারা গণ-পতি পুরুষদিগের নিত্যপার্শ্বচর ও প্রীতিভাজন।

* The Leader of a party.

এ সকল বেশ বুঝিলাম। কেবল একটি কথা বুঝিতে পারিলাম না। বৈকুণ্ঠবিলাসিনী লক্ষ্মীর জন্যে, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত পশু পক্ষীর মধ্যে, সকল ছাড়িয়া একটা পেচক কেন বাহন-রূপে গৃহীত হইয়াছে, ইহা ভাল রূপে আমার বুদ্ধিস্থ হইতেছে না। লক্ষ্মী দেবতার মধ্যে দেবতা,—ভুবন-মোহিনী, বিশ্বপালিনী, এবং সাপত্নাসত্ত্বেও বীণাপাণির অগ্রগামিনী। তাঁহার জন্য একটা বিকট-মূর্ত্তি পেঁচা কেন? যাঁহার পদরজঃস্পর্শে বিষ্ণু পুলকিত হন, ব্রহ্মাও কৃতার্থ হন,—সংসার সুখসম্পদের সানন্দহাস্যে সন্ধ্যাকালীন কুসুম-কাননের প্রফুল্লকান্তি ধারণ করে, যাঁহার বাতাস লাগিলেই অবনী ধনধান্যে পরিপূর্ণা হয়, অরণ্য অপূর্ব্ব নগর হইয়া উঠে এবং ভস্মস্তূপে সোণা ফলে, তাঁহার [illegible]টে এই লাঞ্ছনা কে লিখিল? পেচকের মত একটা কুৎসিত-কণ্ঠ কদর্য্য পক্ষীকে কে আনিয়া তাঁহার বাহন করিয়া দিল?

প্রশ্ন হইলেই তাহার উত্তর হয়। এপ্রশ্নেরও অবশ্যই একটা উত্তর হইবে। কিন্তু আমি আমার চিত্তকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য যে একটা উত্তর ঠাউরাইয়া রাখিয়াছি,

তাহা লক্ষ্মীর উপাসক দিগের মনঃপূত হইবে কি না, বলিতে পারি না। আমার এই মনে লয় যে, পেচক দিবাভীত * আলোক-সঙ্কুচিত ও অন্ধকার-প্রিয় এবং এই সকল অদ্ভুত গুণেই উহা লক্ষ্মীর প্রিয় বাহন। লক্ষ্মীর গতায়াত অন্ধকারে। তিনি নারিকেলে জল সঞ্চারের মত কখন আসেন, তাহা কেহ দেখে না। দেখিবার নিমিত্ত অনেকে কোজাগরী পূর্ণিমায় † শয্যা ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে, তথাপি দেখিতে পায় না। কিন্তু যখন তিনি ঐরূপ অলক্ষিত গতিতে একবার আসিয়া উপবিষ্ট হন, তখন সকলেই তাঁহাকে দেখে এবং দেখিয়া মধুলুব্ধ মক্ষিকার মত তাঁহার আসনের চতুষ্পার্শ্বে ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করে। যাহারা ব্রহ্মার বেদ, বিষ্ণুর পালনী রীতি, মহাদেবের আশুতোষ ভাব, পবনের দ্রুত গতি, কৃতান্তের সংহারিণী মূর্ত্তি, ইন্দ্রের বজ্র এবং শক্তির তেজোরাশি পরিত্যাগ করিয়া শুধু লক্ষ্মীরই আরাধনা করে;—ধর্ম্ম থাক্ বা না থাক্, দয়া বাথিত হউক কিংবা বিনাশ পাউক এবং জ্ঞান, মান ও পৌরুষী প্রতিষ্ঠা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাউক তথাপি লক্ষ্মীর সেবা করিব এই যাহাদিগের স্থির সংকল্প, তাহাদিগেরও গতায়াত অন্ধকারে। তাহারাও দিবাভীত, আলোক-সঙ্কুচিত, অন্ধকার-প্রিয়। কি দিয়া কি করে কেহ তাহা বুঝে না; তৃণ হইতে তাহারা কেমন করিয়া তাল তরুর মত বাড়িয়া উঠে, কেহ তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে ন্যায়ের জ্যোতি, অথবা নীতির দীপ্তি, সেখানে তাহারা পেচকের মত। চক্ষু মেলিয়াও মেলে না, পাছে লক্ষ্মী রুষ্ট হন। যেখানে কাতরের করুণ বিলাপ এবং শোক দুঃখ ও বিষাদ-বেদনার হৃদয়-বিদারী পরিতাপ সেখানেও তাহারা পেচকের মত। প্রাণান্তেও ফিরিয়া চাহে না, পাছে লক্ষ্মী ক্রোধভরে চলিয়া যান। পেচক ইহাদিগেরই প্রতিকৃতি এবং হয়ত হইতে পারে যে, এই হেতুই পেচকে লক্ষ্মীর অচলা প্রীতি।

পেচকের আর এক গুণ আছে। পেচকের মুখে আর কোন শব্দ নাই, একমাত্র শব্দ—'নিম্'। এই একই ধ্বনি বই পেচক আর কোন ধ্বনি শিখে নাই, এই একই কথা বই পেচক আর কোন কথা কহে না। উহার সকল কথারই আদি কথা ও শেষ কথা—চিরতিক্ত 'নিম্'। যাহারা আলোক-ভয়ে ভীত রহিয়া,—অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া,—শুধু অন্ধকারেই লক্ষ্মীর উপাসনা করে, তাহাদিগেরও সকল আশা, সকল ভরসা এবং সকল প্রকার সুখ সম্পদের শেষ পরিণাম কি নিম্ নহে? তুমি অনাথা ও অসহায়া অবলার গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া নিয়া আপনার পর্ণকুটীরকে লক্ষ্মীর বিলাস-যোগ্য প্রাসাদ বানাইলে; ইহার পরিণাম নিম্। যে তোমাকে অন্ধবৎ বিশ্বাস করিয়া, আপনার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অন্ধকারে তোমার

* অভিধানে দিবাভীত শব্দের দুই অর্থ লিখে,—এক পেচক আর চোর।

† "নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্ত্তীতি ভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ।"

নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিল, তুমি অন্ধকারে তাহাকে প্রতারণা করিয়া আজি কুসুম শয্যায় শয়ান হইয়াছ; তোমার এ সুখের পরিণাম নিম্। তুমি শত সহস্র লোকের দুঃখ সন্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পাল উড়াইয়া তোমার বাহাদুরীর ডিঙ্গা বৈভবের বন্দরে আনিয়া বাঁধিয়াছ; তোমার এ বৈভবের পরিণাম নিম্। তুমি জোঁকের মত আশ্রয় লতার রক্ত শুষিয়া আপনি এইক্ষণ ফুলিয়া অতি বড় হইয়াছ; তোমার এই স্ফীত-দেহের পরিণাম নিম্। তুমি সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য করিয়া সম্পদের স্বর্ণপর্য্যঙ্কে আরোহণ করিয়াছ; তোমার এই সম্পদের পরিণাম নিম্। তুমি দ্বারস্থ দুঃখী ও ভিক্ষান্নপোষ্য প্রতিবেশীদিগের আর্ত্তনাদে বধির রহিয়া, আপনি পায়স-পলান্ন ও পঞ্চব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইতেছ; তোমার এই ভোগের পরিণাম নিম্। তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে দুর্ম্মন্ত্রণা ও কথার ছলনায় নানাবিধ দুষ্কৃতিতে ডুবাইয়া আপনি তাহাদিগের নষ্ট ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছ; তোমার এই ঐশ্বর্য্যের পরিণাম নিম্। তুমি কলঙ্কের ডালি মাথায় বহিয়া কলঙ্কের মূল্যে প্রভুত্ব কিনিয়াছ; তোমার এ প্রভুত্বের পরিণাম নিম্। তুমি বিচারের নামে অবিচার অথবা বাণিজ্যের নামে বঞ্চনা করিয়া আজি দানবদর্পে দৃপ্ত হইয়াছ, তোমার এই দর্পের পরিণাম নিম্। তুমি কমলার কৃপাকটাক্ষলাভের জন্য মহত্ব ও মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া কখনও শৃগাল এবং কখনও কুক্কুরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ,—কখনও সর্পের মত ফণা ধরিয়াছ, কখনও হাড়গিলার মত গলা বাড়াইয়াছ,—যে তোমার গ্রাসে পড়িয়াছে, তাহারই মাংস খাইয়াছ এবং যে তোমার নিকটে আসিয়াছে, তাহাকেই আগুনের জিহ্বায় পুড়িয়া ফেলিয়াছ,—আর যাহাকে নিদ্রায় দেখিয়াছ, দূরদর্শী শকুনির মত তাহারই উপরে গিয়া উড়িয়া পড়িয়াছ; তোমার এই সমস্ত আশা ও উদ্যমের শেষ পরিণাম নিম্। এই হাস্য ও রসোল্লাসের অবসান নিম্; এই অজস্রবাহিনী আমোদলহরীরও অস্তিমগতি নিম্। লক্ষ্মীর পেচক এই নিমিত্তই মনুষ্যকে নিম্ নিম্ বলিয়া সাবধান করে, এবং চিরচঞ্চলা লক্ষ্মীও বোধ হয় এই কথাই বুঝাইতে চাহেন বলিয়া পেচককে এত আদর করেন। কিন্তু মনুষ্য সাবধান হয় কৈ? রাবণের সোণার লঙ্কা এইক্ষণ শ্মশান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে,—কুরু পাণ্ডবের হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ, মোগলের ময়ূরসিংহাসন, মহারাষ্ট্রীয় দুরন্ত দণ্ড ও জয়বৈজয়ন্তী এবং সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর ও রাজবল্লভ প্রভৃতি খদ্যোতচয়ের বিহারভূমি শ্মশানানলে দগ্ধ হইয়া নিম্বে পরিণত হইয়াছে! হা লক্ষ্মী! এই যদি তোমার পদারবিন্দ সেবার পরিণাম ফল,—তুমি যেখানে গিয়া অধিষ্ঠান কর, সে স্থানই যদি কালে ফল ফুল ও তৃণ লতাদি পর্য্যন্ত লইয়া অঙ্গার হইয়া যায়,—তুমি যাহার প্রতি করুণা কর, তাহারই সর্ব্বনাশ দেখিতে যদি তোমার প্রীতি জন্মে, অথবা যাহাকে ভালবাসিয়া বাড়াও, তাহারই মাথায় বজ্রের আঘাত করিয়া যদি সুখী হও, তবে কেন মনুষ্য তোমার মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া তোমার জন্য একে আর কলায়, একে আর

ঘটায়,—পতঙ্গের ন্যায় আগুনে ঝাঁপ দেয় এবং কীট পতঙ্গ ও পশুপক্ষী যাহা করিতে লজ্জা পায় কিংবা সন্তপ্ত ও সংকুচিত হয়, তাদৃশ নৃশংস কিংবা নীচ কার্য্যও অম্লান ব-দনে ও আনন্দিত মনে সম্পাদন করে ?

যাঁহারা গৃহলক্ষ্মী বলিয়া জগতে পূজা পাইয়া থাকেন,—লোকে পুষ্পচন্দনে ও পাদ্য অর্ঘে পূজা না করিয়া,আলতা, আতর এবং আভরণাদি দ্বারা যাঁহাদিগের পূজা করে, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই অনেক সময়ে পেচকানুরক্ত ও পেচকারূঢ় দৃষ্ট হন। ইহাও কি লক্ষ্মীরই অনুকরণে ? না আর কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ বিশেষ গুণের অলক্ষিত আকর্ষণে ?

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "বিক্রমপুর প্রকাশ। মাসিক সংবাদ, সন্দর্ভ ও সমালোচন। ১ ম খণ্ড, ১ ম সংখ্যা। শ্রীনগর, বীরতারা, বিক্রম-পুর কার্য্যালয় হইতে, শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।"—আমরা এই পত্রি-কার সমালোচনা করিব না। বোধ হয় স-মালোচনা করিতে আমাদিগের অধিকারও নাই। কারণ,সম্পাদক ইহার আবরণ-পত্রের উপর একস্থলে হস্তাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন যে,—'এই পত্রিকা সম্বন্ধে কোন কিছু স-মালোচনা করিবেন না, মাথার দিব্য।' এই কথার পর সমালোচনা করিতে যাওয়া নি-তান্তই ধৃষ্টতার কার্য্য। কিন্তু সমালোচনা করিতে অধিকারী নই বলিয়া আমরা যে ইহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিতেও অধিকারী নহি, এমন নহে। যখন পড়িবার অধিকার আছে, তখন উদ্ধৃত করিবারও অধিকার আছে। অতএব আমরা ইহার দুই চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াই এ বারকার তরে পরিতৃপ্ত রহিব। প্রথমতঃ কবিতা,—

"কার্ত্তিক বারুণী মেলা, মেলার প্রধান।
নামেই কার্ত্তিক!—প্রকৃত যে অগ্রাহাণ!
উঠাইছে জিনিসাত করি ভিন্ন ভার।
কত লোক! কিন্তু—গণে সাধ্য কার?"

তার পর গদ্য প্রবন্ধ ;—"যদি আমাকে পাগল বল,—বল! ইহাতে আমার আপত্তি নাই।—তোমরা আমাকে ছাগল বল,—বল আমি নিরুত্তর রহিব।"

একথার পর আবার কে বলিবে, বল।

২। "ভিষক্ বা The Physician চি-কিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ঢাকা ভৈষজ্যসমালোচনী সভা হইতে প্র-কাশিত।"—বাবু সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ, বাবু দুর্গাদাস রায় এবং বাবু কাশীচন্দ্র দত্ত প্র-ভৃতি চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ ক-র্ত্তৃক এখানি সম্পাদিত হইতেছে। সুতরাং ইহা না বলিলেও সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, ইহাদ্বারা বাঙ্গালা চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আছে। এদেশে ইদানীং অনেক হাতুড়িয়া বৈদ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারা যমের অব-তার। যাহাকে ধরে, তাহার আর রক্ষা নাই। সে বাঁচিয়া উঠিলেও চিরদিন যমের ভয় হইতে চিকিৎসকের ভয়ে অধিকতর-

অস্থির রহে। যেখানে ম্যালেরিয়া, সেই-খানেই ইহারা; অথবা যেখানে ইহারা, সে-খানেই ম্যালেরিয়া। গ্রাম্য প্রদেশেই ইহাদিগের বেশী আড়ম্বর, এবং মূর্খ ও স্ত্রীলোকের চিকিৎসায়ই ইহারা সমধিক পটু। এই শ্রেণীর মহাপুরুষেরা ভিষকের পাতা মাত্র উল্টাইলেই অনেকে নখচ্ছেদে কুঠারের আঘাতরূপ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। আমরা ভরসা করি, ভৈষজ্য সমালোচনী সভার সভ্যগণ এবং উহার সদুৎসাহশীল সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন এই পত্রিকাখানিকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল রহিবেন এবং বঙ্গের ধনিসন্তানেরা অর্থানুকূল্যে ইহার উপকার করিবেন।

৩। "নলিনী, মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" নলিনীর বৎসর পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া আমরা বড় সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি নলিনী আর এরূপ ক্ষীণদেহ না রহিয়া বর্দ্ধিত কলেবরে ও প্রস্ফুটিত লাবণ্যে ফুল্লকমলিনীর শোভা প্রাপ্ত হউক। এই বৎসর নলিনীতে কএকটি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই তিনটি কবিতা উচ্চ মূল্যের সামগ্রী এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্থায়িরূপে গ্রথিত হইবার যোগ্য।

৪। "শরদবকাশ। যুক্তাক্ষর পরিত্যক্ত (কাব্য)। শ্রীচন্দ্রশেখরকর প্রণীত।" গোচারণের মাঠে যুক্তাক্ষর নাই, ইহা দেখিয়া অনেকেই বালকদিগের জন্য যুক্তাক্ষর-সম্পর্ক শূন্য কবিতা লিখিতে প্রয়াস পাইতেছেন। যত্ন প্রশংসার বটে; কিন্তু সকলের যত্নই সমানরূপে সফল হইতেছে কি না, তাহার বিচার করিবার জন্য আমরা এই দুইখানি কাব্যের দশ পাঁচটি পংক্তি একত্র সন্নিবেশ করিলাম। যদি এইরূপ বিচিত্র সন্নিবেশদর্শনে কেহ দুঃখিত হন, তাহা হইলে আমরা লাচার আছি। অথবা বলিব,—'বিশেষবিৎপাণিনিরেকসূত্রে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইক্ষণ কাব্যের কথা। প্রথমতঃ গোচারণের মাঠ।—

"জগৎ জাগাতে গতি করিল সমীর,
ঈষৎ কুপিত তবু অতীব সুধীর;
দুলালী লতারে ধরি ধীরে দুলাইল,
পাতার ভিতর হতে ফুল দেখা দিল,
তরুরে তাড়না করি যায় বায়ু চলি,
শাখীর কোলেতে পাখী করিল কাকলী।"

তারপর শরদবকাশ।—

"কিছুদিন গত পূজা হইত বাড়ীতে,
করিতেন যিনি তিনি যমের বাড়ীতে।
এখন পুরুষ লোক নাহিক বাড়ীতে,
বাড়ীটি রয়েছে শুধু ঘাসাদি বাড়িতে।
ঘর গুলি গেছে খোলা ধানের বাড়িতে,
যে আছে সে উঁই খসে বাড়িতে বাড়িতে,
সে কালে যেজন কভু এসেছে বাড়ীতে,
এবে এলে বুক ভাসে নয়ন বারিতে।"

শুধু লিখিলেই যে হয়, এমন নহে। গোচারণের মাঠের আদ্যোপান্ত কোন স্থলেই এইরূপ অন্ত্য যমকের ঘটা নাই; এবং এখানে কবিতার কৌশল গুণে যেমন একই বাড়ী শব্দ হইতে 'নানা অর্থ' ফুটিতেছে, উহার কোথাও তেমন কোন কৌশলের পরিচয় নাই।

৫। "বন্ধুপূজা। শ্রীনারায়ণ দ ঘোষ প্রণীত।"—সংস্কৃত আলঙ্কারিকে

যাহাকে চম্পূ বলেন, এখানি লক্ষণতঃ সেই শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকার কিরূপ ভাব-বিহ্বল উদ্বেল হৃদয় লইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থের সমগ্র নাম না শুনিলে পাঠকবর্গের বোধগম্য হইবে না। 'বন্ধুপূজা' এত উপক্রমণিকা মাত্র, গ্রন্থের সমগ্র নামটি এইরূপ ;—

"বন্ধু পূজা !!!—সুখস্বপ্ন ;—ভেঙ্গে গেল !—হায়রে !—(কিন্তু)—সাধরে !—ঘুচেগেল !—মৃত্যুস্বপ্ন ;—দশভুজা !!!"

ইহারপরে বলা উচিত ছিল ট্যাং ট্যানা টেং ট্যাং,—ঘোর তাদ্ ধিনা ধিন্ ধিনা। কিন্তু সুরুচিসম্পন্ন গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। ইহা বলা বাহুল্য যে, গ্রন্থের মুখ পত্র যেমন মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য, অথবা শব্দ লইয়া শিশুর খেলা; গ্রন্থের মধ্যে যাহা আছে, তাহাও ঐরূপ মানুষীশক্তির দুরধিগম্য। আমরা তাহার কিয়দংশ নমুনা স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আহা !

মধু কি মানস রে !

বঁধু কি বাহার রে !

ফুল্ল কি নয়নবে; বসুধামোদিত !

* * *

গুঞ্জি কি সে অলি চর্চ্চিকা চর্চ্চিত রে !

চিৎ কি [illegible] রে ! চয়নে গর্ব্বিত !"

যে দেশে এরূপ গ্রন্থের লেখক আছে ও পাঠক আছে, এরূপ গ্রন্থেরও ক্রয় বিক্রয় হয়, সে দেশে অবশ্যই সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে !

৬। "গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। প্রথমখণ্ড। ব্যবহারিক ধাত্রীবিদ্যা ও শিশু-পালন। [illegible]তিপয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে [illegible]রচন্দ্র চৌধুরি কর্ত্তৃক প্রণীত।"—এই গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বঙ্গীয় গৃহস্থ মাত্রেরই প্রয়োজনে আসিবে, এবং যাঁহারা বাল্যের প্রথম শিক্ষায় একবারে বঞ্চিত না হইয়া গৃহিণীর পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন, এখানি মনোযোগ সহকারে পড়িলে তাঁহাদিগের অনেক প্রকার উপকার দর্শিবে। যিনি ভার্য্যা হইয়াছেন, তাঁহার ভার্য্যাধর্ম্মে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক, এবং যিনি জননী হইয়াছেন, শিশুপালন শিক্ষা তাঁহার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থ এই উভয় বিষয়েই সুশিক্ষার সহায় হইবে। সুতরাং গ্রন্থকারের উদ্যম সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ।

৭। "নবচরিত। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।"—ত্রিবেণীর বিখ্যাত জগন্নাথ, কলিকাতার ডেবিডহেয়ার, কলুটোলার রামকমল এবং পরদুঃখকাতরা সারা মার্টিন এই চারিটি মনুষ্যরত্নের জীবন-চরিতে এই নবচরিত, এবং এই চারিটি চরিত্রই ইহাতে অতি সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা সরল, সুখপাঠ্য এবং বিদ্যালয়ের উপযোগিনী; ভাব-বিন্যাসও ছাত্র বুদ্ধির অক্লেশগম্য এবং সংশিক্ষার অনুকূল। এইরূপ পুস্তকই এদেশীয় বিদ্যালয় সমূহে পঠিত ও প্রচলিত হওয়ার জন্য বিশেষ যোগ্য এবং আমরা ভরসা করি শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ নবচরিতের সমুচিত আদর করিতে কখনও ত্রুটি করিবেন না।

ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনবৃত্তান্ত। জগন্নাথ রঘুনাথ শিরোমণি কিম্বা তৎপরবর্ত্তী গদাধর ভট্টাচার্য্য ও জগদীশ তর্কালঙ্কারের সমশ্রেণিস্থ লোক না হইলেও বঙ্গদেশের অমূল্য আভরণ।

জগন্নাথ শুধু পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি পাণ্ডিত্য অপেক্ষাও পৌরুষী প্রতিভায় সমধিক উজ্জ্বল ছিলেন, এবং যেগুণে আজি স্বনাম-প্রতিষ্ঠিত, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পণ্ডিত্য মাত্র পুঁজি লইয়া সমাজ সংস্কারক ও সমাজের নায়ক, জগন্নাথও সেই পুরুষকার গুণে বিশেষরূপে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি একজন সহায়-সম্পদহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াও নবদ্বীপের সমাজপতি মহারাজ চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সামাজিক যুদ্ধে কিরূপ অক্ষুব্ধ সাহসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন, তাহা পড়িবার সময়ে শরীর পুলকিত হয়। তবে কাল-ভেদে কার্য্যভেদ। সে এক স্বতন্ত্র কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ডেবিডহেয়ার। ডেবিডহেয়ার দয়ার অবতার এবং বাঙ্গালির চিরস্মরণীয় বন্ধু। যদি এখনকার পৌরাণিক বাঙ্গালিরা পিতা মাতার পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় গয়ায় পিণ্ড দিতে পারে, তাহা হইলে ডেবিডহেয়ারের উদ্দেশ্যেও পিণ্ড দেওয়া এক হিসাবে সঙ্গত হয়। তাঁহার মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া কবিকুঞ্জবিলাসী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম দুই পংক্তি এইরূপ ;—

‘মরণের বুঝি নাইক মরণ,
কৃপানিধি বিধি ডেবিডহেয়ারকে
ক’র্‌লে হরণ।’

এই গীত শুনিয়া কলিকাতার অসংখ্য সহৃদয় ভদ্রলোক তখন শোকে আকুল হইয়াছিলেন, এখনও ডেবিডহেয়ারের নাম ও গুণানুকীর্ত্তন করিলে অনেকেরই হৃদয় উছলিয়া উঠে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রামকমল সেন; এবং মহাত্মা রামকমল সেনও বঙ্গদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র। তিনি যেমন অর্থোপার্জ্জন করিতে জানিতেন, তেমনই অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার জানিতেন এবং মনুষ্য বিষয়সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিলেও যে, জ্ঞান ও [illegible] করিতে পারে, তাহার [illegible] হাতে [illegible] আমরাও সেইরূপ [illegible] মল হৃদয়ে এই পবিত্র জীবনের প্রতি ঘটনা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।”

রজনী বাবু নবচরিতের প্রথম পৃষ্ঠায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের শৈশবের যে একটি কাহিনী দিয়াছেন, তাহা প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিত সমাজে রঘুনাথ শিরোমণির কথা বলিয়া প্রচলিত। এবার একদিন গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত গঙ্গাধর বিদ্যারত্নের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ ছিল। তিনিও বলিলেন যে, ওকথা জগন্নাথের নহে; উহা রঘুনাথেরই শৈশবের ইতিহাস। বিশেষতঃ জগন্নাথ যদি বাসুদেবের দৌহিত্র ও রুদ্রদেবের পুত্র, তাহা হইলে তিনি কখনও অপরিচিতকুলা অসহায়া ভগীর[illegible]পুত্র হইতে পারেন না। এইরূপ ঘটনাবিরুদ্ধ কিংবদন্তী জীবনচরিতের মধ্যে গৃহীত হওয়া উচিত কি না, সুযোগ্য গ্রন্থকার তদীয় পুস্তকের পুনঃসংস্করণ সময়ে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা নিতান্ত প্রীত হইব।